আয় ঘুম

আয় ঘুম

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ISBN 978-93-5040-034-0

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

AAI GHUM
[Novel]
by
Krishnendu Mukhopadhyay

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta 700009

মা-কে

ঘুমটা এক চটকায় ভেঙে গেল। মনে হল যেন মোবাইল বাজছিল। এখন আর বাজছে না। নিস্তব্ধ ঘরে রেশটুকু যেন রয়ে গেছে। বাথরুমের দরজার পাশ ঘেঁষা নরম ফুটলাইটের আলো। অন্ধকার ঘরে এই আলোতে ঘরটা কেমন দেখতে লাগে তার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। কাল সন্ধেবেলায় প্রীতম সান্যাল এখানে এসেছেন। রিসর্টটা নতুন হয়েছে। জায়গাটা মহীশূর থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরে। আর সঙ্গে ছিল...

প্রীতম সান্যাল দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিলেন। পাশ ফিরলেন। মেয়েটাও উলটোদিকের দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরে আছে। শরীরের ওপরে সাদা শাটিনের চাদর যেভাবে এলোমেলো হয়ে আছে, তাতে ফুটলাইটের চোরা আলোয় অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটার শরীরে একটা সুতোও জড়ানো নেই। ধারালো পেনসিলে আঁকা টানটান নিখুঁত রেখায় মোড়া একটা শরীর। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল প্রীতম সান্যালের। শরীরের জটিল জ্যামিতি দেখার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা জেগে উঠল, মেয়েটার শরীরে একটা সুতোও নেই কেন?

কী যেন একটা নাম বলেছিল মেয়েটা? আচমকা ঘুম ভেঙে এখন আর মনে পড়ছে না। অবশ্য মনে করার চেষ্টাও করলেন না প্রীতম সান্যাল। নেহা না নিকিতা, ওইরকম কী যেন একটা নাম কাল বলেছিল বোধহয়। পেশাদার এসকর্টদের আবার কোনও নাম থাকে নাকি! এক-এক দিন এক-এক নাম। জেগে আছে নাকি এখন? কনুইয়ে ভর দিয়ে শরীরটা খানিকটা উঠিয়ে নিয়ে প্রীতম উলটোদিকে ফিরে শুয়ে থাকা মেয়েটার মুখটা দেখার চেষ্টা করলেন। আর তখনই মাথার থেকে গলগল করে একটা রাগ আলোর গতিতে ছড়িয়ে পড়ল গোটা শরীরে। কী স্পর্ধা মেয়েটার!

মধ্য চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই শরীরটা মনের মতো চটপটে নয়। অস্থি-মজ্জায় বয়সের লক্ষণ উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। তার ওপর খাটের গদিটা এত মোটা, নরম তুলতুলে, শরীরের ভারসাম্যই ঠিকমতো রাখা যায় না। টালমাটাল হয়ে খাটের থেকে নেমে স্লিপার গলিয়ে মেয়েটার সামনে এলেন। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক করে অকাতরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। নিজের অর্ধেক বয়সি মেয়েটার নিষ্পাপ ঘুমন্ত মুখটা দেখে এক মুহূর্ত মনটা অবিন্যস্ত হয়ে গেল প্রীতম সান্যালের। ঘুমোতেই তো দিতে চেয়েছিলেন মেয়েটাকে। কিন্তু ওর শরীরে একটাও সুতো নেই কেন? এই পেশায় থাকতে থাকতে নিরাভরণ হয়ে শোওয়াটাই হয়তো অভ্যেস!

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে যাওয়া রাগটা আবার ছড়িয়ে পড়ল মাথার শিরা-উপশিরায়। মেয়েটার ছড়ানো হাতটার মুঠোয় প্রীতম সান্যালের মোবাইল।

মাটিতে কার্পেটের ওপর অবহেলায় পড়ে ছিল মেয়েটার ট্রাউজার, টি-শার্ট আর

অন্তর্বাস। প্রীতম সান্যাল সবকটাকে একদম পাকিয়ে তুলে সজোরে ছুড়ে মারলেন মেয়েটার মুখের ওপর।

অতর্কিত আঘাতে মেয়েটার ঘুম ভাঙল। চমকে উঠে বসল সে। ঘুম থেকে টেনে তুলে শেষ পয়সাটুকু উশুল করার জন্য ক্লায়েন্টরা অনেক রকম অত্যাচার করে। মেয়েটা ভাবতে বসল, এই অদ্ভুত লোকটা ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কিছুই করেনি। শেষপর্যন্ত এবার তা হলে...। আলো-অন্ধকারে মেয়েটা দেখল নাইটসুট পরে গনগনে একটা দৃষ্টি হেনে লোকটা তাকিয়ে আছে তার দিকে। খুব অদ্ভুত লোকটা। রোজালিনা বলেছিল, 'জীবনে এরকম একটা ক্লায়েন্টের জুড়ি পাবি না।' মেয়েটা জানার চেষ্টা করেছিল কোনও বিকৃতি বা বিপদ আছে কিনা। রোজালিনা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল, 'দুর বোকা, কোনও বিপদ নেই, তোকে গ্যারান্টি দিচ্ছি। তবে তুইও জীবনে ভুলবি না এরকম ক্লায়েন্ট।'

রোজালিনার কথাটা যে কতটা সত্যি মেয়েটা তার আন্দাজ কাল থেকে পেয়েছে। বেঙ্গালুরু থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে মাইসোর রোডের ওপর অপেক্ষা করতে বলেছিল লোকটা। ঘড়ির কাঁটা ধরে সময়ে এসেছিল দামি গাড়ি চালিয়ে। তারপর গোটা রাস্তায় একটা কথাও বলেনি। গাড়িতে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল চালিয়ে একমনে ড্রাইভ করে গেছে। কফি খাওয়ার জন্য একবারও থামেনি। লং ড্রাইভে ক্লায়েন্টরা যেরকম কথা শুনতে পছন্দ করে, সেরকম আদুরে গল্পও করার চেষ্টা করেছিল মেয়েটা, লোকটা বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠেছিল। মেয়েটা গোটা রাস্তায় শুধু বাবলগাম চিবিয়ে গেছে। দু'-চারবার বড় বড় বাবল ফুলিয়ে ফাটিয়েও লোকটার একচুল মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই ধমকানিই খেয়েছে।

হাউ ডেয়ার... ইউ বিচ?

প্রীতম সান্যালের ছুড়ে দেওয়া পোশাকগুলো বুকের ওপর চেপে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল মেয়েটা, নেশা জড়ানো পাতলা ঘুমটা ভেঙে নিজের অপরাধটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। 'বিচ', লোকটার মুখে এই প্রথম একটা গালাগাল শুনল। হতে পারে লোকটা ওর শরীরে কড়ে আঙুলটাও ঠেকায়নি, কিন্তু তার মতো পেশাদার এসকর্টদের বিবসনা দেখে এতখানি রেগে ওঠার কোনও কারণ ধরতে পারছে না। হাতের মুঠোয় চেপে রাখা মোবাইলটা বালিশের পাশে রেখে ছুড়ে দেওয়া পোশাকগুলো বুকের ওপর চেপে ধরে খাটের ওপর উঠে বসল। লোকটা এক ঝটকায় বালিশের পাশ থেকে মোবাইলটা তুলে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, নাউ, জাস্ট গেট লস্ট!

মোবাইলটা নিয়ে ঘরের অন্য দিকে জানলার ধারে চলে এলেন প্রীতম সান্যাল। কলকাতার বাড়ির কয়েকজন ছাড়া এই নম্বর পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। ভুলেও কখনও তিনি এই মোবাইল বন্ধ করেন না। বাইরের জগতের জন্য ওঁর অন্য যে-মোবাইল আছে, সেটা এখন নিষ্ক্রিয় হয়ে গল্ফ কিটের মধ্যে ঘুমোচ্ছে। মেয়েটা খাটে বসে থেকেই গজগজ করে বলল, ইয়োর বাগিং সেল...

রোজালিনা একেবারে ঠিকই বলেছিল। লোকটাকে জীবনে ভুলবে না। এখানে

এসে কাল সন্ধেবেলা লোকটা বলেছিল, 'তুমি ইচ্ছেমতো খাও দাও ঘোরো ফেরো, তারপর ঘুমিয়ে পড়ো, খালি আমাকে কোনও ডিস্টার্ব কোরো না।' মেয়েটা চোখ টিপে বলেছিল, 'বিছানাতেও নয়?' উত্তরে লোকটা কাছে ডেকেছিল। তারপর ঠান্ডা মাথায় শুনিয়েছিল নিজের প্রত্যাশার কথা।

শোনো, আই জাস্ট ওয়ান্ট ইয়োর কম্পানি ইন মাই ওন ওয়ে। মাঝে মাঝে একা থাকতে আমার খুব ভয় লাগে। এর থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমার কেউ নেই। আই জাস্ট গেট সাম রিলিফ। তোমাদের মতো অচেনা, অজানা মেয়েদের পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ কাটিয়ে...। তা ছাড়া এটা আমার...

কথাটা শেষ না করে চুপ করে গিয়েছিল লোকটা। চুপ তো চুপই। ডিনার পর্যন্ত একসঙ্গে খায়নি। তবে পয়সাকড়ি মিটিয়ে দিয়েছিল। মেয়েটা একা-একাই খেতে গিয়েছিল। যা খুশি, যত খুশি খাওয়ার স্বাধীনতাটাই কাল হয়েছিল। শরীরটাই সম্পদ। তবু ক্যালোরির নিক্তি বেহিসেবি হয়ে গিয়েছিল। পেগের অঙ্ক মাথায় থাকেনি। তারপর ঘরে ফিরে এসে দেখেছিল লোকটা খাটে বসে একমনে একটা মোটা ইংরেজি পেপারব্যাক পড়ছে। এমনকী ও যখন পাশে এসে শুয়ে পড়ল, লোকটা ফিরেও দেখেনি ওকে। লোকটার পুরুষত্ব নিয়েই মনে তখন প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছিল। পাশ ফিরে একদম ঘুমিয়ে পড়ার আগে নেশা জড়ানো গলায় লোকটাকে শুধু বলেছিল, গুড নাইট!

লোকটা বইটা এক মুহূর্তের জন্য মুড়ে রেখে হেসেছিল। ওই একবারই লোকটাকে হাসতে দেখেছিল।

গুড নাইট! হ্যাভ আ সুইট ড্রিম।

তারপর লোকটা কতক্ষণ বই পড়েছিল, কখনই-বা ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিছুই আর খেয়াল রাখেনি মেয়েটা। নেশার ঘোরে শরীরের ভেতর থেকে হলকা বেরোচ্ছিল। এসি-র নিঃশব্দ ঠান্ডা সেই হলকা মোচন করতে পারছিল না। নেশার ঘোরেই শরীরের অসহ্য তাপ থেকে নিবৃত্তি পেতে মেয়েটা হয়তো একটা একটা করে পোশাক খুলে ফেলেছিল। কখন? এটাও খেয়ালে নেই। মাথাটা টলটল করছিল। আর মাথা পরিষ্কার থাকলেও, অচেনা পুরুষের কাছে কখন নিঃসংকোচে উন্মুক্ত হয়েছে সেটা আর কবে খেয়াল রেখেছে! তবে যেটা খেয়াল করে মনে পড়ছে, সেটা হল ওই লোকটার মোবাইল ফোনটা। ঘুমোতে যাওয়ার আগেও তো খেয়াল ছিল ফোনটা দুটো বালিশের মাঝখানে ছিল। হালকা একটা রিংটোন, তার সঙ্গে মেশানো একটা ভাইব্রেশন। এই ভাইব্রেশনটা যে কী সাংঘাতিক বস্তু, বুঝতে পারল রাতদুপুরে। দুটো বালিশের মধ্যে থাকা মোবাইলটা ঘুমের ঘোরে হাতটাত লেগে কোনওভাবে হয়তো ওর বালিশের তলায় চলে এসেছিল। তারপরে রাতদুপুরে বালিশের তলায় থিরথির করে কাঁপতে লাগল। হালকা রিংটোন তাও সহ্য করা যাচ্ছিল. কিন্তু থিরথিরানিটা অসহ্য। মাথাটা ধরেছিল। তারপর মাথার নীচে ওই কাঁপুনি। পাশে তখন ওই আজব লোকটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। দু'বার হালকা ঠেলা মেরেও ঘুম ভাঙানো যায়নি। আর চেষ্টা করেনি। বরং আরও অসহ্য একটা চিড়বিড়ানি হচ্ছিল মোবাইলটার সুইচ অফ করার কায়দা খুঁজে না

পেয়ে। অগত্যা কলটা কেটে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সেই থিরথিরানি। আবার কল কেটে দেওয়া। বিরক্তিকর খেলাটা চলল বেশ কিছুক্ষণ। কল আসা আর কেটে দেওয়া। এভাবেই কখন যেন মোবাইলটা মুঠোয় মুড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল।

জানলার কাছে এসে প্রীতম সান্যাল মন দিয়ে মোবাইলের স্ক্রিনটা দেখলেন। স্ক্রিনের মধ্যে তারিখ, সময় ফুটফুট করছে। এই প্রথম ঘুম ভেঙে সময় দেখলেন। রাত্রি দুটো বারো। তারপর মোবাইলের কল রেজিস্টার দেখলেন। রাত্রি একটা পঁয়ত্রিশ থেকে একটা সাতচল্লিশের মধ্যে একটা মিসড কল আর তিনটে ড্রপড কল। তিনবারই এদিক থেকে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। এই ইনকামিং নম্বরটায় আজ পর্যন্ত কোনওদিন এরকম হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে এই ফোনটা। ছ'টার বেশি রিং হওয়ার আগেই কানে তুলে নেন প্রীতম। আর মাঝরাতে পারতপক্ষে কলকাতা থেকে কোনও ফোনই আসে না। নিশ্চয়ই সাংঘাতিক জরুরি কিছু।

শুধু আজকে। ক্যালেন্ডারের এই একটা তারিখ কুঁকড়ে দেয় ভেতরটা। মেয়েটাকে পাশে নিয়েও দুটো ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নিয়েছিলেন। যারা আজকের প্রীতম সান্যালকে চেনে, তাদের স্বয়ং ঈশ্বর এসে বললেও বোধহয় বিশ্বাস করবে না প্রীতম সান্যাল এরকম কোনও বেহিসাবি কাজ করে দুটো সিডেটিভ খেয়ে নিতে পারেন। নিজের উপর বিরক্তিতে দু'বার মাথা ঝাঁকিয়ে ফোন করলেন কলকাতার নম্বরে। কয়েকটা রিং হওয়ার পর অপর প্রান্তে শোনা গেল উদ্বেগ মেশানো এক মহিলার কণ্ঠস্বর।

হ্যালো, স্যার...

কে, বনানী?

হ্যাঁ স্যার...

কী ব্যাপার? এনি প্রবলেম?

আপনাকে স্যার এত রাতে বিরক্ত...

অধৈর্য হয়ে মৃদু ধমকে উঠলেন প্রীতম সান্যাল।

আঃ, সমস্যাটা বলো।

বনানীর অনেকদিন হয়ে গেল কলকাতার বাড়িতে নার্সের চাকরি। সেবা, যত্ন, মায়া, মমতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা নিয়ে মেয়েটার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু বারবার শেখানো সত্ত্বেও সহজ-সরল কমিউনিকেশন করার কায়দাটা আজও রপ্ত করে উঠতে পারেনি। প্রীতম সান্যাল বারবার শেখানোর চেষ্টা করেছেন, কথা হবে স্পেসিফিক এবং টু দ্য পয়েন্ট। অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া নিশ্চয়ই রাত একটা পঁয়ত্রিশ থেকে ফোনের চেষ্টা করে যায়নি!

প্রীতম সান্যালের বিরক্তি বুঝে একটা ঢোঁক গিলে এবার আরও এক পর্দা খাদে নামল বনানীর গলা, স্যার, ওঁকে কিছুতেই সামলে রাখা যাচ্ছে না। বারোটা-সাড়ে বারোটা থেকে একদম অস্থির হয়ে উঠেছেন একবার আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোনও কথা শুনছেন না।

ওফ্, ফোন করোনি কেন আমায়? বলেই প্রীতম সান্যাল চুপ করে গেলেন। বুঝতে

পারলেন বারোটা-সাড়ে বারোটা থেকে কিছুক্ষণ সামলানোর চেষ্টা করে বনানী তো বারবার চেষ্টা করেছিল কথা বলতে। ওই বেয়াদপ ভাড়াটে মেয়েটার জন্য...

মুখ ফিরিয়ে মেয়েটাকে দেখলেন। গোলাপি টি-শার্টটা চড়িয়ে খাটের উপর গুম মেরে বসে আছে। একঝলক দেখে আবার জানলার দিকে ফিরে ফোনে মন দিলেন।

কী করছেন এখন? ঘুমিয়েছেন?

না, স্যার।

চোখটা অসহায়ের মতো বন্ধ করলেন প্রীতম স্যান্যাল।

ডাক্তারকে খবর দিয়েছ?

দিয়েছি স্যার। সাড়ে বারোটার আগেই খবর দিয়েছি। ডক্টর বললেন পয়েন্ট ফাইভ ঘুমের ওষুধটা আরও একবার খাইয়ে দিতে। তিনি আর আধঘণ্টার মধ্যেই আসবেন। কিন্তু কিছুতেই পারছি না স্যার। ট্যাবলেটটা মুখে নিয়েই থু-থু করে ফেলে দিচ্ছেন। তিনবার চেষ্টা করেছি। আমাকে অকথ্য গালি দিচ্ছেন। অবশ্য তাতে...

ফোনটা ওঁকে দাও বনানী। যতক্ষণ ডাক্তার না আসছে, আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলছি। ডাক্তার চলে এলে তুমি অন্য কোনও ফোন থেকে আমাকে এই নম্বরেই ফোন কোরো। তুমি এনগেজড পাবে। কিন্তু আমি ইনকামিং পিকপিক আওয়াজে বুঝে যাব তুমি কথা বলতে চাইছ। যাও, এবার ফোনটা ওঁকে দাও।

মেয়েটা খাটের ওপর বসে মাঝে মাঝেই মুখ তুলে দেখছিল। কী ভাষায় লোকটা কথা বলছে একবর্ণ বোঝা যাচ্ছে না। ক্লায়েন্টদের ব্যক্তিগত পরিচয় খুব একটা জানার অভ্যাস ওর নেই। লোকটা যেরকম অবোধ্য ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে, তার উচ্চারণ আর কথা বলার ভঙ্গি থেকে শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে লোকটা আর যাই হোক, দক্ষিণ ভারতীয় নয়। তবে কতটা বিভিন্ন দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা জানে সেটা একটা প্রশ্ন। যে-ইচ্ছেটা কোনওদিনই করে না, সেই ইচ্ছেটাই চাগাড় দিচ্ছে। এই লোকটা সম্পর্কে জানার। অন্য মেয়েদের সঙ্গে কী করে রাত কাটায়। হাতব্যাগ থেকে নিজের মোবাইল বার করে রোজালিনকে ফোন করল মেয়েটা।

হাই হানি।

মেয়েটা একপলক সামনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় মলায়লি ভাষায় একটা গালি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে রে?

রোজালিনা সেই ভয়ংকর হাসিটা হাসতে থাকল। পুরুষমানুষের শরীরে রক্ত ছলকায় ওই হাসি শুনলে। মেয়েটা আরও বিরক্ত হয়ে কয়েকটা অশ্লীল শব্দ আউড়ে আবার জিজ্ঞেস করল, লোকটা কে?

রোজালিনা হাসির গমক থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন, প্রেমে পড়েছিস? গলায় মালা দিবি? নাকি...

বনানী রকিং চেয়ারটার সামনে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ মাঝে মাঝে চুপ করে পাথরের

মতো বসে আছেন। মাঝে মাঝে বিপজ্জনকভাবে দোল খাচ্ছেন। বনানী কর্ডলেস ফোনটার মাউথপিসটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল, এই নিন, ছেলেকে তখন থেকে খুঁজছিলেন... আপনার ছেলে...

বৃদ্ধ দুলুনি থামালেন। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বনানীর দিকে চেয়ে এক ঝটকায় ফোনটা কেড়ে নিয়ে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, বাবা বিট্টু!

প্রীতম সান্যাল গলাটা একদম নরম করে বললেন, বলো বাবা, এই তো আমি!

ম্যানচেস্টারের কলেজ থেকে তোর নামে একটা খাম এসেছে। লম্বা খয়েরি খাম। রানি এলিজাবেথের মুখের ছবি দেওয়া ডাকটিকিট। ওর মধ্যে তোর ভরতি হওয়ার ফর্মটা আছে। কিন্তু কোথায় যে রাখলাম, তখন থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। কাজের লোকগুলো সব অপদার্থ। সব ক'টাকে তাড়াব আমি... কোথায় যে রাখলাম... তোর মা আবার নিয়ে ছিঁড়ে ফেলল কিনা...

প্রীতম সান্যাল একটা চাপা শ্বাস ফেলে বললেন, সে কী বাবা, তুমি তো বিকেলবেলায় আমাকে ফর্মটা দিয়ে দিলে। তোমার মনে নেই?

বৃদ্ধ একটু থমকে গিয়ে বললেন, তোকে দিয়ে দিয়েছি, তাই না? দেখ কিছুতেই মনে করতে পারছি না। একবার নিয়ে আয় তো ফর্মটা আমার কাছে।

ওটা তো আমি পোস্ট করে দিয়েছি। তুমি বললে যে পোস্ট করে দিতে. .

তোকে তাই বলেছিলাম, তাই না? কিন্তু ফর্মটায় কী ভরতি করেছিস সব খাতায় টুকে রেখেছিস তো?

হ্যাঁ বাবা, জেরক্স করে রেখেছি।

জেরক্স করে রেখেছিস? এর মানে কী রে?

প্রীতম সান্যাল চোখটা একটু কুঁচকোলেন। একটু ভেবে বললেন, জেরক্স নয় বাবা, বলছিলাম জোরে কষে কার্বন দিয়ে সব টুকে রেখেছি। ফর্মটা ফিলআপ করার সময় তলায় একটা কার্বন আর সাদা কাগজ দিয়ে চেপে চেপে ফিলআপ করেছি। তুমিই তো বলেছিলে।

তাই বল, ওটা আমাকে একবার দেখা তো, নিয়ে আয় একবার।

এখন অনেক রাত বাবা, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, আমি সকালবেলাতেই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

সেই ভাল। সকালে অনেক কাজ আছে। সরোজকে আসতে বলেছি। বিওএসি-তে তোর টিকিটটা কাটতে বলেছি। তারপর তোকে নিউ মার্কেটে দর্জির দোকানে নিয়ে যাব। নাসির আলিকে বলা আছে। ওর মতো সুট কাটতে সাহেবরাও পারবে না। ওই সুট পড়ে প্রিন্সিপ্যাল এমারসন সাহেবকে বলবি, স্যার, আই অ্যাম ফ্রম সোনার বাংলা। তোর মনে আছে তো, সোনার বাংলা কথাটা কোথা থেকে এসেছে?

মনে আছে বাবা। সোনার বাংলা। যে-দেশের গ্রামে গ্রামে সোনার মতো রেশমি সুতো তৈরি হয়।

ভেরি গুড। গোল্ডেন ফেব্রিক ফ্রম বেঙ্গল। তুই এমারসন সাহেবকে বলবি, রবার্ট ক্লাইভ যখন বেঙ্গলে এসেছিল, তখন সুতানুটি বলে একটা গ্রাম ছিল, সেই গ্রামের সুতো মুঘল বাদশাদের জন্য যেত। কী কোয়ালিটি ছিল সেই সুতোর! বলবি, আমাদের সুতো পৃথিবীর সেরা। তোমরা টেকনোলজিতে এগিয়ে থাকতে পারো, কিন্তু কোয়ালিটিতে নয়।

বলব বাবা।

তবে বিলেতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিংটা মন দিয়ে পড়বি বাবা। হরিতলা কটন মিলের ভবিষ্যৎ তো তুই। অনেক অনেক বড় করতে হবে কারখানাটা। হরির ঝিলটা তুই নিশ্চিন্তে বুজিয়ে দিতে পারিস।

প্রীতম সান্যাল ভেতর ভেতর অস্থির হচ্ছেন। ফোনে এখনও বনানীর বিপবিপ করে ইনকামিং কলের খোঁজের বার্তাটা নেই। বনানী বলেছিল আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার চলে আসবে। বনানী যে-সময়ে ডাক্তারকে খবর দিয়েছিল বলল, তখন থেকে সব মিলিয়ে দু'ঘণ্টা কেটে গেছে। ওপ্রান্তে বৃদ্ধ অনর্গল বলে চলেছেন। বৃদ্ধকে মাঝপথে থামিয়ে গলাটাকে একেবারে আদুরে করে দিয়ে প্রীতম সান্যাল বললেন, বাবা, একটা কথা শুনবে আমার? তুমি প্লিজ বনানীর কাছে ওষুধটা খেয়ে নাও। তারপর অনেক গল্প শুনব তোমার কাছে। গাঁধীজি, চরকা, সুতো, আমাদের স্বাধীনতা, তারপর একটু একটু করে তুমি কীভাবে হরিতলা কটন মিলটা করলে। হরির ঝিল...

বৃদ্ধ একটু গুম মেরে গেলেন। তারপর অভিমানী গলা করে বললেন, ঠিক আছে। ওকে বল ওষুধটা দিতে।

প্লিজ তুমি একবার বনানীকে ফোনটা দাও।

বৃদ্ধ থমথমে মুখে ফোনটা এগিয়ে দিলেন। বনানী দ্রুত ফোনটা নিয়ে একটু তফাতে এসে চাপা গলায় বলল, হ্যালো স্যার!

বনানী কুইক। রাজি হয়েছেন। মত পালটে ফেলার আগে এক্ষুনি ওষুধটা খাইয়ে দাও। আমি লাইনটা ধরে আছি। ওষুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে ফোনটা আবার ওঁকে দিয়ো।

প্রীতম সান্যাল চোখ বন্ধ করলেন। চারদিক নিস্তব্ধ। তার মধ্যেই পিছন দিক থেকে একটা রিংটোনের আওয়াজ শুনতে পেলেন। মেয়েটার সেলফোনটা বাজছে। মেয়েটার ফোনের ব্যাপারে প্রীতম সান্যালের কোনও আগ্রহ নেই, তবে এরকম নিঃশব্দতার মধ্যে মেয়েটার কথাবার্তাগুলো কানে ঢুকে পড়া আটকাতে পারলেন না। অবশ্য মেয়েটা যে-দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় কথা বলছে, তার একটা শব্দেরও মর্মোদ্ধার করতে পারছেন না তিনি।

কী রে, রাগ করে লাইনটা কেটে দিলি কেন?

আমার আর কোনও ইন্টারেস্ট নেই। এর চেয়ে রাফ অ্যান্ড টাফ ক্লায়েন্ট অনেক সেফ। মারধর করে হয়তো রাতে বার করে দিয়েছে, কিন্তু সেটা আফটার গুড সেক্স। এরকম একবারও না ছুঁয়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলে, মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলা লোকেরা ডেঞ্জারাস। এরা ঠান্ডা মাথায় খুনও করে দিতে পারে।

দুর পাগল, সেরকম ভয়ের কিছু থাকলে কি আমি তোকে পাঠাই? আর তুই পাগল বলছিস? তুই জানিস লোকটা কে? প্রীতম সানিয়াল। উইংসফট-এর মালিক। আমি অন্য ক্লায়েন্টদের কাছে শুনেছি, লোকটা যে উল্কার গতিতে উঠেছে, সেটা থাকলে নেক্সট দশ বছরে দেশি-বিদেশি সব আইটি কোম্পানিকে ছাড়িয়ে যাবে।

তাই নাকি? মেয়েটা অবাক গলায় বলল।

এত অবাক হওয়ার কী আছে? তুই যেন কোনওদিন এইসব লেভেলের লোকদের সঙ্গে শুসনি...

না... অন্য একটা কথা ভাবছি... টিভিতে তো উইংসফট-এর মালিক একটা অন্য রকম দেখতে লোককে দেখেছিলাম মনে হচ্ছে...

না, একেই দেখেছিলি, এখন মাথাটা চকচকে ন্যাড়া করে নিয়েছে শুধু। আমার কথা শোন, আঠার মতো চিটে থাক। লাস্ট টাইম কী হয়েছিল জানিস? পিঙ্কিকে সারারাত ধরে কম্পিউটার শিখিয়েছিল। পরে একটা ল্যাপটপ গিফ্ট করেছিল।

উইংসফট-এর মালিক... বিল গেটসকে কি একদিন ছাড়িয়ে যেতে পারে লোকটা...? কী অদ্ভুত...!

অচেনা মেয়েটার অজানা ভাষার মধ্যে একটা চেনা শব্দ শুনতে পেলেন প্রীতম সান্যাল। উইংসফট। মেয়েটা বোধহয় ওঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। এসকর্টদের ব্যবস্থা যারা করে দেয়, তাদের কারও কাছেই কোনওদিন নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য আলাদা কোনও শর্ত দিয়ে রাখেন না প্রীতম সান্যাল। এইটুকু ঠুনকো সম্মানহানির ভয় তাঁর নেই। এর চেয়ে অনেক জটিল পারিবারিক সামাজিক পরিচয়টা বরং তিনি চান সবার সামনে আসুক।

বনানী ভয় ভয় মেশানো গলায় বলল, স্যার, ট্যাবলেটটা এবার খেয়ে নিয়েছেন।

গুড, বাবাকে দাও ফোনটা।

বৃদ্ধ আগের বারের মতোই ফোনটা বনানীর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। চিন্তিত গলায় বললেন, তোকে কী যেন বলছিলাম বাবা বিট্টু!

বলছিলে, তোমার ঘুম পাচ্ছে, তুমি ঘুমোতে যাবে, পরে কথা বলবে...

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। তবে তোর নামে আজকে একটা রানির মুখের ডাকটিকিট দেওয়া লম্বা খয়েরি খাম এসেছে। কোথায় যে রাখলাম... কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

তুমি তো আমাকে খামটা দিয়েছ বাবা। এবার শুয়ে পড়ো। তুমি বলছিলে তোমার ঘুম পাচ্ছে। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছে বাবা।

দিয়েছি, তাই না? ঠিক আছে বাবা, শুয়েই পড়ছি। তুইও শুয়েই পড় বিট্টু।

রিসর্টে মেয়েদের নিয়ে যে-তাড়না লোকেরা মেটাতে আসে, তার ছিটেফোঁটা নেই লোকটার শরীরে। মেয়েটার ভেতরে ভেতরে এবার হাসি পাচ্ছে। রোজালিনা বলছে ক'বছর পরে এই লোকটা নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার কোম্পানির মালিক

হয়ে যেতে পারে। কাঁচা ঘুমটা চটে গেছে, তার ওপর এটা ভাবতে ভাবতে প্রীতম সান্যালের চকচকে মাথাটা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল মেয়েটা।

মেয়েটাকে ফিক করে হাসতে দেখে প্রীতম সান্যাল সদ্য লুপ্ত হওয়া রাগটা গলায় ফিরিয়ে এনে বললেন, তুমি এখনও যাওনি? জাস্ট গেট লস্ট রাইট নাও।

মেয়েটা কাঁধ ঝাঁকাল, নো, আই ওন্ট!

মানে?

মানে খুব সোজা, আমি যাব না। কথা ছিল বেঙ্গালুরু থেকে পিক আপ আর বেঙ্গালুরুতেই ড্রপ ব্যাক।

ছিল হয়তো। কিন্তু এখন আমি মত বদলেছি।

মেয়েটা খাট থেকে নেমে সাদা ট্রাউজারটা পায়ে গলাতে গলাতে একটা চোখ টিপে বলল, আমি বদলাইনি। আমি তোমার সঙ্গেই এখানে থেকে যাব।

মেয়েটার কথা শুনে প্রীতম সান্যালের মুখের রেখার আঁকিবুকিগুলো পালটাতে থাকল। মেয়েটার সার্ভিস চার্জ গতকালই মিটিয়ে দিয়েছেন। প্রাপ্য টাকার ওপর টিপ্‌সও দিয়েছেন। তবু আবার ওয়ালেটটা খুলে কয়েকটা সবুজ পাঁচশো টাকার নোট মেয়েটার পাশে রেখে বললেন, তোমার বেঙ্গালুরু ফিরে যাওয়ার টাকা। আর বিরক্ত কোরো না। বেরিয়ে যাও।

মেয়েটা আড়চোখে নোটগুলোর দিকে তাকাল। বেঙ্গালুরু বাসে করে ফিরে যেতে আর কতটুকু লাগবে! এটা উপরি হল। শুধু সকাল হওয়া পর্যন্ত এই ঘরের বাইরে এদিক-ওদিক করে রিসর্টটাতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিতে হবে, তারপর মাইসোর হয়ে বেঙ্গালুরু। বাঁচা যাবে এই পাগলটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে। টাকাগুলো নিয়ে বলল, বাই! তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন প্রীতম সান্যাল। ভেবেছিলেন একদম সকাল সকাল মেয়েটাকে নিয়ে যাবেন রঙ্গনথিট্টো বার্ড স্যাংচুয়ারিতে। কাবেরী নদীর মধ্যে ছোট ছোট চড়ার দ্বীপ। ভাড়া করে নেবেন একটা বোট। তারপর একটার পর একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দূরবিন দিয়ে মেয়েটাকে চিনিয়ে দেবেন কোনটা হেরন, কোনটা বিল স্টর্ক, কোনটাই বা স্পুনবিল। তারপর ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে বেঙ্গালুরু।

মেয়েটা সব গন্ডগোল করে দিল। এখন সকাল হলে আর রঙ্গনথিট্টো যাবেন কিনা ভাবছেন। ফোনটা বেজে উঠল তখনই। কলকাতা থেকে ডাক্তার। প্রীতম সান্যাল ক্লান্তি ঝরানো গলায় বললেন, বলো ডাক্তার।

স্যার, আপনার বাড়ি থেকে বলছি। আপনার বাবা ঘুমোচ্ছেন। সাউন্ড। এভরিথিং এলস ইজ অ্যাবসোলিউটলি নর্মাল।

প্রীতম সান্যাল ডাক্তারকে থামিয়ে দিলেন, হেই... ওয়েট আ মিনিট। কী সাফাই গাইতে চাইছ? আই পে ইউ ফর মাই ফাদার্স টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন কেয়ার। হাউ মেনি টাইমস আই হ্যাভ টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট?

না, মানে আমি সেকথা বলছি না স্যার। আই অলওয়েজ ট্রাই টু ডু মাই বেস্ট।

কিন্তু আমার সব কথা তো শোনা হয় না। যেমন স্যার কাল রাতে একটা জিনিস ঠিক হয়নি।

কী আবার ঠিক হয়নি?

কাল রাতে স্যার আপনার বাবা ম্যাডামের ছবির সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি দেখেছিলেন। মানে বুঝতে পারছেন তো স্যার, আগুনের রিফ্লেকশনটা ম্যাডামের ছবির কাচের ওপর... মানে স্যার ওঁর মতো অ্যালঝাইমার্স পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা একটা শকিং...

নার্সকে দাও।

অ্যাঁ স্যার?

বনানীকে দাও।

চিৎকার করে উঠলেন প্রীতম সান্যাল। বনানী ডাক্তারের পাশেই ছিল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি ওর দিকে ফোনটা এগিয়ে দিল। ডাক্তারের মুখ দেখেই বনানী বুঝেছিল ওদিকে ঝড় বইছে। ফোনটা ধরে কাঁপা গলায় বলল, হ্যালো স্যার!

কাল মাম্মির ছবির সামনে ক্যান্ডেল জ্বালানো হয়েছিল?

শুনেছি স্যার। আসলে আমি তো ন'টায় ডিউটি ধরেছি। তার আগেই...

আমাকে বলোনি কেন?

মানে স্যার... আমি ভেবেছিলাম পার্বতী আপনাকে বলেছে। কাল তো ম্যাডামের মৃত্যুদিন ছিল। আপনার পারমিশন ছিল।

কী আশ্চর্য! আমার পারমিশন কী ছিল? বাবাকে নিয়ে গিয়ে মাম্মির ছবির সামনে ক্যান্ডেল জ্বলছে সেটা দেখানো? এতগুলো লোক তোমরা কাজ করছ বাড়িতে, সবার কি একসঙ্গে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল?

সরি স্যার। আমি তো আসলে ছিলাম না, কিন্তু শুনেছি স্যার, উনি হঠাৎ করে ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন।

তুমি এরকম আরও কত কথা শুনে আমার কাছে চেপে যাও বনানী? এত কথা নিজের মধ্যে চেপে রাখলে তোমার তো এবার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। তার চেয়ে ভাল তুমি এবার কাজটা ছেড়ে দাও, ঘরসংসার করো, ওটাই তোমার দ্বারা হবে। যাক গে, ডাক্তারকে দাও।

হ্যাঁ স্যার।

মন দিয়ে শোনো ডাক্তার। যা হয়ে গেছে, আমার ভয় হচ্ছে, আবার সেই আগের মতো না হয়। বাড়িতে মনে হচ্ছে ডিসিপ্লিনটা একেবারে গেছে। এনি ওয়ে আমি সকালের ফ্লাইটেই আসছি। তুমি ডক্টর শেখরকে খবর দাও। আমি না পৌঁছোনো পর্যন্ত তোমরা সকলে বাড়িতে থেকো।

প্রীতম সান্যাল ঘড়িতে সময়টা দেখলেন তিনটে সতেরো। গল্‌ফ কিটটার একপাশের চেনটা এক টানে সশব্দে খুলে ভেতর থেকে বার করে আনলেন আর একটা মোবাইল। মোবাইলটা অন করে ফোন করলেন উইংসফ্‌ট-এর ট্র্যাভেল ম্যানেজারকে। বললেন,

আজ সকাল ন'টার আশেপাশে বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা যাওয়ার ফ্লাইটের একটা টিকিট যেন তক্ষুনি ইন্টারনেটে কেটে নেয়। টিকিটটা নিয়ে একজন ড্রাইভার যেন বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করে। প্রীতম কলকাতা চলে যাবেন আর ড্রাইভার ওঁর গাড়িটা নিয়ে বাড়িতে রেখে দেবে।

ভোরের দিকে গেস্টদের আর কোনও বায়না থাকে না। তারপর এখন আবার মাঝ সপ্তাহ। এই রিসর্টে উইক এন্ডেই যা ভিড় হয়, বাকি সময়টা তো ফাঁকাই। নিশ্চিন্ত হয়ে গলায় টাইয়ের নট আলগা করে রিসেপশনের ডেস্কে মাথা দিয়ে ঝিমোচ্ছিল সদ্য চাকরি পাওয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রীকান্ত। ডেস্কের ওপর টকটক একটা আওয়াজ শুনে ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখল সামনে তিন নম্বর কটেজের ন্যাড়া মাথা লোকটা দাঁড়িয়ে। শ্রীকান্ত টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে বলল, গুড মর্নিং স্যার।

মর্নিং, আমি এখনই চেক আউট করব। আমার বিলটা প্লিজ।

'এখন!' কথাটা মুখে চলে এসেছিল। কোনওরকমে বিস্ময়টা গিলে ফেলে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, রাইট স্যার, আমাকে শুধু দুটো মিনিট সময় দিন।

প্রীতম সান্যাল মাথাটা অল্প নাড়ালেন। বাচ্চা ছেলে। একদম নিয়ম মেনে কাজ করবে। ওকে তো একটু সময় দিতেই হবে। ঘরে লোক পাঠাবে। তারা ঘরে টিভির রিমোট থেকে বাথরুমে তোয়ালে গুনতি করবে। ফ্রিজ খুলে দেখবে ক'টা বিয়ারের বোতল খরচ হয়েছে। যেটা দু'মিনিট বলছে সেটা আধঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়াবে। যদিও এখান থেকে বেঙ্গালুরু মাত্র দেড়শো কিলোমিটার, তবু ন'টার ফ্লাইটটা ধরতে গেলে সময় নষ্ট করা যাবে না। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে শ্রীকান্তকে বললেন, আমার খুব তাড়া আছে। আমাকে এখনই রওনা হতে হবে।

রাইট স্যার।

হাত দুটো পিছনে করে প্রীতম সান্যাল পায়চারি করতে আরম্ভ করলেন। শ্রীকান্ত হাউসকিপিং-এ ফোন করে প্রীতম সান্যালের কটেজে লোক পাঠিয়ে রিসেপশনের পিছনে একটা ছোট অফিসে বিল তৈরি করতে বসল। তবে কোথাও একটা শ্রীকান্তর মনে খচখচ করছে। লোকটা কেন এত অস্থির হয়ে পায়চারি করছে, তাড়াহুড়ো করছে? এমনকী গল্‌ফ কিটের ঢাউস ব্যাগটা পর্যন্ত নিজে বয়ে নিয়ে এসেছে। একটু চিন্তা করে রিসর্টের জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করল শ্রীকান্ত।

গুড মর্নিং স্যার, সরি এই সময় আপনাকে বিরক্ত করছি। সি-থ্রি এখনই চেক আউট করতে চাইছে। বিল সেট্‌ল করে দিই?

রিসর্টের জেনারেল ম্যানেজার প্রাজ্ঞ লোক। সাত রিসর্টের জল খাওয়ার অভিজ্ঞতা। প্রীতম সান্যাল! নামটা উচ্চারণ করে চুপ করে কিছু ভাবতে থাকলেন। বড় ধরনের কিছু গন্ডগোল না হলে, ভোর হওয়ার আগে এই সময় কেউ তাড়াহুড়ো করে চেক আউট করে যায় না। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, ওর সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল না? মেয়েটাও চেক আউট করেছে তো?

শ্রীকান্ত নিশ্চিন্ত হল। তার খচখচানির কারণটা নিজেই ধরতে পারছিল না। তবে একটা সলিড পয়েন্ট আছে। একটু ঝুঁকে বাইরেটা দেখে বলল, মেয়েটাকে তো দেখছি না স্যার। কটেজের ক্লিয়ারেন্সও হয়ে গেছে।

হুম। প্রীতম সান্যাল ইজ আ ভেরি বিগ শট। অনেক কর্পোরেট বিজনেস আসতে পারে উইংসফট থেকে। কিন্তু মনে রেখো, আমরা এখনও ফার্স্ট অ্যানিভারসারি পার করিনি। উই কান্ট টেক এনি রিস্ক। কোনও ঝামেলা যেন প্রীতম সান্যাল ফেলে না যায়। মেয়েটাকে লোকেট করো। যতক্ষণ মেয়েটাকে না খুঁজে পাও, প্রীতম সান্যালকে কায়দা করে ডিটেন করে রাখো। দরকার হলে আমাকে আবার ফোন কোরো। বাট মেক শিয়োর, প্রীতম সান্যালের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও যেন রিসর্টের বাইরে চলে যায়, সাউন্ড অ্যান্ড হেলদি।

লাইনটা কেটে দিয়ে শ্রীকান্ত মাথা চুলকোতে থাকল। এত রাতে এক দিকে প্রীতম সান্যালকে বুঝতে না দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে, আর এক দিকে এই এত বড় একটা রিসর্টে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে। মাথায় কিছু আসছে না। অফিসের বাইরে বেরিয়েই প্রীতম সান্যালের মুখোমুখি হয়ে আর একবার তাগাদা খেল। ক্ষমাটমা চেয়ে আরও পাঁচটা মিনিট সময় চেয়ে নিল শ্রীকান্ত।

গেট। প্রথমেই গেটের কথা মাথায় এল শ্রীকান্তর। দৌড়োতে দৌড়োতে গেটের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সিকিয়োরিটিকে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা বেরিয়ে গেছে কিনা। সিকিয়োরিটি গার্ড দু'জনেই জানাল, রাত সাড়ে এগারোটায় তালা পড়ে গেছে, তারপর একবারও গেটটা খোলা হয়নি। শ্রীকান্ত রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বলল, দু'জনেই মেয়েটাকে খুঁজতে আরম্ভ করো, কুইক।

মাটি ঘেঁষা ছোট ছোট আলোতে নিঝুম বিশাল রিসর্টটা। এক-একটা কটেজকে এখন প্রেতপুরী মনে হচ্ছে শ্রীকান্তর। এত বড় একটা রিসর্ট। তার মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কটেজগুলো। শ্রীকান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে লাগল একটার পর একটা জায়গায়। এভাবেই একসময় সুইমিং পুলের একটু দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। সুইমিং পুলটার একধারে বেবিপুল। তার পাশে কয়েকটা সার দেওয়া ডেক চেয়ার। তার একটাতে গোলাপি জামা আর সাদা প্যান্ট পরে শুয়ে আছে মেয়েটা। শ্রীকান্ত পা টিপে কাছে এল। মেয়েটার চোখটা বোজা। শিশিরে ভিজে স্যাঁতসেঁতে মুখটা। শ্রীকান্ত আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে নরম করে ডাকল, ম্যাম।

মেয়েটা চোখ খুলে তাকাল। একটা ঘোর লাগিয়ে দেওয়া দৃষ্টি। নিজের শরীর বিহঙ্গে একটুও অস্বস্তি নেই।

আমাকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার একটা বাস ধরিয়ে দেবে?

শ্রীকান্ত একটু থতমত খেয়ে বলল, ম্যাম, মিস্টার সানিয়াল রিসেপশনে অপেক্ষা করছেন। এখনই চেক আউট করবেন।

মেয়েটার ভুরু দুটো একটু কুঁচকোল। শ্রীকান্ত আবার নিশ্চিন্ত করল, ইয়েস ম্যাম, মিস্টার সানিয়াল এখনই চেক আউট করে বেরিয়ে পড়তে চান।

মেয়েটার মুখে একটা ছোট হাসির ঝিলিক ফুটল। তারপর উঠে দাঁড়ানোর সাহায্য চাইতে নিজের হাতটা এগিয়ে দিল শ্রীকান্তর দিকে।

অবশেষে প্রীতম সান্যাল চেক আউট করতে পারলেন। আকাশ ততক্ষণে ফিকে হতে শুরু করেছে। শ্রীকান্ত যখন মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, প্রীতম সান্যাল এক ঝলকেই বুঝে গেলেন রিসর্টওয়ালাদের অভিপ্রায়। ওদের সামনে আর কোনও সিন ক্রিয়েট করলেন না। শুধু মেয়েটাকে আর নিজের পাশে বসাননি। ঠাঁই দিয়েছেন পিছনের সিটে, গল্‌ফ কিটের পাশে। মেয়েটার মুখে তখন থেকেই একটা জিতে যাওয়া অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যের হাসি। প্রীতম সান্যালের রাগের প্রতিক্রিয়া পড়ছিল গাড়ির এক্সিলারেটরের ওপর। উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছিল গাড়িটার গতি।

রিসর্টটা থেকে মহীশূর পৌঁছোতে কুড়ি মিনিটও লাগল না। মহীশূর পৌঁছে এত ভোরে রাস্তায় প্রথম যে-লোকটাকে পেলেন, গাড়ি থামিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাস স্ট্যান্ডটা কোথায়? পথনির্দেশটা জেনে নিয়ে আবার ঝড় তুললেন গাড়িতে।

আকাশ লাল। আলো ফুটছে একটু একটু করে। আর তাতে যেন কীরকম একটা সম্মোহন ভর করছে প্রীতম সান্যালকে। চারদিকে বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছে শুধু থোকা থোকা লাল ফুল। রাস্তার দু'পাশে এরকম সার দেওয়া বড় বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ আর কোনও শহরে দেখেননি। আকাশ থেকে যেন মুঠো মুঠো আগুন ঝরে পড়ছে।

ওয়াও... গুলমোহর।

পিছন থেকে অস্ফুট আওয়াজটা এল। লুকিং গ্লাস দিয়ে পিছনে মেয়েটাকে দেখলেন। সেই তাচ্ছিল্যের হাসিটা আর নেই। অবাক একটা মুখ করে চারদিকের কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো দেখছে। আয়নায় প্রথম সূর্যের লাল রঙের আলোয় কৃষ্ণচূড়ার রাজত্বে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মেয়েটার মুখ। মেয়েটাকে যেন ঘিরে ধরেছে লাল আগুনের শিখা। সেই আগুনের বলয়ে এ যেন সেই মেয়েটা নয়, কাল রাত থেকে যাকে ছুড়ে ফেলতে চাইছেন। গাড়ি চালাতে চালাতে চোখটা বারবার আঠার মতো আটকে যেতে থাকল আয়নায়। এই মেয়েটাকেই তো চেয়েছিলেন, যাকে পাশে নিয়ে কাবেরীর বুকে নৌকায় বসে শুনবেন বিদেশি পাখিদের গান। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে থাকলেন ক্রমশ। আর তাতেই ঘটে গেল বিপদটা। প্রীতম সান্যালের গাড়িটা সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারল একটা কৃষ্ণচূড়ার গুঁড়িতে।

মুহূর্তের মধ্যে স্টিয়ারিং-এর মধ্যে থেকে এয়ার ব্যাগটা বেরিয়ে এসে বেলুনের মতো ফুলে গিয়ে প্রীতম সান্যালের পাঁজরগুলো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার থেকে বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু অসম্ভব একটা চোট পেলেন হাঁটুতে। অসহ্য যন্ত্রণা। তার মধ্যেই শুনতে পেলেন পিছনের দরজাটা 'খুট' করে খোলার আওয়াজ হল। স্থবিরের মতো বেলুন বুকে চেপে চুরচুর হয়ে যাওয়া সামনের কাচ দিয়ে দেখলেন, একটুও চোট না পেয়ে মেয়েটা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একবারও ফিরে তাকাল না প্রীতম সান্যালের দিকে। কোনওরকমে এয়ার ব্যাগের নাইট্রোজেনটা রিলিজ করে দুটো বড় শ্বাস নিলেন। তারপরে নিজের দিকের দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। খুলল না। খানিকটা

তুবড়ে আটকে গেছে দরজাটা। সাহায্যের জন্য ডাকতে হবে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করলেন। ফোনটা উঠিয়ে নিয়ে এলেন চোখের সামনে। স্ক্রিনের ওয়াল পেপারে একটা সাদা-কালো পুরনো ছবি। এক বয়স্কা মহিলা আর তার সামনে একজন কিশোরী। মহিলা দু'হাত বেড় দিয়ে সামনে ধরে রেখেছেন কিশোরীকে। পিছনে অস্পষ্ট একটা পাহাড়। মোবাইলের স্ক্রিনে ঠোঁট ছোঁয়ালেন প্রীতম সান্যাল। তারপর বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, মাম্মি, আই অ্যাম অল রাইট। শুধু পা-টাতে ভীষণ... প্লিজ হেল্প মি মাম্মি... আমি আর পারছি না মাম্মি... ভীষণ ইচ্ছে করে একটা শান্তির ঘুম ঘুমোতে। তুমি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সেই গানটা গাইবে। আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল নাকে। প্রীতম সান্যাল যন্ত্রণা সামলে পাশ ফিরে দেখলেন, হালকা নীল ট্র্যাক সুট পরা ছিপছিপে একটা মেয়ে জানলা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে।

মাই গড! আপনার তো...

কষ্ট করে মুখে একটা হাসি ফোটালেন প্রীতম সান্যাল।

একটু চেষ্টা করে দেখবেন প্লিজ বাইরের থেকে দরজাটা খোলা যায় কিনা।

শিয়োর।

মেয়েটা একটুও আর সময় নষ্ট না করে গাড়ির দরজার হাতলটা ধরে টানতে থাকল। এবং একসময় খুলে ফেলল দরজাটা।

সাবধানে বাইরে আসুন।

প্রীতম সান্যাল নিজেকে অনেক কষ্ট করে বাইরে এনে মাটিতে পা ফেলে বুঝলেন, পারবেন না। মেয়েটাকে বললেন, থ্যাঙ্কস আ লট। এবার ম্যানেজ করে নিতে পারব।

মেয়েটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনার গায়ে ভরতি কাচের গুঁড়ো। পায়েও ভাল চোট পেয়েছেন। ইমিডিয়েট হসপিটালে যাওয়া উচিত। আপনার ফোনটা দিন, আমি ব্যবস্থা করছি।

প্রীতম সান্যাল মুগ্ধ চোখে মেয়েটাকে দেখতে দেখতে বললেন, থ্যাঙ্কস এগেন। ইউ আর সো কেয়ারিং। আমি একদম ঠিক আছি। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি আমার অফিসে ফোন করছি। ওরা এখনই যা ব্যবস্থা করার করে দেবে। ইন ফ্যাক্ট, আমাকে ন'টার মধ্যে বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে হবে। সরি, আপনার ভোরবেলার জগিংটা নষ্ট করছি।

নেভার মাইন্ড স্যার। ইউ আর উন্ডেড।

তারপর মেয়েটা একটু চিন্তা করে বলল, কিন্তু এরকম ইনজিয়োর্ড হয়ে রাস্তায় বসে থাকবেন কেন? একদম কাছেই আমাদের বাড়ি। ওখানে চলুন।

প্রীতম সান্যাল এবার কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেললেন, আই রেসপেক্ট ইয়োর ফিলিংস। ঠিক আছে চলুন। সকালের কফিটা তো পাওয়া যাবে। বাই দ্য ওয়ে, আই অ্যাম প্রীতম সান্যাল।
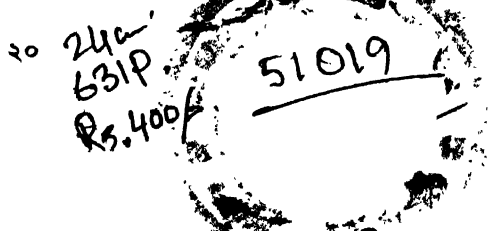
আমি দর্শনা। দর্শনা রঙ্গনাথন।

দর্শনা প্রীতম সান্যালের যন্ত্রণার থেকে মনটা ঘোরাতে বলল, আপনি সত্যি অদ্ভুত মানুষ। অ্যাক্সিডেন্ট করে চোট পেয়ে বসে বসে গান করছিলেন।

গান? হো হো করে হেসে উঠলেন প্রীতম সান্যাল, দ্যাট ওয়াজ লালাবাই। বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানো গান। আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য মাই মাম্মি ইউজড টু সিং। অনেক বড় পর্যন্ত আমি মাম্মির এই গান না শুনলে ঘুমোতে পারতাম না। অ্যান্ড আই হ্যাড অ্যানাদার হ্যাবিট। এই গানটা শুনতে শুনতে আই ইউজড টু পুট মাই থাম্ব ইনসাইড মাই মাউথ। মাম্মি বকত। বলত, বিট্টুসোনা মুখের থেকে হাত বার করো... বিট্টু মুখের থেকে হাত না বার করলে এবার কিন্তু আমি ভীষণ রেগে যাব... বিট্টু...

দর্শনা হেসে বলল, আপনি এখনও সেরকমই বাচ্চাই রয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। মাম্মিজ বিট্টু। এনি ওয়ে, চলুন।

লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলঝরা রাস্তায়, পা-টা টেনে টেনে দর্শনার সঙ্গে এগোতে থাকলেন প্রীতম সান্যাল।

২

আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

অন্ধকার ঘরে খুব চাপা স্বরে বিট্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছিল শিপ্রা। ছেলেটার হাতের বুড়ো আঙুল মুখের মধ্যে ঢুকে গেছে। এটা ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বলক্ষণ। ছেলেটার বয়স ছয় ছাড়িয়ে গেছে, তবু মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারেনি। আলতো হাতে ছেলের কাঁধের কাছে চাপড় মারতে মারতে সুরটাকে গলায় ধরে রেখে ক্রমশ ঘুমপাড়ানি শব্দগুলো উহ্যে তুলে নিচ্ছিল শিপ্রা। এখন গলায় শুধু গুনগুনানিটুকু রয়েছে। আজ রাতটা টানটান উত্তেজনার। ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজের ঘুমিয়ে পড়ার কথা নয়। তবু গুনগুন করতে করতে শিপ্রার নিজেরই চোখের পাতাটা ভারী হয়ে আসছিল।

ভারী চোখের তন্দ্রাটা হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেল। খোলা জানলাটার ঠিক বাইরে একটা ঝটপটানির আওয়াজ। চটকাটা ভেঙে যেতে অবশ্য আওয়াজটা আর দ্বিতীয়বার শুনতে পেল না শিপ্রা। তবু কান খাড়া করে সজাগ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপরে ঝুঁকে একবার বিট্টুর মুখটা দেখল। ছেলেটা একইরকমভাবে নিষ্পাপ মুখে আঙুল চুষে যাচ্ছে। বিট্টুর গায়ের ওপর কম্বলটা ঠিক করে দিয়ে সাবধানে মশারি তুলে খাট থেকে নেমে নিঃশব্দে জানলার কাছে এল শিপ্রা।

জানলাটার বাইরে মরা চাঁদের আলো হরির ঝিলে চিকচিক করছে। কুয়াশার স্তর ঘন হচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পরে জলের চিকচিকানিটা কুয়াশায় ঢেকে যাবে। আর এই নিঃস্তব্ধতার মধ্যে ঝিঁঝিপোকাগুলো একইরকমভাবে একটানা ডেকে যাচ্ছে। অবশ্য

খোলা জানলাটার নীচের দুটো পাল্লাই বন্ধ। ওপরের দুটো খোলা। এটা বাড়িটার পিছন দিক। একতলা ছোট ভাঙাচোরা বাড়িটার পিছনটা একচিলতে বাগান ছাড়িয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে হরির ঝিলের একধারে। এই দিকটায় তাই পায়ে হাঁটা কোনও রাস্তা নেই। কারও আসার সম্ভাবনা নেই এই দিকে। তবু সাবধান হল শিপ্রা। একেবারে জানলার শিকের সামনে এসে দাঁড়াল না। কোনাকুনি একপাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। এরকম সময় দ্বিতীয়বার আবার আওয়াজটা হল।

ঝট পট... ঝট পট... ঝট...পট...

চমকে উঠে জানলার পাশ থেকে দ্রুত সরে গেল শিপ্রা। ঘরের অন্য প্রান্তে ভেজানো দরজাটা অল্প ফাঁক করে চাপা গলায় ডাকল, মহেশদা...

রান্নাঘরে উনুনে চায়ের জল বসিয়েছিল মহেশ। শীতে তাপ নিতে উনুনের সামনে বসেছিল। কেটলিতে জলটা ফুটে এসেছে। কেটলির মুখ দিয়ে অল্প অল্প বাষ্প বেরোচ্ছে। তার আওয়াজেই শিপ্রার চাপা ডাকটা কানে পৌঁছোল না মহেশের। ডাকের উত্তর না পেয়ে শিপ্রা এবার পায়ে পায়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে আর একটু জোরে ডাকল, মহেশদা!

মহেশ উঠে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, ওরা এসে গেছে?

না।

তা হলে? বিট্টুবাবুর কাছে গিয়ে থাকো। চা ভিজিয়ে আসছি।

শিপ্রা আরও দু'পা মহেশের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, পিছনে জানলার কাছে একটা আওয়াজ পেলাম... দু'বার।

মহেশ এবার একটু সতর্ক হয়ে টানটান হয়ে জিজ্ঞেস করল, কীসের আওয়াজ?

বুঝতে পারলাম না। কীরকম ঝটপটানি আওয়াজ একটা।

মহেশ দু'মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। উনুনের ওপর থেকে কেটলিটা পাশে নামিয়ে রাখতেই তোলা উনুনের কয়লার গনগনে আগুনে ওর মুখের পেশিগুলো অসম্ভব শক্ত দেখাল। শিপ্রার দিকে একবার চেয়ে বলল, ঠিক আছে, তুমি ভেতরের ঘরে বিট্টুবাবুর কাছে যাও। আমি দেখছি।

খাটো করে পরা ধুতিটার কোঁচাটা শক্ত করে বেঁধে নিল মহেশ। তারপর সেখানে গুঁজে নিল একটা কাটারি। এই শীতে লোহার কাটারি বরফঠান্ডা হয়ে আছে। পেটের কাছে সেই ঠান্ডা স্পর্শ একটা অস্বস্তি দিচ্ছে। মাথামুড়ি দিয়ে একটা কম্বল জড়িয়ে নিজেকে কোমর পর্যন্ত ঢেকে নিল মহেশ। রান্নাঘরের একটা দরজা দিয়ে পিছনে যাওয়া যায়। দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে শিকল তুলে, হাতে দু'সেলের টর্চটা নিয়ে বাড়ির পিছনে চলে এল মহেশ।

একতলা এই বাড়িটায় মহেশ একাই থাকে। তবে বাড়িটার ইদানীং কোনও পরিচর্যা করেনি। পিছনটা ঝোপজঙ্গল হয়ে আছে। যখন ভেতরে ভেতরে ঠিক হয়েছিল শিপ্রা আর বিট্টু এসে এখানে দিনকয়েক থাকবে, একবার ভেবেছিল বাড়ি ঘিরে ঝোপজঙ্গলগুলো একটু সাফসুতরো করে নেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্তটা থেকে পিছিয়ে এসেছিল।

যদিও ধারেকাছে আর কোনও বাড়ি নেই, তবু বলা যায় না, সাজানো-গোছানো চেহারাটা আবার কার কখন চোখে পড়ে যায়! সাবধানের মার নেই।

বাড়ির পিছনে এসে অন্ধকারে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মহেশ। সামনে হরির ঝিল। ঝিলের ওপারে হরিতলা কটন মিলের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা এখনও গিলে ফেলেনি আলোগুলোকে। সেই আলো-আঁধারিতেই মিলের পাঁচিলের একপাশে ভুতুড়ে বাড়ির মতো দেখা যাচ্ছে ম্যাকার্থি সাহেবের বাংলো। বাংলোটা যতবার দেখে বুকের ভেতর একটা চাপা কষ্ট হয় মহেশের। এত বড় সম্পত্তির মালকিন হয়েও শিপ্রাকে কিনা থাকতে হচ্ছে আরশোলা, ইঁদুর আর টিকটিকিতে বোঝাই ভাঙাচোরা, জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়া এই স্যাঁতসেঁতে বাড়িটাতে। মুখটা হরিতলা কটন মিলের দিকে ঘুরিয়ে নিল মহেশ। মিলে এখন ইভিনিং শিফটের কাজ চলছে। শিপ্রা যে-ঝটপটানি আওয়াজটা শুনেছে, বলা যায় না মালিকপক্ষের কোনও চর গোপনে জায়গাটা দেখতে এসেছে কিনা। তারপর যদি গিয়ে একবার গোপন আস্তানার খবর দিয়ে দেয়... সব শেষ।

কোমরে গোঁজা কাটারির হাতলটা আর একবার শক্ত মুঠিতে পরখ করে নিল মহেশ। স্নায়ু টানটান করে কান খাড়া করে অন্ধকারে অপেক্ষা করতে থাকল। কারও নড়াচড়ার শব্দ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। লাশটা তলিয়ে দেবে হরির ঝিলে। জ্যান্ত মানুষের লাশ ফেলে দেওয়ার কাজটা হয়তো অনেকদিন পরে আবার করতে হবে। তবে তার জন্য বুকের মধ্যে কোনও ধুকপুকুনি নেই। অনেককাল আগে এই কাজ বেশ কয়েকবার করতে হয়েছে। আজ না হয় আর একবার করবে মার্থা মেমসাহেবকে দেওয়া কথাটা রাখার জন্য। প্রাণ থাকতে শিপ্রা আর বিট্টুর কোনও ক্ষতি হতে দেবে না।

বেশ কিছুক্ষণ একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরও ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না মহেশ। অন্ধকার হাতড়ে পায়ের কাছ থেকে একটা নুড়ি হরির ঝিলের দিকে জোরে ছুড়ল। নুড়িটা জলে পড়ে একটা আওয়াজ হল। প্রতিপক্ষ যদি আশেপাশে ঘাপটি মেরে থাকে, এই আচমকা আওয়াজে একটু নড়াচড়ার আওয়াজ করে উঠবেই। কিন্তু কোনওরকম প্রত্যাশিত আওয়াজ শুনতে পেল না মহেশ। শুধু জলে নুড়ির আওয়াজটা শুনে ঘরের ভেতর জানলার পিছন থেকে শিপ্রার আবার একটা চাপা গলার আওয়াজ পেল, মহেশদা!

মহেশ কোনও উত্তর দিল না। শুধু আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল, যাতে শিপ্রা জানলা দিয়ে মহেশকে দেখতে পায়। হাতে দু'সেলের টর্চটার বোতামটা টিপল মহেশ।

জানলার হাতখানেক দূরে একটা আমগাছ। গাছটা বিশেষ বড় নয়, তবে এই বাড়ির চৌহদ্দিতে এটাই সবচেয়ে বড় গাছ। গোড়ায় গুচ্ছের শুকনো পাতা পড়ে আছে। সেখানেই টর্চের আলোটা এক জায়গায় স্থির করে ফেলল মহেশ। শুকনো পাতার ওপর একটা পাখি মরে পড়ে আছে। যথাসম্ভব শুকনো পাতায় মচমচানি আওয়াজ না তুলে পাখিটার কাছে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল মহেশ।

মাটি থেকে পাখিটা তুলে এক হাতের তালুতে মরা পাখিটা রেখে মহেশ অনুভব

করল পাখিটার গা-টা একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে তবে মরে গিয়ে এখনও শক্ত হয়ে যায়নি। তার মানে বেশিক্ষণ আগে মরেনি পাখিটা।

অদ্ভুত সুন্দর দেখতে পাখিটা চড়াইয়ের চেয়ে সাইজে একটু বড়। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। তার মধ্যে পেটে তুঁতেরঙের এক পোঁচ। মাথায় কমলা রঙের একটা ঝুঁটি। একই রঙের আভা লেজের শেষ প্রান্তে।

শিপ্রার শুনতে পাওয়া ঝটপটানি আওয়াজের উৎস এবার বুঝতে পারল মহেশ। পাখিটা আমগাছে ছিল। বিষাক্ত কিছুর কামড়ে মরে গেছে। শুকনো পাতার ওপর শেষ প্রতিরোধে ডানা ঝাপটিয়ে আওয়াজটা তুলেছে। শীতকালে সাপেরা ঘুমোয়। তাই পাখিটা সাপের ছোবল খায়নি বলে মনে হয়। তবে আমগাছটায় বিষাক্ত বিছে দেখেছে মহেশ।

পাখিটা দেখতে দেখতে জানলার নীচে চলে এল মহেশ। মুখ তুলে চেয়ে দেখল শিপ্রা এবার জানলার শিক ধরে ঝুঁকে মহেশের তালুতে মরা পাখিটা দেখছে।

সেই ছোটবেলা থেকে শিপ্রাকে দেখে আসছে মহেশ। বড্ড নরম মেয়েটার মন। একটা সামান্য মরা পাখি দেখে যার চোখ এরকম জলে ভরে ওঠে, সে আজকের রাতের এত বড় সিদ্ধান্তটা নেবে কী করে ভেবে আর একবার আশ্চর্য হল মহেশ। আজ রাতের গোটা পরিকল্পনাটা যবে থেকে ছকা হচ্ছে, এই প্রশ্নটা বারবার তাড়িয়ে বেরিয়েছে মহেশকে।

পাখিটার মুখে একটু জলটল দাও না, দেখো যদি বেঁচে যায়।

মহেশ মরা পাখিটাকে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। শিপ্রার কথায় সামলে নিল। টর্চের আলোটা পাখির গায়ের ওপর থেকে নিভিয়ে দিল। শিপ্রার চোখের সামনে মরা পাখিটা ছুড়ে ফেলতে পারা যাবে না।

এটা কী পাখি গো মহেশদা, জানো?

দু'দিকে মাথা নাড়ল মহেশ। হরির ঝিলে শীতকালে দূর দূর দেশ থেকে কত বাহারি পরিযায়ী পাখি আসে। সেই মার্থা মেমসাহেবের সময় থেকেই হরির ঝিলে কত পাখি দেখেছে মহেশ। তবে সে নিজে কাক, চড়ুই, শালিক, টিয়ার ওপর খুব বেশি হলে দোয়েল, কোয়েল, মাছরাঙা পাখি চেনে। শিপ্রা মাঝে মাঝে বিচিত্র সব পাখির নাম বলে। এসব পাখির নাম মহেশ কখনও শোনেইনি, চেনা তো দূর অস্ত্।

আমি দু'বার ঝটপটানির আওয়াজ শুনেছিলাম মহেশদা, দেখো না আরও হয়তো একটা পাখি আছে। ওটাকে হয়তো বাঁচানো যাবে।

শিপ্রার কথা শেষ হল না। হরির ঝিলের ওপারে কটন মিলের একটা ভোঁতা সাইরেন বেজে উঠল। নিঝুম শীতকালে আওয়াজটা তীব্র। মহেশ কুয়াশা মোড়া কটন মিলের আবছা আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, রাতের শিফটের ভোঁ পড়ল। ন'টা বাজল। তুমি খেয়ে নেবে?

খেয়ে? এখন? তুমি চায়ের পাতা ভিজতে দিয়েছিলে না?

ও চা আর খাওয়া যাবে না। এতক্ষণে তেতো হয়ে গেছে। ওরা আসার আগে খেয়ে নাও।

নাঃ, এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। পলাশের তো আজ ইভিনিং শিফট ছিল, এখনই চলে আসবে।

এখনই আসতে পারবে না। সবার চোখ বাঁচিয়ে আসতে হবে। আধঘণ্টা তো লাগবেই। তারপর আবার ওদের নিয়ে আসতে হবে।

তুমি ভেতরে চলে এসো মহেশদা, ঠান্ডায় দাঁড়িয়ো না। হিম পড়ছে।

মহেশ নিশ্চিন্ত হল। হরিতলা কটন মিলের রাত্রি ন'টার সাইরেন আর একটা পাখির খোঁজের জন্য শিপ্রার চিন্তাসূত্রটা ছিঁড়ে দিয়েছে। অথচ এখনই সব থেকে সাবধানে থাকার সময়। মহেশ হরিতলা কটন মিলে ক্যান্টিন চালায়। মাস মাইনের চাকরি হলেও অন্যদের মতো আট ঘণ্টা থাকতে হয় না। দুপুরের খাওয়াটা সারিয়ে দিতে পারলেই ছুটি। লোকে খেতে বসে দুনিয়ার গল্প করে। এই ক'দিনের মতো আজও খাওয়ার সময় ক্যান্টিনে কান পেতে ছিল মহেশ। যদি কানাঘুষোয় কিছু শোনা যায়। হরিতলা কটন মিলের মালিক, দয়াল সান্যালের বউ-ছেলে দু'দিন ধরে নিখোঁজ। খবরটা দয়াল সান্যালের কলকাতার বাড়ি থেকে ঢেউয়ের মতো এখানে আছড়ে পড়ার কথা। অথচ এই নিয়ে একটা শব্দও শুনতে পায়নি মহেশ। হয় সান্যাল বাড়িতেই এখনও খবরটা চেপে রাখা হয়েছে, না হয় মালিকবাড়ির খবর জেনে থাকলেও কেউ সাহস করে এখন আলোচনা করছে না। তবে দয়াল সান্যাল এই দু'দিন মিলে আসেনি। পলাশ এলে অবশ্য জানা যাবে এই শিফটে কোনও খবর এসেছে কিনা। চারদিকটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে বাড়ির মধ্যে আবার ঢুকে এল মহেশ।

ভাঙাচোরা বাড়িটায় একটা শোওয়ার ঘর, একটা রান্নাঘর ছাড়া আধফালি আর একটু জায়গা আছে। শোওয়ার ঘরটা শিপ্রাকে ছেড়ে দিয়ে এই আধফালি জায়গাতেই এই দু'দিন শুচ্ছে মহেশ। আজ সন্ধেবেলা জায়গাটাকে আর একটু পরিষ্কার করে নিয়েছে সে। ওরা এলে এখানেই বসে আলোচনা হবে। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে সলতেটা কমিয়ে লণ্ঠনটা ওখানেই রাখল মহেশ। তারপর নিজের ছেঁড়া শতরঞ্চিটা ওখানে বিছিয়ে দিল।

মাঝে মাঝে খুব চিন্তা হচ্ছে মহেশদা। এরপর কী হবে? এভাবে তো আর চলতে পারে না। এরকমভাবে আর ক'দিন?

তুমি এত ভাবছ কেন? সবই তো তোমার। দয়াল সান্যালের আর আছেটা কী? দেশের আইন তো তোমার সঙ্গে আছে।

মহেশের কথা শুনে শিপ্রা ফুঁপিয়ে উঠল, আমার আর কিছু নেই মহেশদা। আস্তে আস্তে সব ও নিজের করে নিয়েছে। আইন যদি বলো সবই ওর সঙ্গে। কিন্তু যেটা কারওই নয় সেইটা বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করতেই এসেছি মহেশদা। তুমি তো জানো, আমার মায়ের সারা জীবনের এই একটাই স্বপ্ন ছিল। মায়ের সেই স্বপ্নটা আর... আর আমার ছেলেটা...

দরজার বাইরে একটা টুং করে সাইকেলের বেলের আওয়াজ হল। কিছুক্ষণ পরে আর একবার, মহেশ শিপ্রা, দু'জনেরই আবার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল।

তুমি ঘরের ভেতর বিট্টুবাবুর কাছে যাও। দরজাটা ভেজিয়ে রাখো। আমি দেখছি।

শিপ্রা ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে মহেশ সদরের দরজাটার কাছে এল। দরজায় কয়েকটা ফুটোফাটা আছে। তারই একটাতে চোখ লাগিয়ে চাঁদের আলোর ছায়া ছায়া অন্ধকারে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে পলাশ। দরজাটা খুলে সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে এল মহেশ।

পলাশ সাইকেলটা স্ট্যান্ডে রাখতে যাচ্ছিল। বাধা দিল মহেশ। বলল, ঘুরে বাড়ির পিছনে গিয়ে মাটিতে সাইকেলটা শুইয়ে রেখে আসতে, যাতে বাইরের থেকে কেউ বুঝতে না পারে সাইকেল করে এ-বাড়িতে কেউ এসেছে। পলাশ যতক্ষণে সেইমতো সাইকেলটা রেখে এল, দরজায় পাহারা দিল মহেশ। পলাশ ফিরে আসতে জিজ্ঞেস করল, বাকিরা?

চলে আসবে। পুলিশের নজর আছে ওদের ওপর। ঘুরপথে আর একটু রাত্তির করে আসবে।

যাও, ভেতরে যাও।

সদর দরজার পাল্লাটা অল্প ফাঁক করে ভেতরটা দেখাল মহেশ। সে ইচ্ছে করে ভেতরে গেল না। পলাশের সঙ্গে শিপ্রার সম্পর্কটা শিপ্রার বিয়ের অনেক আগে থেকেই জানে। কেন পলাশ শিপ্রাকে একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাও জানে। পলাশকে কোনওদিনই ভাল চোখে দেখেনি মহেশ। তবু শিপ্রার পলাশের জন্য দুর্বলতাটা মেনে নিয়েছে। এখন মনে হয় বিবাহিত জীবনে দয়াল সান্যালের সঙ্গে যে-দুঃসময়টা শিপ্রা কাটাচ্ছে, সেটা ছেড়ে যদি পলাশের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক গড়ে ভাল থাকে, তাই থাকুক। ওদের দু'জনের একটু একান্ত সময় থাক। এগারো বছর বয়স থেকে মহেশ জীবনের অনেক কিছু জানে, বোঝে। তার সঙ্গে জীবনে একটা সার শিক্ষাও নিয়েছে, সব জানা-বোঝা প্রকাশ করতে নেই। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে হিম ঝরানো খোলা আকাশের নীচে বসে মহেশ একটা বিড়ি ধরাল।

ভেতরে ঢুকে পলাশ দেখল একটা শতরঞ্চি বিছানো আর এক কোনায় মৃদু হারিকেন জ্বলছে। শিপ্রা কোথাও নেই। একপাশে দরজা বন্ধ একটা ঘর। পাল্লা ভেজানো দরজাটা এসে অল্প ঠেলতেই দেখল খাটের এক কোনায় বসে শিপ্রা অকাতরে ঘুমোনো ছেলের কপালে-চুলে নরম করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। দু'হাত দূরে তার স্বপ্নের নারী। একটা সময়ে যাকে পাগলের মতো পেতে চেয়েছিল। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে।

পলাশ খাটের কাছে আরও কয়েক পা এগিয়ে আসতেই শিপ্রা ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে সাবধান করে দিল কোনও কথা না বলার জন্য। ছেলের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

দরজার পাল্লা দুটো মেলে খুলে দিয়ে বাইরে শতরঞ্চির ওপর এসে বসল পলাশ। একটু পরেই শিপ্রাও এসে ওর পাশে বসল। শিপ্রার পাশে এসে বসার উষ্ণতাটা আজও একইরকম লাগল পলাশের।

কেমন আছিস পলাশ?

দু'দিকে মাথাটা দুলিয়ে একটা তির্যক হেসে পলাশ বলল, তোকে কী বলে ডাকব? শিপ্রা, শ্যারন, না ম্যাডাম? যাক গে, তবে তোর প্রশ্নটা ভাল। মালকিন এক সামান্য বেতনভুক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করছে, কেমন আছিস? তোরা লেবার ক্লাসের লোকদের এসব জিজ্ঞেস করিস নাকি, কেমন আছিস টাছিস। আমার খাকি রঙের জামাটা খেয়াল করেছিস তো? আজ আমি তোদের মিলের একটা সাধারণ লেবার কিন্তু।

শিপ্রা চুপ করে রইল। পলাশ অভিমান দেখাচ্ছে। আসল অভিমান যদি দেখানোর থাকে, তা হলে শিপ্রারই দেখানোর কথা। এত বছর পরে, পলাশের নতুন করে এভাবে খোঁজ পাওয়াটা কাকতালীয় না ভবিতব্য এটা বুঝে উঠতে পারে না শিপ্রা। দয়াল সান্যালের ড্রয়ারে অবহেলা অযত্নে পড়ে থাকা হরিতলা কটন মিলের কয়েকটা ছবির মধ্যে একদিন খাকি পোশাকে পলাশকে খুঁজে পেয়েছিল শিপ্রা। কটন মিলে মেশিন চালাচ্ছে। শিপ্রার কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল পলাশ তো জানত শিপ্রা দয়াল সান্যালের বউ। আর ওটা জানার পরেও হরিতলা কটন মিলের কাজটা ও চেষ্টা করে জুটিয়ে নিয়েছিল কেন?

ভাগ্যের কী পরিহাস! যে-পলাশ একদিন তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, ছ'বছরের ছেলের হাত ধরে শিপ্রাকে আজ আবার তারই শরণাপন্ন হতে হল। তবে মহেশ না থাকলে এটা হত না। বহু কষ্টে গোপনে মহেশের মাধ্যমে পলাশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিল। তাও মুখোমুখি নয়, ফোনে।

দু'জনের কেউই কথা শুরু করতে পারছিল না। দু'জনের মাঝখানে সময় গুমোট হয়ে আটকে আছে। শেষপর্যন্ত নিজের পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে শিপ্রা বলল, ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস। তোর তো আমেরিকায় যাওয়ার কথা ছিল। দয়াল সান্যালের মিলে কাজ করতে এলি কেন?

পৃথিবীটা তুই যেরকম সরলভাবে গোল ভাবিস, বাস্তবে সেটা নয় বলে। তুই যত সহজে খ্রিস্টান থেকে হিন্দু হয়ে গেলি, অত সহজে বিদেশে যাওয়া যায় না বলে।

তুই কীরকম পালটে গেছিস পলাশ। তুই বোধহয় জানিস না, দয়াল সান্যালকে আমি বিয়ে করতে রাজি হয়েছি তুই চলে যাওয়ার পরে। হিন্দু হওয়াটা সেই বিয়েটার একটা শর্ত ছিল।

আমি যেদিন বলেছিলাম সেদিন তুই হিন্দু হতে চাসনি, কারণ আমি বলেছিলাম বলে।

তুই নিজেকে কখনও প্রশ্ন করেছিস পলাশ, তুই আমাকে চেয়েছিলিস কিনা? আমার ব্যাকগ্রাউন্ড, আমার ধর্ম সুদ্ধু? সত্যি কথাটা খুব অপ্রিয়—তোর কোনও রোজগার ছিল না, তাই গোঁড়া মা-বাবাকে ভয় পেয়েছিলি। আরও ভয় পেয়েছিলি আমার মায়ের পরিচয়কে। দয়াল সান্যাল সেটা পায়নি।

তাই? তা হলে দয়াল সান্যালের ওপরই যখন ভর করেছিলি, এতদিন পরে দয়াল সান্যালের বিছানা ছেড়ে আমার কাছে ফিরে আসতে চাইছিস কেন? আবার আমাকে দরকার হল কেন?

চুপ করে গেল শিপ্রা। কথাটা চাবুকের মতো এসে বিঁধল। মাথাটা ঝুলে গেল শিপ্রার। একটু চুপ করে থেকে পলাশ বলল, সরি রে, আসলে লেবার ক্লাসের লোক হয়ে গেছি তো! আনকালচার্ড। মুখের বাঁধন আটকায় না, তাই... তবে এর জন্য মনের সত্যি কথাগুলোও না চেপে বেরিয়ে আসে। যেমন...

চুপ করে গেল পলাশ।

যেমন কী? এই তো তোর মুখে বাঁধন চলে এল।

তবুও চুপ করে থাকল পলাশ।

বল... যেমন কী?

আমার একটা বউ আছে, ফুটফুটে একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। আমার কোনও অভিযোগ নেই ওদের নিয়ে। তবু জানিস তো কোথায় যেন তোকে ভুলতে পারি না। একটা সত্যি কথা বলব? তোকে এতদিন পরে দেখে এখুনি জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছিল। তোর জন্য আমার ভালবাসাটা একটুও পালটায়নি। সেটা তুই যেভাবেই ব্যাখ্যা কর।

এবার শিপ্রা আছড়ে পড়ল পলাশের কাঁধে। নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ভুল করেছিলাম, তুই এবার আমাকে নিয়ে চল পলাশ। তোর জন্য আমার ভালবাসা আছে কিনা জানি না। তবে আজ তুই ছাড়া আমার ভরসা করার কেউ নেই।

শিপ্রার কাঁধে আস্তে আস্তে নিজের ঠোঁটটা চেপে ধরল পলাশ।

৩

অনেক দূরে পায়ে হাঁটা রাস্তায় তিনটে লোককে দেখতে পেল মহেশ। হেঁটে এদিকেই আসছে। এদিকে আর কোনও গন্তব্য নেই ওর বাড়ি ছাড়া। লোকগুলোকে এদিকে আসতে দেখে মনে শুধু একটাই প্রশ্ন, এরা নিজেদের লোক না প্রতিপক্ষ? নিজেকে আবার একটু আড়াল করে নিল মহেশ। ওদের সঙ্গে একটা সংকেত ঠিক করা আছে। পলাশ বলেছে। ওরা বাড়ির সামনে এসে দুটো দেশলাই কাঠি জ্বালাবে। পলাশের আগে ওরা চলে এলে এভাবেই পরিচয় পেত ওদের। তবে এখন যখন পলাশ চলেই এসেছে ওদের অভ্যর্থনা করার জন্য ওকেই ডেকে নেওয়া ভাল মনে করল মহেশ।

দরজায় যে-ফুটোটা দিয়ে বাইরে পলাশকে দেখেছিল এবার সেই ফুটোটা দিয়েই ঘরের ভেতর তাকাল মহেশ। মরা হারিকেনের আলোতে দেখল পলাশ আর শিপ্রা আলিঙ্গনবদ্ধ। ছোটবেলা থেকে দরজার ফুটো দিয়ে অনেক নারী-পুরুষের শরীরের খেলা দেখেছে মহেশ। তবে আজ একটা নিষ্পাপ আলিঙ্গন দেখে কেমন অস্বস্তি হল মহেশের। সময় কম। সংকোচ হলেও দরজায় টোকা মেরে ডাকতেই হল পলাশকে।

পলাশ বেরিয়ে এল। লোক তিনটেও কাছাকাছি এগিয়ে এসেছিল। কোনও দেশলাই

জ্বালানোর দরকার হল না। পলাশ সরাসরি চিনতে পারল লোকগুলোকে। চাপা গলায় বলল, আসুন কমরেডস।

পলাশ তিনজনকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মহেশ আগের মতোই সদর দরজার বাইরে পাহারা দিতে বসে রইল।

ভেতরে পাঁচজনের বসার পক্ষে জায়গাটা নিতান্তই অপরিসর। ওরা তিনজন একদিকে পাশাপাশি বসার পর উলটোদিকে পলাশ আর শিপ্রা চাপাচাপি করে বসল। লোকগুলো কোনও সময় নষ্ট না করে পলাশের দিকে তাকিয়ে বলল, কে শুরু করবেন, কমরেড আপনি না উনি? সময় খুব কম। একদম সরাসরি প্রসঙ্গে চলে আসুন।

একটু ইতস্তত করে শিপ্রা বলল, আমিই বলছি। আসলে যে-উদ্দেশ্যে আপনাদের সাহায্য চাইছি... মানে আপনারা যে-ঝিলটার পাশ দিয়ে এলেন, হরির ঝিল, আপনাদের মাধ্যমে একটা পরিবেশ আন্দোলন করে এই ঝিলটা বাঁচতে চাইছি।

লোকগুলো এ-ওর দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একজন বলল, মানে? ঠিক বুঝলাম না ম্যাডাম।

এই যে ঝিলটা দেখছেন, এই অঞ্চলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। গোটা অঞ্চলের একটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করছে ঝিলটা। তা ছাড়া এই ঝিলটার জন্য প্রচুর মাইগ্রেটরি বার্ড আসে এখানে। ব্যক্তিগত স্বার্থে এই ঝিলটা নষ্ট করে দিতে চাইছে দয়াল সান্যাল। আপনারা এটা বন্ধ করুন।

আর একটু খুলে বলুন।

আপনারা ঝিলের ওদিকে সুতোর কারখানাটা দেখলেন। ওই কারখানাটার পিছন দিকটায় প্রায় দু'-একর জমি নিয়ে একটা বাগানবাড়ি আছে। বাগানবাড়িটা শেষ হয়েছে ঝিলটার ঠিক সামনে। এই বাগানবাড়ির জমিটা আর ঝিলের খানিকটা বুজিয়ে কারখানাটাকে বাড়িয়ে নিতে চাইছেন আমার স্বামী দয়াল সান্যাল। ঝিলটা একবার বোজাতে আরম্ভ করলে ও কোথায় গিয়ে থামবে আমার জানা নেই। হয়তো একদিন এই ঝিলটার আর অস্তিত্বই থাকবে না। মাইগ্রেটরি বার্ডরা আর আসবে না।

জমিটার মালিক কে?

শিপ্রা মাথা নিচু করে অস্ফুটে বলল, আমি।

ঝিলটার মালিক কে?

আমি যতদূর জানি, কোনও এককালে এক দেশীয় মহারাজার সম্পত্তি ছিল এটা। এখন এর অনেক শরিক। দু'একর যে-জমিটার কথা বললাম, তার সামনের ঝিলের অংশের অংশীদারকে দয়াল সান্যাল খুঁজে বার করেছেন। এই জমি আর ঝিলটা নিয়ে কারখানাটা বাড়তে আরম্ভ করলে পরিবেশের সাংঘাতিক ক্ষতি...

লোকটা হাত তুলে শিপ্রাকে থামিয়ে বলল, এটার জন্য আপনি আমাদের সঙ্গে বসলেন কেন বলুন তো? আপনি তো কোর্টে গিয়ে পাবলিক ইন্টারেস্টে মামলা করতে পারতেন।

দুটোর কোনওটা দিয়েই দয়াল সান্যালকে থামানো যাবে না। ওর একটা মাস্টারমাইন্ড আছে। থামাতে পারলে, পারবেন একমাত্র আপনারাই।

হঠাৎ আপনার কেন মনে হল যে পারলে আমরাই পারব?

শিপ্রা একটু চুপ করে.বলল, কারণ, দয়াল সান্যাল একমাত্র আপনাদেরই ভয় পায়।

আর আপনার ইন্টারেস্ট?

মানে?

মানে আপনি কোন স্বার্থ থেকে এটাকে আটকাতে চাইছেন?

স্থানীয় একজন মানুষ হিসাবে পরিবেশ বিপন্নতা থেকে বাঁচতে।

লোকটা দু'দিকে মাথা নাড়ল, ঠিক বলছেন না ম্যাডাম, ঠিক বলছেন না। আপনি স্থানীয় নন, আর যেটা বলছেন সেটা আপনার আসল স্বার্থও নয়। শুনুন ম্যাডাম, আমরা যে-রাজনীতি করি তাতে আমাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে চলতে হয়। কাজেই আমরা স্থানীয় নই বলে কোনও খোঁজখবর না করেই কলকাতা থেকে এত দূরে এসেছি ভাববেন না। আমরা যেখানে যাই সব কিছু আগাম খোঁজখবর নিয়েই এগোতে হয়। আপনি আমাদের সংগঠনকে মোটা টাকা সাহায্য দিতে চেয়েছেন আর বিনিময়ে কিছু সাহায্য চেয়েছেন। কমরেড পলাশ আমাদের হাইকম্যান্ডের কাছ থেকে আপনার সঙ্গে বসার ব্যবস্থাটা করেছেন। সংগঠন চালাতে গেলে টাকার নিশ্চয়ই দরকার আছে ম্যাডাম। বিশেষ করে আমাদের এখন প্রচুর টাকার দরকার। তাই হয়তো আমাদের হাইকম্যান্ড এই মিটিংটার জন্য রাজি হয়েছে। কিন্তু টাকা নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করে দেওয়াটা আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য নয়। আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি দয়াল সান্যালের স্ত্রী। বাগানবাড়িটা, দু'একর জমি আপনার। কারখানাটা আপনার স্বামীর। বিরোধটা সম্পত্তির। সমস্যাটা পারিবারিক। আমরা একটা আদর্শের রাজনীতি করি। আপনাদের পারিবারিক বা দাম্পত্য সমস্যা মেটানোর প্ল্যাটফর্ম আমরা নই।

আপনারা এটাকে দাম্পত্য বা পারিবারিক সমস্যা হিসাবেই বা দেখছেন কেন?

তা হলে ম্যাডাম আর একটু পিছন থেকে শুরু করতে হয়। সরাসরিই কথা বলা যাক। আপনার মা ছিলেন একজন রূপোপজীবিনী। পরবর্তীকালে তিনি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে নিজের ব্যাবসা চালানোর জন্য একটা বাড়ির মালিক হয়েছিলেন। আমাদের ডেফিনিশনে উনি ছিলেন একজন ফিউডাল লর্ড। সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। দেহব্যাবসা থেকে প্রচুর অর্থ করে উনি হরিতলায় বকলমে ম্যাকার্থি সাহেব বলে একজনের নামে হরির ঝিলের পাশে এই বিপুল সম্পত্তি কেনেন এবং আপনার সঙ্গে দয়াল সান্যালের বিয়ের সময় জামাইকে যৌতুক হিসাবে এই জমি দেন, যাতে জামাই তাঁর স্বপ্নের কারখানাটা এখানে করতে পারেন। তবে পুরো জমিটার একটা অংশ আর ওটার মধ্যে একটা বাংলো, যেটাকে স্থানীয়রা ম্যাকার্থি সাহেবের বাংলো বলে বা আপনি যেটাকে বাগানবাড়ি বলছেন, সেটা আপনার মা আপনার নামে দলিল করে দিয়ে গেছেন। কী করে ওঁর পেশার উপার্জন থেকে এত বড় একটা সম্পত্তি করেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। প্রাসঙ্গিক হল, আপনার মায়ের মতোই দয়াল সান্যালও একজন ফিউডাল লর্ড। ফিউডাল লর্ডরা

আমাদের শ্রেণিশত্রু। আমাদের লড়াই এদের বিরুদ্ধে। ভারতের গণতন্ত্র এদের জন্য বিপন্ন। এরকম দু'জন ফিউডাল লর্ডের ব্যক্তিগত স্বার্থের টানাপড়েনে আমরা এগিয়ে আসব এটা আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিরোধী।

পলাশের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল শিপ্রা। আশ্চর্য! লোকগুলো ওর ইতিহাস, নাড়ি-নক্ষত্র সব জানে। এটা ওদের কে বলেছে? পলাশ? নাকি অন্য সূত্র ধরে ওরা জানতে পেরেছে। তা হলে কি পলাশের সঙ্গে ওর অতীত সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও লোকগুলো জানে?

পলাশ শিপ্রার চাহনিটার মানে বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কমরেডস, আপনাদের রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে করা আছে। তার আগে একটু চা করতে বলি।

পলাশের দেখাদেখি শিপ্রাও ব্যস্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। নেতা গোছের লোকটা শিপ্রাকে উঠতে দেখে বলল, আপনি উঠবেন না ম্যাডাম, বসুন।

শিপ্রা আবার বসে পড়ার পর লোকটা বলল, ম্যাডাম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি আমাদের রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করেন, না শুধুই সামান্য একটা সমস্যার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

শিপ্রা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার সমস্যাটা কিন্তু সামান্য নয়, অন্তত আমার কাছে। আমি রাজনীতির কিছু বুঝি না। পুলিশ যা করছে তাও যেমন বুঝতে পারি না সেরকম আপনাদের সংগঠন যা করছে তাও বুঝি না।

যেমন?

অনেক কিছুই আছে।

বলুন না! উদাহরণ দিন কয়েকটা।

পুলিশের গুলিতে কত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে মারা যাচ্ছে, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে, আবার আপনাদের হাতেও সাধারণ ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবল থেকে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর খুন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আদর্শের ভেতরটায় না ঢুকলে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসটা চোখ খুলে না দেখলে, এসব আপনি বুঝবেন না ম্যাডাম...

রাষ্ট্র না আপনারা, সে-তর্কে না গিয়েও চোখ খুলে একটা জিনিস তো দেখতে পাই, চারদিকে নিরীহ মানুষ খুন হচ্ছে।

সবাই কি আর নিরীহ দেখলেই নিরীহ ম্যাডাম?

পলাশ বলে উঠল, এই যে তোর স্বামীর ছায়াসঙ্গীর মতো সরোজ বক্সী বলে যে-লোকটা ঘোরে, যে-লোকটা তোর স্বামীর সমস্ত দুষ্কর্মের হুকুম মুখ বন্ধ করে তামিল করে, সেই লোকটাকে বাইরে থেকে দেখে কী মনে হয়? বছর পঞ্চাশের একটা ভিতু ভিতু কেরানি। চোখে হাই পাওয়ারের গোল চশমা, ধুতি আর বাংলা শার্টের পিছনে মূর্তিমান একটা শয়তান। হারামির হাতবাক্স একটা। এই লোকটার বেঁচে থাকার কোনও অধিকারই নেই।

এত রক্ত দিয়ে আমরা কী পাব পলাশ?

পলাশ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। এবার নেতা লোকটা পলাশকে চুপ করিয়ে দিল। তারপর আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল।

আর এক মাস পরে উনিশশো একাত্তর সালটা শেষ হয়ে যাবে। ভারতের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর হবে সামনের বছর। আপনাদের ভোটে তৈরি সরকার খুব ঘটা করে তার উদ্‌যাপন করবে। এই পঁচিশ বছরের তথাকথিত স্বাধীনতাতে আপনি ভাবছেন, খুব ভাল আছেন। আর রক্ত, সশস্ত্র বিপ্লবের দরকার কী? তা এটা সত্তরের দশক না হয়ে চল্লিশের দশক হলে আপনি কী বলতেন? বলতেন বিদেশির হাত থেকে স্বাধীনতার জন্য এই রক্ত সার্থক, তাই তো? কিন্তু চিন্তা করে দেখেছেন কি কখনও এই স্বাধীনতা কী দিয়েছে? দয়াল সান্যালের মতো ফিউডাল লর্ডদের সাতচল্লিশের আগে-পরে অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি? উলটে রাষ্ট্র আরও সুবিধাই করে দিচ্ছে এদের।

শিপ্রা এবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এবার আপনি বলছেন। সাতচল্লিশ সালে দয়াল সান্যালের বয়স ছিল তেইশ। আপনাদের ভাষায় তখন ও কোনও ফিউডাল লর্ড ছিল না। ডুমুরঝড়া বলে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে থাকত ও।

এটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নয়, উদাহরণ মাত্র। আপনি ডুমুরঝড়া গ্রামের কথা বলছেন। গ্রামটা আমরা দেখিনি, নামও শুনিনি কখনও। তবে একটা কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আপনার হিসেব মতো দয়াল সান্যালের আজ বয়স সাতচল্লিশ। তেইশ থেকে সাতচল্লিশে দয়াল সান্যাল আজ যত উন্নতিই করুন না কেন, এই চব্বিশ বছরে ডুমুরঝড়া গ্রামের মতো ভারতের অসংখ্য গ্রামের মানুষের কোনও উন্নতিই হয়নি। সাতচল্লিশ সালটা আমাদের কাছে কোনও ঐতিহাসিক বছর নয়। একই মানুষগুলো শুধু গণতন্ত্রের পোশাকের ভেক ধরেছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। আপনার পারিবারিক সমস্যা এবং আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। দয়াল সান্যালের হাত থেকে মুক্তি। আপনার ক্ষেত্রে সেটা ব্যক্তিগত আর আমাদের ক্ষেত্রে সেটা সামাজিক, রাজনৈতিক।

আমি সত্যি বুঝতে পারছি না।

মহেশ একটা থালার মধ্যে চায়ের কাপ বসিয়ে এনে ওদের মধ্যে রাখল। লোকগুলো চায়ের কাপ তুলে নিল। নেতা লোকটা চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বলল, ঠিক আছে। আগে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত এবং অবস্থানটা ব্যাখ্যা করুন। তার পরে আপনাকে বুঝিয়ে বলছি।

অচেনা তিনটে লোকের সামনে আচমকা এভাবে নিজের ইতিহাসের পাতাটা খুলে ফেলতে কুণ্ঠা লাগছিল শিপ্রার। তবু ময়দানে যখন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সামনাসামনি বসেছে তখন আর পিছিয়ে পড়ার অবকাশ নেই। দু'দণ্ড সময় নিয়ে দ্বিধাটা ঝেড়ে

ফেলে বলতে শুরু করল, আপনারা তো জানেন আমার মায়ের পেশা কী ছিল। তবে আমি আর একটু পিছন থেকে বলি। কোনও এক সাহেবের উপপত্নী হয়েছিলেন আমার দিদিমা। হিন্দু বাড়ির মেয়ে সাহেবকে বিয়ে করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তকমাও জুড়ে গেল একসময়ে। সেই সাহেবই দিদিমাকে শেষ পর্যন্ত এই পেশায় বসিয়ে দিয়েছিল। তারপরে মা, মায়ের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরকম একটা ঘৃণ্য পরিবেশই ছিল। পেশাটার বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এসে সত্যি হয়তো অনেক পয়সা করতে পেরেছিল। তবে সমসাময়িক অন্যদের মতো বিলাসিতার জীবনের পিছনে সেই পয়সা খরচ না করে মা এই হরিতলায় বিপুল সম্পত্তি কিনেছিল। তার প্রধান আকর্ষণ ছিল হরির ঝিল। পারলে এই বিশাল ঝিলটাও হয়তো মা কিনে নিত, কিন্তু আইনি উপায় ছিল না। সারা জীবন একটা কয়েদখানায় কাটিয়ে, শরীরটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে বিক্রি করে এই ঝিলের কাছে এসে অদ্ভুত একটা মুক্তির স্বাদ পেত মা। তার প্রধান কারণ বিভিন্ন দেশের পরিযায়ী পাখি। তারা সুন্দরী কিন্তু মুক্ত। ইচ্ছে স্বাধীন।

এদিকে দিদিমা যত অনায়াসে মাকে নিজের পেশায় নিয়ে এসেছিল, মা কিন্তু আমাকে একদম আগলে রেখেছিল সেই পেশার হাতছানি থেকে। কার্শিয়াং-এ কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি আমি। কলকাতায় মায়ের কাছে এলে কখনও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাড়িতে যেতাম না। হয় হোটেলে থাকতাম, না হলে এখানকার বাগানবাড়িটায় থাকতাম। মিস্টার ম্যাকার্থি হরিতলার কারখানাটা শুরু করলেও যে-কোনও কারণেই হোক, শেষ করতে পারেনি। একটা বিশাল খোলা জায়গা, একটা এত বড় ঝিল, আর একটা অর্ধসমাপ্ত কারখানার শেড। অদ্ভুত একটা পরিবেশ ছিল এখানে। আপনারা হয়তো আমাকে স্থানীয় বলবেন না, কিন্তু আমার মনটা সবসময় এখানেই পড়ে থাকে। কী অদ্ভুত ছিল সেই ছেলেবেলাটা! বিদেশি পাখিরা শুধু ঝিলের ধারে গাছটাতেই থাকত না, কারখানার শেডের মধ্যেও চলে আসত ওরা। আমরা গম ছড়িয়ে রাখতাম ওখানে। কখনও কখনও ফলের টুকরোও। আমি দেখেছি, মায়ের কী অদ্ভুত মমতা ছিল এই পাখিগুলোর জন্য। ছোটবেলা থেকে মা একটাই কথা বলে এসেছে আমাকে, এই ঝিলটা বাঁচিয়ে রাখতে। যাতে চিরকাল দেশ-বিদেশের পাখিরা এসে আশ্রয় পায় এখানে। আমার বিয়ের শর্ত হিসেবে শেডসুদ্ধ অনেকটা জমি দয়াল সান্যালকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল মা। খুব কষ্ট হয়েছিল, তবু দিতেই হয়েছিল। এখন শুধু বেঁচে আছে ওই একটু জমিসুদ্ধ বাংলোটা আর হরির ঝিল। বাংলোটা হয়তো বাঁচাতে পারব না। জমিটা নিয়ে নেওয়ার ও সবরকম চেষ্টা করছে। কিন্তু হরির ঝিলটা? যেটা কারও একক ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, যেটা অন্যায়ভাবে দয়াল সান্যাল বুজিয়ে ফেলে নিজের কারখানাটা বাড়িয়ে নেবে, হরির ঝিলের ওপরের আকাশে আরও আরও গলগল করে ধোঁয়া ছড়াবে, আর আমি সেটা বাঁচানোর কোনও চেষ্টাই করব না? এই চেষ্টাটাই মায়ের স্মৃতির প্রতি আমার একমাত্র কর্তব্য। তার জন্যই আপনাদের সাহায্য চাওয়া।

একটানে এতগুলো কথা বলে হাঁপিয়ে পড়ল শিপ্রা। লোকগুলো মন দিয়ে শুনতে শুনতে চায়ের কাপগুলো নামিয়ে রেখে বলল, আপনার চা-টা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

খেতে খেতে বাকিটা বলুন। শিপ্রা তবু চায়ের কাপটা না ধরে বাকিটা বলতে আরম্ভ করল।

দয়াল সান্যাল কিন্তু কোনও চরিত্রের দোষে কখনও ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে মায়ের বাড়িতে আসেনি। এসেছিল এখানকার সম্পত্তির মালকিনকে খুঁজতে। মায়ের ওকে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বেশ্যাদের প্রতি আকর্ষণ নেই, দয়াল সান্যালের চরিত্রের এই দিকটাই হয়তো সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল মাকে। তা ছাড়া নির্দিষ্ট পিতৃপরিচয়হীন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড... একটা সামাজিক বাধা তো ছিলই।

একটু থেমে আড়চোখে পলাশকে একবার দেখল শিপ্রা, পলাশের মাথাটা ঝুলে রয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিপ্রা আবার আরম্ভ করল।

দয়াল সান্যালের সঙ্গে ষোলো বছর বয়সের ফারাক নিয়েও একদিন আমার বিয়ে হয়ে গেল। সম্পত্তিটা পাওয়া ছাড়া ওর আর একটা শর্ত ছিল, আমাকে হিন্দু হতে হবে। কেন এই কন্ডিশনটা ছিল, জানি না। আমার ইচ্ছে না থাকলেও মা ওইটা জোর করেছিল। আমাকে বুঝিয়েছিল এককালে তো আমরা হিন্দুই ছিলাম, আবার হিন্দু হয়ে গেলে ক্ষতি কী! কোনও একটা আশ্রমে দয়াল সান্যাল একদিন আমাকে নিয়ে গেল। কীসব হল, ব্যস আমি নাকি হিন্দু হয়ে গেলাম। আমার নাম ছিল শ্যারন, দয়াল সান্যাল নাম পালটে করে দিল শিপ্রা। আসলে মা বোধহয় কিছুতেই দয়াল সান্যালকে হাতছাড়া করতে চায়নি।

একদিন হরিতলা কটন মিল সম্পূর্ণ হল। মা খুব খুশি হয়েছিল। একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের বউ আমি। একদিন কটন মিলটা দেখতেও এসেছিল। মায়ের কোনও ধারণা ছিল না, একটা চালু কটন মিল কেমন হয়। কিন্তু দেখতে এসেই চমকে গিয়েছিল। সেই শেডটা আর নেই। চিমনি দিয়ে গলগল করে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। চারিদিকে যন্ত্রপাতির নানান আওয়াজ। হরির ঝিলের ওপর মুক্ত আকাশে গিয়ে মিশছে সেই ধোঁয়া। মা শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, শীতকালে পাখিরা আসবে তো শ্যারন? সত্যি এর পরের শীতকালগুলোয় ক্রমশ পাখি আসা কমে যেতে দেখলাম। একদিন মা-ও চলে গেল। আমার নামে থাকা জমিটুকু আর হরির ঝিল বুজিয়ে কারখানাটা বাড়িয়ে নেওয়ার যেটুকু কুণ্ঠা দয়াল সান্যালের মনে ছিল, সেটাও আর থাকল না। সবরকম চেষ্টা করছে ও। মাঝে মাঝে মনে হয় সরকারকে ধরে, হরির ঝিলের একটা একটা করে শরিককে বুঝিয়ে টাকা দিয়ে ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে। কিন্তু মায়ের স্মৃতির জন্য আমি হরির ঝিলটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আপনাদের যা সাহায্য পারি করব। আপনারা শুধু এইটুকু করে দিন।

নেতা লোকটা চোখ দুটোর মাঝখানে নাকের কাছটা চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে এতক্ষণ শিপ্রার কথা শুনছিল। শিপ্রার কথা শেষ হতে বলল, আপনি খ্রিস্টান ছিলেন, তাই তো?

আর আমার কোনও ধর্মবিশ্বাস নেই, ওই যে বললাম দয়াল সান্যালের বউ হয়ে খাতায়-কলমে এখন হিন্দু। অবশ্য এভাবে সত্যি হিন্দু হওয়া যায় কিনা আমি নিশ্চিত

নই। হয়তো, মায়েরও ইচ্ছে ছিল বলে আমি মেনে নিয়েছিলাম। তবে বাইবেলের শিক্ষা আমাকে আজও প্রেরণা দেয়।

পরিসংখ্যান বলে আপনাদের পবিত্র বাইবেলের চেয়েও একটা বই বেশি ছাপা হয়েছে। রেড বুক। নাম শুনেছেন?

বইটার নাম শুনেছে শিপ্রা, তবে কখনও চোখে দেখেনি। শুনেছে নিষিদ্ধ বইটা। বইটার বিষয়বস্তু নিয়েও কোনও ধারণা নেই শিপ্রার। নকশালদের বাইবেল নাকি বইটা। লোকটা নিজের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা লাল পকেট-বই বার করে শিপ্রার হাতে দিল।

হারিকেনের মিয়ানো আলোর ওপর ডায়েরির মতো বইটা শিপ্রা হাতে নিয়ে দেখল। লাল রঙের মলাটে মানুষটার ছবিটা চেনে। মাও সে তুং। নিষিদ্ধ বইটার কথা এত শুনেছে একবার দ্রুত পাতা উলটে দেখার খুব ইচ্ছা হল। বইটার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। পাতা উলটোতে উলটোতে শিপ্রা অবাক হল, এ তো উদ্ধৃতির সংকলন।

লোকটা একটা স্থির দৃষ্টিতে শিপ্রার প্রতিক্রিয়া দেখছিল। শিপ্রার দ্রুত পাতাগুলো ওলটানো হয়ে যাওয়ার পর বলল, এটা কিন্তু কোনও সিনেমার পত্রিকা নয় ম্যাডাম, পাতা ওলটালেন আর দেখা হয়ে গেল। আপনি রাখুন বইটা, সময় করে মন দিয়ে পড়ে দেখবেন।

শিপ্রা মৃদু হাসল, বইটার জন্য কোনও আগ্রহ দেখাল না। তবে সরাসরি লোকটাকে কিছু না বললেও, সামনে বইটা নামিয়ে রেখে প্রকারান্তরে নিজের মনের ভাবটা জানিয়ে দিল।

মহেশ এসে জিজ্ঞেস করল, রাতের খাবার দিয়ে যাবে কিনা। লোকগুলো বলল এখনই দরকার নেই তবে এই ঠান্ডায় আর এক কাপ করে গরম চা হলে ভাল হয়। এঁটো কাপগুলো মাঝখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর নেতা লোকটা আবার শুরু করল।

এবার আমাদের অবস্থানটা বলি ম্যাডাম। আমাদের হিট লিস্টে দয়াল সান্যালের নামও আছে। সেটা আপনি জানেন। এবং জানার পরও আপনি আমাদের সঙ্গে মিটিং করতে চেয়েছেন। তাই নিঃসংকোচেই আপনার সামনে বলছি। আজ হোক, কাল হোক, পরশু হোক দয়াল সান্যালকে চলে যেতে হবে। একটা দুর্নীতিমুক্ত সমাজের স্বার্থে চলে যেতে হবেই। আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনি এই কাজে সাহায্য করতে পারেন।

চমকে উঠল শিপ্রা। দয়াল সান্যালের নামে এরা যে পোস্টার ছড়াচ্ছে সেটা দয়াল সান্যালের মুখ থেকেই শুনেছে। এবং সেই প্রথম এই সংগঠনকে খুব ভয় পেতে দেখেছে বেপরোয়া দয়াল সান্যালকে। শিপ্রা শুধু এই ভয়টাই কাজে লাগাতে চেয়েছিল। একমাত্র ওদের ভয়েই যদি দয়াল সান্যাল পিছিয়ে আসে, হরির ঝিলটা বাঁচে। শিপ্রার এখনও মায়ের দেওয়া প্রচুর টাকা গোপনে আছে, যার খোঁজ দয়াল সান্যালও জানে না। এদের

টাকা দিয়ে শিপ্রা এক ঢিলে দুটো লক্ষ পূরণ করতে চেয়েছিল। দয়াল সান্যালের প্রাণ বাঁচানো আর হরির ঝিল বাঁচানো। নকশালদের সাহায্য নিয়ে উদ্দেশ্য ছিল দয়াল সান্যালকে ভয় দেখানো। নকশালদের হুমকি পেলে দয়াল সান্যাল আর এক পা-ও হরির ঝিলের দিকে এগোনোর সাহস পাবে না। তা ছাড়া দয়াল সান্যাল সম্পর্কে তার একমাত্র দুর্বলতা হল, লোকটা বিট্টুর বাবা। এইটুকু ছেলেকে পিতৃহীন হওয়া থেকে বাঁচতে নকশালদের নিজের বশে নিয়ে আসতে হবে। তবে লোকগুলো এত কঠিন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে চলে, এদের দেখার আগে কল্পনাও করতে পারেনি শিপ্রা। এখন এদের দৃঢ়তা দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। গলাটা মিইয়ে এল শিপ্রার।

হরির ঝিল বাঁচানোর জন্য দয়াল সান্যালকে খুন করাটা আবশ্যিক নয়। আমি কখনওই সেটা চাই না। এটা আপনারা কী বলছেন!

লোকটা একটা স্থির দৃষ্টিতে শিপ্রাকে দেখে বলল, আপনি তো দয়াল সান্যালকে ছেড়ে চলে এসেছেন। একটা স্বার্থপর লোকের জন্য আর কী আপনার পিছুটান?

চলে এসেছি মানে? এটা তো সাময়িক। উনি আমার স্বামী, আমার ছেলের বাবা। আমি দয়াল সান্যালের একটা স্বার্থপর উচ্চাশাকে খুন করার কথা বলছি, মানুষটাকে কখনও নয়। আপনারা আমাকে একটা কথা বলুন, দয়াল সান্যাল খুন হয়ে গেলে কী লাভ হবে?

নিজেকে শক্ত করে শিপ্রা যুক্তির লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল। এই লোকগুলো যদি সত্যিই দয়াল সান্যালকে খুন করে বসে, বড় হলে কী জবাব দেবে বিট্টুকে! নেতা লোকটা অবশ্য শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে মুখের ওপর একরাশ ঘৃণা জড়ো করে বলল, পুঁজিবাদের একটা কীট কম হবে। সাম্যবাদের দিকে আরও এক পা এগোনো যাবে। পরিসংখ্যান দিয়ে...

কিন্তু কী ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছেন কি?

লোকটাকে কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে শিপ্রাও ওর চোখের দিকে এবার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটা চোখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, আপনাকে বোধহয় আমি এখনও ঠিক করে বোঝাতে পারিনি।

আমি যেটুকু বুঝি সেটুকু আপনাকে বোঝাই। দয়াল সান্যালের হরিতলা কটন মিলে তিনশো বিরাশি জন কাজ করে। দয়াল সান্যাল কাল খুন হয়ে গেলে এই কটন মিলের ব্যাবসাটা কে চালাবে? এতগুলো পরিবারের কী হবে?

লোকটা এবার স্বস্তি পেল। নিজের যুক্তিতে ফিরে আসার রাস্তা পেয়ে বলল, সমবায় আন্দোলন করে চলবে। চিনে এভাবে চলছে না? শ্রমিক-মালিক বলে কিছু থাকবে না।

কারা চালাবে সেই সমবায় যাতে ব্যাবসাটা টিকে থাকে? তাদের ব্যাবসা চালানোর অভিজ্ঞতা আছে কি? পলাশকে জিজ্ঞেস করুন। ও তো অনেকদিন কাজ করছে এই কারখানায়। ও ব্যাবসা চালানোর কোন দায়িত্বটা নিতে পারবে?

তর্কটা বাড়ছিল। নেতা লোকটার গলাটা ক্রমশ চড়ে যাচ্ছিল। প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, আপনি কতটুকু ঠিকঠাক জানেন ম্যাডাম? ওই তিনশো বিরাশি জন কেমন আছে? একেবারেই ভাল নেই। জুট মিল, কটন মিলে বদলি বলে একটা ব্যবস্থা আছে, জানা আছে আপনার? খাতায়-কলমে একই নামের পিছনে কত লোক ভ্যানিশ হয়ে যায় সেখানে, কতরকম দুর্নীতি...

লোকটার কথা এবার আটকে গেল। ভেতরের দরজায় ভেসে উঠেছে একটা ছায়া ছায়া বাচ্চা ছেলে। দ্রুত লণ্ঠনের সলতেটা আরও নামিয়ে দিল লোকটা। বাচ্চা ছেলেটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল শিপ্রার দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, মাম্মি!

শিপ্রা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, তুমি উঠে পড়লে কেন সোনা?

কোনও উত্তর না দিয়ে ছেলেটা শিপ্রার কাঁধে মুখ গুঁজল। পলাশও ব্যস্ত হয়ে উঠল। শিপ্রাকে বলল, তুই ওকে ঘুম পাড়িয়ে আয়, ততক্ষণে আমরা খেয়ে নিই।

পলাশের কথা শুনে শিপ্রা ঘরের মধ্যে এসে খাটে আবার ছেলেকে শুইয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, তুমি ঘুমোও বিট্টুসোনা।

এবার খুব নিচু স্বরে ফিসফিস করে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, ওরা কারা?

ওরা? বলে একটু চুপ করে শিপ্রা চিন্তা করে বলল, ওরা সব কাকা। আমার বন্ধু। তুমি ঘুমোও।

ছেলেকে আলতো চাপড় মেরে মেরে গুনগুন করে শিপ্রা আবার গাইতে লাগল—আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

উলটোদিকে মুখ করে বিট্টু তখন বুড়ো আঙুলটা মুখে নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের কালো আকাশের দিকে। মায়ের বন্ধু লোকগুলো? কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে!

হরির ঝিলে সেদিন রাতে তারপর পরপর কী হয়েছিল শিপ্রার ঠিক জানা নেই। শুধু কয়েকটা মুহূর্তের ঘটনা। শিপ্রা তখনও বিট্টুকে আলতো চাপড় মেরে গুনগুন করে গান গাইছিল 'আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...' তার পরের ঘটনাগুলো ভুলতে চাইলেও কিছুতেই ভুলতে পারে না শিপ্রা...

বাইরের ঘরে টুংটাং করে মহেশের মাটিতে থালাবাসন বেছানোর আওয়াজ। লোকগুলোর খাওয়ার বন্দোবস্ত করছে। লোকগুলো নিঃশব্দে খেতে শুরু করল। খুব হালকা পলাশের একটা গলা পাওয়া যাচ্ছিল। একবার পলাশ উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, শিপ্রার খাওয়া হয়েছে কিনা। শিপ্রা ইশারায় না বলতে পলাশ খুব নিচু স্বরে বলল, ঠিক আছে। তুই ওকে ঘুম পাড়িয়ে নে। ওদের খাওয়া হয়ে যাক। পরে তুই আর আমি একসঙ্গে খাব।

না, তুই ওঁদের সঙ্গে খেয়ে নে। আমরা ওদের ডেকেছি। ওদের খাওয়ার সময় আমরা একজনও না থাকলে খারাপ দেখায়।

ওরা কিছু মনে করবে না। আমি বরং এখানেই বসি।

না, তুই থাকলে বিট্টু উঠে যেতে পারে। তুই যা।

পলাশের খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু শিপ্রার চাপাচাপিতে নিমরাজি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শিপ্রা আবার বিট্টুকে ঘুম পাড়াতে মন দিল, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়...

হঠাৎ করে বাড়ির সামনের আর পিছনের দরজাগুলোয় একসঙ্গে দুটো ভীষণ জোরে 'দড়াম' 'দড়াম' করে আওয়াজ। শিপ্রা চমকে উঠে ঘুরে দরজার দিকে মুখ করে শুধু এক লহমায় একটাই দৃশ্য দেখতে পেল। লোকগুলো গায়ে জড়ানো কম্বলগুলো এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে হারিকেনটা একটা লাথি মেরে নিভিয়ে দিল। কেরোসিন তেলের গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে। তার মধ্যে কয়েকটা টর্চের গোল আলোর দাপাদাপি আর পরপর কয়েকটা কান ফাটানো গুলির আওয়াজ। বাইরের আমগাছটায় ঝটপট করে উঠল অসংখ্য পাখি। তারস্বরে কেঁদে উঠল বিট্টু। সেই সঙ্গে কয়েকটা আর্ত চিৎকার, গালিগালাজ আর ভারী বুটের দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ।

বিট্টুর দুটো কান চেপে মুখটা নিজের বুকে গুঁজে নিকষ অন্ধকারে খাটের মধ্যে পাথরের মতো বসে রইল শিপ্রা। আর কোনও চিন্তাশক্তি কাজ করছে না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, খোলা দরজাটা দিয়ে একটা গনগনে বুলেট এখনই ধেয়ে আসবে ওদের দিকে। এই পরিণতিটার জন্য সে নিজেই দায়ী। এমনকী একরত্তি শিশুটাকেও এনে ফেলেছে এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে। একটু আগে ওই লোকগুলোকে বলছিল, সে হিন্দু, খ্রিস্টান কোনওটাই নয়। তার কোনও ধর্মবিশ্বাসই নেই। এখন চোখটা বন্ধ করে একটা ক্রুশ দেখতে পাচ্ছে। এক অসম্ভব সৌম্যকান্তি পুরুষ কাঁটার তার মাথায় জড়িয়ে সেই ক্রুশটাতে বিদ্ধ হয়ে আছেন। বারুদের গন্ধের মধ্যে বিড়বিড় করে শিপ্রা বলতে থাকল, জিসাস প্লিজ ফরগিভ মি, তোমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, বিট্টুকে রক্ষা করো, প্লিজ জিসাস...

চোখধাঁধানো আলোটা এগিয়ে এল। এবার অচেনা একটা গলা ধমকে উঠল, অনেক ন্যাকামি করেছেন... নেমে আসুন...

কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। তারপর শিপ্রার হাতটা শক্ত করে ধরে হ্যাঁচকা একটা টান দিল অচেনা একটা হাত। বিট্টুকে কোলে আঁকড়ে ধরে কোনওরকমে টাল সামলে খাট থেকে নেমে এল শিপ্রা। খালি পা। চটি পর্যন্ত পরার সময় পেল না।

বাইরে এসে চোখের অন্ধকারটা হালকা হয়ে কাটল। চারপাশের লোকগুলোকে এবার চিনতে পারল শিপ্রা। পুলিশ। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বড় কালো একটা ভ্যান। আর তার সামনে একটা জিপ। কখনও হাত ধরে টেনে, কখনও পিছন থেকে ঠেলা মেরে দৌড় করিয়ে ভ্যানের ভেতর শিপ্রা আর বিট্টুকে তুলে দিল পুলিশগুলো। ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠল শিপ্রা। ভেতরে এক কোনায় বসে আছে দয়াল সান্যাল।

এই রাতটা ধরলে, সব মিলিয়ে চারদিন ছিল শিপ্রা এখানে। এই চারদিন বাবাকে দেখেনি বিট্টু। এত গন্ডগোলের মধ্যে এরকমভাবে দুম করে বাবাকে দেখতে পেয়ে তার বুকের ভেতর আনন্দ লাফিয়ে উঠল। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে রাখা হাত দুটো ছাড়িয়ে

দৌড়ে গিয়ে উঠে বসল বাবার কোলে। দয়াল সান্যাল বিট্টুর কপালে কয়েকটা চুমু খেয়ে ওর চুলে বিলি কাটতে থাকলেন কিন্তু শিপ্রার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।

পুলিশ ভ্যানটার গায়ে ছোট ছোট জানলা। সেই জানলার ওপর আবার দু'পরতা জাল। শিপ্রা জানলাটা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে কুয়াশামোড়া হরির ঝিল। এত কিছুর মধ্যেও অবিচল জল। জলের ওপর একটা চোরা হাওয়া ঝিরঝিরে ঢেউ খেলিয়ে যাচ্ছে। এই চারদিন ভোরে, দিনে, দুপুরে, রাতে এই টলটলে জলের দৃশ্যটাই বহু রূপে দেখে কাটিয়েছে শিপ্রা। কিন্তু এখন একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম অনুভূতি হতে লাগল শিপ্রার মনে। মায়ের কথা মনে পড়ছে। হু হু করছে ভেতরটা। মা তো এই ঝিলটাতে একটা অতল শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। দেশ-বিদেশের পাখিরা বয়ে নিয়ে আসত সেই শান্তি। শিপ্রার মনে একটা গভীর অনুশোচনা হতে লাগল। কেন বিয়ের আগে আত্মহত্যা করল না? তা হলে ওই হরিতলা কটন মিলটা হত না। ওর থেকে দু'হাত দূরে বসে থাকা লোভী লোকটা এই ঝিলটাকে বুজিয়ে ফেলার একটার পর একটা গভীর চক্রান্ত করতে পারত না।

আবছা আলো-আঁধারিতে শিপ্রা দেখল দুটো পুলিশ একটা লাশকে হাত-পা চ্যাংদোলা করে ধরে হরির ঝিলের একটা ঝোপের দিকে নিয়ে গেল। দূর থেকে অন্ধকারে লাশটা কার, বুঝতে পারল না শিপ্রা। এতক্ষণ এটা নিয়ে চিন্তা করার মতো অবস্থাতেই ছিল না। এবার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল, ওটা কার লাশ? পলাশের? মহেশদার? 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' বিশ্বাস করা লোকটা, নাকি তার অনুগামীদের? যারই হোক শিপ্রার বারবার মনে হতে থাকল, মৃত্যুটা কি তা হলে এতই ঠুনকো, অনাড়ম্বর, প্রস্তুতিহীন! এই তো একটু আগে পলাশ চেয়েছিল ওকে চুমু খেতে, শরীরের উত্তাপ পেতে। নেতা লোকটা চেয়েছিল ভারতে সাম্যবাদ আনতে, মহেশদা চেয়েছিল একটা পাখিকে বাঁচাতে। আর একটু পরেই তাদের জীবনটা শেষ হয়ে গেল। প্রাণহীন শরীরটাকে বেওয়ারিশের মতো পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আরও লাশ বেরোবে। আর বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে পারল না শিপ্রা।

চার্লি কলিং রজার... চার্লি কলিং রজার... চার্লি কলিং...

জিপটার ভেতর ওয়্যারলেস সেট থেকে খ্যাসখ্যাসে গলায় অনবরত ভেসে আসছে নানারকম ডাক। নিঝুম রাতে ভ্যানটার ভেতর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওয়্যারলেসের শব্দ। বাবার বুক থেকে মুখটা তুলে বিট্টু জিজ্ঞেস করল, ওরা কী কথা বলছে বাবা? চার্লি কে?

ওটা সব পুলিশকাকুদের নাম। ওরা...

দয়াল সান্যালের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভ্যানের দরজাটা খুলে উঠে এল বেশ কয়েকজন পুলিশ। উঠে পিছনের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করতেই স্টার্ট দিয়ে দিল ভ্যানের ড্রাইভার। দুলে উঠে ভ্যানটা এগিয়ে চলল সামনে জিপটাকে রেখে। জালের জানলাটা দিয়ে ছোট হতে হতে একসময়ে মিলিয়ে গেল হরির ঝিলের ধারে মহেশের ভাঙাচোরা বাড়িটা।

সরু রাস্তা ছেড়ে একসময় পুলিশ ভ্যানটা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। বড় রাস্তায় পড়েই অসম্ভব গতি বাড়িয়ে দিল ভ্যানটা। ড্রাইভারের স্পিডটাই যেন একমাত্র লক্ষ্য। গর্ত, খানাখন্দ মানামানি নেই। এক এক সময় লাফিয়ে উঠছে গাড়িটা। অন্যরা নিজেদের মধ্যে চাপাচাপি করে বসলেও, শিপ্রা একমাত্র মহিলা বলে টানা বেঞ্চটায় একটু ছড়িয়ে বসার মতো জায়গা পেয়েছিল। অথচ এই ছড়ানো জায়গাতে বসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এক একটা গাড্ডায় যখন পূর্ণ গতিতে চাকাটা আছড়ে পড়ছে, নিজেকে আর সামলে বেঞ্চটায় চেপে বসতে পারছে না। ঝাঁকুনিতে মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেল। এতগুলো পুরুষমানুষের সামনে এরকমভাবে বেসামাল হয়ে বিপর্যস্ত হতে প্রচণ্ড অস্বস্তি লাগছিল। অবশ্য অচেনা পুলিশগুলোর এতে খুব হুঁশ নেই। ক্লান্ত হয়ে অনেকেই ঘুমে ঢলে পড়ছে। শুধু দয়াল সান্যাল শিপ্রাকে এরকম অবস্থায় দেখে ভেতরে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন। মনে মনে ভাবলেন, প্রাণে শেষ করে দিতে চেয়েছিল মেয়েটা। ডাহা গুলিয়েছে। এবার ফলভোগের পালা। শান্তিতে বাকি জীবনটা কীভাবে কাটায় মেয়েটা, এবার দেখবেন। ওই সিটটার ওপর যেমন লাফাচ্ছে, সারাটা জীবন ওইরকম তুর্কি নাচ নাচিয়ে যাবেন।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর পুলিশের জিপটা একটা বাজারের মতো জায়গায় এসে দাঁড়াল। এত রাতে অবশ্য বাজারের একটা দোকানও খোলা নেই। জিপটার পিছনে ভ্যানটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। জিপ থেকে একজন পুলিশ অফিসার নেমে ভ্যানের একটা জানলার নীচে এসে ভেতরের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিস্টার সান্যাল, আমরা সেফ জায়গায় চলে এসেছি। কথামতো আপনার গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে সামনে। আপনি আপনার গাড়িতে উঠে এবার বাড়ি চলে যান।

দয়াল সান্যাল একটু চিন্তা করে বললেন, আপনি কোথায় যাবেন এখন?

লালবাজারে।

কীসে যাবেন?

অফিসার একটু অবাক হয়ে উত্তর দিলেন, কেন? আমার জিপে।

আমাকে তা হলে প্লিজ লালবাজার পর্যন্ত আপনার জিপে একটা লিফ্‌ট দিন।

পুলিশ অফিসার আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন, আপনার আর কোনও ভয় নেই। হাওড়া ব্রিজ পর্যন্ত তো আপনার পিছন পিছন আমরা জিপে আছি। ততক্ষণে ভোরও হয়ে যাবে।

দয়াল সান্যাল একটু ভেবে বললেন, না, ও... মানে শিপ্রা বিট্টুকে নিয়ে আমার গাড়িতে এগিয়ে যাক। আমার লালবাজারে এসিপি রায়ের সঙ্গে একটু দরকার আছে। উনি সকাল আটটা পর্যন্ত লালবাজারে থাকবেন বলেছেন।

আর একটা রক্তাক্ত অপারেশনের রাতের পর অফিসার ক্লান্ত ছিলেন। দয়াল সান্যাল লোকটা উঁচু মহলে যোগাযোগ রেখে চলা লোক। উঁচু তলার নির্দেশ না থাকলে এরকম একটা অপারেশনে কখনই সঙ্গে রাখা হত না দয়াল সান্যালকে। ক্লান্তিতে ভ্যানের পিছনে এসে দরজাটা খুলে বললেন, আপনি তা হলে নেমে আসুন, জিপে আমার সঙ্গে চলুন।

দয়াল সান্যাল ভ্যান থেকে নেমে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতেই বিট্টু বাবার সোয়েটারটা খামচে ধরল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

না বাবা, তুমি বাড়ি চলে যাও।

বিট্টু বায়না ছাড়ল না।

না, তোমার সঙ্গে যাব।

সময় বাঁচাতে এগিয়ে এলেন পুলিশ অফিসার। বিট্টুর দিকে নরম চোখে চাইলেন।

কী নাম তোমার?

প্রীতম সান্যাল। মুখ গোঁজ করে বিট্টু বলল।

শোনো প্রীতম, লক্ষ্মীছেলে, মায়ের সঙ্গে যাও। বাবার একটা কাজ আছে, একটু পরেই ফিরে যাবে।

শিপ্রার মাথায় কিছু ঢুকছিল না। চারদিন পর বউ-ছেলেকে উদ্ধার করে দয়াল সান্যাল এত ভোরে ওদের ছেড়ে লালবাজারে কেন যাচ্ছে? এতক্ষণ পর্যন্ত দয়াল সান্যালের সঙ্গে একটা কথাও হয়নি। এবার বিট্টুকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো দয়াল স্যান্যালের সামনে এসে বলল, কোথায় যাব আমরা?

দয়াল সান্যাল একবার পুলিশ অফিসারের দিকে তাকালেন। তারপর একটা হিম দৃষ্টিতে শিপ্রাকে দেখে চাপা গলায় কেটে কেটে বললেন, যদি তুমি একা হতে তা হলে বলতাম যেখানে খুশি... জাহান্নামে... ছেলেটা যখন আছে তখন নিশ্চয়ই বাড়িতেই যাবে। যাও বিট্টুকে নিয়ে চুপচাপ আমাদের গাড়িতে উঠে পড়ো।

দয়াল সান্যাল ভ্যান থেকে নেমে গেলেন। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে নিজের বড় গাড়িটা। তার একপাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সরোজ বক্সী। গটগট করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে ক্রুর হেসে চাপা গলায় বললেন, দুটোই ফিনিশ।

এই দুটো মাত্র শব্দ আওড়েই দয়াল সান্যাল আর কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে উঠে বসলেন পুলিশের জিপটায়। কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে শিপ্রা একইরকম যন্ত্রচালিতের মতো বিট্টুকে নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়িতে ছিল দয়াল সান্যালের বিশ্বস্ত ড্রাইভার বনোয়ারীলাল আর, পলাশ যাকে বলেছিল বছর পঞ্চাশের ভিতু ভিতু কেরানির মতো দেখতে, একান্ত অনুগত দুষ্কর্মের সহচর, সেই সরোজ বক্সী।

৪

সকাল ছ'টার মধ্যেই সরোজ বক্সী শিপ্রা আর বিট্টুকে বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। গোটা রাস্তাটা বনোয়ারীলাল যতটা সম্ভব ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালিয়েছে। পাশে সরোজ বক্সী কাঠ হয়ে বসে ছিলেন। পিছনে শিপ্রা আর বিট্টু। বিট্টু একটু-আধটু কথা বলার চেষ্টা করলেও শিপ্রা প্রত্যেক বারই মৃদু ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে শিপ্রার কোলে মাথা

রেখে বিট্টুও ঘুমিয়ে পড়েছিল। আসার আগে দয়াল সান্যাল বাড়িতে হুকুম দিয়েছিলেন গাড়িতে যেন বিট্টুর কিছু খাবার তুলে দেওয়া হয়। মালিকের প্রতিটা কথা সরোজ বক্সী টনটনে মনে রাখেন। তবে আজকের পরিস্থিতিটা একদমই অন্যরকম। শিপ্রার থমথমে মুখ দেখে বিট্টুর খাওয়ার কথাটা মনে থাকলেও প্রসঙ্গটা আর তোলেননি সরোজ বক্সী।

যা নির্দেশ দেওয়ার গতকাল রাতে দয়াল সান্যাল দিয়ে রেখেছিলেন। আজ আর নতুন করে কোনও কথা হয়নি। শুধু ভোররাতে পুলিশের ভ্যান থেকে নেমে সরোজ বক্সীর কাছে এগিয়ে এসে একটা আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে দম্ভভরে বলেছিলেন, দুটোই ফিনিশ।

এই দুটোই, মানে দু'জন যে কে, সরোজ বক্সীর বুঝতে এক মুহূর্তও অসুবিধে হয়নি। পলাশ আর মহেশ। এর মধ্যে পলাশের নামটা শুনে বুকের ভেতরটা মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠেছিল। কাল পলাশ কলকাতায় এসেছিল। অন্য কোনওখানে নয়, একেবারে দয়াল সান্যালের বসার ঘরে বসে নিখুঁত পরিকল্পনাটা পলাশের সঙ্গে ছকা হয়েছিল। কাজ হয়ে গেলে পলাশকে দু'হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন দয়াল সান্যাল। সরোজ বক্সীর জামার ভেতরের দিকের পকেটে এখনও ঘুমিয়ে আছে কুড়িটা নীল রঙের নোট। মাথার মধ্যে গুনগুন করছে ক্ষীণ একটা আওয়াজ, দুটোই ফিনিশ। পলাশকে কেন মেরে ফেলল ওরা?

পলাশ অবশ্য একটা বিপজ্জনক খেলায় নেমেছিল। হয়তো খেলাটায় এই পরিণতিটাই অবধারিত ছিল। কখনও মালিকের স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিকের অভিনয়, কখনও উদ্বুদ্ধ নকশালের অভিনয়। এই ভারসাম্য বজায় রেখে দয়াল সান্যালের মতো লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাজিমাত করা অসম্ভব কাজ। পলাশ বোধহয় অতটা গভীরভাবে চিনত না দয়াল সান্যালকে।

প্রথম ভুলটা পলাশ করেছিল হরিতলা কটন মিলে নকশাল আন্দোলনের চোরা স্রোত ঢুকিয়ে। আলতা-লেপা পোস্টারে যখন দয়াল সান্যালের মাথার দাবি হরিতলা কটন মিলের পাঁচিলের বাইরে পড়েছিল, দয়াল সান্যাল প্রথমে কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় এরকম অসংখ্য পোস্টারের অনেকগুলোই যে ঠুনকো নয়, নকশালরা বন্দুক দিয়ে তার প্রমাণ রাখছে। দয়াল সান্যাল এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে, হরিতলা কটন মিলে যাতায়াতটাই সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গোটা হরিতলায় কিন্তু আর কোথাও পোস্টার পড়েনি। শুধু মিলের পাঁচিলের গায়ে রাতের অন্ধকারে এসে পোস্টারগুলো দু'বার টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিল নকশালরা। পলাশ বুদ্ধিমানের মতো প্রথমে কাজ করেছিল। নকশালদের একটা অংশের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মিলের একটা লোককেও শামিল না করে দয়াল সান্যালের ওপর শ্রমিকদের ক্ষোভটা ফুটিয়ে তুলেছিল পোস্টারে।

তাই মিলের ভেতর নকশালদের উৎস কোথায় এটা খুঁজতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল সরোজ বক্সীকে। দয়াল সান্যাল যথারীতি কাজটা সঁপেছিলেন সরোজ বক্সীর

ওপর। ভেতরে ভেতরে খোঁজ করতে করতে সন্দেহের তালিকায় যে-ক'টা নাম উঠে এসেছিল, তার মধ্যে পলাশের নামটাও ছিল। কিন্তু এদের কাউকে ধরা সরোজ বক্সীর মনে হয়েছিল কাজটা খালি হাতে সাপ ধরার মতো কঠিন। একটু এদিক-ওদিক হলে নির্ভুল লক্ষ্যে ছোবলটা পড়বে।

কিন্তু ভেতরে আর একটা সমান্তরাল খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ দয়াল সান্যালকে পরামর্শ দিয়েছিল সন্দেহভাজনদের কিছু ছবি দিতে। দয়াল সান্যাল বিভিন্ন সময়ে তোলা সেইসব ছবি জোগাড় করে, বাড়িতে নিজের ড্রয়ারে রেখেছিলেন। আচমকাই সেই ছবিগুলো শিপ্রা দেখে ফেলে চিনে নেয় পলাশকে। এই ছবিগুলো দেখার আগে পর্যন্ত শিপ্রা জানত না, পলাশ হরিতলা কটন মিলে কাজ করে। পলাশ, নকশাল আর হরির ঝিলের পাখি... শিপ্রাও একটা বিপজ্জনক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

এদিকে, যে-দয়াল সান্যাল নকশালদের ভয়ে কুঁকড়ে ছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই সেই দয়াল সান্যাল পলাশকে চিহ্নিত করে শুধু নিজের দিকেই ঘুরিয়ে নেননি, গতকালের রাতের পুরো পরিকল্পনাটা নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। সরোজ বক্সী শুধু কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, পলাশকে কেন মরতে হল। দয়াল সান্যাল তো বলেছিলেন পলাশ হবে শিপ্রার ব্যভিচারের তুরুপের তাস।

কাল রাতে পুলিশ বনোয়ারীলাল আর সরোজ বক্সীর একটা মিষ্টির দোকানে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। হরির ঝিলের ধারে মহেশের বাড়িতে অপারেশনটা ঠিক কখন শুরু আর শেষ হবে কেউ জানত না। একজন পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গে বনোয়ারীলাল সারা রাত গভীর ঘুমোলেও, সরোজ বক্সী দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। কনকনে ঠান্ডা, মশার কামড় ছাপিয়েও মানসপটে একটা যেন সিনেমা চলছিল। মহেশের বাড়িতে কী হচ্ছে।

কথা ছিল পলাশ ঠিক সময়ে বাড়ির বাইরে চলে যাবে। মহেশের আর নকশালদের ঘাড়ে বন্দুক ঠেকিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলবে, শিপ্রা আর বিট্টুকে উদ্ধার করে তোলা হবে জিপে। ভোর রাতে তাই ঝড়ের বেগে পুলিশ ভ্যানটা যখন এসে দাঁড়িয়েছিল, সরোজ বক্সী উদ্‌গ্রীব হয়ে খুঁজেছিলেন জানলার জালের পিছনে মহেশ আর নকশাল ছেলেগুলোকে। তার জায়গায় পুলিশ ভ্যান থেকে খালি পায়ে নেমে এল শিপ্রা আর বিট্টু। আর আত্মপ্রসন্নর হাসি হাসতে হাসতে দয়াল সান্যাল। তারপরেই সেই দুটো শব্দ—'দুটোই ফিনিশ'।

শিপ্রাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বাসে ধর্মতলায় এসে একটু চা খেতে ইচ্ছে হল সরোজ বক্সীর। কাল রাত আটটার পর পেটে একটা দানাও পড়েনি। রাতে মিষ্টির দোকানে পুলিশের লোক ভেবে, ভয়ে ভক্তিতে দোকানওয়ালা শালপাতায় কিছু মিষ্টি খেতে দিয়েছিল। রক্তে চিনি বেসামাল হয়ে যাবে ভেবে সেটা বনোয়ারীলাল আর পুলিশ কনস্টেবলটার মতো সরোজ বক্সী খেতে পারেননি। রাতভরের খিদেটা মেটাতে ধর্মতলায় দুটো শিঙাড়া দিয়ে এক কাপ চা খেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই শরীরটা

পাক দিয়ে গুলিয়ে উঠল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। রাস্তার একধারে গিয়ে হড়হড় করে বমি করে ফেললেন। বমির সঙ্গে শরীরের সবটুকু শক্তি মনে হল নিংড়ে বেরিয়ে গেল। নিজেকে টানার আর একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই। কোনওরকমে ট্রাম লাইনের একধারে এসে মাটিতে বসে পড়লেন। ভোরবেলাতে একজন অসুস্থ প্রৌঢ়কে রাস্তার ধারে এভাবে বসে থাকতে দেখে পথচলতি মানুষরা দৃষ্টিক্ষেপ করে চলে যেতে থাকল। কিন্তু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না কেউ।

বসে বসেই দুটো চেনা নম্বরের ট্রামকে হাত তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন সরোজ বক্সী। কিন্তু রাস্তার মানুষদের মতোই ট্রাম ড্রাইভারও সেই সংকেতের আর্তি বুঝল না। টিংটিং করে ঘন্টা বাজিয়ে চলে গেল ট্রাম দুটো।

সরোজ বক্সী রাস্তা পেরোনোর জন্য আবার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকলেন। কোনওরকমে উঠে দাঁড়ালেন। আর একটা ট্রাম আসছে। ট্রামটা পেরিয়ে গেলেই রাস্তাটা পেরোবেন ঠিক করলেন। আজ শরীরের এই অবস্থায় মনে হচ্ছে একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। সামনে দিয়ে ট্রামটা পেরোনোর সময় ট্রামের ভেতর থেকে একটা ডাক শুনলেন।

'অ্যাই সরোজ।

ট্রামটা কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল। সরোজ বক্সী দেখলেন সেকেন্ড ক্লাস কামরাটার একটা জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে কালো কাচের চশমা পরা একটা লোক ডাকছে। একে কালো চশমা তার ওপর শরীরটা খারাপ, নিজের নামের ডাক শুনেও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন সরোজ বক্সী। তারপর ধীরে ধীরে মানুষটাকে চিনতে পারলেন। যামিনী ভট্টাচার্য। সরোজ বক্সীর প্রতিবেশী।

সরোজ বক্সীকে হতভম্ব হয়ে রোগগ্রস্তর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যামিনী ভট্টাচার্য ট্রামের পাদানি পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। হাতছানি দিয়ে দু'বার সরোজ বক্সীকে ডেকেও কোনও ভাবান্তর না দেখে ট্রামের কনডাক্টরকে দু'মিনিট দাঁড়ানোর অনুরোধ করে নেমে এসে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে সরোজ? দূর থেকে দেখলাম মাটিতে বসে ছিলে। তারপর যখন উঠে দাঁড়ালে পা টলমল করছিল, কী হয়েছে...

ট্রামের কনডাক্টর ট্রাম ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাড়া দিচ্ছিল। যামিনী ভট্টাচার্য অভিভাবকের গলায় বলে উঠলেন, চলো, ট্রামে উঠে পড়ো। শরীর খারাপ, বাড়ি চলো।

সরোজ বক্সী নিশ্চিন্ত হলেন। এই অবস্থায় একজন অন্তত বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোনোর সঙ্গী পাওয়া গেল। সকালে ট্রামটা ফাঁকা হলেও ফার্স্ট ক্লাসের তুলনায় সেকেন্ড ক্লাসে ভিড়টা একটু বেশি। বসার জায়গাগুলো সব ভরতি। যামিনী ভট্টাচার্য সিট ছেড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন বলে ফাঁকা সিটটায় একজন বসে পড়েছিল। যামিনী ভট্টাচার্য আবার সেই জায়গাটাতে এগিয়ে আসতে লোকটা সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ফাঁকা সিটটা দেখিয়ে যামিনী ভট্টাচার্য বললেন, বসো সরোজ।

সরোজ বক্সী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না, না, আমি ঠিক আছি। আপনি বসুন যামিনীদা...

যামিনী ভট্টাচার্য ধমকে উঠলেন, আঃ, যা বলছি শোনো, বসো তুমি।

সরোজ বক্সী সিটের ওপর নিজের শরীরটা এলিয়ে দিলেন। যামিনী ভট্টাচার্য কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এত সকালে কোথায় যাচ্ছিলে, কী হয়েছে?

সরোজ বক্সী সতর্ক হয়ে চারদিকে একবার চোখ বোলালেন। কাল রাতের কথা কিছুই বলা যাবে না। যামিনী ভট্টাচার্য মানুষটা খুব ধার্মিক প্রকৃতির। একটা অন্য রকম শ্রদ্ধাবোধ আছে। লোকটাকে মিথ্যে কথা বললে ভেতরটা একটা পাপবোধে খচখচ করে। সত্যি কথাটা এড়িয়ে গেলেন সরোজ বক্সী।

অফিসের একটা কাজে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ করে মাথাটা ঘুরে গেল।

যামিনী ভট্টাচার্য শুভানুধ্যায়ীর মতো বলে উঠলেন, পঞ্চাশ তো প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছ। এবার সাবধান হও! অফিস অফিস করে দিনরাত এক করা ছাড়ো এবার। তোমার অফিসের কী এত কাজ থাকে হে এত সকালে?

সরোজ বক্সী কথাটা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

সকালে একটু বাবুঘাটে এসেছিলাম। গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যস্তব করলাম।

এবার ভাল করে যামিনী ভট্টাচার্যকে দেখলেন সরোজ বক্সী। সত্তর পার করেও মাথার চুলে একটুও পাক ধরেনি, চুলের ঘনত্ব একটুও কমেনি। এই শীতের সকালেও ভিজে চুলের পরিপাটি বিন্যাস দেখে কোথায় যেন ভেতরে একটা শান্তির ছোঁয়া পেলেন। বয়স্ক মানুষটা ঋজু হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পবিত্রতার একটা পরশ ছড়াচ্ছেন। অদৃশ্য সেই পরশে ভেতরকার গ্লানির বহিস্পর্শগুলো যেন একটু একটু করে প্রশমিত হচ্ছে। সরোজ বক্সীর ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে হতে লাগল মানুষটার পা-টা স্পর্শ করে মাথা নিচু করে স্বীকারোক্তি করতে যে, কাল রাতে দুটো তাজা প্রাণের শেষ হওয়ার কারিগর অজ্ঞাতে কী করে হয়ে গেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে মনে অন্য একটা প্রশ্ন জন্ম নিল। সরোজ বক্সী, যামিনী ভট্টাচার্য শোভাবাজারের কাছে যে-বাড়িটায় ভাড়া থাকেন, তার পিছনেই তো গঙ্গা। যামিনী ভট্টাচার্য বারো মাস কাকভোর থেকে সেই গঙ্গার ধারে অপেক্ষা করেন সূর্যকে আবাহন করার জন্য। বাবুঘাটে এই কাজটা করার জন্য যান না। কাল রাতে কি সরোজ বক্সীর মতো যামিনী ভট্টাচার্যেরও কিছু গোপনীয়তা আছে?

যামিনী ভট্টাচার্যর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটাই অস্বস্তি হতে থাকল সরোজ বক্সীর। বিশেষ করে কালো কাচের রহস্যময় চশমাটা। জিনিসটা অস্বাভাবিক। এটা কখনও যামিনী ভট্টাচার্যর চোখে দেখেননি, তাও আবার এই সাতসকালে।

পিছন দিকে একটা সিট খালি হয়েছিল। যে লোকটা বসে ছিল ওঠার সময় যামিনী ভট্টাচার্যকে বসার জন্য জায়গাটা দেখিয়ে দিল। চলন্ত ট্রামে আবার কিছুক্ষণের জন্য একলা হয়ে গেলেন সরোজ বক্সী। ওয়েলিংটনের বাঁকটা ঘোরার পর ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়লেন।

যামিনী ভট্টাচার্য একটা সময়ে সরোজ বক্সীকে ঝাঁকিয়ে তুললেন।

সরোজ, হাতিবাগান চলে এসেছে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন সরোজ বক্সী। শরীরটা এখন কিছুটা সুস্থ মনে হচ্ছে। যামিনী ভট্টাচার্যর সঙ্গে হাতিবাগানের মোড়ে নেমে পড়লেন। নামার পর খেয়াল হল যামিনী

ভট্টাচার্যের বাড়ি তো শোভাবাজারে, তা হলে চিৎপুরের ট্রাম ছেড়ে হাতিবাগানের দিকে ট্রাম কেন ধরেছিলেন?

চলো, একবার বিপুল ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবে চলো। ছোকরার মাথাটা ভাল। নাড়ি ধরে রোগ বলে দেয় বিধান রায়ের মতো।

সরোজ বক্সী রাজি হলেন না।

না যামিনীদা, এখন শরীরটা ঠিক লাগছে। বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।

যামিনী ভট্টাচার্য এক মুহূর্ত কী চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, চলো তা হলে, বাড়ির দিকেই চলো।

আপনি এদিকে কোনও কাজে আসছিলেন? সেরে নিন না কাজটা। আমি ঠিক চলে যেতে পারব।

কাজ? না, সেরকম কিছু কাজ নয়। ভেবেছিলাম চোখটা একটু দেখিয়ে যাব।

সরোজ বক্সীর আবার খেয়াল হল যামিনী ভট্টাচার্য একটা কালো চশমা পরে আছেন। কারণটা এবার জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে আপনার চোখে?

জয় বাংলা। চোখ উঠেছে।

একটা যেন রহস্যর উন্মোচন হল। অল্প হেসে ফেললেন সরোজ বক্সী।

আপনি এই চোখ নিয়ে ভোরবেলায় বাবুঘাটে গঙ্গাচান করে এলেন?

যামিনী ভট্টাচার্য কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, কেন? কী হবে?

চোখটার আরও বারোটা বাজবে।

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন যামিনী ভট্টাচার্য।

চোখের বারোটা বেজে গেছে সরোজ। এই চোখ দিয়ে চারিদিকে যা দেখছি তাতে চোখের বারোটা অনেকদিনই বেজে গেছে।

গ্রে স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যামিনী ভট্টাচার্য দার্শনিকের মতো বলতে শুরু করলেন, সকালে কেন বাবুঘাটে গিয়েছিলাম জানো?

উত্তরটা সরোজ বক্সীর জানা নেই। চুপ করে থাকলেন। তবে যামিনী ভট্টাচার্য উদাস গলায় বললেন, আকাশটা যখন সবে ফরসা হচ্ছে রোজকার মতো গঙ্গার ঘাটে গিয়েছিলাম। তুমি তো জানো রোজ ওই সময়ে স্তব করতে আমি যাই। অল্প আলোয় দেখলাম একটু দূরে পাড়ে একটা লাশ এসে কাদায় গেঁথে আছে। কাদা ভেঙে আমি লাশটার কাছে এগিয়ে গেলাম। পচে ফুলে উঠেছে। দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি কী করলাম জানো? এই কালো চশমাটা পরে নিলাম। অথচ দেখো, ওই যে লাশটা, ওটা তো কয়েকদিন আগেও একটা জীবন্ত মানুষ ছিল। তার অনেকগুলো সম্পর্ক তো বেঁচে আছে। ছেলে, বাবা, স্বামী, বন্ধু কত কিছু? তারা হয়তো এখনও মানুষটার ফেরার পথ চেয়ে বসে আছে।

সরোজ বক্সীর ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিটা বাড়তে থাকল। একটা শুকনো ঢোঁক গিলে বললেন, আপনি কী করতে পারতেন যামিনীদা?

কী করতে পারতাম? যামিনী ভট্টাচার্য উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, আমি লোকটার পরিচয় জানতে পারতাম।

কী করে পারতেন যামিনীদা? একটা পচে যাওয়া বেওয়ারিশ লাশ...

যামিনী ভট্টাচার্য আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, পৃথিবীতে বেওয়ারিশ বলে কিছু হয় না সরোজ, সবাই ঈশ্বরের সন্তান। এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর আমি কি কিছু চেষ্টা করেছিলাম সরোজ? খরগোশের চোখ বন্ধ করার মতো কালো চশমাটা পরে পালিয়ে বাবুঘাটে চলে গিয়েছিলাম আমার নিত্য কর্তব্য করতে। ঈশ্বর কি আজ আমার স্তব নিলেন? আমি জানি সরোজ, ঈশ্বর আজকে আমার স্তব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হাঁটতে হাঁটতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড় চলে এসেছিল। যামিনী ভট্টাচার্য সরোজ বক্সীকে জিজ্ঞেস করলেন, এবার তুমি বাড়ি চলে যেতে পারবে তো?

সরোজ বক্সীর ইচ্ছে করছিল না তাঁকে ছেড়ে যেতে। খানিকটা আকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন যামিনীদা?

যামিনী ভট্টাচার্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাই গঙ্গার ঘাটটায় আর একবার ঘুরে আসি।

চলুন আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

যামিনী ভট্টাচার্য একটু অবাক হলেন, তুমি? তোমার শরীরটা তো ভাল নেই। বেলা বাড়ছে, রোদ চড়ছে।

সরোজ বক্সী একটু জেদই ধরলেন, না, এখন ঠিকই আছে। চলুন। মনটা বড় অশান্ত হয়ে আছে।

যামিনী ভট্টাচার্য আর কোনও বাধা দিলেন না।

চলো তা হলে।

শেষ পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে ওরা গঙ্গার ঘাটটা পেরিয়ে সেই জায়গাটায় চলে এলেন, যেখানে ভোরের আলো ফোটার আগে পাড়ের প্যাচপ্যাচে কাদায় একটা লাশকে গেঁথে থাকতে দেখেছিলেন যামিনী ভট্টাচার্য। এখন অবশ্য সেই লাশটা আর নেই। গঙ্গার ধারে এই জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। গঙ্গায় মাঝে মাঝে লাশ ভেসে আসা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। তাই চাঞ্চল্যও নেই।

একটু ছাওয়া দেখে দু'জনে গঙ্গার দিকে মুখ করে বসলেন। সামনে শান্তভাবে বয়ে চলেছে গঙ্গা। কাল রাতে নিজের চোখে না দেখা ঘটনাগুলো অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সরোজ বক্সীর চোখের সামনে সিনেমার মতো আবার ভাসতে শুরু করল। কানের কাছে বারবার বাজছে দয়াল সান্যালের কথাটা, 'দুটোই ফিনিশ'।

এই অব্যক্ত যন্ত্রণাটা ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছে। ঈশ্বর যামিনী ভট্টাচার্যকে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে চাপিয়ে ধর্মতলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সরোজ বক্সীকে উদ্ধার করতে। সেই ঈশ্বরই হয়তো আবার সরোজ বক্সীকে যামিনী ভট্টাচার্যর সঙ্গে গঙ্গার ধারে পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বীকারোক্তিটুকু করার জন্য। নিজের সমস্ত জড়তা আর দ্বন্দ্ব

কাটিয়ে শেষপর্যন্ত সরোজ বক্সী বলে উঠলেন, আমি দুটো খুনের শরিক হয়ে গেছি যামিনীদা।

কথাটা বলে যামিনী ভট্টাচার্যর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন সরোজ বক্সী। কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য। যামিনী ভট্টাচার্য কিন্তু চমকালেন না। কালো কাচ ভেদ করে চোখের প্রতিক্রিয়াও বোঝা গেল না। তিনি চুপ করে থাকলেন।

এ পাপের বোঝা বাকি জীবনে কীভাবে বইতে পারব, জানি না।

সরোজ বক্সী বিলাপের মতো খাপছাড়া খাপছাড়া করে বলে যেতে লাগলেন দয়াল সান্যাল, শিপ্রা সান্যাল, পলাশ সেন, মহেশ, হরিতলা, এসিপি রায়ের কথা।

যামিনী ভট্টাচার্য যেন শুনেও শুনছিলেন না। একসময় চোখ থেকে খুলে ফেললেন কালো চশমাটা। দুটো চোখই টকটকে লাল হয়ে আছে। সরোজ বক্সী সেই রক্তচক্ষুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি জানি আপনি এসব কথা আর কাউকে বলবেন না যামিনীদা।

যামিনী ভট্টাচার্য গঙ্গার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, তুমি আমাকে তো কিছু বলোনি সরোজ। তুমি স্রোতস্বিনীকে বলেছ। তোমার কথাগুলো সব সাগরে চলে গেছে।

কিন্তু পাপটা যে ভেতরেই রয়ে গেল যামিনীদা।

যামিনী ভট্টাচার্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥—মানুষ পাপ করতে ইচ্ছা না করলে, কে তাকে বলপূর্বক পাপ করায়?

সরোজ বক্সী অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যামিনীদা?

না, শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনিচ্ছায় পাপে মগ্ন হয় কোন জন?

সরোজ বক্সী আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী উত্তর দিয়েছিলেন ভগবান কৃষ্ণ?

এবার আর সংস্কৃত শ্লোক না আওড়ে ছড়া কাটতে থাকলেন যামিনী ভট্টাচার্য—

দুষ্পূর ও অতি উগ্র জ্ঞান হয় জ্ঞাত।
রজোগুণে হয় তারা ক্রোধে পরিণত ॥
মোক্ষ পথে কামে শত্রুরূপেতে জানিবে।
হে অর্জুন! মম বাক্যে বিশ্বাস রাখিবে ॥

ছন্দ তুলে ছড়াটা বলে যামিনী ভট্টাচার্য যেন ধীরে ধীরে কোমল হলেন। সরোজ বক্সীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুমি নিজেকে একটা প্রশ্ন করো সরোজ, তোমার পাপবোধটা তোমার আত্মার কাছে না তুমি খুব ভয় পেয়ে আছ?

সরোজ বক্সী দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে বললেন, জানি না।

তুমি এবার বাড়ি যাও।

সরোজ বক্সী মুখের ওপর থেকে হাতটা না সরিয়ে বললেন, ঠিকই, যামিনীদা ঠিকই। কাম মানুষের বুদ্ধি বিলোপ করে। বেশ তো ছিল জীবনটা। কেন যে সাতচল্লিশে পৌঁছে বিয়ে করলাম, আটচল্লিশে বাপ হলাম। আমার কিছু হয়ে গেলে অতসী আড়াই বছরের মেয়েটাকে মানুষ করবে কী করে?

যামিনী ভট্টাচার্যের মুখে এক চিলতে হাসি ফুটল, তুমি ভয়ই পেয়ে আছ সরোজ। যে-পাপের কথা তুমি বলছ, তোমার আত্মা এখনও তার জবাবদিহি চাইছে। 'আত্মানাং বিদ্ধি', নিজেকে চেনো সরোজ। চলো ওঠো বাড়ি যাও।

সরোজ বক্সী তবুও যেন ওঠার ভরসা পেলেন না। উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠলেন, কী যে হবে যামিনীদা, অনেক মূল্য চোকাতে হবে...

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে যামিনী ভট্টাচার্য এবার উদাত্ত গলায় বলে উঠলেন, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ, নিজের বুদ্ধি দিয়েই নিজেকে উদ্ধার করো সরোজ আর আত্মাকে কখনও অধঃপতিত কোরো না। সূর্যর দিকে তাকাও। দু'চোখ মেলে তাকাও। বলো ওঁ জবাকুসুম...

যামিনী ভট্টাচার্যের লাল চোখ দুটোর থেকে মুখটা ঘুরিয়ে সূর্যর দিকে তাকালেন সরোজ বক্সী। বেলা বেড়েছে। এখন আর খালি চোখে সূর্যর দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। মনে হল একরাশ আগুন চোখ দুটোকে ঝলসে দিল।

একরকম জোর করেই যামিনী ভট্টাচার্য এবার সরোজ বক্সীকে বাড়ির দিকে ঠেলে পাঠালেন। গঙ্গার ঘাট থেকে একটা ছোট গলি দিয়ে এসে চিৎপুর রোডের ট্রাম লাইনের ওপর এসে পড়লেন সরোজ বক্সী। তারপর আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলেন এক সময়কার এক মহারাজার বিশাল বাড়িটায়। যার তিনতলায় দেড়খানা ঘর নিয়ে সরোজ বক্সীর সংসার।

রাতে অফিসের কাজে বাইরে কাটানোটা সরোজের ক্ষেত্রে একেবারে ব্যতিক্রম নয়। অতসী জানে মাঝে মাঝে স্বামীকে অফিসের কাজে হরিতলায় গিয়ে রাত কাটাতে হয়, তবে আজ মানুষটাকে দেখে চমকে উঠল অতসী। ভূতগ্রস্ত চেহারা। এতক্ষণ ফিরে না আসাতে একটা চিন্তা হচ্ছিল। তার কারণ, এই একটু আগেই স্বামীর অফিসের বড়সাহেব দয়াল সান্যাল একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। ছেলেটা বার্তাবাহক হয়ে এসে বলে গেছে, 'সরোজদা বাড়ি ফিরেই যেন অফিসে চলে আসেন। বড়সাহেব হুকুম দিয়েছেন।'

স্বামীর মুখে যতটুকু শোনে, আর নিজের বুদ্ধিতে যতটুকু বোঝে তাতে অতসী জানে মানুষটার প্রতিটা পদক্ষেপ, প্রতিটা শ্বাস তার অফিসের বড়সাহেব মেপে ঠিক করে দেন। সেই বড়সাহেব সকালে বাড়িতে ছেলে পাঠিয়ে হুকুম জানিয়েছেন অনতিবিলম্বে যাতে সরোজ বক্সী অফিস আসে। তা হলে কি বড়সাহেব জানে না রাতে কোথায় ছিল ও?

দুশ্চিন্তা কপালে ভাঁজ ফেলেছিল। কোনও বিপদ-আপদ হয়নি তো? ভূতগ্রস্ত চেহারাটা দেখে সেই ভাঁজগুলো আরও ঘনও হল। মানুষটা বাড়িতে কম কথা বলেন। বাড়ি ফিরেই খাটে ছোট্ট ঘুমন্ত মেয়েটার পাশে শরীরটা এলিয়ে উদাস হয়ে কড়িবরগার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কী হল তোমার? শরীর ঠিক আছে? জলের গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল অতসী।

সরোজ বক্সী ম্লান হাসলেন। ইশারায় বোঝানোর চেষ্টা করলেন শরীর ভাল আছে।

অফিস থেকে যে লোক এসেছিল সরোজ বক্সীকে অনতিবিলম্বে খুব জরুরি প্রয়োজনে অফিস যেতে বলার জন্য—এই তথ্যটা চেপে গেল অতসী। মানুষটা অফিসের ব্যাপারে যা কর্তব্যপরায়ণ এখনই হয়তো সব ছেড়েছুড়ে সকালের খাওয়া ভুলে দৌড়োবেন অফিসে। অতসী একসময় দেখল উদাস হয়ে কড়িবরগার দিকে তাকানো ছেড়ে পরম যত্নে ঘুমন্ত মেয়ের মাথায় হালকা করে হাত বোলাতে থাকলেন। গলায় খুশি ঢেলে অতসী বলল, রোজ ঘুম থেকে উঠে দেখে তুমি অফিসে বেরিয়ে গেছ, আজ উঠে দেখবে তুমি পাশে। কী যে খুশি হবে!

মেয়ের কপালের ওপর হাতটা আচমকা থেমে গেল সরোজ বক্সীর। মুখ তুলে নির্বাক হয়ে অতসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। অতসী স্বামীকে খুশি করতে বলতে থাকল, বাপ সোহাগি মেয়ে তোমার। অবশ্য মেয়েরা বাপ সোহাগিই হয়।

সরোজ বক্সীর মুখটা ফ্যাকাশে হতে থাকল। পলাশের মেয়েটা তো বীথিরই বয়সি। সেও কি বাপ সোহাগি? সেও কি কচি হাত দিয়ে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরতে পারলে পৃথিবীতে আর কিছু চায় না? এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে জামা গেঞ্জি খুলে খাটের ওপর ফেলে বাথরুমে ঢুকে মগের পর মগ ঠান্ডা জল ঢালতে থাকলেন গায়ে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলেন অতসী যত্ন করে জলখাবার সাজিয়ে বসে আছে। সরোজ বক্সী সবে খেতে বসতে যাবেন এমন সময় অতসী একগোছা টাকা দেখিয়ে বলল, তোমার জামার পকেটে ছিল...

সরোজ বক্সী প্রায় চিৎকার করে উঠে ছোঁ মেরে টাকাগুলো অতসীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বললেন, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না... ও টাকা ছুঁয়ো না...

বাবার চিৎকারে জেগে গিয়ে কেঁদে উঠল বীথি। অতসী নতুন করে আবার হতভম্ব হয়ে পড়ল। স্বামীর এরকম ব্যবহার আগে কখনও দেখেনি।

৫

দয়াল সান্যাল সেদিন অত ভোরে লালবাজারে কেন গিয়েছিলেন সেটা দিন তিনেক পরে খানিকটা স্পষ্ট হল শিপ্রার কাছে। দাম্পত্যে ফাটলটা অনেকদিন আগেই ধরেছিল। এই ঘটনার পর এক ছাদের তলায় থেকেও দু'জনের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান হয়ে গেছে। নিজের ঘরটাকে শিপ্রা পাকাপাকিভাবে তুলে আনল বিট্টুর ঘরে। দয়াল সান্যালের সঙ্গে বাক্যালাপ পুরোপুরি বন্ধ। শিপ্রা মনে মনে অনেক রকম প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল দয়াল সান্যালের কাছ থেকে, কিন্তু লোকটা অন্য যে-কোনও প্রসঙ্গের মতো এই প্রসঙ্গে একটা কথাও বলেনি। তবে দয়াল সান্যালের ঘোড়ার আড়াই চালটার আন্দাজ শিপ্রা পেল, দিন তিনেক পরে।

বেলা এগারোটা নাগাদ বাড়ির বয়স্ক পুরনো চাকর হরিহর শিপ্রার ঘরে এসে বলল, মেমসাহেব, দু'জন দেখা করতে এসেছে আপনার সঙ্গে। ড্রয়িংরুমে বসে আছে।

শিপ্রার এই ক'দিন মনমেজাজ একদম ভাল নেই। মহেশ, পলাশ—কী হল ওদের, কোনও খোঁজ পায়নি। সেদিন যে লাশটাকে দেখেছিল, মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করার চেষ্টা করেছে যে, সেটা মহেশ অথবা পলাশের নয়। বাড়ির টেলিফোনটা কী যেন এক কায়দায় সারাদিন ডেড করে রাখেন দয়াল সান্যাল। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাই কোনও যোগাযোগ নেই। একমাত্র উপায় নিজে বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে খোঁজখবর করা। কিন্তু বিট্টুর জন্য বাড়িছাড়া হতে পারে না শিপ্রা। সেই রাতের আতঙ্কটা এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারেনি ছেলেটা। মাকে ছেড়ে একা একা থাকতে ভীষণ ভয় পায়।

দুটো লোক দেখা করতে এসেছে শুনে প্রথমেই বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল। মহেশদা আর পলাশ নয় তো! কিন্তু পরক্ষণেই রক্তটা নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। হরিহর পুরনো কাজের লোক। মহেশের বহু দিন ধরে যাতায়াত ছিল এ-বাড়িতে। হরিহর পলাশকে না চিনলেও মহেশকে চেনে। বলত মহেশের নামটা। তা হলে কারা দেখা করতে এল? হরিহর শিপ্রার চিন্তিত মুখটা দেখে বলল, মেমসাহেব, ওরা পুলিশের লোক।

কয়েক মুহূর্তের জন্য শিপ্রার শরীরটা কেমন যেন আলগা অবশ হয়ে গেল। মুখ শুকনো করে কাঁপা গলায় হরিহরকে বলল, তুমি ওদের জল দাও। আমি একটু পরে আসছি।

কিন্তু ভেতরের ছটফটানিতে শিপ্রা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারল না। নীচের তলায় বৈঠকখানায় নেমে এল। প্রায় একই সঙ্গে হরিহর একটা ট্রে করে দু'গ্লাস জল এনে সেন্টার টেবিলে রাখল। দু'জন পুলিশ অফিসার গম্ভীর হয়ে সোফায় বসে আছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে দু'জনের একজন উর্ধ্বতন আর একজন অধস্তন। উর্ধ্বতন যিনি, তিনি হাত বাড়িয়ে একটা জলের গ্লাস তুলে নিলেন।

আমি এসিপি শান্তনু রায় আর ও ইন্‌সপেক্টর সিনহা। সিনহাকে তো বোধহয় আপনি চেনেন।

এসিপি রায় তার সঙ্গী অফিসারকে দেখালেন। প্রথম ঝলকে শিপ্রা অতটা খেয়াল করেনি। এবার একটু ভাল করে চেনার চেষ্টা করল। এই অফিসারই সেদিন রাতে শিপ্রার হাত ধরে টেনে মহেশের বাড়ির বাইরে নিয়ে এসেছিল। অন্য হাতে ছিল খোলা পিস্তল। ঘটনার পরে ওদের ভ্যানের আগের জিপে ছিল। তবে সেদিন ছিল সাদা পোশাকে, আজ ইউনিফর্মে। মাথার টুপিটার জন্য সহজে চিনে নেওয়া যাচ্ছে না। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরটা উথলিয়ে উঠল মহেশদা আর পলাশের খবর জানার জন্য। শিপ্রা ইন্‌সপেক্টর সিনহার দিকে চেয়ে বলল, চিনতে পারছি। আপনিই তো সেদিন...

এসিপি রায় শিপ্রার গলাকে ছাপিয়ে গেলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন সিনহা আগাগোড়া ছিল আপনাদের সঙ্গে। হি ডিড আ মার্ভেলাস জব। আমাদের সাইডে একজনও উন্ডেডও হয়নি অথচ ওদের সব ক'টাকে নামিয়ে দিয়েছে। ভীষণ রিস্কি ছিল কাজটা। ভাবুন তো একবার! ওই অন্ধকারে একেবারে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি ছোড়া! ওই অতটুকু চালচুলোহীন একটা ঘর। তার ওপর অন্ধকার। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আপনার ছেলেও ছিল।

ভাবুন তো একবার কী হত, যদি একটা গুলি ফসকে গিয়ে এফোঁড়ওফোঁড় করে দিত আপনাদের? ইউ মাস্ট থ্যাঙ্ক সিনহা।

বিট্টুর কচি মুখটা মনে পড়তেই শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করল শিপ্রা। এত বড় একটা বিপদের মধ্যে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল! ইন্‌সপেক্টর সিনহা একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, আপনি কেন এটা করলেন মিসেস সান্যাল?

শিপ্রা চুপ করে থাকল। এসিপি রায় সোফায় পিঠটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, ও.কে। টেক ইয়োর টাইম। আপনার যতক্ষণ ইচ্ছে সময় নিন। ইনফ্যাক্ট আমরা পরশুই আসতাম। কিন্তু আপনাকে সময় দিয়েছিলাম। শরীর আর মনের ওপর এত বড় একটা ধকল গেছে আপনার। সেটা ভেবেই আটচল্লিশ ঘণ্টা আরও সময় দিলাম আপনাকে। পরশুর জায়গায় আজকে এলাম। অবশ্য এই ফেভারটা আপনি পেলেন মিসেস সান্যাল হিসেবে...

সব দ্বিধা ফেলে দিয়ে শিপ্রা এবার চোয়াল শক্ত করল, মহেশদা আর পলাশ কোথায়?

এসিপি রায় মাথার টুপিটা খুলে চুলে আঙুল চালালেন, ম্যাডাম, আমরা কিন্তু এসেছিলাম কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে, জবাব দিতে নয়। যে-কথাটা আপনাকে বলছিলাম, এই ফেভারটা আপনি পাচ্ছেন দয়াল সান্যালের স্ত্রী হিসাবে। না হলে হয়তো সেদিন রাতেই আপনাকে অ্যারেস্ট করা হত।

শিপ্রা এবার রেগে উঠল, করুন, অ্যারেস্ট করুন আমাকে। বারবার বলছেন কেন দয়াল সান্যালের বউ হিসাবে আমাকে ফেভার করছেন? আমার এগেনস্টে চার্জ থাকলে জেলে পুরে দিন আমাকে।

এসিপি রায় ঠান্ডা গলায় বললেন, এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন কেন ম্যাডাম? এই যে জেল, লক-আপ—এই জিনিসগুলো সিনেমায় যেমন দেখেন, বাস্তবে জায়গাটা কতটা ভয়ংকর কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনার এই সুন্দর চেহারাটায়... থাক গে খারাপ কথা বলব না। তবে পুলিশ বলে আমাদের অত ভয় করার কিছু নেই। আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। লেট আস ডিসকাস। শুভানন মিত্রকে আপনি কতদিন চেনেন?

কে শুভানন মিত্র? কোনও শুভানন মিত্রকে আমি চিনি না। কোনওদিন নাম পর্যন্ত শুনিনি।

যাঃ বাবা! আপনি তো মুশকিলে ফেলছেন ম্যাডাম। এরপর হয়তো বলবেন চারু মজুমদার, কানু সান্যালের নামও শোনেননি। শুভানন মিত্র কি তা হলে এমনি এমনি ম্যাডাম বারুইপুর থেকে হরিতলা গেল সিনহার গুলি খেয়ে বেঘোরে মরতে!

শিপ্রা ইন্‌সপেক্টর সিনহার দিকে তাকাল, আপনি মহেশদা আর পলাশকেও গুলি করে মেরে দিয়েছেন, তাই না?

ইন্‌সপেক্টর সিনহা গম্ভীর হয়ে গেলেন, গুলি আমরা চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম, ওদের কাছেও রিভলভার ছিল। আমরা গুলি চালাতে না পারলে ওরা চালাত। আমরা মরতাম। আমাদের তাও একটা দায়িত্ব ছিল। আপনাকে আর আপনার ছেলেকে রক্ষা করা। ওরা কিন্তু বেপরোয়া। ওদের কোনও দায়িত্ব ছিল না। এত সব চিন্তা করত না।

শিপ্রা নিজের উত্তেজনাটা কমাতে পারল না। আপনি জানেন, পলাশের একটা ছোট মেয়ে আছে। বয়স্ক বাবা-মা আছে। ওদের কী হবে একবারও ভেবে দেখেছেন?

এসিপি রায় এবার গলাটা আরও চড়ালেন, সিনহারও একটা ছোট ছেলে আছে। বিধবা মা আছে, বউ আছে। সিনহার কিছু হয়ে গেলে কী হত সেটা আপনি চিন্তা করে দেখেছেন?

তা বলে পলাশকে আপনারা গুলি করে দেবেন?

এসিপি রায় গলাটাকে বরফঠান্ডা করে বললেন, পলাশ সেনকে আপনি অনেক আগে নিজেই গুলি করে দিয়েছিলেন ম্যাডাম। যখন ঠিক করেছিলেন পলাশ সেনের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে নতুন জীবন খুঁজবেন, তখন কি একবারও ভেবেছিলেন কী হবে পলাশের ছোট্ট মেয়েটার, বউটার, অথর্ব বিধবা মায়ের?

এসিপি রায়ের কথা শুনে চমকে উঠল শিপ্রা। সেদিন রাতে হয়তো আবেগে পলাশের বুকে মুখ গুঁজে বলেছিল, আমাকে নিয়ে চল পলাশ। কিন্তু পলাশের সংসার নষ্ট করে কখনওই পলাশের জীবনে নতুন করে সে আসত না। পলাশের সাহায্য নিয়ে দয়াল সান্যালের নাগালের বাইরে একটা আশ্রয় খুঁজত। দু'একর জমি আর বাংলোটা নিজের কোম্পানির জিম্মায় নিতে দয়াল সান্যাল একটার পর একটা দলিল বানিয়ে নানারকম চাপ দিচ্ছে। শিপ্রা চেয়েছিল দয়াল সান্যালের আগ্রাসী লোভটা ছেঁটে দিতে। মহেশদা আর পলাশই ছিল একমাত্র সম্বল। নকশালদের ভয় ছিল একমাত্র অস্ত্র। খুব গোপনে পলাশের সঙ্গে দু'বার ফোনে যোগাযোগ হয়েছিল। ছকে নিয়েছিল হরিতলার ঘটনাটা। পলাশই বুদ্ধি দিয়েছিল নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দয়াল সান্যালকে ভয় দেখানোর। সেই কাজটা কিছুদিন একটা গোপন আস্তানায় থেকে করবে। আবেগের জোয়ারে এই খেলাটার পরিণতি কত ভয়ংকর হতে পারে, তলিয়েই দেখেনি। নিজের ভুলটা এখন বুঝতে পারছে শিপ্রা। আবেগ ওকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তবে এখন এই দু'জন পুলিশের সামনে আবেগটা আস্তে আস্তে গলে যেতে যেতে একটা নতুন প্রশ্ন মাথায় জন্ম নিল। পুলিশরা কী করে জানল পলাশের সঙ্গে ওর কী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছিল? বিস্ময়ে প্রশ্নটা করেই ফেলল শিপ্রা। আপনারা কী করে জানলেন?

এসিপি রায় একটা চওড়া হাসলেন, এতক্ষণে আপনি একটা ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন করেছেন ম্যাডাম। আমরা কী করে জানলাম! উত্তরটা আপনাকে দিতে পারি, তবে শুনতে আপনার একটুও ভাল লাগবে না।

হরিহর চা নিয়ে এসেছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে ইন্‌সপেক্টর সিনহা বললেন, দারুণ ফ্লেভার ম্যাডাম। আপনি যে চায়ের দেশে পড়াশুনো করেছেন চা খেয়েই তা বোঝা যাচ্ছে। যাক গে ম্যাডাম, আবার একটু কাজের কথায় ফিরে আসি। সেদিন রাতে শুভাননের সঙ্গে বিপ্রতীপেরও আসার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসেনি। ব্যাটা কোন ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে আছে এখন বলুন তো? উত্তরবঙ্গে? আমাদের কাছে সেরকম একটা খবর ছিল।

বিশ্বাস করুন, আপনারা কোন শুভানন, বিপ্রতীপের কথা বলছেন আমি কিছুই

বুঝতে পারছি না। পলাশই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি নাম পর্যন্ত জানি না। ওরা নিজেদের মধ্যেও নিজেদের নাম বলে না, শুধু কমরেড বলে।

আপনি বুঝতে পারছেন না ম্যাডাম, আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। বললাম না, আমরা আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী! সেটা একটাই কারণে। মিস্টার সান্যাল আমার ভাল বন্ধু বলে। কিন্তু সবটা তো আমার হাতে নেই। আমার ওপরওয়ালা আছেন। শুভাননদের ফ্র্যাকশনটা মোস্ট ডেঞ্জারাস। আপনার সঙ্গে ওদের যে কানেকশন ছিল বা বরং বলা ভাল আছে, সেটা কিন্তু আমি বেশি ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারব না। আর একবার যদি আইনের হাতে পড়ে যান—ওই যে বললাম না, জেল লক-আপগুলো ঠিক সিনেমার মতো বাস্তবে হয় না ম্যাডাম। আপনি ওদের পাঁচ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন—এই খবরটা কিন্তু লালবাজারে রেকর্ডেড।

এবারও চমকে উঠে শিপ্রা দ্রুত নিজেকে সামলে ফেলে চুপ করে রইল। শিপ্রার প্রতিটি চমক অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে মেপে পরের বক্তব্যটা গুছিয়ে বলছেন এসিপি রায়।

ঠিক আছে। ভেবেছিলাম আপনাকে বলব না, এখন মনে হচ্ছে বলেই দিই। বারবার আপনি যখন জিজ্ঞেস করব-করব করেও করতে পারছেন না। তার আগে বলুন তো, আপনার কী মনে হয় আমরা কীভাবে সব খবর জোগাড় করি?

শিপ্রা দু'দিকে মাথা নাড়ল। পুলিশের খবর জোগাড় করার পদ্ধতি তার সত্যিই জানা নেই। তবে খবরগুলো যে একদম ঠিকঠাক জোগাড় করে সেটা দেখতে পাচ্ছে।

সোর্স ম্যাডাম, সোর্স। আমাদের অথেনটিক সোর্স থাকে। এক্ষেত্রে আমাদের সোর্স ছিল পলাশ সেন নিজে।

পলাশ? হতেই পারে না! বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল শিপ্রা।

এসিপি রায় শিপ্রার দিকে ঝুঁকে এগিয়ে এলেন। মুচকি হেসে বললেন, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কুয়োর ব্যাঙের মতো দুনিয়াটা দেখবেন না। খোলা চোখে দেখুন। একবার ভেবে দেখুন তো ম্যাডাম, যে-কথাগুলো, যে-তথ্যগুলো আপনাকে দিলাম সেটা পলাশ ছাড়া আর কারও পক্ষে আমাদের দেওয়া সম্ভব ছিল কিনা? শুধু তাই নয়, কখন ওদের অ্যাটাক করব সেটাও পলাশের সঙ্গে ঠিক করা হয়েছিল। রাতে ওদের ডিনার দেওয়া হবে। ডিনারের সময় ওরা একটু আলগা থাকবে। পলাশ আপনাকে ভেতরের ঘরে পাঠিয়ে দেবে...

শিপ্রা চোখ বন্ধ করে ফেলল। সিনেমার ফ্ল্যাশ-ব্যাকের মতো পলাশের এক-একটা পরিকল্পনা দেখতে পাচ্ছে। পলাশ বলেছিল কয়েকদিনের জন্য লুকিয়ে থাকার পক্ষে মহেশের বাড়িটাই আদর্শ জায়গা, কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না। কিন্তু পলাশ নিজে দেখা করতে এসেছিল তিনদিন পরে যেদিন ওদের সঙ্গে মিটিংটা ঠিক হল। পলাশ বলেছিল ওরা মহেশের বাড়ির মতো নির্জন কোনও জায়গায় দেখা করতে পারে, পলাশ বলেছিল ওরা রাতে খাবে। পলাশ ওদের খাওয়ার আগে বলেছিল বিট্টুকে নিয়ে ভেতরের ঘরে যেতে। পলাশ চেয়েছিল ওদের খাওয়ার সময় শিপ্রার কাছে থাকতে... ছবির মতো সব বুঝতে পেরেও যেন মন মানছে না। নিজের অবুঝ মনের যুক্তি খুঁজতে

শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, পলাশ যদি আপনাদের সোর্সই হবে, তা হলে ওকে গুলি করলেন কেন?

আনফরচুনেট। ভেরি আনফরচুনেট। নিজে ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়ে গেল। বিধাতার বিচারে বোধহয় এরকমই হয় ম্যাডাম। ডবল ক্রসেরা এরকম ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়ে যায়। তবে সেই রাতে সিনহার গুলি খেয়ে বেঁচে গেলেও এরপর পলাশ বেশি দিন আর বাঁচত না। আপনার মহেশদাদাও নয়। বেইমানি করার জন্য ওর রাজনৈতিক দাদারাই ওদের খুন করে দিত। সেই বেইমানির বিপদের খাঁড়াটা আজ আপনার ওপরেও ঝুলছে ম্যাডাম।

শিপ্রা ভেতরে আত্মবিশ্বাসের যে-ঠাস বুনটটা বুনেছিল সেটা ঝুরঝুর করে ভাঙতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে পুরনো ভয়-ভয় ভাবটা মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করল। সাতপাঁচ না ভেবেই বিরাট জালে জড়িয়ে পড়েছে। শিপ্রার ঘাবড়ে যাওয়া মুখটা দৃষ্টি এড়াল না এসিপি রায়ের।

আমরা আপনাকে প্রোটেকশন দেব। শুধু বলুন বিপ্রতীপ কোথায়?

শিপ্রা এবার চুপ করেই থাকল। শুভানন, বিপ্রতীপ এদের কাউকে যে শিপ্রা চেনে না, এটা হাজারবার বললেও এই পুলিশ অফিসার দু'জন বোধহয় বিশ্বাস করবে না। ওদের যা ইচ্ছে করুক। জেলে দিক, টর্চার করুক, যা খুশি করুক। সব কিছুর জন্যই এখন শিপ্রা প্রস্তুত করে নিচ্ছে নিজেকে। এবং সত্যিই একসময় এসিপি রায় আর ইন্‌সপেক্টর সিনহা হতাশ হয়ে পড়লেন। হতোদ্যম হয়ে এসিপি রায় হতাশ গলায় বললেন, বাঁচতে পারবেন না ম্যাডাম, বাঁচতে পারবেন না আমার ওপরওয়ালার হাত থেকে। সুযোগটা আপনাকে বাড়িতে বয়ে এনে দিয়েছিলাম, আপনি নিলেন না। আপনি কী ভাবছেন, পলাশকে যেটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ওই হরির ঝিলে পাখি বাঁচাও আন্দোলনটা, ওই গল্পটা লালবাজারে টিকবে? ঠিক আছে, দেখুন চেষ্টা করে পাখির গল্প বলে। আপনার যেমন ইচ্ছে। আমরা আজ চলি।

এসিপি রায় আর কখনও সান্যাল-বাড়িতে না এলেও, ইন্‌সপেক্টর সিনহা কিন্তু মাঝে মাঝেই যাতায়াত করতে লাগলেন। প্রশ্ন একটাই। সেই বিপ্রতীপের ঠিকানা। ক্রমশ চাপটা সহ্য করতে শিখে গেল শিপ্রা।

৬

বিট্টু পাড়ারই একটা স্কুলে পড়ে। বাড়ি থেকে স্কুল হেঁটে দশ মিনিট, বিট্টুর পায়ে বড়জোর মিনিট পনেরো। শিপ্রা হাঁটিয়েই বিট্টুকে স্কুলে নিয়ে যেত। তবে হরিতলার ঘটনাটার পরে দয়াল সান্যালের কড়া নির্দেশ, ওইটুকু রাস্তাও যেন বিট্টু বাড়ির গাড়িতে যায়। শিপ্রার বাড়ির বাইরে যাওয়া মানে ছিল সকাল আটটায় গাড়িতে বিট্টুকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর বেলা বারোটায় স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা।

এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন বিটুকে স্কুল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার সময় যখন বাড়ির গেটে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে, একটা মেয়ে কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার বন্ধ কাচের জানলাটার ওপর খুব আস্তে দু'বার ঠকঠক করে আওয়াজ করল।

শিপ্রা ঘুরে দেখল একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ে। গায়ে একটা হালকা প্রিন্টেড শাড়ি, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। শরীরে একটা রুক্ষতা থাকলেও মুখে একটা আলগা শ্রী আছে। জানলার কাচটা নামিয়ে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

মেয়েটার কাঁধে একটা ময়লা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। ব্যাগটার ভেতর থেকে কয়েকটা ধূপের প্যাকেট বার করে মেয়েটা বলল, দিদি, কয়েকটা ধূপের প্যাকেট যদি নেন, খুব উপকার হয়।

শিপ্রাদের পাড়াতে হকারদের আনাগোনা প্রায় নেই। বাড়ির কড়া নাড়া তো একদমই নেই। তাই প্রথমে একটু অবাকই লাগল শিপ্রার। বাড়িতে ধূপ টুপ জ্বালানো হয় না কিন্তু চশমার পিছনে মেয়েটার চোখ দুটো দেখে মুখের ওপর না বলতে পারল না। তার ওপর এই বয়সি মেয়ে-হকার শিপ্রা কোনওদিন দেখেনি। অভাব মেয়েটার আভিজাত্যকে একদম খেয়ে ফেলতে পারেনি। শিপ্রা ব্যাগ খুলতে খুলতে বলল, ঠিক আছে, দিন। কত করে?

টাকায় চার প্যাকেট দিদি। আপনাকে পাঁচটা দেব।

একটা এক টাকার নোট বাড়িয়ে দিল শিপ্রা। মেয়েটা টাকাটা নিজের একটা ছোট্ট হাতব্যাগে রেখে বলল, যাক দিদি, সেই সকাল থেকে ঘুরছি। এতক্ষণে বউনি হল।

ড্রাইভার গাড়িটা বাড়ির ভেতরে ঢোকানোর জন্য এগোতেই মেয়েটা বলে উঠল, দিদি একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন। এক গ্লাস জল পাব আপনার বাড়িতে? সকাল থেকে এ পাড়াতে কোথাও একটু জল পেলাম না।

মেয়েটার জন্য ততক্ষণে একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। শিপ্রা দারোয়ানকে বলে দিল মেয়েটাকে ভেতরে আসতে দিতে। শিপ্রা গাড়ি থেকে নামার প্রায় পিছনে পিছনেই মেয়েটা চলে এল। শিপ্রা মিষ্টি হেসে মেয়েটাকে বলল, আসুন, ভেতরে আসুন।

শিপ্রা বিটুকে দোতলায় পাঠিয়ে নিজে কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল আর একটা প্লেটে দুটো মিষ্টি নিয়ে ফিরে এসে দেখল মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেঝেতে কার্পেট, দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং দেখছে। শিপ্রার একটু খারাপ লাগল। ভাল বাড়ির মেয়ে, শুধু এখন হকারের পরিচয়ে আছে বলে ভেতরে ডেকেও বসতে বলে যায়নি ওকে। তাই একটু লজ্জা পেয়ে বলল, বসুন না আপনি! দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

মেয়েটা কোনও আপত্তি করল না। সোফায় এসে বসল। জলটা খেয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনি ব্যাগটার মধ্যে কিছু খুঁজতে আরম্ভ করল। উলটোদিকের সোফায় বসে শিপ্রা মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। পূর্ব পাকিস্তান থেকে শয়ে শয়ে শরণার্থীরা ওদেশ থেকে ভিটেমাটি সম্পত্তি ছেড়ে এদেশে চলে আসছে। এই মেয়েটা হয়তো সেরকম একজন। সচ্ছলতাটা ওদেশে রেখে সম্পর্কহীন হয়ে এদেশে এসে পেটের দায়ে ধূপ

বিক্রি করছে। কত মেয়ে ধর্ষিত হচ্ছে ওদেশে, এ মেয়েটাও হয়তো সেরকমই একজন। না, একে আর একটু কিছু সাহায্য করা উচিত। আরও কিছু ধূপ কিনে নেবে বলে ঠিক করল শিপ্রা।

মেয়েটা ব্যাগের মধ্যে থেকে একটা চিরকুট বার করল। চিরকুটের কিছু একটা লেখা পড়ে নিচু গলায় বলল, দিদি আপনি টাকাটা কবে দেবেন?

কীসের টাকা? বুঝতে না পেরে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল।

পলাশ সেনের মাধ্যমে যে-টাকাটা আপনি আমাদের সংগঠনকে দেবেন বলেছিলেন...

চমকে উঠল শিপ্রা। সেদিন রাতে তা হলে ঘটনাটা শেষ হয়ে যায়নি! এসিপি রায় ঠিকই বলেছিলেন, এরা পিছু ছাড়বে না। গলাটা শুকোতে লাগল শিপ্রার, ম্রিয়মাণ একটা গলায় বলল, দিয়ে দেব। যা বলেছিলাম সবটা দিয়ে দেব। আমার কাজ হোক বা না হোক পুরোটাই দিয়ে দেব। আপনারা শুধু দয়া করে আমার স্বামী আর ছেলের কোনও ক্ষতি করবেন না।

মেয়েটা মোটা ফ্রেমের চশমাটা এবার চোখ থেকে খুলল। চশমার পিছনে লুকিয়ে ছিল দুটো বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে চোখ। খুব শান্ত গলায় বলল, আপনি এভাবে বলছেন কেন দিদি? আমরা তো শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। সংগঠনের অবস্থা এখন খুব খারাপ। আমাদের সংগঠনের মধ্যে অনেক খারাপ লোক ঢুকে পড়েছে। তারা আমাদের নাম করে লুটপাট চালাচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের আদর্শ তা নয়।

শিপ্রার তবু সন্দেহটা যাচ্ছে না। এসিপি রায়ের কথাগুলো কানে বাজছে—'ওরা সব খবর রাখে। ওরা আপনাকে বাঁচতে দেবে না।' শিপ্রা রোবোর মতো বলতে থাকল, বাড়িতে আমার কাছে টাকা নেই। বিশ্বাস করুন। দুটো দিন সময় দিন, আপনি বলুন কোথায় গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। আমি পুরো টাকাটাই পৌঁছে দিয়ে আসব। বিশ্বাস করুন, সেদিন রাতে যে মহেশদার বাড়িতে পুলিশ চলে আসবে—আমি তার কিচ্ছু জানতাম না।

মেয়েটা এবার উঠে এসে শিপ্রার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, আপনি শান্ত হন। খামোখা ভয় পাবেন না। আপনার বাড়িতে এত কাজের লোকজন ঘোরাফেরা করছে, কেউ আপনার কথা শুনে ফেললে সন্দেহ করতে পারে। আপনাকে কোনও চাপ দিচ্ছি না। অনুনয় করছি। আপনি যতটা পারেন দিন। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। দু'দিন পরে এসে টাকাটা আমি নিজে নিয়ে যাব।

কাঁধে মেয়েটার নরম হাতে ভরসা ফিরে পেতে লাগল শিপ্রা। ওর হাতের ওপর আলতো করে নিজের হাতটা রেখে বলল, না, আপনি প্লিজ আর আসবেন না। ভুল বুঝবেন না। আপনি এলে আপনার বিপদ হতে পারে। সকালে মাঝে মাঝেই পুলিশ আসে এখানে।

জানি সেটা। আমাদের অনেক রিস্ক নিয়েই চলতে হয়। মেয়েটা এরপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু পুলিশ আসে কেন বলুন তো? প্রত্যেকবারই দেখি আপনার

হ্যাজব্যান্ড বেরিয়ে যাওয়ার পরই ওরা আসে। মানে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসে। কী জিজ্ঞেস করে ওরা?

একজনের খোঁজ করতে আসে। তাকে আমি চিনিও না। অথচ ওরা বিশ্বাস করে না।

কী নাম তার?

বিপ্রতীপ।

মেয়েটা আবার চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর একটু ধরা গলায় বলল, ওরা আর জিজ্ঞেস করবে না আপনাকে কমরেড বিপ্রতীপের কথা। পরশু রাতে ওরা গুলি করে মেরেছে কমরেড বিপ্রতীপকে।

কোনওদিন বিপ্রতীপকে চোখে দেখেনি শিপ্রা, কিন্তু গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার কথা শুনে হরিতলার ভয়ংকর রাতটা মনে পড়ে শিউরে উঠে চোখটা বন্ধ করে ফেলল।

মোটা ফ্রেমের চশমাটা পরে নিয়ে মেয়েটা বলল, আমি আসি আজকে, টাকার কথাটা একটু খেয়াল রাখবেন। আমি না আসি অন্য কেউ এসে নিয়ে যাবে।

গেটের বাইরে মেয়েটা মিলিয়ে যাওয়ার পর শিপ্রা দ্রুত পায়ে দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে এল। পলাশের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছিল ওই লোকগুলোকে টাকা দেবে। কিন্তু কত টাকা ওরা নেবে সেটা পলাশ বলতে পারেনি। সেটা সেদিন মিটিং-এই ঠিক করার কথা ছিল। অবশ্য পুলিশ দু'জন সেদিন বলছিল লালবাজারের রেকর্ডে আছে অঙ্কটা পাঁচ হাজার।

আলমারি খুলে একটা গয়নার বাক্স বার করে আনল শিপ্রা। বাক্সটার মধ্যে সাধারণ আটপৌরে কয়েকটা গয়না। গয়নাগুলোকে খাটের ওপর ঢেলে ফেলে দিয়ে, খালি বাক্সের ভেতর থেকে নীল ভেলভেটের লাইনিংটা চাড় দিয়ে তুলে নিল। এইখানেই লুকিয়ে রাখা আছে একটা চেকবই আব পাসবই। মায়ের আলাদা করে গোপনে দিয়ে যাওয়া টাকা। এই সাত বছরে ওই অ্যাকাউন্ট থেকে এক টাকাও তোলেনি। শুধু অ্যাকাউন্টটা চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝে একশো-দুশো টাকা জমা দিয়েছে।

শিপ্রা পাসবইটার পাতা উলটে দেখল, শেষ যখন পাসবইটা আপডেট করেছিল, সেই হিসেবমতো প্রায় এক লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা আছে। ঠিক করল কিছু টাকা আজই তুলে নেবে। দশ হাজারের মতো। রেখে দেবে বাড়িতে নিজের আলমারিতে। মেয়েটা বা ওর দলের লোকেরা যদি আবার আসে আর তাদের খালি হাতে ফিরে যেতে হবে না। আজকে সময় দিয়েছে, পরের দিন হয়তো আর দেবে না।

ব্যাগের মধ্যে পাসবই চেকবইটা ঢুকিয়ে আবার দ্রুত নীচে নেমে এল শিপ্রা। সময় খুব কম। ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, বনোয়ারীলাল তাড়াতাড়ি চলো।

কোথায় ম্যাডাম?

বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো মাথায় এল চিন্তাটা। বনোয়ারীলাল দয়াল সান্যালের মাইনে নেওয়া বশংবদ চাকর। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দয়াল সান্যালকে বলে দেবে শিপ্রা কোন ব্যাঙ্কে গিয়েছিল। তাই বনোয়ারীলালকে বিভ্রান্ত করতে শিপ্রা বলল, বেহালা।

গাড়িটা কিছু দূর এগোনোর পর একটা রাস্তার মোড়ের কাছে শিপ্রা দেখতে পেল কয়েকটা কালো-হলুদ ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। বনোয়ারীলালকে অবাক করে গাড়ি থেকে নেমে নির্দেশ দিল বাড়ি ফিরে যেতে। ট্যাক্সিতে উঠে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে এবার আসল গন্তব্যের ঠিকানা দিল, ধর্মতলা।

শিপ্রা কখনও ট্যাক্সি ড্রাইভারের আয়না দিয়ে, কখনও ঘাড় ঘুরিয়ে বারবার দেখছিল, বনোয়ারীলাল ওকে ফলো করছে কিনা। কিন্তু শিপ্রা বুঝতেও পারেনি আর একটা সাধারণ গাড়িতে ওকে ফলো করে চলেছেন ইন্‌সপেক্টর সিনহা।

চাঁদনিচকের রেডিয়ো গলিতে একটা বাড়ির দোতলায় এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ছোট একটা ব্রাঞ্চ। শিপ্রাকে ফলো করে এসে ইন্‌সপেক্টর সিনহা একজন সাব-ইন্‌সপেক্টর আর একজন কনস্টেবলকে নিয়ে রাস্তায় অপেক্ষা করছিলেন। ওপরওয়ালাদের সম্প্রতি চাপিয়ে দেওয়া এই কাজটা তাঁর একদম পছন্দ নয়। সবার আগে অ্যাকশনে এগিয়ে যেতে যাঁর বুক কাঁপে না, তাঁকে কিনা কাজ দেওয়া হয়েছে একটা শখের নকশাল হতে যাওয়া বড়লোকের বউয়ের পিছু করা!

শিপ্রা সান্যাল কোন ব্যাঙ্কে ঢুকেছে দেখা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কে ঢোকার দুটো কারণ থাকতে পারে, হয় টাকাকড়ি জমা দেওয়া, লকারে গয়নাগাটি রাখা, না হয় টাকাকড়ি তোলা, লকার থেকে গয়নাগাটি বের করা। এই অতি সাধারণ তথ্যটা ব্যাঙ্কে ফোন করে জেনে নেওয়া যাবে। এটা নিয়ে মাথা ঘামালেন না ইন্‌সপেক্টর সিনহা। তবে ব্যাঙ্কে এই অভিসারটা যে গোপনীয় রাখতে চায় শিপ্রা সান্যাল সেটার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। সকালে সান্যালবাড়িতে এস-আই বন্দনা মল্লিক হকারের নিখুঁত অভিনয় করে এসেছে। এসিপি শান্তনু রায় আর দয়াল সান্যালের মিলিত বুদ্ধি এটা।

এসিপি রায়ই একটা সন্দেহ দয়াল সান্যালের মাথায় ঢুকিয়ে ছিলেন। লালবাজারে ইন্‌সপেক্টর সিনহার সামনেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার স্ত্রী যে নকশালদের প্রচুর টাকাকড়ি দেবেন বলেছিলেন, তার সোর্স কী? আপনি কি স্ত্রীকে প্রচুর ফ্রি ক্যাশ দিয়ে রেখেছেন?

না, একদমই নয়। দয়াল সান্যাল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন।

তা হলে?

সেটাই তো ভাবাচ্ছে। এক হতে পারে নিজের গয়নাগাটি বিক্রি করে দেবে ভেবেছে। কিন্তু সেটাও আমাকে না জানিয়ে করতে পারবে না। ওর সমস্ত গয়নাগাটি যে-লকারে আছে সেটা জয়েন্টে আছে আমার সঙ্গে। ও একা গিয়ে খুলতে পারবে না।

অফ দ্য রেকর্ড জিজ্ঞেস করছি। বাড়িতে প্রচুর আন-অ্যাকাউন্টেড মানি আছে আপনার?

দয়াল সান্যাল হেসে ফেলেছিলেন।

নন ট্যাক্স পেড মানির কথা বলছেন তো? ব্ল্যাক মানি? এটুকু আপনাকে নিশ্চিন্ত করছি, যদি কিছু থেকেও থাকে তার সন্ধান শিপ্রা জানে না।

এসিপি রায় চিন্তা করতে থাকলেন। তারপর অভিজ্ঞতা খাটিয়ে বললেন, একটা

সোর্স আরও থাকতে পারে। আপনার শাশুড়ির তো নন ট্যাক্স পেড মানির অভাব ছিল না। তার কিছুটা হয়তো মেয়েকে গোপনে রাখতে দিয়েছেন।

দয়াল সান্যালের মাথায় বিদ্যুৎ খেলল। শিপ্রার জন্য ওর মা কিছু টাকাকড়ি যে রেখে গেছে, তার কিছু আভাস আগেও পেয়েছেন। তবে টাকার পরিমাণটা কত, তার কোনও আন্দাজ নেই। সেই টাকাটা শিপ্রার একটা বড় জোর, বড় ভরসা। শিপ্রাকে একদম বাগে আনতে ওই টাকার পরিমাণ আর সন্ধানটাও জানা দরকার। এসিপি রায় দয়াল সান্যালের চিন্তিত মুখ দেখে একই কথা বলেছিলেন।

দেখুন মিস্টার সান্যাল, মিসেস সান্যালের গোপনে টাকা-পয়সা কিছু আছে কিনা, সেটা জানা খুব জরুরি। আমাদের পক্ষে জরুরি আর আপনার পক্ষেও জরুরি। পলাশ যতই আপনার কথামতো কাজ করে থাকুক, শিয়ালকে ভাঙা বেড়াটা কিন্তু দেখিয়েই গেছে। শুভাননটা গেছে। বিপ্রতীপের জালটাও গুটিয়ে এনেছি। ওই লাশটা পড়ে গেলে দলটার বিপ্লব করার কোমরটা ভেঙে যাবে। এরপর আপনার বাড়ির টাকায় সেই কোমরটা যেন আর জোড়া না লাগে। আমরা যেমন চাই না মিসেস সান্যালের মাধ্যমে নকশালদের একটা ফ্র্যাকশন ফান্ডেড হোক, আপনিও নিশ্চয়ই চান না আপনাদের ফ্যামিলির টাকা এভাবে নয়ছয় হোক। সুতরাং এককভাবে মিসেস সান্যালের ফিনানশিয়াল স্ট্রেন্থ অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটিস কী, সেটা আমাদের জানতে হবে। কারণ একটা জিনিস জেনে রাখবেন, বিপ্রতীপ, শুভাননের দলের যে-ক'টা বেঁচে থাকবে, তারা আপনার ওপর রিটালিয়েট করার চেষ্টা করবেই।

দয়াল সান্যাল সভয়ে বলে উঠেছিলেন, কারা তারা?

এখনও ঠিক নামগুলো পাইনি। এদের কাজের একটা নির্দিষ্ট ধরন আছে। এরা যখন কোথাও অপারেশনে যায় একটা করে সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স নিয়ে যায়। সুযোগ বুঝে দরকার পড়লে এরা অ্যাকশনে যায় আর বেগতিক দেখলে হাওয়া হয়ে গিয়ে পুরো খবরাখবর ওদের শীর্ষ নেতৃত্বর কাছে পৌঁছে দেয়।

শুনেটুনে দয়াল সান্যাল আরও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এসিপি রায় আশ্বাস দিয়েছিলেন, আপনি এত ঘাবড়ে যাবেন না। আরে আমরা তো আছি। দাঁড়ান একটা বুদ্ধি বার করি।

অবশেষে এস-আই বন্দনা মল্লিককে বিশ্বস্ত ধূপ বিক্রেতা করে সান্যালবাড়িতে পাঠানোর পুরো প্ল্যানটা করা হয়েছিল। আর সেই সঙ্গে ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছিল শিপ্রার ওপর পুরো নজরদারি করতে এবং বন্দনা মল্লিকের নাটকটার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে।

পুরনো কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই চাঁদনিচকের ফুটপাথ ঘেঁষে সাদা পোশাকে গাড়ির মধ্যে বসেছিলেন ইন্‌সপেক্টর সিনহা। কাজের কাজটুকু অর্থাৎ শিপ্রা সান্যালের ব্যাঙ্কের হদিশ জানা হয়ে গিয়েছে। লালবাজার এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ গাড়িতে। অন্য সময় কাজ হয়ে গেলে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন না ইন্‌সপেক্টর সিনহা। তবে এখন আর ভেতর থেকে লালবাজারে ফিরে গিয়ে এসিপি রায়কে সব রিপোর্ট দেওয়ার কোনও তাগিদ অনুভব করছিলেন না। একটা এলোমেলো গড়িমসি ভাব।

সাব-ইন্‌সপেক্টর অমূল্য শিপ্রার পিছন পিছন দোতলায় ব্যাঙ্কে উঠে এসেছিল। বয়স অল্প, সবে বছর তিনেক হল পুলিশের চাকরিটা হয়েছে। ইন্‌সপেক্টর সিনহার মতো কড়া ধাতের অফিসারের সঙ্গে ডিউটি করতে, অ্যাকশনে যেতে বুক কাঁপে। রাতের অন্ধকারে অ্যাকশনে গেলে সবসময় মনে হয় এই বোধহয় অন্ধকার চিরে গনগনে গুলি এগিয়ে আসছে মাথার খুলি লক্ষ্য করে। অ্যাকশনে গেলে ইন্‌সপেক্টর সিনহা মানুষটা কীরকম হঠাৎ করে পালটে যান। অকথ্য গালিগালাজ করে নিজেকে চার্জ করেন। অমূল্য কখনও ভুলতে পারে না সেই ভোরবেলাটার কথা। যখন ইন্‌সপেক্টর সিনহা দুটো ছেলেকে জিপ থেকে একটা ফাঁকা মাঠে নামিয়ে বলেছিলেন, যা পালা, ক্ষমা করে দিলাম তোদের।

ছেলে দুটো নেমেই দৌড়োতে আরম্ভ করেছিল ফাঁকা মাঠটা দিয়ে। ইন্‌সপেক্টর সিনহা অমূল্যর হাতে রিভলভারটা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, ফায়ার করো অমূল্য। মারো গুলি ওদের পিঠে।

পারেনি অমূল্য। কিছুতেই পারেনি। ইন্‌সপেক্টর সিনহার অশ্লীল গালিলাগাজ শুনেও পারেনি রিভলভারের ঘোড়া টানতে। ঘামতে ঘামতে খালি মনে মনে বলে গিয়েছিল, দৌড়ো তোরা, আরও জোরে দৌড়ো।

পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত পেরেছিল ওরা। ইন্‌সপেক্টর সিনহা আর একবার খিস্তি করে বলেছিলেন, তুমি কী ভাবলে অমূল্য, দুটো জীবন বাঁচালে? আসলে দুটো জীবন বাঁচিয়ে তুমি আরও দশটা জীবন খুন করে দিলে। ছেলে দুটো আজ থেকেই আবার মনের আনন্দে খুন করে যাবে। তার একটা রাউন্ডে তোমার নামও লেখা থাকবে।

সিনিয়রের মুখের ওপর কথা বলা যায় না। তার ওপর আদেশ অমান্য করার পরে তো নয়ই। মানুষকে কি মশার মতো মারা যায় নাকি? গায়ের ওপর বসল আর পিছন থেকে নীরবে একটা হাত এগিয়ে এসে এক চাপড়ে শেষ করে দিল মশাটাকে। চ্যাটচ্যাটে খানিকটা রক্ত লেগে থাকল চামড়ায়। অমূল্য তখন মনে মনে ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে বিস্তর গালিগালাজ করেছে আর বাপবাপান্ত করেছে—যাতে এত মানুষ মারার ফল হাতেনাতে এ জীবনেই পায় লোকটা।

শেষ পর্যন্ত তাই ইন্‌সপেক্টর সিনহা যখন শিপ্রা সান্যালকে পিছু নেওয়ার আদেশটা ওর ওপরওয়ালার কাছ থেকে পেয়েছিলেন খুব খুশি হয়েছিল অমূল্য। এক, এই কাজ ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে করতে বলা, ওর হাতে চুড়ি পরিয়ে দেওয়ার মতো অপমানজনক; আর দুই, এই কাজ করতে যাওয়া মানে অ্যাকশন নেই। পিছন থেকে পিঠে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া নেই। পিছন থেকে শিপ্রা সান্যালের খোলা মাখনের মতো পিঠটার ওপর নজর রাখার কাজটা অনেক অনেক ভাল। অন্যরকম উত্তেজনার।

ব্যাঙ্কে শিপ্রা টাকা তোলার জন্য চেকটা জমা দিয়ে টোকেনটা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল। ব্যাঙ্কে কেউই খেয়াল করছে না অমূল্য কোনও কাজ ছাড়াই সাদা পোশাকে ভবঘুরের মতো ঘুরছে।

শিপ্রার চঞ্চল দৃষ্টিটা ব্যাঙ্কের মধ্যে সমানে ঘুরছে। অবচেতন মন বলছে একজোড়া

অদৃশ্য চোখ যেন পিছনে বিঁধে আছে। ক্যাশ কাউন্টার থেকে নিজের টোকেন নম্বরের ডাক শুনে দ্রুত পায়ে কাউন্টারের কাছে উঠে এল। ক্যাশিয়ার আর একটা সই করার জন্য চেকটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কতয় দেব দিদি?

একশোতে দিন। নিচু গলায় বলল শিপ্রা।

ক্যাশিয়ার উলটেপালটে একটা একশো টাকার বান্ডিল গুনে একটা কালো গার্ডারে বেঁধে শিপ্রার দিকে এগিয়ে বলল, গুনে নিন দিদি।

শিপ্রা দ্রুত নোটগুলো গুনতে থাকল। গোনাটা সবে পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে, এমন সময় ক্যাশিয়ারের একটা ধমকের সুরে গলা পেল, কী চাই আপনার? এরকম ঝুঁকে কী দেখছেন?

শিপ্রার নোট গোনাটা বন্ধ হয়ে গেল। টাকাটার বাকিটা আর না গুনেই ঢুকিয়ে নিল ব্যাগের ভেতর। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পাশেই একটা ছেলে। ছেলেটা ক্যাশিয়ারের ধমক খেয়ে বলল, আঠাশ নম্বর টোকেন এসেছে?

এলে কি আমি ডাকতাম না? ঠিক ডাকব। বসার জায়গায় বসুন গিয়ে। কাউন্টারের সামনে ভিড় করবেন না। নম্বর এলে ঠিকই ডাকব।

ছেলেটার চাহনি কীরকম সন্দেহজনক! একদম শিপ্রার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিশ্চয়ই দেখেছে শিপ্রার টাকার পরিমাণ। ছেলেটা কে? দয়াল সান্যালের চর? নকশাল, না পুলিশ? যেই হোক ছেলেটার চালচলন সন্দেহজনক। ছেলেটা দেখে নিয়েছে শিপ্রা ব্যাগে দশ হাজার ঢুকিয়েছে।

ভেতরটা আবার ধক করে উঠল শিপ্রার। সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল যখন দেখল ছেলেটা ক্যাশিয়ারের ধমক খেয়ে একটু এদিক-ওদিক উসখুস করে সোজা ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গেল। শিপ্রা ঠিক করল এখনই ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবে না। অপেক্ষা করবে আরও কিছুক্ষণ। মায়ের অনেক কষ্টের জমানো টাকা। এই টাকা দিয়ে দয়াল সান্যালের আর বিট্টুর জীবন কিনবে।

শিপ্রা টাকা ভরতি ব্যাগটা শক্ত করে চেপে ধরে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চারদিকে চোখ বোলাতে থাকল। ক্যাশিয়ারের ধমক খেয়ে ওই ছেলেটা চলে গেছে কিন্তু আরও কেউ কি ঘাপটি মেরে বসে আছে ওর ওপর নজরদারি করার জন্য! যদি থাকে তা হলে এখন ব্যাঙ্ক থেকে বেরোনোটা মোটেই নিরাপদ নয়। দরকার হলে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে নিরাপত্তা চাইবে। উপস্থিত প্রত্যেকটা মুখের ওপর চোখ বোলাতে থাকল শিপ্রা। আর সেই সন্ধানী চোখে ধরা পড়ল একটা চেনা-চেনা মুখ। একটু চিন্তা করে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল চেনা চেনা মুখটার পরিচয় সম্পর্কে। তারপর দ্রুত এগিয়ে এল ছেলেটার কাছে।

রবার্ট!

ছেলেটা কাউন্টারে কথা বলছিল। পিছন থেকে ডাকটা শুনে একটু চমকে উঠে ঘুরে তাকাল। চোখটা একটু কুঁচকে শিপ্রাকে চিনে নিয়ে বলল শ্যারন তুই!

কাউন্টার থেকে একটু সরে এল রবার্ট। তারপর আলতো করে শিপ্রার কাঁধটা ছুঁয়ে

বলল, হোয়াট আ সারপ্রাইজ! কত বছর পর তোর সঙ্গে দেখা হল বল তো? তোর সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেই পারিনি।

একটা দরকারে এসেছিলাম। শিপ্রা বলল।

তোর এখনও এখানে অ্যাকাউন্ট আছে?

মায়ের সঙ্গে জয়েন্ট ছিল, মা চলে যাওয়ার পরে আমার নামে রয়ে গেছে।

তোকে নিজে ব্যাঙ্কে আসতে হয়? স্ট্রেঞ্জ! আমি তো প্রত্যেক মাসের এক-দু'তারিখে এখানে আসি মাম্মির অ্যাকাউন্ট অপারেট করতে। কোনওদিন তো তোর সঙ্গে দেখা হয়নি!

কেন? স্ট্রেঞ্জ কেন? আমি ব্যাঙ্কে আসতে পারি না? মা আর ক্যাথি আন্টি দু'জনই তো এই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, তা হলে তুই এলে আমি কেন আসতে পারি না?

রবার্ট ম্লান হাসল। না, সে তুই নিশ্চয়ই পারিস, কিন্তু তুই তো এখন আর আমাদের শ্যারন নোস। মিসেস সান্যাল। কী যেন তোর একটা গুড গার্ল-গুড গার্ল হিন্দু নাম হয়েছে? যাই হোক, তোর এখন ব্যাপারই আলাদা। বিরাট একটা পরিচয়। বিরাট এক বিজনেসম্যানের বউ তুই। আমি প্রত্যেক মাসের প্রথমে এখানে কেন আসি জানিস? মাম্মির জমানো টাকাব থেকে মাসের সুদের টাকাটা তুলতে। সেই টাকাটা দিয়ে মাম্মির সারা মাস চলে। শুধু মাম্মির নয়, খানিকটা আমারও। তোর নিশ্চয়ই সেরকম দরকার হয় না।

রবার্টের গলায় সূক্ষ্ম একটা শ্লেষের ছায়া শিপ্রার কান এড়াল না। একটু আহত হয়ে বলল, তোরা কি আর আমাকে নিজের ভাবতে পারিস না? শুধু আমার বিয়ে হয়ে অন্য বাড়ি চলে গেছি বলে, নাকি হিন্দু হয়ে গেছি বলে?

প্রশ্নটা স্পর্শকাতর। রবার্ট দ্রুত একবার এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে গলাটা নামিয়ে বলল, হিন্দুও নয়, বিয়েও নয়, আসলে মিসেস সান্যাল হয়ে তুই আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছিস। তুইও তো কখনও বিয়ের পর আর চেষ্টা করিসনি কোনও যোগাযোগ রাখতে! মাম্মি যে তোকে এত ভালবাসত, একবারও তোর ইচ্ছে হয়নি মাম্মি কেমন আছে খোঁজ নিতে? শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি যে বড়লোকরা এরকমই হয়। যাক গে, এতদিন পর দেখা হল, এসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ ছাড় না!

শিপ্রার ভেতরে ভেতরে ভীষণ হতাশ বোধ এল। অনেকদিন পর ছোটবেলার পড়শি বন্ধু রবার্টের সঙ্গে দেখা হল। অথচ দীর্ঘদিনের পর প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রতিক্রিয়াটায় রবার্টের সঙ্গে পলাশের কোনও তফাত নেই। দু'জনেই মেনে নিতে পারেনি মিসেস শিপ্রা সান্যাল হয়ে তার বৈভব আর সামাজিক প্রতিপত্তি ওদের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

অথচ এককালে শিপ্রার আর রবার্টের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানটা একই ছিল। শিপ্রার মায়ের আর রবার্টের মা ক্যাথি গোমসের পেশা একই ছিল। তফাত ছিল একটাই, ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও দুই মহিলার জীবনদর্শন আর বাস্তব বুদ্ধি আলাদা

ছিল। রবার্টের মা ক্যাথি সন্তানের জন্য শিপ্রার মা মার্থার মতো যত্নবান ছিল না। তাই শিপ্রা পড়াশুনো করেছে কার্শিয়াং-এ কনভেন্ট বোর্ডিং স্কুলে, আর রবার্ট পড়াশুনো করেছে কর্পোরেশন স্কুলে। সন্ধেবেলাগুলো কাটিয়েছে মায়ের বন্ধ দরজার সামনে এক চিলতে বারান্দায় অন্য বন্ধুদের সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলে।

কেমন আছে ক্যাথি আন্টি? শিপ্রা জানতে চাইল।

ভাল। একদিন দেখে আয় না মাম্মিকে। মাম্মি তোকে দেখলে খুব খুশি হবে।

'যাব' বলতে গিয়েও কথাটা মুখে আটকে গেল শিপ্রার। ক্যাথি আন্টি যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে শিপ্রার পক্ষে দেখা করা সম্ভব নয়। মা কখনওই সেখানে শিপ্রাকে যেতে দেয়নি। তবে ক্যাথি আন্টি মায়ের খুব বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। শিপ্রা কার্শিয়াং থেকে কলকাতায় ছুটিতে এলে হয় হোটেলে থাকত, না হয় হরির ঝিলের পাশে ম্যাকার্থি সাহেবের বাংলোতে। মা ব্যাপারটাকে গোপনই রাখত। শুধু ক্যাথি আন্টি জানত কলকাতায় এলে কোথায় শিপ্রা থাকত। সেই গোপন জায়গায় মায়ের সঙ্গে ক্যাথি আন্টি আর রবার্টও কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে যেত কখনও কখনও।

'যাব' কথাটা যে শিপ্রার গলায় এসে আটকে গেল, সেটা রবার্টের চোখ এড়াল না। ম্লান হেসে বলল, তোর ভয় নেই শ্যারন। মাম্মি এখন পুরনো ঠিকানায় থাকে না। ব্যারাকপুরে থাকে। ওখানে গেলে মিসেস সান্যালের জাত যাবে না।

শেষের এই খোঁচাটাও ঢোঁক গিলে শিপ্রা হজম করে বলল, ব্যারাকপুরে? ব্যারাকপুরে কোথায়?

তুই ব্যারাকপুর চিনিস?

না, ঠিক চিনি না।... মানে কোনওদিন যাইনি, তবে ব্যারাকপুর তো কলকাতারই কাছে। তোর ঠিকানাটা দে, চলে যাব একদিন। ক্যাথি আন্টির সঙ্গে দেখা করে আসব।

রবার্ট প্রথমে ঠিকানাটা লিখে দিতে উৎসাহ দেখাল না। তারপর কিছু একটা মনে করে ব্যাঙ্কের একটা পে-ইন স্লিপের পিছনে ক্যাথি গোমসের ব্যারাকপুরের বাড়ির ঠিকানাটা লিখে দিয়ে বলল, নে ঠিকানাটা। মাম্মিকে বাড়িতেই পাবি সবসময়। মাঝে মাঝে আমিও যাই।

যাই মানে? তুই ব্যারাকপুরে ক্যাথি আন্টির কাছে থাকিস না?

রবার্ট নিজের পেটটা দেখিয়ে বলল, এই, এইটার জন্য এখানে থাকতে হয়। আমার যখন ডিউটি শেষ হয় তখন শিয়ালদায় গিয়ে ব্যারাকপুরের ট্রেন ধরা যায় না। আর আজকাল তো রাত হলেই কলকাতায় আতঙ্ক। হয় পুলিশের গুলি ছুটছে, না হয় নকশালদের। অত রাতে...

রবার্টকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য নকশাল শব্দটা মনে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। সেই রবার্টের মুখ থেকেই 'নকশাল' শব্দটা আবার ফিরে এসে ভয়টাকে উসকে দিল। ব্যাগের মধ্যে অতগুলো টাকা। ওরা এখনও শুভাননের হত্যার বদলা নিয়ে চলেছে। একটু আগেই একজন একদম ব্যাঙ্কের ভেতরে এসে নজর রাখছিল শিপ্রার ওপর। শিপ্রা এবার গলাটা নামিয়ে নিয়ে বলল, তুই আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরিয়ে দিবি রবার্ট?

রবার্ট এবার সত্যিই অবাক হল, তুই ট্যাক্সিতে... তোর গাড়ি...

শিপ্রা এবার ভেঙে পড়ল, তুই অন্তত বিশ্বাস কর রবার্ট।

অমূল্য গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে দেখল ইন্‌সপেক্টর সিনহা কবজি থেকে ঘড়িটা খুলে দম দিচ্ছেন।

অমূল্য বলল, স্যার, সব খোঁজ পেয়ে গেছি। শিপ্রা সান্যাল দশ হাজার টাকা তুলল। এখনও ব্যাঙ্কের মধ্যেই আছে।

অমূল্য ভেবেছিল এই খবরটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তারিফ পাবে, তার বদলে ইন্‌সপেক্টর সিনহা চটে উঠলেন, তোমাকে ঠিক যতটুকু বলি, আগ বাড়িয়ে তার চেয়ে বেশি করতে যাও কেন বলো তো? আমি কি তোমাকে বলেছিলাম কত টাকা তুলছে তা জেনে আসতে? ও তো আমি ব্যাঙ্কে একটা ফোন করেই জেনে যাব। এখন দিলে তো নিজের মুখটাকে চিনিয়ে! একটা কাজও ঠিকমতো করতে পারো না কেন বলো তো!

অমূল্য মাথা নিচু করল।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ইন্‌সপেক্টর সিনহা বললেন, তাড়াতাড়ি করো। লালবাজার যেতে হবে।

৭

লালবাজারের অলিন্দে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ইন্‌সপেক্টর সিনহা ছেঁড়া-ছেঁড়া নানা কথা ভেবে যাচ্ছিলেন। একজন কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে বলল, এসিপি সাহেব আপনাকে খুঁজছেন।

এসিপি রায়ের ঘরে অনেক অফিসার। ইন্‌সপেক্টর সিনহা ঘরের মধ্যে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এসিপি রায় একবার মুখ তুলে ইন্‌সপেক্টর সিনহার উপস্থিতিটা দেখে নিয়েছেন। কিন্তু কিছু বলেননি। ইন্‌সপেক্টর সিনহা বুঝতে পেরেছেন এসিপি একান্তে কিছু বলার জন্য ডেকেছেন। তাই এভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

ঘর ফাঁকা হতেই ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে উলটোদিকের চেয়ারে বসতে বললেন এসিপি রায়। গলাটা খাঁকরিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, কাল ব্রিগেডে প্রাইম মিনিস্টারের একটা বিশাল জনসভা আছে।

এই খবরটা নতুন কিছু নয়। গোটা লালবাজারই তৎপর এখন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। তবে ঊর্ধ্বতনের বলার সময় আজ্ঞাবাহকের উৎসুক মুখই রাখা উচিত। ইন্‌সপেক্টর সিনহা সেরকম একটা মুখ করেই এসিপি রায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। এর পরের সম্ভাব্য কথাগুলো ওঁর জানা। এসিপি এখনই বলবেন, শেষ মুহূর্তে দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে খবর এসেছে পিএম-এর নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করতে হবে। তাই বেশ কিছু

ডিউটি রি-ওরিয়েন্টেশন হয়েছে। ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে আকাশবাণীর দিকটায় ছোট একটা ফোর্স নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতে হবে।

অথচ এসিপি রায় সেসব কিছু বললেন না। একটু গম্ভীর চিন্তিত মুখে বললেন, পিএম জনসভার পর রাজভবনে গায়ক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও কিছু বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে চায়ের বৈঠক করবেন।

এইটুকু বলে এসিপি রায় আবার থামলেন। তারপর আবার একইরকম চিন্তিত মুখ করে বললেন, এখানেই একটা সমস্যা হয়েছে। দয়াল সান্যাল কংগ্রেসের এক নেতাকে ধরে ওখানে সস্ত্রীক যাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে। এমনিতে ক্লিয়ারেন্স ছিল, কিন্তু রিসেন্টলি ওর বউ নকশালদের সঙ্গে যে কানেকশনটা করেছে, এখন কোনওভাবে ওই মহিলাকে অ্যালাউ করা যাবে না। শিপ্রা সান্যালের সঙ্গে দয়াল সান্যালের এখন যা সম্পর্ক তাতে হয়তো শিপ্রা সান্যাল এমনিতেও যাবে না, কিন্তু দয়াল সান্যালকেও ওর বউয়ের নকশাল কানেকশনের জন্য অ্যালাউ করা যাবে না।

ইন্‌সপেক্টর সিনহা এতক্ষণে সমস্যাটার একটা হালকা রূপরেখা দেখতে পেলেন। দয়াল সান্যালের সঙ্গে এসিপি রায়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে। মুখে কংগ্রেস নেতার কথা বললেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চায়ের আসরে থাকার ব্যবস্থা করাতে এসিপি'রও কিছু হাত থাকতে পারে। এই অবস্থায় শিপ্রা সান্যালের সঙ্গে নকশালদের যোগাযোগের কথাটা জুড়ে ফেললে এসিপি রায়ের যথেষ্ট বিপত্তির কারণ আছে।

তুমি একটা কাজ করো সিনহা। এসব কথা আমি ফোনে দয়াল সান্যালকে বলতে চাই না। তুমি নিজে একবার দয়াল সান্যালের অফিসে চলে যাও। গিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে বলো। দয়াল সান্যাল যেন এখন আর একদম মিটিংটায় যাওয়ার চেষ্টা না করে। কারণটাও যেন একদম চেপে বসে থাকে। কাউকে পাঁচকান করারও দরকার নেই। কিছুদিন ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে যাক। পরেরবার পিএম এলে কিছু একটা চেষ্টা করে দেখব, এটাও বলে দিয়ো।

ইন্‌সপেক্টর সিনহা উঠে পড়ার আগে বললেন, স্যার, শিপ্রা সান্যালের ব্যাঙ্কের হদিশটা পাওয়া গেছে, চাঁদনিচকে...

এসিপি রায় কোনও উৎসাহ দেখালেন না। হাতটা তুলে ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে থামিয়ে বললেন, এসব এখন ছাড়ো। তুমি কেসটা দেখছ দেখো, পরে ডিটেলস নেব তোমার কাছে।

রবার্টের সঙ্গে ব্যাঙ্কে দেখা হওয়ার পর থেকেই মনটা খুব উতলা হয়ে গেছে শিপ্রার। বাড়ি ফিরে আসার পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙার পর থেকে মনটা পুরনো দিনের স্মৃতির বোঝায় আরও ভারী হয়ে গেছে। চুপ করে খাটে শুয়ে ছিল। কিছু ভাল লাগছিল না। আবছা কোথাও একটা রেডিয়ো বাজছে। ঘোষক উৎসাহের সঙ্গে জানান দিচ্ছে এখন সে সামনের বছর মুক্তি পেতে চলা একটা সিনেমার গান শোনাতে চলেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস সেই গান গোটা ভারতকে উথালপাথাল করে

দেবে। তারপর রেডিয়োতে বাজতে শুরু করল গানটা—সুন চম্পা, সুন তারা, কোই জিতা কোই হারা...

রেডিয়ো থেকে ক্ষীণ গানটা ভেসে আসছে। গানটা শুনতে শুনতে শিপ্রার মনে হচ্ছে পৃথিবীতে কিছু মানুষ কত সুখে আছে। গান ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের। মরতে বসা আলোয় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শিপ্রার বুকের ভেতর থেকে। জীবনটা যদি সত্যি এরকম হত, সুর তাল লয় সব দুঃখগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যেত, তা হলে প্রাণভরে শুধু গান গাইত। শুধু গান। নীচের লনে বিটু খেলা করছে। মাঝে মাঝে বিটুরও গলা ভেসে আসছে। হিন্দি গানের সঙ্গে সঙ্গে বিটুর উচ্ছ্বাসের গলাটা অদ্ভুত সংগত করছে। শিপ্রা গাইবার চেষ্টা করল, সুন চম্পা, সুন তারা...

শীতকাল। পাঁচটার মধ্যেই সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। অন্য দিন হলে সন্ধের অন্ধকারে লনে বিটু খেলা করছে, এটা কিছুতেই হতে দিত না শিপ্রা। বিটুকে ডেকে নিত। পড়াতে বসাত। ক'দিন এসব কিছুই ইচ্ছে করে না শিপ্রার। বিকেল পড়লেই চুপচাপ খাটে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বাইরে ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। তবু ঘরে একটাও আলো জ্বালে না শিপ্রা।

আজ তাও একজনের অপেক্ষা করছে শিপ্রা। সেই মেয়েটা। অথবা ওদের দলের অন্য কেউ। মাঝে মাঝে এসিপি রায়ের কথাগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। মানসপটে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে খবরের কাগজের ওপর আলতা দিয়ে লেখা ওদের পোস্টার—'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস', 'শুভাননের হত্যার বদলা চলছে... চলবে...'।

ভারী গেটটা খোলার আওয়াজ হল। এত বড় লোহার গেটটা খোলা হয় একমাত্র গেট পেরিয়ে গাড়ি ঢুকলেই। তা হলে কি আবার পুলিশের গাড়ি এল! মনে মনে বিরক্ত হল শিপ্রা।

একটু পরে পরে শিপ্রার ভেজানো দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হল। হরিহর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলল, মেমসাহেব, সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

হরিহরের কথাটা ভাল করে খেয়াল না করেই একরাশ বিরক্তি নিয়ে শিপ্রা বলল, বসার ঘরে বসতে বলো, চা দাও—বলো আমি আসছি একটু পরে।

'বসার ঘরে বসতে বলো' কথাটা শুনে হরিহর বুঝতে পারল মেমসাহেব বোধহয় বুঝতে পারছে না কে তাকে ডাকছে। তাই আর একটু পরিষ্কার করে বলল, মেমসাহেব, সাহেব অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। ওঁর ঘরে আছেন। আপনাকে ডাকছেন।

এবার মনে মনে খুব অবাক হল শিপ্রা। প্রথমত, দয়াল সান্যাল এত তাড়াতাড়ি কোনওদিনও অফিস থেকে ফিরে আসেন না। দ্বিতীয়ত, হরির ঝিলের ঘটনার পর অনেকগুলো রাত কেটে গেছে। দয়াল সান্যাল একটাও কথা বলেননি শিপ্রার সঙ্গে। নিজেদের শোওয়ার ঘর আলাদা হয়ে গেছে, খাওয়ার সময় আলাদা হয়ে গেছে, বাড়িতে পুলিশ এসে কী খোঁজ নিয়ে যায়, তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করেন না দয়াল সান্যাল। সেই লোকটাই আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এসে ডাকছেন শিপ্রাকে...। শিপ্রা গলাটা গম্ভীর করে হরিহরকে বলল, ঠিক আছে তুমি নীচে যাও।

হরিহর চলে যাচ্ছিল। শিপ্রা পিছু ডাকল, শোনো! দেখো বিট্টু যেন এখন একতলাতেই থাকে।

এঘর থেকে ওঘর। মধ্যে একটা সরু প্যাসেজ। এই ক'পা-ই এখন শিপ্রার কাছে মনে হল কয়েক মাইল দূরত্ব। ভেতরে একটা তোলপাড় করা ঝড় বইছে। তবু ওপরটাকে ইস্পাত কাঠিন্যে রেখে দয়াল সান্যালের ঘরে এল শিপ্রা। দয়াল সান্যাল কিছু একটা ফাইল পড়ছিলেন। ফাইলটা বন্ধ করে দয়াল সান্যাল বললেন, বসো।

ঘরে কোনও চেয়ার বা সোফা নেই। বসতে হলে খাটেই বসতে হয়। শিপ্রার দাম্পত্যজীবনের খাট। ক'দিন আগেও এই খাটে গা এলিয়ে পৃথিবীর সব ক্লান্তি দূর হত। এখন সেই খাটটা মনে হচ্ছে পাথরের। আগন্তুকের মতো একটা কোনায় এসে বসল শিপ্রা।

দয়াল সান্যালকে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ভেতরে জমে থাকা রাগের রেখাগুলো মুখে আঁকিবুকি কাটছে। হাতের বন্ধ গোলাপি ফাইলটার ওপর তাল ঠুকতে ঠুকতে পায়চারি করতে থাকলেন। তারপর একসময় শিপ্রার দিকে সরাসরি চেয়ে চোখ দুটো ছোট করে বললেন, তোমার মা ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ছাড়া আর কোথাও তোমার থাকার কোনও ব্যবস্থা করে গেছে? যদি থাকে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। পুলিশ তোমার ব্যাপারে এবার সিরিয়াস।

শিপ্রা একটা বড় শ্বাস নিল। তারপর কেটে কেটে বলল, আছে। মা আমার জন্য যে-জায়গাটা রেখে গেছে, সেটা তোমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নিলে তোমাকে ডুমুরঝড়াতে গিয়ে চাষ করতে হবে, না হলে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট বা সোনাগাছিতে দালালি... চয়েস ইজ ইয়োর্স।

শাট আপ! চিৎকার করে উঠলেন দয়াল সান্যাল। তারপর বুড়ো আঙুলটা দোলাতে দোলাতে বললেন, তোমার মায়ের কিচ্ছু ছিল না। হরির ঝিলের পুরো প্রপার্টিটাই ছিল ম্যাকার্থির। তোমার মা ম্যাকার্থিকে বশ করে রেখেছিল। ঠকিয়ে সম্পত্তিটা নিজের নামে করেছিল। ম্যাকার্থিকে যদি শেষ বয়সে কেউ দেখে থাকে সে হচ্ছে আমি। তোমার মা ব্যাঙ্কে গাদা গাদা টাকা জমিয়েছিল। আর ম্যাকার্থিকে, শেষ বয়সে পাগল করে কোথায় কে কেন হাপিস করিয়ে দিয়েছিল... মুখটা আর নতুন করে খুলিয়ো না আমার।

তুমি এত অকৃতজ্ঞ! তোমার সঙ্গে কথা বলতেও ঘেন্না হচ্ছে।

ঘেন্না হচ্ছে? ইয়েস, তা তো হবেই... তোমার মতো মহান মহিলাকে এতদিন মাথায় করে রেখেছি যে... অ্যাকচুয়ালি তোমার আসল জায়গা হচ্ছে তোমার মায়ের আসল বাড়ি। নকশালদের দিয়ে খুন করাতে চেয়েছিলে আমাকে? কেন? না এই ঘরে, এই বিছানায় পলাশের সঙ্গে শোবে বলে, তারপরে হয়তো পলাশকেও খুন করিয়ে দিতে... তারপরে হয়তো মহেশের সঙ্গে... রক্তের দোষ, রক্তের দোষ কোথায় যাবে ম্যাডাম শিপ্রা?

শিপ্রা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল নিজেকে শক্ত রাখতে। ভেতরে অজস্র শিরা-উপশিরা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে। দু'কানের ভেতর হাজার ঝিঁঝিপোকা ডাকতে শুরু করে দিয়েছে।

তবে আজকে এই অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর লোকটা তার মৃত মাকে এভাবে অপমান করে যাবে, এটা সে কিছুতেই সহ্য করবে না। প্রত্যেকটা আঘাত আরও শানিয়ে ফেরত দিয়ে দেবে।

তোমার আসল প্রবলেমটা কোথায় জানো তো মিস্টার দয়াল সান্যাল, বেসিক্যালি তুমি অশিক্ষিত। স্কুল ফাইনালটা পাশ করেছ কি করোনি... খেয়ালও থাকে না... যাই হোক, ওই দু'পয়সার বিদ্যে নিয়ে টাটা-বিড়লা হতে চেয়েছ। সেটাও হতে পারতে, যদি তোমার মধ্যে বেসিক অনেস্টি থাকত। মাই মাদার ওয়াজ অনেস্ট টু হোয়াটএভার হার প্রফেশন ওয়াজ। মাই মাদার ওয়াজ ডিউটিফুল টু হার চাইল্ড। প্রপার এডুকেশন দিয়েছে। প্রপার ভ্যালুজ দিয়েছে। নট লাইক ইয়োর ফাদার। ফুর্তি করে পয়দা করে দায়িত্ব শেষ। গোরুর মতো চাষের মাঠে চরে বেড়াচ্ছে। মানুষ হল কি হল না... লিস্ট বদার্ড। জীবনের কোনও ভ্যালুজ নেই। তোমার কাছে তাই এর বেশি কিছু এক্সপেক্টেড নয়।

দয়াল সান্যাল পায়চারি বন্ধ করে ধপ করে খাটের উলটোদিকের কোণে বসে পড়লেন। চোখ দুটোয় তখন আগুন জ্বলছে। প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে আরম্ভ করলেন, ভুল করেছি... বড্ড ভুল করেছি। ম্যাকার্থি আমাকে জমিটা এমনিও বিক্রি করত। তখন তোমার মায়ের অনুনয়বিনয় শুনে তোমাকে বিয়ে করে ভুল করেছি। সেই ভুল আজও করে চলেছি। এসিপি রায়ের কথা শুনে তোমাকে অ্যারেস্ট করানোই উচিত ছিল। তোমার মতো একটা জঘন্য ক্রিমিনালের জেলে পচাই উচিত।

শিপ্রা বুঝতে পারল তার মধ্যে আবেগটা আর নেই। প্রত্যেকটা আঘাতকে অনায়াসে যান্ত্রিকের মতো ফেরত দিয়ে দিতে পারছে। একটু তির্যক হেসে বলল, ট্রাই ইট। চেষ্টা করে দেখো। আমি কোর্টে বলব আমার স্বামী হরিতলা কটন মিলে নকশালদের শেল্টার দিয়ে রেখেছে। আমার স্বামী আমাকে ফোর্স করেছে নকশালদের সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখতে, তাদের ফান্ড দিতে। সামলাতে পারবে তুমি আর তোমার পুলিশেরা?

শিপ্রা একদৃষ্টে চেয়ে থাকল দয়াল সান্যালের দিকে। দয়াল সান্যাল চুপ করে গেছেন। মনে মনে ভাবছেন শিপ্রার মধ্যে যে সাংঘাতিক একটা ক্ষুরধার বুদ্ধি আছে তার নিদর্শন বহুবার পেয়েছেন। এই বুদ্ধিটা যদি মায়ের প্যাচপ্যাচে সেন্টিমেন্টের জন্য না লাগিয়ে ব্যাবসার স্বার্থে লাগাত তা হলে আজ কোথায় চলে যেত ব্যাবসাটা। ভাবতে ভাবতে একবার শিপ্রার দিকে তাকাচ্ছেন আবার চোখ নামিয়ে নিচ্ছেন। তারপর খানিকটা স্বগতোক্তি করে বললেন, পুলিশের চোখ। পুলিশের সেন্স। এবার বুঝতে পারছি কেন কাল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং-এ পুলিশ আমাকে যেতে বারণ করছে। ঠিক আছে তোমার চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করলাম আমি। চেষ্টা করে দেখো যদি তুমি আমার ব্যাবসার বা জীবনের এক চুলও ক্ষতি করতে পারো। তবে পুলিশের কাছে খবর আছে, নকশালরা এ-বাড়িতে আসতে পারে। যদি আসে মহেশের বাড়িতে যেরকম এনকাউন্টার হয়েছিল, সেরকম আবার হবে। যতদিন না এটা সামলাতে পারছি, ছেলেটার কথা ভেবে জাস্ট গেট আউট।

নতুন করে আর চমকাল না শিপ্রা। এরকম কিছু হওয়ার প্রস্তুতি তো মনের মধ্যে হয়েই আছে। কিছুদিনের জন্য একটা থাকার আস্তানা চাই। শিপ্রা আর অপেক্ষা করল না। হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল দয়াল সান্যালের ঘর থেকে। কিন্তু দরজার মুখে এসেই থমকে দাঁড়াল। দরজার পাশে দেওয়াল ঘেঁষে কীরকম একটা আতঙ্কিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিট্টু। বিট্টুকে দেখে শিপ্রার এতক্ষণে ভেতরে চেপে রাখা জলটা বাঁধভাঙা হল। হাঁটু গেড়ে বসে বিট্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরা গলায় বলল, তুমি এখানে কী করছিলে সোনা?

বিট্টু কোনও উত্তর দিল না। শুধু শিপ্রার কাঁধ দুটো আর একটু খামচে ধরল। শিপ্রার ভেতরে একটা ভীষণ পাপবোধ আসতে আরম্ভ করল। বিট্টু বড় হচ্ছে। দয়াল সান্যাল অনেক খারাপ কথা বলেছে... শিপ্রাও মুখে মুখে তার উত্তর দিয়েছে। এসব কি বিট্টু শুনে ফেলেছে?

ঘরে এসে বিট্টুকে পড়াতে বসাল শিপ্রা। একটু পরেই বিট্টু বুঝতে পারল মাম্মির মধ্যে সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। বাবার সঙ্গে মাম্মির আড়ি চলছে সেটা বিট্টু জানে। আজ ঝগড়াও হল খুব। তারপরে মাম্মি একদম আনমনা হয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে মাম্মি কেঁদে ফেলছে।

বিট্টু ওর কচি তালু দিয়ে মায়ের চোখের কোল দুটো মুছিয়ে দিয়ে বলল, চলো মাম্মি। আমরা খেলি।

শিপ্রা বিট্টুকে বুকে জড়িয়ে টেনে নিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করল। বিট্টু যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে থাকল মায়ের মনখারাপ ঠিক করতে। কিন্তু কিছুতেই যেন আর পারছে না। এমনকী রাতে অন্ধকার ঘরে শুয়ে শেষ চেষ্টা করল মায়ের প্রিয় গল্পটা শুনতে চেয়ে যদি মায়ের মন ঠিক হয়।

মাম্মি! জিসাসের সেই গল্পটা বলো। আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি।

শিপ্রা বিট্টুকে আলতো করে চাপড় মারতে মারতে বলল, একদিন একটা মাঠে অনেকগুলো বাচ্চা ছেলে খেলছিল। জিসাস তখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। জিসাস দেখলেন মাঠের একধারে একটা ছেলে চুপ করে বসে আছে। খেলছে না...

শিপ্রা চুপ করে গেল। বিট্টু বলল, তারপর মাম্মি... জিসাস সেই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, কী হল তোমার? তুমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলছ না কেন? তাই না মাম্মি! তারপরে কী হল?

শিপ্রা বিট্টুর মাথায় আলতো করে বিলি কাটতে কাটতে বলল, বিট্টুসোনা, কয়েকদিন তুই মাম্মিকে ছাড়া থাকতে পারবি?

বিট্টু মায়ের দিকে ঘুরে গেল, তুমি কোথায় যাবে মাম্মি?

শিপ্রা আবার চুপ করে গেল। তারপর বিট্টুর কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, একটা কাজে সোনা। সেখানে বাচ্চাদের যেতে নেই। তুমি আমার ব্রেভ বয়। আমি দু'দিন থেকেই চলে আসব। এখানে সবাই থাকবে তোমার কাছে। হরিকাকাকে বলে দেব, সবসময় তোমার কাছে থাকবে, তুমি যা খেলতে চাইবে খেলবে।

তুমি এখনই চলে যাবে মাম্মি?

না সোনা, এখনই নয়। এখন তুমি ঘুমোও।

শিপ্রা আলতো করে ছেলের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে গুনগুন করতে থাকল, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

৮

সকালবেলায় বিট্টুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসার পর শিপ্রা ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে শিপ্রা কখনও বাড়ির ভেতর দরজা বন্ধ করে থাকে না। তাই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুতই লেগেছে হরিহরের। বাড়ির কোনও কাজের লোকের স্পর্ধা নেই মেমসাহেবের বন্ধ দরজায় ঠকঠক করে। একমাত্র সেই অধিকার আছে দু'জনের। বড়সাহেব আর বিট্টুবাবার। এদের মধ্যে প্রথম জন হয়তো দরজা বন্ধের ব্যাপারটা খেয়ালই করেননি। বা করে থাকলেও স্বভাবমতো পুরো অবজ্ঞা করে অফিস বেরিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় জন স্কুলে। তার ছুটি হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। তাতেই হরিহরের ছটফটানিটা বেড়েছে।

শিপ্রার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হরিহর গলাটা খাঁকরিয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে বলল, মেমসাহেব, বিট্টুবাবার স্কুলের ছুটির সময় হয়ে এসেছে। আপনি কি যাবেন, না আমি যাব?

হরিহরের আসল উদ্দেশ্য শিপ্রাকে সময় সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া। নেহাত একান্ত কোনও দরকারে আটকে না গেলে শিপ্রা নিজেই বিট্টুকে স্কুলে নিয়ে আসা-যাওয়ার কাজটা করে। তবে এখন যে সাহেব-মেমসাহেবের মধ্যে একটা সাংঘাতিক যুদ্ধ চলছে, সেটা আর পাঁচটা চাকরের মতো হরিহরও বোঝে। কয়েকদিন ম্যাডাম বিট্টুবাবাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। তার পর থেকে অনেক কিছু বদলে গেছে। সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেবের কথাবার্তা বন্ধ। বাড়িতে পুলিশের আনাগোনা, কাল রাতে দোতলায় সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেবের চিৎকার-চেঁচামেচি—অশান্তির সংকেতগুলো হরিহর একটা একটা করে মেলানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। মেমসাহেবের আনমনা হয়ে থাকাটাও লক্ষ করেছে হরিহর। এখন আবার বহুক্ষণ ধরে ঘরের দরজাটা বন্ধ। কখন কী ভুলে যায় ঠিক নেই। তাই বিট্টুর স্কুলছুটির সময়টা মনে আছে কিনা তা-ও ঠিক নেই।

একটু ভেতরে এসো তো হরিহর।

ঘরের ভেতর থেকে ডাক এল। দরজাটা অল্প চাপ দিতেই খুলে গেল। তার মানে দরজাটা বন্ধ থাকলেও ছিটকিনি দেওয়া ছিল না। ভেতরে ঢুকে হরিহর দেখল হালকা সাজগোজ করে শিপ্রা দাঁড়িয়ে আছে। মেঝেতে একটা বড় সুটকেস নামানো।

সুটকেসটা গাড়িতে তুলে দাও।

হরিহরের আবার সব গুলিয়ে গেল। মেমসাহেব যদি এখন সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে যায়, তা হলে বিট্টুকে স্কুল থেকে কে নিয়ে আসবে? গাড়িই বা পাবে কোথায়! বাড়িতে তো এই মুহূর্তে একটা মাত্র গাড়ি। সুটকেসের হাতলে হাত রেখে বিট্টুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব-করব করতে করতেই শিপ্রা বলল, শোনো হরিহর, কয়েকদিন আমি থাকব না। সাহেব আর বিট্টুর খেয়াল রাখবে। অন্যদেরও বলে দেবে। বিট্টু যেন ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করে দেখবে। রাতে ও যদি বাবার কাছে গিয়ে শোয় ভাল, না শুতে চাইলে এই ঘরের মেঝেতে এই ক'দিন তুমি একটু শোবে।

হরিহরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে দিতে শিপ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজটা পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে এল। পিছনে পিছনে সুটকেসটা ঘাড়ে করে হরিহর। সিঁড়ির মুখে এসে হরিহর আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, আমি তা হলে বিট্টুবাবাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসি মেমসাহেব?

না, তোমাকে যেতে হবে না। আমি বিট্টুর স্কুলে গিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দেব। বনোয়ারীলাল বিট্টুকে নিয়ে ফিরে আসবে।

হরিহর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। চাকর-বাকরদের কোনও প্রশ্ন না করা, কৌতূহল না দেখানোই দস্তুর এ-বাড়িতে। চুপচাপ সুটকেসটা ডিকিতে তুলে দিল। বিট্টুকে স্কুল থেকে আনার সময় মেমসাহেব হঠাৎ এত বড় একটা সুটকেস নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, তা হরিহরের মতো অবাক করল ড্রাইভার বনোয়ারীলালকেও।

কালকেই দয়াল সান্যালের কাছে খুব ধমক খেয়েছে বনোয়ারীলাল। দয়াল সান্যাল পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন বনোয়ারীলালকে, মেমসাহেবকে যেন গাড়ি থেকে নামতে না দেয়। আর তার পরেও যদি জেদ করে নেমে মেমসাহেব কোনও ট্যাক্সি ধরে, বনোয়ারীলাল যেন পিছন পিছন ফলো করে দেখে কোথায় যাচ্ছে সে। এর অন্যথা হলে অন্য জায়গায় চাকরি খুঁজতে হবে.বনোয়ারীলালকে।

বিট্টুর স্কুল পাঁচ মিনিটের পথও নয়। গাড়িটা ভাল করে গরম হয়ে ওঠার আগেই স্কুলে পৌঁছে যায়। স্কুলের গেটের মুখে শিপ্রা অন্য মায়েদের মতোই শান্ত হয়ে ছুটি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। তারপর ছুটি হলে বিট্টুকে নিয়ে গাড়িতে এসে বসে বনোয়ারীলালকে বলল, তুমি পাঁচ মিনিট ঘুরে এসো বনোয়ারী।

বনোয়ারীলাল গাড়ির পিছনে কিছুটা দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সেখান থেকে গাড়ির পিছনের কাচ দিয়ে গাড়ির ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মেমসাহেব ছেলেকে কিছু বোঝাচ্ছেন। মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বনোয়ারীলালের টেনশনটা বাড়তে থাকল। গাড়ির ডিকিতে বড় সুটকেসটা। ঘটনার গতিপথ খুব জটিল দিকে যাচ্ছে, চাকরিটা এরপর বাঁচাতে পারবে তো? দুশ্চিন্তাটা কুরে কুরে খাচ্ছে

পিছনের কাচ দিয়ে নজরদারি ছেড়ে আর একটু পিছনে একটা গাছের আড়ালে চলে এল বনোয়ারীলাল। ভেতরটা আনচান করছে। একটা বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিল। কিন্তু দ্বিতীয় সুখটানটা দেওয়ার আগেই বাজতে থাকল গাড়িটার হর্ন। বনোয়ারীলাল বিড়িটা

ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল গাড়ির কাছে। তারপর যে-আশঙ্কাটা করছিল সেটাই হল। শিপ্রা গম্ভীরভাবে বলল, বনোয়ারী, একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও তো!

বনোয়ারীলাল একটা ঢোক গিলে বলল, ট্যাক্সি কেন মেমসাহেব? আমার তো এখন আর কোনও ডিউটি নেই। আমি পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে।

শিপ্রা দৃঢ় গলায় বলল, না বনোয়ারী। তুমি বিট্টুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আমি যেখানে যাওয়ার ট্যাক্সি নিয়েই চলে যাব।

এবার সত্যিই বিপাকে পড়ল বনোয়ারীলাল। দয়াল সান্যালের কড়া নির্দেশ কীভাবে পালন করবে মাথায় কিছুতেই আসছে না। মেমসাহেব ট্যাক্সি নিয়ে কোথায় যাবে জানা নেই। এখন বিট্টুকে নিয়ে ট্যাক্সির পিছন পিছন কোথায় কতক্ষণ ঘুরবে? মরিয়া হয়ে উঠল সে, অন্তত মেমসাহেব কোথায় যাচ্ছে সেই তথ্যটুকু জেনে নেওয়ার জন্য। আমতা আমতা করে বলল, আপনি কোথায় যাবেন, কী বলব মেমসাহেব ট্যাক্সি ড্রাইভারকে?

শিপ্রা একটু চিন্তা করে বলল, বলো চিড়িয়ামোড়।

বিট্টুর স্কুলের সামনের রাস্তাটা ধরে একটু এগোলেই বড় রাস্তার মোড়। এই দুপুরে রাস্তায় ট্যাক্সির সংখ্যা কম। বনোয়ারীলাল মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকল, হে ঠাকুর! কোনও ট্যাক্সি যেন না পাওয়া যায়। আমার চাকরিটা বাঁচাও ঠাকুর!

ঈশ্বর কিন্তু বনোয়ারীলালের প্রার্থনা শুনলেন না। দুলকি চালে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল একদম গলি আর বড় রাস্তার মোড়ে। জায়গাটা থেকে সরাসরি দেখা যায় বিট্টুর স্কুলের উলটোদিকে দাঁড়ানো দয়াল সান্যালের গাড়িটা, যার ভেতর শিপ্রা আর বিট্টু বসে আছে। ট্যাক্সিটাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও পথ পেল না বনোয়ারীলাল। মেমসাহেব মোড়ে দাঁড়ানো ট্যাক্সি আর অপেক্ষমাণ বনোয়ারীলাল দুটোই দেখে ফেলেছে। এখন আর ফিরে গিয়ে বলা যাবে না, কোনও ট্যাক্সি পেলাম না মেমসাহেব। তাই অগত্যা ট্যাক্সিটাকে গন্তব্য বলে গলির মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। ট্যাক্সির ডিকিতে চালান করে দিল শিপ্রার সুটকেসটা।

বিট্টু কীরকম কাঠ হয়ে বসে আছে। শিপ্রা বিট্টুর কপালে দুটো চুমু দিয়ে একটু ধরা গলায় বলল, ভাল করে থেকো সোনা। আর যে-কথাগুলো বললাম সেগুলো মনে রাখবে। হরিকাকার কথা শুনবে আর একদম মন খারাপ করবে না।

শিপ্রা নিজেকে ভেতরে ভেতরে শক্ত করে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। আর একবারও ফিরে তাকাল না বিট্টুর দিকে। শিপ্রা জানে আর একবারও যদি বিট্টুর শুকিয়ে যাওয়া করুণ মুখটার দিকে তাকায়, নিজের সিদ্ধান্তে আর অটল থাকতে পারবে না।

টালা ব্রিজ পেরিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বললেন, দিদি, সামনেই চিড়িয়ামোড়, মোড়ে নামবেন না ডানদিক-বাঁদিক কোথাও যাবেন?

চিড়িয়ামোড়! শিপ্রা অবাক হয়ে বলল, এর মধ্যে চিড়িয়ামোড় চলে এল? এখানে আসব বলিনি তো? পরক্ষণেই শিপ্রার মনে পড়ে গেল, ও হো, বুঝতে পেরেছি। এটা দমদম চিড়িয়ামোড়। আমি যাব ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড়ে।

ট্যাক্সিটা রাস্তার একধারে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার বললেন, ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় আমি যেতে পারব না দিদি।

কেন পারবেন না? শিপ্রা রেগে উঠল।

ট্যাক্সি ড্রাইভার শিপ্রাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, দেখছেন না আমারটা হলুদ-কালো ট্যাক্সি। এগুলো কলকাতার ভেতর চলার ট্যাক্সি, ডানলপের ওদিকে যাওয়ার পারমিট নেই। আপনাকে একটা পুরো হলুদ ট্যাক্সি নিতে হবে।

শিপ্রা নরম হল। একটু অনুনয়ের সুরেই বলল, তা হলে ভাই, ওরকম একটা পুরো হলুদ ট্যাক্সি আমাকে ধরিয়ে দিন প্লিজ।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আবার স্টার্ট দিলেন। তাঁর জানা ছিল কোথা থেকে ব্যারাকপুর যাওয়ার ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে। সেরকমই একটা ট্যাক্সিতে শিপ্রার ব্যবস্থা করে ওর সুটকেসটা তুলে দিলেন।

বিটি রোড ধরে ব্যারাকপুরের দিকে এগোতে থাকল হলুদ ট্যাক্সিটা। শিপ্রা এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সিটে গা এলিয়ে বসল।

বিট্টুকে বাড়িতে নামিয়ে প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে বনোয়ারীলাল চলে এল দয়াল সান্যালের অফিসে। সাহেবকে এখনই খবরটা দিতে হবে।

অফিসে এসেই কানাঘুষোয় বনোয়ারীলাল জানতে পারল সাহেবের মেজাজ আজ সকাল থেকেই তিরিক্ষি হয়ে আছে। কারণে-অকারণে যাকে পারছেন ঝাড়ছেন। বুকের ধুকপুকুনিটা বেড়ে গেল বনোয়ারীলালের। বুক বেঁধে যখন দয়াল সান্যালের ঘরে ঢুকল তখন গলা শুকিয়ে গেছে। কোনওরকমে উগরে ফেলল মেমসাহেবের ঘটনাটা। পুরোটা বলে বনোয়ারীলাল অপেক্ষা করতে থাকল পেট্রলে আগুন লাগার অপেক্ষায়। অথচ দয়াল সান্যালের সেই প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াটা হল না। আপাতস্বাভাবিক গলাতেই জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় বললে, চিড়িয়ামোড়?

প্রথম ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো বনোয়ারীলাল একই ভুল করে বসল। নিজের অবস্থানকে শক্ত করতে জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার, দমদম চিড়িয়ামোড়।

দমদম চিড়িয়ামোড়... দমদম চিড়িয়ামোড়... নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। তারপর বনোয়ারীলালকে জিজ্ঞেস করলেন, চিড়িয়ামোড়ের রাস্তাগুলো কোনদিকে যেন গেছে?

বনোয়ারীলালের প্রাথমিক ভয়টা কেটে গেছে। গলার স্বর স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল, বাঁদিকটা কাশীপুর, সোজা সিঁথির মোড় আর ডানদিকে গেলে দমদম স্টেশন হয়ে মতিঝিল, নাগের বাজার স্যার।

দয়াল সান্যাল আবার নিজের মনে বিড়বিড় করতে থাকলেন, চারদিকটাই নকশালদের ডেন। আর কোথায় যাবে! পুলিশের গুলি খেয়ে মরা যার কপালে আছে, সে আর কোথায় যাবে!

বনোয়ারীলাল চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল। একসময় দয়াল সান্যাল বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও।

বনোয়ারীলাল বেরিয়ে যাওয়ার পর লালবাজারের নম্বরে টেলিফোনের চাকাটা

ঘোরাতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। সকাল থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিছুতেই এসিপি রায়কে ধরতে পারছেন না। একটু আগে পর্যন্ত এক'টা খবর দেওয়ার জন্য এসিপি রায়কে ফোন করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন, স্ত্রীর সম্বন্ধে আর কোনও দায়িত্ব তাঁর নেই। এটা কাগজে লিখে দিতেও প্রস্তুত উনি। পুলিশ যদি নকশাল ভেবে এখনই ফোর্স পাঠিয়ে লালবাজারে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে টর্চার করে শিপ্রাকে, তাঁর কোনও আপত্তি নেই। শুধু ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে রাজভবনে মিটিং-এ থাকার পারমিশনটা যেন পাওয়া যায়। এখন বনোয়ারীলালের কাছে ছেলেকে বাড়িতে ফেলে শিপ্রার বড় সুটকেস নিয়ে চিড়িয়ামোড় অঞ্চলে চলে যাওয়ার বাড়তি খবরটা পেয়ে এসিপি রায়কে দ্বিতীয় খবরটাও দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন, নকশাল হওয়ার বাসনায় তাঁর স্ত্রী স্থায়ীভাবে গৃহত্যাগ করেছে।

প্রৌঢ় সর্দারজি লাটবাগানের কাছাকাছি এসে শিপ্রাকে জিজ্ঞেস করলেন, সামনে চিড়িয়ামোড়। উঁহাসে কাহা যানা হ্যায় আপকো?

শিপ্রা ব্যাগ খুলে ব্যাঙ্কের পে-ইন স্লিপের পিছনে রবার্টের লিখে দেওয়া ঠিকানা আর পথনির্দেশটা পড়ে বলল, ধোবিঘাট আর সদর বাজারের মাঝামাঝি। ব্যারাকপুর কোর্টের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা ধরতে হবে।

ব্যারাকপুর কোর্ট মালুম হ্যায় জি, মগর ধোবিঘাট পুছনা পড়েগা। সর্দারজি বিড়বিড় করে বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক সাইকেল আরোহীকে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্রাদার... ধোবিঘাট কিস তরফ?

লোকটা চিড়িয়ামোড় থেকে বাঁদিকে আঙুলের ইশারা করল। নির্দেশমতো গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন সর্দারজি। এই রাস্তাটা একদম ফাঁকা। শান্ত, গাছগাছালিতে ঘেরা। শিপ্রার চোখ জুড়িয়ে গেল। আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটা চার্চ।

নিজের পুরনো ছেড়ে আসা ধর্মটা ভেতর থেকে চাগাড় দিয়ে উঠল। শিপ্রার ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে করল চার্চের মধ্যে একবার যেতে। সর্দারজিকে বলল গাড়িটা একটু দাঁড় করাতে। অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে সর্দারজিও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই আপত্তি করলেন না। ট্যাক্সিটা চার্চ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে বনেট খুলে ফেললেন। শিপ্রা সর্দারজিকে বলল, আপনি একটু ধোবিঘাটের রাস্তাটা জেনে নিন ভাল করে, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি। ডিকিতে সুটকেসটা রইল, খেয়াল রাখবেন।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে এগোচ্ছে সময়। অলস দুপুর ও বিকেলের সন্ধিক্ষণ। চার্চের কমপাউন্ডে ঢুকে শিপ্রা কাউকে দেখতে পেল না। মূল দরজাটাও বন্ধ।

কিচিরমিচির, কিচিরমিচির একঝাঁক সুরেলা চড়ুইপাখির ডাক কানে এল শিপ্রার। শব্দের উৎস খুঁজতে খুঁজতে দেখল, শীতে পাতা ঝরিয়ে ন্যাড়া হয়ে যাওয়া একটা গাছের ডালে অনেক চড়ুইপাখি খেলা করছে। পিছনে ডালপালার আড়ালে ক্ষীণতেজ সূর্য। ডালপালার আড়াল থেকে হলেও সূর্যের রশ্মি আর পাখিগুলো এক অদ্ভুত সিল্যুট তৈরি করেছে। দৃশ্যটা সম্মোহনী। ছড়ানো সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়ল শিপ্রা। চড়ুইগুলোর খুনসুটি দেখতে দেখতে তার মুখে ফুটে উঠল একটা নিষ্পাপ হাসি।

আজ কী বার যেন? কত তারিখ? এই ক'দিনের ঝড়ঝঞ্ঝায় বার, তারিখ সব গুলিয়ে গেছে শিপ্রার। চেষ্টা করতে মনে পড়ল, আজ শুক্রবার। কাল-পরশু বিটুর স্কুল ছুটি। তাই শুক্রবারকেই বেছে নিয়েছিল। তার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলল এতক্ষণ আসার সময় রাস্তায় দেখা পোস্টার আর দেওয়াল লিখনগুলো—'তেসরা ডিসেম্বর ব্রিগেডে ইন্দিরা গাঁধীর জনসভায় দলে দলে যোগ দিন'।

তেসরা ডিসেম্বর। মানে আর তিন সপ্তাহ পর ক্রিসমাস। শিপ্রার মনে পড়ে গেল কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং স্কুলে এই সময়েই ছুটি পড়ে যেত ক্রিসমাসের। ক্রিসমাসের ছুটি পড়ার আগে সিস্টার ক্রিস্টিনা এরকমই দুপুর-বিকেলের সন্ধিলগ্নে একদঙ্গল মেয়েকে নিয়ে বসতেন লনে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে সামনে রেখে তখন সবাই মিলে গাইত ক্রিসমাস ক্যারলস।

নিস্তব্ধ দুপুরে নিঃসঙ্গ হয়ে চার্চের লনে হঠাৎ শিপ্রার মনে হতে লাগল, পৃথিবীটা যেন আবার সুন্দর হয়ে উঠছে। এই সুন্দর পৃথিবীতে রক্ত, বন্দুকের গুলি, ক্ষমতার লড়াই, অপরিমিত লোভ কিছুই নেই। আছে শান্তি, আছে বারুদের গন্ধহীন নির্মল আকাশ যেখানে বিকেলে বাসায় ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পাখিরা প্রাণ খুলে গান গাইতে পারে, খেলা করতে পারে। আর এই পৃথিবীতে বিটুকে নিয়ে সে একা নয়। তার স্কুলের বন্ধুরা, সিস্টার ক্রিস্টিনা, ব্রাদার ডি'সুজা সবাই আছে তার সঙ্গে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে। হয়তো এই চার্চের পিছনেই। এখনই চলে আসবে ওরা। পাখিদের কিচিরমিচির শুনে হাততালি দিয়ে উঠবে। ক্রিসমাসকে স্বাগত জানিয়ে পাখিরা আর ওরা একসঙ্গে গেয়ে উঠবে ক্রিসমাস ক্যারলস।

গুনগুন করে শিপ্রা গাইতে থাকল প্রিয় একটা ক্যারলস—হি কেম টু টেল দ্য ফাদার্স লাভ...

ভিজে ভিজে মাটির মাতাল গন্ধ ভেসে আসছিল। একজন মালি লম্বা একটা জলের পাইপ নিয়ে ফুলগাছ আর সবুজ ঘাসে জল দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ করে দেখল একটা সুন্দরী মেয়ে ঘাসের ওপর বসে উদাস হয়ে ডালপালা ছড়ানো ন্যাড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে আর আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছে। কলটা বন্ধ করে পাইপের জলের উৎসটা বন্ধ করল মালি। তারপর শিপ্রার কাছে এগিয়ে এসে বলল, দিদি, কাউকে খুঁজছেন?

সংবিৎ ফিরে পেয়ে শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, খুব সুন্দর জায়গাটা! কী শান্তি এখানে, তাই না?

এর উত্তর মালির জানা নেই। বরং অন্য প্রশ্ন তার মনে। এই নির্জন দুপুরে ভদ্রবাড়ির একজন সুন্দরী মেয়ে চার্চের পিছনের লনে একা একা বসে কী করছে?

মালির কোনও প্রতিক্রিয়া না পেয়ে শিপ্রা বলল, একটু যাওয়া যাবে চার্চের ভেতরে? জিসাসের সামনে দু'মিনিট বসতাম।

মালি মাথা নাড়ল, নাঃ, এখন বন্ধ। এখন যাওয়া যাবে না।

কখন আসা যাবে?

মালি তখন এই অবাঞ্ছিতকে চার্চের বাইরে বার করে দিতে পারলে বাঁচে। দায়সারা ভাবে বলল, পরে আসুন, পরে আসুন... পরশু আসুন... পরশু রবিবার... রবিবার সকালে।

ট্যাক্সিতে ফিরে এল শিপ্রা, যতক্ষণ বলে গিয়েছিল সর্দারজিকে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কাটিয়ে এসেছে। তবে এতে সর্দারজির কোনও বিরক্তি দেখল না শিপ্রা। শিপ্রা উঠে বসতেই খোশমেজাজে স্টিয়ারিং-এ হাত রাখলেন। শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, জেনে নিয়েছেন ধোবিঘাট কোথায়?

গুরুমুখী টানে সর্দারজি বললেন, পুরা মালুম কর লিয়া বহেনজি। সদর বাজার ভি পতা কর লিয়া।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগোতে এগোতে সর্দারজি বলতে থাকলেন, ইয়ে যো জাগা দেখ রহে হ্যায় না বহেনজি, ইয়ে পুরা মিলিটারি এরিয়া হ্যায়। পঞ্জাব মে মেরা গাঁও সে তিস মাইল দূর, অ্যায়সেহি এক জাগা হ্যায়।

সারা ভারতেই মিলিটারিদের জায়গার একই রকম চেহারা। আলাদা করে চিনিয়ে দিতে হয় না। মিলিটারিদের নানান রকম পথচিহ্ন, একই রঙের বাড়ি, ইতস্তত এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে থাকা জলপাই রঙের যানবাহন—সর্বত্র একটা মৌলিক পরিচিতি এনে দেয়। সর্দারজির হয়তো এসব দেখে মনে হচ্ছে পঞ্জাবের গ্রামের তিরিশ মাইলের মধ্যে চলে এসেছে। তাই এত খোশমেজাজ। সর্দারজির মন রাখতে শিপ্রা বলল, আপনি তা হলে এখানে নিশ্চয়ই প্রায়ই আসেন?

নেহি বহেনজি, কয়ি বার আয়ে হ্যায়, মগর বহুত নেহি আয়ে। কভি কভি ব্যারাকপুর কোর্ট কা প্যাসেঞ্জার মিলতা...

মিলিটারিদের এলাকার মধ্যে দিয়ে ধোবিঘাটের কাছে এসে পৌঁছে গেল সর্দারজির ট্যাক্সি। ছোট এলাকা। কেউ কেউ অবাক হল, সদরবাজার যাওয়ার জন্য ঠিকানাটা ধোবিঘাট থেকে দেওয়া কেন? তবে এভাবেই দু'-একজনকে জিজ্ঞেস করে অনায়াসেই শিপ্রা খুঁজে পেয়ে গেল ক্যাথি গোমসের বাড়ি।

সাদামাটা দোতলা মধ্যবিত্ত বাড়ি। কিছুক্ষণ আগে যে-সুন্দর সাজানো-গোছানো অনুশাসিত সৈন্যবাহিনীর অঞ্চলটা পেরিয়ে এল, তার সঙ্গে এই জায়গাটার মিল নেই। বাড়িটার গেটের মুখে ভ্যানগাড়ির ওপর ছাউনি করা একটা পান-সিগারেটের দোকান। এই সময়ে সেই দোকানেও কোনও খদ্দের নেই। ওইটুকু গুমটির মধ্যে দোকানদার কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

ক্যাথি গোমসের বাড়ির শেষ পথনির্দেশ হিসাবে রাস্তার একটা লোক বলছিল এই পান-সিগারেটের দোকানের লাগোয়া বাড়িটা। তবু শিপ্রার একটু ইতস্তত লাগছিল সব দরজা-জানলা বন্ধ বাড়িটায় এত বড় একটা সুটকেস নিয়ে ঢুকে পড়তে।

শেষপর্যন্ত বাড়িটার দরজায় এসে কলিংবেল খুঁজে না পেয়ে কড়া নাড়ল শিপ্রা। বারদু'য়েক নাড়ার পরই একটা অল্পবয়সি মেয়ে এসে দরজাটা খুলে শিপ্রার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। শিপ্রা নরম করে হেসে বলল, ক্যাথি আন্টি আছে?

মেয়েটার মুখচোখ দেখে মনে হল শিপ্রার প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি অথবা ক্যাথি আন্টি নামটাই কোনওদিন শোনেনি। শিপ্রা ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল। ঠিক বাড়ির কড়া নাড়ল তো! রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে রবার্টের লেখা ঠিকানাটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। শিপ্রা ভাবছিল ঠিকানাটা বলে মেয়েটার কাছে মিলিয়ে নেবে ঠিক বাড়িতে এসেছে কিনা, এমন সময় ভেতর থেকে একটা গলা ভেসে এল, কে এসেছে রে বাবলি?

পূর্ববঙ্গীয় টানে মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে বলল, একজন খোঁজ করছে মাসি! তোমায় আন্টি-আন্টি করে খুঁজছে।

শিপ্রার ভেতরে তখন সমুদ্রের ঢেউ খেলছে। যে-গলাটা এখনই শুনল, সেটা একটুও পালটায়নি। অবিকল একইরকম মিঠে আছে ক্যাথি আন্টির গলা। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল ক্যাথি আন্টিকে দেখার জন্য।

মেয়েটা ভেতরে আসতে বলল কি বলল না তার তোয়াক্কা করল না শিপ্রা। কোনওরকমে সুটকেসটা হিঁচড়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দ্রুত পায়ে এসে জড়িয়ে ধরল ক্যাথি আন্টিকে।

দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কারওই মুখে কোনও কথা ফুটল না। শিপ্রার কাঁধে চিবুকটা রেখে ক্যাথি গোমস বললেন, কালকেই রবার্টের সঙ্গে ফোনে কথা হল। বলল, তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুই ঠিকানা নিয়েছিস, কিন্তু তুই যে সত্যিই আসবি, আজই চলে আসবি, এটা আমি ভাবতে পারিনি শ্যারন...

শিপ্রা গলায় অভিমান ফোটাল, কেন, আমি আসতে পারি না? তোমরাই তো কোনও যোগাযোগ রাখোনি আমার সঙ্গে। মা চলে যাওয়ার পরে একটা খোঁজও নাওনি।

ক্যাথির চোখটা ছলছল করে উঠল। তবে চোখের জল উনি শিপ্রাকে দেখাতে চান না। শিপ্রার পক্ষে হয়তো সত্যিই অসম্ভব ছিল তাকে খুঁজে বার করা, কিন্তু তাঁর পক্ষে মোটেও অসম্ভব ছিল না দয়াল সান্যালের স্ত্রী শিপ্রা সান্যালকে খুঁজে বার করার। আসলে বন্ধু মার্থার একটা ইচ্ছেকে ক্যাথি সম্মান জানিয়েছিলেন, শিপ্রার বিবাহিত জীবনে তাঁদের অতীত জীবনের কোনও ছায়া কোনওদিন পড়তে দেননি।

শিপ্রার কাঁধে চিবুকটা রেখে ক্যাথি গোমস বললেন, বোকা মেয়ে, বড়রা ছোটদের কাছে আসে, না ছোটরা বড়দের কাছে যায়? আমিও তো খুব অভিমান করেছি। আমার শ্যারন বেবি বুড়ি আন্টিটার কোনও খোঁজ রাখল না। নেহাত রবার্টের সঙ্গে তোর ব্যাঙ্কে দেখা হয়ে গিয়েছিল, না হলে তুই কি আমার কোনও খোঁজ নিতিস?

সরি আন্টি। তবে যেই তোমার খোঁজ পেয়েছি, একদম এত বড় একটা সুটকেস নিয়ে তোমার কাছে থাকতে চলে এসেছি, তুমি তাড়িয়ে না দিলে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।

ক্যাথি গোমস এবার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন। তারপর শিপ্রার কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বললেন, বরের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিস বুঝি?

তোমাকে পরে সব বলব আন্টি। এখন আগে আমাকে চা খাওয়াও।

ক্যাথি গোমসের অভিজ্ঞ চোখ। শিপ্রার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝলেন দাম্পত্যে কোনও গোলমাল আছে। তবে এই নিঃসঙ্গ জীবনে পুরনো দিনের প্রিয়জন কাউকে পেয়ে মনে মনে খুশি হলেন। দয়াল সান্যালের সঙ্গে ঝগড়া করে মেয়েটা যদি ক'দিনের জন্য তাঁর কাছে থাকতে এসেছে, তা হলে বেশ হয়েছে। বিচ্ছেদ থেকে বিরহ হয়। বিরহে দাম্পত্য নিটোল হয়। সুতরাং যে-ক'দিন মেয়েটা থাকবে নিজের ব্যড়ি মনে করে থাকুক এখানে। শিপ্রাকে চিরকাল নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করে গেছেন তিনি, তা ওর মায়ের সঙ্গে এককালে যতই পেশাগত রেষারেষি থেকে থাকুক না! কখনও কখনও তো এই স্বপ্নও বুনতেন, ছেলের বউ করে শ্যারনকে ঘরে তুলবেন উনি। পুরনো স্মৃতির অন্যমনস্কতা কাটিয়ে গলা চড়িয়ে ক্যাথি বললেন, বাবলি, চায়ের জল চাপা তো!

মেয়েটা কে গো আন্টি? ঠিক কাজের লোক মনে হল না!

ক্যাথি গোমস দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, না ওকে কাজের মেয়ে ভাবিস না। ওপার বাংলার মেয়ে। রিফিউজিদের ঢলে পালিয়ে এসেছে। বড় বাড়ির মেয়ে। খারাপও লাগে ওকে দিয়ে কাজ করাতে।

ওমা তাই? ইস, তা হলে ছেড়ে দাও, ওকে চা করতে বলতে হবে না, পরে আমি সবার জন্য চা বানাব।

ক্যাথি গোমস আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, না রে, বাড়ির ফাইফরমাশ খাটুক তাও ভাল। পিছলে গিয়ে যেন আমার মতো আর একটা জীবন না হয়।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিল, তুমি কিন্তু আন্টি অনেক বুড়িয়ে গেছ। কী সুন্দর টানটান মাখনের মতো স্কিন ছিল তোমার...

ওমা, সে কী কথা! বয়স বাড়বে না আমার? এই তো দেখ না চোখে ছানি পড়েছে। ডাক্তার এ বছরই চেয়েছিল কাটতে, আমি বলেছি সামনের ক্রিসমাসের পরে যদি বেঁচে থাকি...

শিপ্রা চেয়ারের হাতলে হাত ঠেকিয়ে বলল, বাজে কথা বলো না তো... টাচ উড...

ক্যাথি গোমস ভারী গলায় বললেন, বাজে কথা নয় রে। জিসাসের কাছে সবসময় প্রার্থনা করি তোর মায়ের মতো না ভুগে, ছেলেকে না ভুগিয়ে টুক করে যেন ওপরে চলে যেতে পারি। জানি না জিসাস আমার প্রেয়ার শুনবেন কিনা।

শিপ্রা এবার ভাল করে দেখল ক্যাথি আন্টিকে। এককালে তার মায়ের মতো রূপসি মহিলার মন আর শরীর দুটোই অনেক পালটে গেছে। কিছুতেই মেলানো যায় না যৌবনে পুরুষের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া সেই নারীর সঙ্গে। এখন শরীর শিথিল হয়ে স্থূল হয়েছে। পৃথিবীকে পায়ের তলায় রেখে দেওয়ার উদ্ধত উন্নাসিকতাও আর নেই। জীবন সম্পর্কে ক্যাথি আন্টির এই উদাসীনতা, এই দার্শনিকতা আগে কখনও দেখেনি শিপ্রা।

বাবলি একটা থালার ওপর দু'কাপ দুধ ছাড়া চা নিয়ে এল। শিপ্রার একটু খারাপ লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বাবলির হাত থেকে থালাটা নিয়ে বলল, দু'কাপ কেন? তোমার কই?

আমি চা খাই না।

বসো। বাবলিকে নিজের পাশে বসতে ইশারা করল শিপ্রা।

বাবলি কিন্তু বসল না। চা-টা পৌঁছে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাবলি বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্যাথি বললেন, মেয়েটা খুব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

ও একাই ওপার বাংলা থেকে এসেছে বুঝি?

না, ওর বাবা মা ভাই বোন সবাই এসেছে। সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ভাবি, এই পরিবারটা খুব লাকি বুঝলি! অন্তত পরিবারের সকলের একটা করে মাথাগোঁজার ঠাঁই হয়েছে, খাওয়াপরার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ওদের মতো কত যে হাজার হাজার লোক আসছে... তারা কিছুই করতে পারছে না। যাক গে, তোকে একটা জিনিস একটু জানিয়ে রাখছি, ওকে ও-বাংলার কথা কিছু জিজ্ঞেস করিস না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে শিপ্রা বলল, ভাল করলে বলে রাখলে, কী জানি কখন কী জিজ্ঞেস করে ফেলতাম! মাঝে মাঝে খুব জানতে ইচ্ছে করে ওপার বাংলাটা কেমন। কিন্তু ওকে জিজ্ঞেস করতে বারণ করছ কেন বলো তো?

ওর চোখে কষ্ট আর আতঙ্কটা দেখতে পাই রে! কয়েক মাস আগেও বড়লোকের আহ্লাদি বেটি ছিল। তারপর সব ছেড়েছুড়ে প্রতি মুহূর্তে সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে রেপ্‌ড হওয়ার আতঙ্কটা নিয়ে না খেয়ে, না দেয়ে এদেশে এসেছে। ভীষণ ভয় হয় রে, ওর শরীরটাকে দেখে। এককালে আমরা ওত পেতে বসে থাকতাম এরকম শরীব পাওয়ার জন্য। কত অন্যায়ই না করেছি, অত্যাচার... পাপ.. জিসাসের কাছে করুণা ভিক্ষা করারও যোগ্যতা নেই আমার।

বাবলির প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে ক্যাথি আন্টি। শিপ্রাও প্রসঙ্গটা ঘোরানোর চেষ্টা করল, ছাড়ো না আন্টি ওইসব কথা। যে-জীবনটা ছেড়ে এসেছ, সেটা ছেড়ে এসেছ। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। আসার সময় দারুণ একটা চার্চ দেখলাম। দুপুরে বন্ধ ছিল। ভাবছি রবিবার সবাই মিলে যাব। তুমি যাবে তো?

আমি চার্চে যাই না রে শ্যারন। কিন্তু তুই কেন চার্চে যাবি? তুই এখন হিন্দু হয়ে গিয়েছিস না?

হিন্দু হয়ে গিয়েছি বলে কি চার্চে যেতে পারি না?

কী জানি, পারিস হয়তো। ঈশ্বর তো মনের ব্যাপার। তবে তুই তো দেখছি নামেই হিন্দু হয়েছিস। মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা-পলা কিচ্ছু নেই!

শিপ্রা হেসে উঠল, পায়ে আলতাটা বাদ দিলে কেন আন্টি!

ক্যাথি গম্ভীর হয়ে বললেন, এসব কথা আমার মুখে মানায় না, তাই না রে শ্যারন?

শিপ্রা একটু চুপ করে থাকল। তারপর নিচু ফিসফিসে গলায় বলতে থাকল, আদর্শ হিন্দু বউ মানে কী আন্টি? বাড়িতে একটা ছোট তুলসীতলা থাকবে। সন্ধেবেলায় লালপাড় শাড়ি পরে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজাবে, বাড়িতে উপোস করে ষষ্ঠী করবে। সবই আমি হয়তো করতাম আন্টি। হয়তো ভালবেসে ভক্তিভরেই করতাম। কিন্তু কিছুই হতে দেয়নি দয়াল সান্যাল।

এবার প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করলেন ক্যাথি। আধঘণ্টাও হয়নি মেয়েটা বাড়িতে এসেছে। সঙ্গে বড় একটা সুটকেস। পরশু চার্চে যাবে বলছে। তার মানে বেশ কয়েকদিন থাকতেই এসেছে। অনেক সময় আছে দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসার। ক্যাথি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তোর একটা ছেলে আছে না? কত বড় হয়েছে? ওকে নিয়ে এলি না কেন?

ছয় পেরিয়েছে। তোমাকে পরে একসময় সব বলব আন্টি।

ঠিক আছে। আয় তোকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিই। এতটা রাস্তা এসেছিস। মুখেচোখে জল দিয়ে আয়। তারপর বসে বসে অনেক গল্প হবে। তোর ছেলের গল্প শুনব।

শিপ্রা আপত্তি করল না। সুটকেস খুলে তোয়ালে বার করে স্নানঘরে চলে গেল।

৯

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ছাদে রোদ পোহাতে ওঠেন ক্যাথি গোমস। শীতকালে বেলা ছোট। ইদানীং রোদ পোহাতে পোহাতে উল বোনেন। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই হাতের বোনাটা শেষ করে ফেলতে হবে। তাই প্রত্যেক দিন কতটা বুনবেন একটা লক্ষ্য ঠিক করে রাখেন। আজ তার থেকে খানিকটা পিছিয়ে রয়েছেন। শিপ্রার বাথরুমে যাওয়ার সুযোগে হাতে তুলে নিলেন উল বোনার কাঁটা দুটো।

কাঁটার সঙ্গে কাঁটার নিখুঁত সংগত হচ্ছে। তার মধ্যে আঙুলের প্যাঁচে জন্ম নিচ্ছে একটা করে ঘর। এক-একটা করে উলের ঘরের সঙ্গে লক্ষ্যপূরণের দিকে আর একটু এগিয়ে যাচ্ছেন ক্যাথি। অথচ মনের ভেতর তোলপাড় হচ্ছে কত পুরনো দিনের স্মৃতি। শ্যারনের মায়ের সঙ্গে কাটানো সুখ-দুঃখের দিনগুলো।

মার্থা মেয়ে হিসেবে খুব জেদি ছিল। তবে বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। মার্থার মেয়ে শ্যারন আর ক্যাথির ছেলে রবার্টের জন্ম কাছাকাছি সময়েই। শ্যারন অল্প কয়েক মাসের বড়। আসলে সেবার যখন মার্থা পেটের বাচ্চাটাকে রেখে দিল, ক্যাথিও তার কয়েক মাস পরে গর্ভবতী হয়ে মার্থার দেখাদেখি একই সিদ্ধান্ত নিল। তারপর যখন শ্যারন জন্মাল, অনেকে ভেবেই নিয়েছিল, মার্থা তার পেশার উত্তরাধিকারের জন্ম দিল। এ ছাড়া আর কী-ই বা ভাবতে পারত অন্যরা! মার্থার মা, ক্যাথির মা এভাবেই তো জন্ম দিয়েছিল তাদের উত্তরাধিকারের! মুষড়ে পড়েছিল মার্থা। দিনরাত শুধু ভাবত কীভাবে দেহব্যাবসার আঁচ থেকে আগলে রাখবে মেয়েকে। শ্যারনের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই জন্ম হয়েছিল রবার্টের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার্থাই সব করতে পেরেছে। মেয়েকে কনভেন্ট বোর্ডিং স্কুলে পড়িয়েছে, বড়লোক বাড়িতে বিয়ে দিতে পেরেছে, এমনকী সম্পত্তি-টাকাকড়িও রেখে যেতে পেরেছে মেয়ের জন্য।

আর ক্যাথি নিজে? নিজের ভুলেই মার্থার মতো জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে পারেনি। যখন রাজরানির মতো জীবন ছিল, বেহিসেবির মতো বইয়ে দিয়েছে। খেয়াল রাখেনি শিক্ষাদীক্ষার মানদণ্ডে কীভাবে ক্রমশ ফারাকটা একটু একটু করে বেড়ে গিয়েছিল রবার্ট

আর শ্যারনের মধ্যে। বোকার মতো রবার্টের মা হিসেবে ক্যাথি চিরকাল একটা সুপ্ত বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করে যেত—যতই মার্থা আগলে রাখুক শ্যারনকে, যতই বড় করে তুলুক শিক্ষাদীক্ষায়, শেষ পর্যন্ত কে বিয়ে করবে একজন বেশ্যার মেয়েকে! মার্থাকে একদিন আসতেই হবে ক্যাথির কাছে রবার্টকে জামাই করার জন্য।

সেসব দিনকাল অন্যরকম ছিল। তাই এই সুপ্ত বাসনাটা কখনও কারও কাছে প্রকাশ করেননি ক্যাথি। তবে একটু একটু করে বড় হতে দেখা শ্যারনকে মনে মনে ভীষণ আদরের টুকটুকে মিষ্টি ছেলের বউ বলেই নিজের মনে স্থান দিয়েছিলেন ক্যাথি। সেই মায়াটা আজও কমেনি।

জীবনে যেমন অনেক সযত্নে লালন করা বাসনা মেলে না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। মার্থার সঙ্গে ছিল আধবুড়ো ম্যাকার্থি। ম্যাকার্থি হরিতলায় এককালে একটা কারখানা বানানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কারখানাটা শেষ করতে পারেনি ম্যাকার্থি। বড় বড় শেড দেওয়া কারখানার বাড়িটা শুধু করতে পেরেছিল, তারপর যন্ত্রপাতি আর কিছুই আনাতে পারেনি। তবে অত বড় পাঁচিলঘেরা জায়গাটার মধ্যে বানিয়ে নিতে পেরেছিল একটা ছোট বাংলোবাড়ি। সেই বাংলোতেই বছরের অনেকটা সময় থাকত ম্যাকার্থি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, সেটা ছিল ম্যাকার্থির গোপন ডেরা। ম্যাকার্থির তখন গলা অবধি দেনা। পাওনাদাররা ছিনে জোঁকের মতো লেগে ছিল। এদের থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকার একটাই জায়গা ছিল—হরিতলা।

কিছু কিছু খদ্দেরের সঙ্গে সম্পর্কটা কখনও কখনও একটু গাঢ় হয়ে যায়। চোরাস্রোতের মতো মন দেওয়া-নেওয়া চলে। ম্যাকার্থির সঙ্গে সেই সম্পর্কটাই কোনও একদিন শুরু হয়ে গিয়েছিল মার্থার। অবশ্য ম্যাকার্থির শেষ বয়সে মাথাখারাপ হয়ে যায়, তারপর একদিন হারিয়ে যায়। নিন্দুকেরা বলে দুটো ঘটনার পিছনেই মার্থার হাত ছিল। শ্যারন হয়তো ম্যাকার্থিরই মেয়ে। মার্থা অবশ্য স্পষ্ট করে এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলেনি। তবে মার্থা গর্ভপাত করায়নি বলেই এই সন্দেহটা হয়েছিল ক্যাথির। যে-মার্থা নিজের পেশার জন্য ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাইরে যেত না, সেই মার্থাই একদিন শীতের রাতে গাড়িতে চেপে চলে গেল হরিতলা! তারপরের অভিজ্ঞতাটা মার্থার কাছে বহুবার শুনেছে ক্যাথি।

হরিতলায় সে এক আশ্চর্য ভোর ছিল। রাতে পৌঁছে জায়গাটা কেমন অন্ধকারে টের পায়নি মার্থা। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে ম্যাকার্থির সঙ্গে শরীরের ক্রীড়া আর অপরিমিত মদ্যপান। বেহেড পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে গভীর রাতে ঘুমোতে গিয়ে ভোরে ঘুম ভাঙার কথা ছিল না। অথচ তার মধ্যে নানা সুরে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ। কমলা রোদ একটু একটু করে তেজি হচ্ছে। গলিয়ে দিচ্ছে ঘন কুয়াশার আস্তরণ। একটু একটু করে ফুটে উঠছে টলটলে একটা ঝিল। ঝিলকে ঘিরে বড় বড় গাছ। আর গাছগুলোয় নানা জাতের পাখি।

মার্থা বলত, সেই ভোরটা ছিল তার জীবনের পবিত্রতম দিন। কারণ, পাখিগুলোর ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎ নাকি সে অনুভব করেছিল তার পেটের মধ্যেও একটা পাখি। সে-পাখি অন্ধকারে থাকতে চায় না। মুক্ত হতে চায়, ইচ্ছে-স্বাধীন হতে চায়।

আস্তে আস্তে হাতটা নামিয়ে এনেছিল তলপেটের ওপর। জীবনের পবিত্রতম সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল, এই পাখিটাকে মেরে ফেলবে না কোনওদিন।

সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে ম্যাকার্থির সঙ্গে কী চুক্তি হয়েছিল মার্থার, তা শ্যারনের বাবা ম্যাকার্থি ছিল কিনা-র মতোই স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট করে জানা না গেলেও তখন একটা কথা খুব চালু ছিল। তা হল, ম্যাকার্থি কিছু টাকার জন্য মার্থার কাছে নাকি কারখানাটা বন্ধক রেখেছিল। তবে যেভাবেই পেয়ে থাক, মার্থার একটা অদ্ভুত মোহ জন্মেছিল ওই সম্পত্তি আর বিশেষ করে ম্যাকার্থির বাংলো বাড়িটার জন্য। কাগজে-কলমে যাই হয়ে থাকুক, হরিতলায় আধবানানো কটন মিলের মালকিন কিন্তু হয়ে গেল মার্থাই। প্রায়ই যেত সেখানে। বিশেষ করে শ্যারন যখন বোর্ডিং থেকে ছুটিতে কলকাতায় আসত মার্থা ওকে নিয়ে চলে যেত হরিতলায়।

শ্যারন বড় হল। কার্শিয়াং-এ পড়া শেষ করে কলকাতায় ফিরে এল। পার্ক সার্কাসে একটা বাড়ি ভাড়া করে মেয়েকে রাখল মার্থা। কলেজে পড়াল। তারপর ইউনিভার্সিটিতে। এই সময়েই আর একবার নতুন করে শ্যারনকে নিয়ে খুব বিচলিত হয়েছিল মার্থা। সন্দেহ করত মেয়েটা ইউনিভার্সিটির কোনও ছেলের প্রেমে পড়েছে। অথচ ছেলেটা কিছুতেই দেখা করতে আসত না মার্থার সঙ্গে। মার্থা ভয় পেল এই ভেবে, যে-ছেলের এইটুকু সৎসাহস নেই একজন বেশ্যার কাছে এসে তার মেয়ের হাতটা চেয়ে নেওয়ার, সে বাকি জীবন কীভাবে সাহসের সঙ্গে বউয়ের বংশ পরিচয় নিয়ে কাটাবে, সামাজিক স্বীকৃতি দেবে তাকে! দু'দিনের মোহ কেটে গেলে তারপর যদি আগুনে পুড়িয়ে মেরে দেয় মেয়েটাকে!

ক্যাথি তখন মজা দেখত। ভাবত যে-কোনও মুহূর্তে মার্থা এসে হাত দুটো জড়ো করে বলবে, আমার শ্যারনকে তুই রবার্টের জন্য নে ক্যাথি। ক্যাথির এই আত্মবিশ্বাসটাই তার দীর্ঘদিনের সযত্নে লালন করা স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিল। কারণ ঠিক সময়ে সৎসাহসটা দেখিয়ে ফেলল শ্যারনের চেয়ে বয়সে অনেক বড় দয়াল সান্যাল।

একদিন ম্যাকার্থির হাত ধরে দয়াল সান্যাল এসেছিল মার্থার কাছে। দয়াল সান্যাল সেদিন মার্থার কাছে কোনও মেয়ে কিনতে চায়নি, কিনতে চেয়েছিল হরিতলার দলিল। শ্যারনকে অর্ধাঙ্গিনী করতে দয়াল সান্যাল দুটো শর্ত রেখেছিল। একটা বৈষয়িক, অন্যটা ধর্মীয়। হরিতলা কটন মিল আর শ্যারন থেকে শিপ্রা। বৈষয়িক ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও দয়াল সান্যাল কেন শ্যারনকে ধর্মান্তরিত করে শিপ্রা করেছিল, সেটা কখনও বুঝতে পারেনি ক্যাথি। দয়াল সান্যালকে যেটুকু দেখেছিল তাতে লোকটাকে খুব একটা ধার্মিক মনে হয়নি ক্যাথির। এমনকী ওদের অনাড়ম্বর বিয়েতে পাত্রপক্ষের বাড়ির কাউকে দেখেনি।

এতদিন পর ক্যাথি আবার মনে করার চেষ্টা করল সেদিন কীসে মার্থার বেশি দুঃখ হয়েছিল, শরীর বিক্রির সঞ্চয়ে কেনা প্রিয়তম সম্পত্তিটা জামাইয়ের অধিকারে ছেড়ে দেওয়ায়, না মেয়ের ধর্মান্তরে। উত্তরটা ক্যাথি কোনওদিন পায়নি। তার আগেই সব কিছু গুছিয়ে ঘৃণ্য জীবনটাকে ছেড়ে একদিন গোরস্থানে শুতে চলে গেল মার্থা। কিন্তু সত্যি কি শান্তি পেয়েছিল নিজের জীবনটাকে দেখে?

এক-একটা দিন এমন থাকে, যার স্মৃতি রঙিন সিনেমার মতো টাটকা। সেরকমই একটা দিনের কথা আজও মাঝে মাঝে স্পষ্ট মনে পড়ে। মার্থা সেদিন খুব সাজগোজ করছিল। ক্যাথি গিয়ে চোখ মটকেছিল, কী রে? দিদিমা হতে চললি, চোদ্দোটা মেয়ের মালকিন তুই, আর এত টাকার কী দরকার তোর?

মার্থা খোঁচাটা গায়ে মাখেনি। বলেছিল, জামাইকে বলেছিলাম, তুমি কারখানা করো, কিন্তু ওই যে ম্যাকার্থির বাংলোটা পাঁচিল ঘেঁষে হরির ঝিলের দিকে আছে ওটাকে তুমি পাঁচিলের বাইরে করে দাও। এইসব পাপের ব্যাবসা ছেড়ে বাকি জীবনটা ওখানেই থাকব। তা জামাই বলছে একদিন গিয়ে দেখতে কীভাবে কী হবে, আজকে দেখে আসি। সব ঠিকঠাক হলে মহেশকে নিয়ে চলে যাব। মহেশ কারখানার কাজও করবে কিছু একটা আর আমার দেখাশোনার জন্য থাকবে...।

ক্যাথি সেদিন খুব ঈর্ষা করেছিল মার্থার ভাগ্যকে। নিজের বেহিসেবি জীবনটায় কিছুই গোছানো হয়নি। এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও যেতে তার মনও তো চায়। কিন্তু একটা বাড়ি করার মতো পয়সাও জমিয়ে রাখতে পারেনি। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল, তুই চলে যাবি মার্থা? আমাকে নিয়ে যাবি না?

ঝলমল করে উঠেছিল মার্থার চোখ। ক্যাথিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, সত্যিই যাবি! চল, বাকি জীবন আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকব আর প্রাণভরে শুধু পাখির গান শুনব।

সেই খুশির দিনটা অবশ্য এক দিনের জন্যই স্থায়ী হয়েছিল। রাতে থমথমে মুখে ফিরে এসেছিল মার্থা। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল বিছানায়। বিড়বিড় করে প্রলাপের মতো শুধু বলে গিয়েছিল, এ কী কারখানা করল দয়াল... এত ধোঁয়া কেন ওর কারখানায়... এবার শীতে যে একটা পাখিও এল না হরির ঝিলে... ওরাও আমার ওপর রাগ করে চলে গেল...

না, কোনওদিন মার্থার আর যাওয়া হয়নি হরির ঝিলের সেই বাংলোয়। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের অন্ধকার ঘরেই একদিন শেষ নিশ্বাস ফেলেছিল মার্থা। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ক্যাথির দু'চোখ ভরে উঠল জলে।

শিপ্রা ছাদে এসে পিছন থেকে ক্যাথির কাঁধে হাত দুটো রেখে বলল, বাঃ, দারুণ লাল রঙের সোয়েটার বুনছ তো আন্টি! কার জন্য?

হাতের কাঁটা দুটো কখন যেন থেমে গিয়েছিল। শিপ্রার কথায় সংবিৎ ফিরল। উল বোনাটা কতটা এগোল দেখতে গিয়ে ক্যাথি দেখলেন বেশ কয়েকটা লাইন আনমনা হয়ে বুনেছেন উনি। চারঘর সোজা, দু'ঘর উলটো ডিজাইনটা উলটোপালটা হয়ে গিয়েছে। যেটুকু এগিয়েছিল খুলে ফেলতে হবে। বিরক্ত হয়ে পাশে নামিয়ে রাখলেন। শিপ্রা বোনাটা তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, কার জন্য বুনছ বললে না তো?

জিমি, রবার্টের ছেলে। বায়না ধরেছে এবার ক্রিসমাসে ওকে সান্তাক্লজের মতো একটা লাল পোশাক করে দিতে হবে। মাফলারটা শেষ করে দিয়েছি। এবার সোয়েটার আর টুপিটা শেষ করতে হবে।

শিপ্রার মন একটু খারাপ হল। বিট্টুর কথা মনে পড়ছে। জিজ্ঞেস করল, এখানে লাল উল কোথায় পাওয়া যাবে আন্টি?

কেন?

আমার ছেলের জন্যও একটা বুনব। ক্রিসমাসে দেব। কাল থেকেই শুরু করব। তুমি দেখিয়ে দেবে, ক্রিসমাসের আগে হয়ে যাবে না?

ক্যাথি একটা স্থিরদৃষ্টিতে শিপ্রার দিকে চেয়ে থাকলেন। গলায় স্বরটা পালটে বললেন, তুই এখানে ক'দিন থাকবি সত্যি করে বল তো শ্যারন?

শিপ্রা মাথাটা নিচু করল, তোমার কি খুব অসুবিধা হবে আন্টি?

ক্যাথি শিপ্রার মাথায় হাত রাখলেন, তোর মা আজ নেই। তোর মা থাকলে তোকে এই প্রশ্নই করত। স্বামী-ছেলেকে ছেড়ে এভাবে তুই চলে এসেছিস! কী হয়েছে তোর?

আজকের দিনটা ছেড়ে দাও আন্টি, কাল তোমাকে সব বলব। হয়তো কালই কলকাতা ফিরে যাব... কিছুই ঠিক করতে পারছি না আন্টি... খুব অশান্তিতে আছি।

ক্যাথি শিপ্রার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, পাগলি মেয়ে, একদম মন ঠিক করেই যাবি, যতদিন লাগুক। ক্রিসমাসটা তোদের যেন খুব ভাল হয়।

মার্থা মারা গেছে ছ'বছরের ওপর। মাত্র কয়েকটা মাসের জন্য নাতির জন্ম দেখে যেতে পারেনি। এতদিন পরে শিপ্রার মনে হল আবার যেন মায়ের স্নেহ পাচ্ছে। নিজেকে অপরাধী লাগছিল, বিয়ের পরে আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি ক্যাথি আন্টির সঙ্গে। আসলে মার্থার এটাও একটা ইচ্ছে ছিল। বিয়ের পর শিপ্রা যেন আর কোনও যোগাযোগ না রাখে মার্থার অতীতের সঙ্গে। এমনকী মার্থা যখন মারা গিয়েছিল, সেই বাড়িতে পর্যন্ত দয়াল সান্যাল শিপ্রাকে যেতে দেননি। মাকে শেষ দেখেছিল কবরস্থানে। তবে সেখানে রবার্ট এসেছিল। সেটা ছিল একটা নিদারুণ শোকের দিন। রবার্টের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অথচ একবারও জিজ্ঞেস করা হয়নি ক্যাথি আন্টি কেমন আছে। এখনও ওই বাড়িতেই আছে কিনা।

আসলে শিপ্রা হয়তো ধরেই নিয়েছিল, তার মায়ের মতো কোথায়ই বা আর যাওয়ার জায়গা আছে ক্যাথি আন্টির! ঈশ্বর করুণাময়। ঠিক সময়ে আবার যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে রবার্টের সঙ্গে। ক'দিন আগে, মহেশের বাড়ির সেই ভয়ংকর রাতে নকশাল লোকগুলোকে শিপ্রা বলেছিল, তার কোনও নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস নেই। সেই উক্তিটা এখন নিজের কাছে গ্লানিকর মনে হচ্ছে। প্রভু যিশুর কাছে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে শিপ্রা বলল, জিসাস, আমাকে অনেক অনেক শক্তি দাও। লড়াইটা আমাকে জিততেই হবে।

ক্যাথি উলবোনাটা পাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুই রেস্ট নে শ্যারন, আমি বাবলিকে নিয়ে একটু বাজারে ঘুরে আসছি।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে উঠল, এই তো মুশকিল আন্টি। আমি এলাম থাকতে আর অমনি তোমার বাজারে যাওয়া শুরু হয়ে গেল। কিচ্ছু দরকার নেই। বাড়িতে যা আছে, তোমরা রাতে যা খাবে আমি সেটাই খাব। তার বেশি কিছু দিলে আমি টাচ করব না।

ক্যাথি শিপ্রার প্রতিবাদকে গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, কে বলল তোকে, তোর জন্য আমি বাজার করতে যাচ্ছি! আমার অনেক কাজ থাকে। সন্ধের মুখে একবার বেরোতেই হয়। তুই না এলেও বেরোতাম। এই বেরোনোটাই আমার সারাদিনের হাঁটা।

তা হলে চলো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

যাবি, নিশ্চয়ই যাবি। আজ এসেছিস, রেস্ট নিয়ে নে। কাল যাবি।

ছোট একটা বটুয়া নিয়ে ক্যাথি বেরিয়ে গেলেন বাবলিকে নিয়ে। ছোট বাড়িটা নিঝুম হয়ে গেল। সন্ধে নামছে ঝুপঝুপ করে। কলকাতার বাড়ির শেষ কয়েকটা সন্ধের মতো এখানেও ঘরে কোনও আলো জ্বালাল না শিপ্রা। দিনের আলোর রেশটুকু বিদায় নিয়ে অন্ধকারকে একটু একটু জায়গা করে দিচ্ছে। একটা-একটা করে আরও মিল খুঁজে পেতে থাকল কলকাতার অন্ধকার সন্ধেগুলোর সঙ্গে এখানকার সন্ধেটার, জানলা দিয়ে বাইরের কালো আকাশে তারাগুলো একইরকম ভাবে ফুটে ওঠে। এমনকী সেই অচেনা মানুষটার গলা পর্যন্ত।

কলকাতায় সেই অচেনা মানুষটার গলা যে-রেডিয়ো থেকে ভেসে আসত সেই রেডিয়োটা কোথায়, কাদের বাড়িতে বাজত জানা নেই শিপ্রার। অমায়িক হিন্দিতে 'ভাইয়ো অউর বহেনো' বলে যেত কত অচেনা নাম। তারা প্রিয় গান শুনতে চায়। পৃথিবীতে কোনও দুঃখ নেই তাদের। তাদের জীবনটাই যেন গীতিময়। রেডিয়োতে একটার পর একটা বাজে তাদের প্রিয় গান...

ধোবিঘাটে ক্যাথি আন্টির বাড়িতে রেডিয়োর সেই চেনা গলাটা অবশ্য কোন রেডিয়ো থেকে ভেসে আসছে তার আন্দাজ পেল শিপ্রা। ক্যাথি আন্টির বাড়ির ঠিক সামনে চাকা লাগানো যে-পান বিড়ি সিগারেটের দোকানটা আছে, সেখান থেকে।

হঠাৎ করে গানটা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল। ভেসে এল অচেনা আর এক ঘোষকের গম্ভীর গলা।

আকাশবাণী, বিবিধ ভারতী। এখন প্রচারিত হচ্ছে বিশেষ সংবাদ। আজ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। হরিয়ানার আম্বালায়, পঞ্জাবের অমৃতসরে, জম্মু ও কাশ্মীরে উধমপুরের বিমানঘাঁটিগুলো ছিল পাক বিমানবাহিনীর লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গাঁধী কলকাতায় তাঁর কর্মসূচি বাতিল করে আজ রাতে দিল্লি ফিরে আসছেন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে..

শিপ্রার কানে আর কিছু ঢুকছিল না, খাটের মধ্যিখানে টানটান হয়ে বসে পড়ল।

আবার একটা যুদ্ধ! গত দশ বছরের বিভীষিকা একটা একটা করে মনে পড়ে যাচ্ছিল শিপ্রার। কলকাতায় হাতিবাগানে বোমা পড়েছিল যেন কোন একটা যুদ্ধে ভুল করে। এবার যদি পাক বিমানবাহিনীর লক্ষ্য হয় ফোর্ট উইলিয়াম আর ভুল করে বোমা এসে পড়ে কলকাতায় ওদের বাড়ির ছাদে! শিউরে উঠল শিপ্রা। কেন ফেলে এল বিটুকে! ছটফট করতে থাকল। দয়াল সান্যালের সঙ্গে দাম্পত্য অভিমান, হরির ঝিল বাঁচানোর জেদ মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন উবে গেল। শিপ্রা অপেক্ষা করতে থাকল ক্যাথির ফিরে আসার জন্য। ক্যাথি আন্টি ফিরে এলেই যেমন করে হোক ফিরে যাবে কলকাতার বাড়িতে।

সময় কাটছিল না। সেকেন্ডকে মনে হচ্ছিল মিনিট, মিনিটকে ঘণ্টা। এভাবে সময় কাটাতে কাটাতেই হঠাৎ শুনতে পেল দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। একছুটে নীচে গিয়ে দরজাটা খুলেই ক্যাথি আর বাবলিকে দেখে বলল, আন্টি শুনেছ...

ক্যাথির মুখটা শান্ত কিন্তু বাবলির মুখে আতঙ্ক আর উত্তেজনার রেখাগুলো একদম স্পষ্ট। পশ্চিম পাকিস্তান যে যুদ্ধ করতে ভারতে ঢুকে পড়েছে, এই খবরটা বাবলির কানে পৌঁছে গেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আন্টি আমি কলকাতায় ফিরে যাব... এখনই...

যাবি, তবে আজ রাতে তো সম্ভব নয়, এদিকে গাড়ি চাইলেই পাওয়া যাবে না। এখন যেতে গেলে তোকে ব্যারাকপুর স্টেশনে যেতে হবে। ওখান থেকে শিয়ালদা। দিনকাল ভাল নয়, এখন শিয়ালদা থেকে ট্যাক্সি পাবি কিনা জানা নেই। আজ রাতটা শান্ত হয়ে এখানে থাক, কাল সকালে যা ব্যবস্থা করার করব। আয়, ঘরে আয়।

ক্যাথি কোনও কথা শুনলেন না। শিপ্রাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর শিপ্রার মন ঘোরাতে বাজার থেকে সদ্য নিয়ে আসা ঠোঙাটার মধ্যে থেকে দুটো লাল উলের গোলা বার করে বললেন, আপাতত দুটো ছিল। আরও আনতে বলে দিয়েছি, কোথায় ভাবছিলাম দু'জন মিলে রোদ পোহাতে পোহাতে দুটো ছোট্ট সান্তা সোনার সোয়েটার বুনব আর অনেক অনেক গল্প করব, কিন্তু তুই তো চলে যাবি বলছিস।

শিপ্রা লজ্জা পেয়ে বলল, এইসব যুদ্ধটুদ্ধ শেষ হয়ে যাক আন্টি, বিট্টুকে সঙ্গে নিয়ে এসে তোমার কাছে অনেকদিন থেকে যাব। অনেক ঝামেলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি... তোমাকে সব গল্প করব একদিন... মনটা শান্ত করতেই তোমার কাছে ক'দিন থাকতে এসেছিলাম, কিন্তু আমার কপালে নেই।

ক্যাথি খাটে বসে কপালে হাত দিয়ে কিছু ভাবলেন। তারপর বাবলিকে বললেন ঘরের বাইরে যেতে। বাবলি বেরিয়ে যাওয়ার পর নিচু গলায় বললেন, শোন শ্যারন, তোকে কয়েকটা কথা বলি। শুনে তুই হয়তো ভাববি যে আন্টি কোনওদিন ঘরসংসার করেনি, স্বামী কী জিনিস জানে না, সে আবার সংসার নিয়ে এসব জ্ঞানের কথা কেন বলছে। তবু বহু পুরুষ মানুষ দেখে, তার অভিজ্ঞতা থেকে তোকে একটা সার কথা বলছি, সংসারে সুখশান্তি রাখতে পারে কিন্তু মেয়েরাই।

শিপ্রা নিজেকে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল, মা স্বপ্ন দেখত হরির ঝিলে সেই ইচ্ছে-স্বাধীন পাখিগুলো প্রত্যেক শীতে আসবে, ডাকবে, গান গাইবে, খেলবে আর শীত ফুরোলে চলে যাবে। ছোট্ট একটা স্বপ্ন। আমি মায়ের স্বপ্নটা আজও বাঁচিয়ে রাখতে চাই। মা তো সারা জীবন এত কিছু করল আমার জন্য, আমি এটুকু করব না মায়ের জন্য? মায়ের স্বপ্ন বেঁচে থাকা মানে তো আমার কাছে মায়ের বেঁচে থাকাই। বিশ্বাস করো আন্টি, আমার মনে হয় মায়ের আত্মা হরির ঝিলেই আছে। পাখির ভেতর। যদি পাখিগুলো চলে যায়, মা-ও চিরকালের জন্য চলে যাবে। দয়ালের লোভ হরিতলা কটন মিলে থেমে নেই আন্টি। হরির ঝিলটা চাই ওর। ঝিলটা একবার ও নিয়ে নিতে পারলে পাখিদের আসা চিরকালের জন্য বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দেবে। এই অন্যায়টার সঙ্গে

আপস করে আমি সংসারে শান্তি চাই না আন্টি। মায়ের আত্মাটা বিসর্জন দিতে পারব না। এটা একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধটা আমি জিতবই আন্টি।

একনাগাড়ে কথা বলতে বলতে শেষের দিকে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল শিপ্রা। উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল। ঘরের কোণে একটা কুঁজো ছিল। কুঁজোর থেকে এক গ্লাস জল ভরে শিপ্রার হাতে দিলেন ক্যাথি, শিপ্রা ঢকঢক করে সবটুকু জল খেয়ে নিল। শিপ্রার মাথায়-পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, মার্থার স্বপ্ন ঠিক বেঁচে থাকবে শ্যারন। খালি মার্থার স্বপ্নটা তোর ছেলের মধ্যে পুরে দে।

মানে? কথাটার ঠিক মানে বুঝতে না পেরে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল।

মার্থা যেভাবে ভালবেসেছিল পাখিগুলোকে, তুই যেরকম ভালবেসেছিস, ঠিক সেরকমই ভালবাসাটা পুরে দে তোর ছেলের মধ্যে।

শিপ্রা হতাশ হয়ে বলল, তার আগেই তো সব শেষ করে দেবে দয়াল।

কোনও কিছুই কেউ শেষ করতে পারে না শ্যারন। ভালবাসার প্রতিজ্ঞায় সব ফিরে আসে। তুই হিন্দু না এখন। গীতা পড়িস না কেন? আমাকে একজন শোনাত জানিস। উফ, ভেতরটা একদম ছুঁয়ে যায়। বিশ্বাসটা কীরকম পোক্ত করে দেয়।

ক্যাথি চাইছিলেন না এই আলোচনাটা আর চলুক। শিপ্রার সঙ্গে তাঁর মতের বিস্তর ফারাক। ক্যাথির কাছে শান্তির মানে একটাই। জীবনের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, মৃত মানুষের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার যুদ্ধ নয়। তাই যে-আলোচনাটা একান্তে শুরু করতে বাবলিকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আলোচনাটার শেষের ইঙ্গিত বোঝাতে বাবলিকেই আবার ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন ক্যাথি।

বাবলি ঘরের মধ্যে এসে অনুমতি চাইল, রেডিয়োটা একটু চালাব মাসি? যুদ্ধের খবরটা শুনব।

ক্যাথি রাজি হলেন না। বললেন, কী হবে ওই খুনোখুনির যুদ্ধের খবর শুনে?

বাবলির মুখে আতঙ্ক কাটেনি। শুকনো গলায় বলল, খান সেনাদের প্লেন যদি এখানে ঢুকে পড়ে?

শিপ্রা একটু ম্লান হেসে বাবলিকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, বোকা মেয়ে, ভারত একটা কত বড় দেশ জানো? যেখানে পাকিস্তান ঢুকে পড়েছে, সেটা অনেক অনেক দূরে। আর আমাদের সৈন্যরা কিছু কম নাকি? এই যে ব্যারাকপুরে আমাদের আর্মিকে দেখছ, গোটা ভারত জুড়ে এরকম বহু জায়গা আছে। ওরা আছে তো আমাদের রক্ষা করতে! তোমার কোনও ভয় নেই।

কথাগুলো বলে নিজের কাছেই নিজের অবিশ্বাস্য লাগল শিপ্রার। যে-কথাগুলো ও বাবলিকে বলে অভয় দিল, সেই কথাগুলো নিজেকে বলতে পারল না কেন একটু আগে? কেন তার নিজের বুক কাঁপছিল কলকাতায় যুদ্ধের বোমা পড়ার আশঙ্কায়?

রাতে খাওয়া-দাওয়া করে শোওয়ার সময় শিপ্রা লক্ষ করল, একমাত্র সিঙ্গল বেড খাটে আন্টি ওর শোওয়ার ব্যবস্থা করে বাবলিকে দিয়ে মেঝেতে নিজের বিছানা

করিয়েছেন। শোওয়ার এই ব্যবস্থায় শিপ্রা কিছুতেই রাজি হল না। মেঝের বিছানায় নিজে এসে শুল। আর শুয়েই খেয়াল হল বাবলির কথা।

আন্টি, বাবলি কোথায় শোয়?

নীচের ঘরে।

মেয়েটা আজ খুব ভয় পেয়ে আছে, ওকে আমার পাশে এসে শুতে বলো না। এতটা তো জায়গা আছে, আমার কোনও অসুবিধা হবে না।

ব্যবস্থাটায় ক্যাথির খুব একটা অনুমোদন না থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন। বাবলির কাছে এই ব্যবস্থাটা অপ্রত্যাশিত হলেও চোখের কোণে খুশির ঝিলিক গোপন করতে পারল না। নিজেকে যতটা পারল সংকুচিত করে শিপ্রার শোওয়ার জন্য প্রশস্ত জায়গা রাখল। সব গুছিয়ে ঘরের আলো যখন নিভল তখন রাত মাত্র সাড়ে ন'টা। কলকাতায় শিপ্রা কখনও কখনও এই সময়ে এক কাপ চা খায়।

বিট্টু জন্মানোর পর থেকে জীবনে এই বোধহয় প্রথম রাত নিজের পাশে পেল না বিট্টুকে। অন্ধকারেও কী অদ্ভুত একটা শূন্যস্থান! বিট্টুর গায়ের গন্ধটাও নেই। কেমন আছে, কী করছে ছেলেটা কে জানে! দয়াল সান্যালের মতো স্বার্থপর লোকটা কি ওর বিছানায় বিট্টুকে একটু জায়গা দিয়েছে? যদি না দিয়ে থাকে, হরিহরের কি মনে আছে, শিপ্রা তাকে বিট্টুর ঘরের মেঝেতে বিছানা করে রাতে শুতে বলে এসেছিল? সেটা যদি আবার দয়াল সান্যালের চোখে পড়ে, দয়াল সান্যাল আবার ঘর থেকে বার করে দেবে না তো হরিহরকে? কলকাতার বাড়িটা আর বিট্টুকে ঘিরে হাজারো এলোমেলো চিন্তা আছাড় খেতে থাকল শিপ্রার মনে। সেই চিন্তার মধ্যেই চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। আচমকাই ভেঙে গেল তন্দ্রাটা।

খাটের ওপর থেকে একটা খাবি খাওয়া টানের আওয়াজ আসছে। চমকে উঠে শিপ্রা এল ক্যাথির কাছে। ভীষণ একটা কষ্টের টান নিচ্ছেন ক্যাথি। মানুষের শেষ অবস্থায় যেরকম হয়।

অন্ধকারে সুইচবোর্ড কোথায় খুঁজে পেল না শিপ্রা। প্রায় চিৎকার করে বাবলিকে ডাকল। ধড়ফড়িয়ে উঠে আলোটা জ্বালিয়ে দিল বাবলি। তাতে ক্যাথির অবস্থা দেখে আরও ঘাবড়ে গেল শিপ্রা।

চোখের মণিগুলো কেমন যেন স্থির। মুখ হাঁ, কষ্ট করে করে এক-একটা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছেন ক্যাথি।

বাবলি শিগগির এক গ্লাস জল দাও। এখানে ডাক্তার কোথায় আছে জানো?

বাবলিকে অতটা বিচলিত দেখাল না। ক্যাথির বুকে চেপে চেপে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, চিন্তা করবেন না দিদি, মাসির ওরকম হাঁপের টান মাঝে মাঝেই হয়।

বাবলিকে নিরুত্তাপ দেখে একটু রেগেই উঠল শিপ্রা, তুমি কী করে জানলে? রাতে তো তুমি এই ঘরে থাকো না।

আমি তো রাতে জেগেই থাকি দিদি, ভোরের দিকে ঘুমোই। মাসির টানের আওয়াজ

শুনতে পেলে এক ছুটে ওপরে চলে আসি। মাসির বুকে মালিশ করি। মালিশ করতে করতেই ঠিক হয়ে যায়। আপনি দেখুন।

বাবলির শুশ্রূষা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া সত্যিই আর কোনও উপায় ছিল না শিপ্রার। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাথি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। চোখের সামনে উদ্বিগ্ন শিপ্রাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উঠে বসার চেষ্টা করতেই শিপ্রা দু'কাঁধ ধরে চেপে শুইয়ে মৃদু ধমক দিল ক্যাথিকে, আঃ, উঠে বসার চেষ্টা করছ কেন? শুয়ে থাকো।

ক্যাথি কষ্ট চেপে বললেন, অ্যাজমা, বুঝলি। তোকে বলে রাখা উচিত ছিল। কেন যে বললাম না! আসলে কতদিনের পুরনো রোগ। কখনও কাউকে জানতে দিইনি। তাই হয়তো তোকেও বলতে পারিনি।

চিকিৎসা করাওনি?

অ্যাজমার কি কোনও ভাল চিকিৎসা আছে রে আমাদের দেশে! আমার কাছে এক ডাক্তার আসত জানিস, বোধহয় একমাত্র তাকেই বলেছিলাম। সে বলেছিল বিদেশে একটা মেশিন পাওয়া যায়...

ক্যাথি বাবলির উপস্থিতিটা খেয়াল করে চুপ করে গেলেন। বললেন লাইটটা নিভিয়ে শুয়ে পড়তে।

বাবলিকে পাশে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে আবার শুয়ে পড়ল শিপ্রা। তবে এলোমেলো চিন্তাগুলো আর তাড়া করে বেড়াচ্ছে না। বাইরে পানের দোকানে রেডিয়োতে রাত দশটার খবর শুরু হল। প্রধানমন্ত্রী দিল্লি পৌঁছে গেছেন, গোটা দেশকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাক সেনাদের সংঘর্ষ আরও তীব্র হয়েছে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা পাক আক্রমণের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন—একটার পর একটা খবর রেডিয়ো থেকে ভেসে আসতে থাকল। অন্ধকারে শিপ্রা বুঝতে পারল বাবলি কাঠ হয়ে শুয়ে কান খাড়া করে প্রতিটা খবর শুনছে।

খবরটা শেষ হয়ে যেতেই পানওয়ালা রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল। নিস্তব্ধতা নেমে এল অন্ধকার ঘরে। ক্যাথির এখন আর কোনও হাঁপের টান নেই। কখন যে শিপ্রা গুনগুন করে গলায় একটা সুর এনে ফেলেছিল নিজেও জানে না। অভ্যেস। অনেকদিনের অভ্যেস। ভীষণ মন খারাপ করছে বিট্টুর জন্য। মনে হচ্ছে বিট্টুর চোখেও ঘুম আসছে না। পাশ থেকে চাপা গলায় বাবলি জিজ্ঞেস করল, কী সুন্দর সুরটা দিদি, এটা কী গান?

অন্ধকারে একটা হাসি খেলে গেল শিপ্রার মুখে, বলল, শুনবে? তারপর নিজেই গুনগুন সুরে শব্দগুলো বসিয়ে গাইতে থাকল—

আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

শিপ্রার হাতটা একসময়ে আলতো হয়ে উঠে এল বাবলির মাথায়। আরামে গানটা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল বাবলি। ভারতে আসার পর বাবলির এত শান্তির ঘুম এই প্রথমবার।

১০

সকালে খবরটা শোনার পর থেকে ছটফট করছিল বাবলি। কখন শিপ্রাদিদি ঘুম থেকে উঠবে। এমনিতে একা একা শুয়ে ঘুম হয় না বলে অনেক রাত অবধি বাবলি চুপচাপ অন্ধকারে জেগে থাকে। তারপর ভোররাতে ঘুমিয়ে একটু বেলা করেই ওঠে। কিন্তু কাল দিদির পাশে শুয়ে সেই গানটা শুনতে শুনতে এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত একটা গভীর ঘুম হয়েছে যে, আজ ভোর ভোরই ঘুমটা ভেঙে গেছে। আর ভালও লেগেছিল দিদি যখন আলতো করে চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল। অনেকদিন পর এত আদর এত যত্ন করে কেউ ঘুম পাড়াচ্ছিল তাকে। সকালে উঠে তাই মনের সঙ্গে শরীরটাও ঝরঝরে লাগছে। কোনও ক্লান্তি নেই। দিনটা সত্যিই ভাল শুরু হল বাবলির। এই খুশির দিনে সক্কাল সক্কাল দারুণ একটা খবর রেডিয়োতে শুনল বাবলি। সেই খবরটা শোনার পর থেকেই ছটফট করে যাচ্ছে—কখন দিদিকে খবরটা শোনাবে।

শিপ্রা মেঝেতে বিছানায় ঘুমোচ্ছে। দিদিকে ডেকে তোলার অছিলায় বাবলি একবার চা করে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু মাসি সেই চা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, দিদির পায়ের কাছে পুব দিকের জানলা দুটোর পাল্লা বন্ধ করে দিতে বলেছে যাতে রোদ ঢুকে ঘুম ভেঙে না যায়। খুশির খবরটা মাসিকে শুনিয়েছে, কিন্তু মাসির কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। দায়সারা ভাবে বলেছে, ও, তাই বুঝি! তাই অধীর আগ্রহে বাবলি প্রতি মুহূর্তে খেয়াল রেখে যাচ্ছে কখন ঘুম ভেঙে উঠবে দিদি ।

বাবলির মনের তীব্র ইচ্ছেটা অবশ্য ক্যাথির হাত দিয়েই প্রকাশ পেয়ে গেল। একতলায় রান্নাঘরে বাসন গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ফসকে হাত থেকে পড়ে ঝনঝন করে বাড়ি কাঁপিয়ে একটা আওয়াজ উঠল। বাবলি বাসনগুলো মেঝে থেকে কুড়িয়ে তুলতে তুলতে বলল, মাসি, হাত থেকে বাসন পড়ল তো! দেখো, আজ ঠিক কেউ আসবে বাড়িতে...। আজ আবার শনিবার। ফলবেই ফলবে।

ক্যাথির মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল। নিজের মনে গজগজ করতে থাকলেন, দিলাম মেয়েটার ঘুম ভাঙিয়ে। ক'দিন শান্তিতে থাকতে এসেছিল।

এই আওয়াজে যে শিপ্রার ঘুম ভেঙে যেতে পারে, তা বাবলির খেয়াল হয়নি। খেয়াল হতেই দ্রুত বাসনগুলো তাকে তুলে, 'আমি দেখছি' বলে দুদ্দাড় করে ছুট লাগাল সিঁড়ির দিকে।

আওয়াজে সত্যিই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল শিপ্রার। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। আওয়াজটা ঘুম ভাঙিয়েছে। রেশটা কানে বাজছে এখনও। ক্যাথি আন্টি, বাবলি কেউই ঘরে নেই। তা হলে কোথায় হল আওয়াজটা? আচমকা আওয়াজের দুঃস্বপ্নই তো তাড়া করে বেড়াচ্ছে এই ক'দিন।

বিছানার মধ্যে বাবু হয়ে উঠে বসল শিপ্রা। তারপরই দেখল দরজার মুখে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল বাবলি। বাবলির হাঁপ ধরা চেহারা দেখে শিপ্রা আরও আতঙ্কিত হয়ে বলল, কোথায় আওয়াজ হল রে বাবলি?

ও কিছু নয় দিদি। মাসির হাত ফসকে থালা পড়ে গিয়েছিল।

শিপ্রার পাশে এসে বসল বাবলি। শিপ্রা এবার বাবলিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, মেয়েটা হাঁপালেও, চোখমুখ কীরকম খুশি-খুশি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই এরকম একটা হাসিখুশি মুখে দেখে মনটা ভরে গেল শিপ্রার। বাবলির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যত্ন করে সাজিয়ে রাখা খবরটা এবার বলার সুযোগ পেল বাবলি।

দিদি আজ রেডিয়োতে খবর শুনেছ?

খবর শুনবে কী করে, শিপ্রা তো এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল! বাবলিও সেটা দেখেছে। তবে বাবলির রেডিয়োর খবর বলার ভূমিকাটা দেখে হাসিটা আরও চওড়া করে দু'দিকে মাথা নাড়ল শিপ্রা।

ভারতের সেনা আমাদেব দেশে ঢুকে পড়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এবার কোথায় যাবে ওরা! আমরা জিতবই।

খবরটা শুনে শিপ্রার মুখের চওড়া হাসিটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল। বাবলি তখনও উল্লাসে বলে চলেছে, এবার আমরা জিতবই। আমাদের নিজেদের দেশ হবে। আমার স্কুল আবার খুলবে...

জানলাটা খুলে দাও তো বাবলি।

শিপ্রা একই রকমভাবে স্থাণু হয়ে বসে। বাবলি যুদ্ধজয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রায় প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে গিয়ে জানলার পাল্লাগুলো খুলে দিল। বিছানা থেকে উঠে এসে জানলার শিক ধরে দাঁড়াল শিপ্রা। জানলা দিয়ে পানের দোকানের পিছনটা দেখা যাচ্ছে। তবে রেডিয়োটা চলছে না। বাইরেটা দেখতে দেখতেই শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, আন্টির কোনও রেডিয়ো নেই?

বাবলি মুখটা ছোট করে বলল, আছে তো একটা! তবে চলে না। মাসি বলছিল ভাল্‌ভ আর পাওয়া যাচ্ছে না। দেখলে না, কালকে চালাতে দিল না!

আন্টি কোথায়?

· নীচে, তোমার জন্য জলখাবার তৈরি করছে।

শিপ্রা আনমনা হয়ে বাবলির দিকে তাকাল। মেয়েটা কাল জড়োসড়ো ছিল, কুণ্ঠা ছিল। আজ সেই জড়তা ঝেড়ে ফেলেছে। কাল শিপ্রাকে আপনি আপনি বলে সম্বোধন করছিল। আজ তুমি তুমি করে বরং আরও আপন করে নিয়েছে।

তুমি মুখ ধুয়ে এসো দিদি, আমি চা করে আনছি।

না, তোমাকে আর চা করে আনতে হবে না। আমি নীচে যাচ্ছি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে নীচে এসে শিপ্রা দেখল খাওয়ার টেবিলে ক্যাথি আনমনা হয়ে বসে আছেন। শিপ্রা টেবিলে এসে বসার পর আলুর তরকারি আর লুচি দিতে দিতে ক্যাথি চিন্তিত মুখে বললেন, তুই কী করে যাবি বুঝতে পারছি না।

কেন? শিপ্রাও কপালে ভাঁজ ফেলল।

স্বপনকে পাঠিয়েছিলাম, কোনও ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কিনা দেখতে। একটু আগে এসে বলল, এখনও পর্যন্ত একটাও ট্যাক্সি দেখতে পায়নি।

স্বপন কে?

আমাদের কাগজওয়ালা। ছেলেটা ভাল। টুকটাক অনেক কাজ করে দেয়। ও যখন চেষ্টা করে পায়নি, তখন আর কাকে বলব বুঝতে পারছি না।

কেন? কাল যে তুমি বলছিলে ব্যারাকপুর স্টেশনে গেলে ওখান থেকে ট্রেন পাওয়া যাবে!

স্টেশন তো অনেকটা দূর। ওখানে পৌঁছোতে হবে তো! তোর তো আবার একটা বড় সুটকেস আছে। স্বপন বলছিল, মিলিটারিরা সোজা রাস্তাটাও বন্ধ করে রেখেছে। ওদের সব সাঁজোয়া গাড়ি যাচ্ছে ওই রাস্তায়।

তা হলে? শিপ্রার গলাটা শুকিয়ে এল।

ক্যাথি একটু চিন্তা করে বললেন, তুই এক কাজ কর শ্যারন। আগে তুই কলকাতায় তোর বাড়িতে একটা ফোন কর। এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। দয়ালের সঙ্গে তোর মান-অভিমান, ঝগড়া সব ভুলে যা। দয়ালকে বল তুই আমার এখানে আছিস, ও যেন গাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

দয়াল সান্যালের কাছে আত্মসমর্পণ করাটা শিপ্রার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তবে ক্যাথি আন্টির কথার কিছুটা অংশ মনে ধরল শিপ্রার। কলকাতার বাড়িতে টেলিফোন তো করাই যায়, অন্তত বিটুর সঙ্গে একটু কথা বললে বুকটা জুড়োবে। ছেলেটাকেও আশ্বস্ত করা যাবে আজই ফিরে যাচ্ছে কথাটা বলে।

এখানে কাছাকাছি কোথায় টেলিফোন আছে?

বাজারের একটা দোকানে আছে। তুই ভাল করে খেয়ে নে। তারপর তোকে নিয়ে বেরোচ্ছি।

সকালের খাওয়া হয়ে গেলে বাবলিকে বাড়িতে রেখে শিপ্রাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাথি বেরোলেন। বাড়ি থেকে খানিকটা এগোলেই একটা ছোট স্থানীয় বাজার। তার একটা স্টেশনারি দোকানে পয়সা দিয়ে ফোন করা যায়। ডিসেম্বরের শীতের সকালে এখন যুদ্ধ নিয়ে উৎসাহ-উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। জায়গাটা মিলিটারি এলাকার লাগোয়া বলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি এবং যুদ্ধযাত্রার নানারকম খবর অত্যুৎসাহীদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছে। অতি উৎসাহীরা যুদ্ধের ছক নিয়েও মন্তব্য করা শুরু করে দিয়েছে।

স্টেশনারি দোকানটাতে সেরকমই একটা জটলা। কাউন্টারের এক কোণে রাখা টেলিফোনটায় ব্যারাকপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে দয়াল সান্যালের বাড়ির ফোনটায় সংযোগ করিয়ে ফোনটা শিপ্রার দিকে এগিয়ে বলল, কথা বলুন দিদি। ফোন ধরল রান্নার ঠাকুর সত্যেন। ফোনটা যে শিপ্রার হতে পারে, সে আশাই করেনি। তার ওপর ফোনে শিপ্রার গলাও কোনওদিন শোনেনি। বার দুয়েক 'কে বলছেন', 'কে বলছেন' করল।

শিপ্রা চাপা গলায় ধমকে উঠল, তুমি ওপরের ঘরে কী করছ? হরিহর কোথায়? হরিহরকে দাও...

ধমকানির সুরে সত্যেনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল ও-প্রান্তের গলাটা কার। রিসিভারটাকে নামিয়ে রেখে 'হরিহরদা', 'হরিহরদা' বলে চিৎকার করতে লাগল।

হরিহর ঘরে আসতেই অস্ফুট স্বরে সত্যেন জানিয়ে দিল, মেমসাহেবের ফোন। হরিহর রিসিভারটা কানে তুলে শিপ্রাকে নমস্কার জানাল।

সত্যেন ওপরের ঘরে কী করছে হরিহর?

হরিহর আমতা আমতা করতে থাকল।

তোমার সাহেব বাড়িতে নেই?

না মেমসাহেব...

বুঝেছি। তাই বাড়িতে এখন মোচ্ছব চলছে। বিট্টু কোথায়? বিট্টুকে ডাকো।

বিট্টুবাবা তো সাহেবের সঙ্গে গেছে মেমসাহেব।

সাহেবের সঙ্গে... সাহেবের সঙ্গে কোথায় গেছে? আজ তো শনিবার। শনিবার সকালবেলা তো সাহেব এই কলকাতার অফিসেই যায়। তো বিট্টু কোথায় গেল?

একদম সকালে সাহেব বিট্টুবাবাকে নিয়ে বনোয়ারীর গাড়িতে বেরিয়ে গেছেন। এখন কয়েকদিন আসবেন না বলে গেছেন।

কয়েকদিন আসবেন না মানে? কোথায় গেছে? শিপ্রা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হরিহর আবার আমতা আমতা করতে থাকল, সাহেব তো কিছু বলেননি। তবে বিট্টুবাবা একবার বলছিল, হরিতলা মিলের ওখানে সাহেবের যে-বাংলো বাড়িটা আছে, ওখানে ক'দিন থাকবে।

শিপ্রা ভাবতে থাকল। এটা কি দয়াল সান্যালের পালটা চাল? শিপ্রা এভাবে চলে আসায় বিট্টুকে নিয়ে চলে যাওয়া, নাকি যুদ্ধের ভয়ে চলে গেছে! কিন্তু হরিতলায় কেন? ওখানে তো নকশালদের পোস্টারে দয়াল সান্যালের মাথার দাবিটা এখনও জ্বলজ্বল করছে। ...হরিতলায় থাকার তো একটাই জায়গা, ম্যাকার্থির বাংলো। সেটাও আবার মিলের পাঁচিলের ঠিক বাইরে। মায়ের আমলেই সেটা করা হয়েছিল। ঝিলের ধার দিয়ে আবার চলে আসবে না তো নকশালরা? আবার বিট্টু বন্দুকের গুলির মাঝে পড়ে যাবে না তো...?

ফোনটা ছেড়ে দিল শিপ্রা। শরীরটা কীরকম যেন অবশ লাগছে। ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করল, এখানে নৌকোর ঘাট আছে না আন্টি?

আছে শুনেছি, তবে কোনওদিন যাইনি। কেন, কী হবে গঙ্গার ঘাট দিয়ে?

ব্যারাকপুরের উলটোদিকে কী জায়গা গো আন্টি?

তুই হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন করছিস বল তো শ্যারন? আমি এখন এখানে থাকি, কিন্তু এতসব খোঁজ রাখি না। কী একটা শুনেছিলাম ওপারে... শ্রীরামপুর বোধহয়।

আমি তা হলে গঙ্গা পেরিয়ে শ্রীরামপুর যাব। ওখান থেকে হরিতলা অনেক কাছে হয়ে যাবে।

কী পাগলের মতো বলছিস বল তো! হঠাৎ কলকাতা ছেড়ে হরিতলা যাবি কেন?

বিট্টুকে নিয়ে দয়াল হরিতলা চলে গেছে আজ সকালে। ওখানে ছেলেটাকে কে দেখবে? বাড়ির কাজের লোকদের একটাকেও নিয়ে যায়নি।

ক্যাথির মুখে একচিলতে হাসি ফুটে গেল। দোকানদারকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বললেন, চল, বাড়ি যাই।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ক্যাথি বলতে থাকলেন, এই ভাল হয়েছে রে শ্যারন। দু'দিন তুইও আমার কাছে থেকে যা, আর দয়ালও তোর ছেলেকে নিয়ে কলকাতার বাইরে ক'দিন থাকুক। ওখানে নিরাপদে থাকবে। পাকিস্তান নিশ্চয়ই হরিতলায় বোমা ফেলতে আসবে না!

পাকিস্তান নয় আন্টি। হরিতলায় আসল ভয় নকশালদের নিয়ে। তোমাকে সব বলব। অনেক ব্যাপার ঘটে গেছে। বিট্টুকে ছেড়ে, কলকাতার বাড়ি ছেড়ে আমি এমনি এমনি তোমার কাছে চলে আসিনি...

ক্যাথি শিপ্রাকে থামিয়ে দিলেন, শোন শ্যারন, এই বয়সে এসে আমি এখন সব কিছু সোজাসাপটা বুঝি। দয়াল বোকা নয়। কোনও ঝুঁকি নিয়ে ও নিশ্চয়ই হরিতলা যাবে না। সব ঠিক ব্যবস্থা করা আছে। আর তোরও কলকাতার বাড়ির জন্য টান কিছু কম নয়...

বিশ্বাস করো আন্টি, কোনও মোহ নেই আমার কলকাতার বাড়ির জন্য।

সেটা তুই মুখে বলছিস। কিন্তু নিজের ভেতরটাকে জিজ্ঞেস করে দেখ শ্যারন। কেন এত উতলা হচ্ছিলি তোর কোন ঘরে কোন চাকর ঢুকে গেছে বলে?

শিপ্রা চুপ করে গেল। ক্যাথি আন্টি হয়তো ঠিকই বলছে। কয়েকটা অদৃশ্য সুতোর টান হয়তো রয়ে গেছে কলকাতার বাড়ির জন্য, নিজের সংসারের জন্য। কিন্তু সব কিছুর ওপর আছে বিট্টু।

শিপ্রা চুপ করে যাওয়াতে ক্যাথি বুঝতে পারলেন, তাঁর যুক্তি শিপ্রা একদম ফেলে দিতে পারছে না। ঝড়ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত হয়ে মেয়েটার সংসার ভেঙে পড়ার আগে ক্যাথি ফাটলগুলো জোড়া লাগাবার একটা মলম বার করলেন, একটা কথা আছে জানিস তো শ্যারন, বিরহ... বিরহ অনেক কিছু জোড়া লাগিয়ে দেয়। তোরা কয়েকদিন আলাদাই থাক। দেখবি, শেষ পর্যন্ত তাতে তোদের ভালই হবে। এটা আমি ভেবেই বলছি। না হলে আমিও তো চাইতাম তুই ফিরে যা।

কিন্তু বিট্টু? বিট্টু কী করে পারবে আমাকে ছেড়ে হরিতলায় থাকতে?

তুই ভাবিস না। ঠিক পারবে। এতে ওরও ভাল হবে। বাবা-মা'র অশান্তি বাচ্চাদের সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্ট করে। দু'দিন ও কষ্ট করুক না। তোদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে গেলে, সবচেয়ে ভাল থাকবে ও। আর কষ্ট মানে তো অন্য কোনও কষ্ট নয়, তোকে ছেড়ে থাকার কষ্ট।

কথা বলতে বলতে ক্যাথির বাড়ি চলে এসেছিল। বাড়িতে ঢুকে ক্যাথির কেমন জানি মনে হল—বাবলি যেন একটু সেজেগুজে কোথাও যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে। ক্যাথি দ্রুত একবার ওকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, কী রে! কোথায় যাবি বলে এত সেজেছিস?

যাই না গো মাসি একটু...

কী আশ্চর্য! কোথায় যাবি বলবি তো।

মিলিটারির গাড়িগুলো সব ব্যারাক থেকে বেরোচ্ছে। যাই না গো একটু দেখে আসি! বেশি দূরে তো নয়।

বাবলির শেষ কথাগুলো কেমন যেন আহ্লাদি। এক ধমক দিয়ে উঠলেন ক্যাথি, কোথাও যাবি না তুই। তোর বাবাকে আমি আগেই বলে রেখেছি।

বাবলির মুখটা মুহূর্তে ছোট হয়ে গেল। চোখটাও অল্প ছলছলে হয়ে উঠল। শিপ্রা কিশোরীর এই উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারল। বাবলির পিঠে আলতো করে হাত রেখে বলল, মিলিটারিদের গাড়ি এখন ব্যারাক থেকে যাচ্ছে, তুমি কী করে জানলে বাবলি? ওরা কি আর এমনিভাবে সবাইকে বলে বেরোয়?

বাবলি মনোবাসনা পূর্ণ করার একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়ে বলল, তপাইদা বলছিল।

'তপাইদা' নামটা শুনেই আরও চটে গেলেন ক্যাথি। গলার শির ফুলিয়ে বললেন, তোকে আর আমি রাখতে পারব না বাবলি। তোর দায়িত্ব নিতে পারব না। তোর বাবা আসুক, বিদেয় করে দেব তোকে।

বাবলি এবার আর চোখের জল সামলাতে পারল না। মাথাটা নিচু করে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ক্যাথির ব্যবহারে শিপ্রা একটু বিরক্ত হয়ে বলল, আঃ, আন্টি! তুমি এত এক্সাইটেড হয়ে মেয়েটাকে বকাবকি করছ কেন? তপাইদাটা কে?

ক্যাথির তখনও উত্তেজনা কমেনি। মুখচোখ থমথমে করেই বললেন, যত সব লোফারের দল। পানের দোকানে একদিন দেশলাই কিনতে পাঠিয়ে কাল করেছিলাম। কোথাকার ওই লোফারটার সঙ্গে আলাপ করে ফিরে এল। দেখ না আঠা কেমন হয়েছে! তুই আমি একটু বেরোলাম, আর উনিও সব কাজ ফেলে বেরিয়ে গেলেন লোফারটার সঙ্গে দেখা করতে।

তুমি এত ভেবো না আন্টি, এ বয়সে একটু-আধটু ওরকম হয়। মেয়েটার তো কোনও সাথী নেই...

একটু-আধটু? আরও রেগে উঠলেন ক্যাথি। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন বাবলি কাছেপিঠে নেই। গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, তুই জানিস না এই একটু-আধটু থেকে কী হয়? ওই তপাইদা বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলবে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আমার মতো কোনও মালকিনের কোঠায়। পারব না রে শ্যারন, এ পাপ আর পারব না হতে দিতে। ওর বাবা-মাকে কী বলব তখন? জিসাসকে কী জবাবদিহি দেব?

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে ভেঙে পড়লেন ক্যাথি। ক্যাথি আন্টির মতো একদা নাস্তিকের মুখে জিসাসের নাম শুনে শিপ্রাও চুপ করে গেল। ক্যাথির মুখটা গম্ভীর হয়েই থাকল। মুখ গোঁজ করে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

এ-বাড়িতে বাবলির গুমরে কান্নার একটাই জায়গা আছে। ছাদের সিঁড়ির শেষ

ধাপটা। হাঁটুতে মুখটা গুঁজে সেখানে বসে বাবলি বুঝতে পারল, অতি উৎসাহে একটা অন্যায় করে ফেলেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে খানিকক্ষণ পরে মুখটা শুকনো করে রান্নাঘরে এল। ক্যাথির একজন রান্না করার লোক আছে। কিন্তু সে এখন কয়েকদিন ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। এই ক'দিন রান্নাটা তাই ক্যাথি নিজেই করছেন। সোজাসাপটা ভাত, ডাল আর একটা পদ। মাছ কোনওদিনই সেরকম পছন্দের নয়। মাংস করার অনেক ঝামেলা। ডিমটা এককালে পছন্দের হলেও, ডাক্তারের নিষেধে এখন প্রায় খানই না। তবে বাবলিকে বলে রেখেছেন ওর খেতে ইচ্ছে করলে যেন বাজার থেকে এনে সেদ্ধ করে নেয়।

আজ শিপ্রার জন্য ক্যাথি ঠিক করে রেখেছেন ভাল দু'-একটা পদ রাঁধবেন। শিপ্রা ঘুম থেকে ওঠার আগে সেইমতো বাজারও করে এনেছেন। ফোন করতে যাওয়ার আগে রান্নাঘরে আনাজগুলো এক জায়গায় করে রেখে গিয়েছিলেন। বাবলিকে বলে গিয়েছিলেন কুটে রাখতে। রান্নাঘরে এসে দেখলেন বাবলি কাজটা কিছুই এগিয়ে রাখেনি।

এ-বাড়িতে দেড় মাস হয়ে গেল বাবলির। দু'-একবার ছাড়া ক্যাথিকে খুব একটা রাগতে দেখেনি সে। বারবার মনে হয়েছে মানুষটা ভাল, দয়ালু। বাবলিকে নিজের মেয়ের মতো রেখেছেন। তবে রেগে মুখটা থমথমে হয়ে গেলে ক্যাথিকে খুব ভয় করে বাবলির। মানুষটা যেন বদলে অন্য মানুষ হয়ে যায়।

এখন ক্যাথির রেগে যাওয়ার কারণ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে বাবলি। এক নম্বর তপাইদা আর দু'নম্বর আনাজ না কুটে রাখা। ভারতের সেনা যে পাক সেনাকে যুদ্ধে হারিয়ে দেবে, আবার যে পূর্ববঙ্গে নিজের গ্রামে ফিরে যাবে, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল বাবলি। তখন আনাজ কোটার মতো তুচ্ছ কাজের কথা ভাবতেই ইচ্ছে করছিল না। এখন ক্যাথির থমথমে মুখটা দেখে সেই তুচ্ছ কাজটা এবার তাড়াতাড়ি করতে থাকল বাবলি।

ফাঁকা বাড়িতে কোনও কাজ না পেয়ে শিপ্রা রান্নাঘরের মুখের কাছে এসে ক্যাথিকে বলল, তুমি ছাড়ো না আন্টি। আমি রান্নাটা করে দিচ্ছি।

ক্যাথি মন দিয়ে কাজ করতে করতে বললেন, তুই ওপরের ঘরে যা, দু'দিনের জন্য আন্টির কাছে এসে আর রান্না করতে হবে না।

শিপ্রা আদুরে অভিমান দেখিয়ে বলল, তুমি এরকম করলে কিন্তু আমি আর আসব না আন্টি।

একদম পাকামো করবি না শ্যারন... চা খাবি?

এখন আর না।

রান্নাঘরটা ছোট। তিন জনের জন্য খুবই অপরিসর। শিপ্রা একটা মোড়া নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এসে বসল। সামনে মাটিতে বসে বড় একটা বঁটিতে বাবলি আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে। খোসাগুলো এত মোটা মোটা করে বঁটিতে ঝুলছে, শিপ্রার দেখেই মনে হল মেয়েটার এসব কাজের অভ্যেস নেই। আর থাকবেই বা কী করে? ক্যাথি

আন্টিই তো কালকে বলছিল, অনেক বড় ঘরের মেয়ে। বড় ঘরের মেয়েদের এই বয়সে আহ্লাদি হয়ে থাকার কথা। কে ভেবেছিল সেই আহ্লাদি মেয়েকে রাতারাতি রিফিউজি হয়ে লোকের বাড়ির রান্নাঘরে জোগাড়ের কাজ করতে হবে! নিশ্বাসটা ভারী হল শিপ্রার।

একটা ছুরি হবে বাবলি?

ছুরির কথা শুনে বাবলি অবাক হয়ে শিপ্রার দিকে তাকাল।

কী হবে তোর ছুরি নিয়ে শ্যারন? ক্যাথি নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

কিছু তো করি আন্টি, অন্তত আলুর খোসাটা ছাড়াই।

বললাম তো তোকে কিছু করতে হবে না। কিছু করতে ইচ্ছে করলে উলের গোলা আর কাঁটাজোড়া নিয়ে আয়। তোর বোনাটা এগিয়ে থাকবে।

না আন্টি। ওটা একসঙ্গে বসে করব।

রান্না করতে করতে ক্যাথির মুখের থমথমে ভাবটা কমে আসছিল। একটা দার্শনিকের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই বাড়িতে রান্না করিস শ্যারন?

এমনিতে রোজকারের রান্না করি না। লোক আছে। তবে মাঝে মাঝে বিট্টু যেগুলো খেতে ভালবাসে, সেই ডিশ বানাই।

আমারও তো তাই ছিল রে শ্যারন। রান্নাবান্না করার আর সময় ছিল কখন বল! ওই রবার্টের জন্য তৈরি করতাম কখনও কখনও।

আমার মনে আছে আন্টি। কী ভাল কেক তৈরি করতে তুমি! রবার্টের জন্মদিনে, ক্রিসমাসে আমাদের দিতে।

তোর মা কিন্তু খুব ভাল রান্না করত, জানিস। রান্না করতে ভালবাসত। তবে তুই বোর্ডিং-এ চলে যাওয়ার পর একদম আর রান্না করতে চাইত না। বলত, তুই নেই, কার জন্য আর করবে? তবু আমাদের ভাল কিছু খেতে ইচ্ছে করলে মার্থাকে বলতাম। যত্ন করে আমাদের রান্না করে দিত। কিন্তু তোর জন্য মনের দুঃখে সেই রান্না নিজে একটুও দাঁতে কাটত না। সুখে, দুঃখে, আনন্দে, যন্ত্রণায় আমরাও একটা ভালবাসার জীবন কাটিয়েছি রে শ্যারন।

কড়াইয়ের গরম তেলে আনাজগুলো ফেললেন ক্যাথি। ছ্যাঁক করে একটা আওয়াজ হল। ভসভস করে খানিকটা ধোঁয়া উঠে এল ক্যাথির মুখে। ধোঁয়াটা ঝাপটা মেরে স্মৃতিরোমন্থনে ছলছলে হয়ে যাওয়া চোখ থেকে জলটুকু নিংড়ে বার করে আনল।

মুখ নিচু করে বসে ছিল শিপ্রা। মায়ের কথা শুনলে মনটা ভারী হয়ে যায়। ক্যাথি আন্টির সঙ্গে গল্প করতে বসলে মায়ের প্রসঙ্গ উঠবে, এটাই স্বাভাবিক।

শিপ্রার মাথাটা ঝুলে থাকায় ওর মুখটা দেখতে পেলেন না ক্যাথি। তবে স্মৃতির অবগাহনে ওর মনটাও যে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে, এটা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না ক্যাথির। ওর মনটা ঘোরাতে এবার হালকা প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন।

রবার্টের ছেলেটা খুব দুষ্টু হয়েছে রে জানিস তো!

রবার্টের ছেলের কথাটা কাল থেকেই শুনছে শিপ্রা। ভেতরে ভেতরে ভীষণ জানতে

ইচ্ছে করছে রবার্টের কোথায় বিয়ে হয়েছে, কীরকম হয়েছে ওর বউ। শিপ্রার বিয়ের পরই বিয়ে হয়েছে রবার্টের। তবে মায়ের মুখে ও কখনও শোনেনি রবার্টের বিয়ের কথা। আসলে শিপ্রার বিয়ের পর থেকে নিজের সমাজের মানুষগুলো সম্পর্কে একটা শব্দও আলোচনা করতে চাইতেন না মার্থা। স্বাভাবিকভাবে ওদের সম্পর্কে আগ্রহও ক্রমশ কমে গিয়েছিল শিপ্রার মধ্যে।

রবার্টের বউয়ের নাম কী আন্টি?

সিমি।

সিমি, বাঙালি?

না, বিহার না ইউপি কোথায় একটা যেন ওর বাড়ি বলেছিল।

তোমার কাছে ছবি নেই?

না, রাখিনি।

শিপ্রা বুঝতে পারল ক্যাথি আন্টির সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্ক খুব একটা ভাল নয়। ক্যাথি আন্টি কীরকম একটা অনিচ্ছুক গলাতে কথা বলছে। তাই রবার্টের বউয়ের প্রসঙ্গে আর বেশি আলোচনা করল না শিপ্রা। তা ছাড়া বাবলি আছে এখানে। অনেক কিছুই ওর সামনে আলোচনা করা যায় না।

ক্যাথি নিজের মতোই বলতে থাকলেন, আমি শুধু দুটো প্রার্থনাই করি জানিস। ওরা যেন সব সুখে-শান্তিতে থাকে, মায়ের পাপের বোঝা বইতে না হয়। আর আমি যেন মার্থার মতোই টুক করে চলে যাই।

কাল থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কথা বলল আন্টি। একটা বয়সের পর মানুষ নিজেকে পৃথিবীর বোঝা মনে করে। বেঁচে থাকার সব আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুর পর স্বর্গবাসের একটা সুখচিন্তা করে তৃপ্তি পায়।

বাইরে মাইকে কিছু একটা ঘোষণার আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। সেটা আর একটু স্পষ্ট হতে ঘোষণাটা শোনার জন্য ক্যাথি চুপ করে গেলেন। উনুনের ওপর থেকে কড়াইটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, কী বলছে বল তো?

শিপ্রাও ঠিক বুঝতে পারছিল না। বলল, দাঁড়াও দরজা খুলে শুনে আসি।

ক্যাথিও দরজার দিকে এগোলেন। পিছন পিছন বাবলিও উঠে এল।

একটা সাইকেল রিকশা। রিকশাটার হাতলে একটা মাইক লাগানো। রিকশাওয়ালা খুব ধীরে ধীরে রিকশাটা চালাচ্ছে। পিছনের সিটে বসে একজন ঘোষক বলে চলেছে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় কয়েকটা নিয়ম মেনে চলতে হবে। রাত্রিবেলায় জোরালো টর্চ ব্যবহার করা যাবে না। আকাশের দিকে টর্চ একেবারেই তাক করা যাবে না। সাইকেল থেকে গাড়ির হেডলাইট, সব কিছুরই কাচের অর্ধেক কালো রং করে নিতে হবে। সাইরেন বেজে উঠলে নিভিয়ে ফেলতে হবে বাড়ির বাইরের সব আলো। ভেতরে আলো জ্বললেও দরজা-জানলা এমন করে বন্ধ রাখতে হবে, যাতে একটুও আলো চুঁইয়ে বাইরে না আসে। আকাশপথে শত্রুপক্ষ যদি কোনওরকমে চলেও আসে কিছুতেই যেন চিহ্নিত না করতে পারে এলাকাকে।

রিকশাটা আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেল। শিপ্রা ঘুরে দেখল সব থেকে শুকিয়ে গেছে বাবলির মুখটা। শিপ্রা বাবলির কাঁধে হাত রেখে বলল, কী হল তোমার? আবার ভয় পেয়ে গেলে?

তুমি যে বলেছিলে দিদি, এখানে কোনও ভয় নেই। তা হলে মাইকে ওরকম বলছে কেন? নিশ্চয়ই পাক সেনারা প্লেন নিয়ে ঢুকে পড়ছে।

শিপ্রা বাবলিকে অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল, যুদ্ধের সময় ওরকম হয়। এটাকে ব্ল্যাক আউট বলে। পাকিস্তানের সঙ্গে আগের যুদ্ধে, চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও এটা দেখেছি। যুদ্ধের সময় অনেক সাবধানতা নিতে হয়। তুমি এসব শুনে একদম ঘাবড়িয়ো না।

ক্যাথিও বাবলিকে তাড়া দিলেন। বাকি রান্নাটা শেষ করতে হবে। শিপ্রা সেটা শুনে বলল, যাও, তুমি চানটান করে এসো। আমি বাকিটা আন্টিকে হেল্‌প করে দিচ্ছি।

ক্যাথি রান্নাটা কষতে কষতে এক চামচ কড়া থেকে তুলে শিপ্রাকে দিয়ে বললেন, দেখ তো নুন মিষ্টি ঠিক হয়েছে কিনা?

চামচটা আগুন গরম। তরকারিটার ওপর দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। শিপ্রা ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে মুখে দিয়ে বলল, দুর্ধর্ষ হয়েছে আন্টি!

কীসের আবার দুর্ধর্ষ? একটা পাঁচমেশালি তরকারি।

সত্যি বলছি আন্টি।

ক্যাথির খুব ভাল লাগল। কখনও কখনও রান্নার জন্য এরকম আন্তরিক স্বীকৃতি পেলে রান্না করার পরিশ্রমটা সার্থক মনে হয়। খুশির মেজাজে বললেন, এই তরকারি রান্নাটা কে শিখিয়েছিল জানিস আমাকে? বিশ্বাস করতে পারবি না। মহেশ। মহেশ যা রাঁধত না এই তরকারিটা...

শিপ্রা চুপ করে গেল মহেশের কথা শুনে। ক্যাথি অবশ্য সেটা খেয়াল না করেই বললেন, মহেশ তো তোদের ওখানেই আছে এখন, তাই না? মার্থা তো তোর ওখানেই মহেশের ব্যবস্থা করে গিয়েছিল। বলেছিল দয়ালের কারখানায় কী একটা কাজের ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

মহেশদা আর নেই আন্টি। শিপ্রা গম্ভীর গলায় বলল।

নেই মানে? তোদের কারখানার চাকরিটা ছেড়ে দিল। মার্থাকে ও যে কথা দিয়েছিল, শেষ দিন পর্যন্ত তোর কাছে থাকবে। তোর মা মহেশের জন্য কত করেছে জানিস? ছেলেদের জাতই এই, অকৃতজ্ঞের দল সব। একটু ভাল দু'পয়সার চাকরি পেয়েছে কী সব ভুলে গেল।

শিপ্রা আর চুপ করে থাকতে পারল না। ভিজে গলায় বলে উঠল, মহেশদা কথা রেখেছিল আন্টি। শেষ দিন পর্যন্ত আমার পাশেই ছিল।

ক্যাথির বুকটা একটু কেঁপে উঠল। শিপ্রা কী বলতে চাইছে? ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শিপ্রার দিকে চাইলেন। শিপ্রার চোখে জল টলটল করছে।

মহেশদাকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। দয়াল পুলিশকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছে।

ক্যাথির কাঁপতে থাকা বুকের ভেতরটা এবার শূন্য মনে হল। মহেশও চলে গেল।

ম্যাকার্থি অনেক ছোট বয়সে মহেশকে কোথা থেকে যেন নিয়ে এসেছিল। তারপর একটা সময় থেকে মার্থার কাছেই রয়ে গিয়েছিল মহেশ। ওই পরিবেশে থেকেও মহেশের চরিত্রের কোনও দোষ কোনওদিন দেখেননি ক্যাথি। অন্য মেয়েরাও মহেশকে খুব ভালবাসত। সত্যিকারের ভাইয়ের মতো দেখত। হাতে রাখি পরাত, ভাইফোঁটায় কপালে চন্দনের টিপ দিত। ম্যাকার্থি আর মার্থার লোক হলেও একসময়ে সবার আপনজন হয়ে উঠেছিল মহেশ।

মহেশও জান কবুল করত মেয়েগুলোর জন্য। ব্যাবসার শর্তটুকুর বাইরে মেয়েগুলো কোনওভাবে উত্ত্যক্ত হলে বা বিপদে পড়লে প্রাণের পরোয়া না করেই ঝাঁপিয়ে পড়ত মহেশ। বড্ড মাথাগরম ছিল ছেলেটার। কয়েকটা খুনখারাপিও করে ফেলেছিল মেয়েগুলোর জন্য। মার্থা তাই একসময় বাধ্য হয়েছিল মহেশকে হরিতলায় পাকাপাকিভাবে পাঠিয়ে দিতে। মেয়েরা তো শ্যারনকে চিনতই না। চোখেও দেখেনি কখনও। তাই শ্যারন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার ঘটনাটা ওদের স্পর্শ করেনি। কিন্তু ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল সবাই মহেশ চলে যাওয়ায়।

মহেশের করা অসংখ্য উপকারগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে ক্যাথির। একটা নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে শিপ্রার দিকে চেয়ে স্মৃতিতে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

ক্যাথির আহত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না শিপ্রা। চোখ দুটো যেন বলতে চাইছে, মহেশের মৃত্যুর দায় তোর শ্যারন। তোর স্বামীর অন্যায় আর পাপের দায়ভাগ তোর। মুখটা নিচু করে নিল শিপ্রা।

তরকারি থেকে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ উঠল। তলাটা ধরে গেছে। ক্যাথি ক্লান্ত হাতে দু'বার খুন্তিটা নাড়িয়ে উনুনের ওপর থেকে কড়াইটা পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, বড্ড মায়া ছিল ছেলেটার। ওর রুক্ষ খরখরে বাইরেটা দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কী আশ্চর্য একটা নরম দয়ালু মানুষ ছিল ওর মধ্যে। দয়াল ওকে খুন করিয়ে দিল কেন?

শিপ্রা এসে থেকে ভাবছিল ক্যাথিকে সব খুলে বলবে। সময় সুযোগ হচ্ছিল না। এই সময়টা বাবলি চান করতে গেছে আর মহেশের প্রসঙ্গটাও হঠাৎ করে উঠল। শিপ্রা ছোট করে ক্যাথিকে জানাল হরিতলার ঘটনাটা। মহেশের বাড়িতে গোপন ডেরা, নকশাল থেকে আরম্ভ করে পুলিশ এনকাউন্টার পর্যন্ত সব কিছু। কেন ক্যাথি আন্টির কাছে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলে এসেছে, সেটা খুলে বলে ভেতরটা অনেক হালকা লাগল শিপ্রার।

ক্যাথি শিপ্রাকে বললেন, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল রে শ্যারন। ভাল খবর আর এখন কেউ শোনায় না কেন রে? মহেশ... মহেশ চলে গেল... চল ওপরে যাই। বাবলি বাকি রান্নাটা শেষ করে দেবে, বলে দিচ্ছি ওকে।

ওপরের ঘরে এসে মহেশের জন্য স্মৃতিচারণ আরও বিস্তৃত করলেন ক্যাথি। কিন্তু দয়াল সান্যালের নিষ্ঠুরতার ব্যাপারে একটা কথাও বললেন না। মহেশের কথা যত শুনছে, নিজেকে তত অপরাধী মনে হচ্ছে শিপ্রার। সে কঠিন গলায় বলল, দয়ালকে এর মূল্য দিতে হবে।

ক্যাথি একটা আনমনা গলায় বললেন, কী জানি, কে কীসের মূল্য দিচ্ছে। মহেশও তো এককালে খুনখারাপি করেছিল। ব্রজেন বলে একটা লোক আমাদের ওখানে মেয়েদের সাপ্লাই করত। লোকটা একদিন খুন হয়ে গেল। সবাই সন্দেহ করেছিল মহেশকে। এরকম আরও ঘটনা আছে...

দুটো কি এক হল আন্টি? ওই ব্রজেনকে যদি খুন করেও থাকে মহেশদা, সে কি নিজের স্বার্থে করেছিল? সেদিন যদি মহেশদা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বা বিট্টুকে বাঁচাতে গিয়ে কারও গলায় কাটারির কোপ বসিয়ে দিত, সেটা কি নিজের স্বার্থে করত? দয়াল কিন্তু যা করেছে নিজের স্বার্থে করেছে। শাস্তি ওকে পেতেই হবে... কেউ না দিলে আমিই দেব...

এভাবে বলিস না শ্যারন। স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করিস না।

শিপ্রা এবার জ্বলে উঠল, কীসের স্বামী? যে আমার মাকে গালি দেয়? যে আমাকে নকশাল প্রমাণ করে জেলে পাঠাতে চায়? আমি কি শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নকশালদের হেল্‌প চেয়েছিলাম? ওর প্রাণটাও কি বাঁচাতে চাইনি? তার বদলে কী দিল ও? শুধু ঘৃণা আর অপমান। বিট্টু যদি না জন্মাত, আমি কবে ছেড়ে চলে যেতাম লোকটাকে।

তোর মায়ের এটাও একটা স্বপ্ন ছিল তুই দয়ালের বউ হয়ে থাকবি। শুধু পাখিগুলো বাঁচিয়ে রেখে মায়ের একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবি তুই? মার্থার আর একটা স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবি না?

তুমি মায়ের কোন স্বপ্নের কথা বলছ আন্টি! এইভাবে বেঁচে থাকাটা কি মা চেয়েছিল? আমার স্বামী মহেশদাকে খুন করিয়ে দিচ্ছে, এটা আমার মা সহ্য করতে পারত?

তোর বয়স অল্প শ্যারন। তোর মা পৃথিবীর কোনও কালো ছায়া তোর ওপর পড়তে দেয়নি। তুই জানিস না রে, মেয়েদের জীবনটা অনেক কঠিন। প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে করতে এগোতে হয়। পাপ-পুণ্যের হিসেব করাটা তুই ঈশ্বরের ওপরই ছেড়ে দে। শাস্তি দেওয়ার হলে উনিই দেবেন।

কখনও নয়। ঈশ্বরের শাস্তি দেওয়ার ভরসায় বসে থাকলে দেখবে কোনও কোনও মানুষ সারাজীবন অন্যায় করা সত্ত্বেও দিব্যি পার পেয়ে গেল।

এবার ক্যাথিও মেজাজ হারালেন, ঈশ্বরে তোর এতই অবিশ্বাস, অভক্তি, তো চার্চে যাব বলছিলি কেন? হিন্দু হয়ে বাড়িতে তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতে না পেরে বড় বড় নিশ্বাস ফেলছিলিস কেন?

শিপ্রা চুপ করে গেল। গলার তেজে যেন কেউ জল ঢেলে দিল। খুব আস্তে নিচু গলায় শিপ্রা বলল, জিসাসের কাছে আমি তো কোনও পাপপুণ্যের হিসেব চাইতে যাইনি। আমার আর অধিকারও নেই জিসাসের কাছে কিছু চাওয়ার। আমি যাই শুধু একটু শান্তির খোঁজে। চুপ করে জিসাসের সামনে বসে থাকলে একটা অদ্ভুত শান্তি পাই। চার্চে আমি শুধু সেইটুকুর জন্যই যাই।

দুপুরে খাওয়ার সময় বাবলি খেয়াল করল মাসি আর দিদি কেউই ভাল করে খেল না। দু'জনেরই কেমন যেন মনখারাপ। চান করতে যাওয়ার আগে ওদের এক রকম দেখেছিল বাবলি। চান করে বেরিয়ে এসে আর এক রকম। দু'জনেরই মুখ হঠাৎ করে কেমন যেন থমথমে, গম্ভীর।

এই হঠাৎ করে পালটে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বাবলির কোনও আন্দাজ নেই। মনে হল, তা হলে কি খবর এসেছে, ভারত যুদ্ধে হারছে! বাবলিকে সেটা বলছে না? রান্নার বাকিটা ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে মাসি আর দিদি ওপরের ঘরে চলে গিয়েছিল। দু'জনের তারপর উঁচু গলায় তর্কাতর্কি হচ্ছিল। তার মধ্যে মহেশ নামটা বেশ কয়েকবার দু'জনের মুখেই শুনেছে বাবলি। তবে এই মহেশটা কে, তা জানে না। দিদির সঙ্গে দিদির বরের কোনও বনিবনা নেই। দিদির বরের নাম কি মহেশ? নাকি যুদ্ধের কেউ মহেশ? ভারতের সেনাপতির নাম তো শুনেছিল মানেক শ'। সেই নামটাকেই আবার মহেশ শোনেনি তো ভুল করে!

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ক্যাথি খবরের কাগজ, উলের গোলা, টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে ছাদে রোদ পোহাতে যান। আজ বললেন, যাবেন না। মন ভাল নেই, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। বাবলিকে বললেন, জানলাগুলো বন্ধ করে দিতে।

সিঙ্গল বেডের চেয়ে অল্প চওড়া খাট। ক্যাথির পাশে চেপেচুপে শুয়ে পড়ল শিপ্রা। তারপর খুব নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকল। বাবলি বুঝতে পারল, এটা তার কান বাঁচিয়ে আলোচনা। শীতের রোদ পোহাতে সে একা ছাদে চলে এল।

শিপ্রাকে একদিনেই একদম আপন মনে হতে শুরু করেছে বাবলির। সে যে রিফিউজি, এ-বাড়িতে দয়ার আশ্রয়ে আছে, মাস ফুরোলে তিরিশ টাকা মাইনে পাওয়ার কথা— এই ঝিয়ের পরিচয়টা দিদি যেন ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। বাবলি লজ্জায় মাটিতে প্রায় মিশে যাচ্ছিল যখন খাওয়ার পরে শিপ্রা বাসন ধুতে ওর সঙ্গে হাত লাগিয়েছিল। ওর মধ্যে বাবলির নিজের এঁটো বাসনও ছিল যে!

সেই দিদিই যখন বাবলির কান বাঁচিয়ে শুধু মাসির সঙ্গে গল্প করতে শুরু করল, তখন ভেতরে ভেতরে একটু কষ্ট হতে লাগল বাবলির। আপনই যখন করে নিয়েছে তখন গল্পের মধ্যে ওকে রাখলেও তো পারে! কার সঙ্গেই বা দুটো কথা বলার আছে বাবলির!

বাবলি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কখনও ভাবতে থাকল, পর যতই আন্তরিক হোক, পর কখনও আপন হয় না। মালকিনের ব্যবহার যতই ভাল হোক, বাড়ির ঝি কখনও নিজের বোন হয় না। তার আপনজনরাই তার নিজের। তারা যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার আসল সম্মান, আসল আহ্লাদের জায়গা সেখানেই। চোখ দুটো জলে ভরে এল বাবলির। হঠাৎ করে ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য খুব মনখারাপ করতে শুরু করল।

ছাদ থেকে নীচে নেমে এল বাবলি। শোওয়ার ঘরে দিদি আর মাসি একইরকম ভাবে

গল্প করে যাচ্ছে। নিচু গলায়। বাবলি দরজার কাছে দাঁড়াতে ক্যাথির চোখ পড়ল, কিছু বলবি বাবলি?

বলছিলাম যে মাসি, এখন তো কোনও কাজ নেই, মায়ের কাছে একটু ঘুরে আসব? বিকেল হওয়ার আগেই চলে আসব।

ক্যাথি একটু চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে যা, সোজা মায়ের বাড়ি যাবি আর আসবি। অন্য কোথাও যাবি না কিন্তু।

বাবলি ঘাড় হেলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, ওর মা কোথায় থাকে?

কাছেই একটা বাড়িতে রান্নার কাজ করছে। আমি বাবলিকে দুপুরে খুব একটা ছাড়ি না। ওর মা কাজকর্ম সেরে দুপুরে আসে। এখন বোধহয় জেনেছে তুই আছিস, তাই দুপুরে আসছে না। যাক গে, ছাড় ওর কথা, তোর সঙ্গে যে কথাটা হচ্ছিল... দয়ালের সঙ্গে আইনিভাবে সব সম্পর্ক শেষ করে দেওয়াটায় তোর সমস্যা মিটবে না শ্যারন। সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। কোথায় থাকবি তুই?

তোমার কাছে একটু জায়গা হবে না আন্টি?

এটাও কোনও কাজের কথা নয়। আমি আর ক'দিন? তারপর? তোকে অন্য কিছু ভাবতে হবে...

ফাঁকা রাস্তায় নেমে এল বাবলি। মনে মনে গোছাতে থাকল মায়ের সঙ্গে কী কথা বলবে। যুদ্ধটা মিটে গেলে, নিজেদের স্বাধীন দেশ হয়ে গেলে আবার সবাই ফিরে যাবে নিজের মাটিতে।

টিং, টিং। পিছন থেকে সাইকেলের ঘন্টির একটা আওয়াজ হল। বাবলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল তপাইদা। যবে থেকে আলাপ হয়েছে তপাইকে এড়িয়ে যাওয়া খুব মুশকিল। মাসির বাড়ির কাছাকাছিই অষ্টপ্রহর ঘুরঘুর করে আর বাবলিকে একা পেলেই কোথা থেকে যেন ঠিক উদয় হয়ে যায়। এখন তপাইকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে খুব সাবধান হয়ে গেল বাবলি। আজ সকালেই সদ্য মাসির কাছে বকুনি খেয়েছে। যদিও দেখে এসেছে মাসি আর দিদি খাটে শুয়ে আছে, কিন্তু কোনও ভরসা নেই। যদি এর মধ্যে উঠে পড়ে ছাদে চলে আসে তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাবে বাবলিকে আর তপাইকে। সকালে সাবধান করার পরও যদি আবার তপাইয়ের সঙ্গে দেখে ফেলে, ও-বাড়ির দরজাই হয়তো চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

তপাইয়ের ডাক উপেক্ষা করে বাবলি হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। তপাই কিন্তু ওর পিছু ছাড়ল না। বাবলির হাঁটার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাশে পাশে সাইকেলটা চালাতে চালাতে বলল, কী হল, যাবে না মিলিটারিদের গাড়ি দেখতে?

বাবলি কোনও উত্তর না দিয়ে দু'দিকে মাথাটা ঝাঁকাল।

তপাই একটু হতাশ হল, কিন্তু আশা ছাড়ল না।

যা বাবাঃ! এই তো সকালে ঠিক হল আমরা দেখতে যাব। এখন আবার তোমার কী হল? আমি সব কাজকর্ম ফেলে কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

নিচু স্বরে বাবলি বলল, মাসি জেনে গেছে। তোমাকে মাসি একদম পছন্দ করে না। তোমার কথা শুনলেই রেগে যায়।

যাঃ বাবা! আমি আবার বুড়ির পাকা ধানে কবে মই দিলাম?

তোমার কথাবার্তা এরকম বলেই মাসি রেগে যায়...

ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। তবে একটা কথা তোমাকে বলে দিলাম আজই কিন্তু শেষ সুযোগ। এর পরে মিলিটারিদের গাড়ি যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, এটা আর দেখতে পাবে না।

বাবলির পা দুটো থেমে গেল। ভুরু দুটো কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, কেন, আর দেখতে পাব না কেন?

তপাই সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

বাঃ রে! মিলিটারিরা সব এখানে, ব্যারাকপুরেই বসে থাকবে নাকি? রোজ একজন-একজন করে যাবে যুদ্ধ করতে? যত মিলিটারি আছে সব আজকেই চলে যাবে। সব গাড়িগুলো। ওঃ, যা আনন্দ হয় না ওদের যুদ্ধে যেতে দেখে! তোমাদের সব কষ্টের শোধ তুলবে ওরা।

বাবলি ধন্দে পড়ল। মনের একটা প্রচণ্ড আশ ভারতের মিলিটারিরা পূর্ববঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে দেখবে। মিলিটারিরা লড়াই করে উদ্ধার করবে ওদের গ্রাম। যদি সুযোগ থাকত মিলিটারিদের বলে দিত ওর গ্রামের ঠিকানাটা। তপাইদা ঠিক বলেছে—ওরাই তো শোধ তুলবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে দেখল বাবলি। মাসির বাড়িটা আর দেখা যাচ্ছে না। এখানে দাঁড়িয়ে তপাইয়ের সঙ্গে দুটো কথা বললে মাসির বা দিদির দেখে ফেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। নিজের অসহায়তার কথা বলল তপাইকে।

কী করি বলো? দেখতে তো খুব ইচ্ছে করে। তুমি আমাকে রাস্তাটা বলে দাও, আমি দেখে আসছি।

তপাই পুরনো উৎসাহটা ফিরে পেল। সাইকেলের রডটা দেখিয়ে বলল, বসো এখানে, তোমাকে দেখিয়ে আনছি।

বাবলি প্রায় আঁতকে উঠল, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? তোমার সাইকেলে উঠি, কেউ দেখে ফেলে মাসিকে বলে দিক, তারপর মাসি আমাকে শুধু মেরে বাড়ি থেকে তাড়াবে না, এই পাড়াতেও থাকতে দেবে না।

এটা কি বুড়ির খাস মুলুক নাকি? তোমাকে পাড়ায় থাকতে দেবে না বললেই হল? আমরা আছি কী করতে? এক ডাকে পঁচিশটা ছেলে দাঁড় করিয়ে দেব বুড়ির সামনে। ওর ছেলেটা এলে কেলিয়ে...

আঃ, আবার খারাপ কথা বলছ?

ঠিক আছে বলব না। কিন্তু এটা বুড়ির কী ধরনের জুলুম? বাড়িতে থাকতে দিয়েছে বলে কি মাথা কিনে রেখেছে?

কী করব বলো? যদি আমাকে তাড়িয়ে দেয়, কে আমাকে রাখবে?

তপাই চিন্তা করল। তারপর জামার কলারটা একটু তুলে বলল, বুঝতে পেরেছি।

তোমার সমস্যা একটাই। আমার সঙ্গে সাইকেলে চাপলে যদি কেউ দেখে ফেলে। ঠিক আছে। তোমাকে একটা বুদ্ধি দিচ্ছি। তুমি এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা গিয়ে যে-মোড়টা পড়বে সেখান থেকে বাঁদিকে গিয়ে, দ্বিতীয় ডানদিকের রাস্তাটার মুখে অপেক্ষা করো। ওদিকটা একদম ফাঁকা। কেউ নেই। একটা শর্টকাট রাস্তা আছে। সেখান থেকে তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসছি মিলিটারিদের গাড়িগুলো।

বাবলি জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ লাগবে যেতে-আসতে?

কতক্ষণ আবার। বড়জোর যেতে দশ মিনিট, আসতে দশ।

আবার সাতপাঁচ ভাবতে বসল বাবলি এবং শেষ পর্যন্ত তপাইয়ের পরিকল্পনায় রাজি হয়ে গেল।

উলের গোলাটা আর কাঁটা দুটো নিয়ে শিপ্রা ছাদে চলে এল। কাল শুধু কাঁটাতে ঘরগুলো তুলে দিয়েছিলেন ক্যাথি। তারপর দু'-একবার বোনাটা একটু এগোতে চেষ্টা করছে শিপ্রা। কিন্তু কোনওবারই খুব একটা এগোয়নি। এখন কাঁটাটা তুলে ঝুলটা দেখে মনে হল একেবারে মন্দ হচ্ছে না। বেশ কিছুটা এগিয়েছে বোনাটা। তবে শিপ্রা নিশ্চিত যে, এতগুলো লাইন নিজে বোনেনি। তার মানে ক্যাথি আন্টি কোনও এক ফাঁকে বেশ কয়েক লাইন বুনে দিয়েছে।

খুব তৃপ্তির সঙ্গে বোনাটা দেখতে থাকল শিপ্রা। বিট্টুই যেন ফুটে উঠছে একটু একটু করে। লাল টুপি আর সোয়েটারে বিট্টুকে যে দারুণ মানাবে এটা ভাবতেই মনটা ভরে উঠল শিপ্রার। এগিয়ে গেল পাঁচিলের ধারে।

পাঁচিলের সামনে এসে নীচে চোখ পড়ল। এক মহিলা কুণ্ঠিত হয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। শিপ্রা গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কাউকে খুঁজছেন?

মহিলা ওপর দিকে তাকাল। তারপর একইরকম কুণ্ঠিত স্বরে বলল, বাবলি আছে?

বাবলি ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। একটু পরেই চলে আসবে।

ও। আমিই বাবলির মা। ও কখন গেছে?

এই তো একটুখানি আগে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?

না তো!

আপনি দাঁড়ান, আমি নীচে এসে দরজাটা খুলে দিচ্ছি। আপনি ভেতরে এসে বসুন।

না বসব না। মেয়েটা হয়তো পিছনের রাস্তা দিয়ে গেছে। তাই রাস্তায় দেখা হয়নি। এখন হয়তো আমার দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। আসি আমি।

বাবলির মাকে এগিয়ে যেতে দেখে সকালের মতোই আর একবার মন ভারী হল শিপ্রার। হঠাৎ করে মানুষগুলোর জীবন কীরকম পালটে গেছে।

এ অঞ্চলের রাস্তাঘাট নিয়ে শিপ্রার কোনও ধারণা নেই। শুধু শুনেছে বাবলির মা কাছেই একটা বাড়িতে থাকে। বাবলি যতক্ষণ বেরিয়েছে তাতে তো কাছাকাছি বাড়ি হলে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কোথায় গেল তা হলে মেয়েটা?

চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে উলের কাঁটায় মন দিল শিপ্রা।

এটা কোন রাস্তা তপাইদা? কোথায় গেছে এটা?

ব্যারাকপুর কোর্টের পিছন দিয়ে শুনশান ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে তপাইয়ের সাইকেলের রডে বসে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল বাবলি।

তোমাকে বললাম না, শর্টকাট রাস্তা। চলো না দেখবে। মিলিটারিদের সব দেখতে পাবে এখান দিয়ে।

আর কত দুর তপাইদা?

এই তো সামনেই... আর একটুখানি...

তপাই সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দিল। রাস্তাটা এখন জনমানবশূন্য। বাবলি কখনও এ-অঞ্চলটা দেখেনি। বাড়িঘর প্রায় নেই। ঘন গাছগাছালি আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে, অনেকটা জঙ্গলের মতো। একটা জায়গায় এসে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে তপাই বলল, নামো এখানে।

এখানে? বাবলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এখানে মিলিটারিদের কী দেখার আছে কিছুই মাথায় আসছে না। এখানে তো কিছুই নেই তপাইদা।

তপাই হাসল। বলল, বোকা মেয়ে। এরকম জায়গা দিয়েই তো মিলিটারিদের গাড়িগুলো পাস করবে। অপেক্ষা করতে হবে।

বাবলি অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কতক্ষণ?

তপাই হাত ওলটাল।

সে কি কেউ বলতে পারে!

তা হলে চলো আজ ফিরে যাই। পরে আসব।

এত দূর এসে ফিরে যাবে? বললাম না তোমাকে সব গাড়িগুলো আজই চলে যাবে। পরে এলে আর দেখতে পাবে না। চলো আমরা রাস্তাটা ছেড়ে একটু ভেতর দিকে গিয়ে বসি।

ভেতর দিকে কেন?

বাঃ রে! মিলিটারিদের রাস্তায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব নাকি? ওরা ভীষণ রাগী।

বাবলিকে ইঙ্গিত জায়গায় নিয়ে এসে ফেলে তপাইয়ের শরীরের মধ্যে উত্তেজনাটা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। শীতকালেও যেন শরীরের ভেতর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে।

রাস্তার থেকে সাইকেলটা নামিয়ে একটা গাছের পিছনে দাঁড় করাল তপাই। তারপর বাবলির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তপাইয়ের এরকমভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত চোখে ওকে দেখতে দেখে বাবলির একটা অস্বস্তি হতে থাকল।

তপাইদা চলো। আজ চলে যাই। পরে কপালে থাকলে ঠিক দেখব।

তপাই কোনও উত্তর দিল না। আচমকা দু'হাতের তালুতে বাবলির মুখটা শক্ত করে ধরে নিজের ঠোঁটটা এগিয়ে আনতে লাগল বাবলির ঠোঁটটা লক্ষ্য করে। তপাইয়ের দু'হাতের চাপের মধ্যে থেকে নিজের মুখটাকে কোনওরকমে নীচের দিকে করে বাবলি বলল, কী করছ তপাইদা? ছাড়ো...

তপাইয়ের ঠোঁটটা বাবলির ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছোতে পারল না। প্রতিরোধের মধ্যে কোনওরকমে বাবলির কপালে ঠোঁটটা ছোঁয়াতে পারল তপাই। তারপর চেষ্টা করল সর্বশক্তি দিয়ে বাবলিকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরার।

তপাইয়ের শক্তির কাছে বাবলির নিজেকে খুব দুর্বল মনে হল। ছটফট করেও নিজেকে ছাড়াতে পারছে না। এই অসহায় অবস্থাতে বাবলিকে রক্ষা করল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

তপাইদা মিলিটারি... ছাড়ো...

তপাই চমকে উঠে নিজের বন্ধন শিথিল করল। রাস্তায় দূরে দেখা যাচ্ছে একটা মিলিটারির বড় গাড়ি এগিয়ে আসছে। বাবলি এই সুযোগটার পুরো সদ্ব্যবহার করল। দৌড়ে উঠে এল রাস্তায়। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকল যেদিক দিয়ে তপাইয়ের সঙ্গে সাইকেল চেপে এসেছিল।

মিলিটারির গাড়িটা দেখে তপাইও খুব ঘাবড়ে গেল। বাবলি যদি এখন গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বলে যে তপাই ওর সঙ্গে জোরজবরদস্তি করছিল—মিলিটারিরা রেয়াত করবে না। হয়তো তপাইকে ধরেই নিয়ে যাবে ব্যারাকে। রেগে ব্যারাকের মধ্যে ধরে নিয়ে গেলে মিলিটারিরা কী করে, এ নিয়ে অনেক জনশ্রুতি শুনেছে তপাই। হাঁটুতে আর কোনও জোর পাচ্ছে না সে।

মিলিটারির গাড়িটা পেরিয়ে গেল বাবলির পাশ দিয়ে। রাস্তার একপাশে বাবলিকে ধর্তব্যের মধ্যেও আনল না। দু'জন জওয়ান ছাড়া অত বড় গাড়িটায় কেউ নেই। বাবলি তখন সদ্য লাঞ্ছনা ভুলে হাঁ করে দেখছে জলপাই রঙের গাড়িটা। পিছনের ছাউনির ওপর মোটা দড়ির জাল। সেই জালে ঠেসে বসানো আছে গাছের ডালপালা।

গাড়িটা পেরিয়ে যেতে বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বলতে থাকল, ঠাকুর ওরা যেন ঠিক জিতে ফেরে... ঠাকুর ওরা যেন ঠিক জিতে ফেরে...।

তপাই মাথাটা ঝুলিয়ে সাইকেলটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাবলির পাশে এসে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি বাবলি। নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি। বিশ্বাস করো, আর কোনওদিন এরকম হবে না। আর কোনওদিন যদি এরকম কিছু হয়, তুমি আমার নামে কুকুর পুষো। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। আর কোনওদিন হবে না।

তপাই নাগাড়ে কথাগুলো বলে যাচ্ছে। বাবলি একটা কথারও উত্তর দিচ্ছে না। যতটা সম্ভব জোরে হাঁটছে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তপাইকে বলল, আমাকে বাড়ির কাছে পৌঁছে দাও।

বাড়িতে পৌঁছে আলতো করে দু'বার কড়া নাড়ল বাবলি।

ক্যাথি তখনও ঘুমোচ্ছেন। শিপ্রা ক্যাথিকে আশ্বস্ত করেছিল একটু পরেই ডেকে দেবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ডাকেনি। শুনেছে অ্যাজমার পেশেন্টদের শীতের রাতে মাঝে মাঝে ভয়ংকর কষ্ট হয়। ঘুমোতে পারে না। তাই মনে হয়েছে দুপুরে আন্টি যতক্ষণ ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। তারপর মিঠে রোদ মেখে উল বুনতে বুনতে কোথা দিয়ে সময়টা

কেটে যাচ্ছিল বুঝতেই পারছিল না। ছাদের থেকেই শুনতে পেল বাইরে কড়া নাড়ার আওয়াজ। পাঁচিলের কাছে এসে দেখল দরজার সামনে বাবলি দাঁড়িয়ে আছে।

নীচে নেমে দরজাটা খুলেই শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, তোমার মা এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

প্রশ্নটা শুনেই বাবলির মুখটা সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। বাবলির মুখের এই দ্রুত পরিবর্তনটা শিপ্রার চোখ এড়াল না। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় গিয়েছিলে বাবলি?

বাবলির গলায় তখন যেন স্বরই ফুটছে না। কোনওরকমে ঢোঁক গিলে সত্যি কথাটাই বলল, মিলিটারিদের গাড়ি দেখতে...

কার সঙ্গে?

এবার বাবলি মিথ্যে বলল, একাই, এই তো সামনেই...

শিপ্রা মুচকি হেসে ঠোঁটের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে বলল, চুপ। চুপ। আন্টিকে কিছু বলার দরকার নেই। জানতে পারলে আবার হুলস্থুল করবে।

বাবলির চোখে এবার জল ভেঙে পড়ল।

আর কখনও যাব না দিদি।

শিপ্রা ওর মাথায় হাত রেখে বলল, সেই ভাল। আর কখনও একা একা যেয়ো না। বোঝো তো আন্টির বয়স হয়েছে। টেনশন করে। কী দরকার শুধু শুধু ওর চিন্তা বাড়িয়ে! কেঁদো না, যাও গিয়ে মুখ হাত-পা ধুয়ে এসো।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হল। একসময় সন্ধের আলো নিভে রাত্রি নামল। তবু যেন ক্যাথির কোনও হুঁশ নেই। ক্যাথি সেই শেষ বিকেলে ছাদে এসেছেন, কিন্তু এখনও ছাদ থেকে নীচে নামেননি। গায়ে একটা চাদর পর্যন্ত নেননি। শিপ্রা বেশ কয়েকবার ক্যাথিকে বলেছে। আবার সাবধান করল, এই ঠান্ডায় খোলা ছাদে আর থেকো না আন্টি।

তুই যে কেন এতক্ষণ আমাকে ঘুমোতে দিলি শ্যারন! দুপুরে বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে এমনিতেই খুব ডিপ্রেসড লাগে। তার ওপর সকালে মহেশের কথাটা শোনা থেকে মনটা একদমই ভাল নেই রে। ঠিক এরকম সন্ধের মুখে মহেশ মাঝে মাঝে খোঁজ নিত মেয়েদের খাওয়াদাওয়া...

শিপ্রা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মহেশের কথা যতবার উঠছে ওর নিজের ভেতরটাও ডুকরে উঠছে। মহেশের মৃত্যুর দায়ভার কিছুতেই যেন এড়াতে পারছে না।

মহেশের বাড়ির কথা কিছু ভেবেছিস শ্যারন? ছেলেটা বিয়ে-থা না করলেও একটা বুড়ি মা ছিল। জানি না এখনও বেঁচে আছে কিনা। তবে যদি বেঁচে থাকে খবরটা তো জানাতে হবে।

না। মহেশদার দেশের ঠিকানাটাই তো জানি না। এখনও হয়তো মহেশদার বাড়িতে জানেই না যে, মহেশদা আর নেই... তুমি ঠিকানাটা দাও। মহেশদার মা যদি বেঁচে থাকে, তার সব দায়িত্ব আমি নেব। শিপ্রার গলা বুজে এল।

ক্যাথি চেয়ারে আরও গা-টা এলিয়ে দিয়ে বললেন, খবরটা তো জানাতেই হবে। আমাদের কিছু করতেও হবে ওর ফ্যামিলির জন্য। ছেলেটা একসময় অনেক করেছে আমাদের জন্য। ওর ঠিকানার ব্যাপারে চিন্তা করিস না। দয়ালের অফিসের খাতায় ওর ঠিকানা না থাকলেও আমার চেনা লোক আছে যে ওর ঠিকানাটা জানে।

শিপ্রা উঠে এসে ক্যাথির হাতটা ধরে বলল, প্লিজ আন্টি, মহেশদার ঠিকানাটা আমাকে জোগাড় করে দাও। আমি যতটা পারি করব। আফটার অল এসব হওয়ার দায়িত্বটা তো আমার।

তোর একার কেন হবে? তুইও তো একটা পরিস্থিতির শিকার। তোর মতো মহেশও বাঁচাতে চেয়েছিল মার্থার স্বপ্নটাকে। ক্যাথি একটু চুপ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুই হুইস্কি খাস শ্যারন?

হুইস্কি? না, না, ওসব কোনওদিনই খাইনি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে কেন?

আজ আমি একটু হুইস্কি খাব।

তুমি? তুমি এখনও এসব খাও?

পুরনো অভ্যাস রে। একদম ছাড়তে পারিনি। তবে এখন ওই দু'মাসে-চার মাসে একবার-আধবার। খুব যখন ইচ্ছে করে। রবার্ট এলে মাঝে মাঝে বটল কিনে নিয়ে আসে।

শিপ্রা একবার চারপাশটা দেখে বলল, বাবলি জানে?

জানে না বোধহয়। ও কতদিন হল এসেছে? মাস দুয়েক হবে হয়তো। তার মধ্যে খেয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না। তবে আজকে জানবে। সব কিছুই একদিন প্রথম জানতে হয়।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব আন্টি? তুমি এখানে ঠিক কী পরিচয়ে থাকো? তোমার পাস্ট সম্পর্কে কী বলো?

ক্যাথি একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলেন।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হওয়ার একটা সুবিধে কী জানিস তো শ্যারন, লোকে আমাদের বাঙালি বলে ভাবতেই পারে না! ভাবতেই পারে না আমরা মাছের ঝোল ভাত ওদের মতোই পছন্দ করি। প্রতিবেশী দু'-একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি গাউন না পরে শাড়ি পরি কেন? তাই আমার আসল অতীতটা জানলে হয়তো এখানে কারও হার্ট অ্যাটাক হবে না। বড়জোর আমাকে পাড়াছাড়া করে দেবে। আমার মা-দিদিমা যে আর দশজনের মতো বাঙালি বাড়ির মেয়ে-বউ ছিল, আজকে আর কাউকে বললেও বিশ্বাস করবে না।

শিপ্রার কাছে শব্দগুলো খুব চেনা। একসময় মা-ও এ ব্যাপারে দুঃখ করত। শ্যারন থেকে নিজে যেদিন শিপ্রা হল, সেদিন তার নতুন নামটায় মা একটা ব্যাপারে খুব খুশি হয়েছিল। 'শিপ্রা' নামটার মধ্যে দিয়ে অন্তত বাঙালি পরিচয়ের স্বীকৃতিটুকু সে পাবে।

কী আশ্চর্য এই জীবন তাই না রে শ্যারন! তোর ভয় হচ্ছে একটা ষোলো বছরের মেয়ে কী জেনে ফেলবে আমার সম্পর্কে তাই ভেবে, আর এককালে ওই বয়সি মেয়েরা আমাকে যমের মতো ভয় করত।

ভাবুক হয়ে কথাগুলো বলতে বলতে ক্যাথি উঠে দাঁড়াতে গেলেন। শিপ্রা বাধা দিয়ে বলে উঠল, তুমি রিল্যাক্স করে বসে আছ, থাকো না। বলো কোথায় তোমার হুইস্কি আছে, আমি নিয়ে আসছি।

ক্যাথি আপত্তি করলেন না। বললেন, পারবি তুই? শোওয়ার ঘরে আলমারির মাথার কোনায় চাবি আছে। বাঁদিকের পাল্লাটা খুলে নীচের তাকের পিছন দিকে বটলটা পাবি। বাবলিকে বলিস একটা কাচের গ্লাস আর জলের বোতল দিতে।

এ অঞ্চলে কাছে-পিঠে দোতলার চেয়ে উঁচু বাড়ি আর নেই। তাই অন্যান্য বাড়ির থেকে ক্যাথির বাড়ির ছাদটা সরাসরি দেখার কোনও সুযোগ নেই। তার ওপর শীতকালে ছাদগুলোও ফাঁকা। খোলা ছাদে মদ্যপান করতে ক্যাথির কোনও কুণ্ঠা নেই। তবু শিপ্রার অস্বস্তি হল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে ছাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর ক্যাথির কথামতো শিপ্রা আলমারি থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করে বাবলিকে হাঁক পাড়ল, বাবলি, একটা কাচের গ্লাস আর জলের বোতল নিয়ে ছাদে এসো।

রান্নাঘরে বাবলির কানে কথাটা পৌঁছোনোমাত্র খুশির ঝিলিক খেলে গেল তার মনে। এর মানে ছাদে এখন গল্প হবে। অনেক অনেক গল্প। যত দ্রুত সম্ভব গ্লাস আর জলের বোতল নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে জোড়া সিঁড়ি ভেঙে ছাদের দিকে উঠতে থাকল বাবলি। কিন্তু দোতলার মুখে শিপ্রাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

দিদির হাতে ওটা কী? মদের বোতলটা চিনতে অসুবিধে হল না বাবলির। কিন্তু মনে তখন হাজারো প্রশ্ন। দিদির হাতে এই বোতলটা কেন? কে খায় মদ? দিদি? বিশ্বাসই হচ্ছে না। তা হলে? মাসি? দুর, এত বয়স্ক একজন মহিলা, সে আবার মদ খেতে পারে নাকি! তা হলে নিশ্চয়ই দিদি। ওই সুটকেসের মধ্যে করে দিদি কি বোতলটা নিয়ে এসেছে? মাসির সামনে দিদি মদ খাবে?

বাবলির চোখের মণি দুটো একবার শিপ্রার মুখের দিকে একবার শিপ্রার হাতের বোতলের দিকে ঘুরছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিপ্রা বলল, এটা খারাপ জিনিস বাবলি। তবে যারা এটা খায় তারা সবসময় যে খারাপ তা নয়...

বাবলি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু জিজ্ঞেস করছে না। এ-বাড়িতে কিছু জিজ্ঞেস করার স্পর্ধাই তার নেই। তবু শিপ্রা যেন নিজের তাগিদেই বাবলিকে বলে যাচ্ছে।

সব কথা সব সময় সবাইকে বলতে নেই বাবলি। কিছু কথা নিজের মধ্যেই রাখতে হয়। যেমন ধরো, আজ দুপুরে তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে বলে মিলিটারিদের ওদিকে চলে গিয়েছিলে। আমি কি মাসিকে বলেছি? কেন বলিনি বলো তো? কারণ, মাসি তোমাকে বারণ করেছিল, তার পরেও তুমি গেছ। বড় হয়েছ। নিজের স্বাধীনতায় তুমি গেছ। আমি সেটা মাসির কানে তুলে খামোকা তোমার জীবনে অশান্তি ডেকে আনব কেন?

বাবলিকে বলতে বলতে শিপ্রাও ভেবে পাচ্ছে না, এত কথা বাবলিকে বলছে কেন? খোলা ছাদে বসে হুইস্কি খেতে মাসির কোনও আপত্তি নেই, শিপ্রাও এখানে

চিরকালের জন্য থাকতে আসেনি। তা হলে নিজে এত সাবধান হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর শিপ্রারও জানা নেই।

ক্যাথি নিজেই নিজের পানীয়টা বানিয়ে নিলেন। বাবলি একটা মাদুর এনে বিছিয়ে দিয়েছিল। আকাশে তারারা ঝিকমিক করছে। শিপ্রা আকাশের দিকে মুখ করে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। একটু দূরে বাবলি অল্প জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কোনও মহিলা মদ্যপান করছে, এই দৃশ্য তার চোখে প্রথম।

আকাশের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিপ্রা বলল, মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। কী অদ্ভুত একটা রহস্য! ব্রাদার ডি'সুজা বলতেন... তুমি তারা চেনো বাবলি? কোনটা সপ্তর্ষিমণ্ডল, কোনটা কালপুরুষের বেল্ট...

ক্যাথির অদ্ভুত হালকা লাগছে শরীরটা। মাথার ভারটাও যেন নেই। গুনগুন করে বহু দিনের পুরনো একটা গজল গাইতে চেষ্টা করতে থাকলেন। বাবলি আকাশের দিকে তাকাল। তারা চেনে না সে। শুধু দেখছে আকাশটা অন্ধকার। চাঁদের আলো নেই। এমন সময়ে হঠাৎ বেজে উঠল মিলিটারিদের সাইরেন।

আগের যুদ্ধগুলোর সূত্রে 'ব্ল্যাক আউট'-এর সঙ্গে ক্যাথির আর শিপ্রার পরিচয় থাকলেও বাবলির কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। ঝুপঝুপ করে নিভে যাচ্ছে চারদিকেব বাড়িগুলোর আলো। শিপ্রা তাড়াতাড়ি বাবলিকে বলে উঠল, বাবলি, বাড়িতে ক'টা আলো জ্বলছে?

বাবলি তখন রীতিমতো আতঙ্কিত, দিশেহারা, মুহূর্তেই যেন গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। কোনওরকমে বলল, সিঁড়ির ঘরে আর দোতলায়।

নিভিয়ে আসতে পারবে?

বাবলি ছুটতে লাগল সিঁড়ির দিকে। শিপ্রা উঁচু গলায় বলল, অন্ধকারে সাবধানে এসো। সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ো না। পারলে নীচ থেকে একটা টর্চ নিয়ে এসো।

ক্যাথি গ্লাসটা শেষ করে পরের পেগটা ঢালতে ঢালতে বললেন, বোকা মেয়ে। এত বিপদ কাটিয়ে এল আর এইটুকু সাইরেনেই ভয় পেয়ে যাচ্ছে। জানিস তো এর আগের যুদ্ধের সময়... চিনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক আউটের সুযোগে দুটো মেয়ে পালাতে গিয়েছিল, মহেশ তখন...

প্লিজ আন্টি! তুমি আর ওসব গল্প এখন কোরো না। কী দরকার বাবলির সামনে ওসব গল্প করার...।

ক্যাথি অল্প নেশায় খানিকটা বিহ্বল হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুই যখন বলছিস বারবার, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের গল্প আর করব না। তার চেয়ে বরং হরিতলার ম্যাকার্থির বাংলোর গল্প করি। তোর মনে আছে শ্যারন, একবার ক্রিসমাসের আগে হরিতলায় গিয়েছিলাম! তুই তখন বাবলির চেয়ে অনেক ছোট। আমরা হরির ঝিলের দিকে মুখ করা বারান্দাটায় বসে তোর ক্যারলস শুনেছিলাম। কী সুন্দর ক্যারলস শিখেছিলি তুই তোর স্কুলে!

ক্যাথির গলা আরও জড়িয়ে গেছে। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বলে চলেছেন,

জিসাসের ওপর আস্থা রাখ। জিসাসের জন্য গান গা... জিসাস সব ঠিক করে দেবেন... কাল রাতে তুই একটা খুব পবিত্র গান গাইছিলি। আয় ঘুম, আয় ঘুম, ওটা গা তো মা একবার আমার জন্য।

১২

এতদিন পর্যন্ত দু'একর জমি সমেত ম্যাকার্থির বাংলোতে ঢোকার রাস্তাটা ছিল হরিতলা কটন মিলের বাইরে দিয়ে। আধবানানো কারখানা আর বাংলোটা এককালে একই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। পরে হবু শাশুড়ির শর্ত মানতে বাংলোটা পাঁচিলের বাইরে বের করে দিয়েছিলেন দয়াল সান্যাল। এখন সেই পাঁচিলটা ভেঙে আবার পুরনো বন্দোবস্তই দ্রুত করে ফেলেছেন তিনি। তবে সেকালে পাঁচিলটা ছিল এক কোমর উঁচু, সম্প্রতি বাংলোটা ঘিরে যে-পাঁচিলটা তোলা হয়েছে, তা দেড় মানুষ উঁচু। তার ওপর আরও এক হাত প্যাঁচানো কাঁটাতার। ফলে বাংলোটাও পাঁচিল ঘেঁষা হয়ে পড়ল। একতলায় আলো-হাওয়া ঢোকা একদমই বন্ধ হয়ে গেছে। বসার ঘরের ভেতর দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। কিন্তু দোতলাতে যাওয়ায় কড়া নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছেন দয়াল সান্যাল।

দোতলার ঝোলা বারান্দাটা একেবারে হরির ঝিলের ধারে। বলা যায় না কে কোথায় লুকিয়ে আছে! ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কখন ছুটে আসে আততায়ীর গুলি। চোখ বন্ধ করলেই খবরের কাগজে আলতা দিয়ে লেখা নিজের মৃত্যুর ফরমানটা স্পষ্ট দেখতে পান দয়াল সান্যাল।

এসিপি রায়ই বুদ্ধিটা দিয়েছেন দয়াল সান্যালকে। পুলিশের ইনটেলিজেন্স এবং গোপন সূত্র বলেছে হরিতলায় নকশালদের নিয়ে কোনও ভয় নেই। শুভাননরা ছিল প্রধান দলের একটা উপশাখা। তাও শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা পুলিশের গুলি খেয়ে হয় মারা গেছে, না হয় অন্য কোনও জায়গায় আত্মগোপন করে আছে। যা ক্ষতি আপাতত ওদের হয়েছে কোমর জুড়তে সময় লাগবে। তার ওপর হঠাৎ করে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সব ভেবেচিন্তে দয়াল সান্যালের মনে হয়েছে, ম্যাকার্থির বাংলোটা একটা পাঁচিলের ঘেরাটোপের মধ্যে করে নিতে পারলে নিরাপত্তার বলয় সুনিশ্চিত হবে। কাজটায় একমাত্র বাধা দিতে পারত শিপ্রা। কিন্তু সে নিজেই এখন যথেষ্ট বেকায়দায় আছে।

দয়াল সান্যাল অনেক অঙ্ক কষে দেখেছেন, শিপ্রার অবর্তমানে বিট্টুকে নিয়ে এখানে থাকলে অনেক দিক থেকেই লাভ। বিট্টু তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। হরিতলার সেই রাতের বিভীষিকাটা মন থেকে মুছে ফেলতে গেলে হরিতলাতে থেকেই সেটা করতে হবে। আর সব থেকে বড় শিক্ষাটা দেওয়া দরকার শিপ্রাকে, দেখিয়ে দেওয়া দরকার, তার আর বিট্টুর জীবনে শিপ্রাকে কোনও দরকার নেই।

বিট্টুর দেখাশোনার সমস্ত ভার দয়াল সান্যাল ছেড়ে দিয়েছেন একান্ত বিশ্বস্ত সরোজ বক্সীর হাতে। সরোজ বক্সীও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন বিট্টুর প্রয়োজনের জোগাড়ে কোনও খামতি না রাখতে।

বিট্টুও এই কারখানার ভেতরে বাংলোটায় এসে সত্যিই আত্মহারা হয়েছে। বাড়িতে শাসন করার মানুষ একজনই ছিল, মাম্মি। এখানে মাম্মি নেই, তাই ইচ্ছেমতো এই কারখানার ভেতর ঘুরে-ফিরে বেড়ানো যায়। কেউ কোনও বাধা তো দেয়ই না, উলটে মালিকের ছেলে বলে শ্রমিকরা সকলে খুব খাতির করে। শুধু শ্রমিকরা কেন? কারখানার ম্যানেজার, শীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য—সেও পর্যন্ত কেমন যেন সমঝে চলে ছ'বছরের ছোট্ট বিট্টুকে।

বিট্টুর সবচেয়ে মজা লাগে কারখানার মধ্যে বাবার অফিসের মোটা গদি-আঁটা চেয়ারটায় বসতে। সামনে-পিছনে হেলানো যায়। ঘূর্ণির মতো ঘোরা যায়। কয়েকপাক চেয়ারটাতে ঘুরে নিয়ে দৌড়ে চলে যায় শীতল ভট্টাচার্যর ঘরে। শীতল ভট্টাচার্যও বিট্টুর জন্য আনিয়ে দেন কোল্ড ড্রিঙ্কস।

কারখানায় একটা ছোট ঘরে ক্যারম বোর্ডও আছে। ম্যাচ বোর্ড। একটা স্ট্যান্ডে বসানো আছে। বিট্টুর বুক পর্যন্ত উঁচু। বিট্টু জানে এই কারখানার যে-কোনও লোককে ও ইচ্ছে করলেই খেলার সঙ্গী হিসেবে পেতে পারে। সবসময় পেয়েই যায় কাউকে না কাউকে।

একদিন দুপুরে বিট্টু বায়না ধরল দু'জনে নয়, চারজনে খেলতে হবে। যে-ছেলেটাকে ক্যারাম খেলার সঙ্গী হিসেবে বেছে এনেছিল বিট্টু, তার কাছেই বায়না ধরল আরও দু'জনকে ধরে আনতে। চারজনে মিলে খেলতে খেলতে একটা সময় একটা ছেলে ফিসফিস করে পাশের ছেলেটাকে বলল, পলাশের বউ এসেছে জানিস?

পাশের ছেলেটা কথাটা শুনে বিট্টুর দিকে একঝলক তাকিয়ে একইরকম চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, তাই! কোথায়? পলাশের খোঁজ পাওয়া গেছে?

ছেলেটা মাথা নাড়ল, এখনও তো কিছু পাওয়া যায়নি। তবে পলাশের বউ জেদ ধরে বসে আছে, ওঁর সঙ্গে দেখা করেই যাবে। কিন্তু উনি কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছেন না।

বিট্টু বুঝতে পারছিল না, কেন বাকি তিনজন দায়সারাভাবে স্ট্রাইকার দিয়ে গুটিগুলো মেরে দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। খেলায় মন ফেরাতে বিট্টু একজনের হাতটা নাড়িয়ে বলল, হল? নাও, এবার তোমার দান।

ছেলেটা একটু চমকে উঠল। তারপর বিট্টুকে বলল, তুমি রেড ফেলেছ, না? এখানে নিয়ম হচ্ছে রেড ফেললে তুমি যতগুলো খুশি দান নিতে পারো পরপর। গুটিগুলোও ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিতে পারো।

বিট্টুর অবাক লাগল। হঠাৎ করে খেলার নিয়ম বদলে গেল কেন? লোকগুলোও হঠাৎ যেন নিজেদের গল্পতেই ব্যস্ত। কালো লাইনের ওপর গুটিগুলো লাইন দিয়ে সাজাতে থাকল বিট্টু। এবার চোখ দুটো ক্যারাম বোর্ডের ওপর রাখলেও কান দুটো খাড়া রাখল, ওরা কী নিয়ে আলোচনা করছে জানার জন্য।

ছেলেগুলো বিট্টুকে মালিকের ছেলে হিসেবে সমীহ করলেও ওর বয়সটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি। কয়েকদিন আগে ইভিনিং শিফট করে যাওয়ার পর থেকে পলাশ সেনের আর কোনও খোঁজ নেই। প্রথম দু'দিন তো জানাই যায়নি পলাশ সেন নিখোঁজ। সবাই ভেবেছিল কামাই করছে। দু'দিন পর পলাশ সেনের দাদা আর শালা এল খোঁজ করতে। আর সেদিনই বিকেলে পুলিশ। জানা গেল, পলাশ সেন নকশাল ছিল। এখন গা ঢাকা দিয়ে আছে। এই অবস্থায় পলাশ সেনের বউ এসেছে কারখানার গেটে আর দয়াল সান্যাল তাকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না, ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলের। আলোচনার উত্তেজনায় ছেলেগুলো যতই গলাটা নামিয়ে রেখে কথা বলার চেষ্টা করুক, সেটা বিট্টুর কান পর্যন্ত পৌঁছোনোর মতো স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

পলাশের বউ বলছে দেখা না করে যাবে না। উনি চামচা বক্সীকে...

আঃ, আস্তে...

...তিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন, বুঝতে পারছিস তো?

এতসব জানলি কী করে?

আমাদের সেকশনে খবর এসেছে... নকশাল সংক্রান্ত পুলিশ কেস হয়েছে বলে কেউ ভয়ে মুখ খুলছে না।

মুখ খুলছে না বলেই খোলসা করে কিছু জানা যাচ্ছে না। কিছু একটা ঘটেছে জানিস! মহেশও তো বেপাত্তা। ক'দিন পলাশের সঙ্গে খুব গুজগুজ ফুসফুস করেছিল মহেশ।

বিট্টুর হঠাৎ মনে হতে লাগল, ও অনেক বড় হয়ে গেছে। অনেক কিছু জানেও। মহেশ, পলাশ, গোলাগুলি...

যেদিন মাম্মি মহেশকাকার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, সেদিন মাম্মিও লুকিয়ে এসেছিল। রাত্রিবেলায়। যে-গাড়িটা করে এসেছিল সেটাও ওদের বাড়ির গাড়ি নয়। তাও মহেশকাকার বাড়ি পর্যন্ত গাড়িটা আসেনি। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল মহেশকাকা। সেখান থেকে বাকি রাস্তাটা রিকশায় এসেছিল। রিকশাওয়ালাটা খুব বুড়ো আর রিকশার সামনের পরদা ফেলা ছিল। বিট্টুর খুব ইচ্ছে করছিল বাইরেটা দেখতে কিন্তু পরদাটা একটু সরাতে গেলেই মাম্মি শক্ত করে হাতটা ধরে নিচ্ছিল। বিট্টুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাম্মির ওকে স্কুলের সামনে গাড়িতে বলা কথাগুলো—তোমাকে মহেশকাকার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে তুমি কিছু জানো না। কেউ মহেশকাকাকে নিয়ে কোনও কথা বললে তুমি সেখানে থাকবে না।

বিট্টু ক্যারামের গুটিগুলো ঘেঁটে দিয়ে বলল, আমার খেলা হয়ে গেছে, আর খেলব না।

ক্যারাম খেলার ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার অফিস ঘরে এল বিট্টু। বাবার কাছে এসে আবদার করল, আমাকে কাগজ আর পেনসিল দাও, ছবি আঁকব।

ঘরের মধ্যে তখন সরোজ বক্সীর সঙ্গে আর একজন দাঁড়িয়ে। বিট্টুর কাগজ-পেনসিলের প্রয়োজন মেটাতে সরোজ বক্সী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যখন তখন অফিসের মধ্যে বিট্টুর ঘুরে বেড়ানোটায় এই ক'দিনেই দয়াল সান্যাল বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। বিট্টুর দিকে

তিনি ফিরেও তাকালেন না। সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে বললেন, তোমাকে আমি লাস্ট অপশন দিচ্ছি অনন্ত। যদি কোর্ট-পুলিশ থেকে বাঁচতে চাও, যেরকম বলছি ঠিক সেরকমই করো।

লোকটা প্রায় কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল, স্যার, আমি এসবে জড়াতে চাই না।

দয়াল সান্যাল ধমকে উঠলেন, জড়িয়ে তুমি গেছ অনন্ত। পলাশ সেনের বউকে গেট পর্যন্ত কে ডেকে এনেছে? ভাবছ, আমি কোনও খবর রাখি না। সব তোমার বুদ্ধি!

অনন্ত ঢোক গিলল। শুকনো গলায় বলল, বিশ্বাস করুন স্যার, গেটের দারোয়ান এসে বলল পলাশের বউ গেটে দাঁড়িয়ে আছে। আমার নাম করছে। পলাশের বউ বলে স্যার...

আমার অত কথা শোনার সময় নেই অনন্ত। তোমাকে আমি আগেই বলেছি—এই মিলে পলাশ একটা নকশালের দল পাকাচ্ছিল। পুলিশ আমার কাছে ছ'জনের নাম দিয়েছে। আমি ওদের ছেড়ে দিলেও পুলিশ ছাড়বে না। পলাশ ছিল ওদের নেতা। মিলে তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল পলাশ। তাই মিলের মধ্যে কার কার সঙ্গে ও মিশত, কোথায় কোথায় কখন মিটিং করত, এসব তুমি কিছুই জানো না, এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না। আর এখন তুমি এসেছ পলাশের বউয়ের হয়ে ওকালতি করতে! পলাশ কোথায় খুনোখুনি করতে গেছে, তার দায় কি আমার? কোন মুখে তুমি বলছ আমাকে ওর বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে? তোমাকে তো দুটো অপশন দিলাম। হয় পলাশের বউকে নিয়ে তোমাদের ইউনিয়নের কাছে যাও, নয় পুলিশের কাছে গিয়ে মিসিং ডায়েরি করো। ওর নকশাল শাগরেদগুলোকে এক জায়গায় করে আন্দোলন করো, না হয় তোমাকে যেরকম বলছি, করো। তবে দুটোরই পরিণতি তুমি যথাসময়ে দেখতে পাবে। হয় পুলিশ কোর্ট-কাছারি, না হয় সুখে-শান্তিতে এই মিলে চাকরি করা।

একদমে এতগুলো কথা বলে গলাটা শুকনো লাগল দয়াল সান্যালের। টেবিলের ওপর থেকে কাচের গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে জল খেতে থাকলেন। জল খেতে খেতেই লক্ষ করলেন বিট্টু কাগজ-পেনসিল হাতে নিয়ে অবাক হয়ে একদৃষ্টে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। খালি গ্লাস টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে দয়াল সান্যাল বিট্টুকে বললেন, তুমি একটু যাও তো বাবা, শীতলের ঘরে গিয়ে বসে ছবি আঁকো।

দয়াল সান্যালের ঘর থেকে অনন্তকে সঙ্গে করে বেরিয়ে, সরোজ অনন্তকে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি কী হে অনন্ত! কোনও কিছু না ভেবেচিন্তে দুমদাম কাজ করে দাও।

সরোজদা, আপনি অন্তত বোঝার চেষ্টা করুন। পলাশ এতগুলো বছর আমার সঙ্গে কাজ করল। এই বিপদের দিনে ওর বউ এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কলকাতা থেকে এত দূর এসেছে, আর আমি দেখা করব না?

অনন্তর কাঁধে একটা হাত রাখলেন সরোজ বক্সী, সাহায্য করবে, নিশ্চয়ই করবে। কিন্তু বড়সাহেব কী করবেন বলো? অসহায়কে সাহায্য করা যায়, কিন্তু যে নকশালদের

মতো ভয়ংকর জিনিসকে নিজের জীবনে যেচে ডেকে এনেছে, তার জন্য আমরা কী করতে পারি?

অনন্ত একবার চারদিকটা চোখ বুলিয়ে গলাটা নামিয়ে নিল।

সরোজদা, আপনি তো একেবারে নিজের দাদার মতো। আপনাকে ভরসা করে দু'-একটা কথা বলা যায়। পলাশের সঙ্গে তো আমার অনেক রকম কথা হত—সুখ-দুঃখের। ও কিন্তু বড়সাহেবের বউকে চিনত।

শ্রীমতী শিপ্রা সান্যালের সঙ্গে পলাশ সেনের পূর্ব সম্পর্ক সরোজ বক্সীর কাছে অজানা নয়। দয়াল সান্যালের অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে অনেক খবরই সরোজ বক্সীর জানা। এসব খবর শুধু খবর হিসেবে রাখলেই হয় না, সম্পর্কের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজরও রাখতে হয়। তবে সেসব একান্ত গোপনে। তাই অনন্তর সামনে সরোজ বক্সী একটা অবিশ্বাসের মুখ করে বললেন, তাই বুঝি? শুনিনি তো!

সরোজ বক্সীকে নতুন একটা খবর দেওয়ার উত্তেজনায় উৎসাহিত হয়ে অনন্ত বলতে লাগল, হ্যাঁ দাদা। আমাদের মালকিন আর পলাশ ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গে পড়ত। তবে পলাশ এটা কাউকে বলত না।

কেন? বলত না কেন?

আসলে দাদা, বুঝতেই তো পারছেন, এই কথা পাঁচকান হয়ে গেলে পলাশকে তো আবার সবাই মালিকের দালাল বলতে আরম্ভ করত!

মরুক গে যাক। তোমারই বা পাঁচজনকে কান কামড়ে বলার কী দরকার! আমরা হলাম গিয়ে সব আদার ব্যাপারী।

না, না, কাউকে বলিনি। আপনাকেই প্রথম বললাম। আসলে পলাশের বউ...

পলাশের বউ কী?

পলাশের বউও ব্যাপারটা জানে। ও তো আবার বলছিল, মালকিনের সঙ্গে বিয়ের আগে পলাশের সম্পর্কও ছিল।

এবার অনন্তর হাতটা ধরে অল্প চাপ দিয়ে সরোজ বক্সী বললেন, এসব কথা আর মুখেও এনো না। পুলিশের কানে একবার গেলে তোমাকে জেরায় জেরায় অস্থির করে দেবে। তা ছাড়া আমরা ভাই গায়েগতরে খেটে দু'পয়সা উপার্জন করি, ওসব বড়লোকদের খবরে আমাদের কী দরকার! আর পলাশের বউই বা কতটুকু জানে? ও কি জানে পলাশ নকশাল, মানুষ খুন করে?

একটু থেমে চিন্তা করে সরোজ বক্সী আরও বললেন, তুমি একটা কাজ করো অনন্ত, তুমি পলাশের বউকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলো। একে তো থানা-পুলিশ-নকশালের কেস আছে, তারপরেও বড়সাহেব তো পুরো চেষ্টা করছেন পলাশের খোঁজখবর করার। মধ্যিখান থেকে পলাশের বউ এসে যদি মিথ্যা কেচ্ছা ছড়ায়, তখন বড়সাহেব কিন্তু সব চেষ্টা বন্ধ করে দেবেন।

অনন্তর মুখটা শুকিয়ে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, আমি কেন এই ঝামেলায় জড়িয়ে গেলাম দাদা? জীবনে তো কোনও পাপ করিনি...।

সরোজ বক্সী চুপ করে গেলেন। চোখের সামনে ভেসে উঠল যামিনী ভট্টাচার্যর মুখ। ফিসফিস করে বলে উঠলেন, তুমি নিজের আত্মার কথা শোনো অনন্ত। আত্মা যাতে সায় দেবে, শুধু সেটাই করো। দেখবে, সব ঝামেলা মিটে যাবে।

১৩

ডোরবেলের আওয়াজ হল। বাবলিকে নিয়ে ক্যাথি বাজারে গেছেন। ফিরে আসার সময়ও হয়ে এসেছে। শিপ্রা বেলের আওয়াজ শুনে ভাবল, ক্যাথি বাজার থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু দরজাটা খুলেই দেখল অন্য একজন দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক প্রৌঢ় কিন্তু টানটান নির্মেদ চেহারা। তাঁর মাথার জকি ক্যাপ আর দু'দিকে চাড় দিয়ে পাকানো গোঁফজোড়া দেখে মনে হল ভদ্রলোক মিলিটারিতে ছিলেন।

গুড মর্নিং ম্যাডাম। মিসেস গোমস আছেন?

শিপ্রা দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, উনি একটু বাইরে গেছেন। এখনই ফিরে আসবেন। আপনি ভেতরে এসে বসুন।

শিপ্রার অনুমানকে নির্ভুল প্রমাণ করে ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি কর্নেল সামন্ত। আসলে এই বাড়িটা আমার। প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার আমি রেন্ট তুলতে আসি।

শিপ্রা একটু অবাক হল। তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল এই বাড়িটা ক্যাথির। এখন জানল ক্যাথি এখানে ভাড়া থাকেন। কাল ভেবেছিল একবার জিজ্ঞেস করবে। ভেতরে ভেতরে আরও আশ্চর্য হচ্ছিল শিপ্রা। ক্যাথি আন্টি এককালে প্রচুর রোজগার করেছেন, কিন্তু একটা বাড়িও করতে পারলেন না!

ক্যাথি অ্যান্টির বাড়িওয়ালা বলে শিপ্রা একটু বেশিই খাতির করতে আরম্ভ করল কর্নেল সামন্তকে। রান্নাঘরে গিয়ে চা করে নিয়ে এসে সেন্টারটেবিলে রাখল।

আপনি মিলিটারিতে ছিলেন?

প্রশ্নটা অবান্তর। ভদ্রলোক নিজের পরিচয়েই বলেছেন, কর্নেল। তবু শিপ্রার প্রশ্নটার উত্তরে বললেন, ইয়েস। ইন্ডিয়ান আর্মিতে। দুটো যুদ্ধে ওয়ার ফ্রন্টে ছিলাম। ওয়ান ওয়াজ উইথ চায়না... অ্যানাদার পাকিস্তান।

কর্নেল সামন্ত বসে একটু উসখুস করে বললেন, ম্যাডাম, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। আপনি মিসেস গোমসের...

ক্যাথি আন্টি আমার মায়ের বন্ধু। একদম ছোটবেলার বন্ধু।

দ্যাটস ভেরি নাইস! সম্পর্ক তো আজকাল এতবছর টিকিয়ে রাখা যায় না। আপনার মা আর মিসেস গোমস যে পেরেছেন... দ্যাটস গ্রেট। সো... মিসেস গোমস তা হলে এখন নিশ্চয়ই ভীষণ খুশি ছোটবেলার বন্ধুকে পেয়ে...।

আমার মা... মা মারা গেছেন সাত বছর আগে।

কর্নেল সামন্ত মাথার ওপর থেকে জ্যাকি ক্যাপটা তুলে বললেন, আই অ্যাম সরি।

ইটস ওকে! প্লিজ আপনি চা খান।

কর্নেল সামন্ত চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। নাইস টি।

আপনার বাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর।

এই বাড়িটা অ্যাজ মাই সেকেন্ড প্রপার্টি অফ ব্যারাকপুর, কিনে ফেলেছি। মিসেস গোমসও খুব ভাল টেনান্ট। ওয়েল মেন্টেন করেন।

থ্যাঙ্ক ইউ।

তো, আপনি কোথায় থাকেন?

কলকাতায়।

শিপ্রা এবার সতর্ক হল। শিপ্রার বিয়ের পূর্ব এবং উত্তর দুটো পরিচয়ই অস্বস্তিকর। কর্নেল হয়তো এখনই এই বিষয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করে দেবেন। প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে বলল, আপনি ব্যারাকপুরে অনেকদিন আছেন?

ওয়েল, সেভাবে বলতে গেলে আমার আর্মি লাইফে দু'বার ব্যারাকপুরে এসেছি। শেষবার এখান থেকেই রিটায়ার করে গেলাম। কী জানেন, ব্যারাকপুর জায়গাটা বড্ড ভাল লেগে গেছে। তা ছাড়া একজন আর্মিম্যান হিসাবে আই অ্যাম প্রাউড অফ দিস প্লেস। ব্যারাকপুর হল ভারতের ওল্ডেস্ট ক্যান্টনমেন্ট। কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে।

শিপ্রা বলল, শুনেছি কিছু কিছু। মঙ্গল পাণ্ডে...

কর্নেল সামন্ত শিপ্রাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, মঙ্গল পাণ্ডের গল্প তো সবাই জানে। কিন্তু আপনি জানেন কি, কলকাতার আলিপুরে যে-চিড়িয়াখানাটা আছে, সেটা এককালে ব্যারাকপুরে ছিল? দুশো বছরের ওপর যে-বয়স্ক কচ্ছপটা আলিপুর চিড়িয়াখানায় আছে, আঠেরোশো সালে লর্ড ওয়েলেসলি সেটা ব্যারাকপুরের চিড়িয়াখানায় নিয়ে এসেছিলেন...।

ব্যারাকপুরের ইতিহাস বলতে বলতে কর্নেল সামন্তর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয়ে কর্নেলের কথা শুনতে শুনতে শিপ্রার ব্রাদার ডি'সুজার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যে-কোনও জায়গা সম্পর্কে ব্রাদার এভাবেই নাড়িনক্ষত্রের ইতিহাস বলে দিতেন।

আনমনা ভাবটা কাটতেই শিপ্রা দেখল কর্নেল সামন্ত ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। উনি কি কোনও প্রশ্ন করেছিলেন? শেষ কথাগুলো শুনতে পায়নি শিপ্রা। খুব অপ্রস্তুত লাগল। ভদ্রলোক ব্যারাকপুরের ইতিহাস নিয়ে কথা বলছিলেন। শিপ্রা পরিস্থিতিটা সামলে পালটা প্রশ্ন করার চেষ্টা করল, সেদিন এখানে আসার সময় একটা চার্চ দেখলাম...

কোথায় দেখলেন? এখানে দুটো খুব পুরনো চার্চ আছে।

ওই তো চিড়িয়ামোড় থেকে এদিকে আসার সময়...

ও বুঝেছি, গ্যারিসন চার্চ। চার্চটার আসল নাম হল বার্থেলোমিউ ক্যাথিড্রাল। স্বাধীনতার ঠিক একশো বছর আগে, মানে আঠেরোশো সাতচল্লিশ সালে চার্চটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মজার ব্যাপার হচ্ছে...

আজ রবিবার। ভাবছিলাম সকালে প্রেয়ারের সময় একটু যাব।

এই রে, ওখানে প্রার্থনার সময়-টময়গুলো কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারব না।

না, সেটা ঠিক আছে। ক্যাথি আন্টি বাড়িতে এলেই বেরোব ভাবছি। কিন্তু এখন যাওয়া যাবে কি?

কেন, যাওয়া যাবে না কেন?

না, আসলে শুনছিলাম এখন আর্মি অপারেশনের জন্য ওদিকে রাস্তায়...

শিপ্রার কথার ওপর গলা চড়িয়ে কর্নেল সামন্ত বললেন, একজন সিভিলিয়ন চার্চে যাবে, আর্মি আটকাবে কেন?

এর উত্তর শিপ্রার জানা নেই। পুরোটাই শোনা কথা। তাও বাবলির কাছে। আবার অস্বস্তিতে পড়ল সে। ছোটবেলা থেকে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে ব্যারাকপুরে এসেছে, কিন্তু এরপর আর কী প্রসঙ্গ পালটাবে ভাবতে থাকল। ঠিক সেই সময়েই দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হল।

সদর দরজার সামনের ঘরটাই বসার ঘর। দরজা দিয়ে ঢুকেই কর্নেল সামন্তকে দেখে মুখটা একটু শুকিয়ে গেল ক্যাথির। কর্নেল এক বিচিত্র মানুষ। রবার্ট কোনও এক সূত্রে কর্নেলের সন্ধান পেয়েছিল। যে-মানুষটা সব কিছুর ইতিহাস নিয়ে থাকতে ভালবাসেন, তিনি রবার্ট-ক্যাথির কোনও ইতিহাস জানতে না চেয়েই এককথায় বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ভাড়াও খুব বেশি নয়। সাধ্যের মধ্যে। তবে শর্ত একটাই। এবং সেটা মিলিটারি অনুশাসনের মতো মানতে চান উনি। মাসের প্রথম রবিবারের সকালে বাড়ি ভাড়াটা চাই। রবার্টও এটা জানে। মাসের এক-দুই তারিখের মধ্যেই ক্যাথির ব্যাঙ্কের শেষ জমানো পুঁজির সুদটুকু তুলে এনে দেয়। আজ ডিসেম্বরের ছ'তারিখ হয়ে গেল। রবার্ট আসেনি।

গতকালও একবার এটা মনে হয়েছিল ক্যাথির। রবার্ট কেন এল না! তার মানে ও কি জানত শ্যারন আসবে! রবার্ট ফোনে যখন বলেছিল শ্যারনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ঠিকানা নিয়ে বলেছে ব্যারাকপুরে ক্যাথির কাছে আসবে, তখন অদ্ভুত একটা তাচ্ছিল্যের শ্লেষ ছিল গলায়। বড় হওয়ার পর যখন ও বুঝতে শিখেছিল যে, শ্যারনের সঙ্গে ওর মানুষ হওয়ার মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে তখন মাঝে মাঝে ওর মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হত। দুষত নিজের ভাগ্যকে। ঝগড়া করত ক্যাথির সঙ্গে। পালটা ঝগড়া করার সময় ক্যাথিও মনে মনে সেই সুপ্ত বাসনাটাকে পরম যত্নে পালন করতেন। একদিন তো শ্যারন রবার্টের হবেই। সেটা কি কখনও রবার্ট বুঝে ফেলেছিল? রবার্টের বউ রূপে-গুণে কোনওভাবেই শ্যারনের কাছাকাছি নয়। বিয়ে করে ফেললেও একটা হতাশা রয়েছে রবার্টের মধ্যে। তাই কি এখনও শ্যারনকে এড়িয়ে চলতে চায়? তাই কি মাসের প্রথম রবিবারের আগে দিয়ে গেল না টাকাটা?

ক্যাথির মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে যাওয়া মুখটা দেখে দ্রুত সমস্যাটা অনুমান করে নিল শিপ্রা। কর্নেল সামন্ত আগেই বলেছে রবিবারের সকালে তাঁর আসার উদ্দেশ্য। শুধু মাসিক বাড়িভাড়ার অঙ্কটা শিপ্রার জানা নেই।

কর্নেল সামন্ত বাবলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এই যে বোকা মেয়ে, কেমন আছ তুমি? কী, এবার ভাল লাগছে আমাদের দেশ?

বাবলির মুখে লজ্জার একটা আভা খেলে গেল। শিপ্রা বুঝতে পারল কর্নেল সামন্তর সঙ্গে বাবলির আগেই পরিচয় হয়েছে এবং সম্পর্কটা আন্তরিক। শিপ্রা পরিস্থিতিকে হালকা করার জন্য বলল, ভয়ে ও মরে যাচ্ছে জানেন! যদি ব্যারাকপুর অ্যাটাক করে ফেলে পাকিস্তান?

এই কথাটাতেই দু'-দুবার যুদ্ধে যাওয়া কর্নেল সামন্তর মুখচোখ বদলে গেল। রিটায়ার করে গেলেও আর্মির সঙ্গে মনপ্রাণ জুড়ে আছে। গলার স্বরটাও পালটে গেল। প্রায় গর্জে উঠলেন বাবলির ওপর, কী করে ভাবতে পারলে তুমি যে পাকিস্তান এই ব্যারাকপুর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে? ইন্ডিয়ায় এক ইঞ্চি জমিতে ঢুকতে দেব না আমরা। তুমি জানো আমাদের স্ট্রেস্থ? হোয়াট ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ কেপেবল অফ? কেন তোমাকে বোকা মেয়ে বলি বুঝতে পারছ? ইন্ডিয়ান আর্মি সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণাই নেই...

কর্নেল সামন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে নিজের মনে অজস্র তথ্য দিতে থাকলেন। এই সুযোগে শিপ্রা ইশারায় ক্যাথিকে একটু আড়ালে ডেকে বলল, আন্টি, একটু ওপরে এসো।

ক্যাথি কোনও কথা না বলে চুপচাপ শিপ্রার পিছন পিছন দোতলায় উঠে এলেন। শিপ্রা নিজের সুটকেসটা খুলে একদম তলা থেকে বের করে আনল একটা খয়েরি রঙের খাম। খামটার মধ্যে পুরো দশ হাজার টাকা আছে। টাকাটা সে তুলেছিল সেই নকশাল মেয়েটাকে দেওয়ার জন্য। সম্মান বাঁচানোর জন্য এখন এটা ক্যাথির দরকার। শিপ্রা খামটা এগিয়ে দিল ক্যাথির দিকে।

কী আছে এতে? খামটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাথি।

তুমি এখন বাড়িভাড়াটা দিয়ে দাও কর্নেলকে। পরে তোমাকে সব বলছি।

ক্যাথির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, রবার্ট তোর হাতে দিয়ে দিয়েছিল, তাই না? আমি তাই ভাবছিলাম ও তো এরকম করে না! ছেলেটার কাণ্ড দেখেছিস? একবার তো ফোনে আমাকে বলে দেবে যে ব্যাঙ্কে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যখন, তখন তোর হাতে টাকাটা দিয়ে দিয়েছে...! আমি দু'দিন ধরে...

বলতে বলতে খামটা খুলে ক্যাথির কথা বন্ধ হয়ে গেল। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, এত টাকা? এত টাকা রবার্ট... এটা কার টাকা শ্যারন?

আঃ, আন্টি। বলছি না তোমাকে পরে সব বলব। তুমি আগে কর্নেলের ব্যাপারটা মিটিয়ে এসো।

না রে শ্যারন। বুঝতে পেরেছি। এটা তোর টাকা। আমি কিছুতেই নিতে পারব না। তুই তো দু'দিন আমার কাছে শান্তিতে থাকতে এসেছিস। সেই শান্তির জন্যও তুই টাকা দিয়ে যাবি!

কী সব কথাবার্তা বলছ তুমি আন্টি? তুমি নাও না এখন। রবার্ট টাকা দিয়ে গেলে না হয় আমাকে ফেরত দিয়ে দিয়ো।

না শ্যারন, আমি পারব না। আমি কর্নেলকে গিয়ে বলছি পরে আসতে। তোর

মায়ের কাছে অনেক ধার করেছি, কিছুই শোধ করতে পারলাম না। এর পরে তোরও... তুই সেই ছোট্ট শ্যারন... তোর টাকা আমি কিছুতেই নিতে পারব না।

শিপ্রা ক্যাথির হাত দুটো জড়িয়ে বলল, তুমি একবারও আমাকে নিজের মনে করতে পারলে না, তাই না আন্টি? ভাবছ এটা পরের টাকা। আমি কিন্তু মায়ের পর তোমাকেই নিজের ভেবে ছেলেকে ফেলে রেখে ছুটে এসেছি। সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য তুমিও আমাকে এই দুঃখটা দেবে আন্টি?

কথাগুলো বলতে বলতে শিপ্রার চোখ ছলছল করে উঠল। শিপ্রার মাথাটা নিজের কাঁধে টেনে নিয়ে অস্ফুট স্বরে ক্যাথি বললেন, টাকা সামান্য জিনিস নয় রে শ্যারন। টাকার জন্যই তো জীবনটা এরকম কাটালাম। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল আর খারাপ জিনিস একটাই—টাকা।

ক্যাথির পিছন পিছন শিপ্রা নীচে বসার ঘরে নেমে এল। কর্নেল এখনও বাবলিকে যুদ্ধের গল্প বলে যাচ্ছেন। মেয়েটা মাটিতে বসে হাঁ করে কর্নেলের ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিক্রমের কথা শুনে যাচ্ছে। শিপ্রাকে দেখে কর্নেল বললেন, এই বোকা মেয়েটাকে বোঝান তো হোয়াট ইন্ডিয়ান আর্মি ক্যান ডু। ওর ডাউট হচ্ছে আমরা যুদ্ধ জিততে পারব কিনা। কোথাকার এক ছোকরা ওকে কাল দেখিয়েছে একটা আর্মি ট্রাকে গাছপালা লাগানো... ভাবছে আমরা ওইসব ডালপালা নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। ইডিয়ট গার্ল। ওকে বলছিলাম কতরকম ক্যামোফ্লেজ করা হয় আর্মিতে। গাছপালা লাগানো ট্রাককে দেখে প্লেন থেকে বোঝা যায় না ওটা প্লাটুন... কে কাকে বোঝাবে।

শিপ্রা হেসে ফেলল, আসলে কী হয়েছে জানেন? কাল রাতে সাইরেন বাজিয়ে ব্ল্যাক আউট করতে বলা হয়েছিল। ও খুব ভয় পেয়ে ভেবেছে পাকিস্তান এবার অ্যাটাক করেছে। বোমা ফেলবে ব্যারাকপুরে।

হুম, বুঝেছি। আই শুড নট রিভিল অল দ্য সিক্রেটস অফ আর্মি। কিন্তু একটা জিনিস বলছি। সব সময় ব্ল্যাক আউট কল করা মানেই কিন্তু এয়ার অ্যাটাক হল, তা নয়। সিভিলিয়নদের অ্যালার্ট রাখার একটা ড্রিলও এটা। পাকিস্তান এয়ার অ্যাটাক করবে? আমাদের এয়ার ফোর্সে কী সব ফাইটার প্লেন আছে জানেন! হান্টার, স্যু সেভেন, মিগ টোয়েন্টি-ওয়ান। অ্যান্ড বেস্ট অফ দ্য লট, এফ সিক্সটিন। দ্য অনলি প্রবলেম ইজ, এফ সিক্সটিন ইজ আ ডে ফাইটার। রাতে যুদ্ধ করতে পারে না।

কর্নেল আপনার রেন্টটা। ক্যাথি টাকাটা কর্নেলের দিকে এগিয়ে দিলেন। মুখটা এখনও গম্ভীর হয়ে আছে। বাবলিকে বললেন, শুধু যুদ্ধের গল্প শুনলেই হবে? ভেতরটা একটু দেখ...।

বাবলি ভেতরে যাওয়ার জন্য উঠতেই কর্নেল তাকে বললেন, এই বোকা মেয়ে, অন্য কাজ করার আগে আমাকে একটা কাগজ আর পেন এনে দাও তো।

বাবলি বাধ্য মেয়ের মতো দোতলা থেকে একটা প্যাড আর পেন নিয়ে এসে কর্নেলের হাতে দিল। কর্নেল খসখস করে প্যাডে লিখতে লিখতে বললেন, আই অ্যাম শিয়োর মিসেস গোমস চট করে আমার ঠিকানাটা খুঁজে পাবেন না।

লেখা থামিয়ে প্যাডের পাতাটা ছিঁড়ে শিপ্রার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, সো, কিপ মাই অ্যাডড্রেস। ব্যারাকপুরে বেড়াতে যখন এসেছেন ড্রপ ইন সামটাইম। আই উইল শো ইউ সাম ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ার মেমেন্টোস। আর যেদিন আসবেন ওই বোকা মেয়েটাকেও নিয়ে আসবেন।

কর্নেল সামন্ত চলে যাওয়ার পর ক্যাথি সদর দরজাটা বন্ধ করে চুপ করে কয়েক সেকেন্ড কী যেন ভাবলেন। তারপর ঘরের একটা আলমারির পিছন থেকে বার করে আনলেন একটা লাঠি।

বাবলি... বাবলি...। চিৎকার করে উঠলেন ক্যাথি। ক্যাথির আচমকা চিৎকারে চমকে উঠল শিপ্রাও।

ক্যাথির চিৎকারে বাবলিরও বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। মাসি কেন এরকম গলা করে ডাকছে, কী অন্যায় করেছে ও, বুঝতে পারল না। দুরুদুরু বুকে বসার ঘরে এগিয়ে এল। বাবলিকে দেখে ক্যাথির রাগ যেন আরও বহু গুণ বেড়ে গেল। একরকম হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হাতের লাঠিটা সপাটে চালিয়ে দিলেন বাবলির পায়ের গোছে।

বল হারামজাদি, কোথায় কার সঙ্গে গিয়েছিলি...?

ক্যাথির রণমূর্তি দেখে শিপ্রাও প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর দৌড়ে এসে ক্যাথির লাঠিসুদ্ধ হাতটা চেপে ধরল, আঃ, আন্টি কী করছ?

তুই ছেড়ে দে শ্যারন। হারামজাদিকে আজই বের করে দেব। কিন্তু তার আগে ওকে একটা জীবনের শিক্ষা দিয়ে দেব। কী ভেবেছ কী? ও জানে না আমি কে, কী করে আমি মেয়েদের শায়েস্তা করতে পারি...। শরীর সুড়সুড় করছে তাই না?

ক্যাথি চিৎকার করে যাচ্ছেন। মুখ লাল হয়ে গেছে। গলার শিরা ফুলে দপদপ করছে। শক্ত মুঠিতে ধরে আছেন লাঠিটা। শিপ্রা সর্বশক্তি দিয়েও লাঠিটা ছাড়াতে পারছে না। মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করছে, তুমি কী বলছ আন্টি? কী করেছে ও?

কী করেছে? কী করেছে ও... জিজ্ঞেস কর ওকে কার সঙ্গে শুয়ে এসেছে ও... শরীরের গরম ঘুচিয়ে দেব আজ।

আন্টি! এবার ক্যাথিকেও ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল শিপ্রা, কী সব বলছ!

ক্যাথি তবুও রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন, আমার চোখ আর কানকে ফাঁকি দেবে? একটা শব্দ শুনেই আমি বুঝে যাই আমার পিছনে কী হচ্ছে। শুনলি না কর্নেল কী বলে গেল... কোথাকার এক ছোকরা ওকে দেখিয়েছে আর্মি ট্রাকে গাছপালা লাগানো। কী করে জানল কর্নেল? কে ওকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল আর্মি ট্রাক!

শিপ্রা বাবলির দিকে তাকাল। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাথির লাঠির বাড়িতে যথেষ্ট জোর ছিল। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেছে। দু'গালে নেমে এসেছে জল। বাবলিকে চোখের ইশারায় শিপ্রা সরে যেতে বলল। বাবলি মাথা নিচু করে চলে গেল।

ক্যাথিকে চেয়ারে বসাল শিপ্রা। প্রাথমিক উত্তেজনাটা কমে ক্যাথি তখন হাঁপাচ্ছেন। শিপ্রা চট করে এক গ্লাস জল এনে দিল ক্যাথিকে। ঢকঢক করে জলটা খেয়ে একটু শান্ত হলেন ক্যাথি। ক্যাথির একদম কাছ ঘেঁষে বসে শিপ্রা বলল, আন্টি, বোঝার চেষ্টা করো।

বাবলি যথেষ্ট বড় মেয়ে, তার ওপর তোমার নিজের কেউ নয়। এইভাবে রেগে দুমদাম মারধর করে যদি বেমক্কা একটা লাগিয়ে দাও তখন কিন্তু হয়রানির শেষ থাকবে না। এত বড় মেয়েকে এইভাবে মারে কেউ? কন্ট্রোল ইয়োরসেল্ফ।

তোকে তো আমি বলেইছি শ্যারন, কেন ওকে আমি এত সাবধান করছি। এই জগৎ আমি খুব ভাল চিনি রে! চারদিক শয়তানে ভরা। তুই জানিস, ওর মা আমার কাছে মেয়েটাকে কী ভরসায় রেখে গেছে? ওর মা আমাকে বলেছে, দেখবেন দিদি, মেয়েটা যেন বিক্রি না হয়ে যায়। যে-মেয়েটাকে আগলে রাখার দায়িত্ব নিয়েছি, তার খারাপ কিছু দেখলে চুপ করে থাকব? অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছি। যখন সব ছেড়ে চলে এসেছি তখন নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি এসব আর না। জিসাসকে তো কিছু জবাবদিহি করতে হবে শ্যারন!

আবেগে উত্তেজনায় কথা বলতে বলতে ক্যাথির হাঁপানি ক্রমশ আরও বেড়ে যাচ্ছিল। শিপ্রা ক্যাথির পিঠে চেপে চেপে হাত বুলিয়ে কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল।

ঠিক আছে, আমি বাবলির সঙ্গে কথা বলব। তুমি এখন ওপরের ঘরে চলো। একটু শুয়ে থাকো, শরীরটা ভাল লাগবে।

আমি ঠিক আছি। তুই চার্চে যাবি বলেছিলি না?

যাব। আজ না হলে আর একদিন যাব। তুমি ওপরে চলো।

১৪

দয়াল সান্যালের শরীরটা ঘুম থেকে উঠে ভাল লাগছিল না। একটা ম্যাজম্যাজে ভাব। বাংলোর একটা কাজের ছেলেকে ডেকে বললেন, মিলের ম্যানেজারকে যেন খবর দিয়ে আসে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়ার জন্য।

বেডসাইড টেবিলে তিনটে খবরের কাগজ আর চা দেওয়া আছে। পিঠে বালিশটা ঠেস দিয়ে আধশোওয়া হয়ে উঠে বসলেন দয়াল সান্যাল। চশমাটা পরে নিয়ে একটা কাগজের পাট খুললেন। প্রথম পাতা ভরতি যুদ্ধের খবর। দেশের দু'প্রান্তে দু'রকম যুদ্ধ হচ্ছে। পশ্চিমপ্রান্তে পাকিস্তান নিরন্তর কামড় বসানোর চেষ্টা করছে। পূর্বপ্রান্তে ভারতও ছেড়ে কথা বলছে না। মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছে। পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রথম দু'দিন ভারত নিজেকে গোছাতে পারেনি। তবে ক্রমশ নিজেদের আরও সুসংবদ্ধ করে তুলছে। তেজগাঁওয়ের পরে কুর্মিটোলার রানওয়েতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর মিগ-২১ ক্রমাগত বোমাবর্ষণ করে তা পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ব্যবহারের অযোগ্য করে দিয়েছে।

এসব খবর দয়াল সান্যালের কাছে আকর্ষণীয় নয়। এই হঠাৎ করে যুদ্ধ বেধে যাওয়াটা তাঁর ব্যবসায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে। তার কারণ ট্রান্সপোর্ট। হরিতলা কটন

মিলের কাঁচা মাল তুলোর বেল অর্থাৎ তুলোর গাঁট, যার একটা বড় অংশ আসে পশ্চিম ভারত থেকে। যুদ্ধের কারণে এই কাঁচা মালের জোগানটা বেশ অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় অসুবিধার কারণ, যুদ্ধের জন্য সুতোর চাহিদাটা হঠাৎ করে কমে গেছে। ডিস্ট্রিবিউটররা নতুন করে সুতোর স্টক তুলতে টালবাহানা করছে। অথচ তুলোর ব্যাবসার পক্ষে ডিসেম্বরটা খুব জরুরি। সারা বছরের ব্যাবসার গতিপ্রকৃতি ঠিক হয়ে যায় এই সময়েই।

দয়াল সান্যাল খবরের কাগজে একটা খবরই খোঁজার আর বোঝার চেষ্টা করেন— এই যুদ্ধটা কবে শেষ হবে। কিন্তু খবরের কাগজে তার কোনও আঁচ পেলেন না তিনি। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বিবৃতিতে ভরতি কাগজে যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোনও ইঙ্গিতই নেই।

বেড-টি শেষ করে বাথরুমে গিয়ে দাড়িগোঁফ নিখুঁত করে কামিয়ে পরিপাটি হলেন তিনি। বিটু এখনও ঘুমোচ্ছে। শিপ্রা ওকে এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে দেয় না। কিন্তু এখানে বিটুর জীবনটাকে অন্য স্বাধীনতা দিয়েছেন দয়াল সান্যাল। অবাধে যেমন মিলের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার অধিকার দিয়েছেন তেমনই ইচ্ছেমতো অফুরন্ত ঘুমোনোর স্বাধীনতাও দিয়েছেন। বাবা হিসাবে উনি যে বিটুকে কতটা ভালবাসেন, সেটা প্রতি মুহূর্তে বিটুকে উপলব্ধি করানোর সবটুকু ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

কাজের ছেলেটা এসে বলল ম্যানেজার সাহেব ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছেন। দয়াল সান্যাল ড্রয়িংরুমে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে 'সুপ্রভাত' জানাল ম্যানেজার শীতলপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

খবর কী শীতল?

শীতল ভট্টাচার্যর মুখ খুব একটা উজ্জ্বল দেখাল না।

স্যার, এখনও পর্যন্ত আশাপ্রদ কিছু নেই। যা খবর পাচ্ছি, গুজরাত আর রাজস্থানের দিকে যেরকম যুদ্ধ হচ্ছে ওদিক থেকে তুলোর সাপ্লাইটা কবে আবার ঠিকঠাক শুরু হবে...

আঃ, এসব তো বাসি খবর। খবরের কাগজে এসব বেরিয়েছে। তোমাকে কাল যে-যোগাযোগগুলো করতে বলেছিলাম, সেগুলোর কী হল?

আমরা দুটো পার্টির সঙ্গে কথা বলেছি স্যার। খুব চেষ্টা করছি যদি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কয়েকটা লরি ধরতে পারি। তবে ওরাও এখন বেঙ্গলে আসতে ভরসা পাচ্ছে না।

দয়াল সান্যাল একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এভাবে ব্যাবসা করাই অসম্ভব হয়ে উঠছে। কিছু একটা ভাবতে হবে।

সেটাই তো স্যার, পশ্চিমবঙ্গে যদি তুলো ফলত, আমাদের কোম্পানি তরতর করে এগিয়ে যেত। অন্য স্টেটের ওপর ডিপেন্ড করতে হত না।

দয়াল সান্যাল কথাটা আর এগোলেন না। শীতল ভট্টাচার্যকে বললেন, আজ সকালটা আর আমি অফিসে যাচ্ছি না বুঝেছ। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।

মালিকের শরীর খারাপ শুনে শীতল ভট্টাচার্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, সে কী স্যার? ডাক্তার ডেকে পাঠাই?

না, সেরকম কিছু নয়। ট্যাবলেট খেয়েছি একটা। তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। সেরকম কিছু থাকলে বাংলোতে চলে এসো।

আপনি কোনও চিন্তা করবেন না স্যার। প্রোডাকশন একদম ঠিক আছে।

আগের দিন দুপুরে সরোজ বক্সীকে কয়েকটা কাজ দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়েছেন গাড়িটা দিয়ে। আজ সকালেই চলে আসতে বলেছেন। শীতল ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, সরোজ ফিরেছে জানো?

আমার সঙ্গে তো দেখা হয়নি! এখনই খোঁজ নিচ্ছি। এসে থাকলে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চা খাবে, শীতল?

শীতল ভট্টাচার্য ঠিক আরাম করে মালিকের সঙ্গে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে পারে না। কুণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল, না স্যার। এইমাত্র চা খেয়ে এলাম।

পলাশ সেনের বউয়ের আর কোনও খবর জানো?

কয়েকটা টুকরো খবর জোগাড় করেছে শীতল ভট্টাচার্য। ভেবেছিল খবরগুলো মালিককে জানিয়ে রাখবে। তবে দয়াল সান্যালের শরীর খারাপ শুনে সংগৃহীত খবরের ঝাঁপিটা আর খোলেনি। প্রসঙ্গটা উঠতে শিরদাঁড়া টান করল।

সেদিন স্যার গেটে ঢুকতে না পেরে বাইরেই ঠায় অপেক্ষা করছিল পলাশের বউ। তারপর আমাদের অনন্তর সঙ্গে ভদ্রেশ্বর স্টেশন পর্যন্ত গিয়েছিল।

ভদ্রেশ্বর স্টেশন? ভদ্রেশ্বর স্টেশনে কী আছে?

না, মানে স্যার, অনন্তর বাড়ি তো ভদ্রেশ্বর স্টেশনে নেমে যেতে হয়। পলাশের বউ ওর সঙ্গে একই ডাউন ট্রেনে ফিরে গেছে। মানে ওই ট্রেনেই ও হাওড়ায় ফিরে গেছে। তবে ওদের সঙ্গে যতীনও ছিল। যতীন শুনেছে, ও আপনার কলকাতার বাড়িতে যাবে।

আমার বাড়িতে? অনন্ত জানে না আমি এখানে পুরো শীতকালটা থাকতে এসেছি? আমার কলকাতার বাড়িতে গিয়ে ও কী করবে? কার দেখা পাবে?

শীতল ভট্টাচার্য ইতস্তত করে বলল, স্যার, যা শুনলাম... ও ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

শিপ্রার সঙ্গে? উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন দয়াল সান্যাল। নিজেকে সামলে মুখে একটা চুকচুক আওয়াজ করলেন, বুদ্ধিনাশ বলে একটা কথা আছে জানো তো? পলাশের বউয়ের বুদ্ধিনাশ হয়েছে। যাক গে, মহেশের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল?

এখনও পাওয়া যায়নি স্যার। সবরকম খোঁজ চালাচ্ছি।

চালিয়ে যাও। ক্যান্টিনটা এখন কে চালাচ্ছে?

একটা টেম্পোরারি লোক জোগাড় করেছি, স্যার। তবে ছেলেটা সেরকম ভাল নয়। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে লোকজন একটু অসন্তুষ্ট।

দয়াল সান্যাল রেগে উঠলেন, তুমি এটা আগে বলোনি কেন? ক্যান্টিন একটা সেনসেটিভ জায়গা। মহেশ ভাল চালাত। এখন খারাপ চললে সবাই মহেশের সঙ্গে

কম্পেয়ার করবে। ওর প্রতি সিমপ্যাথিটা ক্রমশ বাড়বে। তারপর মহেশের মা যেদিন পলাশের বউয়ের মতো গেটে হাজির হবে... লোকে প্রসেশন করে ওকে নিয়ে এসে আমাকে ঘেরাও করবে। এত বছর চাকরি করার পরেও ওসব কি তোমাকে বোঝাতে হবে, শীতল?

শীতল ভট্টাচার্য মিয়ানো গলায় বলে উঠল, ঠিক আছে স্যার। আমি আজই পার্মানেন্ট লোক নেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

দয়াল সান্যাল আবার ধমকে উঠলেন, দিন দিন তোমার বুদ্ধিটা কোথায় যাচ্ছে বলো তো? মহেশ এখনও নিখোঁজ। ওর জায়গায় ভ্যাকেন্সিই হয়নি। তুমি সেই জায়গায় দুম করে একজন লোককে পাকা চাকরিতে নিয়ে নেবে? আইনের বইগুলো তো সব তোমাকে কিনে দিয়েছি, একটু পাতাগুলো উলটেপালটে দেখো! ছ'মাস তোমাকে দেখতে হবে। ছ'মাসের মধ্যে যদি পলাশ আর মহেশ ফিরে না আসে, গেটে একটা নোটিশ ঝোলাবে, তার কপি খবরের কাগজে ছাপাবে। তারপর ওদের টার্মিনেট করে ওদের জায়গায় নতুন লোক নেবে।

দয়াল সান্যাল একটু থামলেন। শীতল ভট্টাচার্য মালিকের ভাষণ কাঁচুমাচু মুখ করে শুনে যাচ্ছিল। বেয়ারা চা দিয়ে গিয়েছিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দয়াল সান্যাল আবার বলতে শুরু করলেন, তুমি ক্যান্টিনে একজন ভাল টেম্পোরারি লোক রাখো। দরকার হলে অনেক বেশি টাকা দাও ওকে। কিন্তু ওর রান্নার কোয়ালিটি আর সার্ভিস দুটোই যেন মহেশের চেয়ে অনেক ভাল হয়। এতটাই ভাল যে লোকে মনে মনে বলবে মহেশ যেন আর ফিরে না আসে। তার জন্য দরকার হলে ক্যান্টিনে সাবসিডিও একটু বাড়িয়ে দাও।

স্যার...

দয়াল সান্যাল মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন। সরোজ বক্সী এসে দাঁড়িয়ে আছে। ইশারায় ভেতরে আসতে বললেন।

কোম্পানিতে পদাধিকারে সরোজ বক্সী একজন কেরানি। শীতল ভট্টাচার্যের চেয়ে অনেক নিচুতলার কর্মী। কিন্তু সেটা শুধু খাতায়-কলমে। শীতল ভট্টাচার্য জানে দয়াল সান্যালের কাছে সরোজ বক্সীর গুরুত্ব তার চেয়ে অনেক বেশি। সরোজ বক্সী ভেতরে এসে ঢোকার পরে, সরোজ বক্সী আর দয়াল সান্যাল দু'জনেই চুপ করে আছে। দয়াল সান্যাল এবার হয়তো শীতল ভট্টাচার্যকে চলে যেতে বলবেন। সরোজ বক্সীর সামনে নিজের সেইটুকু সম্মান বাঁচাতে শীতল ভট্টাচার্য সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল।

আমি তা হলে উঠি স্যার।

ঠিক আছে, এসো তা হলে।

দয়াল সান্যালের খাস লোক হয়ে কাজ করতে করতে সরোজ বক্সীর ভেতরে একটা দ্বিধাহীন ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে। দয়াল সান্যালকে কিছু জানাতে হলে শীতল ভট্টাচার্যের মতো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আমতা-আমতা করতে হয় না সরোজ বক্সীর। কোনও ভূমিকা না করে তাই প্রথমেই খবরটা দিয়ে দিলেন।

বাড়িতে ম্যাডামের ফোন এসেছিল। টেলিফোন এক্সচেঞ্জে খোঁজ করে জানলাম... ব্যারাকপুর থেকে ট্রাঙ্ক কল।

ব্যারাকপুর থেকে ট্রাঙ্ক কল? শিপ্রা ব্যারাকপুরে আছে... ব্যারাকপুরে আবার ওর কে থাকে?

যে-নম্বরটা থেকে ফোন এসেছিল স্যার, আজকে লোক পাঠাব ব্যারাকপুরের ঠিকানাটা খোঁজ করে আসতে।

একটা বাঁকা হাসি হাসলেন দয়াল সান্যাল।

নিজেকে খুব চালাক মনে করেছিল। লুকিয়ে থেকে চোরের মতো খোঁজ করে দেখবে আমি ছেলেকে নিয়ে কেমন আছি। এবার নিজে কেমন বোকা বনেছে! যাক গে, বাড়ির আর সব ঠিক আছে?

হ্যাঁ স্যার।

পলাশের বউ নাকি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে যাবে। গিয়েছিল নাকি?

না স্যার। সেরকম তো কেউ কিছু বলল না।

গুড! একটা খবর বাড়ির প্রত্যেকটা চাকরকে বলে দাও, পলাশের বউ গিয়ে শিপ্রার খোঁজ করলে যেন পলাশের বউকে খাতির করে। দরজা থেকেই বিদায় না করে দেয়। যেন বলে, শিপ্রা এখন বাড়ি নেই কিছুক্ষণ পরে আসতে অথবা অপেক্ষা করতে। পলাশের বউ বারবার আসুক। আর শিপ্রা যদি ফোন করে, ওর কানে যেন এই খবরটা পৌঁছে দেয়... একটা মেয়ে বারবার দেখা করতে আসছে। মেয়েটা যে পলাশের বউ, সেটা যেন না বলে। ওনলি একটা আননোন মেয়ে। কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, চোখে চশমা। কীভাবে এটা গুছিয়ে করবে... সেটা ঠান্ডা মাথায় ঠিক করে নিয়ো। নেক্সট... লালবাজারে গিয়েছিলে? এসিপি-র সঙ্গে দেখা করেছ?

গিয়েছিলাম স্যার। উনি বললেন শুভাননের দলটা একদম শেষ হয়ে গেছে। ওর দিক দিয়ে আর কোনও থ্রেট নেই।

গুড! গুড! নকশাল বস্তুটা যে ঠিক কী, এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না সরোজ। ওরা কি ইউনিভার্সিটির পুতুল-পুতুল ছেলেমেয়েগুলো, না মল্লিকবাজারের গুন্ডা-পকেটমার? চিন নাকি ওদের আদর্শ! যে-দেশটা ইংরেজিতে কথা বলতে শিখল না, সেই দেশ এদের কী ভাষায় মাথা চিবোচ্ছে বলো তো? এই শুভাননরা আসলে দিক্‌ভ্রষ্ট! ওরা আসলে মূল নকশালদের একটা উপদল। বেচারারা ভেবেছিল দেশটাকে বদলে দেবে। এখন ওপর থেকে দেখুক দেশটা কেমন বদলাচ্ছে! বড় বড় নেতা সব। জানতেও পারল না এই দয়াল সান্যালের হাতের পুতুল হয়ে কীভাবে টুক করে পুলিশের গুলিতে প্রাণটা দিয়ে দিল।

দয়াল সান্যাল উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা দু'দিকে ছড়িয়ে বললেন, এতই যদি দেশপ্রেম, পাঠিয়ে দাও পাকিস্তানে যুদ্ধ করতে। যাক গে, সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজম্যাজে লাগছিল। তোমার কথা শুনে এখন একদম ঝরঝরে লাগছে। আপদগুলোর থেকে যখন আর কোনও ভয় নেই, তখন আজ ওপরে যাব, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'চোখ মেলে আমার স্বপ্নকে দেখব।

দয়াল সান্যাল অনেক রকম স্বপ্ন দেখেন। খেয়াল মতো কখনও বলেন, কখনও বলেন না। তবে একটা স্বপ্ন সরোজ বক্সী জানেন— দু'একর জমি আর হরির ঝিল। যেনতেনপ্রকারেণ দয়াল সান্যালের ও দুটো চাই-ই চাই।

যেটা আনতে দিয়েছিলাম, সেটা এনেছ সরোজ?

হ্যাঁ স্যার। এখন ওটা বিক্রি করার খুব কড়াকড়ি আছে। তবে আমি একজনের থ্রু দিয়ে ম্যানেজ করতে পেরেছি। গাড়িতে আছে। এখনই নিয়ে আসছি।

দয়াল সান্যাল গলা উঠিয়ে ডাকতে থাকলেন, নারান... নারান...।

মালিকের ডাক শুনে নারান ভেতর থেকে ছুটে এল। দয়াল সান্যাল অধৈর্যর মতো বলে উঠলেন, যাও, শিগগির গিয়ে বিট্টুকে ঘুম থেকে তুলে দাও। বলো দোতলার বারান্দায় আসতে। একটা দারুণ জিনিস আনিয়েছি ওর জন্য।

একটা উত্তেজনা নিয়েই ঘুমটা ভাঙল বিট্টুর। বাবা বলেছে একটা দারুণ জিনিস আনিয়েছে ওর জন্য। উত্তেজনাটা তাই দু'গুণ। এক নম্বর উত্তেজনা, সেই না দেখা জিনিসটার জন্য। আর দু'নম্বর উত্তেজনা, আজ বাবা বাড়িতে আছে, তাও আবার দোতলার বারান্দায়। যে-বারান্দা এখানে আসার পর থেকে একবারও দেখতে দেয়নি বাবা। দোতলার দিকে এক পা সিঁড়িও উঠতে দেয়নি।

পেস্ট লাগানো ব্রাশটা সংক্ষিপ্ততম সময়ে দাঁতের ওপর দু'বার ঘষে নিয়ে সিঁড়ির মুখে চলে এল বিট্টু। বাংলোটায় দোতলা যাওয়ার জন্য ঘোরানো সিঁড়িটার শুরু একতলার বসার ঘর থেকেই। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার বারান্দায় চলে এল বিট্টু।

বেলা বেশ খানিকটা হয়ে গেলেও শীতের হিমেল আমেজটা এখনও থেকে গিয়েছে। হরির ঝিলের ওপর প্রায় মিলিয়ে যাওয়া একটা ধোঁয়াশার স্তর এখনও থেকে গিয়েছে। হরির ঝিলের মধ্যে দুটো বড় বড় গাছ আছে। সেই জায়গাটা অনেকটা দ্বীপের মতো। কয়েকদিন আগে মা যখন মহেশকাকার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল, জানলার কাছে তখন মা একদম দাঁড়াতে দিত না। সকালবেলা তো জানলা বন্ধ করেই রাখত। রাতে তাও পাল্লা দুটো একটু খুলত। তখন ওই দ্বীপের মতো জায়গাটার বড় বড় গাছগুলোকে কীরকম একটা ভুতুড়ে লাগত। ভয়ভয় করত বিট্টুর, সে চোখ বন্ধ করে ফেলত। এখন গাছটাকে দেখে আর একটুও ভয় করছে না।

বিট্টুর অবাক হওয়া চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রেখে দয়াল সান্যাল বললেন, কী, এবার খুশি তো! এসে থেকেই খালি দোতলায় আসতে চাইতিস।

একগাল হেসে বিট্টু ঘাড়টা হেলাল।

তোর জন্য এবার আরও একটা জিনিস আছে। দেখ কী জিনিস...

দয়াল সান্যাল চোখের ইশারায় বারান্দায় রাখা একটা টেবিল দেখালেন। টেবিলের ওপর খবরের কাগজে মোড়া লম্বা মতো একটা জিনিস রাখা আছে। বিট্টু কিছুতেই আন্দাজ করতে পারল না জিনিসটা কী। দয়াল সান্যাল বিট্টুর পিঠে মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, যা, খুলে দেখ... কী ওটা।

বিট্টু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলটার কাছে। কাগজের মোড়ক খুলে ফেলে চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল। এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিয়ে রাখা জিনিসটা হল একটা এয়ার গান।

এটা সত্যিকারের গান! বুঝলি হাঁদারাম।

দয়াল সান্যাল পকেট থেকে একটা পিচবোর্ডের বাক্স বার করলেন। তার মধ্যে ছোট ছোট দানার সিসার গুলি। এয়ার গানটা বিট্টুর হাত থেকে নিয়ে বন্দুকের নলটাকে মুচড়ে ভাঁজ করলেন। তার মধ্যে দানাগুলিটা ভরে দিয়ে নলটা সোজা করে বিট্টুর হাতে দিয়ে বললেন, নে, চালা এবার।

সত্যিকারের বন্দুক! বাবা চোখের সামনে গুলি ভরে দিল! কিন্তু কোন দিকে গুলি চালাবে ভেবে উঠতে পারল না বিট্টু। অথচ ট্রিগারটা টেপার জন্য হাত নিশপিশ করছে।

কোন দিকে গুলি করব?

দয়াল সান্যাল আঙুল তুলে হরির ঝিলের মধ্যে গাছ দুটোকে দেখিয়ে বললেন, চালা ওদিকে। যত রাজ্যের পাখি আসে এখন ওখানে। চালা ওদিকে। একটা ব্যাটা মরবেই। পাখিরা হচ্ছে তুলোর যম।

বন্দুকটা ভারী। নলের তলাটায় হাত দিয়ে কোনওরকমে গাছটার দিকে তাক করল বিট্টু। তারপর টিপে দিল ট্রিগারটা। খুট করে একটা আওয়াজ। তারপর ঝটপট ঝটপট অনেকগুলো পাখির ঝটপটানি। কেউ মরল কি? বুঝতে পারল না বিট্টু।

১৫

দেখতে দেখতে ক্যাথি গোমসের বাড়িতে শিপ্রার থাকার এক পক্ষকাল পেরিয়ে যাচ্ছে। ক্যাথির একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, চাঁদনি রাতে খোলা আকাশের নীচে এই অগ্রহায়ণের ঠান্ডায় বসে থাকা। শিপ্রা আসার পর প্রথম দু'-একদিন বারণ করেছিল। কিন্তু ক্যাথি শোনেননি। তাঁর একগুঁয়ে জেদটা সেই আগের মতোই আছে।

অগত্যা শিপ্রাও চাঁদনি রাতে ছাদে মাদুর বিছিয়ে বসল। সঙ্গে বাবলি। বাবলিকে গান শেখায় শিপ্রা। অত্যন্ত মনোযোগী ছাত্রীর মতো ক্যারল শিখতে শিখতে বাবলি নিজেই অবাক হয়ে যায়। ইংরেজি গান এভাবে যে কেউ তাকে শিখিয়ে দেবে, নিজের গলায় সে গাইতে পারবে, স্বপ্নেও কোনওদিন কল্পনা করেনি! মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে পড়ে।

শিপ্রা আলতো করে বাবলির হাতে একটা চাঁটি মেরে চোখ পাকাল, এই মেয়ে, বারবার বলছি না, 'স' আর 'শ'-র উচ্চারণ ঠিক করো। ঠিক করে বলো, ইটস আ ড্রিম অ্যান্ড ইলিউশন নাউ, ইট মাস্ট কাম টু সামটাইম সুন সামহাউ। 'ইলিউশন' আর 'সুন' ওয়ার্ড দুটোর উচ্চারণ ঠিক করো।

ইলিউসন

আঃ! ইলিউসন নয়, ইলিউশন... ইলিউ... শন... শন...

শন।

বাবলির এই উচ্চারণ শিক্ষা দেখে ক্যাথি খুব মজা পাচ্ছিলেন। কেমন একটা যেন নিষ্পাপ অনাবিল আনন্দ! নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

জানিস, আমারও উচ্চারণ খুব খারাপ ছিল। মা সারেগামা গলা সাধাতে বসাত, আমি গাইতাম শারেগামা। মা হাত চালাত, খেপে উঠে বলত, এরকম উচ্চারণ হলে তোর কোনও দর উঠবে না। কেউ আসবে না তোর...

শিপ্রা সতর্ক হয়ে তাড়াতাড়ি ক্যাথিকে থামিয়ে দিল।

উচ্চারণের গন্ডগোল ওরকম সবার একটু-আধটু থাকে, প্র্যাকটিস করতে করতে ঠিক হয়ে যায়। ব্রাদার ডি'সুজা আমাদের উচ্চারণ কী করে ঠিক করাতেন জানো? টাং টুইস্টার দিয়ে।

টাং টুইস্টার কী, দিদি? বাবলি জিজ্ঞেস করল।

এই রে, টাং টুইস্টারের বাংলা কী, তা তো জানি না। ওই যে আছে না, তাড়াতাড়ি বলতে হবে—পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়...

ও, বুঝতে পেরেছি, আরও আছে, বাবলা গাছে বাঘ ঝুলছে, বাবলা গাছে বাঘ ঝুলছে, বাবলা গাছে বাপ... নিজের উচ্চারণে হোঁচট খেয়ে বাবলি নিজেই হেসে কুটিপাটি হল।

শিপ্রা বলল, তোমাকে এবার একটা ব্রাদার ডি'সুজার টাং টুইস্টার দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি বলো, আপার রোলার লোয়ার রোলার, আপার রোলার লোয়ার রোলার...

জিভে শব্দ হোঁচট খাচ্ছে। হেসে লুটোপুটি হচ্ছে বাবলি। শিপ্রাও হেসে ফেলছে। মেয়ে দুটোর এই হাসাহাসি দেখে একসময় ক্যাথি বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠলেন, বাবলি, রাতের রুটি হয়েছে?

হাসতে হাসতে তখন বাবলির চোখমুখ লাল। কোনওরকমে দু'দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জানিয়ে দিল হয়নি।

চেয়ারে পিঠ টান করে উঠে বসলেন ক্যাথি। ভুরু কুঁচকে চোখ পাকালেন বাবলির দিকে, হয়নি মানে? এত রাত হতে চলল, আর কখন করবি?

শিপ্রা হাসি থামিয়ে বলল, আমি বলেছি গো আন্টি, আজ বাইরের থেকে রুটি আর তড়কা নিয়ে আসব।

বাইরের থেকে মানে? বাইরে কোথায় পাবি?

আছে একটা দোকান। বাজার যাওয়ার পথে পড়ে।

ক্যাথি কপালে চোখ তুললেন, ওই দোকানটা? যেখানে খাটিয়ায় বসে লরিওয়ালা আর মিস্ত্রিরা খায়? ওখানে আবার ভদ্রলোক খায় নাকি!

টেস্টের আবার ভদ্রলোক, ছোটলোক কী আন্টি! তা ছাড়া আমরা তো আর ওখানে বসে খেতে যাচ্ছি না। ওখান থেকে কিনে নিয়ে এসে বাড়িতে খাব।

এই ব্যবস্থাটাও ক্যাথির ঠিক মনঃপূত হল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যা খুশি কর তোরা দু'জনে। ওইসব খেয়ে শরীর খারাপ হলে কাল আমাকে বলতে আসিস না।

গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে বাবলিকে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল শিপ্রা। বাবলির সঙ্গে হিসেব করতে থাকল ক'টা রুটি আর কতটা তড়কা নিতে হবে। শীতের রাত্রি। রাস্তাটা জনমানবহীন না হলেও ফাঁকাই বলা চলে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই বাবলির পা দুটো থমকে গেল। শিপ্রার কনুইটা ধরে ফিসফিস করে বলল, দিদি... তপাইদা।

শিপ্রা দেখল একটু দূরে কয়েকটা ছেলে সাইকেল নিয়ে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে, অন্ধকারে আবছা ছায়ামূর্তির মতো। তপাইকে কোনওদিন দেখেনি শিপ্রা। নামটাই যা শুনেছে। চাপা গলায় বাবলিকে বলল, তো কী হয়েছে? তুমি তো চেনো তপাইকে। এরকম ভয় পাচ্ছ কেন?

বাবলির শুকিয়ে যাওয়া মুখের কোনও পরিবর্তন হল না। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তপাইদার বন্ধু ছেলেগুলো ভাল নয়। চলো ফিরে যাই। শিপ্রা নিজের গায়ে চাদরটা আরও একটু গুছিয়ে নিল। হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কখনও কখনও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে পুরো অবজ্ঞা করতে হয়। ইগনোর করো যে ওরা ওখানে আছে।

প্রথমে চোখে পড়েছিল রবিনের। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না। তবু ছায়া ছায়া অন্ধকারে চিনে নিতে অসুবিধা হল না মেয়ে দুটোকে। বয়সে ছোটটার সঙ্গে তো তপাই লাইন মারার চেষ্টা করে যাচ্ছে। উদ্বাস্তু মেয়েটা। কিন্তু বয়সে বড় যে, তার কোনও পরিচয় জানা নেই। বুড়ির বাড়িতে থাকতে এসেছে। এও পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু নাকি? বয়স বোঝা যায় না, তবে রূপে চোখে ঘোর লেগে যায়।

রবীন পা দিয়ে সাইকেলটা স্ট্যান্ডে রাখল। খুট করে ল্যাচটা টিপে ডায়নামোর মাথাটা লাগিয়ে ফেলল সাইকেলের চাকার সঙ্গে। তারপরে জোরে চাপ দিল প্যাডেলে। স্ট্যান্ডের মাঝখানে মাটির থেকে উঠে থাকা সাইকেলের চাকাটা বনবন করে ঘুরতে থাকল, হ্যান্ডেলের মাঝখানে লাগানো আলোটা জ্বলে উঠল। নির্ভুল তাকে আলোটা গিয়ে পড়ল শিপ্রার শরীরের ওপর। শিস দিয়ে উঠল রবীন।

আচমকা আলোটা মুখে এসে পড়ায় চোখ দুটো ঢেকে ফেলল শিপ্রা। বাবলি হাতের কনুইটা ধরে আরও টানছে। তপাইদার বন্ধুগুলো যে এরকম করবে দিদির সঙ্গে, স্বপ্নেও ভাবেনি সে। তপাইকে চেনে বলে মরমে মরে যাচ্ছিল বাবলি। তার ওপর, তপাই একবারও ছেলেগুলোকে বারণ করছে না।

'রূপ তেরা মস্তানা, পেয়ার মেরা দিওয়ানা'—একটা ছেলে বেসুরো গলায় গান গাইতে আরম্ভ করেছে। বাবলি আপ্রাণ বলার চেষ্টা করছে, দিদি ছেড়ে দাও। বাড়িতে গিয়ে রুটি আর যা হোক একটা কিছু করে নিচ্ছি।

বাবলির কথায় শিপ্রা কর্ণপাত করছে না। মুখটা কীরকম যেন কঠিন হয়ে গেছে। এখন দুটো মাত্র পথ খোলা—হয় উলটোমুখো হয়ে বাড়িতে ফিরে যাওয়া অথবা সোজা ছেলেগুলোকে পাশ কাটিয়ে রুটি-তড়কার দোকানের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

প্রাথমিক হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে শিপ্রা যেদিকে হাঁটছিল সেদিকেই হাঁটতে থাকল। ছেলেগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রাস্তার বাঁদিকে ওরা। বাবলিও বাঁদিক থেকে নিজেকে ডানদিকে নিয়ে এল। ছেলেগুলো গায়ে হাতটাতও দেওয়ার চেষ্টা করে। এর অভিজ্ঞতা বাবলির আছে। দিনদুপুরেই তপাইদা যা চেষ্টা করেছিল... আর এখন তো রাতের অন্ধকার।

ঠিক পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ছেলেগুলো ওদের ঘিরে ধরল। ওদের ঠিক গতিরোধ করল না, তবে সামনে দু'পাশে ঘিরে এমনভাবে এগোতে থাকল যে, ওদের হাঁটার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল।

রবীন শিপ্রার ডান পাশে। বাবলি শিপ্রার কাঁধ ঘেঁষে। আর বাবলির বাঁদিকে যে-ছেলেটা আছে তার নাম বাবলি জানে না। এমন অসভ্যর মতো গা ঘেঁষে যাচ্ছে, সাইকেলের হাতলে ধরা হাতের কনুইটা মাঝে মাঝেই ধাক্কা খাচ্ছে বাবলির স্তনের নীচে। এই যন্ত্রণাটুকু দিয়ে ছেলেটা কী স্বর্গীয় সুখ পাচ্ছে বাবলির জানা নেই। একবার আড়চোখে দিদির দিকে তাকাল বাবলি। দিদির মুখ একইরকম কঠিন। রবীনের কনুইটাও কি দিদির বুকে... মরে যেতে ইচ্ছে করছে বাবলির। সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িটা এসে বাবলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বাবলি একমনে ভগবানকে ডাকতে থাকল, ঠাকুর, মিলিটারিকে পাঠিয়ে দাও।

চল বাবলি, তোরা দু'জন, আমরাও চার। গঙ্গার ধারে যাই। খুব মস্তি হবে। তপাই বলছিল তোর ইয়ে দুটো...। কী রে তপাই, আমাদের টেস্ট করাবি না!

ছেলেটা বাবলির পাশ থেকে বলে উঠল। ওই ছেলেটার মন্তব্য শুনে উল্লাস প্রকাশ করল অন্য ছেলেগুলো। থেমে গেল শিপ্রার পা দুটো। খপ করে চেপে ধরল রবীনের সাইকেলের হ্যান্ডেলটা। উঁচু গলায় বলে উঠল, এই শোনো, তোমাকে এখনই ঠাটিয়ে চড় মারতে পারি। আরও কী-কী করতে পারি, তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

এক দুর্বল নারীর প্রতিরোধ দেখে ছেলেগুলো মজা পেল। একজন বলে উঠল, কী করতে পারো, একটু দেখাও না। সেটা দেখার জন্যই তো বুকটা আঁকুপাকু করছে।

শিপ্রা বলে উঠল, কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, বাবলি। পাকিস্তান কিছু চর ছড়িয়ে রেখেছে ব্যারাকপুরে। আর্মি খুঁজছে তাদের। তুমি এদের নাম জানো তো?

বাবলি প্রশ্নটার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারল না। ছেলেগুলোও যেন একটু থমকে গেল। বাবলির পাশের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শিপ্রা বলল, তোমার সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যেতে রাজি আছি। শুধু তার আগে বলো আমাদের সেনাবাহিনীর খবর ওদের কাছে পৌঁছে কত টাকা পাচ্ছ?

মানে? কী বলছেন আপনি?

তুমি থেকে আপনিতে উঠে এসেছে। গলার স্ফূর্তির আবেশটাও মিলিয়ে যাচ্ছে।

সাইকেলের আলোতে কালো রং লাগাওনি। কাদের সিগনাল পাঠাচ্ছিলে? ধরো আমি যদি আর্মির কাছে কমপ্লেন করি, তোমরা পাকিস্তানের চর। আমার কাছে প্রমাণ আছে। নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে?

ছেলেটা স্পষ্টতই ঘাবড়ে গেল। শিপ্রা পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে আর একটু আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলল, তোমরা কিছুই জানো না আমি কে আর কী জন্য এখানে এসেছি। ঠিক আছে বাড়ি যাও, তবে প্রস্তুত থেকো যে-কোনও সময়ে তোমাদের বাড়ির কড়া নেড়ে মিলিটারিরা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতে পারে।

বাবলির কাঁধে হাত রেখে শিপ্রা বলতে থাকল, যে-মেয়েটা এক-দেড়শো মাইল অনেক শিয়াল-হাঙরদের ঠেকিয়ে, নিজের সম্মান বাঁচিয়ে এদেশে আশ্রয় চেয়েছে... তার নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা আমি করব। তোমাদের মতো কাপুরুষকে ঠেকাতে তাতে আমাকে যত দূর যেতে হয় যাব। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি হোয়াট আই ক্যান ডু। আই উইল সিম্পলি টিচ ইউ আ লেসন অফ ইয়োর লাইফ!

শিপ্রার সাহেবি ইংরেজি উচ্চারণে ছেলেগুলো কথা হারিয়ে ফেলেছিল। সুন্দরী মহিলা মানেই যে দুর্বল, এই বিশ্বাসটা ধাক্কা খেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে ক্ষমতা যাচাই না করে এভাবে এগোনো উচিত হয়নি। কে কোথায় কী কলকাঠি নেড়ে দেবে ঠিক নেই। পুলিশের কোপে পড়লে একরকম, কিন্তু মিলিটারিদের রোষে পড়লে স্বয়ং ভগবান এসেও রক্ষা করতে পারবেন না। হতবাক্ হয়ে ওরা চেয়ে রইল শিপ্রা আর বাবলির যাওয়ার রাস্তার দিকে।

বাড়িতে ফিরে এসে শিপ্রা আর বাবলি, দু'জনেই স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করল। রাস্তায় ছেলেগুলোর সঙ্গে অভিজ্ঞতার কথা ক্যাথিকে কিছু বলল না শিপ্রা। বাবলিকেও বলতে বারণ করেছিল। তবে খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে শুয়ে পড়ার পর অন্যান্য দিনের মতোই বাবলির যথারীতি অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। ক্যাথির অবশ্য রাতে হাঁপের টানের কোনও সমস্যা হয়নি, ঘুমিয়েই পড়লেন। বাবলি খেয়াল করল, আজ শিপ্রারও ঘুম আসছে না। চাপা গলায় শিপ্রার সঙ্গে গল্প করতে থাকল। ভুলতে চাইল রবীনদের হাতে সদ্য যৌন লাঞ্ছনার কথা।

শিপ্রার সঙ্গে যত গল্প করে, বাবলি তত অবাক হয়ে যায়। যে-কোনও বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দিদির। কঠিন কঠিন বিষয়কে সহজ করে বুঝিয়ে দেয়। ছোট-ছোট সূত্র ধরে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়।

রাতে শিপ্রা বাবলিকে বলতে থাকল ব্রাদার ডি'সুজার কথা। সেই ভদ্রলোক আদতে ছিলেন দিদির কার্শিয়াং বোর্ডিং-এর ফিজিক্সের মাস্টারমশাই। সাউন্ড পড়াতে গিয়ে পিয়ানো দিয়ে তুলনা টানতেন। ভীষণ ভাল পিয়ানো বাজাতেন উনি। ভোর থেকে মাঝরাত, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় রাগরাগিণীর সরগমের আরোহণ-অবরোহণ কেমন, তা নিয়ে নিজের ব্যাখ্যা ছিল ব্রাদার ডি'সুজার। তাঁর ব্যাখ্যায়, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে সংগীত, রাগরাগিণীর মূর্ছনা।

কীরকম? আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে উঠল বাবলি।

একটু চিন্তা করে শিপ্রা বলল, লালাবাই কাকে বলে জানো?

লালাবাই?

লালাবাই হল আমরা বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য যে সুর করে ছড়ার গান গাই, সেগুলো। গাও একটা তুমি, বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তোমার গানটাই গাই দিদি, আয় ঘুম... আয় ঘুম... আয়...

শিপ্রা চুপ করে গিয়ে একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলল, অন্য আর একটা বলো।

বাবলি চিন্তা করে পরের সুরটা ধরল, খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে/ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেবো কীসে...।

গুড, এবার চিন্তা করে দেখো, তুমি যদি একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে এই গানটা গাও, দুপুরে আর রাতে কি ঠিক একইরকম সুরে গাইবে?

বাবলি মনে মনে দুপুর আর রাত ভেবে সুরটা আওড়াল। অন্ধকারে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, মনে হচ্ছে একটু তফাত আছে, রাতে সুরটা একটু টানাটানা।

ঠিক বলেছ। ব্রাদার ডি'সুজা এটাই বলতেন। দিনের বিভিন্ন সময়ে রাগরাগিণীর যে-নিজস্ব অধিকার আছে, ছোট ছোট গানে ফুটে ওঠে সেসব সুর। কখনও ইমন, কখনও দরবারি, কখনও কাফি, কখনও পিলু।

উৎসাহে বাবলি উপুড় হয়ে শিপ্রার কাছে আবদার করল, আমাকে শিখিয়ে দেবে দিদি সব রাগরাগিণী?

অন্ধকারে শিপ্রা হেসে ফেলল, দুর বোকা, এত কঠিন কঠিন জিনিস, আমি নিজেই জানি না। আর ওরকম দুম করে দু'দিনে শিখে ফেলা যায় নাকি? অনেক সাধনা করতে হয়।

বাবলি চুপ করে গেল। তারপর অন্ধকারে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আমি অনেক বড় গায়িকা হতে চাই। সায়রাবানু, ওয়াহিদা রহমান, হেমা মালিনী—সবার ঠোঁটে বেশ আমার গাওয়া গান থাকবে!

ওরে বাবা, তুমি তো দেখছি এদেশের সব হিরোইনদের নাম মুখস্থ করে ফেলেছ! ওদেশে দেখেছ নাকি এদের সিনেমা?

নাঃ, তবে রেডিয়োতে সিনেমার গান শুনেছি, আর পত্রিকায় গানের সিনের ছবি দেখেছি। দেখতে যাবে দিদি একটা সিনেমা?

ঠিক আছে, আমি যে-ক'দিন আছি, তার মধ্যে একটা সিনেমা না হয় ম্যাটিনি শোতে দেখে আসব। কাল আন্টিকে জিজ্ঞেস করতে হবে এখানে কোথায় সিনেমা হল আছে।

বাবলি খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল, আছে দিদি, চম্পা বলে একটা সিনেমা হল আছে, কাছেই। পঁচাশি নম্বর বাসে যাওয়া যায়। তপাইদা একবার বলেছিল...

উৎসাহের আতিশয্যে তপাইয়ের নামটা মুখে চলে এসেছিল। দ্রুত সামলে নিয়ে চুপ করে গেল বাবলি।

একটা নিশ্চুপ রাত্রি। ওপরে খাটের থেকে ক্যাথির নিশ্বাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। তপাইয়ের নামটা ঠোঁটের ডগায় এনে ফেলে বাবলি অপরাধবোধে ভুগছিল। তার ওপর নামটা শুনে দিদি একদম চুপ করে যাওয়ায় দম বন্ধ লাগছিল বাবলির। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শিপ্রা বলতে থাকল, তুমি যদি জীবনে

সত্যিই বড় গায়িকা হতে চাও সব কিছু ভুলে অনেক অনেক সাধনা করতে হবে বাবলি। আন্টিকে কখনও ভুল বুঝো না। আন্টি চায় তুমি অনেক অনেক বড় হও। অনেক নাম করো। তখন আমাদের কত ভাল লাগবে বলো তো! কত গর্ব হবে তোমাকে নিয়ে। লক্ষ্য ঠিক রাখো। কোনও ভুল পথে চলে যেয়ো না।

এরপর শিপ্রার সঙ্গে বাবলির আর কোনও কথা হয়নি। দু'জনেই যে চুপচাপ কতক্ষণ জেগে ছিল, জানে না।

সকালবেলায় ব্রাশের ওপর পেস্ট লাগিয়ে সদর দরজাটা খুলে সিঁড়িতে এসে বসে বাবলি দাঁত মাজে। ক্যাথি যদিও এটা একদমই পছন্দ করেন না, বকেঝকেও বাবলির এই অভ্যাসটা ছাড়াতে পারেননি। বাবলি বুঝে উঠতে পারে না মাসি কেন বারবার বলে, ওভাবে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে খারাপ মেয়েরা বসে, ভদ্রবাড়ির মেয়েরা বসে না।

আজ অবশ্য ব্রাশটা নিয়ে আয়েশ করে আর সিঁড়িতে বসা হল না। তার আগেই কেঁপে উঠল শরীর। সদর দরজার সামনে এক চিলতে বাগান, তারপরেই বাড়ির পাঁচিল আর কোমর সমান উঁচু গেট। গেটটা যে-কেউ ইচ্ছে করলে টপকে ঢুকতে পারে। তবুও ক্যাথি মনের শান্তির জন্য সেখানে একটা তালা দিয়ে রাখেন। সকালবেলায় বাবলি তালাটা খুলে দেয়।

সেই তালাবন্ধ গেটের বাইরে কোনাকুনি সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তপাই। যেন সদর দরজাটা খোলারই অপেক্ষায় ছিল। বাবলির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হাত উঠিয়ে বাবলিকে ডাকল, বাবলি শোনো, খুব দরকার আছে।

বাবলির পায়ের তলার মাটি সরে গেল। মাসি দু'চক্ষে তপাইকে দেখতে পারে না। তার ওপর কাল রাতে দিদির সঙ্গে ওরা যা অসভ্যতামো করেছে! কাল ছেলেগুলো ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তবে আজ যদি সদলবলে ঝামেলা করতে বা বদলা নিতে আসে, ঝুটঝামেলার একশেষ হবে। বাবলি দরজাটা বন্ধ করার জন্য এগোতেই মরিয়া হয়ে তপাই গেটটা ঝাঁকাল।

বাবলি, মাইরি বলছি! ভীষণ জরুরি দরকার...

ভয়ে বাবলির পেটের মধ্যে গুড়গুড়ানি শুরু হয়ে গেল। গেটের ঝনঝনানির আওয়াজে মাসি এবার বেরিয়ে এলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

বাবলিকে দরজার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে তপাই আবার মরিয়া হয়ে বলে উঠল, একটা খুব আর্জেন্ট খবর আছে তোমার দিদির জন্য। তোমার দিদিকে একবার ডেকে দেবে?

বাবলি মাথা নাড়ল। ইশারায় বোঝাল, দিদিকে এখন ডেকে দেওয়া যাবে না। দিদি ঘুমোচ্ছে।

তা হলে তোমার মাসিকেই একবার ডেকে দাও...।

তপাইয়ের নাছোড়বান্দা অবস্থা দেখে মাসির চেয়ে দিদিকে জানানোই শ্রেয় মনে করল বাবলি। ইশারায় তপাইকে অপেক্ষা করতে বলে দরজাটা বন্ধ করে ওপরে এল বাবলি। শিপ্রা তখনও মেঝেতে ঘুমোচ্ছে। অন্যান্য দিনের মতোই জানলার পরদাগুলো

সব টানা, তাই ঘরের মধ্যে বেলা বোঝা যাচ্ছে না। শিপ্রার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে শিপ্রাকে ডাকতে থাকল বাবলি।

চোখ খুলে শিপ্রা দেখল, বাবলির একটা আতঙ্কগ্রস্ত মুখ। ঘুমের রেশটা চট করে ভেঙে গেল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে বাবলি?

ফিসফিসে গলায় বাবলি বলল, তপাইদা।

ভুরু দুটো কুঁচকে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তপাইয়ের?

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

আমার সঙ্গে? অবাক হল শিপ্রা। বাবলির মতো শিপ্রারও প্রথমেই মনে হল, এ হল কাল রাতের জের। হাজার হোক ওরা স্থানীয় ছেলে। অত চট করে ভয় দেখানো যাবে না। কাল পরিস্থিতি সামলাতে যা মনে এসেছিল, বলেছিল। তখনকার মতো কাজ হয়েছিল। ব্যাপারটা যে শুকনো নির্বিষ হুমকি ছিল, সেটা বুঝতে পেরে এখন হিসেবনিকেশ করতে এসেছে।

সকালবেলাতেই ঘুম থেকে উঠে এইসব ঝুটঝামেলার কথা ভেবে শিপ্রার হতাশ লাগল। জীবনে শান্তি নেই, একটার পর একটা লেগেই আছে। পলাশ, শুভাননের দলবল, পুলিশ, দয়াল সান্যাল আর শেষে এই উটকো তপাই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবলিকে জিজ্ঞেস করল, একাই এসেছে, না দলবল নিয়ে?

একাই তো দেখলাম। বলল, তোমার সঙ্গে ভীষণ জরুরি দরকার।

ঠিক আছে। আসছি। ভেতরে ডেকে বসাও।

ভেতরে? বাবলি ঢোঁক গিলল।

শিপ্রা মনে মনে ভাবল, ঠিকই তো। কাল রাতে যা-কিছু হয়েছে তার কিছুই ক্যাথি আন্টি জানে না। তার ওপর এই ছেলেটার নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। তবে এটাও ঠিক, দু'দিনের জন্য থাকতে এসে ক্যাথি আন্টির এখানে সুখেশান্তিতে কাটানো জীবনে কোনও অশান্তি দিয়ে যাব না। গোটা ব্যাপারটার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা করতে হবে। সেসব রাস্তায় হয় না, বাড়ির বৈঠকখানাই দরকার তার জন্য। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে শিপ্রা বলল, হ্যাঁ বাবলি, ভেতরে ডেকে বসাও ওকে। আমি আন্টিকে বুঝিয়ে বলছি। ও তো এখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

শিপ্রার কথাতেও বাবলি পুরোপুরি ভরসা পেল না। দুরুদুরু বুকে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। শিপ্রা বাথরুমে যাওয়ার আগে রান্নাঘরে এল। ক্যাথি ব্রেকফাস্ট তৈরি করছেন। কোনও ভূমিকা না করে শিপ্রা বলল, আন্টি, ওই তপাই আমার সঙ্গে দেখা করে কিছু বলতে চায়। আমি বাবলিকে বলেছি ওকে ভেতরে এনে বসাতে। দু'-একটা কথা হবে হয়তো। তুমি এর মধ্যে থেকো না।

ক্যাথি অবাক হয়ে শিপ্রার দিকে তাকালেন, তুই লোফারটাকে একবারে বাড়ির ভেতর এন্ট্রি দিয়ে দিলি?

সরি আন্টি। এটা তোমার বাড়ি। তোমার পারমিশন নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার

মনে হল বাবলিকে তোমার কাছে রাখার ক্ষেত্রে এই ছেলেটা একটা সমস্যা। সেটাকে যদি একটু ইজি করা যায়, মেটানো যায়।

ক্যাথি গজগজ করতে থাকলেন, লোফারদের সমস্যা মেটাতে একটাই জিনিস দরকার—বিছানা।

শিপ্রা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, রান্নাঘরের চৌকাঠের বাইরে বাবলি। ইশারায় বলছে তপাই ভেতরে এসেছে।

তুমি একটু আন্টিকে ব্রেকফাস্ট করতে হেল্‌প করো বাবলি। আমি চট করে ওর সঙ্গে কথা বলে আসছি।

শিপ্রা বাথরুমে থেকে বেরিয়ে বসার ঘরে এল। পুরনো সোফাটায় তপাই বসে আছে। খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি নয়। এই প্রথম শিপ্রা ভাল করে দেখল ছেলেটাকে। কাল রাতে আলো-আঁধারিতে আর ওইরকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ভাল করে দেখতে পায়নি ছেলেটার চেহারা। এখন দেখে মনে হচ্ছে, ক্যাথি আন্টি যতই লোফার লোফার বলুক, অতটা রুক্ষতা নেই। ছেলেটা একটু ইতস্তত করে বলল, দিদি, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। রবীন বলেছে আর কখনও...

শোনো, কী হয়েছিল সেসব আমরা চলো ভুলে যাই। আমি আশা করব আর কোনও মেয়ের সঙ্গে তোমরা ওরকম ব্যবহার করবে না।

দিদি, রবীন বলছিল আপনি যেন আমাদের নামে কোনও অভিযোগ না করেন।

শিপ্রা হেসে ফেলল।

কে রবীন? যে আমার গায়ে সাইকেলের আলো ফেলেছিল? ওকে কিন্তু যুদ্ধের নিয়ম বলে দিয়ো। আমি অভিযোগ না করলেও সাইকেলের আলোর অর্ধেকটা কালো রং করা নেই দেখলে পুলিশ-মিলিটারিরা যে-কোনও সময়ে ধরতেই পারে। চা খাবে?

চা?

মুখ ফুটে চা খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ না করতে পারলেও তপাইয়ের মুখচোখ দেখে মনে হল চা খেতে ওর কোনও আপত্তি নেই।

তুমি বসো। আমি বাবলিকে চায়ের কথা বলে আসছি। ঘুম থেকে উঠে আমিও চা খাইনি।

শিপ্রা রান্নাঘরে এল। তপাইয়ের সঙ্গে শিপ্রার কী কথাবার্তা হচ্ছে তাতে ক্যাথির কোনও আগ্রহ নেই। তবে বাবলির বুকের ভেতর উত্তেজনায় ঘোড়াগুলো দৌড়োচ্ছে।

বাবলি ডিয়ার, দু'কাপ চা দেবে প্লিজ!

শিপ্রার টেনশনমুক্ত গলা শুনে আর মিষ্টি হাসি দেখে ঘোড়াগুলোর লাগামে টান পড়ল। শিপ্রার মতো চায়ের জল চাপানোই ছিল। তাতে আরও এক কাপ জল ঢেলে বাড়িয়ে দিল বাবলি। শিপ্রা আবার বসার ঘরে এসে তপাইয়ের উলটো দিকের সোফায় বসল। তপাইয়ের ইতস্তুতা এখনও যায়নি। সেটা সামাল দিতে মাঝে মাঝেই হাত কচলাচ্ছে।

দিদি, রবীন খুব ঘাবড়ে গেছে। এই বাড়িটা তো কর্নেল সামন্তর, আপনি ওঁকে বলে দিলে আমাদের আবার ধরে নিয়ে যাবে।

আবার ধরে নিয়ে যাবে মানে? আগে তোমাদের কখনও ধরেছিল নাকি আর্মি?

না, মিলিটারি ধরেনি, তবে পুলিশে ধরেছিল। ওয়াগন ব্রেকার বলে এক হপ্তা চালান করে দিয়েছিল। আসলে বেকার ছেলে তো দিদি, যার যখন যেমন মনে হয় ধরে নিয়ে যায়।

তুমি কতদূর পড়াশুনো করেছ?

বি.এসসি পাশ করেছি, তারপর থেকে বেকার। তিন বছর হয়ে গেল। শিপ্রার হঠাৎ করে পলাশের কথা মনে পড়ে গেল। অত্যন্ত ব্রাইট ছাত্র ছিল। স্বপ্ন দেখত আমেরিকায় যাবে। ওখানকার নামকরা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করবে। শেষ পর্যন্ত তার বরাতে জুটেছিল হরিতলা কটন মিলের সামান্য এক শ্রমিকের চাকরি।

বাবলি ট্রে-তে করে দু'কাপ চা এনে দুটো সোফার মাঝখানের ছোট টেবিলটার ওপর রাখল। শিপ্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, ওরা কেউ কারও দিকে সেভাবে তাকাল না। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আগের চেয়ে একটু সহজ হল তপাই।

দিদি, একজন কিন্তু এখানে খোঁজখবর করছে আপনার।

শিপ্রা এবার একটু চমকে উঠল। তার এখানে এসে থাকার খবর তো পরিচিতরা কেউ জানে না। আর স্থানীয় লোকেরা ওর কোনও পরিচয়ই জানে না। কর্নেল সামন্তকে শুধু বলেছে ক্যাথি আন্টি ওর মায়ের ছোটবেলার বন্ধু। শিপ্রার পালটে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে তপাই আর একটু খোলসা করে বলল, আপনি বাজারে শক্তির দোকান থেকে একদিন ফোন করেছিলেন না, কাল একজন লোক এসে শক্তিকে জিজ্ঞেস করছিল কে ওর দোকানে ফোনটোন করতে আসে। খানিকটা আপনার চেহারার বর্ণনাও দিয়েছে।

স্থির দৃষ্টিতে তপাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, শক্তি কী বলল?

শক্তি আসলে একটু ঢ্যাটা ছেলে। কাল লোকটাকে খুব একটা পাত্তা দেয়নি। তবে আজকে সেই লোকটা আরও একজন লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। ওরা দু'জনে শক্তির দোকান থেকে অনেক জিনিসপত্তর কিনেছে। বুঝেছেন তো দিদি, খদ্দের লক্ষ্মী! এবার শক্তি আর না বলতে পারেনি। বলেছে আপনি মাসির বাড়িতে আছেন আর আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে।

তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছে মানে?

আসলে শক্তি তো জানে, আমরা এই অঞ্চলে আড্ডা মারি। তাই আপনার খবরাখবর আমরাই বলতে পারব।

শিপ্রা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, তারপর?

লোক দুটোকে নিতাইয়ের চায়ের দোকানে বসিয়ে রেখেছে রবীন। আমাকে বলল আপনার কাছে এসে কাল রাতের ব্যাপারটায় ক্ষমাটমা চেয়ে মিটমাট করে নিতে। আপনি চাইলে লোক দুটোকে এমন কড়কে দেব, আর কোনওদিন এ-তল্লাটে আসার সাহস করবে না।

শিপ্রা অন্যমনস্ক হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল, লোক দুটোকে চায়ের দোকানে বসিয়ে রেখেছ বললে, তাই না?

হ্যাঁ দিদি, আমি আপনার সঙ্গে কথা না বলে যাওয়া পর্যন্ত রবীন ওদের আটকে রাখবে।

একটা কাজ করো। লোক দুটোকে এ-বাড়িতে নিয়ে এসো।

এ-বাড়িতে!

শিপ্রা ঠিক এরকম চাইবে, তপাইয়ের হিসেবে ছিল না। কাল রাতে যে-বাড়াবাড়িটা হয়ে গিয়েছিল এবং এই সুন্দরী মহিলার মধ্য থেকে যে-কঠিন ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এসেছিল, তাতে ওরা সবাই ঘাবড়ে গেছে। বাঁচতে একটা সওদা-রফার দরকার ছিল। সকালবেলাতেই শক্তির দোকানে আসা লোক দুটো যেন ভগবান প্রেরিত! অথচ সেই তাসটা ব্যবহারের সুযোগ এই মহিলা দিচ্ছেই না। কীভাবে লোক দুটোর সঙ্গে যুঝতে হবে, ওদের সাহায্য ছাড়া নিজেই ঠিক করে নিচ্ছে।

শিপ্রার সিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন না দেখে, বড়-বড় চুমুকে চা-টা শেষ করে তপাই বলল, ঠিক আছে দিদি, নিয়ে আসছি ওদের।

তোমাদের আর কষ্ট করে আসার দরকার নেই, ওদের শুধু বাড়িটা দেখিয়ে দাও।

তপাই বেরিয়ে যেতে সদর দরজাটা আলতো করে ভেজিয়ে গুম হয়ে সোফায় বসে রইল শিপ্রা। একটু পরে ক্যাথি বসার ঘরে এসে শিপ্রাকে ওরকমভাবে বসে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কী কথা হল লোফারটার সঙ্গে? বলে গেছে তো দু'-চারটে বাজে কথা। এসব ছেলেদের আমি খুব ভাল করে চিনি রে শ্যারন।

শিপ্রা একটা নির্বোধ দৃষ্টিতে ক্যাথির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার খোঁজ পেয়ে গেছে আন্টি।

ক্যাথি ঠিক কথাটার মানে বুঝতে পারলেন না। বললেন, খোঁজ পেয়ে গেছে মানে, কে খোঁজ পেয়ে গেছে?

যারা আমাকে খুঁজছে, তাদের কেউ। হয় শুভাননের লোকেরা, না হয় পুলিশ, না হয় দয়াল সান্যাল।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে ক্যাথি কিছুক্ষণ সময় নিলেন। তারপর শিপ্রার কাঁধে দুটো আলতো চাপড় মেরে বললেন, তোর কোনও ভয় নেই শ্যারন। এ-বাড়িতে আমি থাকতে কেউ তোর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। চল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিবি চল।

ঠিক এইসময়ই বেজে উঠল ডোরবেলটা। ক্যাথি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার বাইরে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখে চিনতে একটু সময় নিলেন। তারপর গলাটা যথাসম্ভব কঠিন করে বললেন, বলুন।

হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করলেন সরোজ বক্সী। অল্প ঝুঁকে ক্যাথিকে বললেন, ভাল আছেন ম্যাডাম?

কুশল জিজ্ঞাসা শুনে মুহূর্তের জন্য ক্যাথির কাঠিন্যে একটু চিড় ধরল। সরোজ বক্সীকে বহু দিন ধরে চেনেন। মার্থার সঙ্গে দয়াল সান্যালের বৈষয়িক এবং অন্যান্য

নানা প্রয়োজনে একমাত্র যোগসূত্র ছিল এই লোকটা। মার্থার শেষ দিন পর্যন্ত। এমনকী এই লোকটা মার্থার কবরে দু'মুঠো মাটিও দিয়েছিল।

ক্যাথির পিছনে শিপ্রাও উঠে এসেছিল। পিছন থেকে বলল, কী ব্যাপার সরোজবাবু?

সরোজ বক্সী নমস্কার করলেন।

আসুন, ভেতরে আসুন।

পিছন থেকে শিপ্রার গলা শুনে ক্যাথি দরজার মুখ থেকে সরে দাঁড়ালেন। সরোজ বক্সীকে সোফাটা দেখিয়ে শিপ্রা বলল, বসুন। তা আর একজন কোথায়? আপনারা তো শুনলাম দু'জন এসেছিলেন।

বিমলকে চলে যেতে বললাম। ফ্যাসফ্যাসে গলায় উত্তর দিয়ে সরোজ বক্সী দ্রুত চিন্তা করতে থাকলেন, আগমনের হেতু সম্পর্কে কী বাহানা দেবেন।

তা বলুন কী ব্যাপার? কঠিন গলায় শিপ্রা জিজ্ঞেস করল।

আমতা আমতা করে সরোজ বক্সী বলার চেষ্টা করলেন, আসলে বিট্টুবাবা খুব জিজ্ঞেস করছে আপনি কবে বাড়ি ফিরে আসবেন। ছেলেমানুষ তো...

বিট্টু, বিট্টু জিজ্ঞেস করছে মাম্মির কথা? ভেতরে ভেতরে বুকটা ফাটতে থাকল শিপ্রার। দয়াল সান্যালের সঙ্গে দাম্পত্যের টানাপড়েনে যে-শাস্তি ওই একরত্তি ছেলেটা পাচ্ছে সেটা কি তার প্রাপ্য? তবু বাইরে ভাঙল না শিপ্রা। গলায় যতটা সম্ভব বরফ রেখে বলল, এটা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছেন সরোজবাবু? বিট্টু আমার খোঁজ করল আর আপনি আমাকে খুঁজতে খুঁজতে চলে এলেন এখানে? বিট্টুর কথা আপনি শুনবেন ঠিকই। তবে আজকে নয়। আজ থেকে কুড়ি বছর পর। যখন হরিতলা কটন মিলের মালিক হবে প্রীতম সান্যাল, আজকের ছোট্ট বিট্টু। আজ তো শুধু আপনি আপনাদের এম.ডি-র হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন।

একটানা কথাগুলো বলে উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকল শিপ্রা। সরোজ বক্সী মাথা নিচু করে বসে আছেন। ক্যাথিও এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার গলা খাঁকরিয়ে বললেন, শুনুন সরোজবাবু, মার্থা নেই বলে ভাববেন না শ্যারন আজ পৃথিবীতে একা হয়ে গেছে। আমি আছি এখনও।

শিপ্রার হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের ঘরের এক কোনায় বাবলি চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে। চোখের ইশারায় সেটা ক্যাথিকে জানাতেই ক্যাথি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বাবলিকে ডেকে বললেন, তুই তোর মায়ের কাছে ঘণ্টাখানেক ঘুরে আয় বাবলি। বড়দের কথার মধ্যে থাকিস না।

অযাচিত ভাবে সকালবেলাতেই ছুটি পেয়ে গিয়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠল বাবলির। যদিও সকাল থেকে যা চলছে তাতে ভেতরে ভেতরে প্রশ্নের শেষ নেই, তবুও এই হঠাৎ করে ছুটি পাওয়াটা সব ভুলিয়ে দিল। ছুটি মানেই তো মুক্তি, ছুটি মানেই স্বাধীনতা।

বাড়ির বাইরে রাস্তাতে এসেই অবশ্য সেই পড়ে-পাওয়া-চোদ্দো আনা আনন্দের রেশটা

ঝপ করে মিলিয়ে গেল। রাস্তার কোনায় তপাই আর রবীনের দলবল কাল রাতের মতোই সাইকেল নিয়ে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলিকে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল বাবলির।

বাবলির পা চলছিল না। এগিয়ে এল ওরাই। বাবলিকে ঘিরে ধরল। তবে কাল রাতের মতো উদ্ধত নয় ওরা। বাবলির শরীর থেকে সম্ভ্রমের দূরত্বেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম মুখ খুলল রবীনই। ওদের দলের পাণ্ডা।

তোর দিদি মালটা কে বল তো বাবলি?

প্রশ্নের ধরন এবং ভাষার ব্যবহারে আরও ঘাবড়িয়ে গেল বাবলি। তবে ধমকে উঠল তপাই।

আঃ রবীন, ঠিক করে কথা বল। তারপর বাবলির দিকে নরম চোখে চেয়ে বলল, আসলে যে দুটো লোক তোমার দিদির খোঁজ করতে এসেছিল, তারা বলছিল...

একজন তপাইকে থামিয়ে বলল, দুটো লোক নয়, এখন যে লোকটা ভেতরে গেছে, ঝান্টু একটা, অন্য লোকটা যত বলতে যায়, এ তত চেপে দেয়।

তপাই হাত তুলে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তা আমরা পরে অন্য লোকটার কাছে জানতে পারলাম তোমার দিদির নাম শিপ্রা সান্যাল। বিরাট শিল্পপতির বউ তোমার দিদি। তুমি জানো কোন কোম্পানির মালিক?

বাবলি মাথা নাড়ল। দিদির ভাল নাম শিপ্রা সান্যাল? দিদির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা এই ক'দিনে বেশ ঘন হলেও দিদির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই প্রায় জানে না। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছে, দিদির সঙ্গে দিদির বরের কিছু একটা ঝামেলা আছে।

বাবলির মাথা নাড়া দেখে হতাশ হল ছেলেগুলো। রবীন বলল, একটু খোঁজখবর নিয়ে আমাদের জানাস তো বাবলি।

বাবলি কোনওরকমে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল। তারপর পা চালিয়ে ওদের থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল।

একজন সুর কেটে বলল, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ বাবলি?

মিয়ানো গলায় বাবলি বলল, মায়ের কাছে...

ছেলেটা বলল, যাও বাবা তপা, বাবলিকে তোমার ইয়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো।

ভিড় ছেড়ে তপাই সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে এল বাবলির সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে দূরত্ব কিছুদূর বেড়ে যাওয়ার পর তপাই গদগদ গলায় বলল, বাবলি রাগ করেছ?

বাবলি কোনও উত্তর দিল না। একইরকমভাবে হাঁটতে থাকল। বাবলির মনোযোগ পেতে সাইকেলের ঘণ্টিটা দু'বার বাজিয়ে বলল, কী বাবলি, আমার সঙ্গে কথা বলবে না?

বাবলি নিচু গলায় বলল, তোমরা ভীষণ অসভ্য।

তুমি জানো তোমার দিদির কাছে সকালে ক্ষমা চেয়ে এসেছি। আসলে কাল রাতে সবাই একটু মাল খেয়ে...। যাক গে যাক গে, আর হবে না। আমাকে বিশ্বাস করে দেখো।

তপাইয়ের কথায় বাবলির কোনও ভাবান্তর হল না। অধৈর্য হয়ে তপাই একটু এগিয়ে বাবলির রাস্তা সাইকেল দিয়ে আটকে বলল, আমাকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে বাবলি।

বাবলি মুখটা তুলতেই চোখে পড়ল হাতলের মাঝখানে আটকানো আলোটার ওপর। বিড়বিড় করে বলে উঠল, কাচের ওপর কালো কালি লাগাওনি কেন? দিদি তোমাকে বলেছিল না।

তপাই উৎসাহ পেয়ে বলল, লাগাব, আজই লাগাব। সদরবাজারের কাছে রাস্তা সারাইয়ের কাজ হচ্ছে। পিচ না হলে আলকাতরা লাগিয়ে নেব। এখন তুমি চলো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

গঙ্গার ধারে। বিশ্বাস করো সেদিনের মতো আর কিছু হবে না, কথা দিচ্ছি।

বাবলি সভয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠল, না বাবা, সেদিন মাসির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। রুলের বাড়ি দিয়েছে পায়ে। তাও তো তুমি সেদিন কী করতে গিয়েছিলে বলিনি...।

উফ! ছটফট করে চোখটা বন্ধ করে ফেলল তপাই। কী করে যে বুড়িটা এত বড় একটা মেয়ের গায়ে হাত তোলে! চোখটা খুলে বলল, সেদিন তোমাকে বলেছিলাম কিনা, বুড়ি তোমাকে থাকতে দিয়েছে বলে কি মাথা কিনেছে নাকি? গায়ে হাত তোলে কোন সাহসে? আজ চলো তো আমার সঙ্গে, আজকের পরও যদি বুড়ি তোমার গায়ে হাত তোলে আমি নিজে গিয়ে দিদির সঙ্গে কথা বলব।

তপাইয়ের জোরাজুরির কাছে হার মানল বাবলি। নদীর দেশের মেয়ে। নদী দেখার আকর্ষণ সব সময়ই থাকে। গঙ্গার খুব কাছাকাছিই ক্যাথির বাড়ি। তবুও গঙ্গা দেখতে যাওয়ার সুযোগই হয় না। তপাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল গঙ্গার ধারে। বড় বড় অনেকগুলো গাছ সেখানে। শীতকালে ঘাসের ওপর পাতা ঝরে পড়ে আছে। সামনে বিস্তৃত গঙ্গা। এই জায়গাটায় বাবলি কখনও আসেনি।

একটু দূরত্ব রেখে বাবলির পাশে বসল তপাই। নিজের ব্যবহার এবং আচরণ সম্পর্কে আজ নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে তপাই। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, আসলে তোমাকে তো আমি বলেছি বাবলি, আমি তোমাকে ভালবাসি। মানুষ যাকে ভালবাসে, কাছে পেতে চায় তাকে তো ছুঁয়ে দেখতে চায়, আদর করতে চায়, সেদিন তাই...

জানো তপাইদা, আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে একটা নদী গেছে। তার নাম বুড়িমতি। এই নদীটার মতো এত চওড়া নয়। তবে এঁকেবেঁকে গেছে। আমরা স্কুল থেকে ফেরার সময় নদীর ধারে এক্কাদোক্কা খেলতাম। আমাদের একজন বন্ধু ছিল, রুবি। খুব ফাজিল। নদী দিয়ে কোনও বুড়ো মাঝি নৌকা নিয়ে গেলে পাড় থেকে চিৎকার করে উঠত, কী কত্তা, কোথা যাও? বউ আনতে যশোহর নাহি? কখনও বলত, কী কত্তা, পোলা কয়খান? বলেই ছুট্টে গাছের পিছনে রুবি লুকিয়ে পড়ত। বুড়ো মাঝি নৌকো থেকে

রুবিকে তো আর দেখতে পেত না, আমাদের যাদের দেখতে পেত বাপবাপান্ত করত।

তপাই দেখল দেশের কথা, বুড়িমতি নদীর কথা বলতে গিয়ে বাবলির মুখচোখ খুশিতে উপচে পড়লেও কোথায় যেন একটা বিষাদের ছায়া। চোখের কোণটা চিকচিক করছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তোমরা ফিরে যাবে, তাই না বাবলি?

বাবলির চিকচিকে চোখ এবার চকচক করে উঠল, যাবই তো। আমাদের দেশটা সবচেয়ে সুন্দর। তবে তোমার কথাও আমার মনে পড়বে তপাইদা।

উদাস হয়ে তপাই চোখটা ফিরিয়ে নিল গঙ্গার উলটোদিকে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কলকারখানার চিমনিগুলো মাথা উঁচু করে রয়েছে। কালো ধোঁয়ার দলা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে।

তুমি তোমার দেশে চলে যাওয়ার আগে আমার একটা উপকার করে দেবে?

বাবলি ঘুরে তাকাল তপাইয়ের দিকে। তপাই গঙ্গার ওপারে কারখানার চিমনিগুলো দেখিয়ে বলল, সকালের লোকটা বলছিল তোমার দিদি গঙ্গার ওপারে একটা বিরাট সুতোকলের মালিকের বউ। পারবে বাবলি, তোমার দিদিকে বলে কারখানায় একটা চাকরি করে দিতে? সায়েন্সের ডিগ্রিটা হাতে নিয়ে তিন বছর ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ফেললাম। তবুও একটাও চাকরি জোগাড় করতে পারলাম না। তুমি আমাকে যে-কোনও একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও, জমাদার, দারোয়ান, পিয়ন—যা হোক কিছু। আমি ওয়াগন ব্রেকার হতে চাই না বাবলি।

আবেগে বাবলির হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিল তপাই। বাবলির মনটা হারিয়ে গেল। নিজের দেশে বসে এই লোফার ছেলেটার চোখ ছলছল করছে কেন?

১৬

বাঁদিক থেকে লাল ফাঁসগুলোর সবকটা ডানদিকের কাঁটায় চলে আসার পর উলের বোনাটা কোলের ওপর মেলে ধরলেন ক্যাথি। পরম মমতায় বোনাটার উপর হাত বুলিয়ে টানটান করে শিপ্রাকে বললেন, তুই ক্রিসমাসের আগেই নিজের বাড়িতে ফিরে যাবি শ্যারন। মাথা উঁচু করে ফিরে যাবি। ছোট্ট সান্তার জন্য লাল সোয়েটার আর টুপি তার আগেই শেষ হয়ে যাবে।

ক্যাথি বুকের দিকটা বুনছেন। শিপ্রা পিঠের দিকটা। ডিজাইনের জটিলতা বুকের দিকেই বেশি, পিঠের দিকটা সোজাসাপটা। তবুও ক্যাথি যতটা এগোতে পেরেছেন শিপ্রা ততটা পারেনি। শিপ্রা বোনাটা হঠাৎ গুটিয়ে পাশে রেখে বলল, ছেড়ে দাও আন্টি। আমার মনে হচ্ছে এটা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার আর থাকা হবে না। দু'-এক দিনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। মাঝখান থেকে রবার্টের ছেলের সোয়েটারটা তুমি বন্ধ করে দিলে...।

ক্যাথি চোখ থেকে চশমাটা খুলে রেখে বললেন, কেন, দু'-এক দিনের মধ্যেই তোকে চলে যেতে হবে কেন?

দয়াল জেনে গেছে আমি কোথায় আছি, টেনে নিয়ে যাবে আমাকে। আর যাওয়ার আগে চারপাশ সব তছনছ করে দিয়ে যাবে। মহেশদাকে তো আমার জন্যই চলে যেতে হল আন্টি...।

ক্যাথি হেসে ফেললেন, তুই কী মনে করছিস, মহেশের মতো আমাকেও গুলি করে মেরে দয়াল তোকে এখান থেকে নিয়ে যাবে?

আমি কিন্তু সিরিয়াস আন্টি, তুমি ওকে চেনো না। তোমাকে এমন কিছু করবে তুমি হয়তো আর এখানে থাকতে পারবে না।

বদনাম রটিয়ে দেবে বলছিস? দুর পাগলি, সত্যিকারের বেশ্যাদের আবার বদনামের ভয় থাকে নাকি! এসব কীভাবে সামলাতে হয় সারাজীবন তো তাই শিখেছি!

না আন্টি, এই বয়সে সব ছেড়ে তুমি যখন সুখেশান্তিতে আছ, তখন নতুন করে আবার এইসব... আমার খুব খারাপ লাগবে আন্টি।

শিপ্রার মাথায় একটা হাত রেখে ক্যাথি বললেন, তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না। তোর যতদিন ইচ্ছে এখানে থাক। শুধু নিজের সংসারটা ভেঙে ফেলিস না।

একটু চুপ করে থেকে শিপ্রা বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব আন্টি? তুমি এখানে ঠিক কী পরিচয়ে থাকো?

রবার্টের মা। যার বর অল্প বয়সে অনেক টাকা আর বউবাচ্চা রেখে মারা গিয়েছিল।

ধরো, কাল যদি দয়াল সান্যাল এসে তোমার সব কথা কর্নেল সামন্তকে বলে দেয়?

তোর শুধু ঘুরেফিরে একটাই চিন্তা তাই না? বেশ, ধর যদি বলেই দেয়, ডিসিশনটা তো কর্নেল সামন্তই নেবে। আমাকে থাকতে দেবে, নাকি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে গঙ্গাজল দিয়ে বাড়িটা ধোবে, ব্যাপারটা পুরোপুরি ওর। যদি ও তাড়িয়েই দেয় আর একটা কোনও জায়গা খুঁজে নেব। পৃথিবীতে থাকার জন্য ব্যারাকপুরই তো ঈশ্বর একমাত্র জায়গা বানাননি।

শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।

না আন্টি। তুমি এখানেই থাকবে। কেউ তোমাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না। শুধু তোমার একটা পারমিশন চাই। আমি কর্নেল সামন্তর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ক্যাথি অবাক হলেন, কী কথা বলবি তুই?

তোমাকে পরে বলব। কিন্তু তুমি কথা দাও, আমি যা করব সেটাতে তুমি না বলবে না। আমি একটু ঘুরে আসছি।

কোথায় যাচ্ছিস এখন?

সময় খুব কম আন্টি। একবার দয়াল সান্যাল চলে এলে সব ভেস্তে যেতে পারে। প্লিজ আমাকে একবার ঘুরে আসতে দাও।

সরোজ বক্সী অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন। যথারীতি স্পষ্ট করে কিছু বলে যেতে পারেননি কী উদ্দেশ্য নিয়ে শিপ্রার খোঁজ করতে এসেছিলেন। আলোচনাটার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য বাবলিকে ঘণ্টাখানেকের জন্য ওর মায়ের কাছে ঘুরে আসতে বলেছিলেন ক্যাথি। সেই সময়টা দু'ঘণ্টার ওপর গড়িয়ে গেছে। ক্যাথির বিষয়টা খেয়ালই নেই। শুধু শিপ্রাকে বললেন, একা যাস না, বাবলিকেও সঙ্গে নিয়ে যা।

শিপ্রা দ্রুত পোশাক পালটে বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে দেখল বাবলি তখনও ফেরেনি। শিপ্রার এখন মনে হচ্ছে প্রতিটা মুহূর্ত অমূল্য। যে-কোনও সময়ে ঝড়ের মতো হাজির হয়ে যেতে পারে দয়াল সান্যাল। বাবলি যে এখনও বাড়ি ফেরেনি সেটা আর ক্যাথির কান পর্যন্ত তুলল না। বাড়ির বাইরে এসে ব্যাগ থেকে কর্নেল সামন্তর ঠিকানা লেখা চিরকুটটা বার করে একটা রিকশা ধরল।

রিকশাটা রাস্তার মোড় পর্যন্ত পৌঁছোনোর আগেই চোখে পড়ল বাবলি দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে। পাশে সাইকেলটা গড়িয়ে পায়ে পায়ে হাঁটছে তপাই। নিজের মনে দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে শিপ্রা গলা চড়াল, অ্যাই বাবলি!

তপাইয়ের সঙ্গে এভাবে বাড়ির বাইরে দিদির চোখে ধরা পড়ে যাবে এটা বাবলি স্বপ্নেও ভাবেনি। শিপ্রার গলা শুনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল। শিপ্রার নির্দেশে রিকশাওয়ালা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাবলি আরও দ্রুত পায়ে অপরাধীর মতো মুখ করে এগিয়ে এল শিপ্রার কাছে। ভেতরে আবার একটা ধুকপুকুনি শুরু হয়ে গেছে, এতক্ষণ বাড়ি ফেরেনি বলে দিদি কি তা হলে খুঁজতে বেরিয়েছিল?

রিকশার কাছে আসতেই শিপ্রা বলল, উঠে পড়ো।

বাধ্য মেয়ের মতো বাবলি রিকশাটায় উঠে পড়ল। তপাই তখনও দূরে হতবাকের মতো দাঁড়িয়ে।

দিদি কোনও কথা বলছে না, এটাতে বাবলির অস্বস্তি আরও বেড়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া রিকশাটা বাড়িমুখো নয়। কোথায় যাচ্ছে কিছু বুঝতে পারছে না বাবলি। সব কীরকম তালগোল পাকাচ্ছে তার।

কর্নেল সামন্তর বাড়ির সামনে এসে রিকশাটা দাঁড়াল। পাঁচিলের মাঝখানে ছোট্ট লোহার গেটে কর্নেল সামন্তর নামাঙ্কিত নেমপ্লেট দেখে বাবলি বুঝতে পারল কোথায় এসেছে তারা। কর্নেল সামন্তর বাড়িতে ওরও এই প্রথম আসা। কলিংবেল টিপতেই ভেতরে একটা কর্কশ আওয়াজ হল এবং সেই সঙ্গে কুকুরের গম্ভীর গর্জন। কুকুরকে খুব ভয় বাবলির। শিপ্রাকে ঢাল করে পিছনে দাঁড়াল। চাকরস্থানীয় একজন এসে দরজাটা খুলতেই শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, কর্নেল আছেন?

দরজাটা খোলায় কুকুরের গর্জনের আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হল।

চাকর দরজায় দাঁড়ানো মেয়ে দু'জনকে ভেতরে আসতে বললেও কুকুরের ভয়ে বাবলি কিছুতেই ভেতরে যেতে রাজি নয়। শিপ্রা মৃদু ধমকে উঠল, আঃ! বাবলি, বাড়ির পোষা কুকুর কখনও কামড়াবে না। ভেতরে চলো।

না দিদি, আমি বরং বাইরেই থাকি। তুমি ভেতরে যাও।

এই টানাপড়েনের মধ্যেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেল সামন্ত। অপ্রত্যাশিত অতিথিদের দেখে অবাক হলেও দ্রুত সেই অভিব্যক্তিটা লুকিয়ে ফেলে উদাত্ত গলায় বলে উঠলেন, আসুন, আসুন, হোয়াট আ সারপ্রাইজ! বিশ্বাস করবেন, আজ সকালেই এই বোকা মেয়েটার কথা বারবার চিন্তা করছিলাম।

শিপ্রা মিষ্টি হেসে বলল, সত্যিই বোকা মেয়ে। ভাবছে, আপনার কুকুরটা এখনই এসে কামড়ে দেবে।

কে, সুলতান? তিন বছর বয়স হয়ে গেল, ছেলেটা এখনও শিখলই না কামড়ানো কাকে বলে। আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।

কর্নেল সামন্তর উপস্থিতিতেও বাবলির ভয় পুরোপুরি কাটল না। শিপ্রার কোল ঘেঁষে বসল। কর্নেল সামন্ত বাবলির পিছনে লাগা ছাড়লেন না।

কী বোকা মেয়ে, কী হল বলো তো! ব্যারাকপুরে একটাও বোম পড়ল না আর ওদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি জিততে চলল। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কর্নেল সামন্ত এবার শিপ্রার দিকে চেয়ে আক্ষেপের একটা সুরে বললেন, দশ মিনিট আগে যদি আসতেন একটা দারুণ জিনিস দেখাতাম। কর্নেল চহ্বান এসেছিলেন। উনিই নিয়ে এসেছিলেন। ইন্ডিয়ান আর্মি আকাশ থেকে লিফলেট ছড়াচ্ছে, তাতে পাক আর্মিকে সারেন্ডার করতে বলছে। সেই লিফলেট দেখাতাম আপনাকে।

শিপ্রা ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, আর ক'দিন এই যুদ্ধ চলবে কর্নেল?

আমার তো মনে হয় ইস্টার্ন ফ্রন্টে আর ম্যাক্সিমাম টু ডেজ। পাকিস্তান এয়ার স্ট্রিপগুলোকে তো ইন্ডিয়া প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ইন্ডিয়ান প্যারাট্রুপাররা যেখানে নামছে, গ্রামগঞ্জের লোকেরা তাদের বীরের সম্মান দিচ্ছে। তার ওপর শোনেননি কাল কী হয়েছে?

শিপ্রার যুদ্ধের খবরে কোনও আগ্রহ নেই। যুদ্ধ মানেই মৃত্যু। এক পক্ষের মানুষের মৃত্যুতে আর এক পক্ষের মানুষের উল্লাস। ক্যাথি আন্টির বাড়িতে খবরের কাগজের পাতা উলটেও দেখে না শিপ্রা। এখন নিজের তাগিদে কর্নেল সামন্তর বাড়িতে এসে বাধ্য হয়ে এসব কথা শুনতে হচ্ছে।

যুদ্ধের খবরে যে কারও অনাগ্রহ থাকতে পারে, এটা কর্নেল সামন্তর কল্পনাতেও আসে না। জমিয়ে উনি বলতে আরম্ভ করলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জানা গল্পটা।

মুক্তি বাহিনীর কাছ থেকে আমাদের এয়ারফোর্স খবর পেয়েছিল যে, ঢাকার গভর্নর হাউসে চোদ্দো তারিখ সকালে একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট মিটিং হবে। তা আমরা কী করলাম? গুয়াহাটি থেকে টোয়েন্টি এইট স্কোয়াড্রনের চারটে মিগ টোয়েন্টি ওয়ান পাঠিয়ে দিলাম। তারা সোজা গিয়ে গভর্নর হাউসকে তাক করে একটার পর একটা নিখুঁত রকেট চার্জ করতে লাগল। গভর্নর তো ঘাবড়ে টাবড়ে গিয়ে প্রাণ নিয়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে পালিয়ে এসে ইউএন ফ্ল্যাগের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এই যখন অবস্থা তখন বুঝতেই পারছেন এই যুদ্ধ আর ক'দিন চলতে পারে...।

শিপ্রা দেখল যুদ্ধের গল্পে মশগুল মানুষটাকে থামাতে হবে। না হলে এ গল্প চলতেই থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সঙ্গে আবার রাজযোটকের মতো আছে বাবলি। যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহে যার কোনও খামতি নেই। বাধ্য হয়েই শিপ্রা প্রসঙ্গটা ঘোরাল।

কর্নেল আপনার কাছে এসেছিলাম একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে।

কর্নেল সামন্ত মেজাজটাকে ধরে রেখেই বললেন, রিকোয়েস্ট ফ্রম আ বিউটিফুল ওম্যান! তা হলে তো রাখতেই হবে। তার আগে বলুন, হোয়াট ক্যান আই অফার ইউ? টি, কফি, জুস অর এলস।

থ্যাঙ্কস। চা-ই ঠিক আছে।

কর্নেল সামন্ত হাঁক দিয়ে চায়ের আর্জি জানিয়ে বললেন, ওয়েল, বলুন ম্যাডাম। কী আপনার রিকোয়েস্ট?

শিপ্রা একটু থেমে বলল, কর্নেল আপনার যে-বাড়িটাতে ক্যাথি আন্টি আছেন, আপনি ওটা বিক্রি করবেন?

কর্নেল সামন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। একদৃষ্টে শিপ্রার দিকে একটুখানি তাকিয়ে বললেন, কে বলল আপনাকে আমি ওই বাড়িটা বিক্রি করতে চাই?

শিপ্রা নিজের সপ্রতিভতাটা বজায় রেখে বলার চেষ্টা করল, না কেউ বলেনি। আসলে প্রয়োজনটা আমার। ক্যাথি আন্টিকে আমি বাড়িটা কিনে দিতে চাই।

শিপ্রা একবার ঘুরে বাবলির দিকে তাকাল। মেয়েটা অবাক হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে।

হঠাৎ আমার বাড়িটাই কেন? কর্নেল সামন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

না, সেভাবে আপনার বাড়ি বলে আলাদা করে কিছু নেই। শেষ বয়সে ক্যাথি আন্টি এসে এই বাড়িটায় এরকম সেট হয়ে গেছে। ভীষণ ভালবেসেছে এই জায়গাটা, বাড়িটা। আসলে কী জানেন, আমার মা আর আন্টি ছোটবেলা থেকেই একটা স্বপ্ন দেখত। শেষ বয়সে একটা বাড়ি কিনে দু'জনে একসঙ্গে থাকবে। এটা একটা ইমোশন। মা নেই তো আজ! আপনাকে বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারব না।

আমি আপনার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পারছি। প্রবাবলি ইউ হ্যাভ প্লেন্টি। মায়ের বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসে দেখলেন উনি ভাড়াবাড়িতে আছেন আর আপনার মনে হল টুক করে বাড়িটা কিনে দিই। বিকজ ইউ হ্যাভ প্লেন্টি।

না, ঠিক তা নয়।

আমার ইমোশনটা কী জানেন? আমার দুই পুত্র। ওদের গ্রোয়িং আপ স্টেজের সময় আমি বম্বেতে ছিলাম। বম্বেকেই ওরা জন্মভূমি মনে করে। ওখানেই সেট্‌ল করে গেছে। দে লস্ট দেয়ার মাদার.দেয়ার। তবু আমি এই ব্যারাকপুরে দুই ছেলের জন্য দুটো প্রপার্টি কিনে রেখেছি। জানি; কোনওদিন ওরা এখানে এসে সেট্‌ল করবে না। তবু ভেতরে কোথায় যেন একটা আশা আছে। কোনওদিন হয়তো ওরা আসবে। সরি ম্যাডাম। আমার ইমোশনকে আমি বিক্রি করতে পারব না।

আই অ্যাম সরি কর্নেল।

শিপ্রা উঠে দাঁড়াল। কর্নেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আরে আপনি উঠলেন কেন? শুধু কি এইটুকুই কথা ছিল আপনার সঙ্গে? আসুন আপনাকে আর এই বোকা মেয়েটাকে কিছু ওয়ার মেমেন্টোস দেখাই।

শিপ্রা কবজি উলটে ঘড়িতে সময় দেখে বলল, একটু তাড়া ছিল আজ। পরে না হয় একদিন আসব বাবলিকে নিয়ে। ইফ ইউ প্লিজ অ্যালাউ আস।

কর্নেল একটা ম্লান হাসলেন, আপনি একটা আশা নিয়ে এসেছিলেন। আপনাকে বোধহয় খুব হতাশ করলাম। তাই না?

ওমা! আমিই তো বোধহয় একটা অন্যায় প্রোপোজাল নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। শিপ্রার সঙ্গে দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, ইন্ডিয়ান আর্মিতে সবচেয়ে বড় শিক্ষাটা কী, জানেন? মহিলাদের সম্মান করা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, মিসেস গোমস নিজের থেকে চলে যেতে না চাইলে আমি কোনওদিনই ওঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলব না। আপনি ওঁকে বলে দেবেন বাড়ির মালিক যেই হোক, উনি যেন এটা নিজের বাড়িই ভাবেন।

কর্নেল সামন্তর শেষ কথাগুলো শুনে আবেগমথিত গলায় শিপ্রা বলে উঠল, থ্যাঙ্ক ইউ কর্নেল।

কর্নেল সামন্তর বাড়ি থেকে বেরিয়েই রিকশা পাওয়া গেল না। বাবলির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে শিপ্রা লক্ষ করল বাবলির মন খুশিখুশি। সেটার কারণ তপাই, না ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পূর্ববঙ্গ জয়ের আশু সম্ভাবনা, সেটা বুঝতে পারল না শিপ্রা। হাঁটতে হাঁটতে শিপ্রা বলল, বাবলি, তোমাকে আজকে এখানে নিয়ে না এলেও পারতাম। কিন্তু নিয়ে এলাম কেন জানো তো? আমার মনে হল বাড়ির মেয়ের মতোই তুমি যখন আন্টির কাছে আছ, একটু একটু করে কিছু জিনিস তোমার জানা দরকার। বোঝা দরকার। যা শুনছ সেটা শুধু নিজের মধ্যে রাখা দরকার। হয়তো কালকেই আন্টির সম্পর্কে বা আমার সম্পর্কে বাইরের কারও কাছ থেকে দুম করে কিছু শুনবে। শুনলেই সেটা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করবে, যে-মানুষগুলোর সম্পর্কে কথা শুনছ আদপে সেই মানুষগুলো কেমন, ভাল না খারাপ।

দিদির এই শক্ত শক্ত কথাগুলো মাথায় ঢুকছিল না বাবলির। মাথায় শুধু একটাই কথা ঘুরছে—তপাইদা কী বলেছে। তপাইদা বলেছে দিদি গঙ্গার ওপারে এক মস্ত সুতো কলের মালিক। আর দিদির যে সত্যিই অনেক টাকা তার প্রমাণ নিজের চোখে এখনই দেখেছে। আস্ত একটা দোতলা বাড়িই কিনে নিতে চাইছিল।

দিদি আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে, তার কোনওটাই কানে ঢুকছে না বাবলির। ভেতরে শুধু গুড়গুড় করছে একটাই কথা, যেটা হাজার চেষ্টা করেও মুখে আনতে পারছে না। যদি তপাইদার একটা চাকরির ব্যবস্থা হয় দিদিদের মস্ত কারখানাটায়...।

সরোজ বক্সী দয়াল সান্যালকে বললেন, ম্যাডাম ব্যারাকপুরে ক্যাথি গোমসের বাড়িতে আছেন।

ক্যাথি গোমস, মানে সেই ক্যাথি গোমস! ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের?

হ্যাঁ স্যার, মার্থা মেমসাহেবের সঙ্গে যিনি থাকতেন।

দয়াল সান্যাল হাসলেন, বুড়ি এখন ব্যারাকপুরে দোকান খুলে বসেছে! রক্তের টান যাবে কোথায়। শিপ্রাও তার উপযুক্ত জায়গাতেই গিয়ে বসেছে। ঠিক আছে, থাকুক ওখানে আলো করে। খদ্দেরপত্তর কিছু দেখলে নাকি?

নিজের স্ত্রীর সম্পর্কে এরকম অসম্মানসূচক উক্তি নিজেরই সামান্য এক বেতনভুক্ কর্মচারীর সামনে করে কোনও বিকার হল না দয়াল সান্যালের। বরং মন্তব্যটা নিজেই উপভোগ করে আরও জাঁকিয়ে চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা তুলে বললেন, তা কী বলল তোমার ম্যাডাম? এখানে আর ফিরে আসতে চায় না, তাই তো?

সরোজ বক্সী আগেই মাটির দিকে মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিলেন। দয়াল সান্যালের প্রশ্নের কোনও উত্তর তাঁর কাছে নেই, এটা ওঁর শরীরের ভাষা বলে দিচ্ছে। দয়াল সান্যাল একতরফাই বলে যাচ্ছেন।

গুছিয়ে ফেলো সরোজ, গুছিয়ে ফেলো। সময় কম। প্রচুর কাজ। মারোয়াড়িদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই ব্যবসাটায় যুঝতে হচ্ছে। প্রত্যেক মুহূর্তে নতুন নতুন কৌশল বার করতে হচ্ছে। শিপ্রা যদি ফিরে আসে, আসবে। যদি ফিরে না আসে, তা হলে ও নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। বাজে সময় নষ্ট। তোমার সঙ্গে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা আছে।

দয়াল সান্যালের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তার একটা হল, গুরুত্বপূর্ণ কোনও একান্ত বৈঠকেও উনি অধস্তন বেতনভুক্ কোনও কর্মচারীকে বসতে বলেন না। সে ম্যানেজার শীতল ভট্টাচার্যই হোক বা সরোজ বক্সীর মতো একান্ত অনুগতই হোক। টেবিলের ওপর রাখা কাচের গ্লাস থেকে ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে দয়াল সান্যাল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন।

যুদ্ধটা চিরকালই একটা সুযোগ, বুঝলে সরোজ। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু বুদ্ধিমান লোক স্রেফ লোহালক্কড়ের ব্যাবসা করে সাত পুরুষের সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে। আমেরিকা আর রাশিয়া মিলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর করবে কিনা জানি না, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগটা আমাদের পুরোপুরি নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গেও এই রাষ্ট্রপতি শাসন অনন্তকাল ধরে চলবে না। এরপর নিশ্চয়ই ভোট হবে। কোনও একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসবে। তা হলে কী দাঁড়াবে? পশ্চিমবঙ্গে একটা স্থায়ী সরকার আর যুদ্ধটা জিতে গেলে পাশেই একটা বন্ধু রাষ্ট্র। নতুন রাষ্ট্র। দুটো মিলেমিশে আমাদের এক অপূর্ব সুযোগ। এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের কারখানার প্রোডাকশনটাকে আরও অনেক বাড়িয়ে নিতে হবে। নতুন নতুন আরও

মেশিনপত্তর আনতে হবে। আরও জমি চাই। কোন জমিটার কথা আমি বলছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ সরোজ। ওই জমিটা আমার চাই-ই-চাই।

সরোজ বক্সী দ্রুত বুঝে ফেললেন দয়াল সান্যাল কী বলতে চলেছেন এবার। একই পুরনো কথা। হরিতলা কটন মিলের তিন দিকেই জনবসতি। পিছনটায় হরির ঝিল আর আছে শিপ্রা সান্যালের দু'একর জমি। এই দু'একর জমিটা চাই। সেই সঙ্গে হরির ঝিলের খানিকটাও বুজিয়ে ফেলতে চান। লোকটার মাথায় অদ্ভুত সব খেয়াল আসে। তবে বিপদ হল, যে-খেয়ালটা আসে সেটা কোনও যুক্তি দিয়েই কাটানো যায় না, আবার প্রকৃতির নিয়মে ভুলেও যান না। একরোখা খেয়ালটা সম্মোহিত করে রাখে ওঁকে।

মাস ছয়েক আগে যখন পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের নামগন্ধও ছিল না, তখন প্রথম মাথায় এসেছিল এই খেয়ালটা। কটন মিলটা এই জায়গাতেই আরও বাড়িয়ে নিতে হবে। ছ'মাস আগে সরোজ বক্সী বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন—বাড়াতেই যদি হয় তা হলে হরির ঝিল বোজানো কেন? এতে খরচ আর ঝঞ্ঝাট দুটোই বেশি। তার চেয়ে কাছেপিঠে কোনও খালি জায়গা দেখে নিলেই হয়। কিন্তু ওই যে একবগ্গা স্বভাব! হরির ঝিল চাই তো হরির ঝিলই চাই।

এই সিদ্ধান্ত দয়াল সান্যালের দাম্পত্য জীবনে শেষ পেরেকটাই শুধু পুঁতে দেয়নি, শুরু করে দিয়েছে আর এক যুদ্ধের। শিপ্রা সান্যাল মনে করে হরির ঝিল তার মায়ের আত্মার শান্তিস্থল। সেই শান্তি চিরায়ত হয়ে থাকবে পাখিদের কলরবে। কোনও মূল্যেই সেই শান্তিকে বিঘ্নিত হতে দেবে না। উভয়ের এই যুদ্ধের মাঝে শুধু ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হচ্ছে ওঁদের ছোট্ট ছেলেটা।

বিট্টুর কথা মনে পড়তেই আর একটা কথা মনে পড়ে গেল সরোজ বক্সীর। এই খবরটা দয়াল সান্যালকে দেওয়া হয়নি। দয়াল সান্যালের হরির ঝিল অধিগ্রহণ পরিকল্পনার বক্তৃতা শেষ হতেই প্রথম সুযোগে সরোজ বক্সী বলে উঠলেন, স্যার, বিট্টুবাবার হস্টেলের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। এত ছোট বয়সে দুন স্কুলে নেয় না। অন্যান্য ভাল বোর্ডিং স্কুলও একই কথা বলছে। শুধুমাত্র... মানে আপাতত, একটা স্কুলেরই সন্ধান পেয়েছি... কার্শিয়াং-এ।

কথাটা প্রায় লুফে নিলেন দয়াল সান্যাল। দারুণ হবে এটা, একদম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। কার্শিয়াং-এ শিপ্রা না বলতে পারবে না। চোখদুটো চকচক করে উঠল দয়াল সান্যালের।

কার্শিয়াং? কার্শিয়াং-এ তো কোন একটা মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে শিপ্রাও পড়ত। ছেলেটা বড় হচ্ছে। ওকে ওর মায়ের থেকে দূরে রাখা খুবই দরকার সরোজ। তুমি দেরি কোরো না, দরকার হলে কালই চলে যাও কার্শিয়াং-এ। একদম পাকা ব্যবস্থা করে এসো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিট্টুকে পাঠিয়ে দেব কার্শিয়াং-এ।

স্যার, এখন তো স্কুলে শীতের ছুটি চলছে।

আঃ, সরোজ! সব কিছুতেই তুমি নিজের বুদ্ধি একটু বেশি লাগাও। শীতের ছুটি মানে কী? ছেলেপুলেদের ছুটি। গোটা স্কুলবাড়িটা ফাঁকা হয়ে গেছে নাকি? অন্তত গেটে

একটা দারোয়ান তো আছে। যাও, তার কাছে গিয়েই খোঁজ করে এসো কত তাড়াতাড়ি বিট্টুকে ওখানে ভরতি করে দেওয়া যায়।

. দয়াল সান্যালের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সরোজ ৲ ী। একজন হৃদয়হীন বাবার খেয়ালিপনার জন্য ছোট্ট ছেলেটার অনাথ অবস্থার কথা ভেবে বুকের ভেতরটা টনটন করছিল। একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছেন সরোজ বক্সী। বছর আড়াইয়ের একটা মেয়ে রয়েছে তাঁর। পিতৃত্বের যে-স্বাদ প্রতিদিন সেই সন্তান দেয়, কিছুতেই তিনি মেলাতে পারেন না দয়াল সান্যাল কী করে যেচে সেই স্বাদ দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন।

পূর্ব পাকিস্তানের পতন হল। জন্ম হল নতুন দেশের। সে-দেশের নাম বাংলাদেশ। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বেরোল ছবি—পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ চুক্তি সই করছেন ভারতীয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধীও দেশের পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন। উপমহাদেশে নেমে এল শান্তি। এই শান্তি দয়াল সান্যালকে প্রভাবিত করল তাঁর ব্যাবসা আরও শিখরে ওঠানোর জন্য, আবার বাবলির মতো ষোড়শীকে নিজের স্বাধীন দেশে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাল। যদিও সময়ের সঙ্গে দু'জনের স্বপ্নের দিশা মোড় নিয়েছিল অন্যভাবে, তারা এগিয়েছিল নিয়তিনির্দিষ্ট পথে। সময় শুধু এগিয়েছিল নিজের নিয়মে, ক্যাথির উলবোনা কাঁটায় একটা-একটা লাল উলের ফাঁস এগিয়ে যাওয়ার মতো।

বুক-পিঠ দু'জোড়াই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। একটা বিট্টুর, অন্যটা রবার্টের ছেলে জিমির। নিপুণ হাতে ছুঁচ চালিয়ে বুক-পিঠগুলো জোড়া লাগিয়ে প্রসন্ন হেসে ক্যাথি বললেন, কী রে শ্যারন, হল তো শেষ পর্যন্ত? তুই তো ভাবছিলি একটাই শেষ হবে না। আজ কত তারিখ?

উনিশ।

শিপ্রা আলতো করে সোয়েটার দুটোর ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, পাক্কা ছ'দিন দেরি আছে ক্রিসমাসের। এর মধ্যে টুপি দুটোও হয়ে যাবে। আর চার গোলা উল পেয়ে গেলে মাফলারও হয়ে যাবে। তোমার হাত যা ফাস্ট আন্টি!

বাবলি আবদার করে বলে উঠল, টুপির মাথার ওপর সাদা বরফের ফুলগুলো আমি তৈরি করব। আমাকে দাও, আমি এখনই করে দিচ্ছি।

শিপ্রা হেসে বলল, সে না হয় হবে, কিন্তু বাবলি প্লিজ, এখন এক কাপ চা খেতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। তারপর তোমার ভাইপোদের জন্য টুপির মাথার সাদা ফুলগুলো বানিয়ো।

বাবলি খুশি হয়ে রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর ক্যাথি গালে হাত দিয়ে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন শ্যারন, আমি একটা কথা দু'দিন ধরে ভাবছি। ক্রিসমাসে তুই দয়ালকে এ-বাড়িতে আসতে বল। আমিও বিট্টুসোনাকে দেখি, ছোট্ট সান্তাটাকে টুকটুকে লালে কেমন লাগে। তারপর তোরা সবাই মিলে ফিরে যা। সংসারটাই তো তোর আসল জায়গা। আমি তো রইলামই। যখন খুশি চলে আসিস।

শিপ্রা দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল, তুমি ওকে চেনোনি আন্টি। আমি চাইলে দয়াল সান্যাল কখনওই আমাকে নিতে আসবে না।

ক্যাথি মৃদু ধমকে উঠলেন, তুই বোধহয় সবেতেই একটু বাড়াবাড়ি ভাবছিস শ্যারন। যেদিন সরোজবাবু এল, তুই বললি এবার যে-কোনও মুহূর্তে দয়াল চলে আসবে, তুলকালাম করে দিয়ে যাবে। দয়াল দূরে থাক, সরোজবাবুও কি আর দ্বিতীয়বার এল? আসলে মানুষ যেমনই হোক, প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব মান-অভিমান আছে। এটা তো অস্বীকার করতে পারবি না যে তুই দয়ালকে কিছু না বলেই চলে এসেছিস!

ক্যাথির কথা শুনতে শুনতে শিপ্রা মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। একটা ফিসফিসে গলায় বলল, তোমারও খুব অভিমান হয়েছিল, তাই না আন্টি?

কীসের অভিমান?

এই যে আমি বিয়ের পরে তোমার একবারও কোনও খোঁজ করার চেষ্টা করিনি।

না রে, কোনও অভিমান হয়নি। কারণ এটা তো তোর ইচ্ছেয় হয়নি। মার্থাও চায়নি। আমি জানি দয়াল হয়তো আমাকে পছন্দ করে না। ঘৃণা করে। তবে আমি তো আমার জন্য আসতে বলছি না। তোর জন্যই বলছি...।

ওর এখানে আসার দরকার নেই। আমি নিজে এসেছি, নিজেই চলে যেতে পারব।

দরকার আছে শ্যারন। তুই একবার দয়ালকে বলেই দেখ না।

ক্যাথির পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত শিপ্রা রাজি হয়েছিল। তবে শক্তির মনিহারি দোকান থেকে হরিতলা কটন মিলে যোগাযোগ করতে পারেনি। ফোনে অবশ্য ধরতে পেরেছিল কলকাতার বাড়ি। খবরটুকু পৌঁছে দিয়েছিল যে, সে দয়াল সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

যে-যুদ্ধের বোমা পড়ার শঙ্কা নিয়ে আর নকশালদের কোপের থেকে নিজেকে আড়ালে রাখতে ছেলেকে নিয়ে দয়াল সান্যাল কলকাতা ছেড়ে হরিতলায় গিয়েছিলেন তার প্রথম কারণটা সম্পূর্ণ মিটে গিয়েছিল। দ্বিতীয় শঙ্কাটা থেকেও পুলিশ আশ্বস্ত করেছিল, নির্ভয়ে কলকাতায় ফিরে আসতে বলেছিল, তবুও দয়াল সান্যাল কলকাতায় ফিরে আসার খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। বরং রোজ সকালবেলায় ম্যাকার্থির বাংলোর দোতলা থেকে হরির ঝিলটা দেখতে দেখতে সেই সম্পত্তিটা করায়ত্ত করার নানারকম পরিকল্পনা করে মনে মনে একটা আরাম পেতেন।

কলকাতার বাড়ি থেকে খবরটা পেয়েছিলেন। শিপ্রা কথা বলতে চায়। দয়াল সান্যাল মনে মনে হেসেছিলেন। পাখির দুনিয়া দেখা হয়ে গেছে। পাখি এবার খাঁচায় ফিরে আসতে চায়।

সরোজ বক্সী যেদিন কার্শিয়াং থেকে বিট্টুর স্কুলের খবরাখবর নিয়ে ফিরে এলেন, সেদিনই দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীকে নির্দেশ দিলেন, যাও, তোমার ম্যাডামের তেজ শেষ হয়ে গেছে। ব্যারাকপুরে যাও। বাড়ি নিয়ে এসো।

ক্রিসমাসের দু'দিন আগে দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ক্যাথি কেক বানাতে বসলেন।

এবার কেকের পরিমাণটা বেশি। কেকটা ফেটিয়ে-ফেটিয়ে থকথকে করে নিয়ে প্রত্যেক বছরের মতো স্থানীয় একটা বেকারিতে গেলেন। ওরা বেক করে দেয়। বেক করা কেক থেকে যে-সুন্দর গন্ধটা উঠে আসে, সেটাই যেন ক্রিসমাসের শুরু।

ক্যাথি মনে মনে একটা হিসেব করে রেখেছেন। কালকে সকালের মধ্যে দয়াল সান্যাল যদি শ্যারনকে নিতে না আসে তা হলে উনি নিজেই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে শ্যারনকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। যে-ছোট্ট লাল সোয়েটার আর টুপিটা তৈরি হল সেটা একজন মা ক্রিসমাসের আগে তার ছেলের হাতে তুলে দেবে না, এটা হতে পারে না। যদি প্রয়োজন হয় শ্যারন ক্রিসমাসের পর আবার চলে আসবে।

কেক বেক করিয়ে বাবলিকে সঙ্গে করে নিয়ে ক্যাথি যখন মরা বিকেলে বাড়িতে ফিরছেন, তখনই দূর থেকে বাড়ির সামনেটা দেখে মন খুশিতে ভরে গেল। রাস্তা জুড়ে তখন দাঁড়িয়ে আছে মস্ত একটা গাড়ি।

রুমাল দিয়ে দ্রুত নিজের মুখের পরিচর্যা করে নিয়ে টানটান হয়ে উঠলেন ক্যাথি। বাড়ির দরজাটা খোলাই ছিল। কিন্তু ভেতরে ঢুকে একটু নিভে গেলেন। দয়াল সান্যাল কোথায়? সোফায় তো বসে আছে সরোজ বক্সী! তার উলটোদিকে শিপ্রা। মেয়েটাকে এক লহমা দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভেঙে পড়েছে।

কী হয়েছে শ্যারন? উদ্বিগ্ন হয়ে ক্যাথি জিজ্ঞেস করলেন।

শিপ্রার চোখ দুটো লাল। ধরা গলায় বলল, বিট্টু এখন কী করে জানো? এয়ারগান দিয়ে হরির ঝিলে পাখি মারে।

হরির ঝিল, পাখি, এগুলোর সঙ্গে মার্থা কোথায় যেন সমার্থক। ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন ক্যাথি। তারপর সরোজ বক্সীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মার্থা আপনাদের কী ক্ষতি করেছিল সরোজবাবু?

সরোজ বক্সীর মাথাটা ঝুলেই রয়েছে। মালিকের হুকুম ছিল, মালকিন যেন কর্মচারীর সঙ্গেই ফিরে আসে। কিন্তু মালকিনেরও জেদ কম নয়। কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না। তখন বাধ্য হয়ে তুরুপের তাসটা ব্যবহার করতে হয়েছিল।

ম্যাডাম, আপনি অন্তত বিট্টুবাবার জন্য ফিরে চলুন। আপনি বুঝতে পারছেন না কারখানার পরিবেশে ওর ব্যবহার কীরকম পালটে যাচ্ছে। না হলে হরির ঝিলের পাখিগুলোকে একটার পর একটা বন্দুক দিয়ে মারে?

চমকে উঠেছিল শিপ্রা। এর পর আর একটা কথাও বলেনি। দশ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে নিয়েছিল নিজের সুটকেস। তারপর বাইরের ঘরে এসে অপেক্ষা করছিল ক্যাথির ফিরে আসার জন্য।

বাইরের ঘরে দিদির সুটকেসটা দেখে দু'চোখ জলে ভরে গিয়েছিল বাবলিরও। দিদি যে এবার চলে যাবে, তার আন্দাজ পাচ্ছিল; তবে এরকম দুম করে চলে যাবে ভাবেনি।

ক্যাথি ইশারায় বাবলিকে ডাকলেন। ইঙ্গিতে একটা খবরের কাগজে কেকটা মুড়ে দিতে বললেন। ক্যাথিকে আর বাবলিকে জড়িয়ে ধরে শিপ্রা অনেকক্ষণ ঝরঝর করে কাঁদল। তারপর সূর্যের শেষ আলোটুকু শুষে নিয়ে চলে গেল।

নিয়তি যখন মানুষকে নিঃসঙ্গ করতে শুরু করে তখন চারদিক দিয়েই করে। শিপ্রা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই এল বাবলির মা। মুখে একটা খুশিখুশি ভাব। ক্যাথিকে বলল, দিদি, ভাল খবর আছে গো। শুনছি আমাদের দেশের সম্পত্তি নিয়ে সালিশি হবে। বাবলির বাবা বলছিল ওদেশের সম্পত্তি যদি নাও পাই, বদলে এদেশে সম্পত্তি পাব।

এনিমি প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ শব্দটা ক্যাথি শুনেছিলেন। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে সেটা কীভাবে হবে তাঁর মাথায় এল না। বাবলিরা তো ওদেশেরই লোক। সম্পত্তিও ওখানকার। তার বদলে ভারতে কীভাবে সম্পত্তি পাবে? প্রশ্নচিহ্নটা তুলে বাবলির মায়ের হাসিটা মিলিয়ে দিতে চাইলেন না। মুখে বললেন, ভালই তো।

সেই জন্যই এলাম দিদি। বাবলির বাবা খবর পেয়েছে বনগাঁর কাছে কী যেন একটা ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে যেতে হবে।

হ্যাঁ, ভাল করে খোঁজখবর করুন।

বাবলিকে তা হলে নিয়ে যাই দিদি? কাল ভোরে বাস। রাতটা আমার কাছেই থাকুক।

ক্যাথি অবাক হলেন, বাবলিকে নিয়ে যাবেন মানে? কোথায় নিয়ে যাবেন?

না, মানে ওর বাবা বলছিল ওখানে সপরিবারে যেতে হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ক্যাথি। কতরকম গুজব ছড়ায়। মানুষ বৃথা হয়রানিতে শেষ হয়ে যায়। তবুও মুখ ফুটে কিছু বললেন না। বাবলি ওদের সন্তান। সিদ্ধান্তও ওদের।

আপনি চিন্তা করবেন না দিদি, কাজ শেষ হয়ে গেলেই ফিরে আসব। বাবলিকে আপনার কাছেই রেখে যাব।

বাবলি চলে যাওয়ার পর কর্নেল সামন্তর বাড়িটা যেন একটা নিঝুমপুরী হয়ে গেল। নীচে বসার ঘরেই অন্ধকারে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থাকলেন ক্যাথি। তারপর ধীর পায়ে ওপরে এলেন। আলমারি থেকে হুইস্কির বোতলটা বার করে ছাদে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন জিমির লাল সোয়েটারটা।

বোতলটা আস্তে আস্তে শেষ হতে লাগল। ক্যাথির চোখ শুকনো। শক্ত মুঠোতে ধরা আছে সোয়েটারটা। ক্যাথি জানতেন রবার্ট কখনওই জিমিকে নিয়ে ক্রিসমাসে ওঁর কাছে আসবে না! ক্রিসমাসের সময়ই তো রেস্টুরেন্টে সবচেয়ে বেশি টিপ্‌স পায় রবার্ট। তবু এই কথাটা কাউকে বলেননি। আশা নিয়ে ফুটফুটে নাতির জন্য বুনে গেছেন একটার পর একটা লাল ঘর।

১৮

ক্যাথি গোমস বারবার শিপ্রাকে একটা কথা বলতেন। বিরহ মানুষকে শুদ্ধ করে। দেখিস শ্যারন, তুই যে এই দয়ালকে ছেড়ে এতদিন আছিস এটা এক দিকে ভালই হচ্ছে।

তোদের মধ্যে যে-প্রেমটা মরে রয়েছে, সেটা আবার বেঁচে উঠবে। সম্পর্কটা আবার ঠিক হয়ে যাবে।

কলকাতায় ফিরে এসে শিপ্রা কিন্তু দয়াল সান্যালের মধ্যে কোনও পরিবর্তনই দেখতে পেল না। শিপ্রা জানত দয়াল সান্যাল মানুষ হিসেবে কেমন। ক্যাথি যে-শুদ্ধির কথা বলতেন সেটা তাদেরই হয় যাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটা থাকে। যে-মানুষ নিজের ছেলেকে নিরীহ পরিযায়ী পাখিদের গুলি করে মারতে শেখায়, তার কোনও শুদ্ধি হওয়ার নয়।

মানুষটাকে এখন মনেপ্রাণে ঘেন্না করে শিপ্রা। শরীরের আকর্ষণ শূন্যে তো কোন কালে চলে গেছে। এখন দয়াল সান্যালকে দেখলে ভেতরে একটা ঘিনঘিনানি হয়। একটা সময় শিপ্রা স্বপ্ন দেখত ছেলের পরে একটা মেয়েরও মা হবে সে। দয়াল সান্যালের ঔরসে আর একবার গর্ভসঞ্চারকে এখন দুঃস্বপ্ন মনে হয়।

ব্যারাকপুর থেকে ফিরে আসার দিন গাড়িতে ছটফট করছিল শিপ্রা। কখনও মনে হয়েছিল ফিরে গিয়েই জীবনের কঠিনতম লড়াইটা দয়াল সান্যালের সঙ্গে লড়বে। কোন সাহসে হরির ঝিলের পাখি মারার শিক্ষা বিট্টুকে দিয়েছে তার জবাবদিহি চাইবে। তার পরিণতি যদি বিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়, গড়াবে। কিন্তু এর শেষ দেখবে। কখনও মনে হয়েছিল বিট্টুর হাত মুচকে দেবে। জবাবদিহি চাইবে, কেন এয়ারগান হাতে তুলে পাখিদের দিকে তাক করেছিল? এতদিন কি এই শিক্ষাই দিয়েছিল? তবে এগুলো ছিল সবই একাকিত্বে রাগের আস্ফালন। লম্বা রাস্তাটা পেরিয়ে আসতে আসতে সেই রাগ ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে ফিরেই হরিতলা কটন মিলে ফোন করেছিল শিপ্রা। দয়াল সান্যাল শিপ্রার ফোন ধরেননি। শিপ্রা সরোজ বক্সীকে বলেছিল, আপনার সাহেবকে বলে দিন কাল দুপুরের মধ্যে যদি বিট্টুকে কলকাতায় পাঠিয়ে না দেয়, আমি নিজেই চলে যাব বিট্টুকে আনতে। আর একবার যদি যাই, তার পরিণতির জন্য আপনার সাহেব যেন প্রস্তুত থাকে। কোনও স্থান-কাল-পাত্র আমি দেখব না।

বাইরে প্রকাশ না করলেও শিপ্রার কিছু কিছু জেদকে এখনও ভয় পান দয়াল সান্যাল। কোনও বিশ্বাস নেই। দুম করে চলে আসতেই পারে। তারপর সত্যিই স্থান-কাল-পাত্র বিচার না করেই হাজার ঝুটঝামেলা শুরু করে দিতে পারে। সেটা মহেশ, পলাশ, হরির ঝিল—যে কোনও কিছু হতে পারে। এবং প্রকাশ্যে। কর্মচারীদের মধ্যে।

টানা বেশ কয়েকদিন হরিতলায় পড়ে আছেন দয়াল সান্যাল। যুদ্ধের জন্য একটা ডামাডোল চলছিল। পশ্চিম ভারত থেকে তুলোর গাঁটের সাপ্লাই ঠিকমতো আসছিল না। তাই সুতোর প্রোডাকশনটাও ঠিকমতো কারখানা থেকে বার করা যাচ্ছিল না। যুদ্ধশেষে অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হতে শুরু হল। তাই শুধু শিপ্রার হুমকিতেই নয়, ব্যাবসার প্রয়োজনেও চব্বিশে ডিসেম্বর দয়াল সান্যাল ফিরে এলেন কলকাতায়।

বিট্টুকে ছাড়া ব্যারাকপুরে থাকা একরকম ছিল। কিন্তু কলকাতার বাড়িতে একা থাকাটা যে কতটা শূন্য, সেটা জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করল শিপ্রা। ব্যারাকপুরে

ক্যাথি ছিলেন, বাবলি ছিল। সুখ-দুঃখে, লাল উলের ঘর বুনতে বুনতে, ছাদে ক্যারলস গাইতে গাইতে সময় কেটে যেত। কলকাতায় তার কিচ্ছু ছিল না।

ক্রিসমাসের আগের দিন সকালবেলাতেই সরোজ বক্সী ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, দয়াল সান্যাল সেদিনই বিট্টুকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। ছেলের ফিরে আসার প্রতিটা মুহূর্ত গুনছিল শিপ্রা। সেই প্রতীক্ষায় কিছু খায়নি পর্যন্ত। বিছানায় খালি পেটে শুয়ে চোখে একটা তন্দ্রাও চলে এসেছিল।

মাম্মি!

চোখটা খুলে গেল শিপ্রার। বহু দূর থেকে ঘোরের মধ্যে যেন ডাকটা ভেসে এল। কোথা থেকে এল ডাকটা? ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল শিপ্রার। বিছানায় উঠে বসল। তারপরেই দরজার মুখে ভেসে উঠল বিট্টুর ছোট্ট শরীরটা।

চোখ দুটো ভিজে গিয়ে বিট্টু ক্রমশ ঝাপসা হতে লাগল। দু'হাত বাড়িয়ে দিল দরজার দিকে। নরম তুলতুলে শরীরটা এসে আছড়ে পড়ল দু'হাতের মধ্যে। যে-ছোট্ট হাত দুটোকে মচকে দেবে ভেবেছিল সেই কচি হাত দুটো পেঁচিয়ে ধরল ওর গলা।

বিট্টুকে বাড়িতে পৌঁছে দয়াল সান্যাল অফিসে এসে শুনলেন নির্মল চ্যাটার্জি সকাল থেকে তিনবার ফোন করেছেন। নির্মল চ্যাটার্জি একটা এক্সপোর্ট ফার্ম চালান। তবে সেটা লোক দেখানো। লোকটা আদপে একরকম দালাল। উঁচুমহলে যোগাযোগ প্রচুর। নির্মল চ্যাটার্জি দয়াল সান্যালের ঘনিষ্ঠ এবং নানারকম ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও সুলুকসন্ধান নিয়ে আসেন।

দয়াল সান্যাল ফোনে ধরতেই নির্মল চ্যাটার্জি একসঙ্গে অনেক অনুযোগের ঝাঁপি খুললেন।

কোথায় ছিলেন মশাই? ঠিক সময়েই আপনাকে পাওয়া যায় না। চাড্ডা কিন্তু আর জাস্ট দু'দিন কলকাতায় থাকবে।

চাড্ডা নামটা চট করে মনে পড়ল না দয়াল সান্যালের। চোখ বন্ধ করে ভাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, চাড্ডা কে?

ফোনে স্পষ্টত হতাশ শোনাল নির্মল চ্যাটার্জির গলা, আপনি চাড্ডাকে ভুলে গেলেন?

দয়াল সান্যাল আপ্রাণ মনে করার চেষ্টা করতে থাকলেন, চাড্ডা কে?

আপনার দ্বারা কিছু হবে না সান্যালমশাই। যারা আপনার লাইনে বিজনেস করে, তারা দিনে দু'বার চাড্ডার নাম জপ করে।

ইদানীং এটা হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ নাম ভুলে যাচ্ছেন দয়াল সান্যাল। অনেক সময় অফিসেরই কোনও কর্মীকে দেখে, হঠাৎ করে তার নামটা ভুলে যান। কিছুতেই মনে করতে পারেন না। হাজার একটা নাম মাথার ভেতর মাছির মতো ভনভন করে, শুধু লোকটার ঠিক নামটা ছাড়া। আবার অনেক সময় এরকম হয়, যেমন এখন চাড্ডার পরিচয়টা অনেক চেষ্টার পরেও কিছুতেই মনে করতে পারছেন না।

সুনীল চাড্ডা মশাই, দিল্লির সুনীল চাড্ডা। এবার মনে পড়ছে? এক্সপোর্ট লাইসেন্স...

মাথার মধ্যে অল্প একটা বিদ্যুতের চিড়িক। তারপর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল সুনীল চাড্ডার পরিচয়টা। নিজেই নির্মল চ্যাটার্জিকে কয়েক মাস ধরে পীড়াপীড়ি করে যাচ্ছেন সুনীল চাড্ডাকে ধরার জন্য। বিদেশ মন্ত্রকে সুনীল চাড্ডার অবাধ গতিবিধি। একটা এক্সপোর্ট লাইসেন্সের জন্য নির্মল চ্যাটার্জির মাধ্যমে বেশ কিছু টাকাও খরচ করেছেন দয়াল সান্যাল। তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামাল দিতে বললেন, আরে মশাই, চাড্ডাকে কি ভুলতে পারি? মানুষ আর ভগবানের মধ্যে যোগসূত্র। আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।

নির্মল চ্যাটার্জি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

এটা ঠাট্টা-ইয়ারকির সময় নয় সান্যালমশাই। সিরিয়াস ব্যাপার। চাড্ডা ইজ ইন টাউন। আপনার ব্যাপারটা এগোনো দরকার। সময় কম। চাড্ডার পিছনে কিন্তু লম্বা লাইন আছে।

না, না। আমিও সিরিয়াস। যা করার আপনি করুন। পার্ক স্ট্রিটে আজই ডিনারে ডাকুন ওঁকে।

পার্ক স্ট্রিট? নাক সিঁটকালেন নির্মল চ্যাটার্জি, মশাই, চাড্ডাকে কি আমার মতো এঁদো লোক পেয়েছেন যে পার্ক স্ট্রিটে দুটো পাতিয়ালা খাইয়ে কাজ সারবেন? চাড্ডার মতো লোকের বয়েই গেছে মশাই আপনার-আমার সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে বসে মাল খেতে। ক্লাস লোকদের জন্য ক্লাস অ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার। কলকাতার ক্লাবগুলো ভুলে যাচ্ছেন! যে-কোনও একটা ক্লাবে নিয়ে চলুন সান্যালমশাই।

ঠিক আছে, ব্যবস্থা করুন।

ব্যবস্থা তো করছি। কিন্তু আপনি একটা কথা বলুন তো, আপনি কবে একটা ক্লাবের মেম্বার হবেন? এভাবেই কি চিরকাল আমি অমুকের গেস্ট, তমুকের গেস্ট করে ক্লাবগুলোতে নিয়ে ঘুরে বেড়াব আপনাকে? কতবার ব্যবস্থা করে দিলাম...

দয়াল সান্যাল হেসে ফেললেন।

নাহ্। এবার ঠিক হয়ে যাব। আর একবার ব্যবস্থা করে দিন একটা।

করে তো আবার দিতে পারি মশাই। কিন্তু ক্লাব মেম্বারশিপের জন্য তো ফর্ম ভরতি করলেই হয় না। ক্লাবের কর্তারা আপনার সঙ্গে আপনার গিন্নির ইন্টারভিউ নেবেন। যাবেন তো দু'জনে? আগেও কিন্তু এই কারণেই হয়নি...

আগেও এই প্রশ্নটা দয়াল সান্যাল করেছিলেন। এবারও মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল, ক্লাব মেম্বারশিপ পেতে গেলে বউয়ের সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের কী প্রয়োজন? কিন্তু নির্মল চ্যাটার্জির প্রশ্নটার ইঙ্গিত চট করে ধরে ফেললেন। শিপ্রার সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক, শিপ্রার সাম্প্রতিক কার্যকলাপ আস্তে আস্তে লোক জানাজানি হচ্ছে! নির্মল চ্যাটার্জি কায়দা করে হয়তো এটাই ঘোড়ার মুখ থেকে জানতে চাইছেন।

দয়াল সান্যাল গলাটা গম্ভীর করে বললেন, দেখা যাবে।

নির্মল চ্যাটার্জি এমন ভাব করলেন যেন দয়াল সান্যালের এড়িয়ে যাওয়া ব্যাপারটা খেয়ালই করলেন না।

শুনুন, আর একটা দরকারি কথা। কালকে বড়দিন। আজ ক্রিসমাস ইভ। আজ সাহেব-সুবোরা ভেট পেয়ে থাকে। চাড্ডার জন্য কিন্তু একদম খালি হাতে আসবেন না।

চাড্ডার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে দয়াল সান্যালের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। তাই এই ব্যাপারটাও নির্মল চ্যাটার্জিকে দায়িত্ব দিতে চাইলেন।

মশাই, আপনাকে তো বলেই দিয়েছি, যা-যা করার আপনি করুন। আমাকে শুধু খরচটা বলুন। আমি শুধু লাইসেন্সের কাগজটা চাই।

নির্মল চ্যাটার্জি একটু ভেবে বললেন, ভাবছি লোকটাকে কী দেবেন। অদ্ভুত লোক মশাই। টাকার খাঁই প্রচুর। এর সঙ্গে একটু মেয়েমানুষের দোষ থাকলে সুবিধে হত। পিঙ্কিকে দিয়ে কাজটা তুলিয়ে নিতাম। এ মশাই শুনেছি আবার এসব ব্যাপারে নীতিবাগীশ। তবে সেটা ওপর ওপর লোক দেখানো কিনা জানি না। এরা তো মশাই গভীর জলের মাছ। এই মুহূর্তে দেওয়ার মতো জিনিস একটাই মাথায় আসছে। লোকটা তামাক খুব ভালবাসে। আপনার ওই অপদার্থটা, সরোজ, ওকে দিয়ে নিউ মার্কেটে একটু খোঁজ করান ভাল হাভানা চুরুট পাওয়া যায় কিনা।

নিউ মার্কেটের চরিত্রটা সব সময়ই আর দশটা জায়গার চেয়ে আলাদা। ক্রিসমাসের সময় সেটা আরও বদলে যায়। গোটা জায়গাটা সাজানো। ঢোকার মুখে বড়-ছোট ক্রিসমাস ট্রি, সান্তা ক্লজ। ক্রিসমাসের দিন সকালে মায়ের হাত ধরে অবাক হয়ে সবুজ সবুজ গাছগুলো দেখতে দেখতে নিউ মার্কেটের ভেতর ঢুকে পড়ল বিট্টু।

ভেতরটা যেন স্বপ্নপুরী! বিট্টুর মুখস্থ জায়গাটা। সোজা গিয়ে মধ্যে যে-গোল চত্বরটা আছে, সেখানে যে-কামানটা বসানো আছে, তার মুখটা যেদিকে, সেদিকে এগোলেই সার দিয়ে খেলনার দোকান। মায়ের সঙ্গে নিউ মার্কেটে খুব কমই আসা হয়, কিন্তু এলে মায়ের হাত ধরে টেনে একবার খেলনার দোকানগুলোর দিকে যায়ই বিট্টু। মা-ও আপত্তি করে না। বিট্টুর পছন্দের খেলনা কিনে দেয়।

অন্যান্য দিনের মতো আজও কামানের কাছটায় এসে মায়ের হাতটা দু'বার অল্প ঝাঁকিয়ে টানল বিট্টু। মা কিন্তু ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। বিট্টুর হাতটা চেপে ধরে উলটোদিকের দোকানগুলোর দিকে হাঁটতে থাকল।

চকচকে জামাকাপড়ের দোকানগুলো পেরিয়ে গেল। মিষ্টি গন্ধে ম-ম করছে কেকের গলিটাও। তারপর একদম পিছনের দিকে এসে একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল শিপ্রা। বিট্টু অবাক হয়ে দেখছিল, সেই খোলা দোকান ঘিরে রয়েছে অসংখ্য খাঁচা। খাঁচাগুলো ভরতি নানারকম পাখিতে। তাদের বিচিত্র কিচিরমিচির আওয়াজে সরগরম হয়ে আছে দোকানটা।

মেরি ক্রিসমাস দিদি। একজন মাঝবয়সি লোক অমায়িক হেসে এগিয়ে এল শিপ্রার দিকে। তারপর বিট্টুর দিকে চেয়ে বলল, আপনার ছেলে বুঝি?

শিপ্রা অল্প হেসে মাথাটা ঝাঁকাল। লোকটা ব্যস্ত হয়ে গলা চড়িয়ে একজন কর্মচারীকে বলল, আবদুল, মেমসাহেব আর রাজাবাবুর জন্য চা আর পেস্ট্রি নিয়ে আয়।

সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রা বাধা দিয়ে বলে উঠল, না, না রাজুবাবু, আর চা-টা বলবেন না।

তাই বললে হয় দিদি? আজ বড়দিন। আপনি রাজাবাবুকে নিয়ে এসেছেন।

লোকটা ড্রয়ার খুলে দু'টাকার একটা নোট বের করে আবদুলকে দিল। চারদিকে কিচিরমিচির আওয়াজ। তার মধ্যে বিচ্ছিরি একটা গন্ধ। বিট্টুর গা গুলিয়ে উঠছিল। এই পরিবেশটার জন্য বিট্টুর একটুও পাখিগুলোকে দেখতে ইচ্ছে করছিল না।

লোকটা কাউন্টার থেকে বেরিয়ে শিপ্রার কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনার বন্ধুগুলো লাগবে আজ?

শিপ্রা লোকটার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল। খানিকটা স্বগতোক্তি করে বলল, ইচ্ছে তো করে সবগুলোকেই...

লোকটার গলাটাও নরম হয়ে গেল, জানেন দিদি, এত বছর ব্যাবসা করছি, কিন্তু আপনার মতো কাস্টমার আর একজনও দেখিনি যিনি থোকা থোকা টাকা দিযে পাখি কিনে উড়িয়ে দেন। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলব দিদি? পাখিগুলোকে ছেড়ে দেওয়ার পর কী হয় জানেন? খাঁচায় এতদিন থেকে থেকে ওরা আর ঠিকমতো উডতে পারে না। তারপর কাকের ঠোক্কর খেয়ে অনেকেই মরে যায়।

শিপ্রার হঠাৎ করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। মা সারাজীবন শরীরের ব্যাবসা করে শেষকালে কেমন যেন একটা দার্শনিক হয়ে গিয়েছিল। শিপ্রাকে মাঝে মাঝে বলত, 'আমার মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় মেয়েগুলোকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিই। কিন্তু সমাজে ওরা কোথায় যাবে বল তো? কাকেরা ঠুকরে খাবে। একটা পুরুষমানুষও ঘরে নেবে না। জীবনে কত পুরুষমানুষকে দেখলাম বেশ্যাদের ভালবেসে হিরে-জহরত দিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা পুরুষমানুষকেও দেখলাম না, যে একটা মেয়েকে এক রাত তার শরীর না ছুঁয়ে একটা ঘুম উপহার দিল। বলল, আজ রাতটা তুমি শান্তির ঘুম ঘুমোও। তবু আমার মনে হয় সেই পুরুষমানুষটা আছে। আমি তার হয়তো দেখা পাইনি। আমার মেয়েগুলোকে পাখির মতো স্বাধীন করে দিলে কাকের ঠোক্কর খেতে খেতেও তারা ঠিক একদিন খুঁজে পাবে সেই পুরুষমানুষটাকে।'

লোকটা কথা বলতে যাচ্ছিল। শিপ্রা হাত তুলে লোকটাকে থামাল।

তার মানে, আপনি কি পাখিগুলোকে ছাড়েন না?

লোকটা জিভ কাটল, দিদি, বেইমানি করে ব্যাবসা করি না। আমি সেইরকম পাখির ব্যাবসাদার নই যারা চড়ুই পাখিকে রং করে রথের মেলায় বিদেশি মুনিয়া বলে বিক্রি করে। আমাকে কাস্টমাররা অনেক সময় বাড়ির ঠিকানা দেয়। খাঁচাসুদ্ধু পাখি বাড়িতে ডেলিভারি করি আমি। আপনার ক্ষেত্রে সেই ঠিকানাটা হল খোলা আকাশ। খোলা আকাশের দিকে পাখিগুলোকে ছেড়ে আমার নিজের কীরকম গর্ব হয় জানেন। ভেতরটা হালকা লাগে।

শিপ্রা হেসে মাথা নাড়ল, আমি জানি। তাই তো বিশ্বাস করে সবাইকে ছেড়ে আপনার কাছে আসি।

একটা কেটলিতে চা আর দুটো কাগজের প্লেটে দুটো কেক নিয়ে আবদুল এগিয়ে এল শিপ্রা আর বিটুর কাছে। বিটু একটা কাগজের প্লেট হাত বাড়িয়ে নিলেও শিপ্রা কিছুই নিল না। নিজের ব্যাগ খুলে কয়েকটা নোট বার করে লোকটার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, যতটা আছে দিয়ে গেলাম। আপনি তো জানেন, আঙুল তুলে আমি দেখাতে পারব না কাকে ছাড়বেন আর কাকে ছাড়বেন না। এই টাকায় যতটা হয় করুন।

আপাদমস্তক ঝানু পাখির ব্যবসায়ী হলেও লোকটা ইদানীং শিপ্রার কাছে টাকা নিয়ে মুখের ওপর গোনা ছেড়ে দিয়েছে। টেবিলের একদম নীচের ড্রয়ারে টাকাগুলো রেখে বলল, একটা সত্যি কথা আপনাকে বলছি দিদি, এই যে আপনি মাঝে মাঝে এসে আমাকে যে-কাজটা করতে দিয়ে যান, কাজটা করতে গিয়ে আমার ভেতর কেমন একটা ইয়ে হয়। মনে হয়, এই পাখি বিক্রির কাজটা কীরকম যেন পাপের।

শিপ্রা মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনি এরকম ভাবছেন কেন? এটা তো আপনার ব্যাবসা। আপনি তো লোকঠকানো ব্যাবসা করেন না। নিষ্ঠার সঙ্গেই ব্যাবসাটা করেন। বরং ব্যাবসার বাইরে আপনি পাখিগুলোকে ভালওবাসেন। তাদের ভাল বাড়িতে পাঠাতে চান যেখানে তাদের যত্ন হবে। কাকের ঠোক্কর খেতে দেখলে আপনার বুকের ভেতর কষ্ট হয়। আপনার হৃদয় আছে। আপনার কোনও পাপবোধ হওয়াই উচিত নয়।

আর একটা কথা বলব দিদি, আপনি একটা পাখিকে বাড়িতে রাখুন। খাঁচার দরজা খুলেই রাখুন। দেখবেন, পাখিটা কোথাও উড়ে যাবে না। আপনার মায়ায় বাঁধা পড়েই থাকবে।

শিপ্রা দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল।

না, মায়া চাই না আমি। চাই না কেউ মায়ায় বাঁধা পড়ে খাঁচাবন্দি হয়েই থাকুক। মায়াও একরকম তালা, দাদা।

বিটু ছটফট করছিল। এই বাজে গন্ধটার মধ্যে মায়ের সঙ্গে দোকানদার লোকটার কথাবার্তার কিছুই মানে বুঝতে পারছিল না। অধৈর্য হয়ে শেষকালে মায়ের শাড়ির আঁচলটা টেনেই ফেলল। বিটুর মাথায় আলতো করে হাত ছুঁইয়ে শিপ্রা বলল, দাদা, ছেলেকে আজ নিয়ে এলাম পাখি চেনাব বলে। না হলে পাখিদের জন্য ওর ভালবাসা জন্মাবে না।

দোকানদার লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পাখি দেখবে বাবু? এসো, তোমাকে দেখাচ্ছি। ইস্, দু'দিন আগে যদি তুমি আসতে তোমাকে একটা দারুণ কাকাতুয়া দেখাতাম। একটু একটু মানুষের মতো কথা বলতে শিখেছিল। বিক্রি হয়ে গেছে। তবে তোমাকে আর একটা ভাল পাখি দেখাই চলো।

খাঁচার ওপর খাঁচা। সামনে খাঁচা। পিছনে খাঁচা। দ্রুত হাতে কয়েকটা খাঁচা সরিয়ে তলার দিক থেকে একটা খাঁচা বার করে একটা খালি টেবিলের ওপর রাখল লোকটা। ভেতরে একটা সবজেটে পাখি। অনেকটা টিয়াপাখির মতো দেখতে। লোকটা পাখিটাকে দেখিয়ে বলল, দেখো, এটা চন্দনা। কাকাতুয়ার মতো মানুষের গলায় কথা বলতে না পারলেও এরাও খানিকটা মানুষের মতো কথা বলতে শিখে যায়।

মানুষের মতো কথা? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল বিট্টু।

পাখিটা চুপচাপই আছে। মানুষের মতো কথা দূরে থাক, কোনও পাখির ডাকও ডাকছে না। মাঝেমধ্যে ডানা ঝাপটাচ্ছে। তখন বোঝা যাচ্ছে ডানায় লাল ছোপ আছে।

কই, মানুষের মতো কথা বলছে না তো?

এ এখনও ছোট আছে। সেরকম কথা শেখেনি। ওদের কথা শেখাতে হয়। চলো, তোমাকে আরও পাখি দেখাই।

শিপ্রা বিট্টুর কানের কাছে মাথাটা নামিয়ে এনে বলল, দেখ বিট্টু, পাখিদের চোখগুলো দেখ।

বিট্টু পাখিটার·চোখের দিকে চাইল। কিন্তু পাখিটার চাহনিটা ঠিক বুঝতে পারল না। ওর দিকে চেয়ে আছে কি? চোখটা মাঝে মাঝে কীরকম পিটপিট করছে।

লোকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিট্টুকে নানা রঙের মুনিয়া দেখাতে থাকল। পাখিগুলোর নাম বলতে থাকল মৌটুসি, ফুলটুসি, বুলবুলি। শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে মিটুয়া আছে দাদা?

মিটুয়া! না দিদি, মিটুয়াকে ঠিক খাঁচায় রেখে বাঁচানো যায় না।

বিট্টুর নামটা চেনা চেনা লাগল। মা কালকে রাতেই জিজ্ঞেস করেছিল হরির ঝিলে কী পাখি মেরেছিল ও। বিট্টু এয়ারগান দিয়ে পাখি মেরেছে শুনলে মা ভীষণ রেগে যাবে, এটাই বিট্টু ভেবেছিল। মা যে পাখি খুব ভালবাসে! সেই মা পাখি শিকারেব বর্ণনা শুনতে চাইতে ভয় ভুলে বিট্টু খুব উৎসাহ পেয়ে তার গল্প শুরু করেছিল।

জানো তো মাম্মি, ওই বড় পুকুরটার মধ্যে যে-গাছটা আছে, সেখানে একদিন সকালে একটা পাখি ডাকছিল টিউ-টিউ করে। জানো তো মাম্মি, একবার ডেকেই আর ডাকছিল না। পাখিটা গাছের কোথায় বসে ছিল আমি দেখতেই পাচ্ছিলাম না। বাবা বলল, চালা গুলি, আমি গুলি চালালাম। তারপর পাখিটা আর ডাকলই না। বাবা বলল, বোধহয় তোর গুলিটা লেগে পাখিটা মরে গেছে। দারুণ টিপ তো তোর! মেবে ফেল তো সব পাখিগুলোকে! আমি আবার গুলি চালালাম।

শিপ্রা একটা ভেজা ভেজা গলায় বলল, ওটা বোধহয় মিটুয়া ছিল। অনেক দূর থেকে উড়ে আসে ওরা। তোর গুলিতে ও মরেনি।

হ্যাঁ মরেছে। বাবা বলল, আমার টিপ খুব ভাল।

না মরেনি, আমার ছেলে কখনও গুলি করে পাখিদের মারতে পারে না। ছেলের চুলে হাত বোলাতে শুরু করেছিল শিপ্রা।

আয় ঘুমিয়ে পড়।

তুমি আমাকে গল্প বলবে না মাম্মি? কতদিন গল্প বলোনি।

বলব।

জিসাসের গল্প?

না, তোকে আজ আর একটা অন্য গল্প বলব। একটা খুব বড় যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণের ফ্যামিলির সবাই হেরে গিয়ে আকাশে স্টার হয়ে

গিয়েছিল। কৃষ্ণ তখন একা হয়ে গিয়েছিল। একটা গাছের ডালে বসে মনের দুঃখে বাঁশি বাজাচ্ছিল। কৃষ্ণের পা দুটো শুধু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখা যাচ্ছিল। তখন সেইখান দিয়ে একজন ব্যাধ যাচ্ছিল...

ব্যাধ মানে কী মাম্মি?

ব্যাধ... ব্যাধ মানে যারা শিকার করে।

তারপর কী হল?

সেই পা দেখে ব্যাধের মনে হল হরিণ। বা হয়তো... জানি না... টুকটুকে দুটো নীল পাখিও হয়তো মনে হয়েছিল। ব্যাধ সঙ্গে সঙ্গে তির-ধনুক নিয়ে তির চালিয়ে দিল পাখি দুটোকে মারবে বলে। আসলে ওটা তো ছিল কৃষ্ণের পা। তাই কৃষ্ণের পায়ে তির লেগে গেল। পাখিকে মারতে গিয়ে কৃষ্ণকে...

তারপর কী হল মাম্মি, কৃষ্ণ স্টার হয়ে গেল?

শিপ্রা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। তারপর বিট্টুকে আলতো করে থাবড়াতে থাবড়াতে গেয়েছিল সেই গানটা—আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়... ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

দোকান থেকে বেরিয়ে শিপ্রার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিট্টু বলল, পাখিদের কখনও মারতে নেই, তাই না মাম্মি? তা হলে কৃষ্ণের লেগে যায়।

শিপ্রার হাত দুটো থেমে গেল। অবাক হয়ে নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখল। লাল সোয়েটার আর টুপিতে সে যেন আজ সত্যিকারের সান্তাক্লজ হয়ে উঠেছে। হাঁটু মুড়ে বসে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছিল বিট্টুকে। জনসমক্ষে বড়দিনের দুপুরে নিউ মার্কেটে সেটা করতে নিজের বাধোবাধো ঠেকল। ছেলের কাঁধে হাত রেখে খেলনার দোকানগুলোর দিকে এগোতে থাকল শিপ্রা।

১৯

চারদিকে টুনি বাল্‌বের আলোয় ঝলমল করছে ক্লাবের লনটা। সাজিয়ে গুছিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকগুলো বেতের চেয়ার-টেবিল পাতা। তার একটাতে বসে নির্মল চ্যাটার্জি নিচু গলায় দয়াল সান্যালকে বোঝাচ্ছিলেন, শুনুন সান্যালমশাই, আপনার তো ধৈর্য বস্তুটা একটু কম, চাড্ডা স্কচে প্রথম চুমুকটা দিতে না-দিতেই আবার ফস করে এক্সপোর্টের ব্যাপারটা পেড়ে ফেলবেন না। আগে...

চুপ করে গেলেন নির্মল চ্যাটার্জি। একজন সুবেশা তরুণীর কাঁধে হাত দিয়ে সুজন দত্ত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সুজন দত্ত পাটের ব্যবসায় এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে পড়ে। সুজন দত্ত ওদের কাছে আসতেই ভদ্রতাবশত দয়াল সান্যাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হ্যাপি ক্রিসমাস মিস্টার দত্ত।

সুজন দত্ত সঙ্গিনী মেয়েটার দিকে একবার চোখ ছোট করে তাকাল। মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল। সুজন দত্ত আদুরে গলায় মেয়েটাকে ধমকে উঠল, শাট আপ, জুলি।

তারপর হাতটা দয়াল সান্যালের দিকে বাড়িয়ে বলল, মেরি ক্রিসমাস মিস্টার সানিয়াল। সো, অ্যাট লাস্ট ইউ টুক দ্য মেম্বারশিপ অফ আওয়ার ক্লাব। ওয়েলকাম, ওয়েলকাম।

দয়াল সান্যাল এই ক্লাবের মেম্বার নন। নির্মল চ্যাটার্জি ব্যবস্থা করে এনেছেন। সেটা বলার জন্য মুখ খুলতেই তাড়াতাড়ি নির্মল চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, কেমন আছেন দত্তসাহেব?

সুজন দত্ত চোখ ছোট করে নির্মল চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে বলল, সোওও, দ্য গ্রেট ম্যানিপুলেটর, ইউ আর অলসো হিয়ার? তোমাকে দেখলেই আমার ভয় করে।

নির্মল চ্যাটার্জি আলতো করে কানের লতি দুটো ধরে বলল, কেন সাহেব! আমি আবার কী অন্যায় করে ফেললাম?

সব কাজই তো আপনি করে দেবেন বলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওটাই করেন না। আমার গানি ব্যাগের অর্ডারটা পাওয়ার কী করেছিলেন? জুলিকে না লাগালে আগরওয়াল তো অর্ডারটা মেরে বেরিয়ে যাচ্ছিল প্রায়। আপনাকে আবার চ্যাটার্জি কী অর্ডার ধরিয়ে দেবে বলছে মিস্টার সান্যাল?

দয়াল সান্যাল সুজন দত্তকে বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, বসুন না।

নির্মল চ্যাটার্জি সুজন দত্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপর সাহেব, শুনলাম মধ্যেখানে আপনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?

ও কিছু নয়। ব্লাডি ডাক্তাররা বলল আর্টারিতে কী সব জমেছে টমেছে, লন্ডনে গিয়ে পরিষ্কার করিয়ে এলাম। বাট আই হ্যাড আ গুড টাইম ঠু। হসপিটাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর ডাক্তাররা বলল, বিফোর ইউ গো ব্যাক, টেক রেস্ট ফর সাম ডেজ অ্যান্ড হ্যাভ অ্যানাদার চেক-আপ।

বেয়ারা পানীয় নিয়ে এসে টেবিলে নামাল। সুজন দত্তর পছন্দ বেয়ারার জানা। গ্লাসে দুটো বরফের টুকরো ফেলে দিল। নির্মল চ্যাটার্জি আর দয়াল সান্যালের গ্লাস আগে থেকেই ছিল। সুজন দত্ত নিজের গ্লাসটা অল্প তুলে আবার মাতাল গলায় বলল, মেরি ক্রিসমাস।

দয়াল সান্যাল অল্প মাথাটা ঝোঁকালেন। নির্মল চ্যাটার্জি নিজের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তো সাহেব, আপনার রেস্ট হল?

ইয়া, ইয়া। আমি রেস্ট নিতে একটা স্কট রিসর্টে চলে গেলাম উইথ আ ব্রিটিশ টিন।

গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে মেয়েটার হাতের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলতে থাকল, আই প্রমিস। নেক্সট টাইম আই উইল টেক ইউ জুলি ডার্লিং। বাট টুডে ইজ ওনলি মেরি ক্রিসমাস।

মেয়েটা আগের মতোই হেসে উঠল। সুজন দত্ত আবার আদুরে গলায় বলে উঠল, জাস্ট শাট আপ জুলি। সে ওনলি মেরি ক্রিসমাস।

সুজন দত্তর সঙ্গে মেয়েটার ন্যাকামোর মধ্যে দয়াল সান্যাল নির্মল চ্যাটার্জির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, এ তো গেঁড়ে বসল মশাই। চাড্ডা...

নির্মল চ্যাটার্জি চোখ পাকিয়ে দয়াল সান্যালকে চুপ করতে বলে একই রকম ফিসফিসে গলায় উত্তর দিলেন, আপনিই তো আপ্যায়ন করে বসতে বললেন।

সুজন দত্ত ব্যাপারটাকে নেশাগ্রস্ত চোখেও খেয়াল করল, সো সানিয়াল, 'এনি প্রবলেম?

এবারও পরিস্থিতি সামাল দিলেন নির্মল চ্যাটার্জি, না, মানে সান্যালসাহেব জিজ্ঞেস করছেন আপনার রেড মিট চলবে কিনা। বোটি কাবাবের অর্ডার দেব?

সুজন দত্ত হো হো করে হেসে উঠল।

বললাম না আপনাকে দ্যাট ব্রিটিশ টিন—শি মেড মি টেন ইয়ার্স ইয়ং ইন জাস্ট সেভেন ডেজ। যাক, ছাড়ুন না... মিস্টার সানিয়াল যে-কথাটা আপনাকে বলছিলাম... সিন্স ইউ আর আ মেম্বার অফ দিজ ক্লাব নাউ, লেট আস জয়েন আওয়ার হ্যান্ডস টু ডু সামথিং ফর দিস ক্লাব। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ব্লাডি স্লিপিং মেম্বার্স ফর আওয়ার ক্লাব। উই নিড অ্যাকটিভ মেম্বার্স লাইক ইউ। আমি কী ভাবছিলাম জানেন? স্কটল্যান্ডের যে-রিসর্টটাতে ছিলাম তার লনের ঘাসটা। হোয়াট আ গ্রাস! সেই ব্রিটিশ টিনটার মতো ফ্রেশ, চিকন চিকন, সফট অ্যান্ড টেন্ডার। দু'কন্টেনার ওই ঘাস এনে আমাদের ক্লাবের লনটা নতুন করে করি। কী মিস্টার সানিয়াল দু'কন্টেনার আনাই? আমরা এক্সপেন্সটা শেয়ার করে নেব। চ্যাটার্জি, আপনি একটা এস্টিমেট বানান তো।

নির্মল চ্যাটার্জি হাতটা তুলে বললেন, কালকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি সাহেব।

দয়াল সান্যাল ভেতরে ভেতরে আরও অধৈর্য হয়ে উঠলেন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। চাড্ডা এখনও এল না। নির্মল চ্যাটার্জি ব্যবস্থা করেছে। কাকে যেন একটা লাগিয়েছে, সে চাড্ডাকে একদম এই ক্লাবে এসে পৌঁছে দিয়ে যাবে। দেরি করে আসছে মানে আলোচনার সময়টাও কমে আসবে। তার মধ্যে এই সুজন দত্ত লোকটা উটকোর মতো বসে থাকলে কাজের কাজটাই হবে না। সুজন দত্তর সঙ্গে ফালতু কথা ঝরাচ্ছে দেখে নির্মল চ্যাটার্জির ওপরও খুব বিরক্তি আসছে।

এক্সকিউজ মি। দয়াল সান্যাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি একটা ফোন করে আসছি।

সুজন দত্ত কাঁধ ঝাঁকাল, দয়াল সান্যাল আর অপেক্ষা না করে ক্লাব বিল্ডিং-এর দিকে পা চালালেন। অহেতুক কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার লনে নিজের বসার জায়গায় ফিরে এসে দেখলেন, জায়গাটা ফাঁকা। সুজন দত্ত তার সঙ্গিনীকে নিয়ে চলে গেছে, নির্মল চ্যাটার্জি একটু দূরে কোনও একজন পরিচিতর সঙ্গে কথা বলছেন। দয়াল সান্যাল খানিকটা থমথমে মুখে ,নিজের জায়গায় বসে থাকলেন। দয়াল সান্যালকে দেখতে পেয়েই নির্মল চ্যাটার্জি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। দয়াল সান্যাল ঘড়ি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, চাড্ডা শেষ পর্যন্ত আসবে তো চাটুজ্যেমশাই?

আসবে তো নিশ্চয়ই! লোকটার সময়জ্ঞান এদিক-ওদিক হলেও কথার খেলাপ করে না। অনিলকে যখন দায়িত্ব দিয়েছি আপনি কোনও চিন্তা করবেন না সান্যালমশাই।

দয়াল সান্যাল সামান্য মেজাজ হারালেন, আপনি তো অনেককেই অনেক কিছু দায়িত্ব দেন মশাই, তারা তো সব কাজ ঠিকঠাক করে উঠতে পারে না। সুজন দত্ত এখনই কী বলে গেল আপনাকে?

নির্মল চ্যাটার্জি খোঁচাটা হজম করলেন। প্রসঙ্গটা একদম ঘুরিয়ে বললেন, দায়িত্ব রাখতে গেলে কো-অপারেশনটাও তো জরুরি সান্যালমশাই। সুজন দত্ত যে আপনাকে বলছিল ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাব, ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাব, কথাটার মানে বুঝছিলেন? লোকটা ভালমতো জানে আপনি এই ক্লাবের মেম্বার নন। কারও গেস্ট হয়ে এসেছেন। সেই কথাটাই টনটনে জ্ঞানে আপনাকে খোঁচা দিচ্ছিল। আপনি বুঝতে পেরেছেন কিনা জানি না, তবে আমার খুব খারাপ লাগছিল। এই খোঁচাটা আপনাকে খেতেই হত না, যদি আপনি এই ক্লাবের মেম্বার হয়ে যেতেন। কবেই তো দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমাকে মেম্বারশিপ পাইয়ে দিতে, অথচ আপনার দিক থেকে কোনও কো-অপারেশনই পেলাম না।

দয়াল সান্যাল আরও গুম হয়ে গেলেন। নির্মল চ্যাটার্জি সত্যিই ব্যবস্থা করেছিল। ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী দরকার ছিল শুধু একটা ইন্টারভিউ দেওয়ার। আর সেখানেই যত বিপত্তি। ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী এই ইন্টারভিউ একা দেওয়া যায় না। সস্ত্রীক দিতে হয়। শিপ্রার সঙ্গে সম্পর্কটা বহু দিন ধরে যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে তাতে শিপ্রাকে নিয়ে একসঙ্গে কোনও ব্যাপারে বসা—অসম্ভব।

নির্মল চ্যাটার্জি অনেক কিছুই জানেন। সব হাঁড়ির খবর রাখাই এঁদের মতো লোকেদের কাজ। দয়াল সান্যালও পারতপক্ষে জানিয়ে রাখার বিষয়গুলো লুকোন না নির্মল চ্যাটার্জির কাছে। এই লোকগুলো ডাক্তার-উকিলের মতো। এঁদের কাছে লুকোছাপা দিয়ে আখেরে কাজটা হয় না। ক্লাবে ইন্টারভিউটা দিতে অসুবিধে কোথায় সেটা নির্মল চ্যাটার্জির অজানা নয়। তবু কেন যে প্রশ্নটা করে! বোধহয় সম্পর্কের হাল-হকিকত জানার জন্যই।

টেবিলের ওপর তাল ঠুকতে ঠুকতে নির্মল চ্যাটার্জি সোল্লাসে চাপা গলায় বলে উঠলেন, ওই তো অনিল! চাড্ডাকে নিয়ে আসছে।

পিন স্ট্রাইপ স্যুট-এর সঙ্গে চুল পরিপাটি ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো। এই সন্ধেতেও সকাল আটটার মতো ফ্রেশ লাগছে চাড্ডাকে। লোকটার সঙ্গে দু'-একবার দেখা হয়েছে দয়াল সান্যালের, কিন্তু সেরকমভাবে পরিচয়ই হয়নি। দেখে মনে হয় বয়স মেরেকেটে পঁয়ত্রিশ। এই কম বয়সেই সাংঘাতিক ক্ষমতা লোকটার। অথচ হাত বাড়িয়ে করমর্দন করার সময় লোকটা এমন আন্তরিক ব্যবহার করল, যেন বহু দিনের পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ।

প্রথম চোটে ভুলে গিয়েছিলেন দয়াল সান্যাল। হঠাৎ করে মনে পড়াতে বললেন, হ্যাপি ক্রিসমাস মিস্টার চাড্ডা।

চাড্ডা মৃদু হাসল। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলল, আমরা তো সকলেই এখানে হিন্দু। আমরা কেন সাহেবদের পুজোর মন্ত্র বলি বলুন তো?

পুজো, মন্ত্র। কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলেন না দয়াল সান্যাল। হো হো করে

হেসে উঠলেন নির্মল চ্যাটার্জি। চাড্ডাকে খুশি করতে বলে উঠলেন, একেবারে মনের কথাটা বলেছেন চাড্ডা সাহেব। নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি আমরা নিজেরাই নষ্ট করছি। নতুন দেশটাকে দেখুন। বাংলা ভাষাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে লক্ষ লক্ষ লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা দেশই তৈরি করে নিল।

চাড্ডা হাত দুটো ছড়িয়ে বলল, একটা দেশের জাতীয় ভাষা বাংলা। গুরুত্ব বুঝতে পারছেন? বেঙ্গলি ইজ নাউ আ রেকগনাইজড ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ। আপনারা তো বাঙালি। ইউ মাস্ট বি ভেরি প্রাউড।

দয়াল সান্যাল মনে মনে ফুটতে থাকলেন। মনে মনে বিস্তর গালাগাল দিলেন চাড্ডাকে। শালা! বাঙালিদের জন্য দরদ উথলে পড়ছে। ধর্ম, সংস্কৃতির কথা বলছে। এদিকে পিন স্ট্রাইপ সুট-টাই, মাছি পিছলোনো চকচকে জুতো পরে এসেছে। এ সবই তো ব্রিটিশদের সংস্কৃতি। জুতো ছাড়া এ ক্লাবে প্রবেশ এখনও নিষিদ্ধ।

চাড্ডা অবশ্য এসেই নির্মল চ্যাটার্জির সঙ্গে আড্ডায় মেতে গেছে। ওর খাবার-পানীয়ের ব্যবস্থাটা নির্মল চ্যাটার্জিই সামলাচ্ছে। লোকটার সঙ্গে দিল্লির পাওয়ার লবির যোগাযোগ খুবই ভাল। নিজের কাজটাকে এবার যেভাবেই হোক উদ্ধার করতে হবেই।

স্কচের গ্লাসে আরাম করে চুমুক দিয়ে চাড্ডা বলতে শুরু করল, বাংলাদেশ যুদ্ধের আসল রহস্যটা কোথায় জানেন? টাইমিং। লেট মি শেয়ার সাম সিক্রেটস। ইন্দিরা গাঁধী কিন্তু অনেক আগেই ওদেশে সেনা পাঠাতে চেয়েছিল। মানেক শ' ইন্দিরা গাঁধীকে বুঝিয়ে ঠিক সময়ের জন্য আটকে রেখেছিল।

দয়াল সান্যালের ধৈর্যের বাঁধ অনেকক্ষণ থেকেই ভাঙব ভাঙব করছিল। একটা মিটে যাওয়া যুদ্ধের গোপন কথা শোনার কোনও প্রবৃত্তিই হচ্ছিল না। আর কোনওরকম আজগুবি আলোচনায় সময় নষ্ট না করতে দিয়ে সরাসরি কাজের প্রসঙ্গে চলে এলেন।

মিস্টার চাড্ডা, আমার এবার একটা এক্সপোর্ট লাইসেন্সের ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।

চাড্ডা হাতের গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল। ধৈর্য হারিয়ে দুম করে এই প্রসঙ্গতে আসায় নির্মল চ্যাটার্জিও একটু বিরক্ত চোখে দয়াল সান্যালের দিকে তাকালেন। দয়াল সান্যাল অবশ্য তার তোয়াক্কা করলেন না। চাড্ডার মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন উত্তরের প্রতীক্ষায়।

হবে, মিস্টার সানিয়াল, হবে। সব কিছু স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে। প্রথম কথা, এক্সপোর্ট লাইসেন্স পাওয়াটা খুব সোজা কথা নয়। অসম্ভব কড়াকড়ি আছে। আর দ্বিতীয়ত, একটা এক্সপোর্ট লাইসেন্স পেলেই তো হল না, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আর বিজনেসটা আপনাকে বুঝতে হবে। কিছু মনে করবেন না, সত্যিটা হচ্ছে, টেক্সটাইল মার্কেটে আপনি এখনও খুব স্মল প্লেয়ার। গুজরাতি আর মরাঠিরা কিন্তু খুব স্ট্রং। মারোয়াড়িরাও এই বিজনেসটাকে ডমিনেট করছে। অবশ্য আমি বলছি না আপনি স্মল প্লেয়ার বলে আপনার কোনও সম্ভাবনা নেই। অনেক বড় বড় এক্সপোর্টাররা আপনার চেয়েও ছোট জায়গাটা থেকে অনেক বড় হয়েছে।

হতাশ হতে গিয়েও একটা আশার আলো দেখতে পেয়ে দয়াল সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে অসুবিধাটা কোথায়?

অসুবিধা হচ্ছে ঠিক মার্কেটটা ধরা। আপনি কোন মার্কেটটা টার্গেট করবেন? ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া?

ইউরোপ অফ কোর্স। দয়াল সান্যাল সোৎসাহে নিজের স্বপ্নের দেশগুলোর কথা ভেবে ফেললেন।

চাড্ডা মাথা ঝাঁকাল, এই মুহূর্তে ইউরোপের যা অবস্থা তাতে আপনার পছন্দ ঠিক নয়। ব্রিটিশ মার্কেট তো একদমই ভাল নয়, এমনকী ফ্রান্স আর ইতালির যে-ভাল মার্কেটটা ছিল, সেটাও এখন খুব ভোলাটাইল। মার্কেট যদি বলেন তা হলে এই মুহূর্তে আপনার একটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত, আমেরিকা।

আমেরিকা! ওরা তো আবার রাশিয়ার বন্ধু মনে করে আমাদের বিশেষ পছন্দ করে না।

এখানেই ভুল করছেন। রাজনীতি আর আন্তর্জাতিক ব্যাবসার মধ্যে সম্পর্কগুলো আপনাকে খুঁটিয়ে বুঝতে হবে। খুব সিম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমেরিকার কত সৈন্য এখনও ভিয়েতনামে লড়ছে বলুন তো! একটা যুদ্ধ মানে শুধু গোলাগুলি, ট্যাঙ্কার, প্লেনের দরকারই হয় না, প্রচুর পোশাকও লাগে। তা ছাড়া আপনার তো আমার চেয়ে আরও ভাল জানা উচিত যে-আমেরিকায় এখন একটা নতুন ট্রেন্ড আসছে—প্যাশন ফর ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইজিপশিয়ান কটন।

চাড্ডা লোকটার জ্ঞানের ব্যাপ্তি প্রচুর। আমেরিকাকে একটু বেশিই পছন্দ করে। লোকটার সঙ্গে আলোচনায় দয়াল সান্যাল ঠিক তাল রাখতে পারছিলেন না। নির্মল চ্যাটার্জি বরং এ ব্যাপারে অনেক বেশি সপ্রতিভ। আমেরিকা-রাশিয়ার প্রসঙ্গে টুক করে এ বছর ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনা সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে দিলেন। অ্যাপোলো-চোদ্দো করে আমেরিকা কীভাবে তৃতীয়বার চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছে আর রাশিয়ার সুয়জ-এগারো ভেঙে পড়ে কীভাবে তিনজন নভশ্চর প্রাণ হারিয়েছে। এইসব কথা সমানে বলে চললেন।

বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর রাখার আগ্রহ দয়াল সান্যালের এমনিতে কম। জীবনে একটা জিনিসই বোঝেন তিনি—তুলোর ব্যাবসা। এবং সেটাকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। নির্মল চ্যাটার্জি এবং চাড্ডার সঙ্গে তাই বিভিন্ন বিষয়ের আড্ডায় তালে তাল রাখতে পারছিলেন না। শুধু একটা জায়গাতেই ঠিকমতো সংগত করতে পারছিলেন, গ্লাসের পানীয়তে। মাথাটা যখন টলটল করছে তখনও টনটনে জ্ঞানে ভেবে চলতে থাকলেন, চাড্ডা আদৌ কাজের কাজটা করে দেবে কিনা। আজকের রাতের খাবার আর দামি চুরুটগুলো কেনার খরচটা বৃথা যাবে কিনা।

একটা তেতো মন নিয়ে চাড্ডা আর নির্মল চ্যাটার্জির কাছে ডিনারের পরেই বিদায় চাইলেন দয়াল সান্যাল। নির্মল চ্যাটার্জি একটু অবাকই হলেন। কথা ছিল, ফেরার সময় চাড্ডাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ফিরবেন দয়াল সান্যাল।

দয়াল সান্যালের গাড়িটা ক্লাবের গেট দিয়ে বেরিয়েই বাঁক নিতে হঠাৎ চোখে পড়ল ফুটপাথ ঘেঁষে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর চলন্ত ট্যাক্সিগুলোকে হাত নাড়িয়ে থামতে বলছে। মাতাল চোখেও এক লহমায় মেয়েটাকে চিনতে পারলেন। সুজন দত্তর সঙ্গে একটু আগে দেখেছিলেন মেয়েটাকে। ড্রাইভারকে বললেন মেয়েটার কাছে দাঁড়াতে।

ড্রাইভার বনোয়ারীলাল একটু অবাকই হল। মালিকের মেয়েঘটিত কোনও ব্যাপারে চরিত্র যে সাদা কাগজের মতো পরিষ্কার এটাই এতদিন জানত। মেয়েটার কাছে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল। জানলার কাচটা নামিয়ে দয়াল সান্যাল জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবে?

মেয়েটার চোখে একটা অদ্ভুত ঝিলিক খেলে গেল। সেই সঙ্গে অদ্ভুত মাদকতা মেশানো একটা হাসি। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, যেখানে আপনি ছেড়ে দেবেন।

কোনও উত্তর না দিয়ে দয়াল সান্যাল গাড়ির দরজাটা খুলে দিতে মেয়েটা গাড়িতে উঠে এল এবং দয়াল সান্যালের গা ঘেঁষে বসে পড়ল। গাড়িটা কিছু দূর এগোনোর পর দয়াল সান্যাল মেয়েটাকে দ্বিতীয় কথাটা জিজ্ঞেস করলেন, খেয়েছ রাতে?

মেয়েটা আবার সেই বুক হিম করে দেওয়া হাসিটা হেসে বলল, কেন, খাওয়াবেন আপনি?

দয়াল সান্যাল ড্রাইভারকে বললেন পার্ক স্ট্রিট যেতে। গাড়িটা পার্ক স্ট্রিটে আসতেই ড্রাইভার দেখল সন্ধেবেলায় এ রাস্তাটা দিয়ে যখন গিয়েছিল তার চেয়ে আরও আলো ঝলমলে হয়ে উঠেছে রাস্তাটা। খাস ড্রাইভারদের একটা বড় গুণ হচ্ছে মালিকের অনেক না বলা কথা বুঝে নেওয়া। পার্ক স্ট্রিটে দয়াল সান্যালের একটা প্রিয় রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল বনোয়ারীলাল।

ড্রাইভারের মতো আশ্চর্য হল রেস্তোরাঁর ওয়েটাররাও। দয়াল সান্যাল তাদের পরিচিত এবং নিয়মিত খদ্দের। অধিকাংশ সময়ে একাই আসেন। কোনার একটা টেবিল বেছে একদম নিয়ম মানার মতো দু'পেগ খান। আর নিজের মনে বিড়বিড় করে সারাক্ষণ কথা বলে যান। এরকম অনেক চরিত্রই তারা দেখতে অভ্যস্ত। সাধারণত এরকম লোকগুলোর অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় না। তাই দয়াল সান্যালের সঙ্গে এই বাজারি মেয়েটা একটু চোখে পড়ার মতোই। দয়াল সান্যালের টেবিলে মেনু কার্ডটা দিয়ে মেয়েটাকে তাই আড়চোখে অবাক হয়ে দেখছিল বেয়ারাটা। মেয়েটা বলছিল, আপনি লোকটা ভালই। কিন্তু সুজ বলছিল...

দয়াল সান্যাল মেনু কার্ডে চোখ বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলেন, সুজ কে?

সুজন দত্ত। ও তো আমাকে আদর করে ওই নামেই ডাকতে বলেছে... সুজ।

হুম! কী বলছিল সুজ?

বলছিল... বলছিল আপনি একটা আকাট। আপনি...

মেয়েটা কথা শেষ করতে পারছিল না। খিলখিল করে হেসে যাচ্ছে। দয়াল সান্যাল মেনু কার্ডটা বন্ধ করে মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। মেয়েটা হাসির গমক সামলে বলল, আপনি... নাকি গাঁইয়া... মেরি ক্রিসমাসকে হ্যাপি ক্রিসমাস বলেন।

দয়াল সান্যালের চোয়াল শক্ত হল।

কত দিয়েছে তোমাকে আজ তোমার সুজ?

মেয়েটা বেজার মুখ করে বলল, পাঁচশো চেয়েছিলাম। চারশো দিল শালা।

আরও জড়ানো গলায় দয়াল সান্যাল বিড়বিড় করলেন, চারশো! শালা নয়, শুয়োরের বাচ্চা। তাই বড়দিনের দিনেও তোমাকে পুরো পাঁচ দিল না।

তারপর মেনু কার্ডটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে বললেন, যা খাবে বলে দাও।

এখানে কেন? চলুন না এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। সব ব্যবস্থা আছে। অনেকক্ষণ ধরে আরাম করে খাবেন।

ওখানে তোমার সুজকে নিয়ে যেয়ো। কিছু খাওয়ার হলে খাও।

মেয়েটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে নিয়ে এলেন কেন বলুন তো?

খাওনি বললে। তোমাকে খাইয়ে পুণ্য করতে ইচ্ছে হল। খাওয়ার ইচ্ছে হলে খাও।

হাত তুলে ওয়েটারকে ডাকলেন দযাল সান্যাল।

স্কচ। লার্জ।

আমারও একটা। খিলখিলিয়ে বলে উঠল মেয়েটা।

ওয়েটাব চলে যাওয়ার পর মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, আপনার সঙ্গে যে লোকটা ছিল, সে কে?

কোন লোকটা?

ওই যখন সুজ-এর সঙ্গে আপনাদেব কাছে গিয়েছিলাম।

দয়াল সান্যাল বুঝতে পারলেন মেয়েটা নির্মল চ্যাটার্জিব কথা বলছে। ঘোলাটে চোখে বললেন, কেন, কী দরকাব?

না, কোনও দরকার নেই। আপনি উঠে যাওয়ার পর সুজ তো ওই লোকটার সামনেই বলল আপনি আকাট... ইয়ে-টিয়ে। শুনে ওই লোকটার কী হাসি! বলল ঠিক বলেছেন দত্তসাহেব। সান্যালটা তো গাঁইয়াই। বর্ধমানের গন্ডগ্রামের মুখ্যু একটা। সান্যালের বউটা...

বেয়ারা ঝকঝকে গ্লাসে পানীয় দিয়ে গেল। সোডা, জল কিছু না মিশিয়েই ঢকঢক করে তরলটা গলায় নামাতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। মেয়েটা সেটা দেখে বলল, আপনি এত ফাস্ট খাচ্ছেন কেন?

কারণ, এর পরে আমি আর একটা খাব। তারপরে আব একটা। তারপরে আরও একটা। তারপরে... যাক গে তোমার সুজ ক'টা পেগ খেতে পারে পরপর...

সুজ-এর কথা আর বলবেন না। কী বলছিল দেখছিলেন না? বিলেতে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এক সপ্তাহ কাটিয়েছে। সব ঢপ। ওর মুরোদ আমার জানা আছে। আজই তো ক্লাবে লটকে পড়ে আছে। ভাগ্যিস আমাকে টাকাটা দিয়ে দিয়েছিল; তাই কেটে পড়তে পারলাম।

কতদিন আছ এ-লাইনে?

এসব কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো? এরপর কী জিজ্ঞেস করবেন, কী করে এলে এই লাইনে, তাই তো?

ওসব ফালতু গল্প শোনার সময় আমার নেই। ক্যাথি গোমসকে চেনো?

মেয়েটা মনে করার চেষ্টা করল।

কে ক্যাথি গোমস?

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এক পুরনো বেশ্যা। এখন বুড়ি হয়েছে। ব্যারাকপুরে থাকে।

মেয়েটা মাথা নাড়ল।

অ্যাংলো? না, আমি চিনি না।

ধরো, তোমাকে যদি তোমার পুরো রেট দিয়ে দিই তুমি দুটো কাজ করে দিতে পারবে?

টাকার জন্যই তো কাজ করি। কী কাজ?

প্রথমটা খুব সোজা। তোমাকে একটা হোটেলের রুম নম্বর বলছি। হোটেলটার সামনে তোমাকে এখন আমি নামিয়ে দেব। ওই ঘরটায় চাড্ডা বলে একটা লোক আছে। ওর কাছে জেনে আসতে হবে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজের এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা সত্যিই হবে কি না।

এটা তো সোজা কাজ। এ কাজ তো আকছারই করছি। পুরো পাঁচশো লাগবে। পরের কাজটা কী?

ক্যাথি গোমসের বাড়িওয়ালা মিলিটারির লোক। ওঁর ব্যারাকপুরের ঠিকানাটা আমি তোমাকে দিয়ে দেব। মিলিটারিকে গিয়ে বলবে, ক্যাথি গোমস তোমাকে তেরো বছর বয়সে জোর করে ব্যবসায় নামিয়েছিল। এখন ব্যারাকপুরে তোমাকে দিয়ে আবার দোকান খোলাতে চায়। তুমি আর এই পাপ ব্যাবসাটা করতে রাজি নও বলে গুন্ডা লাগিয়ে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। খালি মনে রাখবে, লোকটা মিলিটারি। বেশি নাটক করতে যেয়ো না।

মেয়েটা প্রায় বিষম খেল, ওরে বাবা, এসব কাজ করতে পারব না।

দয়াল সান্যাল উত্তেজিত হয়ে টেবিলে একটা চাপড় মেরে বললেন, পারতেই হবে। টাকা পেলে সব করা যায়। তুমি না করলে আমি অন্য কাউকে দিয়ে এই কাজটা করাব। মাঝখান থেকে তোমার পয়সাটা যাবে। তবে তোমাকে একা যেতে হবে না। আমার আরও লোক থাকবে তোমার সঙ্গে।

পকেট হাতড়ে নিজের একটা কার্ড বের করলেন দয়াল সান্যাল। সেটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর। এবার উঠে পড়ো। প্রথম কাজটার জন্য তোমাকে আমি হোটেলে নামিয়ে দিচ্ছি।

দয়াল সান্যালের পাড়াটা অল্প রাতেই নিঝুম হয়ে পড়ে। গভীর রাতে দয়াল সান্যাল যখন বাড়ি ফিরলেন তখন শীতে কুণ্ডলী পাকানো কুকুরগুলোরও আর ঘেউ ঘেউ করার উৎসাহ নেই।

একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সময় সিঁড়িতে পা ফেলে মনে হল মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। কোনওরকমে টাল সামলে দোতলায় উঠতে থাকলেন। শরীরটার সঙ্গে সঙ্গে

মাথাটাও পুরো বেসামাল হয়ে গেছে। মাথাটা কিছুক্ষণ আগেও টনটনে পরিষ্কার ছিল। অপরিমিত মদটা ধীরেসুস্থে মাথার কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছে। ঘরে ঢুকে কোনওরকমে টান মেরে খুলে ফেললেন জুতো, মোজা, সুট-টাই। তারপর চিৎকার করে উঠলেন।

কোথায় গেলি শালা সুজন দত্ত? সাহস থাকে তো আমার সামনে আয়...।

কিছুক্ষণ পরে দরজার দিকে চোখ পড়ল। দরজার মুখে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিপ্রা। দয়াল সান্যাল আবার চিৎকার করে উঠলেন, হ্যাপি ক্রিসমাস ম্যাডাম। চাড্ডার সঙ্গে শুয়ে এলে?

শিপ্রা কাটা কাটা গলায় বলল, অসভ্যর মতো চিৎকার করছ কেন? বাড়িতে চাকরবাকর ছাড়া বিট্টুও আছে।

দরজায় ফ্রেমে আঁটা এক নারী। ঝাপসা তার শরীর। টনটনে মনটাও এবার ঝাপসা হতে শুরু করল দয়াল সান্যালের। খাটের ওপর লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

২০

জানলা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকছে রোদ, ধবধবে সাদা চাদরের ওপর রোদ ঝলসাচ্ছে। মাথাটা অসম্ভব ধরে আছে। কোনওরকমে ভারী চোখ দুটো খুললেন দয়াল সান্যাল।

এক কাপ গরম চা চাই। কী যেন নাম বুড়ো চাকরটার, কিছুতেই মনে পড়ছে না। কোনওরকমে বিছানায় উঠে বসলেন। আশ্চর্য! লোকটার নাম কেন কিছুতেই মনে পড়ছে না? গোটা বাড়ি জেগে আছে। নীচের তলা থেকে নানারকম আওয়াজ ভেসে আসছে। আবার মনে করার চেষ্টা করতে থাকলেন বুড়ো চাকরটার নাম। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, কে আছ?

একবার, দু'বার, তিনবার। গলাটা ক্রমাগত চড়তে থাকল এবং শেষ পর্যন্ত সেই বুড়ো চাকরটাই ঘরে এল। দয়াল সান্যাল আপাদমস্তক দেখলেন লোকটিকে এবং এবারও মনে পড়ল না নামটা। উলটে মাথার ভেতরটা আরও যেন দপদপ করতে থাকল।

হাঁ করে দেখছ কী? চা নিয়ে এসো।

ধমকে উঠলেন দয়াল সান্যাল। খাট থেকে উঠতে গিয়ে দেখলেন শরীরে কোনও জোর নেই। শরীরটা কীরকম যেন মরে আছে।

কাল রাতের কথা এবার মনে করার চেষ্টা করলেন। কোনওদিন এরকম বেহিসেবি হন না। কাল যে কী হল! ওই সুজন দত্ত যেন মাথায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। শুয়োরের বাচ্চা ব্যাবসার বোঝেটা কী! মনে মনে গালাগাল দিলেন দয়াল সান্যাল। সুজন দত্তকে তো আর নিজের হাতে ব্যাবসাটা গড়তে হয়নি! বাপের সাজানো বাগানের ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর ওই নির্মল চ্যাটার্জি লোকটা! মনে মনে আরও একটা গালাগাল দিলেন। সাপ-ব্যাং-হাতি-ঘোড়া সবার গালেই চুমু খায়। চাড্ডাকে কি ও আদৌ বলেছে কাজের কথাটা? হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ভেসে উঠল সেই মেয়েটার মুখ। কাল

নেশার ঘোরে মেয়েটাকে কী কী বলেছিলেন মনে করার চেষ্টা করতে থাকলেন। এক নম্বর ছিল চাড্ডা, আর দু'নম্বর ক্যাথি গোমস—দু'জনের মধ্যে কোনও সম্পর্কই নেই।

নেশার ঘোরে মেয়েটাকে বড্ড তাড়াতাড়ি অনেক কথা বলে ফেলেছেন। এসব মেয়েদের কোনও বিশ্বাস নেই। টাকা ছাড়া আর কোনও কিছুতেই লয়্যালটি নেই। এতক্ষণে হয়তো আবার সুজন দত্তর কাছে ফিরে গিয়েছে মেয়েটা। রাতের মতোই খিলখিল করে হাসছে আর গড়গড় করে বলছে চাড্ডা আর ক্যাথি গোমসের কথা।

বিরক্তিতে বিছানার গদির ওপর ক্রমাগত কিল মারতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। বুড়ো চাকরটা সেই সময় ট্রে-তে করে চা নিয়ে ঢুকল। আশ্চর্য, এখনও কিছুতেই মনে পড়ছে না চাকরটার নাম।

ট্রে-সুদ্ধ চায়ের কাপটা বেডসাইড টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। চায়ের কাপ-ডিশটা হাতে তুলে নিয়ে দয়াল সান্যাল বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এই, তোমার নামটা যেন কী?

লোকটি নিচু গলায় উত্তর দিল, হরিহর, সাহেব।

হরিহর... হরিহর... হরিহর। ভেতরে যেন একটা খুশির ফোয়ারা উঠছে। এই এতক্ষণ শত চেষ্টাতেও না মনে করতে পারা নামটা মনের ভেতর যে-বোঝাটা বাড়িয়েই যাচ্ছিল ক্রমশ, সেটা হালকা হয়ে যাচ্ছে।

লোকটি নিচু গলাতেই বলল, সাহেব, নীচে বক্সীবাবু অপেক্ষা করছেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, ওকে এ-ঘরে পাঠিয়ে দাও।

দয়াল সান্যাল কোনও কালে বাইরের কাউকে ওপরে ডাকতেন না। শোওয়ার ঘরে তো নয়ই। শিপ্রা এটা একদম পছন্দ করে না। তবে ইদানীং তিনি সরোজ বক্সীর মতো কাউকে কাউকে ঘরে নিয়ে আসা শুরু করেছেন। কিছুটা সেটা শিপ্রাকে দেখিয়ে, তার অপছন্দকে অগ্রাহ্য করার জন্যই।

হরিহরের কথা শুনে ওপরে এসে সরোজ বক্সী অল্প ঝুঁকে দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করলেন। দয়াল সান্যাল ভুরু কুঁচকে বললেন, কী ব্যাপার সরোজ! এত সকালে বাড়িতে?

কয়েকটা ব্যাপার আপনাকে জানানোর ছিল স্যার। কার্শিয়াং-এ বিট্টুবাবার জন্য যে-স্কুলে গিয়েছিলাম তার প্রিন্সিপাল এখন কলকাতায় এসেছেন। কয়েকদিন থাকবেন। আপনি দেখা করবেন কি?

ক'দিন থাকবেন?

থাকবেন এখন কয়েকদিন।

ভেবে দেখি। পরে বলব তোমাকে। নেক্সট?

স্যার, পলাশের বউ কাল আবার মিলে এসেছিল।

দয়াল সান্যাল ভুরু দুটো আবার তুললেন, কাল! কাল তো মিলে বড়দিনের ছুটি ছিল।

তাই কারও সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে এর-তার কাছে গল্প করে বলেছে, পলাশকে নাকি এলাহাবাদের কাছে দেখা গেছে।

একটু চুপ করে থেকে দয়াল সান্যাল বললেন, ধড়িবাজ মহিলা। বুঝতে পারছি কোন লাইনে খেলতে চাইছে। তবে আমাকে চেনেনি এখনও। তুমি ওর কাছে খবর পাঠাও। এলাহাবাদে না কোথায়... যদি গিয়ে খোঁজ করে আসতে চায়, যাক। আমি খরচ দেব। দু'দিনেই ব্যাটারি ফুস করে চুপসে যাবে।

চা-টা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। এক চুমুকে বাকিটা গিলে নিলেন দয়াল সান্যাল। সরোজ বক্সী একটু অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আজ অফিসে আসবেন স্যার?

অফিসে? এখনও ঠিক করিনি। গেলেও বেলা করে যাব। শোনো সরোজ, তুমি বরং অফিসে চলে যাও। কাল রাতে একটা বাজারি মেয়েকে আমার কার্ড দিয়েছি। মেয়েটা অফিসে ফোন করতে পারে। ওকে একটা কাজ দিয়েছিলাম। রিপোর্টটা নিয়ে নিয়ো। অপারেটরকে বলে রেখো, ফোনটা যেন তোমাকে দেয়। আর মেয়েটা টাকা চাইলে যেখানে বলবে তুমি নিজে গিয়ে পাঁচশো টাকা মেয়েটাকে দিয়ে এসো। আরও একটা কাজ ছিল। একজন ভাল এগ্রিকালচারিস্ট খোঁজ করো তো।

এগ্রিকালচারিস্ট?

হ্যাঁ, এগ্রিকালচারিস্ট। যে স্কটল্যান্ডের মতো ঘাস বুনতে পারবে কলকাতার মাটিতে।

দয়াল সান্যাল আড়মোড়া ভেঙে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। দয়াল সান্যালের বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন সরোজ বক্সী। আজকের ফর্দর দুটো অভিনব কাজ। এক নম্বর, একটা বাজারি মেয়ের কাছে রিপোর্ট নেওয়া আর দুই নম্বর, একজন কৃষিবিদের খোঁজ করা, যে কিনা বিলিতি ঘাস বুনতে পারে! একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সরোজ বক্সী। আরও কত বিচিত্র কাজ যে করতে হবে এই মালিকের সঙ্গে থেকে।

অফিসে ঢোকার মুখেই দারোয়ান সেলাম করে একপাশে ডাকল সরোজ বক্সীকে। সতর্কভাবে চারদিকে চেয়ে বলল, একটা মেয়েছেলে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। খুব তোড়পার করছিল। মেয়েছেলে তো। গায়ে হাত দিতে পারছিলাম না। জোর করে ঢুকতে চাইছিল। শেষে আমি বললাম, সাহেব আসেননি। পরে আসুন।

সরোজ বক্সী প্রমাদ গুনলেন। দয়াল সান্যাল বলছিলেন সেই বাজারি মেয়েটাকে নিজের কার্ড দিয়েছেন। তার ওপর আবার পাঁচশো টাকা পাবে। নির্ঘাত ওই মেয়েটাই একদম অফিস পর্যন্ত ধেয়ে এসেছে।

কী নাম, কিছু বলেছে?

কিছুতেই বলল না। শুধু তো তড়পাচ্ছিল। আগে তো কখনও দেখিনি মেয়েছেলেটাকে।

ঠিক আছে, আবার যদি আসে, এখানে দাঁড় করিয়ে আমাকে অফিসে একটা খবর দিয়ো। ভেতরে ঢুকতে দিয়ো না।

মেয়েটা যখন অফিস পর্যন্তই চলে এসেছে, তখন আর কোনও সম্ভাবনা নেই ফোন করার। তবু অপারেটরকে ফোনের ব্যাপারটা জানিয়ে রাখলেন সরোজ বক্সী। তারপর নিজের টেবিলে এসে বসলেন। ফর্দের প্রথম কাজটার তাও একটা দিশা আছে। দ্বিতীয়

কাজটা শুরু করার কোনও খেই-ই ধরতে পারছেন না। জানাশোনা দু'-একজনকে ফোন করতে শুরু করলেন।

দয়াল সান্যালের অফিসে ঢুকে ছড়ানো উঠোনের মতো জায়গাটায় সার দিয়ে কেরানিরা বসেন। আর এক দিকে দেওয়াল ঘেঁষে অফিসারদের ঘর। পদাধিকারে সরোজ বক্সীর ওই ছড়ানো চত্বরেই বসার কথা। কিন্তু খোদ মালিকের আপ্তসহায়কের কাজ করার জন্য এক কোণে ছোট্ট একটা কাচঘেরা ঘর বরাদ্দ আছে সরোজ বক্সীর। স্বয়ং মালিকের ছায়াসঙ্গী বলে পদস্থ অফিসাররাও সমঝে চলে সরোজ বক্সীকে।

একটা ফোন ছেড়েই, খোলা জায়গাটা থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ পেলেন সরোজ বক্সী। নির্ঘাত সেই মেয়েটি হবে। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং চিৎকার করতে থাকা মেয়েটিকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই চিনতে পারলেন। পলাশের বউ।

একবার একটা বিয়েবাড়িতে পলাশের বউকে দেখেছিলেন সরোজ বক্সী। ভদ্র, নম্র। প্রতিমার মতো সেই মুখটা মনে গেঁথে ছিল। সেদিন কটন মিলের গেটে শুকিয়ে যাওয়া ক্লান্ত বিধ্বস্ত মেয়েটিকে সেই স্মৃতিটুকু দিয়েই চিনতে পেরেছিলেন। তবে সেদিনের চেহারার সঙ্গে আজকের চেহারার কোনও মিল নেই। রুক্ষ কঠিন একটা চেহারা। গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে, দয়াল সান্যাল একজন খুনি। পলাশকে গুলি করে খুন করিয়েছে।

দারোয়ান অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝের জায়গাটার সকলেই প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছেন। অফিসাররাও সবাই বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু কেউই বুঝতে পারছেন না কী করবেন। মহিলার অভিযোগ সাংঘাতিক। সরাসরি খুনের অভিযোগ মালিকের বিরুদ্ধে। আবার মহিলা পুরোপুরি পরিচয়বিহীনও নয়। নিরুদ্দেশ পলাশ সেন এই সংস্থারই একজন কর্মী।

সরোজ বক্সী দ্রুত পায়ে পলাশের বউয়ের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি শান্ত হন। বসুন। জল খান...

চোখে আগুন ঝরল মেয়েটার, না, আমি শুধু একটা কাজের জন্যই এসেছি। দয়াল সান্যালের সঙ্গে আজ দেখা করেই যাব। আপনি সেদিন দয়াল সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে দেননি। আপনারা সবাই মিলে চক্রান্ত করছেন।

সরোজ বক্সী নিজের গলাকে আরও সংযত করলেন, বেশ তো। দেখা করবেন। নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু উনি এলে তার পরে তো দেখা করবেন। এখনও তো আসেননি উনি।

গর্জে উঠল পলাশের বউ।

মিথ্যে কথা। সেদিন আমি যখন হরিতলায় গিয়েছিলাম, তখনও আপনারা বলেছিলেন দয়াল সান্যাল ওখানে নেই। কিন্তু ও ওখানেই ছিল। অনন্তদা নিজে বলেছে আমাকে। দয়াল সান্যাল... খুনি কোথাকার!

পরিস্থিতি সামাল দিতে সরোজ বক্সী দ্রুত নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, দেখুন

আমরা সবাই তো পলাশের সহকর্মী। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি... আপনি তো বলেছিলেন পলাশকে এলাহাবাদে দেখা গেছে। আপনি...

সরোজ বক্সীকে কথা শেষ করতে দিল না পলাশের বউ, আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। আপনারা আমাকে দয়াল সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে দেবেন কি?

সরোজ বক্সী এবার গলাটাকে কঠিন করলেন, আপনি কিন্তু অবুঝের মতো করছেন। আপনি পলাশের স্ত্রী। না হলে হয়তো এতক্ষণ... যাক গে। শুনুন, আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে... কিন্তু এটাই সত্যি যে আপনার এখন মাথার ঠিক নেই। সেদিন হরিতলায় গিয়ে বলছিলেন আমরা জোর করে পলাশকে আটকে রেখেছি। কাল বললেন পলাশকে এলাহাবাদে দেখা গেছে। চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি এখন বলছেন পলাশকে উনি খুন করেছেন।

উপস্থিত লোকজনের সরোজ বক্সীর কথা শুনে পলাশের বউ সম্পর্কে ধারণাটা বদলাতে থাকল। এতক্ষণ সবাই দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সাহস করে দু'-একজন এগিয়ে আসতে থাকল।

২১

দয়াল সান্যাল প্রথমে ঠিক করেছিলেন আজ আর অফিসে যাবেন না। কিন্তু বেলার দিকে শরীরটা একটু ঠিক হওয়ায় মত বদলে ফেললেন। বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময়ই অফিস থেকে সরোজ বক্সীর ফোনটা পেলেন, পলাশের বউ এসেছে।

সব শোনার পর দয়াল সান্যাল গুম মেরে গেলেন। কী করে পলাশের বউয়ের সন্দেহ হতে শুরু করল যে পলাশকে গুলি করে মারা হয়েছে? কে খবরটা পৌঁছোল? পলাশকে যে এলাহাবাদে দেখা গেছে, এই খবরটা লোক লাগিয়ে পৌঁছোনোর ব্যবস্থা তো নিজেই করেছিলেন, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতেই আসল খবরটা কে পৌঁছে দিল মেয়েটার কানে?

অনেক ভেবেচিন্তে লালবাজারে এসিপি রায়কে ফোন করলেন দয়াল সান্যাল। সব শুনে এসিপি রায়কে তেমন বিচলিত মনে হল না। বললেন, ভাবছেন কেন? বড়জোর আমাদের কাছে কমপ্লেন এলে আমরা কমপ্লেনটা নেব। একটা তদন্ত গোছের কিছু শুরু করব। এটা নিয়ে ভাববেন না। বরং দেখুন কে এখনও আপনার পিছনে পড়ে আছে।

সেটাই ভাবছি...

ভাববেন না মশাই বেশি। বরং চোখ-কান খোলা রাখুন। বাই দ্য ওয়ে, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখেছেন? দরকার পড়লে দু'নম্বর দাওয়াইটা এবার দিয়ে দিন।

শিপ্রা? সত্যি তো, এতক্ষণ কেন একবারও মনে হয়নি শিপ্রার কথা? শিপ্রা কলকাতায় ফিরে আসার পরই তো পলাশের বউ সত্যি ঘটনাটার দিকে এগোচ্ছে! এসিপি-র ফোনটা ছেড়ে বাড়ির সামনের লনে চলে এলেন দয়াল সান্যাল। শিপ্রার

গতকালের গতিবিধির খবর নেওয়া হয়নি। ড্রাইভার বনোয়ারীলাল গেটের কাছে দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করছিল। ইশারায় বনোয়ারীলালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কাল মেমসাহেব কোথায় কোথায় গিয়েছিল?

বনোয়ারীলালের এটা নিত্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে গেছে। গতকাল বিকেল থেকে সাহেব এত ব্যস্ত ছিলেন যে রিপোর্টটা আর দেওয়া হয়নি। এখন সাহেবের থমথমে মুখচোখ দেখে ঘাবড়ে গেল বনোয়ারীলাল। ঢোঁক গিলে বলল, ছোটবাবুকে নিয়ে শুধু নিউ মার্কেটে গিয়েছিলেন স্যার।

ঠিক করে বলো, আর কোথাও গিয়েছিল?

আবার ঢোঁক গিলল বনোয়ারীলাল, না স্যার। আর কোথাও না। বাড়ি থেকে নিউ মার্কেট আর নিউ মার্কেট থেকে বাড়ি।

হতাশ হলেন দয়াল সান্যাল। ওঁকে মিথ্যে বলার সাহস নেই বনোয়ারীলালের। শিপ্রারও সাধ্য নেই বনোয়ারীলালকে কিনে ফেলার। মন দৃঢ়ভাবে বলছে পলাশের বউকে শিপ্রাই খবরটা দিয়েছে। তিনি নিজে, সরোজ বক্সী আর পুলিশের লোকেরা ছাড়া এটা একমাত্র শিপ্রাই জানে। কিন্তু শিপ্রা কীভাবে যোগাযোগ করল পলাশের বউয়ের সঙ্গে?

লনের এক কোনায় চোখে পড়ল বিট্টু খেলা করছে। বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে হল, বিট্টু তো কাল শিপ্রার সঙ্গে ছিল। ও নিশ্চয়ই জানে নিউ মার্কেটে মা কেন গিয়েছিল। বিট্টুর কাছে এগিয়ে গেলেন দয়াল সান্যাল। ছেলের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, তুই বল নিয়ে খেলছিস, এয়ারগানটা কী হল?

আমি আর পাখিদের গুলি করব না বাবা।

দয়াল সান্যাল মুখটা গম্ভীর করে বললেন, মা শিখিয়ে দিয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, মাম্মি বলেছে পাখিদের গুলি করতে গেলে কৃষ্ণঠাকুরের গায়ে গুলি লেগে যেতে পারে।

বিট্টু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-শেষে যদুবংশের শেষ পুরুষের অন্তিম পরিণতির গল্পটা বাবাকে বলতে থাকল।

তোর মা বুঝি আজকাল যিশুকেষ্টর গল্প ছেড়ে তোকে শুধু কেষ্টর গল্প বলছে?

বিট্টু এর উত্তরটা ভেবে পেল না। চুপ করে রইল।

কাল কোথায় গিয়েছিলি মায়ের সঙ্গে?

নিউ মার্কেটে।

কী কিনে দিল মা?

এরোপ্লেন। তুমি দেখবে বাবা? চলো দেখাচ্ছি।

বিট্টুর চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল। দয়াল সান্যাল ভুরু দুটো কপালে তুললেন।

ওমা, শুধু এরোপ্লেন... শুধু একটা এরোপ্লেন কিনতে তোরা নিউ মার্কেটে গিয়েছিলি? আর কোথাও যাসনি?

হ্যাঁ! মাম্মি একটা পাখির দোকানে নিয়ে গিয়েছিল।

পাখির দোকানে? পাখি কিনে এনেছিস নাকি তোরা?

না কিনিনি। মা দোকানদারকে বলেছে পাখিগুলোকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে।

দয়াল সান্যাল ছেলের মুখে এই খবরটা শুনে খুব অবাক হলেন। তবে ছেলের সামনে সেটা প্রকাশ না করে বললেন, ইস, পাখি কারা উড়িয়ে দেয় জানিস তো! খুব খারাপ লোকেরা।

খারাপ লোকেরা?

হ্যাঁ, মাকে জিজ্ঞেস করে দেখিস।

বিট্টু ঘাড় নাড়ল। তারপর আবদার ধরল, চলো না বাবা, প্লেনটা দেখবে...।

এখন নয় বাবা, পরে দেখব।

পরে নয় বাবা, এখনই চলো। যদি ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়!

দয়াল সান্যাল ঈষৎ গম্ভীর হলেন।

না, এখন নয়। তুমি এখানেই খেলা করো।

বাড়ির দিকে দু'পা এগিয়েই আবার ছেলের দিকে ফিরে তাকালেন দয়াল সান্যাল। বিট্টুর চোখের ওপর চোখ রেখে বললেন, মা তোকে শুধু খেলনা প্লেন কিনে দিয়েছে, তাই তো? আমি তোকে সত্যিকারের প্লেনে চাপাব।

আবার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন দয়াল সান্যাল। দূর থেকে মনিবকে আসতে দেখে বনোয়ারীলাল এক ছুটে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল। দয়াল সান্যাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বনোয়ারীলালকে পাশ কাটিয়ে হনহন করে বাড়ির ভেতর ঢুকে এলেন। ভেতরে ঢুকেই চোখে পড়ল সেই বুড়ো চাকরটাকে। পা দুটো থেমে গেল দয়াল সান্যালের। আশ্চর্য! সকালে লোকটা কী যেন একটা নাম বলল, এখন আবার মনে পড়ছে না। লোকটার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হাতছানি দিয়ে লোকটাকে ডাকলেন।

কত বয়স তোমার?

হরিহর থতমত খেয়ে শুকনো গলায় বলল, সত্তর হবে সাহেব।

এত বয়স পর্যন্ত চাকরি করছ? রিটায়ার করো। সামনের মাস থেকে তোমার আর আসার দরকার নেই। বুড়ো ভাম।

হরিহর হঠাৎ করে চাকরি খোয়ানোর কারণটা বুঝতে পারল না। পায়ের তলার মাটিটা মনে হল কেঁপে গেল।

দয়াল সান্যাল ওপরে উঠে এলেন। নিজের ঘরে ঢোকার আগে বিট্টুর ঘরের দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন। শিপ্রা খাটে এলিয়ে বসে একটা বই পড়ছিল। মাথার মধ্যে এখন শুধু ঘুরছে এসিপি রায়ের কথাটা। দু'নম্বর দাওয়াইটা এবার দিতে হবে। গম্ভীর গলায় দয়াল সান্যাল বললেন, তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

শিপ্রা মুখের ওপর থেকে বইটা নামিয়ে রাখল। কাল রাতে মানুষটার হুঁশ ছিল না। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছিল। শিপ্রা অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারেনি। মা যে-গুণগুলো দেখে দয়াল সান্যালকে একদিন পছন্দ করেছিল, সেই গুণগুলো মানুষটা

দ্রুত হারিয়ে ফেলছে। লোকটা কোনওদিন চূড়ান্ত মাতাল হয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে গালিগালাজ করেনি। কাল রাতেই প্রথম। অথবা এটাই তার আসল চেহারা। শিপ্রাই এতগুলো বছরে লোকটাকে চিনতে পারেনি। এখন মুখোশগুলো একটা-একটা করে খসে পড়ছে।

শিপ্রা কোনও উত্তর দিল ন।। তবে বইটাও আবার মুখের ওপর উঠিয়ে ধরল না। অন্য দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল। দয়াল সান্যাল কিছু শোনার জন্য দরজার মুখটাতে একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শিপ্রার নির্লিপ্ত অভিব্যক্তি দেখে আবার বললেন, তোমার সঙ্গে কথা ছিল। আমার ঘরে আসবে?

'আমার ঘরে' কথাটা শিপ্রার বুকে এসে বিঁধল। কয়েকদিন আগেও এটা ছিল আমাদের ঘর, আমাদের শোওয়ার ঘর। ঘরটা থেকে শিপ্রা স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। হরিতলার সেই ভয়ংকর রাতের পরের দিন ঘরটায় মনে হয়েছিল সেই উষ্ণতা আর নেই। এই বাড়িটাই আর ভাল লাগে না। তবু খট করে 'আমার ঘর' কথাটা বুকে এসে বিঁধল। উঠে দাঁড়াল শিপ্রা।

দয়াল সান্যালের পিছন পিছন 'আমার ঘরে' এসে শিপ্রা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। দয়াল সান্যাল ইঙ্গিতে খাটটা দেখিয়ে বললেন, বসো।

ঠিক আছে। কী বলার আছে বলো।

দয়াল সান্যাল খাটের একধারে গিয়ে বসলেন। অধৈর্য গলায় বললেন, এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিরিয়াস কথা হয় না।

শিপ্রা তবুও দাঁড়িয়ে থাকল। শক্ত গলায় বলল, কিছু বলার থাকলে বলো। আমি সিরিয়াসলিই শুনছি।

পলাশের বউ আজ অফিসে এসেছিল।

অবাক হওয়ার ভাবটা শিপ্রা নিজের ভেতরে লুকিয়ে রেখে বলল, তো?

দয়াল সান্যালের গলা এবার চড়ে গেল, ও কী করে জানল পলাশকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে?

ভেতরটা মোচড় দিল শিপ্রার। আপ্রাণ চেষ্টা করছে মন শক্ত করে রাখার। দয়াল সান্যালের সঙ্গে আলোচনা মানে যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় নিজের দুর্বলতা দেখাতে নেই। একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল শিপ্রার ঠোঁটে।

পলাশকে পুলিশ গুলি করে মেরেছে নাকি? জানতাম না তো! পলাশ তো নিরুদ্দেশ। তাই তো জানি।

উত্তেজনায় দয়াল সান্যাল দাঁড়িয়ে উঠলেন। শিপ্রার দিকে আঙুল তুলে বললেন, কোনও ঝামেলা হলে তুমিও বাঁচবে না। পলাশকে সেদিন তুমিই ডেকে পাঠিয়েছিলে।

আমি আর কোনও ঝামেলাকে ভয় পাই না। আমি কী করব ঠিক করে ফেলেছি।

কী করবে তুমি?

সময়ে সেটা দেখতেই পাবে। আর কিছু বলার আছে তোমার?

দয়াল সান্যাল খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। এই মেয়ে সাংঘাতিক। নিজের থেকেই গলাটা নরম হয়ে এল খানিকটা। এসিপি রায়ের দু'নম্বর দাওয়াইটার ভূমিকা শুরু করলেন।

শোনো শিপ্রা, তোমার-আমার আসল মতবিরোধটা তো শুধু হরির ঝিল আর বাংলোটা নিয়ে...।

শুধু হরির ঝিল নয়, আরও অনেক কিছু আছে।

থাকতে পারে, তবে হরির ঝিলটাই সবচেয়ে বড় ইস্যু।

শিপ্রা চুপ করে গেল। হরির ঝিল নিয়ে যে-লড়াই চলছে তাতে নতুন করে কোনও কথা শুরু করা যায় না। দয়াল সান্যাল বোঝানোর চেষ্টা করলেন, হরির ঝিল নিয়ে তুমি কিন্তু অবুঝের মতো করছ। হরির ঝিলটা কত বড় সেটা তুমি নিজের চোখে দেখেছ। দু'একর জমিটার সঙ্গে আমি এর একটা খুব ছোট অংশই চাইছি। তোমাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেটা। কিন্তু তুমি জেদ করে বুঝেও বুঝতে চাইছ না। ওইটুকু অংশ বুজিয়ে ফেললে তোমার পাখিদের কোনও ক্ষতি হবে না। ওরা যেমন আসছিল তেমনই আসবে। আমিও তো পাখি ভালবাসি!

শিপ্রা জ্বলে উঠল, তুমি পাখি ভালবাসো! তাই বিট্টুকে শিখিয়েছ পাখিগুলোকে গুলি করতে...

দয়াল সান্যাল হাত তুলে শিপ্রাকে থামানোর চেষ্টা করলেন, তুমি বুঝতে পারছ না। বিট্টুর হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার দুটো কারণ ছিল। এক নম্বর, মহেশের বাড়ির সেই রাতের ঘটনাটা ঘটার পর ওর একটা সাইকোলজিকাল প্রবলেম শুরু হয়েছিল। ভয়ে কীরকম যেন কুঁকড়ে থাকত। তুমি নিজেও সেটা দেখেছ। হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে আমি ওর বন্দুকের ভয়টা ভাঙাতে চেয়েছিলাম। আর দু'নম্বর কারণটা হল, হরিতলার চারদিকে একটা মেসেজ ছড়িয়ে দেওয়া—একটা বাচ্চার হাতে বন্দুক থাকা মানে নিজের শক্তিটাকেও প্রকাশ করা।

বাজে কথা। এর সঙ্গে গুলি করে পাখি মারার কোনও যুক্তি নেই। তুমি কী মনে করেছিলে, বিট্টুর হাত দিয়ে কয়েকটা পাখিকে গুলি করে মারিয়ে তুমি আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে? চেষ্টা করে দেখো। আমিও তোমাকে চ্যালেঞ্জ করে গেলাম। দেখবে, একদিন বিট্টুর হাত ধরেই হাজার হাজার পাখি আসবে হরির ঝিলে।

দয়াল সান্যাল মনে মনে হাসলেন। বিট্টু তাঁর একমাত্র উত্তরসূরি। মায়ের প্রভাব বাঁচিয়ে আগামী দিনের জন্য ছেলেকে কীভাবে তৈরি করতে হবে, একদম ছক করা আছে তাঁর। তবে এখন শিপ্রার সঙ্গে তর্কে যাওয়া যাবে না। আরও কিছুদিন দরকার এই মেয়েকে। ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জটা তারপর শিপ্রার দিকে ছুড়বেন তিনি। এখন ঠান্ডা মাথায় দু'নম্বর দাওয়াইটা খাইয়ে দিতে হবে। ক্ষণিকের চটকটা ভেঙে বললেন, শোনো, মাথা গরম করে কোনও আলোচনা হয় না, কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তুমি আমাকে সহ্য করতে পারো বা না পারো, অনেকগুলো সিদ্ধান্ত ঠান্ডা মাথায় আমাদের নেওয়া দরকার। বিট্টুর ব্যাপারে আমি কিছু ভেবেছি।

তুমি কী ভেবেছ আমার তা জানার ইচ্ছে নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, এই বাড়িতে এক ছাদের তলায় তোমার সঙ্গে আছি শুধু এই ছেলেটার মুখ চেয়ে।

মনে মনে দয়াল সান্যাল ভাবলেন, তাই পলাশের সঙ্গে পালাতে চেয়েছিলে! সব খুইয়ে এখন আবার এখানে ফিরে এসেছ। তবে বাইরে চোখ দুটো করুণ করে অভিনয়ের চেষ্টা করলেন।

তুমি কী ভাবো, আমি ছেলেটার জন্য ভাবি না! ব্যাবসা বড় করে কার জন্য রেখে যাব? ওই একজনই তো আছে আমাদের। হাতের তালুতে মানুষ করতে চাই বিট্টুকে!

হাতে বন্দুক দিয়ে? ও জানে বন্দুক ব্যবহার করতে? পাখি মারতে গিয়ে যদি নিজের কিছু একটা বিপদ ঘটিয়ে ফেলত...

দয়াল সান্যাল মাথাটা হেলিয়ে দু'হাত চুলের মধ্যে চালালেন। গলাটাকে ভাবুক করে বললেন, ভেবেছিলাম তোমাকে কোনওদিন বলব না। পুলিশকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, কোনওদিন তোমাকে কথাটা না বলতে। সেদিন রাতের কথাটা মনে পড়লেই শিউরে উঠি। ভগবানকে শত কোটি প্রণাম জানাই ঠিক সময়ে ঠিক ব্যাপারটা হয়ে যাওয়ার জন্য।

চোখ বন্ধ করে একটু চুপ করে ভাবার অভিনয় করতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, আজ আমাদের কোলে বিট্টু আর থাকত না। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেত ওর মাথাটা। ওকে গুলি করে মেরে ফেলত পলাশ। হরিতলা কটন মিলের সঙ্গে আরও অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখেছিল ও। বাধা ছিল একজনই, বিট্টু। বিট্টুর মাথা লক্ষ্য করে বন্দুকও চালাতে চেয়েছিল ও। বিট্টুর মাথায় গুলিটা লাগত যদি না ঠিক সময়ে সিনহা পলাশকে...

শিপ্রা ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। দু'হাত দিয়ে কান চাপা দিল।

দয়াল সান্যাল এগিয়ে এসে শিপ্রার কাঁধে আলতো করে হাত রাখলেন। কতদিন পর হাত রাখলেন স্ত্রীর গায়ে? মনে করতে পারলেন না।

তোমার বয়স আমার চেয়ে অনেক কম। ঠোক্কর খেতে খেতে আমি পৃথিবী চিনেছি। তোমার-আমার মত আলাদা হতে পারে, তবে স্বামী হিসেবে আমি আমার কর্তব্য জানি। তুমি জানো না কী ভীষণ ঝামেলায় জড়িয়েছ তুমি। তোমার কাছে আমি দু'হাত জোড় করছি, বিট্টুকে তুমি তোমার-আমার মধ্যে জড়িয়ো না।

শিপ্রার মাথাটা ঝুলে আছে। টপটপ করে চোখের জল পড়ছে কোলের ওপর। সত্যি কি পলাশ গুলি করে মারতে চেয়েছিল বিট্টুকে? হয়তো তাই। ইন্‌সপেক্টর সিনহার কথাই যদি ঠিক হয়, তা হলে যে-বিশ্বাসঘাতকতা পলাশ করেছিল তাতে বিট্টুকে গুলি করতেও হয়তো ওর হাত কাঁপত না। কিন্তু... ইন্‌সপেক্টর সিনহা বলেছিল পুলিশ আত্মরক্ষা করতে গুলি চালিয়েছিল। না হলে নিজেরাই গুলিবিদ্ধ হয়ে যেত। কিন্তু একবারও বলেনি পলাশ বিট্টুকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল। কেন বলেনি? দয়াল সান্যাল বারণ করেছিল? সত্যি কি এটাই?

শিপ্রার সামনে থেকে সরে জানলার কাছে দাঁড়ালেন দয়াল সান্যাল। নীচের লনে

বিট্টু একইরকম খেলা করছে। বিট্টু তাঁর উত্তরাধিকারী এবং এই মুহূর্তে একমাত্র তুরুপের তাস। নিখুঁত অভিনেতার মতো গলায় একটা আবেগ জড়িয়ে নিলেন।

ভয় কী হচ্ছে জানো? এত সব হয়ে গেছে, নকশালরা কিন্তু সব হিসেবে রেখেছে। ওদের লক্ষ্য কিন্তু তুমি বা আমি কেউ নই। ওদের লক্ষ্য বিট্টু। তোমার মনে আছে সেই মেয়েটাকে? যে বাড়িতে তোমার কাছে ধূপ বিক্রি করতে এসেছিল... সে কিন্তু সব খোঁজখবর নিয়ে গেছে। বিট্টুর স্কুল কোথায়, কখন স্কুলে যায়, কখন বাড়ি ফেরে, বিট্টু কখন বাগানে খেলা করে। বিট্টুকে কিডন্যাপ করে ওরা হয়তো আমার কাছে টাকা চাইবে। আমি সব বিক্রি করে দিয়ে দেব ওরা যত টাকা চায়... কিন্তু কোনও গ্যারান্টি আছে কি বিট্টুকে ওরা ফেরত দেবে?

জানলার দিক থেকে ঘরের ভেতর মুখ ফিরিয়ে নিলেন দয়াল সান্যাল। মায়ের স্নেহ এক অদ্ভুত বস্তু। শিপ্রার মতো তুখোড় বুদ্ধিমতীও আতঙ্কিত, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দয়াল সান্যালের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে দয়াল সান্যাল বললেন, পলাশের বউকে তুমি কী বলেছ?

কিচ্ছু বলিনি। পলাশের বউকে আমি চিনিই না। কোনওদিন দেখিনি।

শিপ্রার গলাটা একদম শুকিয়ে গেছে। দয়াল সান্যাল মনে মনে খুব উৎফুল্ল হলেন। কিছুক্ষণ আগেও শিপ্রার গলায় যে-তেজটা ঝরে পড়ছিল সেটা কোথায় যেন উবে গেছে। চোখের আগুনটাও নিভে গেছে। এই আতঙ্কটা পুরো উসকে দিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, এই ভয়টাই করছিলাম। ওরা পুরো নজর রাখছে। সত্যিটা জেনে গিয়ে অফিসে পাঠিয়েছে পলাশের বউকে। এর পরে বাড়িতে আসবে।

তোমার তো পুলিশে জানাশোনা আছে। বলছ না কেন ওদের?

পুলিশ? পুলিশ কী করবে! ওই যে নকশাল মেয়েটা বাড়িতে এসেছিল, পুলিশের চোখ বাঁচিয়েই তো এসেছিল! ওদের তুমি জানো না। ওরা ডেসপারেট। বিট্টুর ক্ষতি করতে পারলে এক ঢিলে আমাদের দু'জনকেই মারতে পারবে। শুভাননের মৃত্যুর প্রতিশোধ ওরা এখনও নেয়নি।

শিপ্রা চোখটা বন্ধ করে নিল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মহেশের বাড়িতে লণ্ঠনের অন্ধকার-অন্ধকার আলোয় কম্বল জড়ানো ছায়ামুখটা। যে-লোকটা বলেছিল চিনের চেয়ারম্যানই আমাদের চেয়ারম্যান। যে-লোকটা বলেছিল সব ফিউডাল লর্ডই আমাদের শত্রু। যে-লোকটা ছোট লাল বইটা থেকে পড়ছিল সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক...।

ভেতরটায় অসহ্য একটা ছটফটানি। চিৎকার করে উঠল শিপ্রা।

হরিহর, কী করছ তোমরা? বিট্টু খোলা মাঠে একা একা খেলছে। শিগগির বাড়ির মধ্যে নিয়ে এসো ওকে।

হরিহর। ওই বুড়ো চাকরটার নাম হরিহর। নামটা মনে পড়ে গেল আবার দয়াল সান্যালের। নামটা মনে পড়ে যেতেই ভেতরটায় আর একবার আরাম পেলেন তিনি। দয়াল সান্যালের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো শিপ্রা বলে উঠল, বিশ্বাস করো,

আমি যেমন হরির ঝিল বাঁচাতে ওদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম সেরকমই তোমাকেও বাঁচাতে চেয়েছিলাম। তোমাকে মারতে ওরা পোস্টার লিখেছিল। আমি ওদের টাকা দিতে চেয়েছিলাম।

তুমি পারতে না। এখনও পারবে কিনা জানি না। আমি তো টার্গেট আগেই ছিলাম, এখন আমার ছ'বছরের ছেলেটাও টার্গেট হয়ে গেছে।

তোমার অফিসে পলাশের এখনকার বাড়ির ঠিকানাটা আছে না? তুমি দাও। আমি আজই পলাশের বউয়ের কাছে যাব। বলব যা-কিছু হয়েছে তার জন্য দোষ একমাত্র আমার। কোনও শোধ নেওয়ার থাকলে আমার ওপর নিক।

কোনও লাভ হবে না। তা ছাড়া পলাশের বউই বা কাকে বোঝাবে তোমার কথা? যারা বলে 'চারুবাবুর চিন্তাধারা, খুন দিয়ে শুরু করা', তাদের?

যুদ্ধটা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে এরকমভাবে যুক্তির জালে শিপ্রাকে কখনও বিঁধতে পারেননি দয়াল সান্যাল। শিপ্রা ক্রমশ অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করছে দয়াল সান্যালের কাছে।

তা হলে, কী হবে?

একটা রাস্তা বার করেছি। একদম গোপনে, চুপচাপ দূরে বিট্টুকে কোথাও পাঠিয়ে দেব।

কোথায়? উতলা হয়ে জিজ্ঞাসা করল শিপ্রা।

কোনও হস্টেলে। কেউ জানবেও না।

শিপ্রা চমকে উঠল। লোভী কামার্ত পুরুষদের দৃষ্টি থেকে মেয়ের শরীরকে আগলে রাখতে মার্থাও ঠিক এমনই করে একদিন ঠিক করেছিলেন মেয়েকে দূরে কোনও হস্টেলে পাঠিয়ে দেবেন। কত বয়স ছিল তখন শিপ্রার? বিট্টুর থেকে বড়জোর কয়েক বছরের বড়। অথচ সেই দিনটা স্পষ্ট মনে আছে শিপ্রার। কী যে ভীষণ কষ্ট হয়েছিল মাকে ছেড়ে যেতে। বিট্টু কি পারবে মাকে ছেড়ে থাকতে? গলার স্বর বুজে আসছে। কোনওরকমে বলল, কোথায় পাঠাবে ওকে?

কেন? কার্শিয়াং-এ। তুমি যেখানে পড়েছ!

আমি? আমি তো গার্লস কনভেন্টে...

আহ্! তোমার স্কুলে কেন হবে! সরোজকে দিয়ে খোঁজ করিয়েছি। কী যেন একটা নাম বলেছিল, মনে পড়ছে না। যাক গে, সরোজকে জিজ্ঞেস করো, বলে দেবে। ওদের প্রিন্সিপাল শুনলাম এখন কলকাতায় এসেছেন। চলো, দু'জনে মিলে একদিন গিয়ে দেখা করে আসি।

শিপ্রা একটু চুপ করে গিয়ে বলল, বিট্টুকে তুমি দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছ, এটা আবার তোমার নতুন কোনও ফন্দি নয় তো, বরাবর যেটা তুমি আমার সঙ্গে করে এসেছ?

দয়াল সান্যাল অসহায়ের অভিনয় করার চেষ্টা করলেন, তুমি কী ভাবো বলো তো আমাকে? আমার একমাত্র ছেলেকে নিয়েও আমি ফন্দি করব?

তোমাকে আর বিশ্বাস করতে পারি না।

সেটা তো আমিও বলতে পারি। আমার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে তুমি নকশালদের গুলির সামনে ফেলেছিলে। এর পরও তোমাকে কি বিশ্বাস করতে পারি।

আমি যেটা করতে গিয়েছিলাম, তাতে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত যেটা হয়েছে তাতে আমার কোনও হাত ছিল না। তোমার হাত ছিল।

বেশ, আমার হাত ছিল। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। তাই এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আসল ব্যাপারটা হল আমরা কী চাই। আমি চাই আমার ব্যাবসা। তুমি চাও পাখি। ঠিক আছে, হরির ঝিল নিয়ে আমি একটা কমিটি করে দিচ্ছি। একটা ট্রাস্ট হবে। আইন মেনে, দলিল করে...

আবার দলিল? তুমি আগেও আমাকে দু'বার দলিল তৈরি করে সই করতে পাঠিয়েছিলে। চেয়েছিলে ওই জমি আর বাংলোটা যাতে তোমার হাতে তুলে দিই...

কে তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে জানি না। তুমি আগেও চেয়েছিলে হরির ঝিলে পাখিদের নিয়ে কাজ করবে। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারো না তুমি, ওভাবে একা-একা বড় কোনও কাজ করা যায় না। হরির ঝিলটার মালিক কিন্তু তুমি নও। হরিতলার অবস্থা জানো তুমি? ঘরে ঘরে বেকার। লোকে আমার গাড়ি থামিয়ে ভিক্ষের মতো চাকরি চায়। সেখানে তুমি যদি আমার বউ হয়ে পাখি নিয়ে মাতামাতি করো, রাগে লোকাল লোকেরাই পাখিগুলোকে মেরে ফেলবে...

শিপ্রা আনমনা হয়ে পড়ল। দয়াল সান্যাল হয়তো ভুল বলছে না। নকশালরাও তো এরকমই বলেছিল। 'গিয়ে দেখে আসুন ম্যাডাম, ভারতের গণতন্ত্র গ্রামগুলোকে কী দিয়েছে আর আপনাকে কী দিয়েছে। গ্রামগুলোকে দিয়েছে অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর আপনাকে দিয়েছে বাহারি বিদেশি পাখির প্রাণ কীভাবে বাঁচানো যায় নরম সোফায় বসে সেই চিন্তা করে বিলাসিতা করার সময়।' দয়াল সান্যালের যুক্তির জালে আত্মসমর্পণ করতে থাকল শিপ্রা।

চুপ করে ঘাড় হেলাল শিপ্রা। সূক্ষ্ম একটা হাসি ফুটে উঠল দয়াল সান্যালের ঠোঁটে।

২২

দয়াল সান্যাল অফিসে এসেই সরোজ বক্সীকে ঘরে ডেকে নিলেন, উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, পলাশের বউ কখন গেল?

আধঘণ্টা মতো ছিল স্যার। তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে...

টাকাকড়ি দিয়েছ কিছু?

না স্যার, দিতে গেলে অন্যরকম মানে হয়ে যেতে পারত সবার সামনে। তবে ওকে আমরা অফিস থেকে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে বাড়ি পাঠিয়েছি।

চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন দয়াল সান্যাল। চিন্তিত গলায়

বললেন, নতুন করে চিন্তায় ফেলল পলাশের বউটা। বেশি ঝামেলা আরম্ভ করলে পুলিশ হাত গুটিয়ে নেবে। পুলিশ একবার হাত উঠিয়ে নিলে হরির ঝিলটা আর কোনওদিনই হাতে আসবে না।

স্যার, পলাশের বউ এখানে বারবার বলছিল চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের কথা। বারবার বলছিল, পলাশ নকশাল ছিল না।

দয়াল সান্যাল ভুরু কুঁচকে চিন্তা করতে থাকলেন। কপালে কয়েকবার আঙুল ঠুকলেন। তারপর বন্ধ চোখেই বললেন, পলাশ যে নকশাল ছিল না, সেটা তো তোমার-আমার চেয়ে বেশি ভাল কেউ জানে না। শুয়োরের বাচ্চাটা ছিল এক নম্বরের গিরগিটি। এমনকী, খোদ নকশালরাও তো ওকে কখনও সন্দেহ করেনি! তবে আমার কাছে, পলাশ ওয়াজ এ গুডবয়। ঠিক ঠিক আমি যেরকম চেয়েছিলাম, কাজ করে গেছে। এমনকী, আমি যেমন মনে মনে চেয়েছিলাম শুয়োরের বাচ্চাটা পুলিশের গুলিতে মরে যাক, সেই কথাটাও পলাশ রেখেছে। গুলি খেয়েই মরেছে। সেদিন লালবাজারে শুনছিলাম, নকশালদের মধ্যে এখন পলাশের মতো ভেজাল প্রচুর। আদর্শবাদী ডেঞ্জারাস নকশালগুলো এখন হাতে গোনা হয়ে যাচ্ছে। যাক গে, ওই ছেলেটার নাম কী যেন? পলাশ মিলে যার তলায় কাজ করত?

অনন্ত গুহ, স্যার।

ওর সঙ্গে পলাশের বউয়ের যোগাযোগ আছে না?

আছে বোধহয়। পলাশের বউ তো মিলে এলে ওর খোঁজই করে।

ওকে দিয়ে পলাশের বউকে খবর পাঠাও মিলে আসতে। নাগর বললে ও ঠিক আসবে।

দয়াল সান্যালের মনের ভেতর কী আছে তার তল কখনওই পান না সরোজ বক্সী। তবে বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে দীর্ঘদিনের অভ্যাসে একটা জিনিস রপ্ত করে নিয়েছেন—বিস্ময় গোপন করার। দয়াল সান্যাল পরের কাজের প্রসঙ্গে চলে এলেন।

একটা সেল ডিড বানাও। ম্যাকার্থির বাংলোটা পঁচিশ হাজার টাকায় শ্রীমতী শিপ্রা সান্যাল ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজকে বিক্রি করবে।

সরোজ বক্সী ইতস্তত করে বললেন, স্যার, আগের দুটো স্ট্যাম্প পেপার তৈরি করা অবস্থায় পড়ে আছে। ম্যাডাম সই করেননি।

এবার নতুন বয়ান হবে। আগের দু'বারই অন্যভাবে সম্পত্তিটা পাওয়ার বয়ান করেছিলাম। এবার একদম নতুন অ্যাঙ্গেলে বয়ানটা হবে। উকিলের সঙ্গে কথা বলো। দুটো শর্ত জুড়তে হবে। এক, ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজকে শ্রীমতী শিপ্রা সান্যাল এটা লিজ দিচ্ছে এই শর্তে যে, ম্যাকার্থির বাংলোয় পাখি নিয়ে গবেষণার জন্য একটা রিসার্চ সেন্টার হবে। রিসার্চ সেন্টারটি দেখাশোনার জন্য কমিটি হবে। সেই কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন শ্রীমতী শিপ্রা সান্যাল নিজে। গবেষণার সব খরচ জোগাবে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজ কখনওই নিজের ব্যাবসার কাজে এই সম্পত্তিটা ব্যবহার করতে পারবে না।

সরোজ বক্সী একটু চিন্তা করে বললেন, আগের বারে স্যার, ডিড দুটোয় চোখ বুলিয়েই ম্যাডাম বুঝতে পেরেছিলেন যে...

দয়াল সান্যাল চটে উঠলেন, আঃ সরোজ! যা বলছি তাই করো। তোমাকে বলছি তো তুমি উকিলের সঙ্গে কথা বলো। ম্যাকার্থির বাংলোটা আমার চাই। ওটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। আমাদের গোডাউন বাড়াতে হবে। একবার এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা হয়ে গেলে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ, সব মার্কেট ধরতে হবে। প্রোডাকশন বাড়াতে হবে। তার জন্য মেশিনপত্র, গোডাউন... আরও কত জায়গা লাগবে তোমার মাথায় ঢুকবে না সরোজ...। তাই সব ব্যাপারে মাথা লাগিয়ো না, বুঝলে! যাক গে, সেই মেয়েটা ফোন করেছিল?

হ্যাঁ স্যার, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

উফ্! এই কথাটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলে!

সরোজ বক্সী মনে মনে বললেন, বলার সুযোগটা কখন দিলেন? এসে থেকেই তো বন্দুকের গুলির মতো একটার পর একটা সমস্যা ছুড়ে দিচ্ছেন।

দয়াল সান্যাল অসহিষ্ণুর মতো বলে উঠলেন, দেখা করতে চায় কেন?

আমাকে আর বেশি কিছু বলেনি স্যার। তবে আমাকে একটা ফোন নম্বর দিয়েছে। বলেছে ওই নম্বরে ফোন করে জুলি বললে ডেকে দেবে।

সরোজ বক্সী পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে দয়াল সান্যালের টেবিলের ওপর রাখলেন। চিরকুটে লেখা ফোন নম্বরটায় চোখ বুলিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, টাকা চায়নি?

আর কিছু বলেনি স্যার।

ঠিক আছে। আমি দেখছি।

সরোজ বক্সী একটু ইতস্তত করে বললেন, স্যার, আপনি যে এগ্রিকালচারিস্টের কথা বলেছিলেন...

পেয়েছ কাউকে?

দু'জনকে স্যার। বলছে অনেক কাজকর্ম করেছে...

ওরকম সবাই বলে। যাক গে, কী কাজকর্ম করেছে একটু ভেতরে ভেতরে খোঁজখবর করে আপাতত চুপচাপ বসে থাকো।

আমি ভাবছিলাম...

সরোজ বক্সীকে থামিয়ে দিলেন দয়াল সান্যাল।

তুমি একটু কম ভাবো সরোজ। যে-কাজটা যখন করতে বলব, শুধু সেইটুকুই নিয়ে ভাববে। গুরুজনরা একটা কথা বলে গেছেন, হাতের মুঠোয় বেশি ভাত ধরার চেষ্টা করবে না। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যাবে। মুঠো খুলে দেখবে, হাতে আর কিছু নেই। নিজের ভাবনাচিন্তাটা একটু কম করো।

সরোজ বক্সী মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দয়াল সান্যালের কখন যে কী খেয়াল হয়! এই সকালেই বলেছিল এগ্রিকালচারিস্টের কথা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে

খেয়ালটা কর্পূরের মতো উবে গেছে। আর হাতের মুঠোয় কে বেশি ভাত ধরার চেষ্টা করছে? দয়াল সান্যাল নিজের হাতের মুঠোর ভেতর কী আছে দেখেছেন কি?

নিজের ঘরে এসে বসতে না-বসতেই আবার দয়াল স্যান্যালের ঘরে ডাক পড়ল সরোজ বক্সীর। চেম্বারে ঢুকতেই দয়াল সান্যাল মুখ তুলে একবার চাইলেন। তারপর একপাশের ড্রয়ার খুলে ঘেঁটে একটা ছোট লাল বই বার করে টেবিলের ওপরে রাখলেন। বইটার ওপর কতগুলো হলদে তারা। আর সামরিক পোশাক পরে একজন চৈনিক মানুষের ছবি। বইয়ের ওপর দু'বার আঙুল ঠুকে দয়াল সান্যাল বললেন, এটা নকশালদের আইডেন্টিটি। মিলে পলাশের লকারে বইটা রাখার ব্যবস্থা করো। ইচ্ছেমতো কয়েকটা লাইনের তলায় লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করে দাও। দু'-একটা জায়গায় শুভানন, বিপ্রতীপ নামগুলো লিখে দাও। আর এক জায়গায় বড় বড় করে লিখে দাও, দয়াল সান্যালের মাথা চাই। কাল-পরশু পলাশের বউ যখন মিলে আসবে, ওর সামনে লকারটা খোলা হবে আর তার মধ্যে যেন পাওয়া যায় এই রেড বুকটা।

সরোজ বক্সী টেবিলের ওপর থেকে বইটা তুলে নিলেন। ছোট্ট হালকা বইটাও তাঁর ভারী মনে হল খুব। এই বই পশ্চিমবঙ্গে এখন নিষিদ্ধ। কী আছে বইটাতে যার জন্য এত ছেলেমেয়ে উদ্বুদ্ধ? খুনোখুনি? রক্ত? চুম্বকের মতো টানল বইয়ের পাতাগুলো। এবং এক জায়গায় এসে থেমে গেল চোখটা। কতগুলো লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া। একটা-একটা করে অক্ষরগুলো পড়তে থাকলেন সরোজ বক্সী।

বইটা পলাশের লকারে রেখে পলাশকে নকশাল প্রমাণ করতে হবে, কিন্তু হঠাৎ এই লাইনগুলোর তলায় কেন লাল আন্ডারলাইন করা, বুঝতে পারলেন না। কে দিল দাগটা? দয়াল সান্যাল নিজে, নাকি এটা যার বই ছিল সে?

সরোজ বক্সীর দিয়ে যাওয়া চিরকুটে লেখা নম্বরটায় দয়াল সান্যাল ফোন করলেন। অন্য প্রান্তে একজন লোক ধরে জুলি নামটা শুনেই লাইন কেটে দিল। ওপ্রান্তের লোকটার এই প্রতিক্রিয়া দেখে ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করলেন দয়াল সান্যাল, তারপর ফোন করলেন চাড্ডার হোটেলে। চাড্ডাকে দুপুরে এই সময়ে হোটেলে পাবেন কিনা সংশয় ছিল। কিন্তু অপারেটর হয়ে ফোনটা চাড্ডা পর্যন্ত পৌঁছেই গেল।

গুড মর্নিং, মিস্টার চাড্ডা, সানিয়াল হিয়ার।

চাড্ডা একটা ক্লান্ত হাই তুলল, গুড আফটারনুন সানিয়াল সাহেব। বোলিয়ে হোয়াটস দ্য ম্যাটার।

আপনার কাছে একটা ফাইল পাঠানোর ছিল। আমাদের কোম্পানির পুরো প্রোফাইলটা আছে। আপনি যা যা চেয়েছিলেন, এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা বার করার জন্য।

চাড্ডা একটু চুপ করে থেকে বলল, কাল রাত আপ কিস প্রোফাইলকো ভেজা থা?

দয়াল সান্যাল সতর্ক হলেন। কাল মাতাল হয়ে একটু বেহিসেবি চাল হয়ে গেছে। চাড্ডা লোকটা কেমন, আর একটু বুঝে নেওয়ার দরকার ছিল। নির্মল চ্যাটার্জি বলেছিল লোকটা বিশুদ্ধবাদী, মেয়ের দোষ নেই। নেশার ঘোরে দুম করে বাজারি মেয়েটাকে

পাঠিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। চাড্ডা কাল বাংলায় কথা বলছিল, আজ ভাষাটা হিন্দি হয়ে গেছে।

ওহ্ লড়কি মুঝে পুছ রহি থি আপকো এক্সপোর্ট লাইসেন্স মিলেগা ইয়া নেহি। ইয়ে বাত তো আপ ডাইরেক্ট কাল মুঝেভি পুছ সকতে থে... ফির...

দয়াল সান্যাল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন, না চাড্ডাসাহেব, কাল ক্রিসমাস ছিল। সন্ধেবেলায় সবাই একটু আনন্দ-ফুর্তি-রিল্যাক্স করছিলাম। কথাটা উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু সবসময় কি আর বিজনেসের কথা ভাল লাগে! বিজনেসের বাইরেও একটা জীবন আছে।

চাড্ডা ফোনে একটা চুকচুক করে আওয়াজ করল, আপ বওহত ঘুমা-ফিরাকে বাত করতে হ্যায়। স্পিক সিম্পল। আই ক্যান ডিসটিঙ্কটলি রিমেম্বার, ইয়েস্টারডে নাইট আপনে বোলাথা কী—চাড্ডা, আমাকে একটা এক্সপোর্ট লাইসেন্স করিয়ে দিতেই হবে, অ্যান্ড আই টোল্ড ইউ অ্যাবাউট ভিয়েতনাম ওয়ার এটসেট্রা, এটসেট্রা...। অ্যান্ড আই অলসো টোল্ড ইউ দ্যাট উই হ্যাভ টু প্রোসিড স্টেপ বাই স্টেপ। অ্যান্ড দেন এগেন ইউ সেন্ড দ্যাট গার্ল। বিনা বিজনেস আপনে কিউ উস লড়কিকো ভেজে থে? সি, আই স্পিক স্ট্রেট। যবতক বেংগলমে প্রেসিডেন্ট রুল খতম নেহি হোগা ম্যায় কুছ নেহি কর সকতা হু।

প্রেসিডেন্ট রুলের সঙ্গে এক্সপোর্ট লাইসেন্সের কী সম্পর্ক? ওটা তো সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির ব্যাপার।

আপকি মুশকিল ইয়ে হ্যায় কে, কুছ বাত আপ জাদাহি সমঝ লেতে হ্যায়, রেড টেপ কে বারেমে তো জরুর সুনা হোগা। আপকা রেড টেপ খুলানেকে লিয়ে প্রেসিডেন্টস রুল খতম হোনা জরুরি হ্যায়।

কব খতম হোগা ইয়ে প্রেসিডেন্টস রুল?

এক দো মাহিনা অউর দেখ লিজিয়ে, মালুম পড় জায়েগা। বাট ফর দ্যাট গার্ল... মেরি তরফ সে আপকো ভি কুছ রিটার্ন গিফ্‌ট দেনা হ্যায়। সুনা থা লাস্ট মান্থ আপ প্রাইম মিনিস্টারসে মিলনেকা মওকা মিস কর গেয়ে থে! ইন আ ফিউ মান্থ শি উইল কাম টু লে দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন ফর মেট্রো রেল অফ ক্যালকাটা। ডু ইউ ওয়ান্ট টু মিট হার?

জুলি কাজের কাজটা তা হলে করেছে! ভেতরটা ভরে গেল দয়াল সান্যালের।

বিকেলের দিকে দয়াল সান্যালের অফিসে এল জুলি। ওকে ওর প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে পরের কাজটার জন্য ব্যারাকপুর চলে যেতে বললেন দয়াল সান্যাল।

২৩

হরিহর একটা শুকনো চেহারা নিয়ে এক গ্লাস দুধ এনে বিট্টুর পড়ার টেবিলে রাখল। অন্য দিন দুধটা রেখে বিট্টুকে সেটা খেয়ে নেওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করে। আজ সেরকম কিছু করল না। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। শিপ্রা প্রথমে

খেয়াল করেনি। চোখে পড়তেই জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে হরিহর। শরীর খারাপ নাকি?

হরিহর দু'দিকে মাথা নাড়ল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, আমার ছুটি হয়ে গেল মেমসাহেব।

শিপ্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ছুটি হয়ে গেল মানে?

সাহেব আজ আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন সামনের মাস থেকে আর আসার দরকার নেই। অনেক বয়স হয়েছে, রেটায়ার নিতে।

হরিহরের দিকে আরও অবাক চোখে তাকাল শিপ্রা। লোকটাকে বিয়ের পর থেকে একইরকম দেখছে। এই এত বছর পরেও যেটুকু চুল পেকেছিল তার বেশি একটাও পাকেনি। বয়স যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে ওর।

তোমার বয়স কত হল হরিহর?

সকালে সাহেব যে-প্রশ্নটা করেছিল, অবিকল তারই যেন প্রতিধ্বনি শুনল হরিহর। উত্তরটা দিতে সকালে গলাটা কেঁপেছিল, এখন আর কাঁপল না। বুক বেঁধে বলল, সত্তর মেমসাহেব। কিন্তু এখনও এ-বাড়ির যে-কোনও চাকরের চেয়ে আমি বেশি খাটতে পারি...

শিপ্রা লজ্জা পেল। শিপ্রার দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বয়স লোকটার। অথচ চিরকাল লোকটাকে নাম ধরেই ডেকে এসেছে। এখন আর নিজেকে সংশোধন করা যায় না। তবে হরিহরের যে এরকম করে চাকরিটা চলে যাচ্ছে, এটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। খানিকটা হরিহরকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, তুমি কতটা খাটতে পারো এটা সবাই জানে হরিহর। আর তোমার সাহেবকেও তো চেনো। কোনও কারণে রেগে গিয়ে হয়তো বলেছে।

হরিহর দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল।

না মেমসাহেব। সাহেবের গলার স্বর আমি চিনি। কোন কথাটা উনি রেগে বলেন, আর কোন কথাটা ভেবে বলেন, বুঝতে পারি। আমার ছুটিই হয়ে গেছে মেমসাহেব।

হরিহরের সঙ্গে শিপ্রাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বয়স্ক মানুষটা ঠিকই বলছে।

শিপ্রার শুকনো মুখ দেখে হরিহর চোখ নামিয়ে নিল। এতদিন কাজ করে এই সার সত্যটুকু বুঝেছে, এ-বাড়িতে সাহেবের কথাই শেষ কথা। সাহেবের কোনও সিদ্ধান্তই মেমসাহেব বদলাতে পারবে না। সে শুধু জানতে চায় হঠাৎ করে আজ তার চাকরি যাওয়ার কারণটা কী? শুধুই কি তার বয়স? সে তো যথেষ্ট কর্মঠ। বয়স তো তার কাজের গতিতে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি। নাকি তার চাকরি খোয়ানোর কারণটা অন্য? সেটা কি মেমসাহেবের প্রতি অপরিসীম আনুগত্য, যেটা সাহেবের বিষনজরে পড়ে গেছে?

তুমি এবার কী করবে হরিহর?

দেশে চলে যাব। কিন্তু দেশে গিয়ে কী করে চালাতে পারব জানি না মেমসাহেব। দুটো মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি। আপনাদের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। খাওয়াপরার চিন্তা ছিল না। মাইনের টাকা সবটাই দেশে পাঠাতে পারতাম...

গলা ধরে এল হরিহরের। সম্ভাব্য দুর্দিনের কথা আরম্ভ করল। শিপ্রা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়ল। হরির ঝিলের ট্রাস্টের কাজকর্ম আরম্ভ হলে ওখানে না হয় হরিহরের কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু এ-বাড়িতে হয়তো রাখা যাবে না। ততদিন ওর একটা কিছু উপায় করতে হবে। ভেতরে ভেতরে হরিহরের জন্য কী করা যায় চিন্তা করতে থাকল। এই সৎ চেষ্টাতেই একটা সমাধান মনে এল।

তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ, ওর মাথায় যখন একবার ঢুকে গেছে তোমাকে ছাড়িয়ে দেবে, আমি আর বলে কিছু করাতে পারব না। তবে আপাতত তোমার একটা কাজের ব্যবস্থা করতে পারি।

হরিহর শিপ্রার কথায় ঠিক ভরসা পেল না। দুঃখে ভেজা গলাতেই বলল, বয়সের জন্যই এ-বাড়ির চাকরিটা গেল। এই বয়সে আমাকে কি আর কেউ নতুন করে চাকরি দেবে মেমসাহেব?

দেবে। এখন তোমার কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ব্যারাকপুরে আমার মা'র এক বন্ধু আছে। বয়স হয়েছে। একাই থাকে। তার কাছে পাঠাব তোমাকে।

আপনি এতদিন যেখানে গিয়েছিলেন মেমসাহেব?

শিপ্রা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কী করে জানলে?

সরোজবাবু একদিন বলছিলেন ব্যারাকপুরে আপনি কোন ঠিকানা থেকে ফোন করেন আপনাকে জিজ্ঞেস করে রাখতে।

শিপ্রা গম্ভীর গলায় বলল, হ্যাঁ, সেই বাড়িতেই। মায়ের বন্ধুকে আমি আন্টি বলি। আন্টির কাছে একটা মেয়ে ছিল। বাচ্চা কাজের মেয়ে। কাল আন্টি ফোন করেছিল। বলছিল সেই মেয়েটা বাংলাদেশে চলে গেছে। আন্টি তাই এখন একদম একা। তুমি আন্টির বাড়ি গিয়ে কাজ করো। আন্টির দেখাশোনা করো। আন্টি যা মাইনে দিতে চায় নিয়ে নিয়ো। এ-বাড়ির মাইনে ধরলে বাকি টাকাটা আমি মাসে মাসে তোমার ঠিকানায় মানি অর্ডার করে পাঠিয়ে দেব যতদিন না তোমার অন্য কিছু ব্যবস্থা করতে পারি। আমার মনে হয় তুমি এটাই করো, তোমার ভাল হবে।

হরিহর তবুও ভরসা ফিরে পাচ্ছিল না। অবিশ্বাসী গলায় জিজ্ঞেস করল, একলা মেয়েছেলে থাকেন, আমাকে কি রাখবেন?

আমি কথা বলে দেব। তোমার কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। মন খারাপ কোরো না। বিট্টু কোন ঘরে আছে দেখো তো। দুধটা খেতে পাঠিয়ে দাও।

বছরের শেষ দিনে শিপ্রার কথায় ভরসা করে হরিহর সত্যিই চলে গেল সান্যালবাড়ি ছেড়ে।

আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়... ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

লেপের ওপর আলতো করে চাপড়ে নিচুস্বরে গুনগুন করতে করতে বিট্টুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিল শিপ্রা। ঘুমটা ভেঙে গেল বাইরের ভারী লোহার গেট খোলার আওয়াজে। তবে একটু পরেই দোতলার সিঁড়িতে দয়াল সান্যালের জড়ানো

গলার আওয়াজ পেল, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার... হ্যাপি নিউ ইয়ার... হ্যাপি নিউ ইয়ার...'

আওয়াজটা আস্তে আস্তে দয়াল সান্যালের ঘরের দিকে চলে গেল। দেওয়াল ঘড়িতে কাঁটা বারোটা পেরিয়ে গেছে। শিপ্রা ঘুমন্ত বিট্টুর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে ফিসফিস করে বলল, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার।'

দয়াল সান্যাল বাথরুমে ঢুকে মুখে জলের ছিটে দিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আয়নার ছায়াটাকে চেনার চেষ্টা করলেন। এ কোন দয়াল সান্যাল আয়নার সামনে? যে-লোকটা ক'দিন আগেও দু'পেগের বেশি এক ফোঁটাও মদ খেত না, সেই লোকটাই বেহেড বেসামাল হয়ে এখন বাড়ি ফেরে। সামনের আয়নার ওপর মানুষটাকে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। আয়নাটার ওপর পাগলের মতো হাত বোলাতে থাকলেন, কিন্তু মানুষটা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না।

রেজোলিউশন নিতে হবে। নতুন বছরের রেজোলিউশন। আয়নার মানুষটাকে বললেন দয়াল সান্যাল। এক নম্বর রেজোলিউশন, কিছুতেই আর বেহেড হয়ে মনের কথা বেফাঁস বলে ফেলবেন না। দু'নম্বর, শিপ্রা... না হরির ঝিল না... গুছিয়ে রেজোলিউশনগুলো দানা বাঁধছে না। পা-টা টলটল করছে। মনে হচ্ছে আয়নার সামনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়ালে মাথা ঘুরে এখানেই পড়ে যাবেন। আয়নার মানুষটাকে বললেন, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার।' তারপর জামাকাপড় না ছেড়েই বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে সিলিং-এর পাখাটাকে বললেন, 'হ্যাপি নিউ ইয়ার।' ভীষণ গুমোট লাগছে। কেউ এসে পাখাটা চালিয়ে দিলে ভাল হত। কাকে ডাকবেন পাখাটা চালিয়ে দিতে? বুড়ো সেই লোকটার মুখটা ভেসে উঠছে, কিন্তু তার নামটা আবার কিছুতেই মনে পড়ছে না।

নিজেই উঠলেন পাখাটা চালাতে। সুইচ বোর্ডের কাছে এসে মনে হল, বিট্টুকে তো বলা হল না, হ্যাপি নিউ ইয়ার! শরীরটাকে টানতে টানতে এগিয়ে গেলেন বিট্টুর ঘরের দিকে।

দরজাটা হালকা করে ভেজানো। পাল্লাটা ঠেলে খুললেন দয়াল সান্যাল। ঘরের ভেতর অন্ধকার। বাইরের প্যাসেজ থেকে ঠিকরে আসা আলোয় দেখলেন খাটের ওপর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে শিপ্রা আর বিট্টু। গলা ছেড়ে সবে বলতে যাবেন, হ্যাপি নিউ ইয়ার, এমন সময় হঠাৎই চোখে পড়ল আলো-আঁধারি মাখা দেওয়ালটা। মা কালী টকটকে লাল জিভ বার করে বড় বড় চোখ করে একটা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দয়াল সান্যালের দিকে। হরিহর এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন তারাপীঠের কালীর ছবিওয়ালা এই ক্যালেন্ডারটা শিপ্রাকে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, মা কালী সব ঠিক করে দেবেন। হরিহরের আন্তরিকতাকে মর্যাদা দিতে শিপ্রা বলেছিল ক্যালেন্ডারটা দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতে।

দয়াল সান্যালের শরীরের মধ্যে কয়েকটা বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। সেটা মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভয় গ্রাস করে নিল শরীরটাকে। গলা দিয়ে বেরোতে লাগল অপার্থিব এক গোঙানি।

গেট খোলার আওয়াজে শিপ্রার যে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তারপরে আর ঘুম

আসেনি। চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় কানে আসছিল বাথরুম থেকে দয়াল সান্যালের মাতলামো। দয়াল সান্যাল যখন এ ঘরের দরজার পাল্লা ঠেলে খুললেন, তখনও একটা বিরক্তি চেপে চোখ বন্ধ করে কাঠ হয়ে শুয়ে ছিল শিপ্রা। কিন্তু চোখ খুলল অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজে। দরজার দিকে তাকিয়ে আরও চমকে উঠল সে। দরজার কাছে পাংশু হয়ে যাওয়া আতঙ্কিত একটা মুখ নিয়ে বিস্ফারিত চোখে দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের দিকে চেয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন দয়াল সান্যাল আর গলায় সেই বীভৎস না-ফোটা ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ।

এরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি। ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসেও থতমত খেয়ে কী করবে ভেবে পেল না শিপ্রা। সংবিৎ ফিরল বিট্টু এরকম বীভৎস একটা আওয়াজে উঠে পড়ে কান্না জুড়ে দেওয়ায়। তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এসে দয়াল সান্যালকে ধরে ঝাঁকাতে গেল শিপ্রা। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই বুঝল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কোনওরকমে দয়াল সান্যালকে ধরে খাটে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করল শিপ্রা।

তিনদিন পর পুরোপুরি সুস্থ হলেন দয়াল সান্যাল। রক্ত এবং আনুষঙ্গিক পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া গেল না। ডাক্তার মত দিলেন, ভাইরাল ফিভার। ডাক্তারের কাছে অবশ্য শিপ্রা ক্যালেন্ডারের কথাটা কিছু বলেননি। সেদিন রাতেই দেওয়াল থেকে খুলে ফেলেছিল ওটা।

সুস্থ হয়েই অফিসে যাওয়া শুরু করে দিলেন দয়াল সান্যাল। একদিন দুপুরের দিকে নির্মল চ্যাটার্জি দয়াল সান্যালের অফিসের চেম্বারে ঢুকে বললেন, কী ব্যাপার সান্যালমশাই! একবারও হ্যাপি নিউ ইয়ার বলতে ফোন করলেন না?

দয়াল সান্যাল কাগজপত্তর সই করছিলেন। মুখটা তুলে বললেন, আর বলবেন না, বছরটার শুরুতেই জ্বরে পড়লাম। তিনটে কাজের দিন নষ্ট হল। যাই হোক, হ্যাপি নিউ ইয়ার।

হ্যাপি নিউ ইয়ার, স্যার। নাইটিন সেভেনটি টু আপনার খুব ভাল কাটুক। মা লক্ষ্মী আপনার সিন্দুকে, পাসবইয়ে উপচে পড়ুন। আর যেন জ্বরজ্বালা না হয়, আপনার এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা হয়ে যাক...

দয়াল সান্যাল টেবিলের ওপর কাগজপত্তরগুলোকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি এত গুড উইশ করে যাচ্ছেন, তবে কিছুই মিলবে বলে মনে হচ্ছে না। চাড্ডা শুধুই টাকা খেয়ে গেল। কোনও আশার কথা শোনাচ্ছে না।

চাড্ডার সঙ্গে সেদিন ফোনে কী কথা হয়েছে দয়াল সান্যাল চেপে গেলেন। নির্মল চ্যাটার্জি অবশ্য কোনও হতাশা দেখালেন না।

আপনি অধৈর্য হচ্ছেন কেন? চাড্ডা কাজের লোক। পাওয়ার লবির সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রির কানেকশনটা ভালই সামলায়। ওর কাছে রুলিং পার্টি, অপোজিশন কোনও ব্যাপার নয়। যাকে ধরলে কাজ হবে তাকে ধরে ঠিক করিয়ে দেবে। ভরসা যখন দিয়েছে...

কোনও ভরসা দেয়নি চাটুজ্যেমশাই। সেই দেখছি-দেখব বলে কাটিয়ে গেছে।

নির্মল চ্যাটার্জি একটা অর্থপূর্ণ হাসলেন। চোখটা টিপে বললেন, যা একখানা বোম্বাই পিস পাঠিয়েছিলেন না, চাড্ডার একদম দিল খুশ। আপনার কাজটা হয়ে যাবেই। কে ছিল মশাই মেয়েটা?

দেখেছেন আপনিও। দরকার হলে বলুন আপনার কাছেও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নির্মল চ্যাটার্জি কানে হাত ঠেকালেন, ছি ছি মশাই। ব্রাহ্মণের ছেলে। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক করি। অত দেখার দরকার নেই। শুধু জানতে ইচ্ছে করছে কে মেয়েটা?

চাড্ডাকেও তো আপনি ব্রহ্মচারীর সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। আপনার ব্রাহ্মণত্বের জোরটা একবার পরখ করেই নিন না!

ওফ্ মশাই! বলুন না, কে ছিল মেয়েটা?

বড়দিনের দিন সুজন দত্তর সঙ্গে যে-মেয়েটাকে দেখেছিলেন ক্লাবে...।

নির্মল চ্যাটার্জি চোখ বড় বড় করলেন, বলেন কী মশাই? আপনি তো চাড্ডার চেয়েও সাংঘাতিক লোক। সেদিনই সুজন দত্তর কোল থেকে চাড্ডার বিছানায় পাঠিয়ে দিলেন?

কী পরিস্থিতে ব্যাপারটা ঘটেছিল দয়াল সান্যাল বিশদ আর ভাঙলেন না। তবে নির্মল চ্যাটার্জির বিস্ফারিত চোখ দুটো পুরো উপভোগ করলেন। বেল বাজিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে বললেন, চাড্ডার ব্যাপারটা তো ঝুলেই রইল। এবার ছোট একটা কাজ করে দিন তো মশাই, ক্লাবের মেম্বারশিপটা করিয়ে দিন।

ওতে তো এমনি কোনও সমস্যা নেই সান্যালমশাই। একেবারে টপমোস্ট লোককে দিয়ে রেফার করিয়ে দেব। খালি ওই যে আপনাকে বলেছিলাম, ছোট্ট একটা ফর্মালিটি আছে। আপনাকে আপনার গিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে একটা ইন্টারভিউ দিতে হবে।

দয়াল সান্যাল হাত উলটে বললেন, হবে তো হবে। এতে আবার সমস্যা কী দেখছেন?

কোনও সমস্যা নেই বলছেন?

সমস্যা... কী আবার সমস্যা? এই তো জ্বরের মধ্যে এত সেবাযত্ন করল।

নির্মল চ্যাটার্জি স্যালুট করার ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকালেন, না মশাই। আপনাকে স্যালুট করতেই হচ্ছে। আপনার গিন্নির সঙ্গে আপনার সম্পর্কর গল্পটা এখন বাজারের সবাই জানে। উনি নকশালদের সঙ্গে মিশছিলেন। বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আপনার ব্যবসায় বাধা দিচ্ছেন। আর আপনি বলছেন উনি আপনার জ্বরে মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন! এরপর একসঙ্গে আপনারা ক্লাব মেম্বারশিপের ইন্টারভিউ দিতে যাবেন... সব মিটমাট, ভাবাই যায় না। বললাম না মশাই—নাইনটিন সেভেনটি টু আপনার দারুণ যাবে! দেখে নেবেন। আপনি পি. সি. সরকারের ভোজবাজি দেখাবেন। ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি আপনার ক্লাব-মেম্বারশিপের। তবে মশাই একটা কথা আছে, আপনার মনে আছে তো ক্লাবে চাইনিজ গ্রাসের কথাটা? দারুণ একটা লোক পেয়েছি। কমলেশ ভাণ্ডারী। মেম্বারশিপটা হয়ে গেলেই সুজন দত্তকে টেক্কা মারতে হবে।

ঠিক আছে, আগে হোক। আপনি সরোজের কাছে দিয়ে রাখুন কমলেশের নামটা।

বউবাজারে বো-ব্যারাকে লাল বাড়িটার সামনে এসে দয়াল সান্যালের মনেই হল না যে কলকাতার কোথাও আছেন। গোটা পরিবেশটাই কেমন যেন অন্যরকম। সরোজ বক্সী তাড়াতাড়ি গাড়ির সামনের সিট থেকে নেমে পিছনের দরজাটা খুলে শিপ্রাকে বললেন, আসুন ম্যাডাম।

গাড়ি থেকে নেমে শিপ্রাকে পাশে নিয়ে সরোজ বক্সীর পিছু পিছু একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। সিঁড়িটায় হরেক রকম লোক ওঠা-নামা করছে। তাদের বাঁচিয়ে দোতলায় উঠে একটা দরজার বেল টিপলেন সরোজ বক্সী।

কিছুক্ষণ পর দরজাটা খুলল। একজন বয়স্কা মহিলা দরজার বাইরে তিনজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলেন, ইয়েস?

সরোজ বক্সী দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করে বললেন, অ্যান্ডারসন সাহেব আছেন?

বয়স্কা কিছু বললেন না। ভেতরে আসতেও বললেন না। তবে মুখের ওপর দরজাটাও বন্ধ করলেন না। এমনকী অ্যান্ডারসন সাহেব আছেন কিনা তাও বললেন না। ঘরের ভেতর চলে গেলেন। অপ্রস্তুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকল তিনজন। দয়াল সান্যাল বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে থাকলেন, কীসব জায়গায় তুমি নিয়ে আসো সরোজ? কোথাকার কে, ভিক্টর না কাকে খুঁজে বার করলে সে নাকি সব করে দেবে! তার টিকিও তো দেখছি না। পাঠিয়ে দিল এরকম একটা ফালতু জায়গায়। তার চেয়ে যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তাকে আমার অফিসে নিয়ে আসতে পারতে, বাড়িতে নিয়ে আসতে পারতে। নিদেনপক্ষে ভাল কোনও একটা জায়গায়...

দয়াল সান্যালের অসন্তোষ বেশি দূর গড়াল না। এক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। চৌকাঠে দাঁড়ানো সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়েস?

সরোজ বক্সী আগের মতোই হাতজোড় করে বললেন, অ্যান্ডারসন সাহেব আছেন?

ভদ্রলোক বললেন, আয়্যাম অ্যান্ডারসন।

সরোজ বক্সী আরও অমায়িক হলেন, স্যার, ভিক্টর সাহেবকে বলেছিলাম। আপনি এখন কলকাতায় এসেছেন, এই সুযোগে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ডি. সান্যাল আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, ও ইয়েস, ইয়েস। ভিক্টর টোল্ড মি। প্লিজ ডু কাম ইন।

সরোজ বক্সী এবার সামনে থেকে সরে গিয়ে দয়াল সান্যাল আর শিপ্রার ভিতরে ঢোকার রাস্তা প্রশস্ত করে দিল। তারপর দয়াল সান্যালকে বললেন, আমি তা হলে নীচে গাড়িতে যাচ্ছি স্যার।

দয়াল সান্যাল মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরে ঢুকে অ্যান্ডারসন সাহেবের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আয়্যাম ডি. সানিয়াল।

শিপ্রা হাতজোড় করে নমস্কার করল। অ্যান্ডারসন সাহেব দু'জনকে বসতে বলে বললেন, ভিক্টর আমাকে বলেছে মিস্টার সানিয়াল। আপনারা আপনাদের ছেলেকে আমার স্কুলে দিতে চান।

একজ্যাক্টলি সো মিস্টার অ্যান্ডারসন। দয়াল সান্যাল বললেন।

কত বয়স আপনাদের ছেলের?

নভেম্বরে ছয় কমপ্লিট করেছে।

অ্যান্ডারসন সাহেব দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, জাস্ট সিক্স প্লাস! টু ইয়াং... টু ইয়াং। এত ছোট বাচ্চাকে আমাদের বোর্ডিং-এ নেওয়ার কোনও প্রভিশন নেই।

দয়াল সান্যাল ঝুঁকে পড়ে বললেন, কিছু একটা আপনাকে করতেই হবে। আমরা অনেক আশা করে এসেছি।

অ্যান্ডারসন সাহেব এবার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এত ছোট ছেলেকে আপনারা বোর্ডিং-এ পাঠাতে চাইছেন কেন বলুন তো? কলকাতায় এত ভাল ভাল স্কুল আছে...।

এই প্রশ্নটা প্রত্যাশিত ছিল। দয়াল সান্যাল মনে মনে উত্তরটা গুছিয়ে রেখেছেন। সাজিয়ে-গুছিয়ে সেই উত্তরটা দিতে শুরু করলেন।

শুধু কলকাতার জন্যই আমরা ওকে কার্শিয়াং-এ পাঠিয়ে দিতে চাইছি মিস্টার অ্যান্ডারসন।

হেঁয়ালির মতো শোনাল কথাটা। অ্যান্ডারসন সাহেব বললেন, ঠিক পরিষ্কার হল না মিস্টার সানিয়াল।

স্যার, আমি ছোটখাটো ব্যাবসা করি। আর সেটা করতে গিয়েই আমি এখন নকশালদের টার্গেট হয়ে গেছি। আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি জানেন। যে-কোনও ব্যবসায়ীই নকশালদের টার্গেট হয়ে যাচ্ছে। আমি পুলিশের কাছে গিয়েছিলাম। পুলিশ কিছু অ্যাকশন নিয়েছে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হয়েছে। এখন আমার ছ'বছরের ছেলেও ওদের টার্গেট হয়ে গেছে। আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ওরা। আমি আমার সমস্ত পয়সাকড়ি ওদের দিতে রাজি আছি। কিন্তু ওরা বদলা চায়। পুলিশ ওদের ওপর যে অ্যাকশন নিয়েছে, তার বদলা। আর সেটা হল আমার ছেলের প্রাণ। হি ইজ দেয়ার টার্গেট। স্কুল ছাড়িয়ে যে বাড়িতে বসিয়ে রাখব, সেটাও সেফ নয়। যে-কোনওদিন ওরা বাড়ি পর্যন্ত অ্যাটাক করতে পারে। প্লিজ, আপনি ওকে আপনার কাছে রাখুন।

অ্যান্ডারসন সাহেব চুপ করে শুনছিলেন। দয়াল সান্যালের কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পর চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন, বাট অ্যাপার্ট ফ্রম প্রেয়িং ফর দ্য চাইল্ড, হোয়াট এলস ক্যান আই ডু? আপনাদের তো বললাম, আমাদের বোর্ডিং-এ এত ছোট বাচ্চাদের রাখার প্রভিশন নেই। ইনফ্যাক্ট, সেরকম কোনও বোর্ডিং স্কুলও আমার মনে পড়ছে না।

প্লিজ স্যার, কিছু একটা ব্যবস্থা আপনি করুন।

অ্যান্ডারসন সাহেব আলতো করে দয়াল সান্যালের হাতের ওপর হাতটা রেখে বললেন, আপনি বোঝার চেষ্টা করুন মিস্টার সানিয়াল... ও বড্ড ছোট।

আমি আপনার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছি। আমার স্ত্রীও অনেক ছোট বয়স থেকে কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং স্কুলে পড়েছে।

অ্যান্ডারসন সাহেব এবার শিপ্রার দিকে তাকালেন, আপনিও কার্শিয়াং-এ পড়েছেন? কোন স্কুলে?

শিপ্রার চোখ দুটো ছলছলে হয়ে গিয়েছিল। গলায় বাষ্প আটকে ছিল, কোনওরকমে নিজের স্কুলের নামটা বলল। শুনে উৎফুল্ল হয়ে অ্যান্ডারসন সাহেব বললেন, আপনি তো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্কুলে পড়েছেন। কত ছোট থেকে পড়েছেন?

ক্লাস থ্রি।

রাইট। ক্লাস থ্রি থেকেই বোর্ডিং-এ রাখা যায়। তার চেয়ে ছোটদের বাবা-মা'র কাছ থেকে দূরে রাখা যায় না। বেশির ভাগ স্কুলেই ক্লাস ফাইভ ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড। তবুও বলব ছোট বয়স থেকে বোর্ডিং-এ রাখা একটা কঠিন সিদ্ধান্ত। আজ পলিটিক্যাল ডিস্টার্বেন্স আছে, কাল হয়তো থাকবে না। তখন কী করবেন? ছেলেকে আবার নিজের কাছে নিয়ে আসবেন?

জানি না।

অ্যান্ডারসন সাহেব শিপ্রার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন, আপনার মা-বাবা একদিন একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আপনাকে বোর্ডিং-এ পড়াবেন বলে। কেন ডিসিশনটা নিয়েছিলেন আপনার জানা আছে?

শিপ্রা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর একটা চাপা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ব্রাদার, আমার মায়ের প্রফেশন ছিল প্রস্টিটিউশন। আমার মা আমাকে ওই পরিবেশে রাখতে চায়নি বলে ডিসাইড করেছিল বোর্ডিং-এ দিয়ে দেবে। ব্রাদার ডি'সুজা আমাদের স্কুলের ফিজিক্সের টিচার ছিলেন। একবার মিশনারিজদের একটা টিমের সঙ্গে প্রস্টিটিউটদের ছেলেমেয়েদের হেল্‌থ চেক-আপ করতে ব্রাদার ডি'সুজা মায়ের কাছে এসেছিলেন। তখনই মায়ের সঙ্গে আলাপ। তারপর মায়ের ইচ্ছে মতো ব্রাদার ডি'সুজা কার্শিয়াং-এ আমাকে ভরতির ব্যবস্থা করে দেন।

ব্রাদার ডি'সুজার কথা শুনে অ্যান্ডারসন সাহেবের চোখে ঝিলিক দেখা দিল। শিপ্রার মায়ের অতীতটা যেন গায়েই মাখলেন না। সরাসরি চলে গেলেন ব্রাদার ডি'সুজার কথায়।

ব্রাদার ডি'সুজা ইজ আ গ্রেট ম্যান। ওঁর ছাত্রীকে দেখে খুব ভাল লাগছে। আমি ফিরে গিয়ে আপনার কথা বলব ওঁকে।

এতদিন পরে পুরনো প্রিয় শিক্ষকের পরিচিত কাউকে দেখে শিপ্রাও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল।

কেমন আছেন এখন ব্রাদার ডি'সুজা?

ভাল, খুব ভাল, সাউন্ড অ্যান্ড হেলদি। স্কুল থেকে রিটায়ারমেন্ট নিলেও কাঞ্চনজঙ্ঘার মায়া ছাড়তে পারলেন না। চার্চের একটা সার্ভিসে এখন ভোপালে থাকলেও কাঞ্চনজঙ্ঘার টানে মাঝে মাঝেই এসে কাটিয়ে যান। একটা গোর্খা বস্তিতে থাকেন। মনপ্রাণ দিয়ে পিয়ানো বাজান আর ছোট ছোট গোর্খা ছেলেমেয়েদের ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ান।

খুব ইচ্ছে করে একবার ওঁকে দেখতে।

শিপ্রা হিন্দু হয়ে যাওয়ার পর কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার একটা ছিল, ব্রাদার ডি'সুজার সঙ্গে আর কখনও দেখা না করা। বোধহয় একটা অপরাধবোধ কাজ করত ভেতরে ভেতরে। যাঁর কাছে বাইবেলের অনেক উপদেশ শুনেছে, সারা জীবন যিশুর অনুগত থাকার অঙ্গীকার করেছে, তাঁকে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনাটা কিছুতেই বলতে পারবে না শিপ্রা।

অ্যান্ডারসন সাহেব অবশ্য সহজভাবে বললেন, আসুন না কার্শিয়াং-এ। ভাগ্য ভাল থাকলে দেখা হয়ে যাবে ব্রাদার ডি'সুজার সঙ্গে।

দয়াল সান্যাল ঘড়ি দেখলেন। সময় বয়ে যাচ্ছে। বোর্ডিং-এর ব্যাপারটা কিছু এগোচ্ছে না। সেই ব্যাপারটা মিটিয়ে অফিসে আরও জরুরি অনেক কাজ আছে। আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসতে শিপ্রার উদ্দেশে বললেন, যাও না তুমি নিজে একবার কার্শিয়াং-এ। ব্রাদার ডি'সুজার সঙ্গে একবার কথা বলো। যদি উনি কিছু করতে পারেন, যেমন তোমার ছোটবেলায় করেছিলেন।

অ্যান্ডারসন সাহেব দয়াল সান্যালের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমাকে খুব মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন। ব্রাদার ডি'সুজার কাছে গেলেও উনিও একই কথা বলবেন। আমি একটা সলিউশনের কথা ভাবছি। দেখুন সেটা হয় কিনা। একটা নন রেসিডেন্সিয়াল প্রাইমারি সেকশন আছে আমাদের স্কুলে ফর লোকাল স্টুডেন্টস ওনলি। কার্শিয়াং-এ যদি একটা বাড়ি ভাড়া করে মিসেস সান্যাল ছেলেকে নিয়ে থাকেন আর ওখান থেকে আপনার ছেলে আমাদের স্কুলে স্কুলিংটা করে...।

শিপ্রার চোখের ওপর কাঞ্চনজঙ্ঘা ভেসে উঠল। সেই মিষ্টি হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া যেন মুখে এসে ঝাপটা মারছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হতে পারে? পুলিশ, নকশাল, দয়াল সান্যাল, কলকাতা থেকে অনেক দূরে বিট্টুকে নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার কোলে থাকা। ব্রাদার অ্যান্ডাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল শিপ্রার চোখ দুটো।

অ্যান্ডারসন সাহেব বললেন, আমি জানি এভাবে ফ্যামিলি ব্রেক করে সলিউশন কোনও গুড অপশন নয়। কিন্তু যে-পরিস্থিতিতে ডেসপারেটলি আপনারা আপনাদের ছেলেকে বোর্ডিং-এ দিতে চাইছেন তার এটাই একমাত্র সলিউশন হতে পারে। এতে আপনাদের ছেলেরও একটা চয়েস থাকবে। ভাল লেগে গেলে পরে ওখানে বোর্ডিং-এ থাকবে। আর কলকাতায় পলিটিক্যাল টার্ময়েলটা ঠিক হয়ে গেলে ইচ্ছে করলে কলকাতা ফিরে আসতে পারে।

কার্শিয়াং। শিপ্রার অন্যমনস্কতা যেন আর কাটছে না। মায়াবী কুয়াশা, বিস্তীর্ণ সবুজ, হিমালয়, রোদের লুকোচুরি আর দুটো জীবন, দুটো বাড়ানো কচি হাত, পাখির কলরব। ছোট্ট হাত দুটো কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। ফুসফুসে এত অক্সিজেন যেন কোনওদিন পায়নি শিপ্রা।

অ্যান্ডারসন সাহেব শিপ্রাকে বোধহয় কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন। শিপ্রার কানে প্রশ্নটা ঢোকেনি। অবাক হয়ে চেয়ে আছে অ্যান্ডারসন সাহেবের দিকে। সাহেব হেসে বললেন, মিসেস সানিয়াল, মনে হচ্ছে আপনি কার্শিয়াং-এ নাম শুনে নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন। ইউ আর রিয়েলি ব্লেসড। জীবনের সবচেয়ে ভাল সময়টা এত সুন্দর একটা জায়গায় কাটিয়েছেন।

সরি ব্রাদার। সত্যিই কার্শিয়াং বললে এত স্মৃতি এসে ভিড় করে! আবার মাঝে মাঝে খুব দুঃখও হয় জানেন। এককালে যে-বন্ধুদের ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারব না ভাবতাম, কত প্ল্যান করতাম সবাই মিলে একসঙ্গে থাকার জন্য, তাঁদের একজনের সঙ্গেও আর যোগাযোগ নেই। অথচ কী ভালই না আমরা কাটিয়েছিলাম কার্শিয়াং-এর স্কুল লাইফ। এখন কী মনে হচ্ছে জানেন, কার্শিয়াং-এ গেলে সেই উষ্ণতা আর পাব না।

খুঁজে নেবেন। ঠিক পাবেন। গাছের ছায়ায়, হিমালয়ের উচ্চতায়, সব জায়গায় দেখবেন কার্শিয়াং যত্ন করে রেখে দিয়েছে আপনার ভাল স্মৃতিগুলো।

দয়াল সান্যালের স্বভাবতই এই কাব্যিক আলোচনা ভাল লাগছিল না। মনে মনে হিসেব করে দেখছিলেন বিট্টুর সঙ্গে শিপ্রা কার্শিয়াং-এ চলে গেলে, লাভ-লোকসানের হিসেব কত। হিসেবটা মনে মনে যত মেলাচ্ছেন তত মনে হচ্ছে লাভের দিকের পাল্লাটাই ভারী। নকশাল টকশালের ভয় দেখিয়ে শিপ্রার মন কিছুটা নিজের দিকে ঘোরাতে পেরেছেন, কিন্তু তার স্থায়িত্ব সাময়িক। সেটা কেটে গেলেই শিপ্রা তার পুরনো অবস্থানে ফিরে যাবে। তার মানেই বাধা। একটার পর একটা বাধা। হরির ঝিলে বাধা। দু'একর জমিতে বাধা। ম্যাকার্থির বাংলোতে বাধা। ব্যাবসাটা বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে একটার পর একটা বাধা। কার্শিয়াং-এর সুন্দর প্রকৃতিতে কালো মেঘের মতো নিজেকে আনলেন দয়াল সান্যাল।

মিস্টার অ্যান্ডারসন, তা হলে ওই কথাই রইল। আপনি বিট্টুকে আপনার স্কুলে নিয়ে নিচ্ছেন আর শিপ্রা ওখানে থাকবে। তারপর ভবিষ্যতে আপনি যেমন ঠিক করবেন। আমরা কবে কার্শিয়াং যাব বলুন।

এখন তো স্কুল বন্ধ। আপনি মিডল অফ ফেব্রুয়ারিতে আসুন। তার মধ্যে যদি এখানে সিচ্যুয়েশন নর্মাল হয়ে যায়, তা হলে তো আর প্রয়োজনই হবে না হয়তো।

দয়াল সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন।

না মিস্টার অ্যান্ডারসন, দরকার হবে। যেমন ঠিক হল, তেমনই হবে।

কর্নেল সামন্ত সন্ধেবেলায় হঠাৎই এসে হাজির হলেন ক্যাথি গোমসের বাড়িতে। এটা তাঁর সামরিক অনুশাসনে বাঁধা জীবনে ব্যতিক্রম। মাসে একবারই ক্যাথি গোমসের বাড়িতে আসেন কর্নেল এবং সেটাও মাসের প্রথম রবিবারের সকালে।

ক্যাথি কর্নেলকে দেখে তাই অবাক হলেও চিন্তিত হলেন না। শ্যারন যে-টাকাটা জোর করে দিয়ে গেছে তাতে এখন বহু দিন আর রবার্টের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হবে না। যদিও ক্যাথি নিজের জীবনযাপন এখন একদম বদলে নিয়েছেন। বেহিসেবি কোনও খরচই করেন না, তবু জমানো সুদের টাকাটা পর্যাপ্ত নয়। শেষ সপ্তাহে টান ধরেই যায়। সেদিক থেকে শ্যারনের টাকাটা একটা ভরসা দেয়। যেদিন থেকে এ-বাড়িতে আছেন কর্নেল সামন্ত এক টাকাও বাড়িভাড়া বাড়াননি। ক্যাথির একবার মনে হল, নতুন বছর পড়েছে, কর্নেল হয়তো বাড়িভাড়া বাড়ানোর কথাও বলতে পারেন। এবং ক্যাথি মনে মনে ঠিকই করে নিলেন, বাড়ি ভাড়া বাড়াতে চাইলে শ্যারনের দিয়ে যাওয়া টাকার ভরসায় উনি সেটা মেনেই নেবেন। জীবনে তো খুব কম ভদ্রলোকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। কর্নেল সেই বিরল প্রজাতির একজন।

কর্নেল সামন্তর মধ্যে সবসময় একটা প্রাণবন্ত ভাব দেখা যায়। ক্যাথি দেখলেন আজ কর্নেলের মধ্যে সেই প্রাণবন্ত ভাবটা নেই। একটু গম্ভীরও যেন। কথা শুরু করার সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন না। কী জন্য এই সন্ধেবেলায় এসেছেন সেটা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে ক্যাথির সংকোচ হচ্ছিল।

চা খাবেন কর্নেল? ক্যাথি জিজ্ঞেস করলেন।

নাহ্! এখন আর চা খাব না। কর্নেল চুপ করে গেলেন। পরিবেশটা ক্রমশই ভারী হয়ে যাচ্ছে। কর্নেল চারদিকটায় একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, আপনার সেই পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মেয়েটা নেই?

না, ও চলে গেছে।

কর্নেল একটু বিস্মিত হলেন, চলে গেছে? কোথায় গেল?

জানি না। একদিন সন্ধেবেলায় ওর মা এল, দশ মিনিটের নোটিশে নিয়ে চলে গেল। বলছিল বনগাঁর ওদিকে কোথায় একটা ক্যাম্প হয়েছে, প্রপার্টি সেটলমেন্ট করা হবে....। বলেছিল ফিরে আসবে, কিন্তু তিন সপ্তাহ হতে চলল এখনও তো ফিরে এল না।

বোকা মেয়ে। চাপা দীর্ঘশ্বাসে কর্নেল বললেন।

কর্নেলের মুখটা দেখে ক্যাথিও একটা বুকের ভেতর মোচড় অনুভব করলেন।

জানেন কর্নেল, ওকে প্রথমে আমি রাখতে চাইনি। জানাশোনা একজন নিয়ে এসেছিল আশ্রয়ের জন্য। বড় বাড়ির মেয়ে-বউ, বাবলির মা এসে যখন পায়ে পড়তে যাচ্ছিল খুব খারাপ লেগেছিল জানেন। তারপর কখন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল।

বুঝতে পারছি মিসেস গোমস। আমি আর ওকে কতটুকু দেখেছি বলুন। তাতেই

আমার মনে হচ্ছে আপনার বাড়িটা ভীষণ খালি খালি। গতবার যখন এসেছিলাম আপনার বাড়িটায় প্রাণ উপচে পড়ছিল। শিপ্রা, বাবলি, সবাই ছিল।

কর্নেল সামন্ত আবার চুপ করে গেলেন। ক্যাথি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি বসুন। আমি রেন্টটা নিয়ে আসি।

কর্নেল সামন্ত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, আমি কিন্তু রেন্ট নিতে আসিনি মিসেস গোমস, আপনার সঙ্গে অন্য একটা ব্যাপারে কথা ছিল।

ক্যাথি অবাক হয়ে বসে পড়লেন। উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকলেন কর্নেলের দিকে। কর্নেল গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, মিসেস গোমস, আপনি জানেন শিপ্রা আমার কাছে এসেছিল একদিন দুপুরে।

ক্যাথি একটু চিন্তা করে বললেন, হ্যাঁ, বোধহয় ও যেদিন চলে গেল সেদিনই দুপুরে বা তার আগের দিন দুপুরে আপনার কাছে গিয়েছিল।

আমার কাছে কেন এসেছিল জানেন?

ক্যাথি মাথা নাড়লেন। তখন ভেবেছিলেন শ্যারনকে জিজ্ঞেস করবেন কী কথা হয়েছিল কর্নেলের সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। সেই সময় একটা ঝড় বয়ে গিয়েছিল।

শিপ্রা চেয়েছিল এই বাড়িটা কিনে নিতে।

ক্যাথি চমকে উঠলেন। শ্যারন এই বাড়িটা কিনতে চেয়েছিল? কেন কিনতে চেয়েছিল? এ ব্যাপারে তো একটাও কথা বলেনি ওঁর সঙ্গে।

কর্নেল ক্যাথির মুখের আঁকিবুকিগুলো পড়ে নিয়ে বললেন, বাড়িটা শিপ্রা আপনার জন্যই আমার কাছে কিনে নিতে চেয়েছিল।

ক্যাথির বিস্ময় বেড়েই চলেছে। সেই বিস্ময়েই মুখ থেকে বেরল, কিন্তু কেন কিনতে চেয়েছিল?

সেদিন আমিও বুঝিনি মিসেস গোমস। ভেবেছিলাম বড়লোকের খেয়াল। টাকা আছে। মায়ের বন্ধুর জন্য কিনে নিতে চায়। আমি রাজি হইনি। আমারও অন্যরকম সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে ব্যারাকপুরে আমার প্রপার্টি দুটোর জন্য। মনে হয় না আমার শেষ দিন পর্যন্ত এই সেন্টিমেন্টটার কোনও পরিবর্তন হবে বলে। কিন্তু আমি শিপ্রাকে একটা কথা দিয়েছি। এই বাড়িটায় আপনি যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারেন। আমি কোনওদিনই আপনাকে চলে যেতে বলব না বা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করব না যাতে আপনি চলে যেতে বাধ্য হন।

ক্যাথি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, কর্নেল সামন্ত এই সন্ধেবেলায় এসে কেন এইসব কথা ওঁকে শোনাচ্ছেন। শুধু ছোট্ট করে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ কর্নেল। আপনি দয়ালু। জিসাস আপনার মঙ্গল করুন।

আপনি জুলি বলে কাউকে চেনেন মিসেস গোমস?

ক্যাথি একটু চমকে উঠলেন। সেইসব সময়ে জুলি নামটা মেয়েরা খুব নিত। সেরকম কারও কথা বলছে নাকি কর্নেল?

সেরকম তো কাউকে মনে পড়ছে না কর্নেল।

কর্নেল পিঠটা টানটান করে মাথার জকি ক্যাপটা ঠিক করে বললেন, আজ দুপুরে আমার কাছে একটা মেয়ে এসেছিল। নাম বলল জুলি। একসময় নাকি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আপনার কাছে থাকত। আপনি নাকি ওকে দিয়ে...

ক্যাথির কানে আর কিছু ঢুকছে না। পায়ের তলাটা হালকা মনে হচ্ছে। চারদিকে একটা কেমন যেন শব্দ। চোখটায় মনে হচ্ছে জ্বালা ধরবে। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে কবে চলে যেতে হবে?

কর্নেলের দৃষ্টিটা উদাস হয়ে গেল।

আমি মেয়েটার কথা বিশ্বাস করিনি মিসেস গোমস।

ক্যাথি শুকনো গলায় বললেন, মেয়েটা সব কথা সত্যি না বললেও, আমার অতীত নিয়ে যা বলেছে সেটা সত্যি। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন শুধু। আমি চলে যাব।

আমি আপনাকে বললাম না মিসেস গোমস, আমি কাউকে কথা দিয়েছি অ্যান্ড আই স্ট্যান্ড বাই মাই কমিটমেন্ট। এ-বাড়ির মালিকানা কাগজে-কলমে যারই হোক না, এই বাড়ি আপনার। আপনি নিজের ইচ্ছেয় থাকবেন।

ক্যাথি ম্লান হাসলেন, আমি আমার অতীত গোপন করেছি আপনার কাছে, এর পরেও আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন?

কেন বিশ্বাস করব না মিসেস গোমস? আপনার অতীত যাই হোক না কেন আপনার বর্তমানটা তো একদম পিয়োর। আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনি বাবলির মতো উঠতি বয়সের মেয়েকে কীভাবে প্রোটেকশন দিয়ে রেখেছেন।

ক্যাথি গভীর শ্বাস টেনে বললেন, অতীতকে কেউ ছেড়ে আসতে পারে না কর্নেল। আপনি চিন্তা করে দেখুন তো, প্রথম দিনই যদি আপনাকে আমি আমার অতীত বলে দিতাম, আপনি আমাকে এই বাড়িতে আর ঢুকতে দিতেন?

দিতাম না হয়তো। কারণ একজন মানুষকে চিনতে তো সময় লাগে।

আপনার আমাকে ঘেন্না হচ্ছে না?

ঘেন্না ব্যাপারটা খুব আপেক্ষিক মিসেস গোমস। ওয়ার ফ্রন্টে আমি মানুষকে গুলি করে মেরেছি। আমার হাত কাঁপেনি এবং আই হ্যাভ নো রিগ্রেটস। কারণ ওরা ছিল শত্রু। আমাদের দেশের শত্রু। আপনার কি আমাকে খুনি বলে ঘেন্না হচ্ছে? আমি কিন্তু আপনার পূর্বপরিচয় জেনে গিয়েছি, শুধু এইটুকুই আপনাকে বলতে আসিনি মিসেস গোমস। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আপনার কি কোনও শত্রু আছে?

পৃথিবীতে কার শত্রু নেই কর্নেল?

কর্নেল সামন্ত অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন।

মিসেস গোমস, ফিলজফিক্যাল হবেন না। আমাদের একটা সলিউশন ওয়ার্ক আউট করতে হবে। আমি আপনাকে রিপিটেডলি বলছি, এই বাড়িতে আপনার থাকা নিয়ে একটাও প্রশ্নচিহ্ন নেই। আমি ভাবছি ওই জুলি মেয়েটার কথা। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, শি কেম টু মি উইথ সাম ডেফিনিট পারপাস। ওর যদি আপনার সঙ্গে কোনও

বোঝাপড়া থাকত স্ট্রেট আপনার কাছেই আসত। তা না করে কী করল? আপনার বাড়িওয়ালার কাছে এল আপনার অতীতটা বলতে। এতেই উদ্দেশ্যটা খুব পরিষ্কার। আপনাকে যাতে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিই। সরি ফর মাই ল্যাংগুয়েজ। যাই হোক, সত্যিটা হল, আমি তো কখনওই সেটা করব না। সো হোয়াট শি উইল ডু নেক্সট? সিম্পল। শি উইল স্ট্রাইক এগেন। এবার হয়তো পাড়ার ছেলেদের বলবে। তখন কিন্তু আপনার পক্ষে এখানে থাকা সত্যিই ডিফিকাল্ট হয়ে যেতে পারে মিসেস গোমস। তার আগেই তাই মেয়েটার সঙ্গে মোকাবিলা করে ওর উদ্দেশ্যটা জানতে হবে, আপনার শত্রুকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।

ক্যাথি আস্তে আস্তে ভেঙে পড়তে থাকলেন।

আমি আর কী করতে পারি কর্নেল? আমার সারা জীবনটা যদি শোনেন দেখবেন নতুন নতুন শত্রু গজিয়েছে আর এইভাবেই তাড়া খেয়ে খেয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছি।

কর্নেল ভাল করে ক্যাথির মুখের দিকে তাকালেন। এই মহিলার এককালে পেশা যে কী ছিল এখনকার মুখ দেখে বোঝাই যায় না। ছলছলে চোখ মানুষের মুখে অনেক পাপের চিহ্ন মুছে দেয়। যেমন বসার ঘরে এই কমজোরি আলো-ছায়ার আঁকিবুকিগুলো ক্যাথির চোখ বেয়ে সব পাপের চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। অদ্ভুত এক নিঃস্তব্ধতা গ্রাস করে ফেলছে ঘরটাকে। ঝিঁঝিপোকার ডাকগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। পরিবেশটা স্বাভাবিক করতে কর্নেল সামন্ত বললেন, ইন্ডিয়ান আর্মিতে আমাদের একটা বড় শিক্ষা কী জানেন, মহিলাদের সম্মান করা। দশটা লোকের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাতে এখনও বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পারি। কিন্তু যারা আপনার নামে কুৎসা রটাবে, সামাজিক অসম্মান করবে, তাদের সঙ্গে কীভাবে লড়ব বুঝতে পারছি না।

কর্নেল, কোনও কুৎসা নয়। মেয়েটা আমার অতীত জীবনের সত্যিটাই বলছে।

আপনি যে-জীবন ছেড়ে চলে এসেছেন এখন সেসব টানা মানে কুৎসাই রটানো। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে মেয়েটা করুক না কেন, এটা হতে দেওয়া যাবে না। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আপনি এ-বাড়ি বন্ধ করে কিছুদিন অন্য কোথাও চলে যান। মেয়েটা যদি আবার খোঁজ করতে আসে, দেখবে বাড়িটা বন্ধ। ভাববে ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি। মেয়েটার কাছে আমি জানার চেষ্টা করব ও কেন বা কার হয়ে এসব করছে। তারপর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে আপনি আবার এখানে চলে আসবেন।

ক্যাথি অসহায় হয়ে বললেন, কিন্তু আমি কোথায় যাব কর্নেল?

কেন? আপনি শিপ্রার কাছে গিয়ে থেকে আসুন। ও তো আপনাকে এত ভালবাসে। আপনি যতদিন চাইবেন, নিশ্চয়ই ওর কাছে থাকতে পারবেন।

মার্থা, শিপ্রা, দয়াল সান্যালের পরিচয় আর সম্পর্কগুলো গোপন রাখলেন ক্যাথি।

কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি আমার পরিচয় নিয়ে ওই মেয়েটা যদি শিপ্রার বাড়িতে গিয়েও হাজির হয় কী অবস্থা হবে সেখানে? শিপ্রাই বা কতটা অস্বস্তিতে পড়বে।

কর্নেল চুপ করে গেলেন। এই সমস্যার আর কোনও সমাধান তাঁর জানা নেই। ক্যাথি চাপা শ্বাস ফেলে আবার বললেন, আমি চলে যাব কর্নেল। চলে আমাকে যেতেই হবে। কিছু টাকা আছে আমার। পুরনো পরিচয়ও আছে অনেকের সঙ্গে। জিসাস ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনি চিন্তা করবেন না।

যদি সত্যিই চলে যান, আপনার ফিরে আসার রাস্তা চেয়ে এই বাড়িটা থাকবে মিসেস গোমস। ঝড় সবসময় থাকে না। একসময় বন্ধ হয়ই।

এই ঘটনার দু'দিন পর একদিন সকালে কর্নেল সামন্তর বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থেকে নামলেন ক্যাথি। কর্নেলের হাতে বাড়ির চাবি আর মাসের ভাড়ার টাকাটা এগিয়ে দিলেন। চাবিটা নিলেও কর্নেল ভাড়ার টাকাটা কিছুতেই নিলেন না।

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়ার পর ক্যাথি ড্রাইভারের মাথার ওপরের আয়নাটা দিয়ে দূরে সরে যাওয়া ব্যারাকপুরটা দেখছিলেন। ভেতরে একটা কষ্ট। জীবনে অনেক বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। বুকের ভেতর এরকম কষ্ট কখনও হয়েছে কি? চোখের জল মোছার জন্য রুমাল বার করতে হাতব্যাগটা খুললেন। আর তখনই চোখে পড়ল ব্যাগের মধ্যে উঁকি মারছে একটা মুখ বন্ধ খাম। খামটা বার করে ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বললেন কোনও একটা ডাকবাক্সে খামটা ফেলে দিতে।

স্নান করে বেরিয়ে বিট্টুর পড়ার টেবিলে শিপ্রা দেখল পোস্ট অফিসের শিলমোহর লাগানো ওর নামে আসা একটা খাম। খামটা খুলে দেখল ভেতরে একটা লম্বা দু'পাতার চিঠি। খামের ওপর নাম মিসেস শিপ্রা সান্যাল লেখা থাকলেও চিঠিটা শুরু হয়েছে 'শ্যারন' বলে। অবাক হয়ে তাই সবার আগে দ্বিতীয় পাতার শেষে প্রেরকের নামটা পড়ে নিল শিপ্রা। তারপর আগাগোড়া বার দু'য়েক চিঠিটা পড়ল। ক্যাথি আন্টি চিঠিতে কী বলতে চেয়েছেন স্পষ্ট হল না শিপ্রার কাছে। অসংলগ্ন, খাপছাড়া খাপছাড়া অনেক কথা।

কোথাও ক্যাথি লিখেছেন, মার্থা কোনওদিন চায়নি তোর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ থাকুক। অথচ তোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েই গেল। যোগাযোগ থেকে যে-সম্পর্কটা আবার নতুন করে শুরু হল, তাতে আমার ভয় হচ্ছে তুই আমার কাছে বারবার ফিরে আসবি। তুই যখন আমার কাছে এসেছিলি তখন তোকে বলেছিলাম, আসবিই তো আমার কাছে, যখন খুশি আসবি। কিন্তু মার্থা কি তাই চেয়েছিল? আমি কি অন্যায় করছি না মার্থার সঙ্গে? মার্থার সঙ্গে যখন আবার দেখা হবে কী জবাব দেব আমি ওর কাছে?

আবার কোথাও ক্যাথি লিখেছেন, মার্থা পাখিদের খুব ভালবাসত—পাখিদের জীবন, পাখিদের স্বাধীনতা। পাখিরা পৃথিবীকে অনেক ওপর থেকে দেখতে পায়। খুঁজে বের করে তাদের ভাললাগার জায়গাটা। মার্থা চিরকাল পাখিদের এই ক্ষমতাটা পেতে চাইত। সেদিন আমরা খুব হাসতাম মার্থার কথা শুনে। কিন্তু আজ আমারও পাখি হতে ইচ্ছে করছে। আর ভাল লাগছে না। উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে অন্য কোনও ভাললাগার জায়গায়।

দ্বিতীয় পাতার শেষ ছত্রে ক্যাথি লিখেছেন, আমি ব্যারাকপুর ছেড়ে চললাম। কোথায় যাচ্ছি কাউকে বলে গেলাম না। পাখিরা কখনও বলে যায় না কোথায় উড়ে যাবে এর পর। ভাললাগার জায়গাটা ঠিক খুঁজে নেয়। আমিও হয়তো খুঁজে পাব আমার ভাললাগার জায়গা। তারপর আবার হয়তো একদিন ফিরে আসব যেমন শীতকালে হরির ঝিলে ফিরে আসত মার্থার লাল-হলুদ পাখিগুলো।

নিজেকে গুছিয়ে নিতে অল্প সময় নিল শিপ্রা। ঠিক করল ওর কর্তব্য। প্রথমেই ফোন করল কর্নেল সামন্তকে।

হ্যালো কর্নেল, আমি শিপ্রা বলছি।

কর্নেল সামন্ত যেন ক'দিন ধরে এই ফোনটার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। বললেন, আপনার ঠিকানাটা নিয়েছিলাম। ফোন নম্বরটা নেওয়া হয়নি। আজ আপনি ফোন না করলে আমিই হয়তো চলে যেতাম আপনার কাছে দু'-একদিনের মধ্যে।

আন্টি কোথায় গেছেন কর্নেল?

জানি না, কিছু বলে যাননি। শুধু বাড়ির চাবিটা আমাকে দিয়ে গেছেন। ক'দিনের জন্য বা কোথায় যাচ্ছেন কিছুই বলে যাননি। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?

আন্টি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন। আজকেই পেলাম। চিঠির ভাষাটা পড়েই... চিঠিতেও কিছুই লেখেননি। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, হঠাৎ করে কী হল...

কর্নেল সামন্ত বুঝতে পারলেন জুলির কথা ক্যাথি চিঠিতে শিপ্রাকে কিছু জানিয়ে যাননি। তাই কারণটা উনিও চেপে গেলেন। নিজেও যে ক্যাথির পূর্ব জীবনের পরিচয়টা জেনে গেছেন, সেটাও প্রকাশ করলেন না। ক্যাথি শেষপর্যন্ত কোথায় গেলেন তা নিয়ে ভেতরে একটা খচখচানি রয়েই গেছে।

কর্নেলকে চুপ করে থাকতে দেখে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, রবার্টের ঠিকানা বা ফোন নম্বর আপনার কাছে কিছু আছে কর্নেল?

রবার্ট যে-রেস্তোরাঁয় কাজ করে তার নাম, ফোন নম্বরটা আছে।

ফোন নম্বরটা দিন। ক্যাথি আন্টির বয়স হয়েছে। মাঝে মাঝে রাতে ভীষণ হাঁপানির টান ওঠে। এভাবে একা একা... ওঁকে খুঁজে নিয়ে আসা খুব দরকার।

আয়্যাম উইথ ইউ। যে-কোনও দরকার হলে আমি আছি আপনার সঙ্গে। আর একটা জিনিস মনে রাখবেন। আপনাকে আমি যে-কথা দিয়েছি, আই স্ট্যান্ড বাই দ্যাট। মিসেস গোমস যেদিনই ফিরে আসুন, ও-বাড়ির তালাটা উনিই খুলবেন। ধরুন একটু লাইনটা। আমি রবার্টের ফোন নম্বরটা নিয়ে আসছি।

একা একটা মেয়েকে পার্ক স্ট্রিটের বারে সন্ধেবেলায় ঢুকতে দেখে শিপ্রার পথ আটকে দারোয়ান বলল, ইহাঁ ধান্দা নেহি চলেগা।

মানেটা বুঝতে শিপ্রার বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল এবং তার পরেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, মাইন্ড ইয়োর ল্যাঙ্গোয়েজ। আই উইল সিম্পলি হ্যান্ড ওভার ইউ টু পুলিশ।

শিপ্রার তেজ আর ইংরেজি শুনে দারোয়ান হকচকিয়ে গেল। শিপ্রা আর কোনও কিছু তোয়াক্কা না করে দরজাটা জোরে ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল।

সবে সন্ধে। তারপর সপ্তাহের মাঝের দিন। বারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু খদ্দের। এখনও সেরকম জমে ওঠেনি বারটা। শিপ্রাকে ঢুকতে দেখে বারের প্রথম যে-কর্মচারী এগিয়ে এল তাকেই শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, রবার্ট গোমস এসেছে?

এসেছে ম্যাডাম।

একটু ডেকে দিন তো!

শিপ্রাকে বসতে বলে ছেলেটা ভেতরে চলে গেল রবার্টকে ডাকতে। গেটে দারোয়ানের অপমানটা তখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। বারের চারদিকে লোকজনদের দেখে শিপ্রার মনে হল, এই যে লোকগুলো বসে আছে, ওরাও কি দারোয়ানটার মতো ওকে বাজারি মেয়েছেলে ভাবছে? এই ভাবনাটা ভেতরে ভেতরে নিজেকে আরও উত্তেজিত করল। এবং সেই উত্তেজনার প্রথম ছোবলটা পড়ল রবার্টের ওপর। রবার্ট আসতেই শিপ্রা বলল, তুই এরকম একটা নোংরা জায়গায় কী করে কাজ করিস রে রবার্ট?

শিপ্রা কথাটা যথেষ্ট জোরে বলেছিল। এমনিতেই এই ভরসন্ধেতে একজন সুন্দরী মহিলা রবার্টকে কী বলতে এসেছে সে ব্যাপারে সহকর্মীরা উৎকর্ণ ছিলই। নিজেদের কাজের জায়গা সম্পর্কে শিপ্রার এই মন্তব্যটা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। শিপ্রার সামনে মুখটা কঠিন করে দাঁড়াল রবার্ট।

বোস রবার্ট। তোর সঙ্গে কথা আছে।

রবার্ট কঠিন গলায় বলল, আমি ডিউটিতে আছি, এখানে চেয়ারে বসতে পারব না।

তা হলে চল, বাইরে যাই।

এখন যাওয়া যাবে না। যা বলার এখানেই বল।

ক্যাথি আন্টিকে খুঁজতে যাবি না?

শিপ্রার এই কথায় যেন বারুদে আগুন লাগল। রবার্ট চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, এর জন্য তো তুই-ই দায়ী।

আমি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল শিপ্রা।

গলা নামিয়ে রবার্ট বলল, মাম্মিকে অতগুলো টাকা তুই দিয়ে এসেছিলি না? তুই মাম্মির স্বভাব জানিস না? একসঙ্গে বেশি টাকা পেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

আমার মনে হয় না, আমার টাকার জন্য এটা হয়েছে। তবু যদি হয়েই থাকে আই অ্যাম সরি ফর দ্যাট। কিন্তু আন্টিকে খুঁজে বের করতে হবে। কিছু ভেবেছিস?

কী ভাবব? মাম্মির কোনও দায়িত্বজ্ঞান আছে? কোনও সেন্স আছে? কত কষ্ট করে কর্নেল সামন্তকে বলে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম, ছেড়ে দিল। মাম্মির ব্যাপারে খোঁজখবর করলে কেউ আর ভাড়ার বাড়ি দেবে?

শিপ্রা অসহায়ের মতো বলল, শোন রবার্ট, এসব রাগের কথা পরে বলিস। আগে আন্টিকে খুঁজে বার কর। তোর টাকাকড়ি লাগলে বল।

বড়লোকদের এই একটা সমস্যা জানিস তো শ্যারন, সবকিছু ভাবে পয়সা দিলেই

ঠিক হয়ে যাবে। তোর পয়সায় মাম্মি হারিয়ে গেল, আবার তোর পয়সাতেই খুঁজে বার করলাম। জীবনটা এরকম সোজা নয়। যাক গে, তোর আর কিছু বলার আছে? আমাকে এবার কাজে ফিরতে হবে।

তোর সঙ্গে একবার সকালে কথা বলতে চাই। যখন তোর রাগ থাকবে না, কাজের চাপ থাকবে না।

টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজের ন্যাপকিন নিয়ে নিজের ফোন নম্বরটা লিখে বার থেকে বেরিয়ে এল শিপ্রা।

২৬

দয়াল সান্যাল অফিসে এসে দেখলেন সাতসকালেই নির্মল চ্যাটার্জি এসে বসে আছেন। ক'দিন ধরেই ভাবছিলেন নির্মল চ্যাটার্জিকে কথাটা বলবেন কি না! আজ দু'-চার কথার পর শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন।

আপনাকে একটা কথা বলার ছিল চাটুজ্যেমশাই। সামনের মাসটায় আমি থাকব না।

নির্মল চ্যাটার্জি নড়েচড়ে বসলেন।

সে কী মশাই! পুরো এক মাস থাকবেন না! আপনার গিন্নির রোগটা আবার আপনারও ধরল নাকি? ফুরুত করে হাওয়া হয়ে যাবেন।

দয়াল সান্যাল ইঙ্গিতটা গায়ে মাখলেন না। গলা গম্ভীর করে বললেন, মাসখানেকেব জন্য বিলেতে যেতে হচ্ছে।

নির্মল চ্যাটার্জির ভুরু দুটো কপালে উঠল।

বলেন কী মশাই, একেবারে কালপানি পাড়ি দিচ্ছেন! তা হঠাৎ এই ডিসিশন?

কাউকে বলবেন না এখনই। কিছু মেশিনারি কিনতে দরদাম করতে যেতেই হচ্ছে।

দয়াল সান্যাল ভাল করেই জানেন, নির্মল চ্যাটার্জিকে কাউকে বলবেন না অনুরোধ করা মানে ঠিক ঠিক জায়গায় খবরটা পৌঁছোনোর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া। যেমন শিপ্রার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো। নির্মল চ্যাটার্জির মতো লোকের কাছ থেকে কোনও কিছুই গোপন রাখা খুব মুশকিল। লোকটার কাছে যেন হাওয়ায় ভেসে হাঁড়ির খবর আসে। তাই অন্যর মুখ থেকে লোকটা খবর পাওয়ার আগে দয়াল সান্যাল নিজের থেকেও অনেক কথা বলে রাখেন। পরামর্শও নেন কখনও কখনও।

যেমন কয়েকটা মহলে খবর রটে গেছে যে, বউয়ের খেলায় দয়াল সান্যাল এবার শেষ হয়ে যাচ্ছেন। স্ত্রী, ব্যাবসা, প্রাণ সব কিছুই খোয়াতে বসেছেন দয়াল সান্যাল। কিন্তু শিপ্রা যাই করুক তাতে যে ব্যবসায় কোনও প্রভাব পড়ছে না, এই ইঙ্গিতটাও বাজারে ছড়িয়ে পড়া দরকার। ব্যবসায় শিপ্রারও একটা অংশ আছে। মার্থা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। জামাইকে সম্পত্তি যৌতুক দিচ্ছেন এটা পৃথিবীসুদ্ধ সবাই জানলেও ভেতরে

ভেতরে দয়াল সান্যালের ব্যবসায় মেয়ের একটা অংশের ব্যবস্থাটাও করে গেছেন। সুতরাং শিপ্রার অংশীদারিসুদ্ধ ব্যাবসাটাকে যে অনেক অনেক বড় করতে যাচ্ছেন, সেই খবরটাও যত দ্রুত সম্ভব ছড়িয়ে ফেলা দরকার। মেশিনারি কেনার ব্যবস্থাটা অনেকদিন আগেই পাকা হয়ে গেছে। ম্যাঞ্চেস্টারের একটা কোম্পানি তাদের মেশিনপত্রগুলো আধুনিক করেছে। পুরনো হয়ে যাওয়া মেশিনগুলো প্রায় জলের দরে কিনে নিয়েছেন দয়াল সান্যাল। কাস্টমসের একটা ঝামেলা ছিল, সেটাকেও প্রায় মিটিয়ে ফেলেছেন। বিলেতে না গেলেও চলত, তবে নিজের ব্যবসায়িক মর্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্য বিলেতটা ঘুরে আসা একবার দরকার।

তা কী মেশিন কিনতে চললেন সান্যালমশাই? অসীম কৌতূহলে নির্মল চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন।

কার্ডিং মেশিন।

কেন মশাই, আপনার কার্ডিং মেশিনগুলো বিগড়ে গেল নাকি?

দয়াল সান্যাল হাসলেন, বিগড়োবে কেন? তবে এগুলো তো ঘণ্টায় পাঁচ কেজির বেশি প্রোডাকশন করতে পারে না। এবার যে মেশিন আনছি ঘণ্টায় কুড়ি কেজি মাল তুলবে। কী মশাই! চাড্ডা যদি এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা করে দিতে পারে, তা হলে প্রোডাকশনটা বাড়াতে হবে তো, নাকি?

দয়াল সান্যাল যে ব্যাবসাটাকে আরও বড় করার স্বপ্ন দেখছেন নির্মল চ্যাটার্জির অজানা ছিল না। চারদিক দিয়ে সব রকম চেষ্টা করছেন। তার কিছু কিছুর শরিক নির্মল চ্যাটার্জি নিজেও। কিন্তু বিদেশে গিয়ে মেশিনপত্তর কিনে আনার মতো গুছিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছেন, এটা কল্পনাতে ছিল না।

এক্সপোর্ট লাইসেন্স হাতে পাওয়ার আগেই মেশিনপত্তর কিনে নেবেন সান্যালমশাই?

আরে, এক্সপোর্ট লাইসেন্সটা যদি নাও পাই, দেশের মার্কেটটা আরও বড় করে ধরতে গেলে প্রোডাকশনটা তো বাড়াতে হবে নাকি?

নির্মল চ্যাটার্জির প্রায় ভিরমি খাওয়া চেহারা দেখে ভেতর ভেতর খুব উপভোগ করতে শুরু করলেন দয়াল সান্যাল। এটাই তো চাইছেন! সবার ভেতর ভেতর জ্বালাটা ছড়িয়ে দেওয়া। এবার আস্তিন থেকে দু'নম্বর তাসটা বার করলেন দয়াল সান্যাল।

শিপ্রার সঙ্গে একটা রফা করলাম বুঝেছেন। ওই দু'একর নিয়ে আর অশান্তি ভাল লাগছে না। শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। ওকে একটা ট্রাস্ট করে দিচ্ছি। ও থাকুক ওর পাখির স্বপ্ন নিয়ে।

নির্মল চ্যাটার্জির চোখ আবার কপালে উঠল।

সে কী মশাই! ওই জমিটা না পেলে মিলটা বাড়াবেন কোথায়? এই যে বললেন মেশিনপত্তর কিনতে যাচ্ছেন।

দয়াল সান্যাল চওড়া হাসলেন।

সব হবে। সব হয়ে যাবে। দেখুন না, নতুন মেশিনপত্তরে যে নরম তুলতুলে

মোলায়েম সুতো বেরোবে, তার এক-একটা ব্র্যান্ডের নাম এক-একটা বিদেশি পাখির নামে হবে।

নির্মল চ্যাটার্জি দু'হাত জড়ো করে দয়াল সান্যালকে নমস্কার করে বললেন, আপনাকে শত কোটি নমস্কার মশাই। ভগবানেরও সাধ্য নেই আপনার ব্যবসায়িক বুদ্ধি বোঝার।

নির্মল চ্যাটার্জির প্রশংসা সারাদিন মেজাজটা ভাল রাখল দয়াল সান্যালের। শিপ্রাকে কথা দেওয়া আছে ট্রাস্টের দলিল এই সপ্তাহেই ফাইনাল করে দেওয়ার। সরোজ বক্সী বয়ানটা করিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারেই একটা সংশয় আছে দয়াল সান্যালের। আগের দু'বার শিপ্রা দলিলটা সই করেনি। এখনও দয়াল সান্যাল বুঝে উঠতে পারেন না শিপ্রা কীভাবে আইনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচগুলো ধরে ফেলেছিল। এবারে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চান না। গোটা ব্যাপারটা যেভাবে মাথায় ছকা আছে, ল'ইয়ারের সঙ্গে নিজে ব্যাপারটা সামলাবেন।

বাড়ি ফেরার পথে নিজের ল'ইয়ারের ফার্মে এলেন দয়াল সান্যাল। অনুপম ঘোষ সেই অর্থে খুব বড় ল'ইয়ার নয়। হাইকোর্টের ডাকসাইটে উকিল শশধর দাশগুপ্ত সম্পর্কে অনুপমের শ্বশুরমশাই। তার কল্যাণেই দয়াল সান্যালের মতো মক্কেলকে পেয়েছে। তার মক্কেলের তালিকায় দয়াল সান্যালই সবচেয়ে বড় নাম। অনুপম খুব খাটিয়ে ছেলে। জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করে দয়াল সান্যালের মতো শাঁসালো মক্কেলের জন্য।

দয়াল সান্যাল কখনও নিজে সশরীরে অনুপম ঘোষের অফিসে যান না। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে অনুপম ঘোষই দয়াল সান্যালের অফিসে যায়। তাই সন্ধের মুখে নিজের অফিসে দয়াল সান্যালকে দেখে অনুপম খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আসুন, আসুন স্যার।

দয়াল সান্যাল দেওয়ালে ঠাসা আইনের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, অনেকদিন ধরেই নেমন্তন্ন করে রেখেছিলে তোমার অফিসে আসতে, আজ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম তোমার অফিসটা দেখেই যাই।

কয়েকজন ছুটকো মক্কেল অনুপম ঘোষের টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে বসে ছিল। অনুপম তাদের পত্রপাঠ বিদেয় করে বলল, স্যার কী খাবেন, চা না কফি?

ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

না স্যার, নতুন বছরে এলেন...

নতুন বছর, তাই না? চলো তা হলে বাইরে কোথাও গিয়ে সেলিব্রেট করে আসি।

অনুপম ঘোষের বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছিল। যে-লোকটার ব্যবসায়িক সম্পর্কের বাইরে কোনও ঘনিষ্ঠতা নেই, যার ব্যবহারে উন্নাসিকতা, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা সব কিছুই সমপরিমাণে আছে, সেই লোকটাই বাড়ি বয়ে এসে বলছে নতুন বছর উদ্‌যাপন করতে যাবে। দয়াল সান্যালকে না বলতে পারল না অনুপম ঘোষ। দু'মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল দয়াল সান্যালের সঙ্গে।

গাড়িতে উঠে দয়াল সান্যাল ড্রাইভার বনোয়ারীলালকে বললেন, পার্ক স্ট্রিট।

মালিকের গতিবিধি বনোয়ারীলালের মুখস্থ। আলো ঝলমলে রাস্তায় নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁর

সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল। গাড়ির থেকে নেমে দয়াল সান্যাল অনুপমকে বললেন, তোমার সঙ্গে অনেক কথাও আছে অনুপম। অফিসে সব সময় সব কথা খোলামেলাভাবে বলা যায় না। চলো গলা ভেজাতে ভেজাতে কাজের কথাও একটু সেরে নিই। রেস্তোরাঁতে ঢুকেই অনুপম দেখল ঝলমল পোশাক পরে একটা মেয়ে হিন্দি গান করছে। ওয়েটার এসে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে অভিবাদন করল। দয়াল সান্যাল দীর্ঘদিন এই রেস্তোরাঁতে আসছেন। নিজের পছন্দের পানীয় এবং খাদ্যে কোনও পরিবর্তন নেই। জানা আছে কী অর্ডার করবেন। তবু দস্তুরমতো খাবার এবং পানীয়ের একজোড়া করে মেনু কার্ড দু'জনের সামনে রাখল। দয়াল সান্যাল অধিকাংশ সময়ে একাই আসেন। এই কোণের টেবিলটাই তাঁর প্রিয়। নিজের মনে মেপে দু'পেগ স্কচ খান। দ্বিতীয় পেগটা শেষ হলে বিড়বিড় করে কীসব বলতে থাকেন। তারপরে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে যান। তবে টিপসের হাতটা নেহাত মন্দ নয়।

অনুপম ঘোষকে বললেন দয়াল সান্যাল, কী খাবে বলো?

অনুপম ঘোষ একটু লজ্জা পেয়ে বলল, এনিথিং স্যার। যা আপনার ফেভারিট।

তা বললে চলে! আজ তুমি গেস্ট। বলো তোমার কী ভাল লাগে। হুইস্কি, রাম...

অনুপম ঘোষের মদ্যপানের সেরকম অভ্যেস নেই। নিজের পছন্দও সেরকম কিছু নেই। তার ওপর দয়াল সান্যালের মতো বয়োজ্যেষ্ঠর এই অভাবিত আতিথ্যে লজ্জাটা যেন আরও বেড়ে গেল। দয়াল সান্যাল ওয়েটারকে বললেন, আমারটা তো জানোই। ওটাই ওকেও দাও। সঙ্গে ফিঙ্গার চিপস আর ফিশফ্রাই।

পানীয় আসার পর গ্লাসটা উঁচু করে ধরে দয়াল সান্যাল বললেন, চিয়ার্স অনুপম! হ্যাপি নিউ ইয়ার।

অনুপম ঘোষ শেষ পর্যন্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে বলে উঠল, চিয়ার্স! হ্যাপি নিউ ইয়ার।

দয়াল সান্যাল একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললেন, আচ্ছা অনুপম, কোর্টে আমাদের এখন ক'টা কেস চলছে?

ওই তিনটেই স্যার। কমপেনসেশনের একটা, ট্রান্সপোর্টের একটা আর গুপ্তাদের সঙ্গে ব্রিচ অফ কনট্রাক্টের কেসটা। প্রথম দুটোর স্যার মেরিট আছে। আমাদের ফেভারে রুলিং পেয়ে যাব, তবে গুপ্তাদের সঙ্গে কেসটা বুঝতে পারছি না। খুব চেষ্টা করছি স্যার।

গুপ্তাদের খবরে দয়াল সান্যালকে খুব একটা বিচলিত দেখাল না। অনুপমকে পরের প্রশ্ন করলেন, ধরো, আমি যদি বেশ কিছুদিন কলকাতায় না থাকি তোমার দিক দিয়ে কি খুব অসুবিধা হবে?

ওই গুপ্তাদের কেসটায় স্যার আপনার সঙ্গে অনেক পরামর্শর দরকার হবে। কিন্তু আপনি চিন্তা করবেন না। আমি কোর্ট থেকে পরে একটা ডেট নিয়ে নেব যখন আপনি থাকবেন।

গুড! তুমি আমার বড় ভরসা অনুপম।

দয়াল সান্যালের প্রশংসায় অনুপম ঘোষ খুশি হয়ে গ্লাসে আরামের একটা চুমুক দিল। দয়াল সান্যাল ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, সরোজ তোমার কাছে গিয়েছিল একটা ড্রাফট নিয়ে?

এসেছিলেন স্যার। ওই ম্যাকার্থির বাংলোটার ব্যাপারে। আগের দুটো পেপারে তো ম্যাডাম সই করেননি।

দয়াল সান্যাল গ্লাসটা ধরে একমনে তাকিয়ে বরফের কুচি দুটো নাড়াতে নাড়াতে বললেন, জানি।

তবে এবারে স্যার মনে হয় ম্যাডাম রাজি হয়ে যাবেন। কারণ ম্যাডামের যে-সম্পত্তিটা ট্রাস্ট ব্যবহার করতে চাইছে, সেই ট্রাস্টের প্রধান তো ম্যাডাম নিজে। আগেরবার তো একবার জমিটা বিক্রির আর একবার জমিটা লিজের ক্লজ ছিল, উনি যে-পয়েন্টটাতে আপত্তি তুলেছিলেন...

দয়াল সান্যাল গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, এইখানেই তো আমার প্রশ্ন অনুপম। সব কিছু তো তুমি দেখিয়েছিলে অনেক ঘুরিয়ে লেখা আছে। আইনি বুদ্ধি না থাকলে চট করে ধরে ফেলার কথা নয়। শিপ্রা কাগজটা হাতে পাওয়ামাত্র কীভাবে ধরে ফেলছে? কীভাবে আগের থেকেই বুঝতে পারছে? কেউ কি ওকে আইনি পরামর্শ দিচ্ছে?

অনুপম ঘোষ চিন্তিত মুখে বলল, কারও তো দেওয়ার কথা নয় স্যার। তা হলে তো তাকে আগে পেপারটা দেখতে হবে। ম্যাডাম তো কখনওই পেপারটা চেয়ে রেখে দেননি।

দয়াল সান্যাল টেবিলের ওপর আলতো একটা কিল মেরে বললেন, সেখানেই তো আমার সন্দেহ। কে শিপ্রাকে বুদ্ধি দিচ্ছে? কী করে সে আগের থেকে জেনে যাচ্ছে কাগজে আসল পয়েন্টটা কী?

কে দেবে স্যার?

হয়তো তুমি। হয়তো কেন? তুমিই অনুপম।

আমি? আঁতকে উঠল অনুপম ঘোষ, আমি কেন এসব করব স্যার?

দয়াল সান্যাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনুপমের দিকে। অল্প হেসে বললেন, কী হল, খাও। শেষ করো।

প্রায় আদেশ পালন করার মতো গ্লাসে চুমুক দিল অনুপম ঘোষ। দয়াল সান্যাল আগের মতোই গ্লাসে বরফের কুচিগুলো নাড়াতে থাকলেন।

আসলে কী বলো তো অনুপম, আমি আর কাকে সন্দেহ করব বলো তো? কাগজের ড্রাফট তোমার কাছে থাকে। স্ট্যাম্প পেপারও তোমার কাছে থাকে। বুদ্ধি তোমার। ভাষা তোমার।

অনুপম ঘোষের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকল। দয়াল সান্যাল ওয়েটারকে ইঙ্গিতে ডেকে অনুপমের গ্লাসটা আবার ভরে দিতে বললেন। নিজের গ্লাসটার তখন সিকিভাগও খালি হয়নি। নতুন করে ভরা গ্লাসে অনুপম চুমুক দেওয়ার পর দয়াল সান্যাল বললেন,

আমি শুধু তোমার কথাই ভাবছি না অনুপম। তোমার অফিসের যে কেউ হতে পারে। তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট, তোমার টাইপিস্ট। যে কেউ। তবে মোদ্দা কথা হচ্ছে, শিপ্রার কাছে আগেভাগেই কাগজপত্তরের কপি পৌঁছে যাচ্ছে।

বিশ্বাস করুন স্যার, আমার অফিস থেকে কিছুতেই নয়।

আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না অনুপম। কাউকে নয়। বিশ্বাস করে জীবনে শুধু ঠকেছি। আজও ঠকে যাচ্ছি। এই তোমাকেই কি আমি কম বিশ্বাস করেছি অনুপম? শশধরবাবু যেদিন তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, তোমার ক'টা কোম্পানির ক্লায়েন্ট ছিল? একটাও নয়। ছুটকো-ছাটকা মক্কেল ধরতে তুমি। এখন বড় হচ্ছ। পুরনো দিনের কথা আস্তে আস্তে সব ভুলতে বসছ...।

অনুপম ঘোষের গ্লাসের চুমুকগুলো ক্রমশ বড় হতে থাকল। পানীয় তলানিতে এসে ঠেকার আগেই ওয়েটারকে ডেকে পরের রাউন্ডের অর্ডার দিয়ে দিচ্ছেন দয়াল সান্যাল। মাথাটা অল্প অল্প ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। হাত দুটো জড়ো করে অনুপম ঘোষ বলতে লাগল, আমি ভুলিনি স্যার। আপনার প্রতিটা কেস আমি মনপ্রাণ দিয়ে লড়ার চেষ্টা করি। নিজের বুক দিয়ে লড়ার চেষ্টা করি। আপনার যে-কোনও কাজ...

দয়াল সান্যাল টেবিলের ওপর কনুই দুটো রেখে বললেন, তোমাকে আমি আর একটা কাজ দিয়ে দেখব। দেখব সত্যিই তুমি আমার কাজ বুক দিয়ে করো কিনা।

অনুপম ঘোষ উৎসাহ ফিরে পেতে শুরু করল, বলুন স্যার।

হরিতলার দু'একর বাংলোর ড্রাফটটা!

হ্যাঁ স্যার। কালকেই ডিড তৈরি করে ফেলব। আপনাকে আশ্বস্ত করছি। যদিও এবারে ব্যাপারটা একদম অন্যরকম, তবুও আর চেম্বারে নয়। হাজরার মোড়ে আমি নিজে হাতে করে নিয়ে টাইপ করিয়ে আনব ডিডটা।

ডিড একটা নয়। দুটো করতে হবে অনুপম। তার প্রথমটায় থাকবে ম্যাকার্থির বাংলোটা শিপ্রা নিঃশর্তে পঁচিশ হাজারে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজকে বিক্রি করছে। দ্বিতীয় ডিডে থাকবে ট্রাস্টের কথা। সেখানে পরিযায়ী পাখিদের হাসপাতাল থেকে গবেষণাগার সব থাকবে। ট্রাস্টের প্রধান শিপ্রা সান্যাল। তা ছাড়া ট্রাস্টে থাকবে হরিতলা কটন মিলের ম্যানেজার শীতল ভট্টাচার্য, ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজের সরোজ বক্সী, নিরাপদ পাল, সুভাষ সামন্ত। যেমন ড্রাফটে আছে।

অনুপম ঘোষ একটু ভেবে বলল, দ্বিতীয়টা স্যার বুঝতে পেরেছি। তবে প্রথমটা... একদম ঝাড়াঝাপটা, সম্পর্কটা ঠিক ধরতে পারছি না স্যার। এটায় ম্যাডাম সই করবেন কি?

এতক্ষণে দয়াল সান্যাল তাঁর গ্লাসটা শেষ করলেন। টেবিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়েটার খেয়াল রাখছিল কতক্ষণে গ্লাসটা শেষ হয়। শেষ হতে দেখেই এগিয়ে এল। ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, পরেরটা দিই স্যার?

দয়াল সান্যাল আঙুল নাড়িয়ে না বললেন। তারপর অনুপম ঘোষের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না, শিপ্রা সই করবে না।

শিপ্রা সান্যাল সই করবে না জেনেও দয়াল সান্যাল কী উদ্দেশ্যে প্রথম ডিডটা করাতে চাইছেন বুঝতে না পেরে অনুপম জিজ্ঞেস করল, তা হলে স্যার?

সই করবে তুমি।

আমি স্যার?

কেন, অসুবিধা আছে?

না স্যার। কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি তো সলিসিটরের সইতে ওভাবে কেনাবেচা করা যায় না। তাই...

তোমার চেম্বারের মতো অত আইন ঠাসা বই আমার কাছে না থাকলেও, এইটুকু আইন আমি জানি অনুপম। আমি বলেছি তুমি সই করবে। তবে সেটা তোমার সই নয়, শিপ্রা সান্যালের সই।

অনুপম ঘোষের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল, জাল স্যার? জাল সই?

দয়াল সান্যাল দু'দিকে একবার তাকিয়ে নিচু গলায় ধমকে উঠলেন, আঃ, অনুপম! মদ খেয়ে ভদ্রলোকেরা গলা চড়ায় না। তোমার কোনও চিন্তা নেই। তোমাকে নিজের হাতে করতে হবে না। তোমার কাছে একজনকে পাঠাব যে অন্যের সই নিখুঁত করে দিতে পারে। বিশ্বাস না হয় একটা কাগজে স্যাম্পল সই করে লোকটাকে একটা তোমার ব্যাঙ্কের চেকের সাদা পাতা দিয়ে পরখ করে দেখতে পারো। তবে ডিডটার সই হয়ে যাওয়ার পর ভবিষ্যতে কোর্ট-কাছারির ঝামেলা যদি কিছু হয়, সেটা তোমায় সামলাতে হবে। তোমায় অন্ধকারে রেখে আমি কাজটা করতে চাই না বলেই তোমাকে দায়িত্বটা দিচ্ছি। না হলে লোকটাকে দিয়ে নিঁখুত সই করিয়ে ডিডটা আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতাম।

অনুপম ঘোষের কাছে পরিষ্কার হল কেন দয়াল সান্যাল এত ভালবেসে তাকে মদ খাওয়াতে নিয়ে এসেছে। বাংলো আর দু'একর জমিটা করায়ত্ত করার প্রয়াস অনুপমের কাছে অজানা নয়। দু'-দুবার ডিড নিজে তৈরি করেছে। তবে সেগুলো ছিল স্বামী-স্ত্রীর সম্পত্তি নিয়ে অংশীদারির লড়াই। নানা শর্ত থাকত সেখানে। জটিল আইনের বুদ্ধি। তবে এখন দয়াল সান্যাল যেটা বলছেন সেটা অতি সোজা। জাল করা। এবং নিজেও বুদ্ধি করে বাইরে থেকে অনুপমকে জড়িয়ে রাখতে চাইছেন। শীতকালেও অনুপমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটতে থাকল।

কী, পারবে না? এটা তো তোমাকে একেবারে ছোট্ট একটা কাজ দিচ্ছি। তোমার এত ভয় কীসের? অরিজিনাল দলিল তো আমার কাছে। তা ছাড়া সামনের মাস থেকে নেক্সট ছ'মাস শিপ্রা কলকাতায় থাকবে না। আর একটা ব্যাপার মনে রেখো, আমার ব্যাবসা কিন্তু অনেক বড় হতে চলেছে। কত বড় চিন্তাও করতে পারবে না। আমার সঙ্গে থাকতে চাও তো?

সব সময় স্যার। তবে স্যার ম্যাডামের সঙ্গে এভাবে... ঠিক হবে কি? মানে, আমি বলছিলাম অন্য কোনওভাবে... মানে... যদি ম্যাডাম জেনে যান... মানে স্যার, ধরা পড়ে গেলে খুব প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে যাবে... জালিয়াতি... বার কাউন্সিল...

তুমি তা হলে করবে না?

মানে স্যার... এই কাজটা আমার দ্বারা... আমরা অন্যভাবে...

দয়াল সান্যাল একদৃষ্টিতে অনুপমের দিকে চেয়েছিলেন। অনুপম এই স্থির দৃষ্টিটার দিকে চোখ রাখতে পারছিল না। কী বলতে চাইছিল সেটাই শেষ করতে পারছিল না। দয়াল সান্যাল ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি ফোটালেন।

প্রেস্টিজকে তুমি খুব গুরুত্ব দাও, তাই না অনুপম?

আসলে স্যার...

ঠিক আছে। খাও, ভাল করে খাও। সেলিব্রেট করো। আমি এক মিনিট আসছি। বেয়ারাকে বলো তোমার গ্লাসটা ভরে দিতে। তারপর নিজের ভালমন্দ চিন্তা করে দেখো, কাজটা তুমি করতে পারবে কিনা। শুধু একটাই কথা মনে রেখো, কাজটা করে দেওয়ার কিন্তু লোকের অভাব নেই।

দয়াল সান্যাল টয়লেটের দিকে উঠে গেলেন। অনুপম ঘোষের মাথার ভেতরে দয়াল সান্যাল একটা আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। তার গনগনে আঁচটা টের পাচ্ছে অনুপম। চোখটাও অল্প ঘোলাটে লাগছে।

দূরে যে-মেয়েটা গান গাইছিল সে পালটে গেছে। মেয়েটা পালটে গেছে, নাকি মেয়েটার শাড়িটা পালটে গেছে? মুখটা ঠিক স্পষ্ট নয়। শাড়ির ওপর চুমকিগুলো চিকমিক করছে। মাঝে মাঝে আলো ঠিকরে চোখে এসে পড়ছে। চড়া বাজনার সঙ্গে মেয়েটা গেয়ে চলেছে—'দুনিয়ানে হামকো দিয়া কেয়া...'

গুনগুন করে মেয়েটার সুরে গলা মেলানোর চেষ্টা করল অনুপম ঘোষ।

পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জুলি হঠাৎই খুশিতে আপ্লুত হয়ে গেল। মন যা প্রাণ দিয়ে চায়, তা ঠিকই পাওয়া যায়। গত তিন-চার দিন মনপ্রাণ দিয়ে একটা জিনিসই খুঁজে যাচ্ছিল জুলি। বিশাল একটা মেটে লাল রঙের গাড়ি। এই গাড়িটা বিদেশি। কলকাতার রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না। অন্তত জুলি তো দেখেনি। সুতরাং এই গাড়িটা ওই সান্যাল লোকটার না হয়ে যায় না।

লোকটাকে বেশ মনে ধরেছে জুলির। অন্যের বিছানায় শুতে পাঠানো ছাড়াও একটা অন্যরকম কাজও দিয়েছিল লোকটা। এক বুড়ির বদনাম রটানোর কাজ। কাজটা কিছুই কঠিন নয়। খদ্দেরদের ব্ল্যাকমেল করার কাজ ছুটকো ছাটকা মাঝে মাঝেই করে। তা ছাড়া এই কাজ করার জন্য লোকটা বিছানায় শোওয়ার রেটের ডবল টাকা দিয়েছে। এরকমই আরও দু'-চারটে খুচরো কাজের আশায় পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে সন্ধেয় ঘুরঘুর করছিল জুলি।

গাড়িটা যেখানে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক উলটোদিকে রেস্তোরাঁটা। বড়দিনের পর নিউ ইয়ার্স ইভেও এই রেস্তোরাঁটাতেই নিয়ে এসেছিল লোকটা। তারপরে আবার কিছুদিন বেপাত্তা। অন্য কোনও মেয়েকে তুলেছে নাকি? লোকটা ফসকে যাওয়ার আগে আবার জাপটে ধরতে হবে। পায়ে প্রায় নাচের ছন্দ তুলে রেস্তোরাঁর গেটের দিকে এগিয়ে গেল জুলি।

গেটের দারোয়ান জুলিকে নামে না চিনলেও পেশাদারি অভিজ্ঞতায় ওর মতো মেয়েদের চেনে। গেটের হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, কাঁহা জানা হ্যায়?

অন্দর।

জোরে জোরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দারোয়ান বলল, পারমিশন নেহি হ্যায়।

জুলি চোখ টিপল। ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে আনল পাঁচ টাকার একটা নোট। দারোয়ান পাঁচ টাকার নোট আর জুলির বুক—দুটোই চকচকে চোখে দেখে আবার আগের মতোই সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, বোল্যা না, পারমিশন নেহি হ্যায়।

ঠিক এই সময়ই একটা বড় দল রেস্তোরাঁর ভেতর থেকে বেরোতে শুরু করল। দারোয়ান দরজাটা পুরো খুলে তাদের সেলাম করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, জুলি এই সুযোগটার পুরো সদ্ব্যবহার করল। লোকগুলোকে পাশ কাটিয়ে সটান ঢুকে পড়ল ভেতরে আর দ্রুত চারদিকে চোখ বুলিয়ে কোনার টেবিলটায় খুঁজে পেয়ে গেল দয়াল সান্যালকে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে এল দয়াল সান্যালের দিকে।

টেবিলের কাছে এসে জুলি থমকে গেল। দয়াল সান্যালের উলটোদিকে একটা লোক হাত-পা ছড়িয়ে ঘাড় কাত করে লটকে বসে আছে। বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছে, সই জাল করে দলিল করার কাজ করতে পারব না। ম্যাডামের সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না স্যার...

জুলি পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। দয়াল সান্যাল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে জুলিকে দেখলেন। কোনও বিস্ময় বা আপত্তি প্রকাশ করলেন না। জুলি দয়াল সান্যালকে জিজ্ঞেস করল, কে ও?

চিবিয়ে চিবিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, একটা শুয়োরের বাচ্চা।

কী হয়েছে?

হুইস্কির কিক খেয়ে সততার আত্মা জেগেছে। শালা আবার প্রেস্টিজকে খুব গুরুত্ব দেয়।

দয়াল সান্যালের হাতের ওপর হাত রেখে জুলি বলল, মরুকগে যাক। আজ আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আজকে আপনাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।

দয়াল সান্যাল হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, ফিশফ্রাই খাবে?

জুলি হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই দয়াল সান্যাল ঠান্ডায় জুড়িয়ে যাওয়া ফিশফ্রাইয়ের প্লেটটা এগিয়ে দিলেন জুলির দিকে। জুলি একটা কামড় দিয়ে বলল, ফিশফ্রাই আমার ভাল লাগে আপনি জানলেন কী করে? যাকগে, খেয়ে নিই, তারপর... আজ যাবেন তো আমার সঙ্গে?

দয়াল সান্যাল মুখে কিছু না বলে ঠান্ডা চোখে জুলির দিকে তাকালেন। জুলি ফিশফ্রাই চিবোতে লাগল।

দয়াল সান্যাল হাত উঁচু করে ওয়েটারকে ডাকলেন। ওয়েটার কাছে আসতে বললেন, বিল!

দয়াল সান্যাল এবার সত্যিই উঠে যাবেন বুঝতে পেরে জুলি তাড়াতাড়ি বাকি

ফিশফ্রাইটা শেষ করতে করতে বলল, মাইরি বলছি, একদম ব্যাবসা নেই। আপনি আমার সঙ্গে যেতে না চান অন্য দু'-একটা কাজ দিন না। ওই ব্যারাকপুর যাওয়ার মতো।

একটা ফোল্ডারে করে বিলটা নিয়ে ওয়েটার টেবিলের ওপর রাখল। দয়াল সান্যাল পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে টাকা ফোল্ডারটার মধ্যে গুঁজে দিয়ে বেহুঁশ অনুপমকে দেখিয়ে ওয়েটারকে বললেন, তোলো ওকে।

ওয়েটার আর একজনকে ডাকল। তারপর দু'জন মিলে বেহুঁশ অনুপমের দুটো হাত নিজেদের কাঁধে নিয়ে গেটের দিকে এগোতে থাকল। দয়াল সান্যালের পিছন পিছন এল জুলিও।

দয়াল সান্যাল বাইরে এসে বনোয়ারীলালকে বললেন, বনোয়ারী, একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাও। ওর বাড়ির ঠিকানাটা বুঝিয়ে দাও ট্যাক্সি ড্রাইভারকে।

কথাটা বলেই অবশ্য ক্ষান্ত হলেন না। বনোয়ারীলালের কাছে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে খসখস করে অনুপম ঘোষের ঠিকানাটা লিখে দিলেন।

একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বনোয়ারীলাল, ওয়েটারের সাহায্যে ট্যাক্সিতে অনুপমকে তুলে দিল। ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করতেই দয়াল সান্যাল বললেন, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে একটু দাঁড়াতে বলো।

তারপর জুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, কাজ খুঁজছিলে না? এই নাও কাজ, মাতালটাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। একদম ওর বউয়ের হাতে তুলে দেবে। শুয়োরের বাচ্চা প্রেস্টিজকে খুব গুরুত্ব দেয়।

ওয়ালেট থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বের করে জুলির হাতে দিয়ে বললেন, ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দিয়ো। বাকিটা তোমার।

ভারী চোখের পাতা দুটো কোনওরকমে খুলে অনুপম ঘোষ দেখল বাইরে ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো সরে সরে যাচ্ছে। আর পাশে কালো শাড়ি পরে একটা মেয়ে।

২৭

কাগজে লেখা কোনও ঠিকানা নেই। স্মৃতিটুকুই ভরসা। সেই স্মৃতির ওপরেও দশ বছরের ধুলোবালি। তবু তাকে সম্বল করেই দেওঘর স্টেশনে নামলেন ক্যাথি গোমস। মালপত্তর বলতে তিনটে বড় সুটকেস, ছোট-বড় আরও গোটা দু'য়েক ব্যাগ।

স্টেশনের বাইরে টাঙ্গায় উঠে ধুলো ঝেড়ে ক্যাথি টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন, ডক্টর অমিয় ত্রিপাঠী কা মকান।

ডক্টর অমিয় ত্রিপাঠীর নাম টাঙ্গাওয়ালার জানা নেই। তবে এই বয়স্কা যাত্রীটিকে টাঙ্গাওয়ালা হারাতে চাইল না। পাড়াগুলো তো জানা আছে। গিয়ে খোঁজখবর করলেই হবে। মালপত্তর তুলে টাঙ্গাটাকে নিয়ে চলা শুরু করল সে।

দেওঘরে এই প্রথম এলেন ক্যাথি। জীবনের উপান্তে এসে আর একটা দেশ। এদেশে স্থায়িত্ব কতদিনের হবে জানা নেই। ডাক্তার থাকলে হয়তো শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত, না হলে হয়তো কয়েক ঘণ্টা। এই টাঙ্গাতেই ফিরতি পথ ধরে আবার স্টেশন।

একে-ওকে জিজ্ঞেস করে টাঙ্গাওয়ালা ঠিকই নিয়ে এল একটা বাড়ির সামনে। বাড়ির একতলায় একটা ডিসপেনসারি। কার্নিশের ওপর একটা হলুদ বোর্ড লাগানো। তাতে কালো অক্ষরে লেখা ডক্টর ত্রিপাঠী কা দাওয়াইখানা।

টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন মালপত্তর নিয়ে একটু অপেক্ষা করতে। সময়টা বেলা এগারোটার কাছাকাছি। ডিসপেনসারিটাতে ঢুকেই প্রথমে অপেক্ষমান রোগীদের বসার জায়গা। তিন সারি কাঠের বেঞ্চ পাতা। রোগীদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই অত্যন্ত নিম্নবিত্ত। তার পিছনে একটা ঘর। দরজায় পরদা ফেলা। সেই ঘরেই ডাক্তারবাবু বসেন।

কম্পাউন্ডার লোকটা করিতকর্মা। সজাগ দৃষ্টি। এই ঘরে কে এসে কখন বেঞ্চে বসছে মনে মনে তার ঠিকঠাক তালিকা রাখে। পরপর ডেকে নেয় নামগুলো। তবে স্থানীয় লোকদের ভিড়ে ক্যাথি ব্যতিক্রম। বয়স হলেও চেহারায় একটা জৌলুস আছে। তার ওপর কোলের কাছে ধরা একটা শালপাতার ঠোঙা। এই দুটোই রোগীদের ভিড়ে তাঁর একটা স্বাতন্ত্র্য তৈরি করল। প্যাঁড়া নিয়ে কেউ ডাক্তার দেখাতে আসে না।

আপ আইয়ে মাইজি।

কম্পাউন্ডার ডেকে নিল ক্যাথিকে। ক্যাথি তার পিছন পিছন এলেন ডাক্তার ত্রিপাঠীর চেম্বারে।

ডাক্তার ত্রিপাঠী মাথা গুঁজে একটা কাগজে খসখস করে কী যেন লিখছিলেন। তিনি মুখ তুলে চেয়ে চমকে উঠলেন। এ তো একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য! ক্যাথি গোমস—এই দেওঘরে! ক্যাথির মুখে একটা ম্লান হাসি। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটাতে একটু সময় নিলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।

তুমি এখানে ক্যাথি?

কেন, এখানে আসতে পারি না?

না... না... তা বলছি না। দেওঘরে তো হিন্দুরা আসে ধর্ম করতে। তুমি তো...

কম্পাউন্ডার দাঁড়িয়ে ছিল। বুঝতে চেষ্টা করছিল সম্পর্কটা। ডাক্তার ত্রিপাঠী ইশারা করতে বেরিয়ে গেল।

ক্যাথি একটু ঝুঁকে বললেন, কেন, তোমার কাছে আসতে পারি না?

নিশ্চয়ই পারো। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

কতদিন আছ এখানে?

কত বছর হবে... চিন্তা করতে করতে ডাক্তার ত্রিপাঠী বললেন, চিনের সঙ্গে যুদ্ধটা কোন বছর হয়েছিল তোমার খেয়াল আছে?

না। মনে নেই। ওসব মনে রাখার চেষ্টাও করি না। যত কাটাকাটি, হানাহানি, অশান্তি লেগেই আছে। এই তো আর একটা যুদ্ধ গেল।

আমিও মনে রাখি না ক্যাথি। তবে নিজের জীবনের বড় ঘটনাগুলো মনে রাখার সবচেয়ে সোজা এটাই উপায়। একটা ঘটনার সঙ্গে আর একটা ঘটনা জুড়ে দাও। সাল-তারিখগুলো অন্যরা মনে করিয়ে দেবে।

কম্পাউন্ডার ঘরে ঢোকার একটা ছুতো পেল। পরদাটা সরিয়ে ঘরে ঢুকে ক্যাথির সামনে এসে বিনীতভাবে করজোড়ে জিজ্ঞেস করল, ভাবীজি... ওহ্ টাঙ্গাওয়ালা...

ক্যাথি ঘড়ি দেখলেন। পৌনে এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল টাঙ্গাওয়ালা অপেক্ষা করছে। এখানকার টাঙ্গাওয়ালারা কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের মতো নয় ভেবে যে-তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তার সুযোগটা একটু বেশিই বোধহয় নেওয়া হয়ে যাচ্ছে।

তুমি টাঙ্গা দাঁড় করিয়ে এসেছ? ডাক্তার ত্রিপাঠী জিজ্ঞেস করলেন।

ক্যাথি কম্পাউন্ডারের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওকে একটু বলবেন, আমি আসছি...

কম্পাউন্ডার বেরিয়ে যেতে চেয়ারে গা এলিয়ে ডাক্তার ত্রিপাঠী ক্যাথিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় উঠেছ?

ট্রেন থেকে নেমে সোজা তোমার কাছেই এলাম।

আমার কাছে! ডাক্তার ত্রিপাঠী অবাক হলেন।

আমার একটা থাকার ব্যবস্থা করে দেবে?

তুমি...

ডাক্তার ত্রিপাঠী ভাষা খুঁজে পেলেন না। ক্যাথি গোমস ছলছল চোখে বলে উঠলেন, আর একবার উৎখাত হয়ে গেলাম।

ডাক্তার ত্রিপাঠী আলতো করে ক্যাথির হাতের ওপর হাত রেখে বললেন, আমি আছি ক্যাথি। আর কোনও সমাজের ভয় নেই আমার। তুমি থাকো আমার সঙ্গে। সারা জীবন। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। এত বছর পরে তুমি কোনও খোঁজখবর না নিয়েই এখানে চলে এলে, যদি আমি এখানে না থাকতাম অথবা বেঁচেই না থাকতাম।

ক্যাথি আবেগ দেখালেন না। বরং গুছিয়ে যুক্তিসংগতভাবে বললেন, টাঙ্গাটা নিয়ে ফিরে যেতাম স্টেশনে। তারপর ভাবতাম কোথায় যাব। সেখানকার টিকিট কাটতাম।

তুমি যাও। টাঙ্গাটা নিয়ে আমার বাড়ি চলে যাও। রাকেশকে বলে দিচ্ছি। একজন লোক দিয়ে দেবে তোমার সঙ্গে। সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছ। বাড়ি গিয়ে রেস্ট নাও। দুপুরে আমি বাড়ি ফিরে আসব।

ডাক্তার ত্রিপাঠীর বাড়ি লোকালয় থেকে একটু দূরে। দোতলা বাড়িটা বেশ পুরনো। দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় পলেস্তরা ছেড়ে এসেছে। পরিচর্যা প্রায় নেই। তবে অনাবশ্যক আসবাবপত্রও নেই। মানুষটা এত বছর এখানে আছেন, বাড়িটায় ঢুকে বোঝাই যায় না। ঠিক যেন আধবেলার নোটিশে সব কিছু গুছিয়ে ফেলা যায়। তবে বাইরে প্রকৃতি অকৃপণ। ভেতর-বাইরে মিশে ক্যাথির ভাল লেগে গেল জায়গাটা। মনে হতে থাকল ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। কোথায় যেন আপনজনের ছোঁওয়া আছে এখানে।

টাঙ্গাতে একজন লোক দিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। সে-ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা বাড়ির একমাত্র চাকর সরযুকে বলে দিয়েছিল। সরযু যত্ন করে ক্যাথির সুটকেস আর ব্যাগগুলো একটা ঘরে রাখল। স্নানের জন্য গরম জল করে দিল। দুপুরে কী খাবে জিজ্ঞেস করল।

চান করে ট্রেন জার্নির ক্লান্তিতে ক্যাথি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সরযুকে বলে রেখেছিলেন, ওঁর খাওয়ার কোনও তাড়া নেই। ডাক্তারবাবু এলে খাবেন। ঘুমটা ভাঙল সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজে। খাটের পায়ের দিকের দুটো জানলাই খোলা। সেই জানলা দিয়ে দেখলেন পাঁচিলের ধারের ছোট্ট গেটটায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী। মাথায় একটা বেতের টুপি।

ক্যাথি আশ্চর্য হওয়ার চেয়েও একটা ভাবাবেগে ডুবে গেলেন। বেতের টুপি পরে সাইকেল নিয়ে যে-প্রৌঢ় মানুষটা সাইকেলের ঘন্টি বাজাচ্ছেন, তাঁর পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য, বৈভব এবং পসারের আন্দাজ ক্যাথির আছে।

ক্যাথি উঠে গেলেন। একমুখ নিষ্পাপ হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ডাক্তার ত্রিপাঠীকে। দুপুরে খাওয়ার টেবিলে গল্প করতে করতেই বিকেল গড়িয়ে গেল। ডাক্তার ত্রিপাঠীর সংসারের অশান্তির কথা, তার একেকটা খুঁটিনাটি ক্যাথির জানা। দুই ছেলের হাতে নিগ্রহের গল্পও তাঁর জানা। সব ছেড়ে দেওঘরে চলে আসার সিদ্ধান্তও জানা। এই সময়ে ক্যাথিও নিজের পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ডাক্তার ত্রিপাঠী রাতে শোওয়ার সময় পায়ের দিকে জানলার পাল্লা দুটো খুলে দিলেন। ব্যারাকপুরের তুলনায় রাতে এখানে ঠান্ডা বেশিই। ক্যাথি নিজের ঘরে শুতে যাওয়ার আগে ডাক্তার ত্রিপাঠীর ঘরে একবার এসে দেখলেন ডাক্তার ত্রিপাঠী খোলা জানলার শিক দুটো ধরে উদাস হয়ে বাইরের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। এখানের আকাশ আরও পরিষ্কার। তারাগুলো ঝিকমিক করছে।

ক্যাথি আর ডাক্তার ত্রিপাঠীকে ডাকলেন না। নিজের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতে ঘরে একলা শোওয়া অভ্যাস হয়ে গেলেও জায়গাটা নতুন। ঘরটাও ব্যারাকপুরের ঘরের চেয়ে অনেক বড়। দু'দিকের দেওয়ালে বড় বড় চারটে জানলা। উত্তর দিকের জানলা দুটো বন্ধ থাকলেও পশ্চিম দিকের জানলা দুটোর ওপরের পাল্লা দুটো খোলা। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে সেই জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন ক্যাথি। যেরকম একটু আগে ডাক্তার ত্রিপাঠীর ঘরের জানলা দিয়ে একঝলক দেখেছিলেন, সেরকমই বাইরে ঝকঝকে কালো আকাশে ঝিকমিক করছে তারাগুলো। অন্ধকারটা চোখে সয়ে যাওয়ার পর ঘরটাও আবছা ফুটে উঠল চোখে। নতুন জায়গায় প্রথম রাত্রিতে ঘরটা কিন্তু নতুন লাগল না ক্যাথির।

ভাললাগার লেপের তুলতুলে স্পর্শটা চিবুকের তলা পর্যন্ত টেনে নিলেন ক্যাথি। সারা দিনের ক্লান্তিটা শাখাপ্রশাখা ছড়াতে আরম্ভ করল শরীরে। এমন সময় কানে এল একটা ক্ষীণ টানা মেঠো পাঁচালির সুর।

প্রথমে মনে হয়েছিল সুরটা ভেসে আসছে বাড়ির বাইরে থেকে, কিন্তু একটু পরেই

বুঝতে পারলেন, এটা বাড়ির ভেতর থেকেই আসছে। রাতে খাবার টেবিলে বসে অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে ডাক্তার ত্রিপাঠীর সঙ্গে। নানারকম টুকরো টুকরো সুখ-দুঃখের পুরনো দিনের গল্প। তখনই খেয়াল করেছিলেন কাজের লোকটা উস্‌খুস করছিল। রাতে সব কাজ সেরে লোকটা বাড়ি ফিরে যায়। গল্প তখনও ফুরোয়নি। ডাক্তার ত্রিপাঠী লোকটাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। গোটা বাড়িটায় দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই।

ভূতপ্রেতে ভয় ক্যাথির কোনওদিনই নেই। তবে অস্পষ্ট মেঠো সুরটা কীরকম যেন গা ছমছমে। এতক্ষণ ঘরটা যে নিশ্চিন্ত আপনার মনে হচ্ছিল, এই মেঠো সুরটায় কীরকম যেন অস্বস্তি হতে শুরু করল ক্যাথির। একটু চিন্তা করে বালিশের নীচ থেকে পেনসিল টর্চটা বার করে খাট থেকে নেমে এলেন। সাবধানে ঘরের বাইরে এসে ডাক্তার ত্রিপাঠীর ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজার মুখটায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। মেঠো পাঁচালির সঙ্গে কথাগুলো এবার স্পষ্ট শুনতে পেতে থাকলেন—

রঘুনাথ দিল তোমায় আলিঙ্গন দান।
কহিলেন তুমি ভাই ভরত সমান॥
সহস্র বদন তব গাবে যশ খ্যাতি।
এই বলি আলিঙ্গন করেন শ্রীপতি॥

ঘরের দরজাটা অল্প ফাঁক। খয়াটে হারিকেনের আলোয় একমনে একটা পকেট সাইজের পাতলা চটি বই দুলে দুলে নিচু গলায় পড়ে যাচ্ছেন ডাক্তার ত্রিপাঠী।

ক্যাথি দরজাটা আলতো করে খুলে নরম গলায় বললেন, ডাক্তার আসব?

ডাক্তার ত্রিপাঠী পাঠ বন্ধ করে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাথিকে দেখে একটু ম্লান হেসে বললেন, নতুন জায়গা, ঘুম আসছে না?

ক্যাথি ভেতরে এসে ডাক্তার ত্রিপাঠীর কাঁধে হাত রাখলেন, তুমি কী পড়ছ ডাক্তার?

একটা বড় শ্বাস ফেললেন ডাক্তার ত্রিপাঠী, হনুমান চালিশা।

কিছু পুরনো স্মৃতি হুড়মুড়িয়ে ঝাপটা দিল ক্যাথির ভেতর। এক টানটান চেহারার মধ্যবয়স্ক উন্নাসিক বিলেত ফেরত ডাক্তার। যে টাইয়ের নিখুঁত নটটা ঠিক করতে করতে পাক্কা সাহেবি উচ্চারণে বলত, ভগবানের আগে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখো ক্যাথি, ভগবান কোনও ম্যাজিক পারে না। মানুষ পারে। ক্যাথি জানতে চাইতেন, ভগবানের ওপর তোমার খুব রাগ তাই না ডাক্তার?

রাগ! রাগ কেন হবে? যার অস্তিত্বই নেই তার ওপর কি রাগ করা যায়?

তুমি এবার শুয়ে পড়ো ডাক্তার। অনেক রাত হয়েছে।

ডাক্তার ত্রিপাঠী কোনও কথা বললেন না। মশারিটা তুলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্যাথি যত্ন করে মশারিটা গুঁজে দিয়ে হারিকেনটা নিয়ে বাইরে চলে এলেন। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখের পাতাটা ভারী হতে থাকল। আধ তন্দ্রায় আবার মনে হল অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা সুর... আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

চিৎপুর রোডে ট্রাম লাইন ধরে শোভাবাজারের একটু আগে গঙ্গার ধারে যাওয়ার রাস্তাটা ধরলে প্রাচীন বাড়িটা বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। একটা বড় উঠোনকে মধ্যে রেখে গঙ্গার ধারে তিন ভাঁজের বিশাল বাড়িটা এককালে কোনও এক মহারাজের সম্পত্তি ছিল। এখন সেখানে শাখাপ্রশাখার মতো সাতাশটা পরিবারের শ'খানেকের ওপর সদস্যকে অনায়াসে আশ্রয় দিয়েছে। অষ্টপ্রহর বাড়িটা তাই গমগম করে। বাড়িটার উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে সরোজ বক্সী একবার মাথা উঁচু করে তাকান তিনতলার টানা বারান্দার দিকে। বারান্দাটার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এক-এক দিন অতসী দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর পথ চেয়ে। যেদিন থাকে না, আজকে যেমন, পা দুটো যেন ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা টানা বারান্দার এক দিকে পরপর দরজা, তার পাঁচ নম্বরটা সরোজ বক্সীর। টানা বারান্দার মুখে এসে একটু দাঁড়ান সরোজ বক্সী। পশ্চিম দিকে গঙ্গা। ওদিক দিয়ে একটা ঠান্ডা হাওয়া আসে। বুক ভরে কয়েকটা বড় বড় শ্বাস নিয়ে ক্লান্তিটা দূর করার চেষ্টা করেন। টানা বারান্দায় খড়িমাটি দিকে ছক কেটে এক্কাদোক্কা খেলছে কয়েকটা মেয়ে। প্রজাপতির মতো যেন এঘর থেকে ওঘরে উড়ে যাচ্ছে। সরোজ বক্সীর মেয়েগুলোকে দেখে নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। আড়াইতেই টলটল করে কথা বলতে শিখে গেল মেয়েটা। আর ক'দিন পর ও ঠিক এরকমই প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে এক্কাদোক্কা খেলবে। মনে মনে সেই সুখের দৃশ্যটা ভাবতে ভাবতে খড়ির দাগগুলো বাঁচিয়ে মেয়েগুলোর পাশ দিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজাটায় মৃদু ঠেলা দিলেন।

স্বামী না ফেরা পর্যন্ত অতসী দরজাটা ছিটকিনি না তুলে ভেজিয়ে রাখে। ঠেলা দিয়ে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে একটু অবাক হলেন সরোজ বক্সী। দরজার বাইরে তালা নেই। তার মানে অতসী ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে রেখেছে। চিন্তিত হয়ে কলিংবেলে চাপ দিলেন। একটু পরে ভেতর থেকে এসে অতসী দরজাটা খুলে দিল। দরজাটা কেন বন্ধ করে রেখেছিল, এই কৌতূহলী প্রশ্নটা করার আগেই অতসীর চোখমুখ দেখে অবাক হওয়াটা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

অতসীর চোখমুখ ফোলা ফোলা। চোখ দুটো লাল। মুখটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট। অতসীকে এরকম কোনওদিন দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। বীথির কিছু হয়নি তো? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বীথিমা কোথায়?

নাকটা টেনে অতসী বলল, ঘুমোচ্ছে।

কীরকম যেন বিশ্বাস হল না সরোজ বক্সীর। বুকের ভেতর একটা ভয় ঢুকে গেছে যে! কোনওরকমে জুতোজোড়া খুলে শোওয়ার ঘরে এসে বীথিকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। চিত হয়ে শুয়ে বালিশের দু'দিকে হাত দুটো ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। গায়ের ওপর কাঁথাটা এলোমেলো হয়ে গেছে। কাঁথাটা টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন সরোজ বক্সী।

চা খাবে?

যত রাতেই সরোজ বক্সী বাড়ি ফিরুন, এই প্রশ্নটা করা অতসীর অভ্যেস। একদম কর্তব্যজ্ঞানে প্রশ্নটা করে। চা খেয়ে সরোজ বক্সী চান করতে যান। তারপরে রাতে খাওয়াদাওয়া এবং খাওয়াদাওয়ার পর একবার ছাদে যান।

অতসীর মুখচোখের অবস্থা দেখে আজ আর চা খাওয়ার কথা বললেন না। আজ হবে হয়তো কোনও একটা খারাপ তারিখ। অতসীর মা বা বাবার চলে যাওয়ার তারিখ। অতসী কেঁদে কেঁদে চোখমুখের এই অবস্থা করেছে। এসব তারিখ তো খেয়ালই থাকে না।

অতসীর সঙ্গে সরোজ বক্সীর বয়সের ফারাক একটু বেশিই। মাঝে মাঝে মালিক দয়াল সান্যালের সঙ্গে শিপ্রা সান্যালের বেশি বয়সের ফারাকের সঙ্গে অতসী ও নিজের বয়সের ব্যবধানের মিলটা খুঁজে পেয়ে মনে মনে হাসেন। মনিব-ভৃত্যের কিছু কিছু মিল কোথাও থেকেই যায়। খুঁজলে হয়তো আরও অনেক মনের মিল পাওয়া যাবে মনিবের সঙ্গে। তবে সরোজ বক্সী মনেপ্রাণে কামনা করেন, দয়াল সান্যালের মতো মানুষের সঙ্গে মিল যত কম হয় ততই মঙ্গল।

কুণ্ঠিত হয়ে কম কথা বলার অভ্যাসটা দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীর চরিত্রে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অতসীর সঙ্গে কথা বলার সময়েও তার প্রভাব পড়ে। বাড়িতেও যথাসম্ভব কম কথা বলেন সরোজ বক্সী। আজকে কোনও বিশেষ তারিখ? অতসী ওরকম চোখমুখ ফুলিয়ে কাঁদছিল কেন? খেতে খেতে প্রশ্নটা যেন মুখে এসেও আসছিল না।

আড়াই জনের সংসারে কিছু নিয়ম অতসী নিজেই তৈরি করেছে এবং সেগুলো একদম ধর্মীয় আচারের নিষ্ঠায় মানে। সরোজ বক্সীর রাতের খাওয়ার সময় কোনওদিন একসঙ্গে অতসী খায় না। স্বামীর খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এঁটো বাসন তুলে তারপর নিজে খেতে বসে।

খাওয়ার পরে অতসীর খাওয়ার এই সময়টা সরোজ বক্সী ছাতে চলে আসেন। এ-বাড়ির ছাদে যেন আস্ত একটা ফুটবল মাঠ ঢুকে যাবে। ছাদের এক দিকে দাঁড়ালে গঙ্গাটা দেখা যায়। চুপ করে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকেন। দিনের মধ্যে এই একটাই তাঁর নিজস্ব সময়। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রচুর প্রশ্ন করেন তিনি। দয়াল সান্যাল তাকে দিয়ে সারাদিন যে অসংখ্য অন্যায় করান, প্রবহমান গঙ্গার দিকে তাকিয়ে নিজেকে গ্লানিমুক্ত করতে চান।

বাড়িটার অন্য প্রান্তগুলোর মতো ছাদেও অনেক রাত পর্যন্ত মানুষজন থাকে। কেউ একা, কেউ দলে, সবারই প্রায় একটা নির্ধারিত জায়গা আছে। কোথাও তাস খেলা হয়, কোথাও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, কোথাও লুকিয়ে মদ্যপানের আসর। কেউ খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে সপ্তর্ষি আর কালকেতুর বেল্ট নিয়ে একা একা নিজের মনে গবেষণা করে, কেউ আবার মন্ত্রোচ্চারণ করে ধর্মরক্ষা করে।

সেরকমই যামিনী ভট্টাচার্যর মতো মানুষের এই ছাদটা বড় প্রিয় জায়গা। অন্ধকার ছাদে গীতার শ্লোক আওড়ান এবং কেউ আগ্রহ দেখালে তাকে শ্লোকের ব্যাখ্যা শোনান।

যদিও এ ব্যাপারে কেউই খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। কিন্তু তিন দরজা পাশের বাসিন্দা যামিনী ভট্টাচার্যকে সরোজ বক্সী এড়িয়ে যান না। গীতার বাণী বুঝুন না বুঝুন, মর্মার্থ ভেতরে ঢুকুক না ঢুকুক, যামিনী ভট্টাচার্যর কথা মন দিয়ে শোনেন সরোজ বক্সী। এতেও কখনও কখনও মনে হয় যেন পাপের বোঝা লাঘব হচ্ছে। সরোজ বক্সীর আগ্রহ দেখে মুদ্রাদোষের মতো যামিনী ভট্টাচার্য প্রায়ই বলেন, বুঝলে সরোজ, গীতার বাণী সবাই শোনে, কিন্তু ক'জন পার্থ হয়।

প্রৌঢ় যামিনী ভট্টাচার্যকে ছাদের এক কোণে দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সরোজ বক্সী। যামিনী ভট্টাচার্য সরোজ বক্সীকে দেখে বললেন, কী হে সরোজ, সেদিন যে-কথাটা বললাম, চিন্তা করে দেখেছ?

দুটো শব্দ কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যামিনী ভট্টাচার্য, 'আত্মানাং বিদ্ধি'। সরোজ বক্সী সংস্কৃত জানেন না। মানেটা তাই যামিনী ভট্টাচার্যকেই বলে দিতে হয়েছিল, 'নিজেকে জানো'। কঠিন সংস্কৃতের সহজ সরল একটা মানে। অথচ এই মানের গভীরতা বিরাট।

সরোজ বক্সী খানিকটা তাত্ত্বিকভাবে উত্তর দিলেন, নিজেকেই তো শুধু চিনতে পারলাম না যামিনীদা। কী করি, কেন করি, কিছুই তো ভেবে করি না। যন্ত্রের মতো করি। সেই কথাটাই সবচেয়ে বড় কথা বোধহয়। মা ফলেষু কদাচন...

যামিনী ভট্টাচার্য চটে উঠলেন। বললেন, যত লোককে দেখি গীতার ওই একটা লাইনই আওড়াতে পারে। গোটা গীতায় যেন আর কোনও কথা বলা নেই। গীতা বুঝতে হয় সরোজ, ভেতর থেকে সবকটা লাইন বুঝতে হয়। মন দিয়ে গীতা পড়ো আর রোজ নিজেকে নতুন করে চেনো সরোজ, নিজের আত্মাকে চেনো। মানুষকে মানুষই ছোট-বড় করে। আত্মার কোনও মাপ হয় না। যামিনী ভট্টাচার্য গম্ভীর গলায় বললেন, 'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ', মানুষ নিজের কাজে নিষ্ঠাবান হলে সিদ্ধিলাভ করে... কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা ত্যাগ করতে নেই; গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন।

সরোজ বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, নিজেকে চিনতে গিয়ে একটাই জিনিস দেখেছি যামিনীদা। আমি এবং আমার আত্মার মধ্যে রয়েছে শুধু একটা জগদ্দল পাথরের মতো ভাগ্য।

পরাজয়ের জন্য ভাগ্যের দোহাই দিয়ো না সরোজ।

ভাগ্য ছাড়া আমি আর কীসের দোহাই দেব যামিনীদা? পেট চালাতে, সংসার চালাতে একটা তুচ্ছ চাকরি করতে হয়। সেই চাকরিটা বাঁচাতে গিয়ে বহু অন্যায় করতে হয়। আমি শুধু ভাবি এটাই ভবিতব্য, এটাই নিয়তি।

কেন, তোমার পুরুষকার নেই? সেই পুরুষকার নিয়ে একবার অন্তত রুখে দাঁড়াও, নিজের ধর্ম নিজের হাতে নিয়ে। দেখবে, আস্তে আস্তে তুমি নিজেকে চিনতে পারছ।

নিজের মনে আরও শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে যামিনী ভট্টাচার্য ছাদের অন্য দিকে চলে গেলেন। বিহ্বল হয়ে সরোজ বক্সী ভাবতে লাগলেন, কবে যেন প্রথম দেখেছিলেন দয়াল সান্যালকে? সন-তারিখ খেয়াল নেই। পনেরো-কুড়ি বছর আগে হবে। মগন শেঠের গদিতে ততদিনে সরোজ বক্সীর ছ'বছরের ওপর চাকরি করা হয়ে গেছে।

একদিন কার একটা হাত ধরে যেন দয়াল সান্যাল সেখানে এসেছিল। গদিতে চাকরি হল। পান থেকে চুন খসলেই মগন শেঠের কাছে দু'জনই জাতপাত, বাঙালিত্বর বাপান্ত খেত। তারপর একদিন দুম করে দয়াল সান্যাল চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে নিজেই দালালির কাজ আরম্ভ করল। এটাই বোধহয় পুরুষকার। সরোজ বক্সী মগন শেঠের গদির নিশ্চিন্ত চাকরিটা ছাড়তে পারেননি। বছর চারেক সময় লেগেছিল দয়াল সান্যালের। মার্থা হরিতলা কটন মিলের চাবিটা ম্যাকার্থির হাত থেকে পেয়েছিল। দয়াল সান্যালকে শুধু এক বেশ্যার মেয়েকে বিয়ে করতে হয়েছিল। এটা কি পুরুষকার না ভাগ্য? তারপর দয়াল সান্যাল যোগাযোগ করেছিলেন সরোজ বক্সীর মতো কয়েকজন পুরনো লোকের সঙ্গে। মোটা মাইনের হাতছানিটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অনেক ভেবেও সেই হাতটাকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি—এটা কি ভাগ্য না নিয়তি?

এই অন্ধকার ছাদে ভাবনাগুলো বহুবার ঘুরেফিরে আসে। এই ভাবনাটা একেবারেই সুখদায়ক নয়। বুকের বোঝাটা বাড়িয়ে দেয়। সেই বোঝাটা নিয়েই ছাদের অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে নামতে থাকলেন সরোজ বক্সী।

অতসী এবার দরজাটা ভেজিয়েই রেখেছে। ছিটকিনি তুলে রাখেনি। সরোজ বক্সী রাতের জন্য পোক্তভাবে দরজাটা বন্ধ করলেন। ঘরে এসে দেখলেন অতসীর মুখের ওপর যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছায়াটা যায়নি। এবার না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলেন না।

তোমার কি শরীর খারাপ?

অতসী আঁচলের খুঁট দিয়ে মুখটা চেপে বলল, তলপেটের যন্ত্রণাটা...।

গভীর একটা পাপবোধ গ্রাস করল সরোজ বক্সীকে। অতসী তলপেটের যন্ত্রণার কথাটা মাঝেমধ্যেই বলে। বহুদিন হয়ে গেল, আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব বলে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে না। দয়াল সান্যাল প্রতিদিন নিত্যনতুন কাজ দিয়ে চলেছেন। এবং সেইসব কাজে কোনও ফুরসত নেই। আজ চাই তো, আজই চাই। কোনও ছুটির কথা বলতে পারেন না। আগে তাও একটা রবিবার ছুটি থাকত। বছরখানেক হল সেটাও ঘুচে গেছে। রবিবারগুলোতেও গিয়ে হাজির হতে হয় দয়াল সান্যালের বাড়িতে। আর একবার ও বাড়িতে পৌঁছোলে কখন ছুটি পাওয়া যাবে ভগবানও জানেন না।

সরোজ বক্সী খুঁটিয়ে দেখলেন অতসীর মুখটা। ফ্যাকাশে নীল হয়ে গেছে। আলতো করে হাতটা রাখলেন অতসীর পেটের ওপর। অতসী একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাসার চেষ্টা করল। অপরাধীর মতো মুখ করে সরোজ বক্সী বললেন, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

অতসী কোনও উত্তর দিল না। মুখটা ঘুরিয়ে নিল পাশে ঘুমোনো ছোট্ট বীথির দিকে।

ওষুধ খেয়েছ?

অতসী মাথা নাড়ল। ঠোঁট চেপে বলল, শেষ হয়ে গেছে।

সরোজ বক্সীর বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। নিজে কোনওদিনই অতসীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে পারেননি। অতসী নিজেই পাড়ার নীতিন ডাক্তারকে দেখিয়েছিল।

সাধারণ ব্যথা কমানোর ওষুধ লিখে দিয়েছিল। আর বলেছিল এই ব্যথা থাকলে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। পিজি-তে এক বড় ডাক্তারের নামও লিখে দিয়েছিল।

সেই একবারই এক পাতার ওষুধ অতসী নিজে কিনে এনেছিল।

শেষ হওয়ার আগে প্রেসক্রিপশনটা সরোজ বক্সীকে দিয়ে বলেছিল আর এক পাতা নিয়ে আসতে। সেদিন থেকেই দুমড়ে মুচড়ে প্রেসক্রিপশনটা মানিব্যাগের অস্পৃশ্য এক কোণে পড়ে আছে।

সরোজ বক্সী ভাবলেন, কেন এমন হয়? সান্যাল পরিবারের প্রয়োজনের প্রতিটি খুঁটিনাটির ব্যাপারে সবসময় সজাগ দৃষ্টি থাকে। বিট্টু চিনি দেওয়া জেলি লজেন্স চাইলেও নিউ মার্কেট থেকে সেটা কিনে আনতে কখনও ভুল হয় না, অথচ আপনজনের শখ-আহ্লাদ দূরে থাক, চিকিৎসার প্রয়োজনটা পর্যন্ত খেয়াল থাকে না!

শোওয়ার ঘরে জানলা দুটো বড় বড়। অতসী শোওয়ার আগে জানলার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দেয়। সরোজ বক্সী সেই একটা জানলার আধপাল্লা খুলে দিলেন। বেশ দূরে একটা ল্যাম্পপোস্ট। আলোটা হলদেটে টিমটিমে হলেও জানলা বয়ে একটা চৌখুপি আবছা আলো অতসীর গায়ের ওপর এসে পড়েছে। মুখের ওপর আলোটা আরও কম। সরোজ বক্সী এই কম আলোয় অতসীকে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়তে দেখলেন। সেই সঙ্গে একটু একটু করে যন্ত্রণার রেখাগুলো মুছে গেল অতসীর মুখ থেকে। মনে হল, ঘুমই তার যন্ত্রণাটাকে শুষে নিয়েছে। অতসীর কপালে আলতো করে হাত ছোঁওয়াতে গিয়েও নিজেকে গুটিয়ে ফেললেন সরোজ বক্সী। যদি ঘুমটা ভেঙে যায়? কোনও কিছুই তো স্ত্রীকে দিতে পারেননি সাংসারিক জীবনে, যেটুকু প্রকৃতি দিয়েছে, সেটুকু আর কেড়ে নেওয়া কেন?

ঘুমন্ত স্ত্রী আর মেয়েকে দেখতে দেখতে ক্রমশ আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বালিশটা খাটের মাথায় খাড়া করে পিঠে ঠেস দিয়ে উঠে বসলেন। কারও ঘরে পুরনো একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক আছে। পনেরো মিনিট অন্তর একটা করে আওয়াজ তোলে, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময়ের গুনতি জানান দেয়। নিঝুম রাত্রিটা ঘণ্টার আওয়াজ শুনে কাটতে থাকল সরোজ বক্সীর।

আকাশটা অল্প ফিকে হওয়ার মুখে সরোজ বক্সী খাট থেকে নেমে এসে জানলার সামনে দাঁড়ালেন। জানলায় একটা তাজা বাতাস। বুক ভরে কয়েকটা নিশ্বাস নিলেন। তারপরেই একটা ইচ্ছে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ছাদে যাওয়ার। অতসী আর বীথি তখন গভীর ঘুমে। তবুও খুব সন্তর্পণে সরোজ বক্সী পা টিপে টিপে বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে ছাদে চলে এলেন।

ছাদে আসতেই ভোরের শীত একটা কামড় মারল মুখে। গায়ের মোটা চাদরটা যথেষ্ট মনে হল না। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করলেন। ছাদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তিন-চারজন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। যে-কোণ থেকে গঙ্গাটা স্পষ্ট দেখা যায়, সেই জায়গায় এসে পাঁচিলে কনুই দুটো ভর দিয়ে দাঁড়ালেন সরোজ বক্সী।

অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গঙ্গা। চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। অল্প অল্প করে আলো ফুটছে।

কিচিরমিচির করে পাখিরা জেগে উঠছে। নীচে তোলা উনুনে কেউ আঁচ দিয়েছে। সাদা ধোঁয়া-কয়লা পোড়া গন্ধটা বাতাসে ভেসে কুয়াশায় গিয়ে মিশছে।

একটা পাখি উড়ে এসে ছাদের পাঁচিলের আর এক কোনায় বসল, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে পাখিটা আর ঠুকরে ঠুকরে পাঁচিলের ওপর খাবার দানা খাচ্ছে। পাখিটাকে দেখতে দেখতে নতুন একটা পাপবোধের জন্ম হল সরোজ বক্সীর। ছোট একটা ছেলেকে দয়াল সান্যালের কথায় এয়ারগান এনে দিয়েছিলেন, এরকম নিষ্পাপ পাখিদের মারতে। গঙ্গার দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন সরোজ বক্সী।

আলোটা আর একটু ফুটেছে। কুয়াশাটা অল্প গলে গঙ্গাটা আরও খানিকটা স্পষ্ট হয়েছে। একটা খড় বোঝাই নৌকা গঙ্গা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। সারারাত্রি জেগে থাকার ক্লান্তিটা এবার শরীরকে গ্রাস করতে থাকল। ভারী চোখে দেখতে থাকলেন পাখিরা সব উড়ে যাচ্ছে গঙ্গার দিকে—যেদিকে খড় বোঝাই নৌকাটা এগিয়ে যাচ্ছে। ধীরে চলা নৌকাটার দিকে একমনে তাকিয়ে থাকলেন সরোজ বক্সী। একসময় মনে হল নৌকার ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'এ পাপের ফল তোমাকে পেতেই হবে সরোজ'। কথাটা বুকের ভিতর বেজে মনে হল পা দুটোয় আর কোনও জোর পাচ্ছেন না। হাঁটুর কাছ থেকে মনে হচ্ছে ভেঙে পড়ছে। সরোজ বক্সী বিড়বিড় করে বললেন, 'হে ঠাকুর, পুরুষকার দাও... পুরুষকার দাও'। তারপর আর পারলেন না, রাতজাগা ক্লান্ত শরীর এলিয়ে পড়ল ঠান্ডা ছাদের ওপর।

চোখটা যখন খুলল, তখন রোদ বেশ স্পষ্ট। শরীরটাকে ছ'-সাতজন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অতসীও আছে।

কী হয়েছে সরোজদা? নিমুনিয়া বাঁধিয়ে বেঘোরে প্রাণটা দেবেন নাকি?

ভিড়ের মধ্যে থেকে অলুক্ষনে মন্তব্যটা শুনে অতসী হাতটা কাঁপাতে কাঁপাতে কপালে ঠেকাল। এত বছরের দাম্পত্য জীবনে কখনও এরকমটা দেখেনি ও। ঘুম ভাঙার পর পাশে বিছানাটা খালি দেখে মনে করেছিল মানুষটা বাথরুমে গেছে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরেও ফিরে না আসার পর যখন বাথরুমের দরজা আর বাইরের দরজাটা খোলা পেয়েছিল অতসী, তখন মাথায় আসেনি এত ভোরে কোথায় যেতে পারে মানুষটা। পরিচিত পরিবারগুলোর অধিকাংশই তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। বাড়ির বাইরে যাওয়ার সদর দরজাটা তখনও খোলেনি। তবু ছাদের কথাটা একবারও মাথায় আসেনি। মনটা আনচান করছিল, এমন সময় বাইরে থেকে একটা উত্তেজিত গলা পেয়েছিল, 'সরোজদা ছাদে উলটে পড়ে আছে।'

শব্দগুলো ছলাৎ করে বুকে রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছিল অতসীর। সবার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে উঠেছে ছাদে। দূর থেকে সরোজ বক্সীকে ওইভাবে ছাদে শুয়ে থাকতে দেখে হৃৎপিণ্ডটা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বাকি লোকজন যখন অন্যরকম কিছু ভেবে ছুঁতে ভয় পাচ্ছিল, অতসী জোরে জোরে ঝাঁকাতে থাকল সরোজ বক্সীকে।

কী সরোজদা? বউদির ওপর গোঁসা নাকি? নিমের দাঁতন ঘষতে ঘষতে কেউ একটা জিজ্ঞেস করল।

একদম অপ্রস্তুত হয়ে সরোজ বক্সী উঠে বসলেন। এরকম কাণ্ড সত্যিই কোনওদিন করেননি। তা ছাড়া সত্যি কারণটা লোককে বোঝানো যাবে না। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে বলার চেষ্টা করলেন, ভোরে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল ভাই, ভাবলাম গঙ্গার বুকে সূর্য ওঠা দেখি। তখন এত ভাল লাগছিল... তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি...

পশ্চিমে গঙ্গাটা দেখিয়ে কেউ ফোড়ন কাটল, সে কী দাদা! আজ তা হলে আপনাকে ভাল লাগাতে সূর্য গঙ্গার পশ্চিম দিকে উঠল?

ঘিরে থাকা লোকগুলো হো-হো করে হেসে উঠল। অতসী চাপা গলায় বলল, চলো, নীচে চলো।

ভিড়টা পাতলা হয়ে গেলেও সরোজ বক্সীর শীতের রাত ছাদে কাটানোর রহস্যের উন্মোচন আর এক কাপ করে চা পাওয়ার আশায় জনা দুই-তিন অবশ্য পিছু ছাড়ল না। সরোজ বক্সী আর অতসীর পিছু পিছু ওদের ঘর পর্যন্ত চলে এল। বহু চেষ্টাতেও তারা যখন প্রকৃত কারণ খুঁজে না পেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেল, অতসী প্রথম স্বামীর শরীরের খোঁজ নিল।

তোমার কি শরীর খারাপ?

কেন? না আমি ঠিক আছি।

তা হলে?

সরোজ বক্সী যথাসম্ভব সত্যি কথা বলার চেষ্টা করলেন, রাতে ঘুম এল না, ভোরের আলো ফুটতে মনে হল ছাদে যাই। তারপর ঠান্ডা হাওয়ায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম...

অতসী স্বামীর কপালে চেটো ঠেকিয়ে জ্বর হয়নি নিশ্চিত হয়েও অভিমানী গলায় বলল, আমার কোনও কথাই তো তুমি শুনবে না। তবু বলছি। সারা রাত ঘুমোতে পারোনি, ঘুমিয়ে নাও। আজকে আর অফিস যেতে হবে না।

সরোজ বক্সী বিছানায় উঠে এসে গা এলিয়ে শান্ত হেসে বললেন, যাব না। অনেক আগেই ঠিক করেছি আজ অফিসে যাব না। আজ তোমাকে নিয়ে বেরোব।

আমায় নিয়ে? আমায় নিয়ে কোথায় যাবে?

আগে পিজি-তে তোমাকে ডাক্তার দেখাব। তারপর ভাবছি ভিক্টোরিয়ার মাঠে দু'জনে একটু বসব।

অতসী আপত্তি করার চেষ্টা করল, না, আজ নয়। আজ তোমার শরীরটা খারাপ।

সরোজ বক্সী মাথা নাড়লেন, না, বললাম তো কিছু খারাপ নয়।

তা হলে মেয়েটা, মেয়েটাকে কোথায় রেখে যাবে?

কেন শেফালিদের বাড়িতে রেখে যাওয়া যাবে না?

শেফালি অতসীর পড়শি। অতসী দোকান-বাজার করতে গেলে মেয়েকে যে শেফালির বাড়িতে রেখে যায়, এইটুকু পারিবারিক তথ্য সরোজ বক্সীর কাছে আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় অতসী রাজি হল না।

না। অতক্ষণের জন্য শেফালির বাড়িতে রেখে যাওয়া যাবে না। মেয়েটা কান্নাকাটি করবে। তার ওপর ওর খাওয়া-দাওয়া, চান আছে।

সরোজ বক্সী একটু চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে, ওকে নিয়েই যাব।

পিজি-র যে-ডাক্তারের কথা পাড়ার নীতিন ডাক্তার লিখে দিয়েছিল, ভদ্রলোক আর দশজন ডাক্তারের চেয়ে অনেক বেশি অমায়িক। রোগীর ভিড়ের চাপে মেজাজ হারান না এবং প্রত্যেকটি রোগীকে সময় নিয়েই দেখেন। অতসীকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, দেখুন, আরও কয়েকটা পরীক্ষা না করে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। আমি ওষুধ দিচ্ছি তার সঙ্গে কিছু টেস্টও লিখে দিচ্ছি। টেস্টগুলো করে নিয়ে আর একবার আসুন।

টেস্টের নাম শুনে অতসীর মুখ শুকিয়ে গেল। ডাক্তারবাবু সেটা লক্ষ্য করে বললেন, সে কী? আপনি ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন? ঠিকমতো চিকিৎসা করতে হলে আগে রোগটা বের করতে হবে তো, তবেই তো পুরো সারানো যাবে। শুধু শুধু রোগকে পুষে রাখবেন না। টেস্টগুলো তাড়াতাড়ি করে ট্রিটমেন্টটা শুরু করে দিন।

কথা ছিল পিজি-র পরে ভিক্টোরিয়া। কিন্তু হাসপাতালেই অতসী একদম মনমরা হয়ে গেল। সরোজ বক্সী অতসীর মনটা পড়ে নিয়ে বললেন, ঠিক আছে, এত দূর যখন এসেছি, বীথিকেও সঙ্গে এনেছি, তখন আজ চলো বরং চিড়িয়াখানা যাই। চিড়িয়াখানাটা পাশেই।

শীতকালে চিড়িয়াখানায় একটা পিকনিকের পরিবেশ। আড়াই বছরের বীথি কখন যেন বাবার কাঁধে উঠে বসল। গলায় দু'পাশে ঝুলন্ত দুটো ছোট্ট পা রেখে আর পাশে অতসীকে নিয়ে বাঘ, সিংহ, হাতি দেখতে দেখতে সরোজ বক্সীর মনে হল, ঈশ্বর, এর চেয়ে সুখের দিন কখনও তুমি আমাকে দাওনি।

পরদিন অফিসে যেতেই সরোজ বক্সীকে দেখে দয়াল সান্যাল গর্জে উঠলেন, কী করছিলে কাল? কোথায় ছিলে?

সরোজ বক্সী নিচু গলায় বললেন, স্ত্রীর শরীরটা খুব খারাপ ছিল স্যার। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

দয়াল সান্যাল প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে বললেন, বউকে ডাক্তার দেখাতে হবে বলে সারাটা দিন টিকির দেখাটা দিলে না! অসহ্য।

আমি তো কখনও অফিস কামাই করি না স্যার।

তোমার সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে সরোজ। তর্ক করছ। চাকরিটা চলে গেলে কে খাওয়াবে তোমাকে? তোমার বউ?

একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সরোজ বক্সীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন দয়াল সান্যাল। সরোজ বক্সীকে চুপ করে থাকতে দেখে দয়াল সান্যাল আবার গর্জে উঠলেন, সইটা করিয়ে এনেছ?

কাল যেতে পারিনি স্যার। আজ যাব। একটু পরেই বেরোচ্ছি।

দয়াল সান্যাল চোখ কুঁচকে একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলেন, কাল কি কখনও তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে?

সরোজ বক্সী অবাক হয়ে বললেন, কুই, না তো স্যার!

শিপ্রার সঙ্গে কোথাও দেখা হয়েছিল তোমার?

না, স্যার। কেন? কিছু দরকার ছিল?

দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীর কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা দেখিয়ে বললেন, তোমার ব্যাগে যে-দলিলটা আছে—সেটা কি শিপ্রাকে দেখিয়েছ?

না স্যার, আমার তো এখন নিয়ে গিয়ে দেখানোর কথা ছিল না, আগে সইটা...

অনেক কিছুই তো কথা থাকে না, তবু সেগুলো হচ্ছে সরোজ। যেমন, তোমার কাল কামাই করার কথা ছিল না। যেমন, শিপ্রার দলিলের পয়েন্টগুলো আগে থেকে জেনে যাওয়ার কথা ছিল না...। তবু এসব হচ্ছে।

সরোজ বক্সীর মধ্যে একটা বোধশূন্যতা এল। দয়াল সান্যাল কি এবার তাকেও সন্দেহ করতে শুরু করেছেন? দয়াল সান্যালের বাদবাকি বলে যাওয়া কথাগুলো আর কিছুই মাথায় ঢুকল না। নিজের ঘরে এসে স্ট্যাম্প পেপারটা খুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে বসে থাকলেন।

২৯

দয়াল সান্যাল নিজের পরিকল্পনা মতো একটার পর একটা কাজ পরের দু'মাসের মধ্যে করে ফেললেন। দুটো দলিল যার একটাতে শিপ্রার আসল সই আর অন্যটাতে নিপুণভাবে করা নকল সই, বিট্টুর কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং স্কুলে যাওয়ার পাকা ব্যবস্থা, সেইসঙ্গে শিপ্রারও কার্শিয়াং-এ যাওয়া এবং নিজের ইংল্যান্ডে যাওয়া সব ব্যবস্থাই নির্বিঘ্নে হল।

দয়াল সান্যাল নিজে ইংল্যান্ডে যাওয়ার দিন ঠিক করলেন মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে, বিট্টু আর শিপ্রার কার্শিয়াং চলে যাওয়ার পর সপ্তাহ দুয়েক হাতে রেখে।

শিপ্রার মন থেকে যাতে নকশালদের ভয়টা একদম চলে না যায় এবং কোনও ভাবেই যাতে কার্শিয়াং-এ যাওয়ার পরিকল্পনাটা বাতিল হয়ে না যায়, তার জন্য মাঝে মাঝে কয়েকটা উড়ো হুমকিপূর্ণ চিঠি শিপ্রার কাছে পাঠানোর বন্দোবস্তও দয়াল সান্যাল করেছিলেন। বেনামি চিঠিগুলো পড়তে পড়তে সত্যিই শিপ্রার প্রাণ উড়ে যেত।

ঠিক এরকম সময়েই একদিন শিপ্রা একটা উড়ো ফোন পেল।

আমি কি শিপ্রা সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

অপরিচিত গলা। শিপ্রা অন্য প্রান্তের পরিচয় জিজ্ঞেস করল, কে বলছেন প্লিজ?

আমার নাম আপনাকে বলতে পারব না ম্যাডাম। তবে আপনার ভালর জন্যই আপনাকে ফোন করছি।

শিপ্রা খুঁটিয়ে পুরুষকণ্ঠটিকে বোঝার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছে লোকটা সামান্য বিকৃত করে নিজের গলাটা লুকোনোর চেষ্টা করছে। শিপ্রা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী দরকার আপনার?

ম্যাডাম, আপনার স্বামী আপনাকে ঠকাচ্ছেন। তলে তলে কী করছেন আপনি জানতেও পারছেন না। আপনি কি জানেন, আপনার সই জাল করে একটা দলিল করিয়েছেন?

শিপ্রা উড়ো ফোনটা ছেড়ে দিতে পারত। কিন্তু জাল সইয়ের দলিল শুনে চমকে উঠল। গলায় গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বলল, এসব কথা আপনি কেন শোনাচ্ছেন আমাকে?

কারণ, দয়াল সান্যাল আমারও অনেক ক্ষতি করেছেন। ওর সঙ্গে আমি পারব না। অসম লড়াই হবে সেটা। তবে আপনার মতো নিষ্পাপ স্ত্রীর ওপর উনি যে-অন্যায়টা করছেন, আরও যার যার ক্ষতি উনি করছেন, তাদের সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে ওকে হারানো আমার লড়াই।

লোকটার পরের কথাগুলো শিপ্রার জানতে প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে। অথচ অচেনা লোকটার কাছে কিছুতেই সেটা প্রকাশ করতে পারছে না। লোকটা অবশ্য যা বলবে ঠিক করে ফোনটা করেছে, সেটাই বলতে আরম্ভ করল।

জুলি বলে কোনও মেয়েকে আপনি চেনেন ম্যাডাম?

না, এরকম কাউকে চিনি না।

স্বাভাবিক। সেটাই স্বাভাবিক। জুলি হল একজন কলগার্ল। দয়াল সান্যাল এই মেয়েটাকে দিয়ে একটার পর একটা খারাপ কাজ করাচ্ছেন।

শুনুন, আজেবাজে কথা শোনার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।

শিপ্রা ফোনটা ছেড়ে দিতে পারে, এই আশঙ্কায় লোকটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনি ফোনটা ছেড়ে দেবেন না। আমার কথাটা পুরো শুনে নিন। আমি একবারও বলছি না জুলিকে উনি নিজের তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করেন। উনি মেয়েটাকে দিয়ে শুধু অন্যের ক্ষতি করেন। যেমন, আমার ক্ষতি করেছেন। যেমন, উনি জুলিকে ব্যারাকপুরে পাঠিয়েছিলেন ক্যাথি গোমসকে বাড়িছাড়া করার জন্য। আপনি তো কর্নেল সামন্তকে চেনেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করবেন জুলি ওঁর কাছে গিয়েছিল কি না। আপনাদের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করবেন উনি জুলিকে গাড়িতে চাপিয়ে পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যান কি না। আপনি সরোজ বক্সীকে জিজ্ঞেস করবেন উনি জুলিকে নিয়মিত টাকা দিয়ে আসেন কি না। আপনি আপনাদের ল'ইয়ার অনুপম ঘোষকে জিজ্ঞেস করবেন, একদিন অনুপমকে মাতাল করে দিয়ে উনি ট্যাক্সি করে জুলিকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছিলেন কি না। তারপর অনুপম ঘোষের সংসারে আগুন ধরে গেছে কি না...।

বেশ, ধরে নিলাম জুলি বলে একটা খারাপ মেয়ে আছে। তো, কী ক্ষতি করবে আমার জুলি?

সেটা তো আপনাকেই ভাবতে হবে ম্যাডাম, কী ক্ষতি আপনার করতে পারে জুলি। আমি শুধু আপনাকে সাবধান করলাম। আমি নিজে কিছু আঁচ পেলে আপনাকে জানাব।

শিপ্রার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল লোকটার পরিচয়। দয়াল সান্যালের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। হরির ঝিল থেকে বিট্টুর স্কুল, সব ব্যাপারেই সমঝোতা। এর

পরে নতুন কী চাল আবার চালতে চলেছে দয়াল সান্যাল? কিন্তু যে-লোক নিজেকে লুকিয়ে ফোন করে, তাকে এসব জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, উত্তর পাওয়া যাবে না। তাই লোকটার পরিচয় জানতে আর কোনও পীড়াপীড়ি করল না।

উড়ো ফোনটা কার ছিল? সারাদিন শিপ্রাকে এই প্রশ্নটা তাড়া করল। কখনও মনে হয়েছে ফোনটা নিছকই উড়ো ফোন ছিল, এটাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে, ফোনের অন্য প্রান্তের লোকটা তো একদম বাজে কথা বলেনি! লোকটা অনেক খবর রাখে। ক্যাথি আন্টির কথা বলেছে। অনুপমের কথা বলেছে। অনুপমের আবার কী ক্ষতি করেছে দয়াল সান্যাল?

দয়াল সান্যালের সঙ্গে এখন তো একটা আপস হয়েছে। এর দুটো দিক। এক নম্বর, নকশালদের দৃষ্টির বাইরে বিট্টুকে একটা সুরক্ষিত জায়গায় রাখা। কার্শিয়াং-এ ব্রাদার অ্যান্ডারসনের স্কুলে তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ঠিকই তো হয়ে গেছে বিট্টুকে নিয়ে কার্শিয়াং-এ চলে যাবে শিপ্রা। দু'নম্বর চুক্তিটা হল, হরির ঝিলের ধারে শিপ্রার যে শেষ সম্পত্তিটুকু আছে, ম্যাকার্থির বাংলো আর দু'একর জমি, সেখানে পরিযায়ী পাখিদের নিয়ে একটা গবেষণা কেন্দ্র হবে। এটা নিয়ে একটা ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি হয়েছে।

এই ব্যাপারে দয়াল সান্যাল যে কাগজপত্র তৈরি করিয়েছেন, শিপ্রা নিজের বিচার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বারবার প্রতিটি শব্দ পড়েছে। কোনও ভাবেই সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার কোনও বিপদের গন্ধ দেখতে পায়নি। পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে, ট্রাস্টির কাজ যাই হোক না কেন, সম্পত্তিটার ওপর শিপ্রার একচ্ছত্র অধিকার থাকবে। পাখির গবেষণার কাজে যে-খরচ হবে, তার জোগান দেবে দয়াল সান্যালের ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজ।

এই লাইনটায় এসে অবশ্য মনটা একবার খচখচ করে উঠেছিল শিপ্রার। স্বার্থপর দয়াল সান্যাল যেনতেনপ্রকারেণ জমি আর বাড়িটা হরিতলা কটন মিলের অংশ করে নিতে চাইছিল, রাতারাতি সেটা কী করে পাখির গবেষণার মতো স্বার্থহীন কাজে খরচ করতে রাজি হয়ে গেল?

মনের আসল ভাবটা গোপন করে দয়াল সান্যাল এর একটা পাকা যুক্তি দিয়েছিলেন শিপ্রাকে, ইনকাম ট্যাক্সের প্যাঁচ বোঝো? তোমার বোঝার কথা না। যাকগে, ধরো, তোমার ট্রাস্টের জন্য দু'আনা খরচ করে আমি ডি. এস. ইন্ডস্ট্রিজের জন্য আট আনা ট্যাক্স বেনিফিট আদায় করে নেব।

ঘেন্না করেছিল শিপ্রার। লোকটা কি এক পয়সাও নিঃস্বার্থে খরচ করতে পারে না! তবে এ ব্যাপারে বিশেষ মাথাও ঘামায়নি শিপ্রা। ট্রাস্টি থেকে দয়াল সান্যাল যাই ফায়দা ওঠাক, কাজের কাজটা হওয়া বড় কথা। পাখিদের জন্য কিছু কাজ হবে, দিনের শেষে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। শিপ্রার স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল, সম্পত্তিটা যখন ওর থাকছে, ট্রাস্টির প্রধান যখন সে নিজে, তখন কিছুটা হলেও কাজ হবেই।

কিন্তু উড়ো ফোনটা? উড়ো ফোনটা সেই আত্মবিশ্বাসটাকে টলিয়ে দিচ্ছে। ট্রাস্টির কাগজপত্রে সই করে দিয়েছে। ট্রাস্টির প্রথম মিটিং ছোট করে হলেও একটা বাড়িতেই হয়েছে, তাতে প্রথম কাজ ঠিক হয়েছে একজন পক্ষী বিশারদকে জোগাড় করা। যিনি

প্রথম খসড়া রিপোর্ট তৈরি করবেন, হরির ঝিলে পাখিরা এলে কী আকর্ষণ আর স্বাচ্ছন্দ্য পাবে...।

এই পক্ষী বিশারদকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরোজ বক্সীকে, দয়াল সান্যালের সব মুশকিল আসান করে দেওয়া লোকটাকে। কিন্তু লোকটা সত্যিই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে তো পক্ষী বিশারদকে?

মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্নগুলো পাক খাচ্ছে। সামনের মাসে বিটুকে নিয়ে চলে যাবে কার্শিয়াং-এ। বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময়টাই কাটাতে হবে ওখানে। এখানকার কাজকর্মগুলো কীভাবে হবে গুছিয়ে ছকা হয়নি। তার মধ্যে উড়ো ফোনটা আরও অনেক এলোমেলো আশঙ্কা তৈরি করে দিল।

অনেক ভেবেচিন্তে শিপ্রা ঠিক করল, এ ব্যাপারে সরাসরি দয়াল সান্যালের সঙ্গে কথা বলাই উচিত হবে। আর কোনও দেরি করল না শিপ্রা। সেদিন অফিস থেকে দয়াল সান্যাল ফিরে আসার পরই মনের ভেতরের প্রশ্নগুলো মেলে ধরল, তোমার যে কথা ছিল, হরির ঝিলের জন্য একজন ভাল অরনিথোলজিস্ট জোগাড় করে দেবে, তার কী হল?

দয়াল সান্যাল টেবিলে একটা খাতায় কিছু হিসেবপত্র করছিলেন। মুখ তুলে শিপ্রার এবং শিপ্রার প্রশ্নটায় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অরনিথোলজিস্ট... মানে?

পাখি বিশেষজ্ঞ। তোমার দায়িত্ব ছিল জোগাড় করার... পাওয়া গেছে?

সরোজকে বলেছি খোঁজ করে তোমাকে জানাতে।

একজন অরনিথোলজিস্টেরও বায়োডেটা সরোজবাবু দিয়েছেন কি?

আমি কী করে জানব? বললাম তো, তোমাকে জানানোর কথা। ওসব তো তোমাদের ট্রাস্টের কাজ। দিয়ে থাকলে তোমাকে দিয়ে থাকবে।

শিপ্রা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি জানো না, এটা বিশ্বাস করতে বোলো না। তোমাকে না দেখিয়ে সরোজবাবু একটা অক্ষরও আমাকে দেবেন না।

দয়াল সান্যাল খাতাটা বন্ধ করে বললেন, দেখো, আমার হাজার একটা ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে। তুমি ভাল করেই জানো তোমার ট্রাস্টের ব্যাপারে আমার একটাই ইন্টারেস্ট। সেটা হল ট্যাক্স বাঁচানো। এর বেশি আমার ভাবার দরকার নেই।

শিপ্রা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। এবার চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল দয়াল সান্যালের টেবিলের উলটোদিকে। গলাটাকে আরও কঠিন করে বলল, শোনো, তোমাকে একটা কথা বলে দিচ্ছি। ট্রাস্টে তোমার লোকেরা আছে। যদি তাঁরা অন্য কোনওরকম বদ মতলবে কাজ করে, আমি এই ট্রাস্টটা ডিজল্‌ভ করে দেব।

দয়াল সান্যাল শিপ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বললেন, দিয়ো।

এই নির্লিপ্ত উত্তরটা শিপ্রা আশা করেনি। রেগে উঠে বলল, হ্যাঁ দেব। তাই দেব। নিজের মতো একটা টিম তৈরি করব। তাদের নিয়ে কাজ করব।

দয়াল সান্যাল মুচকি হাসলেন, তা, নিজের টিম আগেই তৈরি করলে না কেন? আমি তো ট্রাস্টের বাকি লোকগুলোর নাম আগে দিতে চাইনি।

শিপ্রা চুপ করে গেল। ট্রাস্টটা তৈরি করতে ন্যূনতম যতজন লোকের দরকার ছিল, তার একজনও শিপ্রার হাতে ছিল না। চারপাশটা তো ফাঁকা। দয়াল সান্যাল সেটা ভালভাবেই জানেন। ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে কথাগুলো বললেন শিপ্রাকে। শিপ্রার চুপ করে যাওয়াটা ভেতরে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন দয়াল সান্যাল। খাতাটা খুলে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, সরোজ'এর মধ্যে একদিন অফিসে ডুব মেরেছিল। পরের দিন এসে বলল বউয়ের নাকি শরীর খারাপ হয়েছিল। তবে পরে খবর পেলাম বউকে নিয়ে চিড়িয়াখানা গিয়েছিল। হনুমানকে ছোলা খাওয়াতে না পক্ষী বিশারদকে খুঁজতে, তা অবশ্য জানি না।

শিপ্রা ভেবেছিল আরও কিছু প্রশ্নও করবে। তবে দয়াল সান্যালের নির্লিপ্ত ভঙ্গি আর তাচ্ছিল্য করে কথা বলার ভঙ্গিতে গোটা শরীরটা জ্বলতে থাকল। উঠে দাঁড়িয়ে সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দয়াল সান্যাল বলে উঠলেন, শোনো, সামনের মাসে আমি বিলেত যাচ্ছি। বেশ কিছুদিন থাকব না।

শিপ্রা অবাক হল। এক মুহূর্তের জন্য থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল এই খবরটাও দয়াল সান্যাল একইরকমভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন। বলার সময় খাতার থেকে মুখটা পর্যন্ত তোলেননি। তাচ্ছিল্যটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই ফেরত দিল শিপ্রা। অবাক হওয়াটা একটুও প্রকাশ না করে, হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরে ফিরে এসে শিপ্রা দেখল বিট্টু নীচে খেতে গেছে। রাতে এ-বাড়িতে তিনজনের তিনটে খাওয়ার সময়। সবার আগে খেয়ে নেয় বিট্টু। তারপর শিপ্রা। দয়াল সান্যাল অধিকাংশ দিন বাইরে খেয়ে আসেন। যদি কোনওদিন বাড়িতে খান, সেটা মধ্যরাত্রির কাছে। বিট্টু তখন ঘুমিয়ে পড়ে। শিপ্রা শুয়ে পড়ে বই পড়তে পড়তে টের পায় দয়াল সান্যাল নিজের ঘরে ঢুকছেন।

বিট্টুর খাওয়ার সময় শিপ্রা পাশে বসে থাকে। যতদিন হরিহর ছিল, বিট্টুর খাওয়ার সময় হরিহর টেবিলের উলটোদিকের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকত। এখন জায়গাটা ফাঁকা লাগে। বাড়িতে ঝি-চাকরের কমতি নেই। অন্য দিনের মতো আজও হরিহরের শূন্যস্থানটা দেখে বুকের ভেতরটা ভারী হল শিপ্রার। এ অভ্যাস যেতে আরও সময় লাগবে। কেমন আছে হরিহর? একটা ব্যবস্থা হয়তো হরিহরের হয়ে যেত যদি ক্যাথি আন্টি ব্যারাকপুরে...। চিড়িক করে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল মনের ভেতর। সকালের উড়ো ফোনটা। লোকটা ফোনে যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তা হলে ক্যাথি আন্টির ব্যারাকপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ কি দয়াল সান্যাল? একটা সন্দেহ ছিলই। কিন্তু দয়াল সান্যালের সাম্প্রতিক ব্যবহারে পরিবর্তন দেখে শিপ্রার মনে হয়েছিল—দয়াল সান্যালের তার প্রতি আক্রোশ কিছুটা হলেও কমেছে। জুলি বলে একটা কলগার্লকে দিয়ে দয়াল সান্যাল অনেক খারাপ কাজ করাচ্ছে। ক্যাথি আন্টির ব্যারাকপুর ছাড়ার পিছনেও কি জুলি আছে? একজন জানতে পারে জুলির কথা। ঘটনার কথার সত্যাসত্য জানার আর একটাই উপায় আছে। কর্নেল সামন্ত।

শিপ্রা বিট্টুকে বলল, তুমি খেয়ে নাও সোনা। আমি একটা ফোন করে আসছি।

শিপ্রা দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে এসে টেলিফোন নম্বর টুকে রাখা ডায়েরিটা নিয়ে নীচে বসার ঘরে চলে এসে ফোন করল কর্নেল সামন্তকে।

শিপ্রার গলা শুনে খুব ভাল লাগল কর্নেল সামন্তর। দুটো কথার পরই শিপ্রা জিজ্ঞেস করল, ক্যাথি আন্টির কোনও খবর পেলেন?

না, কোনও খবর নেই। আপনিও কিছু ট্রেস করতে পারলেন না?

খোঁজই শুরু করতে পারলাম না। একে কোনও ক্লু নেই, তার ওপর আমার কোনও সাপোর্ট নেই। কোথায় থেকে শুরু করব ভেবেই পেলাম না। রবার্টের কাছে গিয়েছিলাম। সাম হাউ হি হ্যাজ লস্ট অল হিজ ইন্টারেস্ট।

এরপর একটু ইতস্তত করে শিপ্রা জিজ্ঞেস করল আসল কথাটা, কর্নেল, আপনার কাছে জুলি বলে কোনও মেয়ে এসেছিল ক্যাথি আন্টিকে নিয়ে কথা বলতে?

কর্নেল সামন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি হঠাৎ জুলির কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আই সাডেনলি কেম টু নো সার্টেন ফ্যাক্টস।

কিছু যখন জেনেছেন তখন খুলেই বলি আপনাকে। যদিও মিসেস গোমস চাননি এ ব্যাপার নিয়ে কোনও কথা কাউকে বলি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে অনেক আগেই বলা উচিত ছিল।

কর্নেল সামন্ত নিজের জানা সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত খুলে বললেন শিপ্রাকে।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে সোফায় কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল শিপ্রা। তারপর ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরে উঠে এসে বেডল্যাম্পটা জ্বেলে বাকি আলোগুলো নিভিয়ে দিল।

চোখের সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। এক, আবার দয়াল সান্যালের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়া; দুই, দয়াল সান্যালকে কিচ্ছু জানতে না দেওয়া। ওপর ওপর জোড়া লাগা সম্পর্কের অভিনয়টা টিকিয়ে রাখা।

প্রথম পথটার পরিণতি শিপ্রা জানে। দু'-দু'বার হেরে গেছে দয়াল সান্যালের কাছে। সেই হার শুধু নিজের নয়, চারদিকের মানুষেরও অনেক ক্ষতি হয়েছে। তাই এবার দ্বিতীয় পথটাই শ্রেয় মনে করল শিপ্রা। যা করবে তলে তলে, ভেবেচিন্তে, গুছিয়ে। অপেক্ষা করবে সঠিক সময়ের জন্য।

খেয়েদেয়ে নিজের ঘরে এসে বিট্টু দেখল মাম্মি ঘরটাকে প্রায় অন্ধকার করে ওর পড়ার টেবিলে মাথাটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে।

বিট্টু শিপ্রার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কী হয়েছে মাম্মি? আমি তো আছি।

শিপ্রা বিট্টুকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, হ্যাঁ সোনা, তুই তো আমার সব। তুই আছিস বলেই তো বেঁচে আছি। না হলে কবে আমার মায়ের কাছে চলে যেতাম।

বিট্টু মন খারাপ করা গলায় বলল, ছিঃ মাম্মি, ওরকম বলতে নেই।

শিপ্রা বিট্টুর দুটো কাঁধ আঁকড়ে বলল, শোন সোনা, আমি যখন মরে যাব, তোর বাবা আমাকে পুড়িয়ে দেওয়ার পর, একটু ছাই তোর দিদিমার কবরের পাশে দিয়ে আসিস।

বিট্টু এবার রেগে উঠল, আবার তুমি মরে যাওয়ার কথা বলছ? এবার তা হলে আমিও মরে যাওয়ার কথা বলব।

শিপ্রা বিট্টুর ঠোঁটটা চেপে ধরে বলল, না সোনা, তুই এরকম একটা কথাও বলবি না।

তা হলে তুমিও বলবে না বলো?

বলব না।

প্রমিস?

প্রমিস। চল, শুতে চল। সকালে স্কুল আছে।

দয়াল সান্যাল টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা টেনে কালো টেলিফোনটা আর একবার দেখলেন এবং মনে মনে সরোজ বক্সীর প্রশংসা করলেন। লোকটা বাইরে যতই মিনমিন করুক, ভেতরে এলেম আছে। ঠিক যেরকমটি চাই সেরকম ব্যবস্থা করে দেয়। দয়াল সান্যাল চেয়েছিল নীচের বসার ঘরের টেলিফোনের একটা প্যারালাল লাইন ওপরে ওর নিজের ঘরে থাকবে আর টেলিফোনটা লুকানো থাকবে ড্রয়ারের মধ্যে। নীচ থেকে কেউ ফোন করলেই টিং করে বেজে উঠবে ফোনটা। নীচে যে ফোনটা করবে সে বুঝতেও পারবে না তার লাইনটা ট্যাপ করা হচ্ছে। তা, সরোজ বক্সী চাঁদনি মার্কেট থেকে একটা মিস্ত্রি ডেকে এনে করিয়ে দিয়েছে কাজটা। এই সমান্তরাল গুপ্ত ফোনটার কথা কেউ জানেই না। যেমন শিপ্রা জানে না একটু আগে কর্নেল সামন্তর সঙ্গে ওর যে কথাবার্তা হল, তার দাঁড়ি, কমা, ফুলস্টপ, শ্বাস, প্রশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস সবটুকু শুনে ফেলেছেন দয়াল সান্যাল। এ এক গভীর প্রশান্তি। অন্ধকার ঘরে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে প্রশান্তিটা পুরো উপভোগ করতে থাকলেন। মেয়েটা ভেবে মরুক, ভেবে ভেবে রক্তে চিনি বাড়ুক, ধমনিতে চর্বি বাড়ুক, ছেলেকে নিয়ে কার্শিয়াং-এ গিয়ে ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে পাহাড়ের খাদে পড়ে মরুক। ... মরুক... মরুক।

দয়াল সান্যালের এই সুখচিন্তাটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। খচ করে একটা প্রশ্ন বিঁধল মনে। জুলির কথা শিপ্রা কীভাবে জানল? জুলির নাম তো কোনও ভাবেই জানার কথা নয়। কর্নেল সামন্তকে তো ওই প্রথম বলল জুলির কথা। কর্নেল সামন্ত যা বলল, তাতে তো মনে হল ক্যাথি গোমসও কোনওদিন জুলির কথা শিপ্রাকে বলতে চায়নি, তা হলে? শিপ্রাকে কে বলল জুলির কথা?

কেউ একজন আছে, যে অনেক কিছু পৌঁছে দেয় শিপ্রার কানে। যেমন দলিলের বয়ান... যেমন জুলি... কে সে?

মাথার মধ্যে ভনভন আওয়াজে ক্ষীণ একটা নাম আবছা আবছা ফুটছে। সরোজ বক্সী নয় তো? একমাত্র সরোজ বক্সীই তো জানে জুলির কথা। মিনমিনে লোকটা কি তা হলে দু'মুখো সাপ? আর শিপ্রাকেও বিশ্বাস নেই। হাজার হোক বেশ্যার মেয়ে। কাজ হাসিল করতে শাড়ির আঁচলটা খসাতেও হাত কাঁপবে না।

বিট্টুর চুলে বিলি কাটতে কাটতে শিপ্রা বলল, চল সোনা, তুই আর আমি অনেক দূরে সুন্দর একটা জায়গায় চলে যাব।

কোথায় মাম্মি?

তোকে যে আমি গল্প বলেছিলাম, আমি যেখানে ছোটবেলায় ছিলাম। সুন্দর সুন্দর পাহাড় আছে। প্রজাপতি আছে, অনেক অনেক রকম ফুল আছে...।

সত্যি মাম্মি!

হ্যাঁ বাবা, ওখানে তুই আর আমি থাকব। তুই ওখানে স্কুলে পড়বি...

আর বাবা?

বাবা এখানেই থাকবে।

কেন?

বাবার তো অফিস আছে। আমরা মাঝে মাঝে আসব। ছুটিতে।

জ্ঞান হওয়ার থেকে এত শুনেছে কার্শিয়াং-এর গল্প, বিট্টুর একটু আগের মনখারাপটা ভাল হয়ে যেতে থাকল। মানসচক্ষে কার্শিয়াং-এর পাহাড়, প্রকৃতির একটা ছবি আঁকতে থাকল। তার মধ্যেই মাম্মির ফিসফিসে গলায় সেই ঘুমপাড়ানি গানটা কানে আসতে লাগল...

আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

৩০

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে দয়াল সান্যাল জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শীত চলে যাচ্ছে। নীচে বাগানে চন্দ্রমল্লিকাগুলো ঝরতে আরম্ভ করেছে। একটা শিরশিরানি আমেজ ছিল সকালের এই সময়টায়, হঠাৎ করেই যেন গরম পড়ে গেল। ঝরা পাপড়িগুলো দেখতে দেখতেই কানে এল উঁচু পাঁচিলের মধ্যিখানে বড় গেটটার ওপারে একটা হর্নের আওয়াজ।

দোতলা থেকেই দেখতে পেলেন গেটের ওদিকে বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। শিপ্রা বিট্টুকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এল। পৌঁছে দিয়ে শিপ্রা যে ফিরে এল, এটা দয়াল সান্যালের ভাল লাগল না। নকশালদের ভয়টা কি তা হলে শিপ্রার কেটে যাচ্ছে?

হরিতলার সেই রাতটার পর এবং বিশেষ করে এসআই বন্দনা নকশাল মেয়ে সেজে শিপ্রার আতঙ্কটা বাড়িয়ে যাওয়ার পর অনেক ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে সময় গেছে। শিপ্রা ব্যারাকপুরে চলে গিয়েছিল, দয়াল সান্যাল বিট্টুকে নিয়ে হরিতলায়। তারপর বিট্টুর স্কুলের বড়দিনের ছুটি পড়ে গিয়েছিল। স্কুল খোলার পর থেকে শিপ্রা কিন্তু বিট্টুকে স্কুলে দিয়ে আগের মতো বাড়ি চলে আসত না। স্কুলেই থাকত। একদম ছুটির পর সঙ্গে করে নিয়ে আসত। ভয়টা আরও জিইয়ে ছিল দয়াল সান্যালের পরিকল্পনায় কিছু উড়ো চিঠিতে। দয়াল সান্যাল ভেবেছিলেন যতদিন না শিপ্রা বিট্টুকে নিয়ে কার্শিয়াং চলে যায়, এই ভয়টা জিইয়ে রাখা দরকার। কিন্তু আজ ভয়টা কেটে গেছে দেখে অস্বস্তি লাগল দয়াল সান্যালের। ভয় কেটে গেলে হয়তো শিপ্রার মনটাই ঘুরে যাবে। আর যেতে চাইবে না কার্শিয়াং-এ।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এসে পিছনের দরজাটা খুলল। গাড়ি থেকে নেমে শিপ্রা দু'পা এগিয়ে ফিরে এল বনোয়ারীলালের কাছে। বনোয়ারীলালকে জিজ্ঞেস করল, তুমি হরিহরের ঠিকানাটা জানো?

না মেমসাহেব।

কোন জেলা, গ্রাম কিছুই জানো না?

না মেমসাহেব।

শিপ্রা বিরক্ত হয়ে বলল, আশ্চর্য, একসঙ্গে পাশাপাশি ঘরে তোমরা থাকতে, দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার তোমাদের দেখা হত, হরিহরং কখনও বলেনি তোমাকে ওর ঠিকানা?

না মেমসাহেব।

শিপ্রা এবার মেজাজ হারাল।

'না মেমসাহেব' ছাড়া তুমি কি আর কোনও কথা বলতে শেখোনি বনোয়ারী? কে জানে হরিহরের ঠিকানা? বাড়িতে তো এতগুলো কাজের লোক।

বনোয়ারী মাথা চুলকে বলল, আসলে হরিহরদা তো কারও সঙ্গে মিশত না তেমন। আমার মনে হয় কেউই জানে না। তবে প্রহ্লাদ ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।

শিপ্রা মাথা নাড়ল, প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও জানে না। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলল। আমারই ভুল হয়েছে, কেন যে ঠিকানাটা নিয়ে রাখলাম না। কার্শিয়াং-এ হরিহরকে নিয়ে যেতে পারলে...

শিপ্রার শেষের কথাগুলো অনুচ্চস্বরে স্বগতোক্তি। সম্ভ্রমের দূরত্বে দাঁড়িয়ে তার কিছুই বুঝতে পারল না বনোয়ারীলাল। তবে এটুকু বুঝতে পারল, মেমসাহেবের আবাব দরকার হয়েছে হরিহরকে। কায়দা করে খবরটা সাহেবের কানে তুলে দিতে হবে। আর একটা কথাও সে শিপ্রার কাছে চেপে গেছে। হরিহরের বাড়ির ঠিকানাটা তো ও জানে। যাওয়ার আগে এক টুকরো কাগজে হরিহর লিখে দিয়ে গিয়েছিল ঠিকানাটা।

দয়াল সান্যাল জানলার একপাশে. সরে এসেছিলেন। কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। শিপ্রা গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারটার সঙ্গে এতক্ষণ কী গল্প করছে? কী যেন নাম ড্রাইভারটার? কিছুতেই মনে করতে পারছেন না। খালি মনে হচ্ছে ড্রাইভারটার নাম হরিহর। কিন্তু হরিহর তো ছিল সেই বুড়ো চাকরটার নাম, যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তা হলে এই লোকটার নাম কী? এই লোকটা রোজ তাকে অফিসে নিয়ে যায়, পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যায়, বাড়ি ফিরিয়ে আনে... তখন কী নামে ডাকেন? শিপ্রা ওর সঙ্গে এত গল্প করছে কেন?

কারও নাম হঠাৎ হঠাৎ না মনে পড়াটা যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। এরকম হলেই ভেতরে একটা অসহ্য ছটফটানি হয়। মাথাটা কীরকম যেন ঝিমঝিম করে। মনে হয় মাথার ভেতরে অন্য একটা কেউ নাগাড়ে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, লোকটার নাম কী... লোকটার... এটা কি কোনও মাথার রোগ? ভাবনাটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে দূরে ঠেলে দিতে চাইলেন। তবে এই তিতিবিরক্তিকর অবস্থাতেও দয়াল সান্যালের মনের মধ্যে আর একটা কুয়াশা কাটতে থাকল।

কাল রাতে ভেবেছিলেন সরোজ বক্সীই শিপ্রার কাছে পৌঁছে দেয় সব খবর। এখন মনে হচ্ছে ভুল ভেবেছিলেন। সরোজ বক্সী নয়। আসল লোক হল এই ড্রাইভারটা, যার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। সরোজ বক্সী ছাড়া এই হচ্ছে সে-ই তৃতীয়জন, যে সব কিছু জানে। শিপ্রাকে আনতে ব্যারাকপুরে ক্যাথি গোমসের বাড়িতে গিয়েছিল। জুলিকে দেখেছে। ট্যাক্সি ডেকে এনে অনুপম ঘোষ আর জুলিকে মাঝরাতে বাড়ি পাঠিয়েছিল। সব জানে। লোকটা সব জানে... কী যেন নাম লোকটার?

দয়াল সান্যাল জানলার পাশ থেকে সরে এসে টেবিলের ওপর কিল মারতে থাকলেন। এই লোকটা এতদিন এত বড় ধোঁকা দিয়ে গেছে, আর তিনি সরল মনে বিশ্বাস করে গেছেন! শিপ্রা যেদিন চাঁদনিচকে ব্যাঙ্কে গিয়েছিল, লোকটা বলেছিল ফলো করতে পারেনি। শিপ্রা যেদিন ব্যারাকপুরে গিয়েছিল সেদিন লোকটা বলেছিল দমদম চিড়িয়ামোড়। ম্যাকার্থির বাংলো আর দু'একর জমির দলিলটার ড্রাফট তো গাড়িতেই পড়ে থাকত। তার মানে লোকটা সেটাও নিশ্চয়ই... কী যেন নাম লোকটার?

ভেতর থেকে একটা রাগ গলগল করে মাথায় উঠতে থাকল দয়াল সান্যালের। শিপ্রার সঙ্গে ড্রাইভারটার রগরগে সম্পর্ক কল্পনা করতে করতে আবার জানলার কাছে সরে এসে দেখলেন নীচে শিপ্রা বা ড্রাইভারটা কেউই নেই। এমনকী গাড়িটাও দেখা যাচ্ছে না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে দয়াল সান্যালকে নিয়ে অফিসে যাওয়ার সময় বনোয়ারীলাল ভাবছিল, দিনের সেরা খবরটা সাহেবকে দেবে। মেমসাহেব হরিহরের খোঁজ করছিলেন এটা সাহেবকে বলতে হবে। কিন্তু সাহেবকে গাড়িতে এমন গম্ভীর থমথমে দেখল যে, একটা শব্দও মুখ থেকে বার করার সুযোগ পেল না।

দয়াল সান্যাল অফিসে এসেই খোঁজ করলেন সরোজ বক্সী অফিসে এসেছেন কিনা। সরোজ বক্সী তখনও এসে পৌঁছোননি। দয়াল সান্যাল বিরক্ত হয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্ট শঙ্কর মাইতিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আমার ড্রাইভারটাকে সব মিটিয়ে দিয়ে তাড়াও।

শঙ্কর একটু থতমত খেয়ে গেল। এসব কাজ সরোজ বক্সীই করেন। বনোয়ারীলালকে কর্তার খুব অনুগত আর বিশ্বস্ত বলেই জেনে এসেছে। বনোয়ারীলাল নেহাত নতুন লোকও নয়। বেশ কয়েক বছর ড্রাইভারের কাজ করছে। তা ছাড়া বনোয়ারীলাল কোম্পানির পে-রোলে রয়েছে। কোম্পানি থেকে কোনও লোককে ছাঁটাই করতে গেলে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। টার্মিনেশন নোটিশ দিতে হয়। হরিতলায় যাতায়াত আছে বনোয়ারীলালের। ইউনিয়নের কাছে যেতে পারে। তখন আর এক ঝামেলা, আর সবচেয়ে বড় কথা, বনোয়ারীলালের দোষটা কী শঙ্করের জানা নেই। সরোজ বক্সীর ওপর শঙ্করেরও খুব রাগ হল। যে-লোকটা রোজ বড়সাহেব আসার আগেই অফিস চলে আসে, না হলে বড়সাহেবের বাড়ি হয়ে একই সঙ্গে গাড়িতে আসে, সেই লোকটা দিন বুঝে আজ এল না!

শঙ্করকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দয়াল সান্যাল আবার গর্জে উঠলেন, কী হল? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কী? যাও, গিয়ে সব মিটিয়ে দাও।

শঙ্কর মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এর আগে কোনওদিন কারও চাকরি যাওয়ার শরিক হয়নি। নিচু গলায় বলল, স্যার বনোয়ারীলালকে চিঠি দিয়ে টার্মিনেট করব তো?

একটু চমকে উঠলেন দয়াল সান্যাল। বনোয়ারীলাল! এতক্ষণে মনে পড়েছে নামটা। বনোয়ারীলাল... বনোয়ারীলাল... বনোয়ারীলাল... আপনমনে বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন নামটা। ওর অপরাধের জন্য শুধু চাকরি খেলেই হবে না, বনোয়ারীলালকে তার সঙ্গে একটা জীবনের শিক্ষা দিতে হবে।

দয়াল সান্যালের অভিব্যক্তিতে শঙ্কর আরও ঘাবড়ে গেল। লোকটা চিরকালই খামখেয়ালি ধরনের, কিন্তু ইদানীংকালে খামখেয়ালের মাত্রাটা যেন লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজ অচিরেই লাটে উঠে যাবে। নিজেরও চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কায় বুকটা অল্প কেঁপে উঠল শঙ্করের। মাথা নিচু করে বেরিয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করল।

দয়াল সান্যালের চেম্বারের দরজা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেনি শঙ্কর, এমন সময় দয়াল সান্যাল আবার ডেকে উঠলেন, শোনো।

শঙ্কর ঘুরে দাঁড়াল।

বনোয়ারীলালকে জবাব দেওয়ার এখনই দরকার নেই।

ঝামেলাটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল শঙ্কর।

ঘণ্টাখানেক পরে সরোজ বক্সী অফিসে এলেন। সরোজ বক্সীকে দেখে দয়াল সান্যাল মৃদু ধমকে উঠলেন, আঃ! সরোজ, তুমি কি অফিসে এখন মর্জিমতো সময়ে আসবে ঠিক করেছ?

সরোজ বক্সী বিরক্তিটা গোপন করলেন। দয়াল সান্যালের কথামতোই ভোরবেলায় উঠে হরিতলা গিয়েছিলেন। সেখানকার রাজনৈতিক নেতা বিমল ঘোষের সঙ্গে কথা বলে একটুও সময় নষ্ট না করে অফিসে চলে এসেছেন। দিনে দিনে দয়াল সান্যাল যেন আরও একবগ্গা হয়ে উঠছেন। এই মুহূর্তে যা বলেন পরের মুহূর্তে তাই ভুলে যান।

স্যার, আপনি হরিতলায় বিমল ঘোষের সঙ্গে কথা বলে আসতে বলেছিলেন।

ও হ্যাঁ, কী বলল বিমল ঘোষ?

পাঁচ হাজারে রফা হয়েছে, আর কয়েকটা ছেলের চাকরি চেয়েছে।

আঃ! টাকার কথা কে জিজ্ঞেস করছে! আসল কথা কী বলল?

জিজ্ঞেস করছিল হরির ঝিলের দিকটা বোজানোর কী দরকার?

কী দরকার? ওটা কি আর ওর মোটা মাথায় ঢুকবে?

আমি বুঝিয়ে বলেছি স্যার। আপনি যেরকম চেয়েছেন। আমাদের কারখানার পাঁচিল আর হরির ঝিলের মধ্যে যে-জায়গাটা আছে, সেখানটায় উদ্বাস্তুদের কিছু ঝুপড়ি করে দিতে। বিমল ঘোষ পরে ওদের মালিকানার কাগজ করে দেবে। তারপর ওরা সেই জমি আমাদের বিক্রি করে দেবে।

দয়াল সান্যাল নিজের হাতের তালুতে ঘুসি মেরে চকচকে চোখে বলে উঠলেন, একেবারে ঠিক বুদ্ধি বার করেছি। ওদিকে দু'একরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এবার হরির

ঝিলটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওখান থেকে বুজিয়ে খানিকটা নিতে পারলেই দেখিয়ে দেব তুলোর ব্যাবসা কাকে বলে। শোনো, সামনের মাসে আমি বিলেত চলে যাচ্ছি, আর শিপ্রা বিট্টুকে নিয়ে কার্শিয়াং। ফেব্রুয়ারি থেকে মে, চার মাস তুমি একদম ফাঁকা ময়দান পাচ্ছ সরোজ। ঠিক ঠিক সব সেরে ফেলবে। শিপ্রার দু'একরে ভিতের কাজ শুরু করে দাও।

সরোজ বক্সী একটা ঢোঁক গিলে বললেন, স্যার, আপনি থাকবেন না, ম্যাডাম যদি কোনও কারণে হরিতলায় এসে দেখেন ওখানে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে কাজ হচ্ছে, যদি অবজেকশন দেন বা কোর্টে গিয়ে ইনজাংশন নিয়ে আসেন...।

শিপ্রা কার্শিয়াং ছেড়ে আসবে না। তবুও তুমি যা বলছ... সাবধানের মার নেই... যদি আসে... যদি আসে... দয়াল সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে থাকলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সরোজ বক্সীকে বললেন, ইমিডিয়েটলি বাড়িতে তোমাদের ট্রাস্টের মিটিংটা করে ফেলো। পক্ষীবিশারদ ক'জনকে খুঁজে পেয়েছ তুমি?

দু'জন স্যার।

হুম! দু'জন! শিপ্রা জানে না তো তাদের কথা?

সরোজ বক্সী দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে 'না' বললেন।

গুড, লোক দুটোকে বলেছ নাকি কোথায় কাজ করতে হবে?

আপনি যেরকম বলেছিলেন স্যার, জয়নগরে...

ভেরি গুড। ওরা কীভাবে কাজ করতে চায় দু'পাতা লেখা চেয়েছিলাম... দিয়েছে?

সরোজ বক্সী ঘাড় নাড়লেন, দিয়েছে স্যার।

এখনই নিয়ে এসো কাগজগুলো আমার কাছে।

সরোজ বক্সী কাগজ দুটো এনে দেওয়ার পর দয়াল সান্যাল গভীর মনোযোগ দিয়ে কাগজ দুটো পড়লেন। তারপর সরোজ বক্সীকে বললেন, কয়েকদিন আগে একজন এগ্রিকালচারিস্টের খোঁজ করেছিলাম। তোমার কাছে নামগুলো আছে না?

হ্যাঁ স্যার, আছে। আপনি ভেতর ভেতর খোঁজও করে রাখতে বলেছিলেন। নির্মল চ্যাটার্জিও একজনের কথা বলেছিলেন। কমলেশ ভাণ্ডারী। তা ছাড়া স্যার যাদবপুর ইউনিভার্সিটির...

নির্মল চ্যাটার্জির লোকটাকেই ফোন করো। এখনই। আমি কথা বলব।

দয়াল সান্যালের টেবিল থেকেই সরোজ বক্সী কৃষিবিদ কমলেশ ভাণ্ডারীকে ফোন করে দয়াল সান্যালকে লাইনটা দিলেন।

কমলেশবাবু, দয়াল সান্যাল বলছি, নমস্কার।

কমলেশ ভাণ্ডারীর মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেল ফোনটা পেয়ে। দয়াল সান্যালের কথা মাসখানেক আগে নির্মল চ্যাটার্জি বলেছিল। লোকটা নাকি বিলিতি ঘাসের চাষ করতে চায়। এমনিতেই হাতে কাজকর্ম বিশেষ নেই, এরকম কয়েকটা শাঁসালো খেয়ালি খদ্দের পেয়ে গেলে কিছুদিনের সংস্থান হয়ে যায়। কাজটা পেলে অবশ্য নির্মল চ্যাটার্জিকে কিছু কমিশন দিতে হবে।

নমস্কার মিস্টার সান্যাল। মিস্টার চ্যাটার্জি আমাকে বলেছিলেন আপনার কথা।

আপনি আজ একবার আমার অফিসে আসতে পারবেন?

আজ? কখন? চেষ্টা করে দেখছি...

চেষ্টা করে দেখছি না কমলেশবাবু, এলে আপনাকে আজই আসতে হবে।

ঝোলা ব্যাগে কৃষিবিদ্যার দুটো বই, কয়েকটা পত্রিকা এবং নিজের গবেষণার একটা ফাইল নিয়ে দুপুর নাগাদ এসে হাজির হল কমলেশ ভাণ্ডারী। মনে মনে ঘাস নিয়ে অনেক কথার প্রস্তুতি। দয়াল সান্যাল কিন্তু ঘাস নিয়ে কোনও কথাতেই গেলেন না। গম্ভীর মুখে কমলেশকে বললেন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় কী হয়েছিল জানেন?

পাকিস্তানের যুদ্ধ শুনে আকাশ থেকে পড়ল কমলেশ ভাণ্ডারী, নির্বোধের মতো মুখ নিয়ে সে তাকিয়ে থাকল দয়াল সান্যালের দিকে।

আমার ব্যাবসা ডুবতে বসেছিল। কেন জানেন? আমার মিলে তুলো থেকে সুতো তৈরি হয়। এই তুলোর সাপ্লাই আসে মহারাষ্ট্র আর গুজরাত থেকে। যুদ্ধের ডামাডোলে তুলো আসাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এই ভূমিকাটা কীসের কিছুই বুঝতে পারছিল না কমলেশ এতক্ষণ। তা হলে কি তুলো, সুতোর ব্যাবসা ছেড়ে ঘাসের ব্যাবসার কথা ভাবছেন দয়াল সান্যাল! অবশ্য আইডিয়াটা খারাপ নয়। কানাঘুষোয় শোনা গেছে, গুজরাতের কিছু ব্যবসায়ী এখন জাহাজ ভরতি ঘাসমাটি আরবের ছোট ছোট মরু শহরগুলোতে রফতানি করছে। দয়াল সান্যাল যদি সেরকম কিছু ভেবে থাকেন তা হলে নিজের বুদ্ধিটা লাগিয়ে প্রাপ্তির ভাগটা চিন্তা করে শুকনো ঠোঁট দুটো জিভ দিয়ে একবার ভিজিয়ে নিল কমলেশ। দয়াল সান্যালের অবশ্য কমলেশের প্রতিক্রিয়ায় কোনও মনোযোগ নেই। নিজের মনেই বলতে থাকলেন, এ ছাড়া আমাদের দেশে মাসুল সমীকরণ নীতিটা এখনও হল না। গুজরাত, মহারাষ্ট্র থেকে তুলো এখানে আনতে যা খরচ পড়ে, তার কিছুই পড়ে না ওদের। তাই সুতোর দাম পশ্চিমবঙ্গে দিনে দিনে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের হাতের কাছে একটা অসাধারণ সুযোগ আছে। সেটা হল বাংলাদেশ।

কীরকম সুযোগ স্যার? আনমনে বলে উঠল কমলেশ।

অসাধারণ সুযোগ! এক্সপোর্ট মার্কেটটা ধরতে হলে আমাদের এখন বাংলাদেশকেই ধরতে হবে। আপনি জানেন ইউরোপে গারমেন্ট এক্সপোর্ট করতে এ বছর থেকে কোটা সিস্টেম চালু হচ্ছে। অর্থাৎ কোন দেশ থেকে কত বস্ত্র বিদেশে রফতানি হবে, তার দেশভিত্তিক কোটা তৈরি হচ্ছে। ভারতের ভাগ্যে সেই কোটার যেটুকু জুটবে তাতে গুজরাত-মহারাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পাল্লা দিতে হবে। প্রাইসিং-এ সেখানে হেরে যাব আমরা। একমাত্র বাংলাদেশকে ইউরোপ এই কোটার বাইরে রেখেছে। তাই বাংলাদেশের মাধ্যমে যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি, তা হলে আকাশচুম্বী সুযোগ আছে আমাদের। তার জন্য আমাদের শুধু একটাই কাজ করতে হবে। সেটা হল, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তুলো চাষ।

অসম্ভব! কমলেশ অস্ফুট স্বরে বলে উঠল।

দয়াল সান্যাল কমলেশের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কেন? অসম্ভব কেন?

স্যার, বাংলার সয়েল কন্ডিশন, ডেমোগ্রাফি, ক্লাইমেট কন্ডিশন কোনওটাই তুলো চাষের উপযোগী নয়।

দয়াল সান্যাল একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, কয়েক মাস আগে আমার মিলের ম্যানেজার কথায় কথায় একবার বলেছিল, স্যার, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যদি তুলো ফলত... তখন আমারও মনে হয়েছিল অসম্ভব। পাগলের প্রলাপ বকছে ও। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করে দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যদি মিনিকিট ধান হতে পারে, তুলো নয় কেন? আমরা কি কখনও চেষ্টা করে দেখেছি?

না, দেখিনি হয়তো... কিন্তু আমরা জানি... কমলেশ আমতা আমতা করতে থাকল।

কমলেশকে থামিয়ে দয়াল সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, আপনি চেষ্টা করে দেখতে চান?

কমলেশ অসহায় হয়ে বলে উঠল, তা হলে তো রিসার্চ করতে হবে। অনেক খরচ আর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার স্যার।

খরচ আর সময় দুটোই যদি আমি দিই, তা হলে চেষ্টা করে দেখতে চান?

কমলেশ মনে মনে বলল, পাগল, পাগল ছাড়া আর কী-ই বা বলা চলে এই খেয়ালি লোকটাকে? যেটা হওয়ার নয়, তার পিছনে দৌড়ে লাভ নেই। তবে আজকাল চাষাবাদে যেভাবে শঙ্করজাতীয় শস্যের ব্যবহার হচ্ছে, তাতে আপাতত এই নিষ্ফল প্রচেষ্টা নিয়ে গবেষণা কিছু করা যেতেই পারে। গবেষণাটা অন্তত দু'বছর টেনে দিতে পারলে আগামী দুটো বছর নিশ্চিন্ত। তাই ভেতর থেকে পরের প্রশ্নটা উঠে এল কমলেশের।

টাকা, সময়ের সঙ্গে আর একটা জিনিস দরকার স্যার, জমি।

দয়াল সান্যালের মুখে একচিলতে হাসি ফুটে গেল। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, জমি! জমিও আপনাকে আমি দেব গবেষণার জন্য। তবে আপনাকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আপনার এই গবেষণাটার যুগান্তকারী গুরুত্ব আছে। ফল পাওয়ার জন্য বহু লোক হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই আপনাকে এই গবেষণাটা করতে হবে একদম গোপনে। কাকপক্ষীতেও যেন টের না পায় আপনি কী নিয়ে গবেষণা করছেন।

কমলেশের ভেতরটা এমনিতেই গোলাতে আরম্ভ করেছিল। একটা অসম্ভব গবেষণার কথা দয়াল সান্যাল বলছেন। তবে সুযোগটা কিছুতেই হারাতে চায় না কমলেশ। মনের ভেতরে সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে কোনওরকমে বলল, হয়ে যাবে স্যার।

দয়াল সান্যালের চোখটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

গুড! ভেরি গুড! শুনুন, মন দিয়ে শুনুন। আপনি এই গবেষণাটা করবেন হরিতলায় গিয়ে। ওখানে আপনার থাকার সব ব্যবস্থা করে দেব। দু'একর জমি পড়ে আছে ওখানে। গবেষণা চালানোর জন্য যথেষ্ট। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার গবেষণার ব্যাপারে সবাইকে বলতে হবে আপনি পরিযায়ী পাখি নিয়ে গবেষণা করছেন।

পরিযায়ী পাখি! ঢোক গিলল কমলেশ, পরিযায়ী পাখির ব্যাপারে আমি তো কিছুই জানি না। আমি বরং অন্য গবেষণার কথা বলতে পারি, যেমন ধরুন স্ট্রবেরি চাষ বা টিউলিপ চাষ।

না। দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন দয়াল সান্যাল। টেবিল ঘেঁটে বার করে আনলেন একটা রিপোর্ট। রিপোর্টটায় লেখা আছে পরিযায়ী পাখি নিয়ে নানা কথা। রিপোর্টটা কমলেশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই দু'পাতা কাগজ পড়ে নিন। আপাতত এইটুকু জানলেই চলবে। শুধু মনে রাখবেন গোপনীয়তাটা। আপনার আসল কাজটা আপনি, আমি, সরোজ আর আমার মিলের ম্যানেজারের মতো দু'-একজন ছাড়া কেউ জানবে না। নির্মল চ্যাটার্জিও নয়। এমনকী আমার স্ত্রীও নয়।

৩১

আজকাল অনুপম ঘোষ বাড়িতে থাকে না। বাড়ি ছেড়ে শিয়ালদায় একটা মেসে আশ্রয় নিয়েছে। একজন ছোকরা ছেলে ঠিক করা আছে, ওই বাড়ির থেকে চিঠিপত্তরগুলো মাঝে মাঝে দিয়ে যায়। আজ চিঠিগুলোর সঙ্গে একটা লম্বা খয়েরি খাম এসেছে। খামটার ওপর টাইপ করে লেখা ওর নাম-ঠিকানা। বাঁদিকের কোনায় প্রেরকের নামটাও টাইপ করা আছে, শশধর দাশগুপ্ত।

শশধর দাশগুপ্তর হাত ধরেই অনুপমের ওকালতি পেশার শুরু। শশধর দাশগুপ্ত হাইকোর্টের ডাকসাইটে উকিল। জুনিয়র হিসাবে শশধর দাশগুপ্তর বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল অনুপমের। সেখান থেকেই ওঁর মেয়ে শ্রাবণীর সঙ্গে এক সময়ে মন দেওয়া-নেওয়া শুরু হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত বিয়ে অবধি পরিণতি পেয়ে গিয়েছিল সম্পর্কটা। নিজের হাঁটুর সমান জুনিয়রকে এককথায় জামাই করে নিতে শশধর দাশগুপ্তর মতো দাম্ভিক মানুষের প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু ওদের প্রেমের জেদের কাছে হার মানতে হয়েছিল। সেই থেকে শ্বশুর-জামাইয়ের এক অদ্ভুত সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল।

মেয়ের একটা স্থায়ী বন্দোবস্তর জন্য অনুপমকে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের দয়াল সান্যালের মতো বড় মাপের মক্কেলকে জুটিয়ে দিয়েছিলেন শশধর দাশগুপ্ত। তা ছাড়া মাঝে মাঝে ছুটকো-ছাটকা মামলাও কিছুটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কটা হয়তো সহজও হয়ে যেত যদি না জুলি বলে মেয়েটা এক রাতে সেই কাণ্ডটা ঘটিয়ে না ফেলত।

কয়েক ঘণ্টায় জীবনটা তছনছ হয়ে গেছে অনুপমের। ঘটনাটা যেন সুস্থ সবল অবস্থায় রাস্তা পার হতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে যাওয়ার মতো। কী হয়েছিল সেই রাতে সেদিন আর মনে ছিল না অনুপমের। তবে ঘটনাগুলো এখন পোড়খাওয়া উকিলের মতো পয়েন্ট-বাই-পয়েন্ট সাজিয়ে নিতে পারে, এরকম: এক,

রাত বারোটার কাছাকাছি অনুপম ঘোষের পাড়ায় একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছিল। অনুপম মত্ত অবস্থায় ছিল। ওর তখন নিজের পায়ে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই। খালি একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছিল। গাড়ি থেকে নামতেই পারছিল না অনুপম। জুলিও মত্ত ছিল, কিন্তু অনুপমের মতো বেহেড হয়ে যায়নি। দয়াল সান্যালের লিখে দেওয়া ঠিকানার বাড়িটায় পৌঁছে অনুপমের হাতটা কাঁধে জড়িয়ে কোনওরকমে টানতে টানতে পাগলের মতো বেল টিপেই গিয়েছিল... টিপেই গিয়েছিল।

দুই, শ্রাবণী দরজাটা খুলে অনুপমকে এরকম অবস্থায় জুলির সঙ্গে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তবে সেটা কয়েক মুহূর্তই। জুলির সাজপোশাক, মুখের ভাষা, শরীরের ভাষা দেখে শ্রাবণীর এক মুহূর্তও সময় লাগেনি মেয়েটা কে বুঝতে।

তিন, ট্যাক্সিটা চলে গিয়েছিল। শ্রাবণী জুলিকে নিয়ে বিপদে পড়েছিল। অন্য সময় হলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু অত রাতে জুলিকে বাড়ির বাইরে রাখলে লোক জানাজানির ভয় ছিল। মেয়েটা যদি হল্লা করত। আবার বাড়ির ভেতরেও ঢোকাতে চায়নি।

চার, অনুপমের বিধবা মা চিরকালই ভিতু প্রকৃতির মহিলা। কখনওই ছেলে-বউয়ের কোনও ব্যাপারে থাকেন না। কিন্তু অত রাতে জোরে জোরে গলার আওয়াজ পেয়ে সদর দরজার কাছাকাছি এসে বুঝেছিলেন ছেলে এক বিষম কাণ্ড করে এসেছে। যে-প্রতিক্রিয়া জীবনে কোনওদিন দেখাননি, ছেলের কাছে আছড়ে পড়ে ডুকরে উঠেছিলেন, তুই এটা কী করলি বাবা...?

পাঁচ, শ্রাবণী জুলিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কীভাবে বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেছিল তা জানা না থাকলেও, শ্রাবণীর চিৎকার করে ফেটে পড়াটা অনুপমের বেশ মনে আছে। শ্রাবণী শোওয়ার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ছয়, পরের দিন অনুপমের ঘুম ভেঙে ওঠার অনেক আগেই শ্রাবণী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। সেই যে গিয়েছিল, একদিন, দু'দিন, পাঁচদিন, এক সপ্তাহ... সেই রাগ-অভিমান আর কাটেনি। নিজের ভিতরের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে মাথা নিচু করে শশধর দাশগুপ্তর বাড়িতে অনুপম গিয়েছিল সব বুঝিয়ে বলার চেষ্টায়। শ্রাবণীকে বোঝাতে তো তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছোতে পারেইনি, উলটে শশধর দাশগুপ্তর মোকাবিলা করতে হয়েছিল। শশধর দাশগুপ্ত যেন এই দিনটার অপেক্ষাতেই ছিলেন। যাচ্ছেতাই অপমান করেছেন অনুপমকে এবং এও বলে দিয়েছেন এরকম চরিত্রহীনের বাড়িতে নিজের মেয়েকে আর কোনওদিন পাঠাবেন না।

সাত, অনুপম অনেক ভেবে দেখেছে মুখোমুখি বসে সব ঘটনা খুলে বলে, বুঝিয়ে বলার মতো পরিস্থিতি এখন আর নেই। যদি ওদের একটা সন্তান থাকত, শ্রাবণীর একটা পিছুটান থাকত। সব কিছু খুলে বলার জন্য অনুপম একটা দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছিল শ্রাবণীকে। দিন দশেক পরে তার উত্তর এল। আজকের খয়েরি খামটা। তবে উত্তরটা শ্রাবণীর কাছ থেকে নয়, শশধর দাশগুপ্তর জবাব।

খয়েরি খামটা অলসভাবে খুলল অনুপম। ভেতরের চিঠিটা শশধর দাশগুপ্তর

লেটারহেডে। একজন আইনজ্ঞ হয়ে যতটা খুঁটিয়ে চিঠি পড়া উচিত অনুপম সেরকমভাবে চিঠিটা পড়ল না। ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে এবং কিছু শব্দ পড়ে বুঝে ফেলল শশধর দাশগুপ্ত তাঁর মেয়ের জীবনটা আইনের ধারা-উপধারায় বাঁধতে চলেছেন। ব্যভিচারে অভিযুক্ত করেছেন জামাইকে।

হঠাৎ করে অনুপমের নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগল। বিয়েটা প্রেমের হলেও সন্তানহীন দাম্পত্যে ছোটখাটো চিড়গুলো ধরতে আরম্ভ করেছিল। তবু সম্পর্কটা যাতে ঠিকঠাক জোড়া লেগে থাকে তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। সেই সম্পর্কটাই ভেঙে চৌচির হতে চলেছে কয়েকটা মিথ্যা অভিযোগে।

এই ক'দিনে অনুপমের বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে দয়াল সান্যালের কথায় রাজি হয়ে গেলেই হত। দয়াল সান্যালের সঙ্গে শিপ্রা সান্যালের যাই চাপান-উতোর থাকুক সম্পত্তি নিয়ে, নিজে সৎ থাকতে গিয়ে তার বিরাট মূল্য দিতে হচ্ছে। সংসারটা তো ভাঙতে চলেছে, পেশাটাও ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের আনুকূল্যে যেখানে তরতর করে উঠছিল, সেটাও তলানিতে এসে ঠেকেছে। সেই ঘটনার পর-পরই দয়াল সান্যালও চিঠি দিয়ে অনুপমের পরিষেবাকে চিরকালের মতো অব্যাহতি দিয়েছেন।

এসব ঘটনা চাপা থাকে না। অনুপম জানে সেই রাতটার ঘটনার কথা নিজের পেশার জায়গায় অন্যদের মুখে মুখে ঘুরেছে। অনুপম এখন চায় শুধু একটাই জিনিস। দয়াল সান্যালের উপর প্রতিশোধ।

সন্ধেবেলায় পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে দু'দিন অনর্থক ঘুরে তৃতীয় দিন জুলিকে খুঁজে পেল অনুপম। সেদিন প্রথমে নেশার ঝোঁকে, তারপর বেহেড হয়ে জুলিকে দেখেছিল। মুখটা ঝাপসা, চেহারা অস্পষ্ট, তবু তীক্ষ্ণচোখে জরিপ করে অনুপমের মনে হল এ সেই মেয়েটা না হয়ে যায় না। একটা বন্ধ দোকানের থামের আলো-আঁধারির মধ্যে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে।

পথচলতি মানুষেরা মেয়েটার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে চলে যাচ্ছিল। অনুপম পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটার সামনে। অনুপমকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটা একটা চোখ টিপল। গলায় যতটা পারে মাদকতা ঝরিয়ে বলল, যাবে নাকি?

মেয়েটার সামনে দাঁড়িয়ে অনুপম নিশ্চিত হল এই মেয়েটাই জুলি। পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে আগুন ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, চিনতে পারছ?

দেশলাইয়ের কাঠির একঝলকের আলোয় মুখটা মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট করে দেখতে পেল জুলি। এরকম পুরনো খদ্দের তো অনেকই থাকে। অধিকাংশই জন-অরণ্যে চিনতে পারলে না চিনতে পারার ভান করে। ব্যতিক্রম দু'-একজন। এই সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা যেমন। চিনতে না পারলেও জুলি চিনতে পারার অভিনয় করতে খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, চিনতে পারব না কেন? তোমার কথা রোজ ভাবি।

আমিও। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে অনুপম বলল।

চলো। যাবে তো?

কোথায়?

ওমা! ভুলে গেলে? তোমায় যেখানে নিয়ে যাই।

যাব। তার আগে চলো কিছু খেয়ে নিই।

জুলির চোখ জুলজুল করে উঠল, তাই? কোনটায় যাবে?

চলো আমার সঙ্গে।

অনুপম পা বাড়াল। পিছনে পিছনে জুলিও। এক-একটা করে রেস্তোরাঁ পেরিয়ে যাচ্ছে, সেদিকে অনুপম ভ্রূক্ষেপই করছে না। অনুপমের পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে জুলি আপ্রাণ মনে করার চেষ্টা করতে থাকল আগে কবে লোকটাকে দেখেছিল।

একটা জায়গায় এসে পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে উলটোদিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল জুলির। রাস্তার ওদিকে একটা পুলিশের ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ জুলির মনে হল এই লোকটা সাধারণ পোশাকে থাকা পুলিশ নয় তো? সোজা নিয়ে গিয়ে ভ্যানটায় তুলবে না তো?

রাস্তায় ট্রাফিকটা ফাঁকা হতেই অনুপম এগিয়ে পিছনে একবার দেখল জুলি আসছে কিনা। তখনই চোখে পড়ল মেয়েটা ফুটপাথের একধারে অল্প সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুপম পিছিয়ে এসে বিরক্ত হয়ে বলল, কী হল?

জুলি ভয়ে ভয়ে বলল, আপনি পুলিশ?

অনুপম অবাক হয়ে বলল, না, আমি পুলিশ নই।

তা হলে আপনি কে?

অনুপম চোখটা ছোট করে বলল, তোমার মনে পড়ছে না, আমি কে? চলো আমার সঙ্গে।

জুলি আবার অনুপমকে সাবধান করে পুলিশ ভ্যানটা দেখিয়ে বলল, আপনি যদি পুলিশ না হন, তা হলে ওপারে গেলে আমার সঙ্গে আপনাকেও পুলিশে ধরবে, আমি মাইরি ওসব ঝামেলায় নেই।

পুলিশ আমাকে ধরবে না। বেশ, চলো, যেখানে গেলে তোমার মনে হয় বিপদ নেই, সেখানে চলো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

'কথা আছে' শব্দগুলো জুলিকে ভাবাল। পুরুষ মানুষদের 'কাজ' আর 'কথা'র মধ্যে 'কাজ'টাই সহজ-সরল, কম বিপজ্জনক। তবে এখন বাজার ভাল নয় বলে বাছাবাছির সুযোগ কম। জুলি একটু চিন্তা করে অনুপমকে একটা হাতছানি দিয়ে ডেকে চৌরঙ্গির দিকে হাঁটতে থাকল। এবার পিছন পিছন অনুপম। জওহরলাল নেহেরু রোড ধরে চৌরঙ্গির দিকে খানিকটা এগিয়ে কিড স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল জুলি। এ-জায়গাটা প্রায় জনমানবহীন। ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলোও যেন প্রাণশক্তির অভাবে ধুঁকছে। কিছুটা গিয়ে একটা পুরনো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল জুলি। অনুপমের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হেসে বলল, এখানে আমার একটা ঘর ভাড়া নেওয়া আছে।

পরিবেশটা একটু থমথমে। অনুপম নিজের ভেতর সাহসটাকে টলে যেতে দিল না। গলায় আত্মবিশ্বাসটা না টলিয়ে বলল, তোমাকে বললাম না, চলো আগে কোথাও খেয়ে নিই।

জুলি গালে একটা হাত দিয়ে বলল, ওমা, আপনিই তো দামি জায়গায় গেলেন না। আপনি পয়সা দিন। যা খাবেন আনিয়ে দিচ্ছি। আসুন, ভেতরে আসুন।

বাড়িটাকে ভুতুড়ে মনে হল অনুপমের। অদ্ভুত সব মানুষেরা জুলির মতো মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। তার মধ্যে জুলি ছোট্ট যে-ঘরটায় অনুপমকে নিয়ে এসে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল, সেখানে একটা তক্তপোষ ছাড়া উল্লেখ করার মতো আর কোনও আসবাব নেই।

বলুন, কী খাবেন? শরীরটাকে দোলাতে দোলাতে জুলি জিজ্ঞেস করল।

থাক, আর ইচ্ছে করছে না।

জুলি শরীর থেকে শাড়িটাকে খুলে একপাশে ছুড়ে ফেলে বলল, আমাকেও নয়?

অনুপমের ভেতর একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নৈতিকতার যুদ্ধ। একটা তীব্র প্রত্যয় নিয়ে জুলিকে খুঁজে বেড়িয়েছে সে। একবার খুঁজে পেলে জুলিকে কী কী জিজ্ঞেস করবে সব ছকা ছিল। এখন সেগুলো গুলিয়ে গিয়ে মনের সঙ্গে নতুন যে-যুদ্ধটা শুরু হয়েছে সেই যুদ্ধটা লড়তে লড়তে বলল, মদ আছে?

আছে, আলাদা পয়সা লাগবে।

অনুপম পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিল। জুলি দরজাটা অল্প ফাঁক করে কাউকে কিছু একটা বলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল মদ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম। জুলি অনুপমকে প্রথম গ্লাসটা এগিয়ে দেওয়ার পর অনুপম দ্রুত শেষ করে ফেলল গ্লাসটা। তারপর একইরকমভাবে একটার পর একটা।

এবার আমাকে চিনতে পারছ জুলি? চার নম্বর মদের গ্লাসটা শেষ করে ঘোলাটে চোখে জিজ্ঞেস করল অনুপম।

তোমায় দেখেছি। কিন্তু কবে কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

দয়াল সান্যাল, মনে পড়ছে?

জুলি প্রথম গ্লাসটা শেষ করতে করতে ভাবল, এই লোকটা দয়াল সান্যালকে চেনে নাকি? লোকটা বলেছিল 'কথা' আছে। লোকটাকে 'কথা' থেকে 'কাজের' দিকে ঘোরাতে হবে। জুলি পটপট করে ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে অনুপমের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিল। নৈতিকতার যে-যুদ্ধটা চলছিল অনুপমের মধ্যে তার শেষ প্রতিরোধটাও ভেঙে গেল। একটানে নিজের জামাকাপড়গুলো খুলে জুলির শরীরে আত্মসমর্পণ করে উন্মত্ত হয়ে উঠল। পেশাদারি শীৎকারের মধ্যে মধ্যে আবছা আবছা করে জুলির রেস্তোরাঁতে সেই রাতটার কথা মনে পড়তে থাকল।

জুলি যখন বুঝল 'লোকটার কাজ শেষ হয়েছে', অনুপমের গলাটা জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বলল, এইবার মনে পড়েছে। সেদিন মাইরি তোমার বাড়ি থেকে ফিরতে... ওফ অত রাতে... তোমার বউও মাইরি...

অনুপম জুলির কোমর দু'হাঁটুতে চেপে ধরে গালে সপাটে একটা চড় কষিয়ে বলল, আমার বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

উফ! যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল জুলি। লোকটা যন্ত্রণা দিতে ভালবাসে, এসবের জন্য বাড়তি লাগবে...

অনুপম জুলির গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, এতেই আমার আনন্দ! এর জন্য টাকা...

তা বলে এত জোরে! মাইরি! এজন্যই তোমার বউ তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

অনুপম জুলির গাল দুটো চিপে ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, না, চলে গেছে তোমার জন্য।

এক ঝটকায় গালটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে জুলি বলল, আমার জন্য? বেশ হয়েছে। তোমার জন্য আজ থেকে আমি আছি। মারো, আমায় যত খুশি মারো। রোজ এসে মেরে যাও আমাকে। তোমার মাসিক বন্দোবস্ত করে দেব।

দয়াল সান্যালের জন্য কতদিন ধরে কাজ করছ?

ওই লোকটার জন্য আবার কাজ... হারামি শালা...

সেদিন রাতে দয়াল সান্যাল কেন তোমাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছিল?

বললাম না, ও শালা ওরকমই হারামি। ছাড়ো না।

জুলির চুলের মুঠিটা শক্ত করে ধরে ঝাঁকিয়ে অনুপম বলল, দয়াল সান্যাল তোমাকে যত টাকা দেয় আমি তার চেয়েও বেশি দেব। শুধু এবার থেকে আমি যা বলব, তাই করতে হবে।

জুলির সেই অদ্ভুত আস্তানা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা টেলিফোন বুথ পেল অনুপম। দয়াল সান্যালের বাড়ির নম্বরটা মুখস্থ। চাকা ঘুরিয়ে নম্বরটা ডায়াল করতেই ওপ্রান্তে রিং হওয়ার আওয়াজ পেল। মাউথপিসটার ওপর দু'পরত করে রুমাল জড়িয়ে নিল। অন্য প্রান্তে নারীকণ্ঠে 'হ্যালো' শুনতেই অনুপম গলাটাকে আর একটু বিকৃত করে বলল, গুড ইভনিং ম্যাডাম!

৩২

হরির ঝিল মাইগ্রেটরি বোর্ড ট্রাস্টের দ্বিতীয় মিটিংটা হল দয়াল সান্যালের বাড়ির বসার ঘরে। শিপ্রা ছাড়া ট্রাস্টের মেম্বাররা হল হরিতলা কটন মিলের ম্যানেজার শীতল ভট্টাচার্য, ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের অফিসার নিরাপদ পাল এবং সরোজ বক্সী। শিপ্রা ভাল করেই জানে এরা সকলেই দয়াল সান্যালের আজ্ঞাবহ। এও জানে দয়াল সান্যালের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া হরির ঝিলে কিছু করা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই এভাবেই কাজ এগোনোর জন্য রাজি হতে হয়েছে তাকে। এ ছাড়া এই মিটিং-এ আছে কমলেশ ভাণ্ডারী। মিটিং-এর মূল বিষয় হল হরির ঝিলে পরিযায়ী পাখি আনা এবং পাখিদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করা।

কমলেশ ভাণ্ডারীর পরিচয় দিয়ে সরোজ বক্সী বললেন, ম্যাডাম, কমলেশবাবু

দীর্ঘদিন ধরে পাখি নিয়ে অনেক কাজকর্ম করেছেন। স্যারের অনুরোধে উনি রাজি হয়েছেন আমাদের প্রোজেক্টে কাজ করতে।

কমলেশ ভাণ্ডারী একদম প্রস্তুত হয়ে এসেছে। পাখি এবং তুলো চাষ, দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রাখার ব্যাপারটা পুরো ছকে রেখেছে। দু'-চার কথার আলাপচারিতার পর কমলেশ ভাণ্ডারী দয়াল সান্যালের সঙ্গে বসে ঠিক করা পরিকল্পনাটা খুলে বলতে আরম্ভ করল।

ম্যাডাম, এখন শীত চলে যাচ্ছে। শীত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-পাখিরা দূরদুরান্ত থেকে এসেছিল, তারাও ফিরে যাচ্ছে। এ-বছর সংখ্যায় তারা যত এসেছিল, সামনের বছর সেই সংখ্যাটা কমে যাবে। এটা শুধু আমাদের এখানেই নয়, গোটা পৃথিবী জুড়েই দেখা যাচ্ছে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। যেখানে যেখানে পরিযায়ী পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে শীতকালে আসত, সেখানে সেখানে ক্রমশ সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে। দীর্ঘ গবেষণায় দেখা গেছে...

শীতল ভট্টাচার্য কমলেশকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কমলেশবাবু, ম্যাডামের সময়ের দাম আছে। আপনি বরং হরির ঝিলে কী করতে চাইছেন সেটা বলুন। আপনার পরিকল্পনা ম্যাডাম অনুমোদন করলে আমরা এই প্রোজেক্টে আপনাকে রাখব।

হ্যাঁ, বলছি। পরিযায়ী পাখিদের যাওয়া-আসা ব্যাপারটাকে একটা পদ্ধতি দিয়ে ভালভাবে মনিটর করতে হবে। এটাকে বার্ড রিংগিং বলে। গোটা পৃথিবীতে এটা খুব জনপ্রিয় পদ্ধতি।

শিপ্রা উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, বার্ড রিংগিং করবেন?

শীতল ভট্টাচার্যও নিজের প্রশ্ন রাখল, বার্ড রিংগিং মানে?

মানে, যে-পাখিরা এখানে এসেছে তাদের পায়ে আমরা ছোট নির্দিষ্ট সংখ্যার রিং পরিয়ে দেব। কাউকে লোহার দুটো রিং, কাউকে তামার একটা রিং। সামনের বছর দেখতে হবে এখানে ক'টা রিং পরা পাখি ফিরে আসে।

সুবল বলে উঠল, পাখিগুলো এতদিন বাঁচবে তো?

সবাই হয়তো বাঁচবে না, সেরকমই সবাই ফিরেও আসবে না। কিন্তু বললাম যে, গোটা পৃথিবী জুড়ে বার্ড রিংগিং-ই পরিযায়ী পাখি নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপায়। আর পাখিদের একটা টেনডেন্সি আছে পুরনো জায়গাতেই ফিরে আসার। তা ছাড়া রিং-এর সংখ্যা দিয়ে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারব কত পাখি এল, কখন এল।

শিপ্রা একটু আনমনা হয়ে বলল, হ্যাঁ, এরকম পড়েছি। কিন্তু পাখিগুলোকে ধরবেন কী করে?

খুব সাবধানে ম্যাডাম... খুব সাবধানে ধরতে হবে। একদম নরম জাল দিয়ে... যাতে পাখিগুলোর একটুও আঘাত না লাগে... যত্ন করে রিংটা পরিয়ে দিতে হবে...

দেওয়া হল... তারপর?

তালিকা তৈরি করতে হবে...

বুঝতে পারলাম। এতে করে না হয় কিছু সংখ্যা আমরা পাব। কিন্তু আসল কথা হল,

পাখিদের জন্য আমরা কী করব? অতিথি পাখিগুলো কীভাবে বুঝবে হরির ঝিল তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা?

সরোজ বক্সী কমলেশকে বললেন, হ্যাঁ কমলেশবাবু এটাই আমাদের লক্ষ্য, এটা আপনি বুঝিয়ে বলুন।

কমলেশ গলাটা খাঁকরিয়ে বলল, উপায় যেগুলো আছে, সেগুলো খুব খরচসাপেক্ষ। আমার একটা ছোট্ট গবেষণা আছে, যদি আপনারা সুযোগ আর অনুমতি দেন, সেটাকে বড় করে করতে পারি।

শীতল ভট্টাচার্য আবার অধৈর্য হয়ে বলল, আঃ, আপনি বলুন না।

আমাকে তা হলে একটু বিশদে আপনাদের বোঝাতে হবে।

ঠিক আছে বলুন।

কমলেশ কয়েক ঢোঁক জল খেয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

ম্যাডাম, পরিযায়ী পাখিরা এখানে কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কীসের তাড়নায় আসে, কারণগুলো খুঁজলে আপনি দেখবেন শীতকালে যেসব দেশ খুব ঠান্ডা, কনকনে ঠান্ডা, বরফে ঢেকে রয়েছে সব কিছু, উষ্ণতার খোঁজে সেই মেরু অঞ্চল থেকে ইকোয়েটর অঞ্চলে চলে আসে ওরা। ওরা খোঁজে জল আর অনুকূল পরিবেশ। সেই কারণেই দেখবেন আপনাদের হরির ঝিলের মতো পশ্চিমবঙ্গের আরও বড় বড় ঝিলের আশেপাশের গাছগাছালিগুলোকে ওরা করে নেয় ওদের ঠিকানা। কিন্তু তার পরেও কেন ওদের আসা কমে যাচ্ছে? তার কারণ মানুষের বসতি।

আর কারখানা, ধোঁয়া, পলিউশন। কঠিন গলায় বলল শিপ্রা।

নিরাপদ বলে উঠল, এসব তো ম্যাডাম সভ্যতার অঙ্গ। সভ্যতা, জনসংখ্যা যত বাড়বে, বসতি কলকারখানা বাড়বে।

শিপ্রা প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, তার মানে এই নয় যে, অন্য প্রজাতিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। যাকগে, তারপর আপনি বলুন কমলেশবাবু।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। পাখিরা কী করে নিজেদের জায়গা চিনে নেয়? ওরা আকাশ থেকে দেখতে পায় সব। যেমন এরোপ্লেনের জানলা থেকে মানুষ দেখতে পায়। ওরা খোঁজে নিজেদের মনের মতো একটা জায়গা। আমরা হরির ঝিলের একপাশে মনের মতো সেরকম একটা জায়গা তৈরি করব।

কীরকম? উৎসুক হয়ে জানতে চাইল শিপ্রা।

ম্যাডাম ওখানে যে দু'একর মতো জায়গাটা আপনাদের আছে, সেখানে আমরা এমন কিছু ফুলের আর শস্যর চাষ করব, যেগুলো পরিযায়ী পাখিদের খুব প্রিয়। তা ছাড়া আমরা ওই জায়গাটার জায়গায় জায়গায় সাদা তুলো ছড়িয়ে রাখব। পাখিরা আকাশ থেকে সাদা তুলোগুলোকে দেখে ভাববে নিজের দেশের বরফ। কিন্তু এখানে উষ্ণতা পাবে। প্রজনন বাড়াবে। প্রত্যেক শীতে বারবার উড়ে আসবে।

এটা হবে মনে হয়? পরিকল্পনাটা শুনতে শুনতে একটা বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করলেও, শিপ্রার মনে একটা আশঙ্কা যেন থেকেই যাচ্ছে।

হবে ম্যাডাম, নিশ্চয়ই হবে। কমলেশ জোর দিয়ে বলল, কিন্তু ম্যাডাম, ব্যাপারটাকে খুব গোপনীয় রাখতে হবে।

গোপনীয় কেন? এতে গোপন করার কী আছে? শিপ্রা জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটা লুফে নিল শীতল ভট্টাচার্য, আমি বলছি ম্যাডাম। হরিতলার আশেপাশে এখন কী অবস্থা জানেন? শ'য়ে শ'য়ে বেকার। চাকরিবাকরি নেই। রোজ আমাদের মিলের গেটে লোকাল বেকার ছেলেগুলো ধর্না দিয়ে পড়ে থাকে। ওদের একটাই আকুতি— চাকরি চাই। যেমন তেমন, যে-কোনও কাজের, যে-কোনও মাইনের একটা চাকরি। এখন ম্যাডাম, যদি দেখা যায় আমরা লোকাল মানুষদের কথা না ভেবে পাখিদের কথা ভাবছি, স্থানীয় লোকেদের মধ্যে একটা জনরোষ দেখা দেবে। যে-চেষ্টাটা কমলেশবাবু শুরু করতে যাবেন, ওরা এসে তছনছ করে দিয়ে যাবে সব কিছু...।

শিপ্রা একটু চমকে উঠল। সেই ভয়ংকর রাতে নকশালদের কথাগুলো আবার কানে বেজে উঠল—দেখে আসুন ভারতের গণতন্ত্র গ্রামগুলোকে কী দিয়েছে আর আপনাকে কী দিয়েছে। গ্রামগুলোকে দিয়েছে অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর আপনাকে দিয়েছে বাহারি বিদেশি পাখির প্রাণ কীভাবে বাঁচানো যায় নরম সোফায় বসে সেই চিন্তা করার বিলাসিতা আর সময়।

আনমনা হয়ে শিপ্রা বলল, শীতলবাবু, আপনার বয়স অল্প হলেও হরিতলায় মিলের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা আপনি চালান। এ ব্যাপারটা আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তাই করবেন।

কমলেশ ভাণ্ডারী যে-পরিকল্পনাটা বলছে সেটা আদপে দয়াল সান্যালের। প্রত্যেকের ভূমিকা খুঁটিনাটি বলে দিয়েছেন। সকলে বারবার আড়চোখে শিপ্রার প্রতিক্রিয়া দেখছিল এবং ক্রমশ বুঝতে পারছিল দয়াল সান্যালের ধূর্ততায় শিপ্রা কীভাবে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অফিসে দয়াল সান্যাল অবশ্য অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সরোজ বক্সীর জন্য। বাড়িতে যে-মিটিংটা চলছে, তাতে শিপ্রা কতটা অনুপ্রাণিত হয়, সেটা জানা দরকার। গোটা ব্যাপারটা এখন মনে হচ্ছে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো মিলিয়ে মিলিয়ে এগোচ্ছে। দু'একর দখলে এলে হরির ঝিল পর্যন্ত টানা দখলে চলে আসবে। তারপর ঝিলটা পুরো মিলের কাজে লাগানো যাবে।

হরিতলার রাজনৈতিক নেতা বিমল ঘোষের সঙ্গে মিলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতার গোপন বৈঠক হয়ে গেছে। ওরা ঠিক করেছে মিলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোনও বাধা এলে একজোট হয়ে লড়বে। পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের মতো ভয়াবহ সমস্যাকে সামনে নিয়ে আসবে। কিন্তু সব কিছুর আগে দরকার শিপ্রার হাত থেকে দু'একর জমির মালিকানাটার প্রবেটে। দলিলটা জাল সই করে আপাতত তাঁর ড্রয়ারে। এই দলিল দেখিয়েই ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়া যাবে, যাতে কেনা হবে নতুন মেশিনপত্তর। আর ওদিকে শিপ্রাও নিশ্চিত থাকবে ওই জমিটায় পাখির ব্যাপারে কিছু কাজকর্ম হচ্ছে দেখে।

দয়াল সান্যালের অস্থিরতার মাঝেই এসে হাজির হলেন নির্মল চ্যাটার্জি। লোকটার মুখে সবসময় যে উপচানো খুশির রেশটা থাকে, আজকে সেটা নেই। একটু যেন শুকনো মুখটা।

খবর পেয়েছেন সান্যালমশাই? চেয়ারে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন নির্মল চ্যাটার্জি।

নির্মল চ্যাটার্জিকে দেখে আজ একটুও খুশি হলেন না দয়াল সান্যাল। আজ অনেকগুলো কাজ হাতে রয়েছে। তার ওপর বাড়ির মিটিংটার ব্যাপারে সব খুঁটিয়ে জানা দরকার। নির্লিপ্ত গলায় পালটা প্রশ্ন করলেন, কী খবর?

সুজন দত্ত ইজ ডেড।

দয়াল সান্যালের ভুরু দুটো অল্প কোঁচকাল। তবে একই রকম নিরুত্তাপ গলায় বললেন, ও তাই!

হ্যাঁ মশাই। কাল রাতে দিব্যি খেয়েদেয়ে শুতে গিয়েছিল। সকালে আর সে-ঘুম ভাঙল না। ঘুমের মধ্যেই ফিনিশ। জাস্ট টুক করে মরে গেল।

হার্ট অ্যাটাক?

আবার কী?

ক'দিন আগে যে খুব বলছিল লন্ডনে গিয়ে শিরা-উপশিরা সব সাফসুতরো করে নিয়ে এসেছিল, তারপরে একটা কচি খুকিকে নিয়ে সাতদিন ফস্টিনস্টি করেছে...।

নির্মল চ্যাটার্জি টেবিলে একটু ঝুঁকে বললেন, সব বাজে কথা মশাই। সুজন দত্ত ওরকম কচি খুকিদের নিয়ে ঘুরত... একদম বাজে কথা। গোটা পৃথিবীর কাছে গল্প দিত আর প্রমাণ করতে চাইত যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর্যবান পুরুষ। আসলে লোকটা ইমপোটেন্ট ছিল। ওর ছেলেকে দেখেছেন?

না দেখিনি।

দেখলে বুঝতে পারতেন। সুজন দত্তর বউয়ের পেট থেকে যে-ছেলেটা বেরিয়েছে সে না সুজন দত্তর বউয়ের মতো দেখতে, না সুজন দত্তর মতো। বুঝতেই পারছেন এতে কী প্রমাণ হয়...

কী?

এতক্ষণে মুখের কালো ছায়াটা কাটল নির্মল চ্যাটার্জির। খ্যাকখ্যাক করে হাসতে হাসতে বললেন, সিম্পল। ওই ছেলেটার আসল বাপ সুজন দত্ত নয়। তবে মাত্র সাতচল্লিশেই টেঁসে যাবে লোকটা, এটা ভাবতে পারিনি।

দয়াল সান্যালের ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

কী বললেন?

হ্যাঁ মশাই, ওই ছেলেটার আসল বাপ সুজন দত্ত নয়...

না না, তারপর কী বললেন... সাতচল্লিশ?

ও। বলছিলাম সুজন দত্তর সাতচল্লিশে অকালমৃত্যু হল।

দয়াল সান্যালের চোখের সামনে ভাসছে দুটো সংখ্যা। চার আর সাত। সাতচল্লিশ।

দয়াল সান্যালের নিজের বয়সও ঠিক সাতচল্লিশ। হয়তো আজকের রাতটা। আজ রাতে বিছানায় শুয়ে কাল সকালে আর ঘুম ভাঙবে না সুজন দত্তর মতো। কাল নির্মল চ্যাটার্জি আর একটা কাউকে বলবে, দয়াল সান্যাল জাস্ট টুক করে মরে গেল। হঠাৎ করে একটা ভয়ানক মৃত্যুচিন্তা গ্রাস করল দয়াল সান্যালকে।

দয়াল সান্যালকে অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে নির্মল চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, ও মশাই, আপনার সঙ্গে তো সুজন দত্তর কোনও ভাব-ভালবাসা ছিল না। বিরাট ক্ষতি তো হল আমার। চার-চারটে কনট্রাক্টের কনসালটেন্সি পিছলে গেল। মুখ লটকানোর কথা তো আমার। আপনার মুখটা কালো হয়ে গেল কেন? শুনুন না মশাই, আপনি নেবেন কনট্রাক্টগুলো? সেজন্য তো সাতসকালে ছুটে এলাম আপনার কাছে...

আপনার বয়স কত চাটুজ্যেমশাই?

বিয়াল্লিশ পেরোল বোধহয়। সেদিন মা ঘটা করে পায়েস...

আর পাঁচ বছর। খুব সাবধানে থাকবেন মশাই।

নির্মল চ্যাটার্জি লক্ষ করল দয়াল সান্যাল খুব আনমনা হয়ে পড়লেন। মৃত্যু যে কখন কাকে কীভাবে ছুঁয়ে যায়। কাজের কথা আর বিশেষ জমল না সেদিন।

সরোজ বক্সীও অফিসে এসে দেখলেন দয়াল সান্যাল কীরকম যেন গুম মেরে বসে আছেন। দীর্ঘদিন মানুষটাকে দেখতে দেখতে সরোজ বক্সী এই গুম হয়ে যাওয়ার প্রকৃতিগুলো বুঝতে পারেন। কোনটা ব্যাবসার গভীর চিন্তায় গুম, কোনটা কূটকচালের গুম আর কোনটা অজ্ঞাত কারণের গুম। এর মধ্যে সবচেয়ে চিন্তার কারণ হয় এই শেষ প্রকারের গুমটায়। এর পর দয়াল সান্যালের বিস্ফোরণটা যে কীভাবে হবে কেউই জানে না।

কর্তব্যজ্ঞানে সরোজ বক্সী ট্রাস্টের মিটিং-এর সমস্ত খুঁটিনাটিগুলো আওড়ে গেলেন। কিন্তু খেয়াল করলেন দয়াল সান্যাল সব ওপর-ওপরই শুনলেন। কোনও মন্তব্য করলেন না। একটা প্রশ্নও করলেন না। সব শোনার পর সরোজ বক্সীকে বললেন, জুলিকে একটা খবর দাও তো। সাড়ে সাতটায় যেন পার্ক স্ট্রিটে চলে আসে।

জুলি যথা সময়ের আগেই পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছিল। রেস্তোরাঁর দারোয়ানটা একা একা ওকে ঢুকতে দেয় না। আজ কিন্তু গাড়ি থেকে নামা ইস্তক একদম গুম দেখাল দয়াল সান্যালকে। বহুক্ষণ পরে প্রথম পেগটা শেষ করে দয়াল সান্যাল জুলির চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুজন দত্ত আজ মরে গেছে, তুমি জানো?

জুলি মন দিয়ে ফিশফ্রাই খাচ্ছিল। খবরটা শুনে ওর বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হল না। আবার ফিশফ্রাইয়ে মন দিল। দয়াল সান্যাল রেগে উঠলেন, তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম। উত্তরটা দাও।

জুলি প্লেটের ওপর থেকে মুখটা না তুলেই বলল, মরে গেছে, বেশ হয়েছে। পৃথিবী থেকে একটা আপদ কমল। হারামি ছিল শালা। আমার অনেক টাকা মেরে দিয়েছে। ওর মরারই টাইম হয়েছিল। আমি জানতাম ও এবার মরবেই।

দয়াল সান্যাল জুলির প্লেটটা এক টানে সরিয়ে নিয়ে বললেন, তুমি জানতে ও মরে যাবে?

দয়াল সান্যালের এরকম ব্যবহারে জুলি আজকাল আর অবাক হয় না। দয়াল সান্যাল লোকটাই আধপাগলা। এতদিনে তাকে সামলে চলার কায়দাটা অনেকটাই রপ্ত করে ফেলেছে জুলি। চোখ টিপে প্লেটটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, হ্যাঁ জানতাম।

দয়াল সান্যাল অবিশ্বাসী চোখে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জানতে! কী করে জানতে?

আগে খেয়ে নিতে দিন। তারপর বলছি।

না, আগে বলো। তারপর খাবে।

জুলি হাল ছেড়ে দিয়ে মনগড়া গল্প বানাতে লাগল, মরে যাওয়ার আগে মানুষ অন্য মরে যাওয়া মানুষদের আশেপাশে দেখতে পায়। সুজন দত্ত এই ক'দিন যখন হেভি মাল খেত সব মরে যাওয়া মানুষদের আশেপাশে দেখতে পেত...।

কাদের দেখতে পেত?

ওফ্, আগে খেতে তো দিন। খেতে খেতে বলছি।

দয়াল সান্যাল প্লেটটা হাতের আওতা থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে ধমকে উঠলেন, না আগে বলো, কাকে কাকে দেখতে পেত?

জুলি এবার ধৈর্য হারাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিড়বিড় করে বলল, খান ওটা, আপনিই খান... শাল্লা... আমি চললাম।

জুলি হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল। দয়াল সান্যাল একমনে জুলির চলে যাওয়া দেখলেন। তারপর হাত তুলে বেয়ারাকে ডেকে নিজের দ্বিতীয় পেগটার অর্ডার দিলেন। ধীরেসুস্থে গ্লাসটা শেষ করলেন। বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলেন পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে।

ফুটপাথ ঘেঁষে সার দিয়ে পরপর গাড়িগুলো দাঁড় করানো। দৈর্ঘ্যে দয়াল সান্যালের গাড়িটাই সবচেয়ে বড়। দু'পেগে কখনওই মাতাল হন না, তবে মেজাজটা খুব ফুরফুরে হয়ে থাকে। আজ সেই ফুরফুরে মেজাজটাই আসছে না। ভেতরে ভেতরে নিরন্তর খোঁচা মেরে যাচ্ছে একটা সংখ্যা, সাতচল্লিশ, যে-ক'টা বসন্ত ভোগ করে আজ সুজন দত্ত মারা গেছে। বারবার মনে হচ্ছে সাতচল্লিশ সংখ্যাটা কি কোনও মৃত্যুঘণ্টা? সুজন দত্ত কি সত্যিই সাতচল্লিশে মারা গেল, নাকি সুজন দত্তর বয়স আরও অনেক বেশি ছিল? সারাদিনে বারবার মনে পড়ছে, ক'দিন আগে বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা হয়েছিল। সেটা কি সাতচল্লিশের মৃত্যুঘণ্টা ছিল?

নিজের গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন দয়াল সান্যাল। গাড়ির সিটে ড্রাইভার নেই। পাশের সিটে বসে আছে সরোজ বক্সী। সরোজ বক্সীর মাঝে মাঝে ডিউটির মধ্যে এটাও পড়ে। দিনের শেষ কাজ। দয়াল সান্যাল ফুরফুরে হয়ে গাড়িতে উঠে সরোজ বক্সীকে ছুটি দিয়ে দেন। আজকেও দয়াল সান্যালকে গাড়ির কাছে এগিয়ে আসতে দেখে শশব্যস্ত হয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন সরোজ বক্সী। বনোয়ারীকে এবার ডাকতে হবে। বনোয়ারীলাল একটু দুরে একটা পান-সিগারেটের দোকানের সামনে

দাঁড়িয়ে রেডিয়োতে গান শুনছে। দয়াল সান্যাল প্রায় ঘড়ির কাঁটা ধরে এই রেস্তোরাঁতে কাটান। ঠিক সময়ে বনোয়ারী ড্রাইভারের সিটে এসে বসে পড়ে।

সরোজ বক্সী বনোয়ারীকে উঁচু গলায় ডাকতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই দয়াল সান্যাল গলা ছেড়ে ডেকে উঠলেন, বনোয়ারীলাল!

সরোজ বক্সী অবাক হলেন। এভাবে গলা ছেড়ে রাস্তায় কোনওদিন বনোয়ারীকে ডাকেন না দয়াল সান্যাল। দয়াল সান্যালের মুখে হঠাৎ করেই যেন একটা আত্মপ্রসন্নতা ফুটে উঠেছে।

বুঝলে সরোজ, মানুষ মরে যাওয়ার আগের পূর্বলক্ষণ কী জানো তো? মানুষ চারপাশের জ্যান্ত মানুষদের নামধাম সব ভুলতে বসে। এই যে আমি বনোয়ারীকে ডাকলাম। এরকম নাম মনে করতে পারে না। কিছুতেই পারে না।

সরোজ বক্সী চুপ করে থাকলেন। অনুমান করতে থাকলেন, আজকাল কতটা মদ খান দয়াল সান্যাল? আগে এটা একদমই তাঁর চরিত্রে ছিল না। ইদানীং দয়াল সান্যাল প্রায়শই বেহেড হয়ে পানশালা থেকে বেরিয়ে মাতলামো করেন। আর আজকে তো কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছেই। এই একটু আগে জুলি বলে কলগার্লটা সরোজ বক্সীকে দেখতে পেয়ে দয়াল সান্যালের নামে বিস্তর গালিগালাজ করে গেছে।

সাহেবের গলার ডাক শুনে চমকে উঠে বনোয়ারীলাল দ্রুত পায়ে গাড়ির দিকে আসতে থাকল। সাহেব আজ সময়ের অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছেন।

দয়াল সান্যাল চোখ ছোট করে একদৃষ্টে বনোয়ারীলালের এগিয়ে আসা দেখতে থাকলেন। চোয়াল শক্ত করে ঠোঁটটা কামড়ালেন একবার। বনোয়ারীলাল—এই ড্রাইভারটা শিপ্রার প্রেমিক। লোকটাকে জীবনের শিক্ষা দেওয়া বাকি আছে। আজ রাতে যদি সুজন দত্তর মতো মৃত্যু হয়, বেইমানটা পার পেয়ে যাবে। এর হিসাবটা করে দিতে হবে আজকেই। এখনই। চাপা গলায় সরোজ বক্সীকে দয়াল সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, বনোয়ারীলালের বাড়ি কোথায়?

পার্ক সার্কাস স্যার।

ঠিকানাটা জানো?

সরোজ বক্সী একটু চিন্তা করে বললেন, পোস্ট অফিসের ঠিকানাটা অফিসে আছে। তবে জায়গাটা জানি স্যার...

এখন ক'টা বাজে?

সরোজ বক্সী ঘড়ি দেখে বললেন, পৌনে ন'টা স্যার।

বনোয়ারীর বাড়ি ফিরতে ফিরতে ক'টা হবে?

দয়াল সান্যালকে বাড়িতে নামিয়ে বাসে করে বনোয়ারীলালের বাড়ি ফেরার সময়টা মনে মনে হিসেব করে সরোজ বক্সী বললেন, সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা হবে স্যার।

দয়াল সান্যাল গালটা চুলকে বললেন, তুমি একটা কাজ করো তো সরোজ! লালবাজারে এসিপি রায়ের ডিপার্টমেন্টে চলে যাও।

সরোজ বক্সী ঢোঁক গিলে বললেন, এখন স্যার?

হ্যাঁ এখন। তোমার তো বাড়ি ফেরার পথ। এক মিনিটের কাজ। কাজটা করে ট্রাম ধরে বাড়ি চলে যেয়ো।

সরোজ বক্সী চুপ করে থাকলেন। আবার কিছু একটা বিচিত্র নির্দেশ আসবে। পেটের খাতিরে আর একটা অনৈতিক কাজ করতে হবে। বিরক্তি চেপে দয়াল স়ান্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

এসিপি রায়ের সঙ্গে দেখা করো। ও অনেক রাত পর্যন্ত আজকাল লালবাজারে থাকে। ওকে গিয়ে বলো আমার দামি রোলেক্স ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। বনোয়ারীর বাড়িতে একটু সার্চ করালে পাওয়া যাবে।

সরোজ বক্সীর চোখটা চলে গেল দয়াল সান্যালের হাতে। দামি রোলেক্স ঘড়িটা ফুলশার্টের কাফের তলায় একচিলতে চাঁদের মতো ঝিলিক মারছে। সরোজ বক্সীর চঞ্চল দৃষ্টিটা দেখে দয়াল সান্যাল একটা বাঁকা হাসি হেসে বললেন, যাও সরোজ। তোমার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে। কাজটা করে বাড়ি চলে যাও। তোমার বউ তো আবার ঠিক সুস্থ থাকে না আজকাল।

সরোজ বক্সী নমস্কার করে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলে দয়াল সান্যাল গাড়িতে উঠে এসে জমিয়ে বসলেন। বনোয়ারী গাড়িটা স্টার্ট দিতে যাবে, এমন সময় মাতালের মতো গলাটা জড়িয়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, বনোয়ারী, একটা দেশলাই নিয়ে এসো তো।

হ্যাঁ সাহেব।

বনোয়ারীলাল আজ্ঞা পালন করতে একছুটে দেশলাই কিনতে গেল। দয়াল সান্যাল হাত থেকে ধীরেসুস্থে হাতের রোলেক্স ঘড়িটা খুললেন। তারপর পায়ের কাছে সিটের তলায় ফেলে দিলেন ঘড়িটা।

দেশলাই কিনে ফিরে এসে বনোয়ারী গাড়িতে স্টার্ট দিল। দয়াল সান্যাল গুনগুন করে গান করতে থাকলেন। একসময় গুনগুনানি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ক'টা বাজে বনোয়ারী?

ন'টা পাঁচ সাহেব।

শালি কুত্তি!

দয়াল সান্যাল জড়ানো গলায় বলে উঠলেন। যেহেতু দুটো শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ, বনোয়ারী নিশ্চিন্ত হল শব্দ দুটো তাকে উদ্দেশ করে বলা নয়। তবে কার উদ্দেশে বলা সেটাও বুঝতে অসুবিধে হল না। মালিক আজকাল সন্ধেবেলায় যে-মেয়েটাকে নিয়ে মদ খেতে আসে সেই মেয়েটাও সিগারেটের দোকানে জর্দাপান কিনতে এসে বনোয়ারীলালকে দেখতে পেয়ে চোখা চোখা বাক্যবাণ দিয়ে গেছে। নপুংসক, হিজড়ে থেকে আরম্ভ করে সাতপুরুষের বাপবাপান্ত কিছুই করতে বাকি রাখেনি মালিককে।

দয়াল সান্যাল নিজের গলাটা আরও জড়িয়ে নিয়ে মাতালের অভিনয়টা বিশ্বাসযোগ্য করে বলতে থাকলেন, হারামজাদি রোলেক্স ঘড়ির দাম কী বুঝবে? তুমি তো আমার ঘড়িটা দেখেছ বনোয়ারীলাল। কত দাম হবে বলো তো ঘড়িটার?

বনোয়ারীলাল ইতস্তত করে বলল, অনেক দাম সাহেব।

দয়াল সান্যাল সামনের দিকে ঝুঁকে ঘড়িশূন্য হাতটা বনোয়ারীলালের কাঁধের পাশ দিয়ে বাড়িয়ে কবজিটা দেখিয়ে বললেন, বলতে পারলে না তো বনোয়ারীলাল! হারামজাদি ঘড়িটা নিয়ে নিল। অত লোকের মাঝে কিছু বলতে পারলাম না। ওটা বিক্রি করে ও কত পাবে? পাঁচ হাজার... বা বড়জোর আট। নিউ মার্কেটে গেলে এর চেয়ে বেশি আর কত পাবে আমার চল্লিশ হাজারের ঘড়িটার।

চল্লিশ হাজার? একটা ঘড়ির দাম! বনোয়ারীলাল ঢোঁক গিলল। মাতাল হয়ে সাহেব ঠিক বলছে তো দামটা? সাহেবের মন রাখতে বলল, সাহেব, কালকেই ঘড়িটা ওর কাছে চেয়ে নেব, আপনি চিন্তা করবেন না।

দয়াল সান্যাল যাত্রার ঢঙে বলে উঠলেন, না বনোয়ারীলাল... না... বেশ্যাকে দেওয়া জিনিস আর ফিরিয়ে নেব না। তুমি ওর সঙ্গে ঘড়ি নিয়ে আর একটাও কথা বলবে না। কাউকে বলবে না। ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব।

দয়াল সান্যাল আবার সিটে গা এলিয়ে দিলেন। মনটা ততক্ষণে ফুরফুরে হল। বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, শ্রীমতী শিপ্রা সান্যাল, তোমার প্রেমিকপ্রবরের ব্যবস্থা করলাম। গুনগুন করে সুর ভাঁজতে থাকলেন দয়াল সান্যাল।

গাড়িটা একটা ক্রসিং-এ লাল আলোয় দাঁড়াল। বাঁদিকে ফুটপাথের কোনায় একটা আধকোমর উঁচু ঘুপচি মন্দির। ঘুলঘুলির মতো ছোট একটা জানলা মন্দিরটার। ভেতরে টিমটিমে গোটাকয়েক মোমবাতি জ্বলছে। তার মধ্যে কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো ঠাকুরদেবতার ছবি আর গাঢ় নীল রঙের একটা ছোট্ট মাটির কালীপ্রতিমা। দয়াল সান্যালের ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। মনে হল ঘুলঘুলির মতো ছোট জানলাটা দিয়ে মা কালী একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি হতে থাকল। রাত হয়েছে। এত রাতে এই মোড়টায় কোনও যানবাহন নেই, তা হলে লাল আলোতে বনোয়ারীলাল দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কী হল বনোয়ারী? কোথাও কোনও ট্রাফিক পুলিশ নেই, গাড়িও নেই। তুমি গাধার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

'গাধা' শব্দটা শুনতে মোটেও ভাল লাগল না বনোয়ারীর। মনে মনে গালাগালটা ফিরিয়ে দিল দয়াল সান্যালকে। আরও ভাবতে থাকল, পুলিশ নম্বর নিলে নিক। আমার কী! গাড়ি কোম্পানির। জরিমানা দিলে কোম্পানি দেবে। ট্রাফিকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গাড়িটা চালিয়ে দিল বনোয়ারী।

দয়াল সান্যাল মন থেকে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকল নতুন একটা চিন্তা। বনোয়ারীলাল সিটের তলায় ঘড়িটা দেখতে পাবে তো? জানলা দিয়ে বাইরের ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় সেই বুদ্ধিটাও খেলে গেল। মাতালের স্বরটা আবার গলায় জড়িয়ে নিলেন দয়াল সান্যাল।

আমার পেনটা কোথায় গাড়ির মধ্যে পড়ে গেছে, গাড়ি গ্যারেজ করার আগে খুঁজে দেখো তো বনোয়ারী। সকালবেলাতেই লাগবে।

রাস্তা ফাঁকা পেয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে বনোয়ারী বলল, হ্যাঁ সাহেব।

এবার একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন দয়াল সান্যাল। চোখটা বন্ধ করে গুনগুনে সুরটা ভাঁজতে ভাঁজতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন।

একটা গাড্ডায় পড়ে অল্প লাফিয়ে উঠল গাড়িটা। দয়াল সান্যালের চটকাটা ভেঙে গেল। গাড়ি একইরকমভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ড্রাইভারটা। কী যেন নাম লোকটার? দয়াল সান্যাল মনে করার চেষ্টা করলেন। বেশ মনে পড়েছে পাঁচ মিনিট আগেও লোকটাকে অনেকবার নাম ধরে ডাকছিলেন। সব কিছু মনে পড়ছে। রোলেক্স ঘড়িটা পায়ের কাছে সিটের তলায়, জুলি, সরোজ বক্সী, একটু আগে ফুটপাথের মন্দিরে দেখা মা কালীর মূর্তিটা... সব কিছু মনে পড়ছে... শুধু ওই লোকটার নামটা ছাড়া... কী যেন নাম?

অমল, বিমল, কমল, স্বপন, রতন, সরোজ, বিরাজ, মনোজ... একটার পর একটা নাম মনে পড়তে থাকল দয়াল সান্যালের। কিন্তু ওর ঠিক নামটা কী কিছুতেই মনে পড়ছে না। হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা হলকা ছড়িয়ে একটা নাম মনে এল। নৃপেন। হ্যাঁ, ওই লোকটাই নৃপেন। সেই নৃপেন যে ডুমুরঝরাতে আট বছর বয়সে পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিল।

দয়াল সান্যালের মনে হতে লাগল গলাটা যেন কেউ দশ আঙুলে চেপে ধরছে। নৃপেন দেখা দিচ্ছে। জলে ডুবে মরে যাওয়া নৃপেন। নৃপেন সাক্ষাৎ সাতচল্লিশের মৃত্যুঘণ্টা।

৩৩

বিট্টুকে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনেই কার্শিয়াং চলে এল শিপ্রা। প্রিন্সিপাল অ্যান্ডারসন কথা রেখেছিলেন। বিট্টুকে ভরতি করে নিলেন নিজের স্কুলে। শিপ্রার জন্য একটা বাড়ি ভাড়ারও ব্যবস্থা করে দিলেন।

বিট্টুকে স্কুলে দিয়ে শিপ্রা কার্শিয়াং-এ ঘুরে বেড়াত। তবে এই কার্শিয়াং-এর সঙ্গে ছোটবেলার কার্শিয়াংকে কিছুতেই মেলাতে পারত না। তখন কার্শিয়াং-এর সরল জীবনটা ছিল স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যে আর এখন জটিল জীবনটা স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে। নিজের স্কুলের ভেতরেও একদিন গিয়েছিল শিপ্রা। খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নিজেকে কিছুতেই মেলাতে পারল না স্কুলের ভেতর।

ক্রমশ শিপ্রা খুঁজে পেল একটা জায়গা। জায়গাটা ভাল লাগার আবার মন খারাপেরও। কার্শিয়াং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা খালি বেঞ্চ। যে-ঘণ্টাগুলো শিপ্রা এই বেঞ্চে কাটাত তখন কোনও ট্রেনের যাতায়াত থাকত না। সরু লাইনজোড়া যেন এক প্রতীক্ষার চিহ্ন। কখনও মনে হত ওই লাইন ধরে এগিয়ে আসবে যে-ট্রেনটা তাতে থাকবে মা, কখনও মনে হত ট্রেনে করে আসবে স্কুলের বন্ধুরা। এই প্রতীক্ষার বিলাসিতা থেকে মোহভঙ্গ হয়ে যাবে বলেই যেন শিপ্রা কখনও ট্রেন আসার সময়ে প্ল্যাটফর্মে থাকত না।

ট্রেনের সময়টুকু ছাড়া বাকি সময় স্টেশনটা একদম সুনসান। স্থানীয়রা শিপ্রাকে

ফাঁকা বেঞ্চে প্রতিদিন ওভাবে বসে থাকতে দেখে ভাবত মাথার কোনও গন্ডগোল আছে মহিলার। কখনও কখনও শিপ্রার হাতে থাকত একটা ডায়েরি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো কাগজ, চিঠিপত্তর। শিপ্রা কখনও সেই চিঠিগুলো পড়ত, কখনও নিজের মনে ডায়েরিতে লিখে যেত টুকরো টুকরো নানান কথা।

অ্যান্ডারসন সাহেবের সঙ্গে শিপ্রার ক্রমশ একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠল। ভদ্রলোক বুঝতেন শিপ্রার জীবনে অনেক সমস্যা আছে। কলকাতায় যেদিন প্রথম আলাপ হয়েছিল, সেদিনই শিপ্রা নিঃসংকোচে বলেছিল নিজের মায়ের কথা, ছেলেবেলার কথা। কার্শিয়াং-এর কথা। সরাসরি নিজের দাম্পত্য জীবনের গভীর সমস্যাগুলো না বললেও, বিচক্ষণ অ্যান্ডারসন সাহেব সমস্যার ব্যাপ্তিটা আন্দাজ করতে পারতেন।

অ্যান্ডারসন সাহেব বিট্টুকে সকালবেলায় স্কুলে দেওয়ার পর নিঃসঙ্গ শিপ্রার সময় কাটানোর সমাধানের জন্য একটা উপায় বার করেছিলেন। বলেছিলেন ওদের স্কুলের প্রাইমারি সেকশনে শিক্ষিকার কাজ করতে। শিপ্রা রাজি না হয়ে বলেছিল, ব্রাদার, আমি চাই না, বিট্টুর আমাকে স্কুলে দেখার অভ্যাসটা তৈরি হোক। কিছুদিন পরে তো আপনি ওকে হস্টেলে নিয়ে নিলে আমিও ফিরে যাব কলকাতায়। তখন ও স্কুলের মধ্যে আমাকে খুঁজে না পেয়ে কষ্ট পাবে।

অ্যান্ডারসন সাহেব শিপ্রার যুক্তিটা উড়িয়ে দিতে পারেননি। তবে শিপ্রার কথা ভেবে বলেছিলেন, আপনি কোনও কিছু একটাতে ইনভলভ্‌ড হোন মিসেস সানিয়াল। কাজে ইনভলভ্‌ড হলে দেখবেন আপনার চারদিকে ঘিরে থাকা সমস্যাটা আর অত গভীর হবে না।

শিপ্রা একটু চিন্তা করে বলেছিল, আমি অবশ্য একটা কাজ করতে পারি। সকালে আমার বাড়িতে যদি কেউ পড়তে আসে আমি পড়াতে পারি।

অ্যান্ডারসন সাহেব খুশি হয়েছিলেন। শিপ্রার অন্তত পড়ানোর আগ্রহ আছে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে শিপ্রার কাছে চা-বাগানের দুটো মেয়েকে পাঠাতে পেরেছিলেন। সরল মেয়ে দুটোর এজন্য শিপ্রার কাছে কৃতজ্ঞতার অবধি ছিল না। ছাত্রী হিসাবেও খুব মনোযোগী ছিল ওরা। ওদের সবচেয়ে আগ্রহ ছিল শিপ্রার কাছে ছোট ছোট ইংরেজিতে কথা বলা শেখায়।

এর মধ্যে একদিন কার্শিয়াং-এ শিপ্রার কাছে এসে হাজির হলেন সরোজ বক্সী। সরোজ বক্সীর সম্পর্কে শিপ্রার একটা মিশ্র ধারণা আছে। কখনও সে সন্দেহ করে দয়াল সান্যালের মোসাহেবের মতো এই লোকটা অনেক ষড়যন্ত্রের কারিগর। কখনও বা মনে হয় লোকটা নিরীহ ভালমানুষ। ব্যক্তিত্বের অভাবে মুখ বুজে দয়াল সান্যালের ক্রীতদাস হয়ে বেঁচে রয়েছে। শিপ্রা অবশ্য সরোজ বক্সীর সামনে নিজের কাঠিন্যটাই বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাই সরোজ বক্সী কলকাতা থেকে এত দূরে শিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দেখেও, শিপ্রা বাড়তি কোনও উষ্ণ অভ্যর্থনা দেখাল না। সরোজ বক্সী একটা বড় খয়েরি খাম বার করে শিপ্রার হাতে দিয়ে বললেন, ম্যাডাম, স্যার পাঠিয়েছেন।

শিপ্রা খামটা খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে অবাক হল। ভেতরে বেশ কিছু টাকা। গরমের

ছুটি পর্যন্ত যতটা টাকা লাগতে পারে তার সবটাই দয়াল সান্যালের কাছ থেকে হিসেব করে শিপ্রা নিয়ে এসেছিল। অযথা অতিরিক্ত টাকা পাঠানোর লোক দয়াল সান্যাল নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে অন্য কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে। না হলে সেই চিরকালের স্বভাবটা। শিপ্রা কেমন আছে লোক পাঠিয়ে দেখতে পাঠিয়েছে।

খামটা পাশে রেখে শিপ্রা ওর ছাত্রী দু'জনের একজনকে ডাকল। সরোজ বক্সীকে এক কাপ চা করে দিতে বলল। সরোজ বক্সী হাত কচলে জিজ্ঞেস করলেন, বিট্টুবাবা কেমন আছে ম্যাডাম?

ভাল, কলকাতার চেয়ে অনেক ভাল। শিপ্রা তির্যক মন্তব্য করল।

স্যার ভাল আছেন ম্যাডাম। গত বুধবার বিলেতে পৌঁছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।

ও আচ্ছা। শিপ্রা নিরুত্তাপ গলায় বলল। দয়াল সান্যালের বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই শিপ্রার। শিপ্রাও চুপ করেই থাকল। সরোজ বক্সী আসলে বুঝতে পারছিলেন না, এর পর কী নিয়ে কথা বলবেন। গরম চা-টা আসার পর সরোজ বক্সী তাড়াতাড়ি ডিশে ঢেলে চা-টা খেয়ে নিয়ে বিদায় নিলেন।

কলকাতা থেকে অতিথি এসে দুপুরে না খেয়েই চলে গেল দেখে শিপ্রার ছাত্রী মেয়ে দুটো খুব অবাক হল। শিপ্রার কাছে আপশোস করল দুপুরে অতিথিকে খাওয়ানোর সুযোগ পেল না বলে। অবশ্য আপশোসটা মেটাবার সুযোগ পেয়ে গেল কয়েক ঘণ্টা পরেই।

বিকেলের দিকে আবার শিপ্রার বাড়িতে এসে হাজির হলেন সরোজ বক্সী। শিপ্রার মন বলছিল সরোজ বক্সী একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। দয়াল সান্যাল এমনি এমনি টাকাটা পাঠায়নি।

বিট্টু সরোজ বক্সীর মতো পুরনো চেনা লোককে দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল। আর সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত কাজটা করে বসল শিপ্রার ছাত্রী দু'জন। বিকেলের দিকে ওরা পড়তে আসে না। বিট্টুর সঙ্গে খেলতে আসে। সেই মেয়ে দুটো সরোজ বক্সীকে ফস করে বলে বসল, স্যার, ডিনার দেন গো।

সরোজ বক্সীর অবশ্য এই ভাঙা ইংরেজিটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। অস্বস্তিতে পড়েছিল শিপ্রাও। ছাত্রীদের সরল আতিথেয়তা দেখানোকে সরাসরি না বলতে পারেনি। সকালে যে-কাঠিন্যটা বজায় রেখেছিল বিকেলে তার খোলসটা একটু একটু করে ভেঙে পড়েছিল।

হরিতলায় কমলেশবাবু কেমন কাজ করছেন সরোজবাবু?

কাজ তো সবে শুরু করেছেন ম্যাডাম। মাস ছয়েক না গেলে বোঝা যাবে না।

শিপ্রা মনে মনে হাসল। শুরু যে কিছু একটা করা গেছে এই যথেষ্ট। এই শুরুটাই তো করা যাচ্ছিল না। তবে দয়াল সান্যাল যেভাবে সন্ধি স্থাপনে রাজি হয়েছেন, 'তোমার পাখিও বাড়ুক আমার ব্যাবসাও বাড়ুক', এটা এত সরলভাবে বিশ্বাস করেনি শিপ্রা। দয়াল সান্যালের দুরভিসন্ধিটা যতদিন না প্রকাশ পায়, এই ব্যবস্থাটাই ভাল।

সরোজ বক্সীও আস্তে আস্তে সহজ হয়ে উঠতে থাকলেন। শিপ্রার কাছে চিরকাল কুণ্ঠিত হয়েই থেকেছেন। তবে ভেতরে ভেতরে শিপ্রার শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, আভিজাত্যকে

শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখে এসেছেন। তবে এরকম একান্তে সরাসরি কথা বলার সুযোগ কখনও হয়নি। শেষ জড়তাটুকু ঝেড়ে ফেলে বললেন, ম্যাডাম, আপনাকে কয়েকটা কথা বলার অনেক দিনের ইচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ হয় না।

শিপ্রা ভুরু দুটো কুঁচকে একবার তাকিয়ে বলল, বলুন।

ম্যাডাম গত এক বছর ধরে যেসব ঘটনা ঘটছে হরির ঝিল নিয়ে...

শিপ্রা সরোজ বক্সীকে থামিয়ে বলে উঠল, অপ্রিয় প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করে আর কি কিছু লাভ আছে সরোজবাবু?

আলোচনা নয় ম্যাডাম। কিছু খুব জরুরি কথা আপনাকে বলার দরকার।

শিপ্রা থমথমে মুখে বলল, বলুন।

গলাটা খাঁকরিয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে সরোজ বক্সী নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন।

ম্যাডাম একেবারে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলছি। আপনার বিয়ের সময় মার্থা মেমসাহেব আমার হাত দুটো ধরে একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, সরোজবাবু, ছেলের বাড়ির তরফে তো আপনি একা। তাই আপনাকেই বলছি। দেখবেন আমার মেয়েটা যেন সুখে থাকে।

শিপ্রা মনে মনে শক্ত হল। একদম অন্যরকম একটা পরিবেশে ধূর্ত লোকটা মিনমিনে গলায় শিপ্রার সবচেয়ে নরম জায়গাটা স্পর্শ করেছে। মায়ের কথা। এই দুর্বল জায়গাটা একবার কবজা করতে পারলে ওকে হাতের মুঠোতে নিয়ে নেবে লোকটা।

মায়ের এই একটা দোষ ছিল। খুব সহজে যাকে-তাকে বিশ্বাস করে ফেলত। দয়ালকেও তো দু'দিনেই বিশ্বাস করে ফেলেছিল।

সরোজ বক্সী ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন। মাথাটা আরও ঝুলিয়ে বলতে থাকলেন, বিশ্বাস করে... হ্যাঁ ম্যাডাম গভীরভাবে বিশ্বাস করে মার্থা মেমসাহেব আমার হাত দুটো ধরে যে-কথাটা বলেছিলেন, সেই কথাটা আমার কানে এখনও বাজে। আমিও মার্থা মেমসাহেবকে কথা দিয়েছিলাম আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

শিপ্রা একটু বাঁকা হেসে গলায় শ্লেষ ঢেলে বলল, সেই চেষ্টাটা আপনি সর্বক্ষণ করে যাচ্ছেন, সেটা আমি দেখতেই পাচ্ছি সরোজবাবু।

আমি জানি ম্যাডাম। খোঁচাটা হজম করে সরোজ বক্সী বললেন, অনেক কিছুর সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু সেগুলোতে জড়িয়ে না পড়লেই ভাল হত। আসলে অনেক ক্ষেত্রেই নিরুপায় হয়ে...

শিপ্রা আবার থামিয়ে দিল সরোজ বক্সীকে।

আপনি যখন নিরুপায়ই, তখন এসব আলোচনা থাক না সরোজবাবু, আপনাকে তো আগেই বললাম।

যে সরোজ বক্সী অনেক কিছুই মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলতে পারেন না, আজ যেন কণ্ঠনালির সেই আগলগুলো চুরমার হয়ে গেছে। আজ না হলে কোনওদিনই নয়। ঈশ্বর এই সুযোগ বোধহয় আর দ্বিতীয়বার দেবেন না।

বিশ্বাস করুন ম্যাডাম পলাশ আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চেয়েছিল। তাই আমি...

পলাশের ব্যাপারে আমি একটা কথাও আলোচনা করতে চাই না সরোজবাবু।

বাধা পেয়েও সরোজ বক্সী হতোদ্যম হলেন না।

শুধু পলাশের ব্যাপারে নয়। আরও অনেক ব্যাপারেই...

শিপ্রা ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকল।

আপনাকে বলছি না সরোজবাবু, আমি এসব কিছুই আলোচনা করতে চাই না। আপনি ভাল করেই জানেন আমার সঙ্গে কী হচ্ছে। আমি আমার যুদ্ধটা একাই লড়ব। স্কুলে অনেক ছোটবেলায় একটা সার নীতিশিক্ষা শিখেছিলাম। যদি উদ্দেশ্য সৎ হয় আর চেষ্টাটা আন্তরিক হয় একাই একটা যুদ্ধে লড়ে জয়ী হওয়া যায়। হরির ঝিলের পাখিগুলোর জন্য সেই সৎ আন্তরিক লড়াইটা আমি লড়ছি। এটা আমি জিতবই। আমি জানি না আপনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। জানি না আপনার স্যার আপনাকে দিয়ে কী বুদ্ধি পাঠিয়েছেন আমাকে বোঝানোর জন্য। কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখবেন, নিজের জায়গা থেকে আমি একচুলও নড়ব না। ভাববেন না এই কার্শিয়াং-এ এসে আছি বলে হরিতলা আমার মন থেকে মুছে গেছে। আমি শুধু আপনাদের একটু সময় দিয়েছি। সত্যি আপনারা কী করেন, কত দূর করেন বিশ্বাস করে আর একবার দেখার জন্য।

শিপ্রা নাগাড়ে এতগুলো কথা বলার পর সরোজ বক্সী কিছুক্ষণের জন্য থেমে যেতে বাধ্য হলেন। তারপর নিজেকে আবার গুছিয়ে নিয়ে বললেন, বেশ ম্যাডাম, এসব নিয়ে আমি আর কিছু বলব না। আমি কিন্তু আপনাকে অন্য একটা কথা বলতে চাইছিলাম ম্যাডাম। মার্থা মেমসাহেব আমার হাত দুটো ধরে বলেছিলেন বলেই আমার মনে হয়েছে আপনাকে এটা বলা দরকার। স্যার কিন্তু ভাল নেই ম্যাডাম।

শিপ্রা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

যে এত লোভী হয় তার ভাল থাকার কথা নয় সরোজবাবু। যে সম্পর্ককে অস্বীকার করে...

আমি স্যারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলছি। যে-ডাক্তারবাবু স্যারকে দেখেন তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

শিপ্রা একটু চমকে উঠল। গলার তেজটা হারিয়ে ফেলে বলল, কী হয়েছে ওর?

স্যারের সমবয়সি একজন বিজনেসম্যান ছিলেন সুজন দত্ত। ভদ্রলোক কিছুদিন আগে দুম করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। স্যারকে ব্যাপারটা খুব বিচলিত করেছিল। উনি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েই ডাক্তার কৈলাস মুখার্জির কাছে বিলেত যাওয়ার আগে চেক-আপ করাতে গিয়েছিলেন।

ডক্টর কৈলাস মুখার্জি? ওর সঙ্গে তো খুব খাতির!

হ্যাঁ ম্যাডাম। কৈলাস মুখার্জি চেক-আপ করে সব ঠিক পেয়েছেন...

তা হলে...

কিন্তু ওঁর কিছু একটা সন্দেহ হওয়াতে উনি সঙ্গে করে অন্য একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার হেমন্ত পাঠক।

হেমন্ত পাঠক? এরকম কারও নাম তো শুনিনি।

হ্যাঁ ম্যাডাম, মনের ডাক্তার।

সাইকায়াট্রিস্ট?

হ্যাঁ, নার্ভ টার্ভ নিয়েও কাজকর্ম করেন। উনি বলেছেন স্যারের মনে গভীর অসুখ বাসা বেঁধেছে এবং তার ফল মারাত্মক হতে পারে।

সরোজ বক্সী দেখলেন শিপ্রার মুখে কাঠিন্যতার রেখাগুলো মুছে গিয়ে একজন উদ্বিগ্ন স্ত্রীর রেখাগুলো ক্রমশ ফুটে উঠছে। গলাটা আরও নামিয়ে নিয়ে সরোজ বক্সী বললেন, হেমন্ত পাঠক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান ম্যাডাম।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ ম্যাডাম। বলেছেন এ-ব্যাপারে পেশেন্টের মনের খবর সবচেয়ে কাছের লোকই... মানে স্ত্রীর কথা বলতে চেয়েছেন।

আপনার স্যার রাজি হয়েছেন?

সরোজ বক্সী একটু যেন শিউরে উঠলেন।

না ম্যাডাম, এসব খুব গোপনে হয়েছে। আমারও জানার কথা নয়। কিন্তু জেনে গেছি। স্যার তো প্রথমত কিছুতেই স্বীকার করতে চাইছেন না যে, তাঁর মনে কোনও অসুখ আছে। আর দ্বিতীয়ত, আপনার সঙ্গে ডাক্তারের কথা বলা তো একদম নাকচ করেই দিয়েছেন। আমি কিন্তু ম্যাডাম কথাগুলো আপনাকে জানানো একান্ত কর্তব্য বলে মনে করেই আপনাকে বললাম।

থ্যাঙ্কস।

শিপ্রা চুপ করে গেল। এবং গভীর চিন্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সন্ধে মুড়িয়ে রাত বাড়ছিল। শিপ্রার ছাত্রীরা যত্ন করে সরোজ বক্সীকে খাওয়াল। খাওয়ার সময় শিপ্রা পাশে থাকল না, খাওয়া শেষ করে সরোজ বক্সী শিপ্রার সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে শিপ্রা একটা কার্ডিগান আর সোয়েটার এনে সরোজ বক্সীর হাতে দিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী আর মেয়ের জন্য।

পরের দিন বিট্টুর স্কুলে এসে প্রিন্সিপাল অ্যান্ডারসনকে শিপ্রা বলল, ব্রাদার, কয়েকদিন বিট্টুকে, মানে প্রীতমকে... ডর্মিতে একটু রাখার ব্যবস্থা করবেন?

অ্যান্ডারসন সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী প্রবলেম হল মিসেস সানিয়াল?

না মানে, কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় যেতে হবে।

ও.কে, আপনি যান। প্রীতমকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। আমি ছুটি গ্রান্ট করে দিচ্ছি।

আসলে আমি সেটা চাইছিলাম না। ও তো এখন বেশ সেট্‌ল করে গেছে। বন্ধুবান্ধবও হয়ে গেছে। তা ছাড়া ওকে তো একদিন বোর্ডিং-এ থাকতেই হবে।

অ্যান্ডারসন সাহেব চিন্তিত হয়ে বললেন, আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম, এত ছোট্ট বয়সে ডর্মিতে রাখার কোনও প্রভিশন আমাদের নেই। আপনারা একটা অসুবিধায় পড়েছিলেন বলে এই স্পেশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছিলাম।

শিপ্রা মুখটা করুণ করে বলল, প্লিজ ব্রাদার, আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই না কলকাতায়। অথচ আমাকে যেতে হবেই।

বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রীতম পারবে কি? ওর কিন্তু একজনও ক্লাসমেট ডর্মিতে থাকে না। আর আপনি তো জানেনই হস্টেল লাইফে কতটা নিজের ব্যাপারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হয়। ওর অনেক কিছু কাজই নিজে করতে হবে।

আমি ওকে তৈরি করেছি ব্রাদার। একটু একটু করে এই ক'দিনে ওকে তৈরি করেছি। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন। চার-পাঁচ দিন পরেই আমি চলে আসব।

আপনি আমাকে কঠিন সমস্যায় ফেললেন মিসেস সানিয়াল। এনি ওয়ে আমাকে দুটো দিন সময় দিন। আমি ওয়ার্ডেনদের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

বিট্টুকে বোর্ডিং-এ রেখে কলকাতায় ফিরে যাবে, এ কথাটা বিট্টুকে কিছু জানায়নি শিপ্রা। কিন্তু অ্যান্ডারসন সাহেবের কাছে অল্প আশ্বাস পেয়ে সেদিন থেকেই বিট্টুকে একটু একটু করে ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করল শিপ্রা।

তোর মনে আছে বিট্টু, আমি যখন কয়েকদিন তোকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম, তার আগে তোকে কী কী বলে গিয়েছিলাম?

বিট্টু মায়ের আঙুলগুলো একটা একটা করে ধরে গুনতে গুনতে বলল, হ্যাঁ মাম্মি। দুষ্টু না করতে, হরিহরকাকার কথা শুনতে, পরিষ্কার করে খেয়ে নিতে...

শিপ্রা বিট্টুর চুলে আলতো করে বিলি কাটতে কাটতে বলল, আমি জানি, আমার বিট্টুসোনা খুব লক্ষ্মী ছেলে হয়ে ছিল।

বিট্টু ঘুরে শিপ্রার গলাটা জড়িয়ে ধরল, আমি আর কখনও পাখি মারব না মাম্মি!

জানি সোনা, তুই আর কখনও পাখি মারবি না।

মনে মনে বেশ কয়েকবার মহড়া দিয়ে শিপ্রা আসল কথায় এল।

তুই তখন যেমন লক্ষ্মীছেলে হয়ে ছিলি সেরকম আরও কয়েকদিন তোকে থাকতে হবে। আমাকে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় যেতে হবে।

বিট্টু আরও জোরে আঁকড়ে ধরল শিপ্রার গলাটা।

এখানে একা একা আমি থাকতে পারব না মাম্মি! ভয় করবে।

ভয়? কীসের ভয়? তুই তো আর একা একা থাকবি না। স্কুলের ডর্মিটরিতে সবার সঙ্গে থাকবি। কত বন্ধুর সঙ্গে থাকবি। পড়াশুনো করবি। খেলবি। কত মজা হবে। দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। তারপর দেখবি আমি আবার চলে এসেছি। তখন আর ডর্মি ছেড়ে মাম্মির কাছে আসতেই ইচ্ছে করবে না। আমিও যখন তোর মতো ছোট্ট ছিলাম, আমিও বন্ধুদের সঙ্গে...

গলায় বাষ্প লুকিয়ে রেখে শিপ্রা বিট্টুকে বোঝাতে থাকল। একসময় ঘুমিয়ে পড়ল বিট্টু। সেই রাতে শিপ্রার আর ঘুম হল না। সারা রাত ধরে ছেলের উষ্ণতাকে ছুঁয়ে

দেখল। পরের দিন সকালে যখন বিট্টু ঘুম থেকে উঠল, মনে হল ছেলেটার মধ্যে বয়সটা অনেক বেড়ে গেছে।

শিপ্রার অনুরোধটা প্রিন্সিপাল অ্যান্ডারসন রাখতে পারলেন। হস্টেল ওয়ার্ডেনদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সবচেয়ে জুনিয়র ডর্মিতে বিট্টুকে জায়গা করে দিলেন। শিপ্রা ফিরে এল কলকাতায়।

৩৪

ডক্টর হেমন্ত পাঠক স্লিপে মিসেস শিপ্রা সান্যাল নামটা দেখেই অনুমান করেছিলেন ইনিই দয়াল সান্যালের স্ত্রী। শিপ্রাকে দেখে একটু দ্বন্দ্বে পড়লেন। দয়াল সান্যালের স্ত্রী যে তার থেকে বয়সে এতটা ছোট ভাবেননি। তবে সৌন্দর্যের সঙ্গে ঝকঝকে ব্যক্তিত্বটা দেখে বুঝলেন, দয়াল সান্যালের চিকিৎসার জন্য শিপ্রা সান্যালের সহযোগিতা একান্ত দরকার।

শিপ্রা সরোজ বক্সীকে দেখিয়ে বলল, ডক্টর পাঠক, আমার হাজব্যান্ডের সম্পর্কে পুরোটা জানতে হলে মিস্টার বক্সীরও থাকার দরকার। এমন অনেক জায়গা আছে যেগুলো আমার চেয়ে উনি ভাল জানেন। আর আপনার যদি খুব পার্সোনাল কিছু জানার থাকে...

তখন আমি মিস্টার বক্সীকে আমাদের এক্সকিউজ করতে বলব। আপাতত চলুন সবাই মিলে সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলি।

সরোজ বক্সী একবার সতর্ক করে উঠলেন, ডাক্তারবাবু আমরা কিন্তু একেবারে গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ডক্টর পাঠক চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে বললেন, আমি জানি। মিস্টার সান্যালও তো এখন ম্যাঞ্চেস্টারে? তাই না?

হ্যাঁ।

ওয়েল মিসেস সান্যাল, উনি যে-রোগে ভুগছেন তার সবচেয়ে বড় সমস্যা, এই ধরনের পেশেন্টরা একদম আর্লি স্টেজে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কেসে বিশ্বাসই করেন না যে, তাঁদের মনের মধ্যে কোনও অসুখ বাসা বেঁধেছে। তাই জন্য এঁদের কাছ থেকে কোনও কো-অপারেশন পাওয়া, ট্রিটমেন্ট করা খুব ডিফিকাল্ট। ডক্টর মুখার্জি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে না এলে, আমি শিয়োর, উনি আমার কাছে বা অন্য কোনও সাইকায়াট্রিস্টের কাছে কোনওদিন যেতেন না। আমার কাছে এসেও উনি ছটফট করেছেন, নামমাত্র কো-অপারেট করেছেন কিন্তু তার মধ্যে থেকেই আমার অভিজ্ঞতায় যেটা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি। সে কারণেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

শিপ্রা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, উনি কি কোনও অ্যাকিউট প্রবলেমে ভুগছেন?

বুঝিয়ে বলছি আপনাদের। তার আগে আপনি বলুন রিসেন্ট টাইমসে ওঁর বিহেভিয়ারিয়াল প্যাটার্নে কি কোনও চেঞ্জ দেখছেন আপনি?

শিপ্রা একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আমার বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই ওঁকে আমি একটু একটু করে পালটে যেতে দেখেছি।

এটা কিন্তু খুব স্পেসিফিক অ্যানসার হল না মিসেস সান্যাল। আমি বলছি রিসেন্ট টাইমসের কথা।

ওঁর রিসেন্ট টাইমসের সব কিছুই একটু একটু করে বিল্ডআপ করেছে আমার বিয়ের সময় থেকে।

ডক্টর পাঠক শিপ্রার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি প্রথম থেকেই বলুন। আপনি ওঁকে যেমন দেখেছিলেন আর এখন যেমন দেখছেন। হি নিডস কাউন্সেলিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম মেডিসিন। মেডিসিনস ফর হিজ নার্ভস, আমি জানতাম আমার প্রেসক্রিপশন প্যাডে কোনও ওষুধ লিখে দিলে উনি সেগুলো খাবেন না। ডক্টর মুখার্জি ওয়াজ কাইন্ড এনাফ যে, আউট অফ দ্য প্র্যাকটিস গিয়ে উনি ওঁর প্রেসক্রিপশনের মধ্যে আমার ওষুধগুলো লিখে দিয়েছেন। এনি ওয়ে...

শিপ্রা একটু দম নিয়ে শুরু করল।

ইটস আ কমপ্লিকেটেড বিগিনিং ডক্টর। আই অ্যাম আ ডটার অফ অ্যান অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রস্টিটিউট। ওয়েলদি। মাই মাদার হ্যাড প্রোটেকটেড মি ফ্রম অল দ্য ইভিলস অফ হার প্রফেশন অ্যান্ড প্রোভাইডেড মি দ্য বেস্ট এডুকেশন...

ডক্টর পাঠক তন্ময় হয়ে শুনতে থাকলেন। এত দৃঢ়তার সঙ্গে, স্বচ্ছন্দে একজন নিজের জীবনের কথা অকপটে বলে যাচ্ছে যে, মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। শিপ্রার কথার ফাঁকে ফাঁকে নোটস নিতেও মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছিলেন ডক্টর পাঠক। একইরকমভাবে মুগ্ধ হচ্ছিলেন সরোজ বক্সী। টানটান ইংরেজিতে শিপ্রা যে-কথাগুলো বলে যাচ্ছে তার প্রতিটা দাঁড়ি, কমা, ফুলস্টপ সরোজ বক্সীর জানা। তবু যে-স্বামী নিরন্তর তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে, তাকে সুস্থ করার চেষ্টায় নিজের কর্তব্যে এতটুকু ঘাটতি নেই।

শিপ্রার নিজের কথা পুরো বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডক্টর পাঠক চেম্বারের অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে কফি দিতে বললেন। তারপর সরোজ বক্সীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনিও কিছু বলবেন বলেছিলেন।

সরোজ বক্সী এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, হে ঈশ্বর, জীবনে অন্তত একদিন পাশে বসা মেয়েটার মতো সব অকপটে বলার সৎ সাহস দাও। কিছু কথা বলার সময় মরমে হয়তো মরে যেতে হবে, কিন্তু তবু আমার জিভ যেন আজ আটকে না যায়।

সান্যাল সাহেব প্রথম জীবনে মগন শেঠ বলে এক মারোয়াড়ির গদিতে চাকরি করতেন। আমি সেখানে তারও আগে থেকে চাকরি করতাম। আমার যেখানে লক্ষ্য ছিল গদিতে আর একটু ওপরে ওঠার, সান্যাল সাহেবের সেখানে লক্ষ্য ছিল মগন শেঠের

গদিটাই। ব্যাবসা করার এই তীব্র ইচ্ছেটা নিয়েই উনি হরিতলা কটন মিলের মালিক হলেন। ওঁর ডাকে আমি মগন শেঠের গদি ছেড়েছিলাম, উনি আমাকে বিশ্বাস করেন, ভরসা করেন, একটু একটু করে কী করে যে ওঁর প্রতিটা কাজে জড়িয়ে গেলাম জানি না। আমার ওপর ওঁর একটা অদ্ভুত নির্ভরতা আছে, আবার উনি আমার অন্নদাতাও বটে।

ডক্টর পাঠক দ্রুত বুঝে নিলেন এই সরোজ বক্সী লোকটা সদিচ্ছা নিয়েও শিপ্রার মতো সব খুলে বলার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারছে না। গৌরচন্দ্রিকাতেই আটকে আছে। এটাও মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা দিক। ডক্টর পাঠক সরোজ বক্সীকে কোনও চাপ দিলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন দরকার হলে একান্তে কথা বলবেন।

সরোজ বক্সী এভাবে যতটা পারলেন বললেন। তারপর ডক্টর পাঠক নিজের বক্তব্য বলতে শুরু করলেন।

ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা দু'জনে একটা মানুষের ব্যক্তিত্বকে জানার জন্য প্রায় সবটুকুই বলেছেন। এবার আমি বলি ওঁর সমস্যার কথা। ডক্টর মুখার্জি ওঁকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন দু'-একটা সাধারণ সিম্পটমকে মাথায় রেখে। তার প্রথমটা হল অ্যামনেশিয়া অর্থাৎ ভুলে যাওয়া। আর দ্বিতীয়টা হল ডিমেনশিয়া অর্থাৎ খানিকটা উন্মাদের মতো আচরণ করা। এই ভুলে যাওয়ার প্রকৃতিটা কী? না উনি হঠাৎ কিছু নাম ভুলে যেতেন এবং যাদের নাম ভুলে যেতেন তাদের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতেন। ওঁর বাড়ির চাকর, ড্রাইভাররা সেই প্রতিহিংসার কোপে পড়েছেন। এর পর মিসেস সান্যাল আপনি যা বললেন, ওঁর চরিত্রের দিকগুলো, যেমন অকারণে সন্দেহবাতিক, নিজের স্ত্রীকে গুপ্তশত্রু ভাবা, দুমদাম সিদ্ধান্ত নেওয়া, হঠাৎ মুড স্যুইং করা... এগুলো সবই মাথার একটা রোগের পূর্বলক্ষণের সঙ্গে মিলে যায়। রোগটার নাম অ্যালঝাইমার্স।

অ্যালঝাইমার্স? আর ইউ শিয়োর ডক্টর?

সরোজ বক্সী এই রোগের নামটা আগে শোনেননি। তবে শিপ্রা যেভাবে বিস্ফারিত চোখে ডক্টর পাঠকের দিকে তাকিয়ে আছে তাতে সরোজ বক্সী দুটো জিনিস বুঝতে পারলেন। এক, রোগটা জটিল; আর দুই, রোগটা মারাত্মক।

ডক্টর পাঠক শিপ্রাকে খানিকটা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন।

ওভাবে কনফার্ম করে বলার মতো সব ক্লিনিক্যাল এভিডেন্স আমার কাছে নেই। ডক্টর মুখার্জি আপনাদের পুরনো ফিজিশিয়ান। উনিও আপনাদের অনেক কিছু জানেন। উনি মিস্টার সান্যালকে নিয়ে আসার আগে আমাকে কিছু কিছু বলেছিলেন, ওঁকে দেখার পর আমার সন্দেহটা ঘন হয়েছিল, আজ আপনাদের সঙ্গে কথা বলার পর কনফার্মেশনের আরও ক্লোজে চলে গেলাম। তবুও মনের ব্যাপারে কনফার্ম হওয়ার আগে আরও অনেক ইনভেস্টিগেশন দরকার। এমনিতে ষাট-পঁয়ষট্টির আগে অ্যালঝাইমার্স প্রায় দেখাই যায় না। মিস্টার সান্যালের মতো পঞ্চাশের কমবয়সিদের অ্যালঝাইমার্স তাই রেয়ার। তবে রেয়ার বলেই পসিবিলিটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সিম্পটমগুলো আমার অ্যালার্মিং-ই মনে হয়েছে। বিশেষ করে ওঁর দীর্ঘ জীবনের কথা চিন্তা করে।

এর ট্রিটমেন্ট কী ডক্টর?

আনফরচুনেটলি এর কোনও ট্রিটমেন্ট নেই। এটা প্রায় ইরিভারসিবল প্রসেস। তবে আপনি এখনই এত ঘাবড়ে যাবেন না। আপনাকে খুব স্ট্রং মনে হচ্ছে বলে খোলাখুলি বললাম। এর অনেক স্টেজ আছে। অনেকের ক্ষেত্রে সারা জীবন ব্যাপারটা মাইল্ড স্টেজেই রয়ে যায়...

শিপ্রা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে উঠল, ডক্টর, এটা কি হেরিডিটারি?

ওয়েল, চান্সেস আর দেয়ার। জিন ফ্যাক্টর একটা থেকেই যায়...

শিপ্রা হতাশ হয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। শিপ্রাকে প্রথমে যতটা শক্ত মনে হয়েছিল ডক্টর পাঠকের তাতে করে এভাবে ভেঙে পড়াটা উনি আশা করেননি, শিপ্রাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। মিসেস সান্যাল, আপনি ভেঙে পড়বেন না। আমি এক্সট্রিম পসিবিলিটির কথা বললাম। হয়তো আর্লি ট্রিটমেন্টে উনি রেসপন্স করবেন। এখনই ডোন্ট গিভ আপ।

আমাকে কী করতে হবে ডক্টর?

ডক্টর পাঠক আবার নিজেকে একটু গুছোলেন।

ওয়েল, মেন্টাল পেশেন্টদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ধৈর্যর পরীক্ষা দিতে হয় বাড়ির লোকদের, কাছের মানুষদের। পেশেন্টের সব ট্যানট্রমস, অবুঝ অবোধ্য ব্যবহার মুখ বুজে সহ্য করতে করতে মনে হয় তারা বোধহয় নিজেরাই মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে যাবে। তাই সহ্য আপনাকে করতে হবেই, ধৈর্যও ধরতে হবে। উনি যা করছেন দুম করে সব বন্ধ করানো যাবে না। বলটাকে গড়াতে দিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে কেয়ারফুলি বলটা থামাতে হবে। আর দরকার ট্রিটমেন্ট। আমার কাছে করান বা অন্য কোথাও...

ডক্টর পাঠক আরও অনেক কথা বলেছিলেন কিন্তু সরোজ বক্সী খেয়াল করছিলেন শেষের দিকে কথাগুলো যেন শিপ্রা শুনেও শুনছিল না। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল।

৩৫

ডক্টর পাঠকের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সরোজ বক্সী শিপ্রার মানসিক অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন শিপ্রা ঠিক সুস্থ নেই। তাই ঠিক করলেন, শিপ্রার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে যাবেন। শিপ্রাও কোনও আপত্তি করল না। সরোজ বক্সী ভেবেছিলেন বাড়ির গেট অবধিই যাবেন। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে শিপ্রা ডেকে নিল ওঁকে।

সরোজবাবু আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

বলুন ম্যাডাম।

আপনি ড্রইংরুমে একটু বসুন, আমি আসছি।

মিনিট দশেক অন্দরমহলে ঘুরে এসে শিপ্রা সরোজ বক্সীর মুখোমুখি বসে বলল, আমি জানি আপনি আপনার স্যারের খুব অনুগত, তাই আপনাকে বিশ্বাস করতেই

হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আপনি ছাড়া এ-ব্যাপারে বিশ্বাস করার... যাক গে... আপনাকে একটা কাজ করতে হবে সরোজবাবু।

সরোজ বক্সী হাত কচলে অল্প ঝুঁকে বললেন, বলুন ম্যাডাম।

হরির ঝিলের দু'একর জমি আর বাংলোটা আপনাকে বিক্রি করে দিতে হবে আর এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ওটা কোনওদিন আর আপনার স্যারের হাতে না আসে।

সরোজ বক্সী চমকে উঠলেন। এ তো অসম্ভব কাজ। প্রথমত, এ কাজটা করাই যাবে না, কারণ দলিল নিয়ে সমস্যা আছে। আর দ্বিতীয়ত, বিলেত থেকে ফিরে দয়াল সান্যাল যদি জানতে পারেন সরোজ বক্সী এরকম কোনও কাজ করার এক আনাও চেষ্টা করেছে, একদিনেই হরির ঝিলে পলাশ সেন আর মহেশের পাশে তার লাশটাও চলে যাবে।

সরোজ বক্সীর বিপর্যস্ত চোখমুখের অবস্থা দেখে শিপ্রা বলল, আমি যেটা চাইছি, সেটা আমার জন্য নয়, আপনার স্যারের ভালর জন্যই।

সরোজ বক্সী এই কঠিনতম কাজটা এড়ানোর ক্ষীণ একটা রাস্তা দেখতে পেলেন। কোনওরকমে বলার চেষ্টা করলেন, ডাক্তারবাবু বলছিলেন না যেমন চলছিল তেমনই চলুক। ওই জমিটায় তো ম্যাডাম...

একটা কথা বলব আপনাকে? জীবনে কোনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ হঠাৎ করে একটা জিনিস কে যেন আমার মধ্যে বলছে, 'হরির ঝিল আমাদের জায়গা'। যে-হরির ঝিলের পাশে কারখানাটা করতে গিয়েছিলেন মিস্টার ম্যাকার্থি, উনি শেষ করতে পারেননি এবং শেষ বয়সে ওঁর কী হয়েছিল জানেন, মাথার একটা অদ্ভুত রোগ। হয়তো অ্যালঝাইমার্স। লোকে আমার মাকে চিরকাল দোষ দিয়ে গেছে। বলেছে মিস্টার ম্যাকার্থিকে মা ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল ওই সম্পত্তিটার লোভে। কিন্তু মিস্টার ম্যাকার্থি তার অনেক আগেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। আর কেউ ওঁর খোঁজ পায়নি। এর পর দয়াল সান্যাল কারখানাটা চালু করল। আস্তে আস্তে দেখুন যেই ও হরির ঝিলের দিকটায় এগোতে চাইছে ওকে একটা রোগ ধরল। হরির ঝিলটা অভিশপ্ত সরোজবাবু। জানি ব্যাপারটা হয়তো কাকতলীয়। কিন্তু কিছু ব্যাপার মনে এমন খটকা ধরিয়ে দেয়!

সরোজ বক্সীর চোখেও উদ্বেগটা ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকল।

ম্যাডাম আপনি এত চিন্তা করছেন? হয়তো...

চিন্তা আমার একটাই কারণে। বংশগত রোগ। বিট্টু তো ওরই ছেলে।

একজন মায়ের এই উদ্বেগকে প্রশমিত করার ভাষা সরোজ বক্সীর জানা নেই। এই পরিস্থিতিতে বলার মতো কোনও কথা তিনি খুঁজে পেলেন না। শিপ্রা চিন্তায় নিজের মধ্যে ডুবে আছে। একসময় সংবিৎ ফিরে বলল, আমার পরশু দার্জিলিং মেলে একটা টিকিটের ব্যবস্থা করুন।

আপনি ফিরে যাবেন ম্যাডাম?

হ্যাঁ, যতদিন ও বিলেতে আছে, আমি এখানে থেকে কী করব? যদি ওর জন্য ফিরে আসতেই হয়, বিট্টুকে নিয়েই হয়তো চলে আসব, ও ফিরে এলে। যে ক'দিন বিট্টু ওই পরিবেশে ব্রাদার অ্যান্ডারসনের কাছে পড়ছে পড়ুক।

সরোজ বক্সী উসখুস করে বললেন, ম্যাডাম, এখন বোঝাই যাচ্ছে সাহেবের অনেক কিছু মাথার রোগ থেকে হচ্ছে, তখন আপনাকে মনে হয় আমি যা যা জানি বলে দেওয়াই উচিত।

শিপ্রা একটা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে বলল, বলুন।

ম্যাডাম হরির ঝিলে কিন্তু ঠিক পাখিদের নিয়ে কাজ হচ্ছে না।

শিপ্রার মুখের রেখাগুলো অল্প বদলে গেল। লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আমিও এটাই আশঙ্কা করেছিলাম সরোজবাবু। যে লোকটা যে-কোনও কিছুর বিনিময়ে ওই জমিটা আর বাংলোটা পেতে চায়, সে হঠাৎ করে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেল, এটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। তবু আমি খটকাটা মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিলাম। ভাবছিলাম, দেখি না কোন দিকে যায় ব্যাপারটা। ঠিক সময়ে... যাই হোক, কী করছেন আপনারা ওখানে?

সরোজ বক্সী খানিকটা লজ্জায় মাথা নিচু করে বললেন, অদ্ভুত একটা চেষ্টা চলছে ম্যাডাম। তুলো চাষ করার।

তুলো চাষ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল শিপ্রা।

হ্যাঁ ম্যাডাম, তুলো চাষ।

ওই দু'একর জমিতে কতটা তুলো আপনারা চাষ করতে পারবেন সরোজবাবু?

আসলে ওখানে তুলো চাষের গবেষণা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তুলো ফলে না। স্যার সেই চেষ্টাই করছেন। তবে ম্যাডাম এই মুহূর্তে এমন কিছু হচ্ছে না যাতে হরির ঝিলে পাখিরা বিপন্ন হতে পারে।

আপনাকে একটা কথাই বলব সরোজবাবু। মায়ের কথা বলেছিলেন না... আপনার হাতটা বিশ্বাস করে ধরেছিলেন... আমিও আপনাকে সেই বিশ্বাসটাই করলাম।

আর একটাও ব্যাপার ছিল ম্যাডাম, জমিটার দলিল নিয়ে...

থাক সরোজবাবু। যত শুনব মনে অশান্তি বাড়বে।

সরোজ বক্সী আর কথা বাড়ালেন না। শিপ্রার কাছে বিদায় চেয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরলেন।

রবার্ট যে-বারে চাকরি করে সেখানে আজ সন্ধেবেলায় দ্বিতীয়বার এল শিপ্রা। গেটের মুখে সেই লম্বা-চওড়া পাকানো গোঁফের দারোয়ানটাই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম যেদিন এসেছিল, ঢোকার সময় বাধা দিয়ে শিপ্রার কাছে ধমকানি খেয়েছিল লোকটা। শিপ্রার ব্যক্তিত্ব এমনই, শিপ্রার চেহারা আর সেই ধমকানি কোনওটাই ভোলেনি লোকটা। আজ একা শিপ্রাকে ঢুকতে দেবে কি দেবে না এই ইতস্ততার মধ্যেই শিপ্রা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার বদলে দারোয়ানটাকেই অনুরোধ করল, রবার্ট গোমসকে একটু বাইরে ডেকে দেবেন, প্লিজ!

বাইরে বেরিয়ে এসে শিপ্রাকে দেখে রবার্ট অবাকই হল। যদিও শেষবার এখানে এভাবেই দেখা হয়েছিল কিন্তু তারপর আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি।

কেমন আছিস রবার্ট?

ভাল। নিচু গলায় রবার্ট বলল।

রবার্ট শিপ্রাকে রেস্তোরাঁর ভেতরে ডাকল না। বরং রেস্তোরাঁর মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলা এড়াতে ফুটপাথ ধরে এগোতে এগোতে বলল, আয় এদিকে একটু ফাঁকায় দাঁড়াই।

কিছুটা এগিয়ে একটু নিরিবিলি জায়গা পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে রবার্ট জিজ্ঞেস করল, তোর কী খবর শ্যারন?

একটা চাপা শ্বাস ফেলে শিপ্রা বলল, ভাল। আমি এখন কার্শিয়াং-এ থাকি।

কার্শিয়াং-এ? হঠাৎ?

বিট্টুকে ওখানে সেট্‌ল করে দেব ভাবছি।

নিজের ছেলে জিমির কথা ভেবে রবার্টের মনটা আর একবার ভারী হল। ছেলেটাকে এখনও ভাল কোনও স্কুলে ভরতি করতে পারল না, স্রেফ পয়সার টানাটানিতে। হতাশাটা ভুলতে সিগারেটে লম্বা টান দিল রবার্ট।

তুই ক্যাথি অ্যান্টির কোনও খবর পেলি?

শিপ্রার দিকে একটা শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রবার্ট উদাস গলায় বলল, পেয়েছি।

শিপ্রার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পেয়েছিস? কোথায় আছে আন্টি?

রবার্ট মাথা নাড়ল।

মাম্মি একটা চিঠি দিয়েছে। শুধু লিখেছে যেখানে আছে খুব শান্তিতে আছে। ভাল আছে। টাকাপয়সার কোনও প্রয়োজন নেই। তুই মাম্মিকে কত টাকা দিয়েছিলি রে শ্যারন?

শিপ্রার মুখটা নিভে গেল।

সেরকম কিছু নয় রে। মানে আই মিন... এমন কিছু টাকা নয় যে, আন্টি বাকি জীবন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে। আসলে আন্টির চলে যাওয়ার পিছনে আরও অনেক কিছু কারণ আছে। সব হয়তো তুই জানিস না। জানলে আমাকে...

এখন একটু কাজের চাপ ছিল রে! আমাকে এগোতে হবে। তুই রবিবার সকালে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে আসবি?

ক্যাথিড্রালে? কেন?

না, এমনি। হাতে সময় নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলা যেত।

আমি কাল কার্শিয়াং-এ ফিরে যাচ্ছি। পরের বার যখন আসব নিশ্চয়ই যাব।

আমি তা হলে এগোই।

তোর সঙ্গে আর একটা কথা ছিল।

রবার্ট দ্রুত আর একবার ঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, বল।

আমার হাজব্যান্ড দয়াল সান্যাল সন্ধেবেলাতে মাঝে মাঝে পার্ক স্ট্রিটে রেস্তোরাঁতে খেয়ে যায়। কোথায় তুই জানিস?

আমাদের এখানে নয় এটুকু তোকে বলতে পারি। বড় বড় লোকেরা যারা রেগুলার আসে তাদের প্রত্যেককেই চিনি। এক-আধবার কখনও সখনও হলে অবশ্য আলাদা কথা।

তুই জুলি বলে কোনও মেয়েকে চিনিস?

জুলি? কে জুলি?

খুব সম্ভবত একজন ফ্লাইং কল গার্ল।

তুই তো জানিস এখানে সন্ধের পর ওরকম অনেক মেয়েই ঘুরে বেড়ায়। ওদের নামটামও ঠিক থাকে না। আমার তো জুলি বলে কোনও কল গার্লের কথা অফ হ্যান্ড মনে পড়ছে না। এনি ওয়ে... কী হয়েছে?

না কিছু নয়। তুই এগো, তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে আসার আধঘণ্টার মধ্যে ফোনটা এল। এই উড়ো ফোনের গলাটা এখনও ভোলেনি শিপ্রা। লোকটা যে গলাটাকে লুকোনোর সবরকম চেষ্টা করে সে ব্যাপারে একদম নিশ্চিত শিপ্রা। কিন্তু লোকটা গলাটাকে লুকোনোর চেষ্টা করে কেন? গলাটা কি খুব পরিচিত কারও? শিপ্রা পরিচয়টা জেনে যাবে বলে ভয় পায়?

ম্যাডাম ফিরে এলেন?

শিপ্রার ভেতরটা মুহূর্তের জন্য ছ্যাঁৎ করে উঠল। ফিরে এলেন মানে বিট্টু ওখানে এখন একা আছে এটা লোকটার জানা। যদিও অ্যান্ডারসন সাহেবের স্কুলটা যথেষ্ট সুরক্ষিত তবুও মায়ের অবুঝ মনটাকে শান্ত করে ওঠাতে পারল না শিপ্রা।

কী চান আপনি?

শিপ্রার কাঁপা গলাটা শুনে লোকটা বলল, আমি তো বলেছি আমি আপনার ভাল চাই। যে-অন্যায়টা দয়াল সান্যাল আমার সঙ্গে করেছে আমি চাই সেই অন্যায়গুলো যাতে আর কারও সঙ্গে করতে না পারে। আমি তাই যেটুকু জানি সময়ে সময়ে আপনাকে বলে সাবধান করে দিতে চাই।

শিপ্রা খুঁটিয়ে লোকটার প্রতিটা উচ্চারণ শুনে বোঝার চেষ্টা করছিল, লোকটা কে হতে পারে। কখনও কখনও মনে হয়েছে, লোকটা সরোজ বক্সী। কিন্তু বিগত কয়েকদিন সরোজ বক্সীর সঙ্গে যেভাবে কথা হয়েছে, তাতে মনে হয় না সরোজ বক্সীর নিজেকে লুকিয়ে এভাবে উড়ো ফোন করার আর কোনও দরকার আছে। শিপ্রা গলা শক্ত করে বলল, এসব আমাকে বলে আপনার কী লাভ?

শান্তি ম্যাডাম, মনের শান্তি। যে-লোকটা আমার সর্বনাশ করে দিব্যি পার পেয়ে গেছে, একটার পর একটা অন্যায় করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করছে, সেই লোকটাকে আটকানোই আমার উদ্দেশ্য।

আপনার যদি তাই উদ্দেশ্য, তা হলে আপনি এগিয়ে আসছেন না কেন? এভাবে নিজেকে লুকিয়ে...

আপনাকে তো বলেছি ম্যাডাম, আমি এখনও অতটা সাহসী হয়ে উঠতে পারিনি। আমার একটা পরামর্শ শুনবেন?

লোকটাকে আরও বোঝা দরকার। লোকটা সত্যিই শিপ্রার শুভানুধ্যায়ী কিনা বোঝা দরকার। নাকি লোকটার অন্য কোনও মতলব আছে? শিপ্রা সরাসরি 'বলুন' না বলে চুপ করে থাকল।

ম্যাডাম ভাল করে চিন্তা করে দেখুন, কাল যদি দুম করে আপনি মারা যান তা হলে আপনার নামে সম্পত্তিগুলোর কী হবে? আপনার ছেলে নাবালক। আপনার সব সম্পত্তি আপনার স্বামীর হবে। সম্পত্তির দখল নেওয়া তো পৃথিবীর সহজতম উপায়।

দয়াল সান্যাল এত দূর যেতে পারে, এতটা চিন্তা করে দেখেনি শিপ্রা। ফোনের ওপ্রান্তের লোকটার কথা ভুলে নিজের মধ্যে হারিয়ে গেল শিপ্রা। সংবিৎ ফিরল যখন ওপ্রান্তের লোকটার ক্রমাগত ডাক শুনতে পেল।

হ্যালো ম্যাডাম, শুনছেন... হ্যালো ম্যাডাম...

শিপ্রা ফোনটা ছেড়ে দিল।

৩৬

চারদিন কলকাতায় কাটিয়ে কার্শিয়াং-এ ফিরে শিপ্রা একটা দারুণ খুশির খবর পেল। বিট্টুর স্কুলে অ্যান্ডারসন সাহেবের কাছে সে খোঁজ করতে গিয়েছিল বিট্টু এই ক'দিন কেমন ছিল জানতে। অ্যান্ডারসন সাহেব একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলেছিলেন, প্রীতম কেমন ছিল সেটা আপনি ওর কাছেই খোঁজ নেবেন। তবে আপনার জন্য একটা ভাল খবর আছে।

শিপ্রা উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল। অ্যান্ডারসন সাহেব ড্রয়ার খুলে একটা ছোট স্লিপ বার করে বলেছিলেন, ব্রাদার ডি'সুজা কিছুদিনের জন্য এখানে এসেছেন। এই নিন ঠিকানাটা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

স্লিপটা ধরে ব্রাদার ডি'সুজার মুক্তোর মতো হাতের লেখাটা দেখতে দেখতে শিপ্রা একদম হারিয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল তখনই ছুটে চলে যায় ব্রাদারের কাছে। নিজেকে সংবরণ করে ঠিকানাটা জানতে চেয়েছিল, এটা কোন জায়গায় ব্রাদার?

দার্জিলিং-এর কাছে। যে-কোনও গাড়ির ড্রাইভারকে বললেই নিয়ে যাবে। আই থিঙ্ক ইট উইল নট টেক মোর দ্যান ফর্টি মিনিটস।

থ্যাঙ্ক ইউ!

উনি কিন্তু পরের শনিবার আবার চলে যাবেন। আপনি দেখা করলে এর মধ্যেই দেখা করে নিন।

কোথায় চলে যাবেন?

ভোপালে। ওখানে চার্চের একটা সার্ভিস করছেন এখন।

আমি কালকেই যাব দেখা করতে। তারপর একটু ইতস্তত করে শিপ্রা বলল, ব্রাদার কালকে কি একটু প্রীতমের ছুটি পাওয়া যেতে পারে?

ব্রাদার ডি'সুজার কাছে নিয়ে যাবেন, তাই তো?

আসলে উনি প্রীতমকে দেখেননি। দেখলে খুশি হবেন।

অ্যান্ডারসন সাহেব হেসেছিলেন, ফার্স্টলি ব্রাদার ডি'সুজা প্রীতমকে মিট করেছেন। উনি যেদিন এসেছিলেন·আমি দেখিয়েছি ওঁকে। উনি প্রীতমকে ব্লেস করেছেন আর সেকেন্ডলি ক্লাস অফ করে ওঁর কাছে গেলে উনি বোধহয় খুশি হবেন না।

মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছিল শিপ্রার মুখটা। চুপ করে গিয়েছিল। অ্যান্ডারসন সাহেব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেছিলেন, আসলে মিসেস সানিয়াল, আপনার সঙ্গে ব্রাদারের যে সম্পর্ক, এতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো আপনাদের অনেক রকম আলোচনা থাকতে পারে, সেখানে একটা বাচ্চা থাকলে আপনি হয়তো ওপেন আপ করতে পারবেন না। আমার মনে হয় প্রথম দিনটা আপনি একাই যান।

মুহূর্তের মধ্যেই শিপ্রা বুঝতে পেরে গিয়েছিল অ্যান্ডারসন সাহেবের ইঙ্গিত। সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না জানলেও অনেক কিছুই খোলামেলাভাবে অ্যান্ডারসন সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছে শিপ্রা। মনে মনে তার শ্রদ্ধাই হয়েছিল অ্যান্ডারসন সাহেবের জন্য।

পরের দিনই বিট্টুকে স্কুলে নামিয়ে শিপ্রা একটা গাড়ি নিয়ে চলে এল ব্রাদার ডি'সুজার বাড়ি। জায়গাটা দার্জিলিং থেকে বেশ কিছুটা আগে একটা গোর্খা বস্তির মধ্যে। ড্রাইভার ছেলেটা রাস্তার একপাশে গাড়িটা রেখে শিপ্রাকে নিয়ে এল ব্রাদার ডি'সুজার বাড়ির গলির মুখে।

দরজাটা খুলে বাইরে শিপ্রাকে দেখে একটা নির্মল হাসি খেলে গেল প্রৌঢ় ব্রাদার ডি'সুজার মুখে। দু'হাত মেলে বললেন, আই ওয়াজ ওয়েটিং ফর ইউ মাই চাইল্ড।

শিপ্রা এগিয়ে এসে ব্রাদারের কাঁধে মাথা রাখল। বাবার কাঁধে মাথা রাখার শান্তি অনুভব করার ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি শিপ্রা। ব্রাদারের কাঁধে যেন সেই শান্তিটাই আছে। ব্রাদার আলতো করে শিপ্রার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, কেমন আছিস শ্যারন?

শিপ্রার চোখটা জলে ভিজে গিয়েছিল। ব্রাদার ডি'সুজার বুকে মুখটা গুঁজেই বলল, আমি ভীষণ ভীষণ স্বার্থপর হয়ে গেছি ব্রাদার।

ব্রাদার ডি'সুজা চোখটা কপালে তুলে বললেন, কেন? স্বার্থপর বলছিস কেন?

আমি... আমি সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবতেই পারি না ব্রাদার কত বছর হয়ে গেল, আমি একবারও তোমার খোঁজ করার চেষ্টা করিনি।

ব্রাদার ডি'সুজা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, এটাকে স্বার্থপরতা ভাবছিস কেন বল তো শ্যারন. মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশটা বদলাতে থাকে, পুরনো সম্পর্কগুলো মুছে যায়, নতুন সম্পর্ক তৈরি হয়। এইটাই তো জীবন।

আমি ঠিক করেছি ব্রাদার, আমি আবার সব পুরনো সম্পর্কগুলো বার করব। সব সিস্টারদের, ব্রাদারদের, বন্ধুদের...

আর নতুন সম্পর্কগুলো ভুলে যাবি? ব্রাদার ডি'সুজা মুচকি হেসে বললেন।

শিপ্রা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হল ব্রাদার?

ব্রাদার ডি'সুজা মাথা চুলকে বললেন, এই রে! বুড়ো বয়সে শক্ত জিনিস জিজ্ঞেস করছিস। তোর ছেলের বয়স কত হল?

সাড়ে ছয়!

তোর সঙ্গে লাস্ট দেখা হয়েছিল ব্যান্ডেল চার্চে। তখনও তোর ছেলে হয়নি। তার মানে কতদিন আগে?

শিপ্রার মনটা ভারী হল। ব্যান্ডেল চার্চে ব্রাদার ডি'সুজার সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনটা মনে পড়ে যাচ্ছে। মায়ের সঙ্গে চার্চে গিয়েছিল শিপ্রা। মার্থা মারা যাওয়ার আগে সেই শেষ কলকাতার বাইরে দূরে কোথাও যাওয়া। মার্থার ইচ্ছে ছিল হরির ঝিল দেখতে যাওয়া। শরীর বেশ খারাপ তখন। হরিতলার কাছাকাছি গিয়ে মার্থা মন পালটে ফেলেছিলেন। মত বদলে গিয়েছিলেন ব্যান্ডেল চার্চে। সেখানেই হঠাৎ করে দেখা হয়ে গিয়েছিল ব্রাদার ডি'সুজার সঙ্গে। শিপ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আট বছর ব্রাদার। তারপরই মা চলে গেল।

ব্রাদার ডি'সুজারও গলা ভারী হল।

জানি, কিছুদিন পরে কলকাতায় গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনেছিলাম মার্থার কথা...

বিষণ্ণ পরিবেশটা কাটাতে ব্রাদার ডি'সুজা বলে উঠলেন, তোর ছেলে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছে শ্যারন। ওকে দেখে আমার বুকটা ভরে গেছে। মাঝে মাঝে জানিস তো এমন পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়, সব কীরকম গোলমাল হয়ে যায় মনের ভেতর। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল এই তো সেদিন তোকে দেখেছিলাম, ছোট্ট শ্যারন... তার ছেলে এত বড় বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

তুমি যদি কার্শিয়াং-এ থাকতে, তা হলে তোমার কাছেই থাকতাম আমরা দু'জন।

দু'জনের মধ্যে একটু একটু করে অনেক কথা হতে থাকল। নিজের লড়াইয়ের কথা এই প্রথম শিপ্রা কাউকে মন খুলে বলতে পেরে ভেতরে একটা শান্তি পেল। ভেতরে অনেকদিন জমে থাকা একটা পাথর যেন বেরিয়ে গেল। ভীষণ হালকা লাগতে থাকল।

ব্রাদার ডি'সুজা মন দিয়ে শিপ্রার প্রতিটা কথা শুনলেন। প্রাজ্ঞ পিতার মতো শিপ্রাকে সাহস জোগালেন।

জীবনে কখনও হার মানবি না শ্যারন। কোনও সমস্যাই জীবনের চেয়ে বড় নয়। তোর মায়ের জীবন থেকে অনুপ্রেরণা নে, ওঁর জীবনটা আরও অনেক কঠিন ছিল। উনি কোনওদিন হারেননি। কেন জানিস তো? কারণ উনি নিজের লক্ষ্যগুলোর জন্য সৎ ছিলেন।

দুপুরে ব্রাদার ডি'সুজা নিজে রান্না করলেন শিপ্রার জন্য। শিপ্রার কোনও আপত্তিকে আমল দিলেন না।

জীবনটা আমি চারটে জিনিসের জন্য যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছি জানিস তো? জিসাস, ফিজিক্স, মিউজিক অ্যান্ড কুকিং।

শিপ্রা হেসে ফেলল।

মনে আবার নেই। তুমি তো সব সময়ই এই চারটের কথাই বলে এসেছ। তুমি বলতে ফিজিক্স, মিউজিক আর কুকিং তিনটেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছোনোর তিনটে পথ।

তুই এর কোন পথটা ফলো করিস?

শিপ্রা ঠোঁট ওলটাল, কোনওটাই হল না।

ব্রাদার ডি'সুজা চোখ পাকালেন, তোকে যে কত কষ্ট করে ফিজিক্স শিখিয়েছিলাম সেটা না হয় সব ভুলে গেছিস, কিন্তু পিয়ানো আর কুকিংটাও ভুলে গেছিস? ভেরি ব্যাড।

পিয়ানোটা আর সুযোগ হল না। দয়াল কিছুতেই বাড়িতে পিয়ানো কিনে আনতে দিল না। ওর মনে অদ্ভুত সব ব্লক আছে। কী যে আপশোস আর দুঃখ হয়!

পিয়ানো না হয় তোর হাজব্যান্ড কিনতে দেয়নি কিন্তু হাতাখুন্তি? এটা বলিস না যে, তোর বাড়িতে রান্নাঘরও নেই।

তোমাকে বললাম না ব্রাদার ওর সব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল আর মেন্টাল ব্লক। আমাকে রান্নাঘরে যেতে দেয় না। হয়তো সন্দেহ করে আমি ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দেব।

ব্রাদার ডি'সুজা নরম গলায় ধমকে উঠলেন, তুই একটু বেশিই অ্যাগ্রেসিভ চিন্তা করিস। তোর হাজব্যান্ড... হি নিডস ইয়োর সাপোর্ট। চল খেতে খেতে গল্প করবি।

ব্রাদার ডি'সুজা যত্ন করে টেবিল সাজালেন। শিপ্রার মনে হল এরকম অমৃত স্বাদের খাবার বহু দিন পর খাচ্ছে। তৃপ্তি করে খেতে থাকল। শিপ্রার তৃপ্ত মুখটা দেখে ব্রাদার ডি'সুজা ভেতরে একটা প্রশান্তি পেলেন। এককালের প্রিয় ছাত্রীটির ভেতরে যে-পাহাড়প্রমাণ সমস্যা আর অশান্তি, তার মাঝে অন্তত এইটুকুই শান্তি ওকে দিতে পারলেন।

খাওয়ার শেষে ব্রাদার ডি'সুজা বললেন, তোর সবচেয়ে বড় সমস্যা কী জানিস তো? তুই বড্ড লোনার।

শিপ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ ব্রাদার। এক বিট্টু ছাড়া আমার চারদিকটা শূন্য। ধুধু করছে।

ব্রাদার ডি'সুজা চোখটা ছোট করে শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, এরকম যদি হত শ্যারন, তোর অনেক বন্ধু থাকত!

অনেক বন্ধু? অবাক হয়ে ব্রাদারের দিকে চেয়ে থাকল শিপ্রা।

হ্যাঁ, অনেক বন্ধু, গোটা পৃথিবী জুড়ে।

ম্লান হেসে শিপ্রা বলল, আমি বোধহয় স্বপ্নে একবারও এটা ভাবতে পারব না ব্রাদার।

ব্রাদার ডি'সুজা একটা রহস্যময় হাসি হাসলেন।

আমি যদি ব্যবস্থা করে দিই। পৃথিবী ভরতি তোর বন্ধু, যখন ইচ্ছে তখন তুই তাদের সঙ্গে কথা বলবি। পাখিদের নিয়ে, আর তোর যা যা ভাল লাগে তাই নিয়ে... যত খুশি কথা বলবি।

শিপ্রা আপ্লুত গলায় বলল, তুমি ব্লেস করো ব্রাদার, পরের জন্মে যেন আমার এরকম হয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে অনেক অনেক বন্ধু...

ব্রাদার ডি'সুজা শিপ্রার কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বললেন, পরের জন্মে নয়, এই জন্মেই... আয় আমার সঙ্গে।

ব্রাদার ডি'সুজা শিপ্রাকে ভেতরে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট ঘর। টেবিলের ওপর রেডিয়োর মতো দেখতে একটা যন্ত্র। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আরও কয়েকটা যন্ত্র লাগানো আছে।

এটা কী ব্রাদার? শিপ্রা বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল।

যন্ত্রটা চালু করে ব্রাদার ডি'সুজা বললেন, বন্ধুত্ব পাতানোর যন্ত্র।

মানে?

হ্যাম রেডিয়ো। গোটা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার হ্যাম রেডিও অপারেটর আছে। চব্বিশ ঘণ্টা তুই পৃথিবী জুড়ে বন্ধু পাবি। অনেক ভাল ভাল সোশ্যাল কাজে ইনভলভ্ড হতে পারবি।

যন্ত্রটার নব ঘোরাতে থাকলেন ব্রাদার ডি'সুজা। নানান রকম বিচিত্র আওয়াজ আসছে যন্ত্রটার ভেতর থেকে। মাঝে মাঝে একটা ছোট পাত লাগানো যন্ত্রে ব্রাদার ডি'সুজা আওয়াজ তুলছেন টক... টক... টক টক...

শিপ্রা নিশ্বাস ঘন করে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কি সিগন্যাল ব্রাদার?

এগ্‌জ্যাক্টলি! আমি বলছি... দিস ইজ আ কল... দিস ইজ আ কল...

এই টক টক আওয়াজগুলো?

মর্স কোড। মর্স কোডে আমি কিউ এস এল জানাচ্ছি।

কিউ এস এল কী?

শিপ্রা একের পর এক শিশুর মতো প্রশ্ন করে যেতে থাকল। হ্যাম রেডিয়ো অপারেটরদের দুনিয়াটা ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকল শিপ্রার কাছে। জীবনে এ এক নতুন মোড়। গোটা ব্যাপারটায় এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করল শিপ্রা। সেদিন কার্শিয়াং-এ ফিরে এল এই নতুন স্বপ্নের ঘোরটা নিয়ে।

এই আকর্ষণটা প্রথম দিনেই এমন তীব্রভাবে শিপ্রাকে নাড়িয়ে দিল যে, তার পরের দু'দিনই শিপ্রা বিট্টুকে স্কুলে দিয়ে চলে যেত ব্রাদার ডি'সুজার কাছে মর্স কোড শিখতে। হ্যাম রেডিয়ো অপারেটরদের আশ্চর্য দুনিয়া দেখতে। এই দু'দিনে শিপ্রা শিখে ফেলল 'ডিটস' আর 'ডাস' অর্থাৎ মর্স কোডের ডট আর ড্যাশ। শিখে ফেলল ডট ড্যাশ মানে 'এ', ড্যাশ ডট ডট ডট মানে 'বি', ড্যাশ ডট ড্যাশ ডট মানে 'সি'...

তার পরের দিন শনিবার। বিট্টুর স্কুল ছুটি। বিট্টু শিপ্রার ছাত্রীদের সঙ্গে গিয়েছিল চায়ের বাগান দেখতে। বাড়িতে শিপ্রা একাই ছিল। এমন সময় কার্শিয়াং-এ শিপ্রার বাড়িতে এসে হাজির হলেন ব্রাদার ডি'সুজা। গাড়ি থেকে মাঝারি একটা ট্র্যাঙ্ক নামিয়ে শিপ্রাকে দিয়ে বললেন, তোকে যন্ত্রটা দিয়ে গেলাম শ্যারন। সঙ্গে কিছু বইপত্তর। বইগুলো পড়। মনে রাখিস অ্যামেচার রেডিয়োর লাইসেন্স পেতে গেলে পরীক্ষা দিতে

হবে। পাশ করলে তবেই ব্যবহার করতে পারবি। কলকাতায় পরের বার যখন যাবি, খোঁজ করে পরীক্ষাটা দিয়ে দিস।

শিপ্রা লজ্জা পেয়ে বলল, এমা তোমারটা দিলে কেন ব্রাদার? তুমি তা হলে কী ব্যবহার করবে?

আর একটা তৈরি করে নেব। এটাও তো আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম।

শিপ্রা থমথমে মুখে বলল, তুমি আজ ভোপালে ফিরে যাচ্ছ, তাই না ব্রাদার?

রাইট মাই চাইল্ড।

আবার কবে দেখা হবে ব্রাদার?

আর মন খারাপ করিস না। এবার থেকে রেডিয়োতে তোর সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, তোর সিগন্যাল রিলে হয়ে আসার অপেক্ষায় থাকব। চলি রে। ট্রেন ধরার সময় হয়ে যাবে।

গাড়িতে ওঠার আগে ব্রাদার ডি'সুজা আন্তরিকভাবে একটা কথা বললেন, অনেক চিন্তা করে আমার মনে হল প্রীতমকে এখানে হস্টেলে রেখে তুই কলকাতায় ফিরে যা। এতে প্রীতমের, তোর, তোর হাজব্যান্ডের ভাল হবে।

কিন্তু ব্রাদার, বিট্টুকে তো এত ছোটতে হস্টেলে নেবে না। ওদের প্রভিশনই নেই।

ব্রাদার ডি'সুজা অল্প হেসে বললেন, দ্যাখ না। ব্রাদার অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কথা বল।

ব্রাদার ডি'সুজার গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার পর শিপ্রা অনেকক্ষণ সেই রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়িটা একসময় ছোট্ট দেশলাই বাক্স হয়ে মিলিয়ে যাওয়ার পর ভেতর থেকে একটা কান্না লাভার স্রোতের মতো বেরিয়ে এসে চারপাশের নিসর্গকে ঝাপসা করে দিল।

৩৭

আড়াই মাস পরে দয়াল সান্যাল দেশে ফিরে এলেন। অফিসের লোকজন লক্ষ করল মানুষটা বিদেশ থেকে একরাশ নতুন উদ্যম এবং উত্তেজনা নিয়ে এসেছেন। দুটো কথার একটায় বিদেশের উদাহরণ দিতে থাকলেন। কথায় কথায় সাহেবদের নিয়মানুবর্তিতা, সাহেবদের নিষ্ঠার কথা বলেন। সদ্য লব্ধ সাহেবি অভিজ্ঞতা দিয়ে অফিসে নতুন নতুন কানুন চালু করবেন বলেন।

একদিন দেখা করতে এলেন নির্মল চ্যাটার্জি। দয়াল সান্যালকে জরিপ করে বললেন, ও মশাই, মেমসাহেবদের হাওয়া লাগিয়ে চেহারাটা তো দিব্যি খোলতাই করে এসেছেন দেখছি।

দয়াল সান্যাল কাঁধ ঝাঁকালেন, হাজার বছর পিছিয়ে আছি মশাই আমরা। গিয়ে দেখে আসুন। না দেখলে বুঝতে পারবেন না কী দেশ!

নির্মল চ্যাটার্জি হাতের পাতা ওলটালেন, নিয়ে আর আপনি গেলেন কই মশাই! কত আশা করেছিলাম আপনি নিয়ে যাবেন।

দয়াল সান্যাল উৎফুল্ল হয়ে বললেন, যাব, যাব, পরের বার নিয়ে যাব আপনাকে। এই তো সবে শুরু, ব্যাবসাটা বাড়াতে গেলে এবার রেগুলার যাতায়াত করতে হবে। আর এদিকের কী খবর বলুন?

ভোট তো হয়ে গেল এখানে। সেন্টারে ইন্দিরা গাঁধী আর এখানে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

এ তো জানা খবর। নতুন খবর শোনান।

ট্যাক্স কিন্তু এবার অনেক বেড়ে যাবে মশাই। পাক্কা খবর আছে। যুদ্ধে দেশের অনেক টাকা খরচ হয়েছে।

ট্যাক্সের কথা পরে ভাবা যাবে, আগে বিজনেসটা বাড়ানোর কথা ভাবতে হবে। বিদেশে দুটো জিনিসই দেখে এলাম। মার্কেট আর মেশিন।

নির্মল চ্যাটার্জির মনে পড়ল মূলত মেশিনপত্তর কেনার জন্যই দয়াল সান্যাল ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে জানতে চাইলেন, তা মশাই মেশিনপত্তর কিনতে আপনার এতদিন লেগে গেল, নাকি সুজন দত্তর মতো স্কটল্যান্ডে সেই হোটেলে না রিসর্টেও গিয়ে বয়সটা কয়েক বছর ঝেড়ে ফেলে এলেন?

বহুদিন পর সুজন দত্তর প্রসঙ্গটা মনে করিয়ে দেওয়ায় গম্ভীর হয়ে গেলেন দয়াল সান্যাল। নির্মল চ্যাটার্জি কথাটা ঘোরানোর চেষ্টা করলেন। গলাটা নিচুতে নামিয়ে বললেন, শুনুন মশাই, একটা খবর জানিয়ে রাখি আপনাকে। আপনার গিন্নি কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছিলেন।

এই খবরটা কেউ দেয়নি, দয়াল সান্যালের ভুরু কুঁচকে গেল। শিপ্রা এসে ওর অবর্তমানে কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে গেল, এই খবরটা কেউ না দেওয়ার স্পর্ধা পেল কোথা থেকে?

নির্মল চ্যাটার্জি দয়াল সান্যালের পালটে যাওয়া চোখমুখ দেখে বুঝতে পারলেন মোক্ষম একটা খবর দিতে পেরেছেন। ব্যাপারটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার জন্য পরের পর্বের খবরটা প্রকাশ করলেন।

ভাবছেন আমি কী করে জানলাম? আরে মশাই, একদিন সন্ধেবেলাতে পার্ক স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার ধার ঘেঁষে আপনার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি ভাবলাম, আপনার ড্রাইভারের তো সাহস কম নয়! আপনি নেই, আপনার গাড়ি নিয়ে কলকাতা চষছে। তারপরে দেখলাম মিসেস সান্যাল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা রেস্টুরেন্টের কালো কোট পরা ছোকরার সঙ্গে কথা বলছেন।

মাথার মধ্যে অনেক কাল ঘুমিয়ে থাকা মাছিগুলোকে নির্মল চ্যাটার্জি যেন উড়িয়ে দিল। দয়াল সান্যালের মাথার ভেতর সেই পুরনো ভনভন আওয়াজটা ফিরে আসতে লাগল। নির্মল চ্যাটার্জি আরও অনেক খুচরো কথা বললেন, কিন্তু সেসব আর মাথার মধ্যেই ঢুকল না দয়াল সান্যালের। নির্মল চ্যাটার্জি বেরিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তারপরেই চিৎকারে ফেটে পড়লেন, সরোজ... সরোজ...

দয়াল সান্যালের ঘরের ভেতর থেকে এই আওয়াজটা শুনে সবাই চমকে উঠল। কয়েকদিন অন্য এক দয়াল সান্যালকে দেখতে দেখতে চোখটা অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু এখন যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল পুরনো দয়াল সান্যাল।

স্বভাবমতো আস্তে দরজাটা খুলে ফাঁক করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সরোজ বক্সী নিচু স্বরে বললেন, স্যার।

সরোজ বক্সীকে দেখে দয়াল সান্যাল উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গলাটাকে সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, শিপ্রা কলকাতায় এসেছিল, এই কথাটা আমাকে না বলার এত বড় সাহস তুমি কোথা থেকে পেলে সরোজ?

সরোজ বক্সী এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করলেন এবং সম্ভবত জীবনে প্রথম বারের জন্য মালিকের সঙ্গে ছলনার আশ্রয় নিলেন।

আপনাকে বলেছিলাম স্যার।

দয়াল সান্যাল একটু থতমত খেয়ে অবিশ্বাসী চোখে সরোজ বক্সীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বলেছিলে?

হ্যাঁ স্যার, দমদম এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথেই বলেছিলাম।

দয়াল সান্যালের গলাটা নরম হয়ে এল। চিন্তিত মুখে বললেন, বলেছিলে? তা হলে ভুলে গেলাম কী করে? ওদেশের ডাক্তাররা তো ছাড়ার সময় বলল, আপনার আর কোনও সমস্যা নেই।

শেষের কথাটা খুব মন দিয়ে শুনলেন সরোজ বক্সী। ব্যাবসার পাশাপাশি তা হলে দয়াল সান্যাল বিলেতে কিছু চিকিৎসাও করিয়েছেন।

আপনি আসলে স্যার সেদিন খুব ক্লান্ত ছিলেন।

দয়াল সান্যালের চোখ দুটো মুহূর্তে চকচক করে উঠল, ঠিক বলেছ সরোজ... ঠিক বলেছ... জেট ল্যাগ। যাকগে... কী যেন তুমি বলেছিলে? শিপ্রা কেন এসেছিল?

সরোজ বক্সী আজ যেন একদম অন্য মানুষ, মনগড়া প্রথম যে-কথাটা জগদ্দল পাথর সরিয়ে বলে ফেলেছিলেন, এখন সেটা বাঁধভাঙা হয়েছে।

ম্যাডাম বিট্টুবাবার স্কুলের জন্য কীসব কাগজপত্তর নিতে এসেছিলেন, আর তার সঙ্গে আপনার অনুপস্থিতিতে বাড়িঘরদোর কেমন আছে, সেটা দেখতেও...

দয়াল সান্যাল একটা তির্যক হাসলেন, তোমাকে তাই বলেছে বুঝি? আর তুমিও বোকার হদ্দ তাই বুঝেছ। খবর রাখতে হয় বুঝলে! আসল খবরটাই জানো না সরোজ। তোমার ম্যাডাম ওই ক'দিনের জন্য এসেও সন্ধেবেলায় পার্ক স্ট্রিটের ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়েছিল। কেন দাঁড়িয়েছিল জানো? রক্তের দোষ কোথায় যাবে সরোজ?

শিপ্রার সম্পর্কে সরোজ বক্সীর চিরকালই একটা শ্রদ্ধাবোধ আছে। তার ওপর কার্শিয়াং-এ গিয়ে আর কলকাতায় ক'দিন শিপ্রাকে আরও খোলাখুলি জানার যে-সুযোগটা সরোজ বক্সীর হয়েছে, তাতে সেই শ্রদ্ধাবোধটা আরও যেন বেড়ে গেছে। দয়াল সান্যাল নিজের স্ত্রী সম্পর্কে যে-অভব্য মন্তব্য এবং অশ্লীল ইঙ্গিত করছেন, সরোজ বক্সীর কানে সেগুলো যন্ত্রণার মতো বিঁধছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে আড়াই বছর

বয়সের মেয়ের বাবার পাহাড়প্রমাণ দায়িত্বটা যদি না থাকত, এই পশুর চেয়ে অধম লোকটার চাকরিটা এখনই ছেড়ে চলে যেতেন সরোজ বক্সী।

দয়াল সান্যাল ধীরে-সুস্থে এক গ্লাস জল খেয়ে চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে বললেন, আরও কিছুদিন শিপ্রাকে আমার সহ্য করতেই হবে সরোজ। বিদেশের মেশিনগুলো কেনার জন্য ব্যাঙ্কের লোনটা শুধু পাস হয়ে যাক, তার পরে আমি ওকে ওর নিজের ইচ্ছের জায়গায় যাওয়ার জন্য মুক্ত করে দেব। লোন পাওয়ার জন্য ওই দু'একর জমিটা যে কী ইম্পর্ট্যান্ট তুমি বুঝতে পারবে না সরোজ। যাকগে, শোনো, একদম খেয়াল থাকছে না। বিট্টুর জন্য কিছু খেলনা আর জামাকাপড় নিয়ে এসেছি। তুমি কার্শিয়াং-এ গিয়ে দিয়ে এসো।

আজ্ঞে, কিন্তু একটা কথা ছিল স্যার। ম্যাডাম তো বিট্টুবাবাকে নিয়ে আর কয়েকদিন পরেই চলে আসছেন।

চলে আসছে মানে?

বিট্টুবাবার তো স্কুলে ছুটি পড়ে যাচ্ছে। গরমের ছুটি। ছুটিতে কলকাতায় আসবে।

বোকা ছাড়া কেউ কলকাতার গরমে হাঁসফাস করতে পাহাড় থেকে নেমে আসে? শিপ্রা আসা মানেই তো ঝামেলা। কমলেশের কাজ কত দূর?

স্যার চার কাঠার মতো জায়গায় তুলো গাছ বসিয়েছে ..

দু'একরের মধ্যে চার কাঠা? এত কম জায়গা কেন? আমি তো বারবার তোমাদের বলে গিয়েছিলাম দু'একরের মধ্যে যতটা পারো জায়গা কুপিয়ে ফেলো। যেটা ঠিক করে দেব সেটা না শোনাটা আজকাল তোমাদের ফ্যাশন হয়েছে।

সরোজ বক্সী একটা ঢোঁক গিললেন। দু'একর জমিটা ভেতরে ভেতরে বাঁচানোর নিজেও একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন। কমলেশকে উনিই বুদ্ধিটা দিয়েছেন অল্প একটু জায়গা খুঁড়ে এক্সপেরিমেন্টটা করতে। অতটা জায়গা খুঁড়ে তুলোর ফলন দেখাতে না পারলে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে কমলেশের সম্পর্কের এ বছরেই ইতি হয়ে যাবে।

দয়াল সান্যালের চোখ থেকে মুখটা নামিয়ে সরোজ বক্সী বললেন, এত বড় একটা গবেষণা দু'একর জায়গা জুড়ে করলে আর ধামাচাপা দিয়ে রাখা যেত না স্যার। একেই মার্কেটে কৌতূহলের অন্ত নেই, আপনি বিদেশে গিয়ে কী মেশিন কিনে আনছেন, আমরা পরের কারখানাটা কোথায় করব...

দয়াল সান্যাল আত্মতুষ্ট হলেন।

ইয়েস। লোকের কোনও ধারণা নেই সরোজ, বাংলায় তুলো আর বিলিতি মেশিন দিয়ে আমরা কোথায় পৌঁছে যাব। ম্যাঞ্চেস্টারে একটা কারখানায় দেখে এলাম...

দয়াল সান্যাল আবার ডুবে গেলেন বিদেশি অভিজ্ঞতার বর্ণনায়।

দার্জিলিং মেল থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে একটু দূরে দয়াল সান্যালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে একটা খুশির আবেশ লাগল শিপ্রার। মুহূর্তের মধ্যে ক্যাথি আন্টির একটা

কথা মনে পড়ে গেল, বিরহ মানুষকে শুদ্ধ করে। দয়াল সান্যালের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, ভাল আছ?

দয়াল সান্যাল যেন শিপ্রাকে দেখেও দেখলেন না। দাম্ভিকের মতো উত্তর দিলেন, ওই আছি।

দয়াল সান্যাল ততক্ষণে বিট্টুকে কোলে তুলে নিয়েছেন। কোলে নেওয়ার পক্ষে দয়াল সান্যাল এবং বিট্টু দু'জনেরই বয়স বেশি। ভরা স্টেশনে বিট্টুকে আদর করার ভঙ্গি দেখে শিপ্রা সরল সত্যটা উপলব্ধি করল, দয়াল সান্যাল এত সকালে স্টেশনে এসেছেন শুধুই নিজের ছেলের জন্য।

শিপ্রার এই উপলব্ধিটা ষোলো আনা সত্যি ছিল—ঠিক যে-সম্পর্ক নিয়ে শিপ্রা কার্শিয়াং চলে গিয়েছিল সেই সম্পর্কটার কোনও উন্নতিই হল না। দিনে দিনে দয়াল সান্যাল যেন শিপ্রার অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করতে থাকলেন। বুঁদ হয়ে থাকলেন নিজের বাস্তব-অবাস্তব লক্ষ্যগুলো নিয়ে।

বিট্টুর গরমের ছুটি শেষ হওয়ার কয়েকদিন আগে শিপ্রা একদিন রাতে দয়াল সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে এল।

বিট্টুর স্কুল খুলে যাচ্ছে। আমি ব্রাদার অ্যান্ডারসনের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। এবার থেকে ও হস্টেলেই থাকবে।

হস্টেলে থাকবে কেন? তোমার তো বাড়ি ঠিক করাই আছে।

আছে। কিন্তু আমি আর ফিরে যাব না। ও হস্টেলে থেকেই পড়াশুনো করবে।

শিপ্রার সিদ্ধান্তটা শুনে দয়াল সান্যাল অবাক হলেন। নকশালদের ভয় দেখিয়ে বিট্টুকে হস্টেলে পাঠানোর একটাই উদ্দেশ্য ছিল। যাতে বিট্টুর সঙ্গে শিপ্রাও কলকাতা থেকে দূরে থাকে। এখন নকশালদের ভয়টা কমে আসছে। কিন্তু শিপ্রার কলকাতা থেকে দূরে থাকাটা জরুরি। অন্তত হরিতলায় জমিটার ব্যবস্থা আর ব্যাঙ্কের মোটা লোনটার ব্যবস্থা যতক্ষণ না নিজের পরিকল্পনা মাফিক হচ্ছে। শিপ্রা এখানে থাকা মানেই পদে পদে একরাশ বাধা আসবে।

শিপ্রার সিদ্ধান্তটায় বাধা দিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, অসম্ভব, এত ছোট বয়সে ও একা একা হস্টেলে থাকতে পারবে না। আর তার ওপর ওদের প্রিন্সিপ্যাল তো বলেই ছিল, এত ছোট বয়সে হস্টেলে রাখার কোনও ব্যবস্থা নেই।

ব্যবস্থা হয়েছে। স্পেশ্যাল পারমিশন।

দয়াল সান্যাল মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করলেন, তুমি পারবে ওকে ছেড়ে থাকতে?

শিপ্রার ভেতর এই কষ্টকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার টানাপড়েনের দিনগুলো যেন আর একবার খোঁচা খেয়ে উসকে গেল। ব্রাদার ডি'সুজা এই সৎ পরামর্শটা দিয়েছিলেন। দয়াল সান্যালের মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশ, শিপ্রার সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা, এসবের বাইরে রেখে বিট্টুর শিশুমনটা বিকাশ করার ব্যবস্থা যেন সে করে। দয়াল সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে তাই শিপ্রা নির্লিপ্ত হয়ে বলল, না পারলে আবার চলে যাব। তবু বিট্টুর ভালর জন্য আমি নিজের মনকে শক্ত করে নিয়েছি।

দয়াল সান্যাল ভেতরে ভেতরে ছটফট করে উঠলেন। কোনওরকমে সেটা লুকিয়ে বললেন, কী দরকার তা হলে ওকে ওখানে রাখার? আর ওকে যদি ওখানেই রাখার দরকার হয়, কী দরকার তোমার এখানে থাকার?

ডক্টর হেমন্ত পাঠক বলেছিলেন, ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে। পেশেন্ট যেন বুঝতে না পারে তাকে সাহায্য করতে আপনি পাশে আছেন। কথাগুলো মনে করে শিপ্রা নিষ্পলক চোখে দয়াল সান্যালের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার কাজ আছে এখানে!

কাজ? কী কাজ?

শিপ্রা গলাটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, আছে। আশা করি হরির ঝিলের কাজটা তুমি ভুলে যাওনি।

দয়াল সান্যাল বুঝতে পারলেন শিপ্রা নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল। শিপ্রাকে কলকাতা থেকে সরানোর অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৮

শিপ্রা নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। গরমের ছুটির পরে নিজে গিয়ে সত্যিই বিট্টুকে বোর্ডিং স্কুলে রেখে এল। শিপ্রা এবং দয়াল সান্যাল দু'জনই বিট্টুকে ছেড়ে থাকার জীবনটা সময়ের সঙ্গে রপ্ত করে ফেললেন। দয়াল সান্যাল নিজের ব্যাবসা বাড়ানোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকলেন আর শিপ্রা ক্রমশ নিজেকে জড়িয়ে ফেলল হ্যাম রেডিয়ো আর পাখির জগতে। একই ছাদের তলায় দুটো দ্বীপ। সেই দ্বীপগুলোতে আলাদা দুটো জগৎ। একটা দ্বীপ থেকে আর একটা দ্বীপে সেতু বাঁধতে কেউই আগ্রহী ছিল না।

কমলেশ ভাণ্ডারী বুদ্ধিমান। যে-জমিটায় নিজের উৎকর্ষ দেখানোর সুযোগ পেয়েছিল, প্রথম দিনেই সে বুঝে গিয়েছিল তাতে বিস্তর গন্ডগোল আছে। সম্পত্তিটার ব্যবহার নিয়ে সান্যাল কত্তা-গিন্নির বিরোধটা সে অঙ্ক কষে বার করে ফেলেছিল। যদিও শিপ্রা জেনে গিয়েছিল ওর দু'একর জমিতে আসলে কী করাচ্ছেন দয়াল সান্যাল, তবুও কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে শিপ্রা বারদুয়েক হরির ঝিলে কমলেশের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল। প্রতিবারই শিপ্রাকে কমলেশ বুঝিয়েছে, কাজের ফলাফল শীতকালের আগে বোঝা যাবে না। কমলেশের কাছে সমস্যা ছিল একটাই, শীতকালই তুলোর ফলনের সময়। শীতকালে ঝাঁক ঝাঁক পাখি আনা এবং একই সঙ্গে রাশি রাশি তুলোর ফুল ফোটানো, দুটোই অসম্ভব কাজ ছিল। তবে পুজোর পর পর অল্প পরিশ্রম এবং প্রচুর কৌশল করে সে দয়াল সান্যালকে কয়েকটা তুলোর গাছে ফুল ফুটিয়ে দেখিয়ে দিল।

হরির ঝিলের ধারে এই কয়েকটা তুলোর ফুল দেখে দয়াল সান্যাল উল্লাসে ফেটে পড়লেন। সরোজ বক্সী, শীতল ভট্টাচার্যের মতো গুটিকয়েক স্তাবকদের হাতের তালুতে তুলোর ফুলটা দেখিয়ে বললেন, কী হে, হল কিনা? তোমরা তো সব বলেছিলে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তুলো ফলবে না। এটা কী দেখছ?

শীতল ভট্টাচার্য মালিককে তোষামোদ করতে থাকল, আপনি যেভাবে রিসার্চ করালেন স্যার... গভর্নমেন্ট থেকে আপনাকে প্রাইজ দেওয়া উচিত। আমরা একেবারে মুখ্যমন্ত্রীকে বলব।

দয়াল সান্যাল ঠোঁটে আঙুল ঠেকালেন, নিজের মুখ একদম বন্ধ রাখো শীতল। ব্যাপারটা এখনই পাঁচ কান হলে সবাই দেদার তুলোর চাষ শুরু করিয়ে দেবে। ব্যাপারটাকে আরও বড়ভাবে করতে দাও। তারপর গভর্নমেন্টকে তাক লাগিয়ে দেব। এবার বড় করে করতে হবে কমলেশ। একদম কমার্শিয়াল প্রোডাকশন।

কমলেশ একটা ঢোঁক গিলল। এ পর্যন্ত কিছু একটা করা গেছে। একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসাবে সে জানে এর বেশি আর কিছু করা সম্ভব নয় এখানকার আবহাওয়া, এখানকার মাটিতে। তবে একই সঙ্গে দয়াল সান্যাল চরিত্রটাকেও খুব ভাল করে চিনে গেছে কমলেশ। যদি সত্যি কথাটা এখন মুখের ওপর বলে দেয়, এই নিশ্চিন্ত জীবনটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। দয়াল সান্যাল আর একজন কমলেশকে খুঁজে বার করবেন। নিজের জায়গাটা খোওয়াতে চাইল না কমলেশ।

স্যার, এ বছর আর হবে না।

দয়াল সান্যাল ভুরু কোঁচকালেন।

হবে না মানে?

এ বছর স্যার সিজন চলে গেল।

দয়াল সান্যাল হতাশ হয়ে পড়লেন, কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

মোটামুটি স্যার পরের বছরের জুন-জুলাই পর্যন্ত।

এখন নভেম্বর, মানে আরও সাত-আট মাস?

হ্যাঁ স্যার। আমরা ওই বর্ষার মুখে মুখে বীজ পুঁতে ফেলব।

তারপর?

দু'-আড়াই মাস পর কুঁড়ি আসবে।

তারপর?

আরও মাসখানেক সময় লাগবে কুঁড়ি ফুটতে। পাপড়িগুলো ঘিয়ে রং থেকে আস্তে আস্তে লাল হবে। ফুটে উঠবে আমাদের এক একটা কটন বল। বলটা ধীরে ধীরে বড় হবে। রোদ সেঁকে সেঁকে একদিন বলটা ফেটে গিয়ে বেরিয়ে আসবে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত তুলো।

দয়াল সান্যাল তন্ময় হয়ে কমলেশের কথা শুনছেন। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। কমলেশের বর্ণনার সঙ্গে যেন দেখতে পাচ্ছেন রাশি রাশি তুলো গাছে ধরে আছে। কমলেশের কথার শেষে যোগ করলেন, তারপর সেই তুলো জিনিং হবে। তুলোর বেল হবে। ট্রাক ভরতি করে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজের কটন বেল শুধু এই হরিতলায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্পিনিং মিলগুলোতে যাবে, গুজরাত-রাজস্থানের চেয়ে অনেক কম পয়সায় তুলো সাপ্লাই করতে পারব। পশ্চিমবঙ্গে একটা রেভলিউশন করে ফেলব আমরা।

শীতল ভট্টাচার্য দয়াল সান্যালের স্বপ্নে আরও ইন্ধন জোগালেন, স্যার, তুলোর খোসা আর বীজ থেকে তেল তৈরির ডাউন স্ট্রিম ব্যাবসাটাও আমরা শুরু করে দিতে পারি।

দয়াল সান্যাল খুশি চেপে রাখতে পারলেন না।

হবে হবে, সব হবে শীতল। কিন্তু আমি এখন ভাবছি তুলোর কথা... শুধু তুলো...

সরোজ বক্সী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কমলেশের কাজের অগ্রগতি দেখতে তিনি নিয়মিত এই জায়গাটায় এসেছেন এবং দেখেশুনে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বুঝেছেন, এটা একটা নিষ্ফল প্রচেষ্টা। কমলেশকে যে পুরো দু'একর জমি দেওয়া হয়েছিল তুলো ফলিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য, সেখানে লোকটা কয়েক কাঠা জায়গায় গুটিকয়েক মাত্র তুলোর গাছ ফলিয়েছে। অবশ্য এই অল্প জায়গায় চাষ করার প্রাথমিক বুদ্ধিটার পিছনে সরোজ বক্সীরও অবদান আছে। এই ব্যাপারটায় একটু ঘুরিয়ে দয়াল সান্যালের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন।

কমলেশবাবু আমরা আরও বেশি জায়গা জুড়ে চাষ করলাম না কেন?

সরোজ বক্সীর প্রশ্নটা শুনে কমলেশেরও মনে হল যে বুদ্ধিটা দিয়েছিল সেই এখন এই প্রশ্নটা করছে কেন? তবে গম্ভীর মুখে সরোজ বক্সীর শেখানো উত্তরটাই দিল।

আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, আমরা ব্যাপারটাকে খুব গোপনীয় রাখতে চেয়েছি। দুম করে এতটা জায়গায় চাষ করলে লোকের চোখে পড়তই। কৌতূহল বাড়ত। কানে কানে পাঁচ কান হত। গোটা ব্যাপারটা পণ্ড হয়ে যেত।

দয়াল সান্যাল মাথা ঝাঁকালেন, ঠিকই বলেছ কমলেশ। একেবারে ঠিক করেছ। আমাকে ভাবতে দাও, বড় করে কোথায় করা যায়। যেখানেই করি তুলো না ফলা পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপনীয় রাখতেই হবে। এবার কমসে কম একশো বিঘে চাষ করে তবে আমরা ব্যাপারটা প্রচারে আনব।

সরোজ বক্সী নিচু গলায় বললেন, একশো বিঘে চাষের জমি কোথায় পাব স্যার?

শীতল ভট্টাচার্য উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, হুগলিতে দেখলে হয় না। এক বছর আমরা চাষের জন্য ভাড়া নেব। ওখানে জমি খুব উর্বর।

কমলেশ বলল, উর্বর, কিন্তু ধান চাষের জন্য। তা ছাড়া হুগলিতে এখন সরকারি উদ্যোগে কলা চাষের চেষ্টা চলছে। লোকে এখন কলা চাষ নিয়ে মেতেছে। নতুন করে তুলো চাষের জন্য রাজি হবে না। ধান থেকে মনটা ঘুরলে কলাতেই ঘুরবে।

দয়াল সান্যাল দু'হাত তুলে সবাইকে চুপ করিয়ে বলে উঠলেন, আছে, আছে, আমার মাথায় একটা জায়গা আছে, শুধু আমাকে একবার যেতে হবে সেখানে।

জায়গাটা কোথায়, কেউ আর জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না দয়াল সান্যালকে। আলোচনার শেষে সরোজ বক্সী তুললেন আর একটা প্রসঙ্গ।

স্যার, শীতকাল আসছে...

তো?

স্যার পাখিরা... মানে শীতের পাখিদের আসার সময় তো হয়ে এল। ম্যাডাম এবার এলে কিছু তো দেখাতে হবে।

দয়াল সান্যাল গম্ভীর হয়ে পড়লেন। খানিকটা স্বগতোক্তি করে বলতে থাকলেন, শিপ্রা বুঝবে না... কিছুতেই বুঝবে না... অথচ এই দু'একর না পেলে সব ভেস্তে যাবে। ম্যানচেস্টার থেকে মেশিনপত্তরগুলোর জন্য এল.ও.আই. করার সময় হয়ে এসেছে। ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ফাইনাল করতে হবে। দু'জন সাহেব আসবে মেশিনপত্তর বসানোর তদারকি করতে। এদিকে তুলোর চাষটাও ভাল প্রসেস হচ্ছে। সব কিছু যখন একটা বিন্দুতে মিলতে চাইছে, সব ঘেঁটে যাচ্ছে, এই জমিটা পুরোপুরি হাতে না আসা পর্যন্ত।

শীতল ভট্টাচার্য কুণ্ঠিত হয়ে বিকল্প বুদ্ধি দেওয়ার চেষ্টা করল, স্যার, আমরা অন্য কোনওখানে জমি দেখতে পারি না?

দয়াল সান্যাল প্রায় ভেঙিয়ে উঠলেন, অন্য কোনওখানে জমি? দু'একর জমির কত দাম তোমার কোনও ধারণা আছে শীতল? আর নতুন জায়গায় ফ্যাক্টরি করতে গেলে দু'একরে কিস্যু হবে না। এই দু'একরে মেশিনপত্তর সব বসানো যাবে চালু মিলটা পাশেই আছে বলে।

সরোজ বক্সী আর কমলেশের সামনে অপমানিত হয়ে শীতল ভট্টাচার্য নিজের গুরুত্ব উদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে বলে উঠলেন, আমরা তা হলে ভেতরে ভেতরে কাজ শুরু করে দিই স্যার, ম্যাডামকে না হয়...

ম্যাডাম... তোমাদের ম্যাডাম নামেই ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনো করেছে। আদপে মূর্খ একটা। না হলে পাখি পাখি করে এরকম হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে! বোকা... বোকা... যেদিক দিয়েই এগোতে যাচ্ছি শেষ মুহূর্তে সব গন্ডগোল করে দিচ্ছে।

সরোজ বক্সী শীতল ভট্টাচার্যকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, শীতলবাবু, খেয়াল রাখবেন শশধর দাশগুপ্তর মতো উকিল কিন্তু আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন।

কীসের ব্যাপারে সাবধান?

সরোজ বক্সী নিজেকে সামলে নিয়ে দয়াল সান্যালের দিকে তাকালেন। দয়াল সান্যাল একটা বিরক্ত চোখ করে সরোজ বক্সীর দিকে তাকিয়ে আছেন। শিপ্রা সান্যালের জাল সইয়ের দলিলটা আর কারও জানার কথা নয়। দয়াল সান্যাল এটা তুরুপের তাসের মতো হাতের আস্তিনে লুকিয়ে রেখেছেন। ওটার ওপর এই মুহূর্তে নির্ভর করছে ব্যাঙ্ক লোন, তারপর আরও অনেক কিছু। তবে শশধর দাশগুপ্ত বলেছেন ওই জাল সইয়ের দলিল আদপে টেকানো যাবে না। উলটে শিপ্রা সান্যাল এটা নিয়ে কোর্টে গেলে ফল অন্যরকম হতে পারে। শশধর দাশগুপ্তর মতো নামী উকিলের পরামর্শকেও এ ব্যাপারে দয়াল সান্যাল গুরুত্ব দিতে চাননি। নিজের দুষ্কর্মের ওপর অদ্ভুত একটা আস্থা আছে। ওঁর ধারণা জাল সইয়ের দলিলটা সঠিক সময়ে ঠিকই ব্যবহার করতে পারবেন।

দয়াল সান্যাল কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে অন্যভাবে এগোতে হবে শীতল।

বলুন স্যার।

তুমি একটা কাজ করো। কথা ছিল না তোমাদের ট্রাস্টে পাখিদের কাজে লোকাল মেয়েদের ব্যবহার করবে।

হ্যাঁ স্যার... তবে...
কোনও তবে নয়। তুমি এখানকার ওই নেতা লোকটা... কী যেন নাম?
বিমল ঘোষ স্যার!
হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কথা বলে ওর নিজের হাতের কিছু মেয়েকে নিয়ে ট্রাস্টের কাজে লাগাও। ওরা শিপ্রাকে ক্রমাগত বলবে এবার অনেক বেশি পাখি আসছে শীতকালে।
বেশি পাখি স্যার...
আঃ, শিপ্রা তো আর চব্বিশ ঘণ্টা এখানে বসে থাকবে না। ওদের কথা বিশ্বাস করবে। তারপর আমাদের পরের কাজটা করতে হবে।
হ্যাঁ স্যার। পরের কাজটা...
পরের কাজটা তোমাকে পরেই বলব শীতল। শীতকালটা জাঁকিয়ে আসতে দাও।
বহু বছর ধরে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সরোজ বক্সী এভাবে দয়াল সান্যালের একটার পর একটা চক্রান্তের সাক্ষী হয়ে পড়েন। বারবার যামিনী ভট্টাচার্যের কথাগুলো মনে পড়ে যায়। কখনও সেই শব্দ দুটো, আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে চেনো; কখনও কখনও যামিনী ভট্টাচার্যের অদ্ভুত ছন্দে বলা গীতার বাণীগুলো।
পঞ্চাশ বয়সটা অনেক। এই বয়সে মানুষের মন পরিণতি পেয়ে যায়। এতকাল ধরে দয়াল সান্যালের সব অপকর্ম, অন্যায়গুলো কর্তব্যের মতো করে গেছেন। তবে ইদানীংকালে সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে। অথচ ভেতরের ইচ্ছেটা ভেতরেই থেকে যায়। শেষপর্যন্ত আর একটা অপকর্মর শরিক হয়ে যান।
যে-জমিটা নিয়ে এত বিরোধ সেই জমিটার ওপর দাঁড়িয়ে সরোজ বক্সীর মনে হল, শিপ্রাকে সব জানাতে হবে।

৩৯

রবার্ট নিজের ধর্মের অন্তত একটা অনুশাসন মানে। বাড়ির কাছে একদম বড় রাস্তার ওপর তালতলা চার্চ। রবিবার সকালে নিয়ম করে এই চার্চে প্রার্থনা করতে আসে। কখনও হাতে সময় থাকলে রবিবার সকালের প্রার্থনাটা তালতলা চার্চের বদলে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে করে আসে। উনিশশো চুয়াত্তর সালের জানুয়ারি মাসের এক সকালে এরকমই সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালে প্রার্থনা সেরে সবে বড় রাস্তায় এসেছে, এমন সময় হঠাৎ করেই দেখা হয়ে গেল শিপ্রার সঙ্গে। শিপ্রাকে দেখে রবার্ট হয়তো এড়িয়েই যেত যদি না শিপ্রা দ্রুত পায়ে এগিয়ে রবার্টের সামনে এসে দাঁড়াত।
তোকে আমি রবিবার সকালগুলোতে এখানে খুঁজতে আসি রবার্ট।
রবার্ট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আমাকে খুঁজতে এখানে?
হ্যাঁ, তুই কখনও একসময় আমাকে বলেছিলি সেন্ট পলসে রবিবার সকালে আসিস। তুই তো আসতেও বলেছিলি।

তাই বলেছিলাম? কী জানি কবে বলেছিলাম। রবিবার সকালে তো বেশির ভাগ দিনই আমি তালতলা চার্চে যাই। রবার্ট একটু চুপ করে থেকে বলল, তা রবিবার সকালে আমাকে খুঁজতে তুই এখানে আসিস কেন?

তোর সঙ্গে খুব দরকার ছিল রবার্ট।

তুই তো পার্ক স্ট্রিটে আমার কাজের জায়গাটা জানিস... গেছিসও তো কয়েকবার।

জানি। কিন্তু ওখানে তোর তো কথা বলার সময় থাকে না। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার খুব দরকার আছে রবার্ট। আজকে একটু সময় হবে তোর?

রবার্টের সত্যিই কোনও তাড়া ছিল না। তবে সেটা শিপ্রার কাছে প্রকাশ না করে বলল, বল।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়, কোথাও একটু বসে কথা বলতে চাই তোর সঙ্গে।

রবার্ট গম্ভীর হয়ে বলল, শোন শ্যারন, তুই যদি আমার বাড়িতে আসতে চাস তা হলে তোকে প্রথমেই বলব, ইউ আর নট ওয়েলকাম। আমার বউ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না তোকে। রি-অ্যাক্ট করবে। একে আমাদের মধ্যে প্রচুর অশান্তি আছে। নতুন করে আর কোনও অশান্তি চাই না।

শিপ্রা ভেতরে ভেতরে আহত হল।

না, তোর বাড়িতে বলছি না। তুই যেরকম অশান্তি বলছিস, আমার বাড়ি তোকে নিয়ে গেলে, ওই একই অবস্থা আমার বাড়িতেও হবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, কোথাও একটু বসে তোর সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার।

রবার্ট একটু চিন্তা করে বলল, সামনেই তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। যাবি?

শিপ্রার পছন্দ হল জায়গাটা। আপত্তি করল না। রাস্তা পেরিয়ে চুপচাপ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গেটটা পেরিয়ে সবুজ মাঠটাতে এল। শীতকালে রবিবারের সকালে গোটা জায়গাটা জমজমাট। রঙিন পোশাক আর খুশির আমেজের ছড়াছড়ি। তার মধ্যে একটা ফাঁকা গাছের তলা চোখে পড়ল রবার্টের। সেদিকে দেখিয়ে শিপ্রাকে বলল, চল ওখানে গিয়ে বসি।

জায়গাটা যেন সম্মোহন করে ফেলল শিপ্রাকে। গাছের ছায়াটায় যেন এক অদ্ভুত শান্তি। শিপ্রার মনে হল, বহুদিন পরে এরকম একটা শান্তি পেল। রবার্টের সঙ্গে জরুরি যে-কথাগুলো বলার ইচ্ছে মনের মধ্যে ছিল, যে জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিল, সেই কথাগুলোই আর শুরু করতে ইচ্ছে করছিল না।

শিপ্রার জন্য রবার্টের মনের মধ্যে জমে থাকা অভিমানটা আস্তে আস্তে গলতে থাকল। কিছুদিন আগে ব্রাদার ডি'সুজাকে এভাবেই নিজের জীবনের কথাগুলো বলে ভেতরটা খুব হালকা লেগেছিল শিপ্রার।

তুই শুনবি রবার্ট? শুনবি আমি কেমন আছি?

শিপ্রা একে একে বলে গেল নিজের জীবনের কথা। হরির ঝিলের পাখি, পলাশ, মহেশ থেকে আরম্ভ করে দয়াল সান্যালের মানসিক অসুস্থতার কথা পর্যন্ত।

একটা সময় রবার্ট শিপ্রার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, আমি তোকে

ভুল বুঝেছিলাম রে শ্যারন। তোর কাছে একটা সত্যি কথা স্বীকার করছি আজ। তোকে আমি হিংসাই করে এসেছি চিরকাল।

একটা নিষ্পাপ হেসে শিপ্রা বলল, আমরা এইসব হিংসে করার বয়সটা অনেকদিন পেরিয়ে এসেছি রে রবার্ট।

রবার্ট উদাস গলায় বলল, হয়তো তাই...

তোর সঙ্গে আমি কী দরকারে দেখা করতে চাইছিলাম জানিস? ক্যাথি আন্টিকে আমার খুব দরকার। একটা প্রশ্নের উত্তর হয়তো ক্যাথি আন্টিই কেবল দিতে পারে।

রবার্ট মাথা ঝাঁকাল, না, মাম্মির ঠিকানাটা আর কিছুতেই পেলাম না। মাম্মি মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। চিঠিতে স্পষ্ট লিখে দেয় পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে আমি যেন মাম্মির খোঁজ না করি। কারণ চিঠিগুলো অন্য লোককে দিয়ে কলকাতায় পোস্ট করায়। মাম্মি ভাল আছে, শান্তিতে আছে, কোনও টাকাপয়সার দরকার নেই, এসবই জানায়। একটা অদ্ভুত স্বেচ্ছানির্বাসনের জীবন বেছে নিল। কেন যে নিল... কিছুই বুঝলাম না।

তোকে তো বললাম। এটার জন্য দয়ালই দায়ী। সেদিন বোধহয় ব্যাঙ্কে তোর সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত।

ডেস্টিনি শ্যারন। যেটা হবার সেটা হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু মাম্মির কাছে তুই কোন প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিস?

যে-প্রশ্নটার উত্তর মা আমাকে কোনওদিন দেয়নি। আমার বাবা কে?

রবার্ট অবাক হয়ে শিপ্রার মুখের দিকে তাকাল, এতদিন পরে তুই এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছিস?

খুঁজছি একটা ভবিষ্যতের ভয়ে। আমি যখন জন্মেছিলাম তখন ম্যাকার্থির সঙ্গেই মায়ের সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক ছিল। ম্যাকার্থি যদি আমার বাবা হয়ে থাকে... শিপ্রা চুপ করে গেল।

রবার্ট শিপ্রার কথার শেষটা জানতে চাইল।

ম্যাকার্থি তোর বাবা হয়ে থাকলে কী শ্যারন?

শিপ্রা আকাশের দিকে চেয়ে উদাস গলায় বলতে থাকল, ম্যাকার্থির শেষ জীবনে কী হয়েছিল জানিস?

কী হয়েছিল?

বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে একদিন হারিয়ে গিয়েছিল। ওর কোনও খোঁজ কেউ আর পায়নি। পৃথিবীতে এখন একমাত্র ক্যাথি আন্টিই আছে রে রবার্ট, যে সত্যিটা জেনে থাকলেও থাকতে পারে আমার বাবা কে।

রবার্ট পকেট থেকে একটা মাউথ অর্গান বার করে শিপ্রাকে দেখিয়ে বলল, আমাকে অনেক ছোটবেলায় এটা কে দিয়েছিল জানিস? একটা লোক। মায়ের খদ্দের ছিল। আমি লোকটাকে আমার বাবা ভাবি। কেন জানিস? এটাই সারা জীবনে আমার পাওয়া সেরা উপহার।

আমি কিন্তু সিরিয়াস!

রবার্ট একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল, আমাদের আবার বাবা... তোর মনে নেই ছোটবেলা থেকে আমাদের কী শেখানো হয়েছে?

কিন্তু আমার যে ভীষণ জানার দরকার রবার্ট, বিট্টুর জন্য...

বিট্টুর জন্য? রবার্ট আবার জিজ্ঞেস্ করল।

শিপ্রা নিচু গলায় বলতে থাকল, দয়ালের যে-মানসিক রোগটা ডাক্তাররা সাসপেক্ট করছে সেটা বংশগত। ম্যাকার্থি যদি আমার বাবা হয়ে থাকে তা হলে বিট্টুর রক্তের দুটো ধারাতেই মানসিক রোগের বীজ লুকোনো আছে। বিট্টুর ব্যাপারে খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। জানতেই হবে আমার রক্তে ম্যাকার্থির বীজ আছে কিনা।

মাউথ অর্গানটায় দুটো ফুঁ দিয়ে এক লহমায় সুরেলা একটা আওয়াজ তুলে রবার্ট বলল, মাউথ অর্গান শুনবি? শোন...

শিপ্রা রবার্টের হাতটা চেপে ধরে বলল, না রে! আজ আর নয়। বাড়ি চল।

৪০

আজ ডিউটিতে আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে সাব-ইন্‌সপেক্টর অমূল্য পালের। অমূল্য দেখেছে যেদিনই কোনও কারণে আসতে একটু লেট হয়ে যায় সেদিনই সাতসকালে ওপরওয়ালাদের তলব পড়ে। ভাগ্যের ফেরে আজও তার ব্যতিক্রম হল না। লালবাজারের গেট পেরিয়ে সবে ঢুকছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একজন কনস্টেবল এসে বলল, সিনহা সাহেব আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁজছেন।

অমূল্য নিজের বসার জায়গায় না গিয়ে গতি বাড়িয়ে ইন্‌সপেক্টর সিনহার ঘরে এসে ঢুকে দেরিতে আসার জন্য প্রাপ্য বকুনিটুকু খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ইন্‌সপেক্টর সিনহা মন দিয়ে একটা ফাইল পড়ছিলেন। একবার ফাইল থেকে মুখটা তুলে অমূল্যকে সামনে দেখেও কিছু বললেন না, আবার ফাইলে মুখটা ডুবিয়ে দিলেন। অমূল্য একই অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পরে ফাইল থেকে মুখটা না তুলেই ইন্‌সপেক্টর সিনহা বললেন, শিপ্রা সান্যালকে তোমার মনে আছে অমূল্য?

নামটা অমূল্যর মধ্যে একটা বিদ্যুচ্চমকের মতো কাজ করল। শিপ্রা সান্যালকে কি ভুলতে পারে! মনে মনে যে-ক'জন হাতগোনা সুন্দরীর আরাধনা সে করে, স্বপ্নে দেখতে চায়, তার সংখ্যা তিন। বৈজয়ন্তীমালা, আশা পারেখ আর শিপ্রা সান্যাল। প্রথম দু'জন রুপোলি পরদার নায়িকা। পুলিশের ডিউটি করেও কখনও ওদের দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু শিপ্রা সান্যালকে চর্মচক্ষু সার্থক করে দেখেছে। মাছি পেছলানো মাখন পিঠটায় দুটো তিলের অবস্থান মুখস্থ অমূল্যর। পারফিউম আর শরীরের গন্ধের অদ্ভুত একটা মিশেল। চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস নিলে এখনও নাকে সেই মাতাল গন্ধটার যেন রেশ ছড়িয়ে যায়।

মনে পড়ছে! কথাটা উচ্ছ্বাস দেখিয়ে বলতে পারল না অমূল্য। সিনিয়ারদের সামনে এভাবে উচ্ছ্বাস দেখানোটা দস্তুর নয়। অমূল্য নিজের ভেতরটা ঢাকতে চেষ্টা করল, নামটা স্যার চেনা চেনা...

ইন্‌সপেক্টর সিনহা একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অমূল্যর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কথা আর চোখ কিন্তু এক কথা বলছে না অমূল্য।

অমূল্যর চোখের ভাষায় কী পরিবর্তন হয়েছে, অমূল্য আন্দাজ করতে পারল না। ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে আর কোনও মন্তব্য করার সুযোগ না দিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে। দয়াল সান্যালের স্ত্রী। ভদ্রমহিলাকে আমাদের কিছুদিন...

ইন্‌সপেক্টর সিনহা অমূল্যকে শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলেন, সেই সান্যালই আবার একটা কমপ্লেন করেছেন। ডিসগাস্টিং। ওঁর বউ নাকি স্পাইং করছে। অদ্ভুত কমপ্লেন বুঝলে। শিপ্রা সান্যাল নাকি ছাদে একটা লম্বা এরিয়াল লাগিয়েছে। আর সময় নেই, অসময় নেই, বাড়িতে নাকি রেডিয়োর মতো একটা যন্ত্রের সামনে বসে খটখট আওয়াজ করে।

আওয়াজ মানে স্যার?

অ্যাকর্ডিং টু দয়াল সান্যাল, ওই আওয়াজগুলো নাকি সাংকেতিক ভাষা। কোড। শিপ্রা সান্যাল ওইসব সাংকেতিক ভাষা দিয়ে স্পাইং করছে। ডিসগাস্টিং।

ইন্‌সপেক্টর সিনহা শার্প শ্যুটার। যে-ঘটনাতে অ্যাকশন নেই পৃথিবীতে সেরকম ঘটনা ওঁর খুব তেতো মনে হয়। অমূল্য এর প্রমাণ বহুবার পেয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ শোনার জন্য টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অমূল্য।

বড়কর্তাদের ইচ্ছে বুঝলে। বড়কর্তাদের ইচ্ছে মানে তো আদেশই। হুকুম এসেছে দয়াল সান্যালের কথার সারবত্তা নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে হবে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল অমূল্যর কাছে। ব্যাপারটা কী, অভিযোগটা কতটা সত্যি এসবেরই একটা রিপোর্ট করতে হবে। অমূল্যর অনুমানকে অভ্রান্ত করে ইন্‌সপেক্টর সিনহা বললেন, তুমি একবার দয়াল সান্যালের বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করে এসো তো।

স্বপ্নে আরাধ্য নারীকে আর একবার চোখ সার্থক করে দেখার আশায় ভেতরটায় খুশি ছলকে উঠল অমূল্যর। ইন্‌সপেক্টর সিনহা ক্ষুরধার চোখে অমূল্যর মনের মতো কাজ পাওয়ার উৎসাহের প্রতিটি রেখা পড়ে নিলেন।

গলাটা যথাসম্ভব নির্লিপ্ত করে অমূল্য বলার চেষ্টা করল, স্যার, কমপ্লেন লেটারটা?

ইন্‌সপেক্টার সিনহা মাথা ঝাঁকালেন, কোনও কমপ্লেন লেটার নেই। সবটাই ভার্বালি এসিপি-কে দয়াল সান্যাল জানিয়েছে। তোমাকে শুধু একটা অ্যাডভাইস দেব। মহিলা কিন্তু ধূর্ত। তুমি ওই নরম পুতুল-পুতুল চেহারাটা দেখে গলে যেয়ো না। মন দিয়ে ব্যাপারটা জেনে আসার চেষ্টা করবে। যাও।

অমূল্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ইন্‌সপেক্টর সিনহা পিছু ডাকলেন।

শোনো অমূল্য। আর একটা কথা। আই থিঙ্ক ইট নিড নট টু মেনশন। শিপ্রা সান্যাল

যেন বুঝতে না পারে, কমপ্লেনটা দয়াল সান্যালের কাছ থেকে এসেছে। এটা এসিপি-র স্ট্রিক্ট ইন্‌সট্রাকশন।

হাতের দুটো খুচরো কাজ দ্রুত সেরে নিয়ে ডিপার্টমেন্টের জিপ আর দু'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে অমূল্য রওনা দিল দয়াল সান্যালের বাড়ির উদ্দেশে। বাড়িতে ঢোকার ভারী লোহার গেটটার সামনে যখন জিপটা দাঁড়াল, জিপে বসেই অমূল্যর চোখে পড়ল ছাদে লিকলিকে একটা এরিয়াল খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। আজকাল ভাল্‌ভ সেট রেডিয়ো প্রায় উঠেই যাচ্ছে। তার জায়গায় ট্রানজিস্টার আসছে। ছাদে এত বড় এরিয়াল টাঙানোর আর দরকারই হয় না। বাড়ির ছাদে রেডিয়োর এরিয়ালের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে। এই এরিয়ালটা তাই চোখে পড়ার মতোই। কনস্টেবল দু'জনকে জিপে অপেক্ষা করতে বলে অমূল্য একাই সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। পুলিশের লোকেরা চিরকালই বাড়তি খাতির আর সম্ভ্রম পায়। দয়াল সান্যালের বাড়ির কাজের লোকেরা জানাল ম্যাডাম স্নান করতে গেছেন। বসার ঘরে যত্ন করে এনে বসাল অমূল্যকে।

সেন্টার টেবিলের ওপর খবরের কাগজ আর গোটা দুই ম্যাগাজিন। অমূল্য আলগোছে সেগুলোর পাতা ওলটাতে ওলটাতে সময় কাটাতে থাকল। একসময় নাকে এসে ঠেকল সেই পারফিউমের গন্ধটা।

ম্যাগাজিনের পাতা থেকে মুখ তুলতেই চোখটা যেন ঝলসে গেল অমূল্যর। সামনাসামনি এত ভাল করে শিপ্রাকে কখনও দেখেনি। সদ্য স্নান করে পিঠ ছাপানো ভিজে চুলে আরও যেন অপ্সরা হয়ে উঠেছে শিপ্রা। অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে নমস্কার করে বলল, ম্যাডাম, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছি।

শিপ্রা অমূল্যকে বসতে বলে নিজেও শান্ত হয়ে বসে গম্ভীর গলায় বলল, বলুন।

ম্যাডাম একটা এনকোয়ারি ছিল। আপনার বাড়িতে কি এমন কোনও যন্ত্র আছে যাতে সাংকেতিকভাবে কোনও তথ্য আদানপ্রদান করা যায়?

শিপ্রা কয়েক সেকেন্ড সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে, তারপর আরও কঠিন গলায় বলল, আছে।

যন্ত্রটা কি একবার দেখতে পারি ম্যাডাম?

শিপ্রা গলাটাকে আরও গম্ভীর করে বলল, আপনার কাছে কি কোনও কোর্ট অর্ডার আছে?

অমূল্য আমতা আমতা করে বলল, না, তা নেই। আসলে একটা স্পেসিফিক কমপ্লেনের এগেনস্টে আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আর যন্ত্রটাকে একবার দেখতে চাই।

শিপ্রা একটা খর দৃষ্টিতে অমূল্যর দিকে তাকাল।

ওভাবে দেখতে চাইলেই তো দেখানো যায় না। প্রথমত, যে-যন্ত্রটার কথা আপনি বলছেন সেটা আমার বেডরুমে আছে। ওটা এখানে বয়ে নিয়ে আসা যাবে না। আর দ্বিতীয়ত, আপনি কী দেখতে চান?

অমূল্য একটা ঢোক গিলল। মহিলা শুধু সুন্দরীই নয়, যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তার ওপর

যে-ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত করতে এসেছে সে ব্যাপারে অমূল্যর নিজের সম্যক কোনও জ্ঞান নেই। শিপ্রা সান্যাল মনে হয় আইনকানুন সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। প্রথম কথাতেই 'কোর্ট অর্ডার' শুনিয়ে রেখেছে। তার ওপর অমূল্যর বয়স অল্প বলে এসব কোণঠাসা অবস্থায় জাল কেটে বেরিয়ে আসার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও নেই। কোনওরকমে নিজের পদমর্যাদা বাঁচানোর চেষ্টা করল।

আসলে ম্যাডাম কোনও কমপ্লেন এলে আমাদের দায়িত্বই হচ্ছে খোঁজখবর করা। আমি জানতে পারি কি, ওই যন্ত্রটা দিয়ে ঠিক কী করেন আপনি?

শিপ্রা একটুখানি সময় চুপ করে চিন্তা করল। তারপর, ঠিক আছে, বসুন আপনি, বলে উঠে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা ফাইল হাতে করে ফিরে এসে বলল, আমি একজন লাইসেন্সড অ্যামেচার রেডিয়ো অপারেটর। এই ফাইলটা দেখুন। সব কাগজপত্র পাবেন। আমার পারমিশন, কিউ. এস. এল কার্ড, কোন ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে অপারেট করে... অল নেসেসারি ডিটেলস।

অমূল্য হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে একটা একটা করে কাগজ উলটে দেখতে থাকল। বিষয়টা একদমই অজানা। 'হ্যাম রেডিয়ো' বলে একটা জিনিসের কথা ভাসাভাসা শুনেছে, তবে তদন্ত করতে গেলে যতটা জানা দরকার তা জানা নেই অমূল্যের।

শিপ্রা মন দিয়ে অমূল্যকে দেখছিল। অমূল্য যে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না সেটা ওর কাগজ ওলটানো দেখে বুঝতে পারল। ঠোঁটের কোনায় একটা মুচকি হাসি খেলে গেল শিপ্রার। অমূল্য সেন্টার টেবিলে ফাইলটা রাখার পর শিপ্রা বলল, ইজ এভরিথিং ইজ ইন অর্ডার অফিসার?

মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ বলা ছাড়া এই মুহূর্তে অমূল্যর আর কোনও উপায় ছিল না। শিপ্রা তির্যকভাবে বলল, তা হলে যিনি বা যাঁরা আপনাদের কাছে কমপ্লেন করেছেন তাঁদের নিশ্চিত হতে বলবেন, আমি কোনও বেআইনি কাজ করছি না। তাঁদের অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব ম্যাডাম? আপনি রেডিয়োতে কাদের সঙ্গে কথা বলেন, কে-ই বা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়?

অল লাইসেন্সড অপারেটরস ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রি। কী কথা হয় তাও সব লগ করা হয়। অ্যান্ড ফর ইয়োর কাইন্ড ইনফরমেশন আমি রেডিয়োতে ভয়েস কমিউনিকেশন করি না। মর্স কোডে কমিউনিকেট করি।

অমূল্য একটা অপেক্ষাকৃত চেনা বিষয় খুঁজে পেল।

মর্স কোড? মানে টেলিগ্রাফের টরে টক্কা টরে টক্কা...

এগজ্যাক্টলি, তবে ওটা টরে টক্কা নয়, ডি, ড্যাট।

হ্যাঁ, তাই কমপ্লেনে আছে। আপনি দিনরাত খট খট খট করেন।

শিপ্রা চুপ করে গেল। এতক্ষণ কে অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশের কাছে ভেবে পাচ্ছিল না। এবার নিজেকে বোকা মনে হল। যাকে সবচেয়ে আগে সন্দেহ করা উচিত ছিল, তাকেই সন্দেহের বাইরে রেখেছিল। রেডিয়োতে ভেসে আসা ডি ড্যাট বা শিপ্রার

আঙুলের চাপে তৈরি ডি ড্যাট কোনওটারই আওয়াজ এত জোরে নয় যে, বাড়ির বাইরে থেকে শোনা যায়। কমপ্লেনটা তা হলে গেছে পাশের ঘরে থাকা মানুষটার কাছ থেকেই এবং গেছে একেবারে গোয়েন্দা দফতরে।

ব্রাদার ডি'সুজা শিপ্রাকে যেদিন অ্যামেচার রেডিয়ো কমিউনিকেশনের প্রথম পাঠটা দিয়েছিলেন, সেদিনই বলেছিলেন অ্যামেচার রেডিয়োতে ভয়েস কমিউনিকেশনই দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। তবু শিপ্রা মর্স কোডের কমিউনিকেশনটাকেই নিজের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পরে যথেষ্ট কষ্ট করে শিখেছে। তারও কারণ ছিল একটাই। কী কথা বলছে, কার সঙ্গে কথা বলছে সেটা পাশের ঘরের মানুষটার কাছ থেকে যথাসম্ভব গোপন রাখা।

শিপ্রার একটা মজা লাগছিল। অল্পবয়স্ক নরম নরম অফিসারটা তদন্ত করতে এসে কোনও খেই পাচ্ছে না। গত কয়েক বছর আগেকার কথা মনে আসছিল বারবার। ঠিক যে-জায়গাটায় এখন অল্পবয়স্ক অফিসারটা বসে আছে সেখানে এসে বসত কড়া ধাতের অফিসাররা। স্নায়ুর যুদ্ধ চলত তখন।

কী ভাবছেন অফিসার? আমি কাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি?

হ্যাঁ ম্যাডাম, এটা আমার ইনভেস্টিগেশনের একটা পার্ট।

আমরা আসলে একটা সংগঠন। পৃথিবীজোড়া সংগঠন।

অমূল্য আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী কাজ আপনাদের সংগঠনের?

পৃথিবীজুড়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে মানুষের উপকার করা। মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

যেমন?

যেমন ধরুন এই উনিশো তিয়াত্তরেই দুটো বড় প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। ব্রাজিল থেকে প্যারিসের অর্লি এয়ারপোর্টে নামার আগে একটা প্লেন ক্র্যাশ করে। আবার একত্রিশে জুলাই বস্টনের লোগান এয়ারপোর্টে আর একটা প্লেন ক্র্যাশ করে। দুটো খবরেই আমি রিলের কাজ করেছি। তিরিশে জুন একটা দীর্ঘতম সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। বিভিন্ন দেশে এটা আমরা ম্যাপ করেছি। আমি এই টিমটার একজন মেম্বার ছিলাম।

অমূল্যর আরও গুলিয়ে যেতে থাকল। শিপ্রাও সম্ভবত এটাই চাইছিল। অমূল্যকে আরও কনফিউজ করে দিতে।

ইন্‌সপেক্টর সিনহাকে দেওয়ার মতো প্রাথমিক তথ্যটুকু অল্প হলেও জোগাড় করা গেছে। এর পরেও এটা নিয়ে লেগে থাকার দায়িত্ব পেলে রীতিমতো পড়াশুনো করে তৈরি হয়ে আসতে হবে। অমূল্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। আমার যেটুকু জানার দরকার ছিল জানা হয়ে গেছে।

শিপ্রা অমূল্যকে বিদায় দেওয়ার আগে বলল, যিনি আপনাদের কমপ্লেনটা করেছেন তাঁকে বলে দেবেন, হ্যাম কথাটার একটা প্রচলিত মানে হচ্ছে, হেলপিং অল ম্যানকাইন্ড। কারও কোনও ক্ষতির জন্য আমরা কোনও কাজ করি না।

এভাবেই বছর ঘুরতে থাকল। বিট্টুর ছুটিতে কলকাতায় আসা, কখনও শিপ্রার

কার্শিয়াং যাওয়া, দয়াল সান্যালের বৈরিতা, তুলো চাষের স্বপ্ন—সব একই রকম থাকল। হ্যামের প্রতি আসক্তি শিপ্রার দিনের পর দিন বাড়তেই থাকল। ব্রাদার ডি'সুজা যেরকম বলেছিলেন, ঠিক সেরকমই পৃথিবীর এক-এক প্রান্তে শিপ্রার নতুন নতুন বন্ধু হতে থাকল। নিজের কল্পনাশক্তিতে শিপ্রা সেই সব বন্ধুদের এক-একটা মুখচ্ছবি আঁকতে থাকত। আসলে দয়াল সান্যালের সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কহীন জীবন, ছেলেকে ছেড়ে থাকার শূন্যতা, হরির ঝিল নিয়ে কিছু করতে না পারার তীব্র হতাশা—সব কিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করত ওই ছোট্ট রেডিয়োর বাক্সটায়। তবে এর বাইরেও সব সময় যেটা ভেতরে খোঁচা মেরে যেত, সেটা হল দয়াল সান্যালের অ্যালঝাইমার্স হওয়ার সম্ভাবনা। দয়াল সান্যালের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ হারিয়েও অদ্ভুত একটা দোটানায় জর্জরিত হত শিপ্রা।

ডক্টর হেমন্ত পাঠকের সঙ্গে বার দুয়েক দেখা করেছিল শিপ্রা। ডক্টর পাঠক জানিয়েছিলেন, দয়াল সান্যাল আর ওঁর চেম্বারে আসেননি। সরোজ বক্সীকেও কথাটা বলেছিল শিপ্রা। যদি কোনওভাবে ডক্টর পাঠকের কাছে দয়াল সান্যালকে পাঠানো যায়। সরোজ বক্সীর সেই ক্ষমতা ছিল না। বরং শিপ্রাকে একদিন শুনিয়েছিলেন অন্য কথা।

ম্যাডাম, আমার মনে হয় স্যার বিদেশে গিয়ে কিছু চিকিৎসা করিয়েছেন।

শিপ্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার অনুমানের কারণ?

না, উনি নিজের মুখে কখনও কিছু বলেননি, তবে কথায় কথায় যেন মনে হয়েছে।

শিপ্রা চিন্তিত হয়ে বলেছিল, ডক্টর কৈলাস মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন না?

সরোজ বক্সী একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, কৈলাস মুখার্জি আমাকে কিছু বলবেন না। উলটে আমি জিজ্ঞেস করলে স্যারের কানে তুলে দেবেন। তখন একটা হুলস্থুলু কাণ্ড হবে ম্যাডাম।

শিপ্রা চিন্তা করে বলেছিল, ঠিক বলেছেন। আমাকেই কথা বলতে হবে।

তবে শেষপর্যন্ত শিপ্রাও ডক্টর কৈলাস মুখার্জিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারেনি একই কারণে। তবে সরোজ বক্সীর অনুমানটা যে ঠিক ছিল সেই খবরটা ডক্টর কৈলাস মুখার্জির কাছ থেকে এনে দিয়েছিলেন ডক্টর হেমন্ত পাঠক। শিপ্রা সেই ডাক্তারের নামটাও পেয়ে গিয়েছিল, ডক্টর রিচার্ড ম্যাকফারসন।

এই ডক্টর রিচার্ড ম্যাকফারসন কে এবং দয়াল সান্যালের উনি কী চিকিৎসা করেছিলেন সেটা জানার জন্য শিপ্রা আশ্রয় নিয়েছিল হ্যাম বন্ধুদের। হ্যাম বন্ধুরা অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারে। অত্যন্ত নিষ্ঠাভরে হ্যাম বন্ধুরা ডক্টর রিচার্ড ম্যাকফারসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিয়েছিল লন্ডনে দয়াল সান্যালের শুশ্রূষার গোপন রিপোর্ট।

ডক্টর হেমন্ত পাঠকের সঙ্গে ডক্টর রিচার্ড ম্যাকফারসনের আশঙ্কার খুব একটা তারতম্য পাওয়া গেল না। তবে শিপ্রা একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হল দয়াল সান্যাল নিজের রোগের ব্যাপারে অন্তত সচেতন। না হলে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করাতেন না। বরং ডক্টর ম্যাকফারসনের চিকিৎসা নির্ণয় আরও গভীর ছিল। অহেতুক মৃত্যুভয়টা উনি

নাম ভুলে যাওয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবং ডক্টর হেমন্ত পাঠকের মতো উনিও পারিবারিক সহানুভূতির বিষয়টার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

দয়াল সান্যালের সঙ্গে শিপ্রার বিরোধের কারণগুলো কী এবং দয়াল সান্যাল শিপ্রার জীবনটাকে দিনের পর দিন কতখানি দুর্বিষহ করে তুলছিলেন এসব শিপ্রা কোনওদিন হ্যাম বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। কিন্তু শিপ্রার জীবনে স্বামীকে নিয়ে এই সংকটে হ্যাম বন্ধুরা একেবারে শিপ্রার পাশে এসে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে থাকল। এদের ক্রমাগত পরামর্শে শিপ্রা মার্থার ছবিকে সামনে রেখে শেষপর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল। একদিন দয়াল সান্যালের কাছে এসে বলল, হরিতলার বাংলো আর জমিটা পেলে তুমি সত্যিই ভাল থাকবে?

শিপ্রার কথাগুলো যেন দয়াল সান্যাল বুঝেও বুঝতে পারলেন না। অবিশ্বাস্য কিছু শব্দের গোছা। শিপ্রার ভেঙে পড়া আত্মসমর্পণ করতে চাওয়া চেহারাটা যেন চোখে পড়েও পড়ল না।

কী বলতে চাইছ তুমি?

জমি আর বাংলোটা নিয়ে নাও তুমি।

দয়াল সান্যাল যেন তবুও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এত বছর ধরে নিরন্তর কৌশল, ছল এবং অনলস চেষ্টায় যে-বাধাটা কিছুতেই দূর করতে পারছিলেন না, সেটা যে বরণডালার মতো চোখের সামনে আছে বিশ্বাস করা শক্ত। অস্ফুট গলায় বেরিয়ে গেল, তোমার পাখি?

ক্লান্ত গলায় শিপ্রা বলল, ওরা আসবে। ওরা ঠিক আসবে... ভালবাসার টানের চেয়ে বড় কিছু হয় না।

শিপ্রার দার্শনিকের মতো কথাগুলো দয়াল সান্যালের কানে আর ঢুকছিল না। খালি মনে হচ্ছিল এতদিনে ভগবান মেয়েটাকে সুমতি দিয়েছেন। শিপ্রার দু'কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি কমলেশকে বলব...

আমি জানি কমলেশ কী নিয়ে কাজ করে...

বিশ্বাস করো... আমাকে একটু বিশ্বাস করো... আমি সব গুছিয়ে দেব।

শিপ্রা কাঁধ থেকে দয়াল সান্যালের হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে বলল, কোথায় আমাকে সই করতে হবে, কাগজগুলো পাঠিয়ে দিয়ো। একটাই শর্ত আজও রয়েছে আমার, তুমি ওখানে এমন কিছু করবে না, যাতে পাখিদের ক্ষতি হয়...

দয়াল সান্যালও এই সুযোগের জন্য মুহূর্তকাল দেরি করেননি। পরের দিনই সরোজ বক্সীকে দিয়ে শশধর দাশগুপ্তর কাছ থেকে স্ট্যাম্প পেপারে চুক্তিপত্র করিয়ে এনে নিজের হাতে কাগজগুলো শিপ্রার কাছে নিয়ে এলেন। কাগজগুলোতে সই করার আগে শিপ্রা এক মুহূর্তের জন্য থমকে গিয়ে দয়াল সান্যালকে বলল, তোমাকে শুধু আমার একটা কথা শুনতে হবে।

দয়াল সান্যাল ইপ্সিত মুহূর্তটার দোরগোড়ায় এসে যে-কোনও শর্ত মানতে রাজি। ছটফট করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শুনব, বলো।

ডক্টর পাঠকের কাছে তোমার চিকিৎসাটা করতে হবে।

এবার চমকে উঠলেন দয়াল সান্যাল। ডক্টর পাঠকের কথা শিপ্রা জানল কীভাবে? এটা তো কারও জানার কথা নয়। এমনকী সরোজ বক্সীরও নয়। গম্ভীর হয়ে মাথা ঝোঁকালেন, তুমি বলছ, তাই যাব। তবে এটাও জেনে রাখো, আমার কিচ্ছু হয়নি...

শিপ্রা কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করল। তারপর খসখস করে নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে সই করে দিল।

সারারাত ঘুম হল না দয়াল সান্যালের। শশধর দাশগুপ্ত বারবার সাবধান করেছিলেন জাল সইয়ের দলিল নিয়ে ব্যাঙ্ক লোন করা, সম্পত্তি বাড়ানো, দুটোতেই প্রবল ঝুঁকি আছে। ধরা পড়লে ঠগবাজির দায়ে জেলহাজত হয়ে যেতে পারে। এবার আর কোনও বাধাই রইল না। তরতর করে পরিকল্পনামাফিক বিদেশি মেশিনপত্তর আমদানি করে কারখানাটা বাড়বে। এই সাফল্যটা যখন অনায়াসে চলে এল তুলো চাষটাও এবার এরকমই সফল হবে। এমনিতেই মরাঠি, গুজরাতি কারখানাগুলো পলিয়েস্টার, ভিনাইল নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফুলেফেঁপে উঠছে। এবার ওদের চমকে দেওয়ার সময় এসেছে। প্রথম দফায় এর চেয়ে আদর্শ জায়গা আর কোথায় আছে? স্বপ্নে সেই জমিটাও দেখতে শুরু করলেন। জায়গাটা ডুমুরঝরায়। যে-গ্রামে আটচল্লিশ বছর আগে জন্ম হয়েছিল তার। বাইশ বছর বয়সে সেই গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তারপর ডুমুরঝরার আর কোনও খোঁজ নেননি কোনওদিন। গোপনে লোক পাঠিয়ে ডুমুরঝরার খোঁজ করলেন। জানলেন বাড়িতে এখনও বাবা বেঁচে আছেন। ভাইয়েরা আছে। ইদানীংকালে ভাল সারের চলন হয়েছে, স্যালোর জল পাওয়া যাচ্ছে। সরকার বলছে ডুমুরঝরার জমি দো ফসলা থেকে তিন ফসলা হয়ে যাবে। তবে একই সঙ্গে আর একটা মনের মতো খবর পেলেন। গত বছর থেকে খরায় ধুঁকছে ডুমুরঝরা। তিন ফসলা থেকে স্বপ্নটা নিজের লক্ষ্যের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার আদর্শ সময় এটা। ছাব্বিশ বছর পরে ডুমুরঝরায় আবার যাবেন ঠিক করলেন দয়াল সান্যাল। দিনটা ঠিক করলেন বৈশাখ পূর্ণিমা।

৪১

ডুমুরঝরা গ্রামটা বর্ধমান জেলায়, বীরভূম জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। গ্রামটার নামের ইতিহাসের কেউ খোঁজ রাখে না। কোনওকালে হয়তো এখানে ডুমুরগাছের অস্তিত্ব ছিল, তবে এখন আর একটাও ডুমুরগাছ দেখা যায় না ডুমুরঝরাতে। গ্রামটা বর্ধিষ্ণুতার মাপকাঠি ছুঁতে না পারলেও, আর দশটা গ্রামের চেয়ে ডুমুরঝরা অঞ্চলখ্যাত একটাই কারণে। সেটা হল ধর্মরায়ের মেলা।

ধর্মরায় ধর্মদেবতা। তার বাহন ঢেঁকি। বৈশাখ পূর্ণিমায় ঘটা করে সেই ঢেঁকির পুজো হয়। নতুন ধান এই ঢেঁকিতে প্রথম কোটা হয়। রীতি মেনে এটাই অর্ঘ্য। এই অর্ঘ্য প্রদান

থেকেই উৎসবের সূচনা। জমে ওঠে সপ্তাহব্যাপী মেলা। যেহেতু আশেপাশের গ্রামে ঠিক এই ধরনের কোনও উৎসব বা মেলা নেই, বৈশাখ পূর্ণিমার সময় ডুমুরঝরা হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চলের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রাম থেকে জীবিকার সন্ধানে দূর-দূরান্তে যাওয়া মানুষজন চেষ্টা করে শিকড়ের টানে এই সময়টা ডুমুরঝরাতে কাটিয়ে যেতে। ডুমুরঝরা গ্রামের সনাতন সান্যালের পাঁচ ছেলের বড়জন দয়াল। সনাতন সান্যাল ডুমুরঝরা গ্রামের বাইরে জেলা সদরে বছরে খুব বেশি হলে একবার বা দু'বার যান। তার বাইরে কখনওই নয়। তাঁর ছেলে দয়াল, ম্যাট্রিকের গণ্ডি টপকিয়ে আঠেরোতেই ঠিক করেছিল কলকাতায় যাবে। সনাতনের তখন আঠাশ বিঘে চাষের জমি, তিনটে ভাগের পুকুর। সাতটা মুনিষ কাজ করে চাষবাস করার জন্য। গায়ে-গতরে ছেলেদের লেগে থাকতে হবে। তাই সনাতন কিছুতেই রাজি ছিলেন না যখন বড়ছেলে রুজির সন্ধানে কলকাতায় চলে যাবে বলেছিল। কিন্তু ছেলেটা ছিল অসম্ভব জেদি। তাই বাপের আপত্তির তোয়াক্কা করেনি। পড়াশোনা আর না করলেও তার বছর চারেকের মাথায় সত্যিই একদিন সব ছেড়েছুড়ে সে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। তার খোঁজ কেউ জানত না। কেউ বলত সন্ন্যাসী হয়ে গেছে, কেউ বলত দুষ্কর্ম করে জেলে পচছে। আদৌ বেঁচে আছে কি না সে নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করত কেউ কেউ।

সনাতন এসবের কিছুই বিশ্বাস করতেন না, তবে বড়ছেলের অস্তিত্ব ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছিল। বুকের ভেতর মিলেমিশে থাকা ক্রোধ আর জমাট অভিমানটাও মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। ছোট ছেলেটার বয়স যখন বছর দুয়েক ছিল, তখন স্ত্রী গত হয়েছিলেন। তাই সে পক্ষ থেকেও হারিয়ে যাওয়া ছেলের কোনও খোঁজখবর নেওয়ার তাগিদ ছিল না। কিন্তু ছাব্বিশ বছর পরে সেই বড়ছেলে সনাতনের বুকে আবার একটা কাঁটা হয়ে ফিরে এল একেবারে বৈশাখ পূর্ণিমায়।

সময়টা এ বছর বড় খারাপ। ওপার বাংলার যুদ্ধের বোঝা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছে এপার বাংলা। জিনিসপত্রর দাম সেই যে লাফ মেরে যুদ্ধের সময় উঠেছিল, তা তো আর নামলই না, আরও বরং উঠতে চায়। তার ওপর গেল বছরটা বিভীষিকার মতো কেটেছে। জমিতে ফলন ওঠেনি এ অঞ্চলে। খরায় খাঁ খাঁ করেছে মাইলের পর মাইল। বাড়িতে বাড়িতে ধানের মরাইয়ে শস্য তলানি ছুঁয়েছে। বাজারে জিনিস দুষ্প্রাপ্য। যেটুকু-বা পাওয়া যায়, তা অগ্নিমূল্য। স্বাভাবিক কারণেই এবার বৈশাখ পূর্ণিমায় ধর্মরায়ের পুজো নিয়ম রক্ষার্থে নমো নমো করে হচ্ছে।

পাকা রাস্তা থেকে ডুমুরঝরা গ্রামে ঢুকতে দেড় মাইল কাঁচা রাস্তা পেরোতে হয়। সেই রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলে দয়াল সান্যালের গাড়ি ধরল ডুমুরঝরার পথ। গাড়ির পিছন পিছন একপাল আধা ল্যাংটা কচিকাঁচার দল। গাড়িটা সোজা এসে দাঁড়াল সনাতনের বাড়ির সামনে।

বাড়ির সকলে ভিড় করল উঠোনের গোড়ায় সদর দরজায়। গাড়ি থেকে যে-চকচকে মানুষটা নেমে এল তাকে পরিবারের কেউই প্রথম ধাক্কায় চিনতে পারেনি। এমনকী নিজের সহোদররাও নয়। তবে শেষপর্যন্ত অবশ্য তারাই বড়দার মুখের ছাপগুলো

দেখে, সংশয়গুলো কাটিয়ে চিনতে পারল এবং প্রবল উত্তেজনায় অনুভব করল বড়দা শুধু বেঁচেই নেই, মস্ত বড়লোক হয়ে বেঁচে আছে।

দয়াল সান্যালও বাড়িতে ঢুকে কিছুতেই মেলাতে পারছিলেন না যে, এই বাড়িতেই তাঁর জন্ম থেকে বাইশটা বছর কেটেছে। বাড়িটার কাঠামোটা একটুও পালটায়নি। তবে অনেক জীর্ণ হয়েছে। সেটা তাঁর অনভ্যস্ত চোখের দোষ, না দারিদ্রের ছায়া সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। যৌথ পরিবারটা আরও অনেক বড় হয়েছে। ছোটদের অনেককে তিনি চোখেই দেখেননি। মেজ ভাইটা বড় ভাইয়ের অপেক্ষা না করে উনিশেই বিয়ে করে নিয়েছিল। সেই ছিল এ প্রজন্মের প্রথম বউ। লাবণ্যে ভরপুর এক যুবতী। তার এখন দড় পাকানো এক রুক্ষ চেহারা।

একটা ঘোর নিয়ে দয়াল সান্যাল বাবার ঘরে এলেন। সনাতন বয়সের ভারে অনেকটা সময়ই এখন বিছানায় কাটান। ছানিপড়া চোখে দরজার চৌকাঠে আবছা আবছা নিজের বড়ছেলেকে অন্যদের মতোই প্রথমে চিনতে পারেননি সনাতন। দয়াল সান্যাল এগিয়ে এসে সনাতনের পা ছুঁয়ে বললেন, ভাল আছ বাবা?

কে?

দয়াল সান্যাল সনাতনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললেন, আমি দয়া।

দয়াল এসে বিছানার একপাশে বসে বাবার শীর্ণ হাতটার কুঁচকে যাওয়া চামড়ার ওপর নিজের হাতটা রাখলেন। ছেলের হাতের স্পর্শে সনাতনের আর কোনও সন্দেহ থাকল না। আবিষ্ট হয়ে বললেন, ইতদিন পইরে বাপকে ময়নে পৈরল?

এত বছর পর পিতা-পুত্রের মিলনদৃশ্য দেখার জন্য ঘরটায় তখন একটু একটু করে ভিড় জমতে শুরু করেছে। দয়াল সান্যাল কিছু বলার আগে কেউ একটা বলল, বইরদা আইখন মইস্ত বেটাছেইলে হৈছে গো।

সনাতন মস্ত বড় মানুষ হওয়ার প্রতীক গাড়িটাকে দেখেননি। ছেলেটা যেদিন একবস্ত্রে গ্রাম ছেড়েছিল সেদিন স্বভাবে গড়নে নিজের বাকি ছেলেগুলোর মতোই ছিল দয়াল। এখন আকৃতি থেকে চাকচিক্যে সবেতেই পালটে গেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ফলন নাই, এইতো গুলান পেইট কী কৈরা চইলবে বল দেখি বাপ।

দয়াল সান্যাল একটা শুকনো হেসে বললেন, এত চিন্তা করছ কেন, আমি তো আছি।

ছেলেটার কথা বলার সোহাগি ভাষাটাও কেমন যেন প্রাণহীন শহুরে। যে-ছেলে এত বছর বাপ বেঁচে আছে না মরে গেছে সেই খবর রাখেনি, এই দুর্বিসহ অভাবের দিনে তার পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাসবাণীতে বিশেষ ভরসা পেলেন না সনাতন। কড়িবরগার দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাস হয়ে বললেন, তুই আর কী কৈরবি বাপ? ইতদিন পর এইছিস, ইতেই পরান জুইড়ালো।

দয়াল সান্যাল একবার খাট ঘিরে ভিড়টার ওপর চোখ বুলিয়ে পকেট থেকে একগোছা টাকা বার করে সনাতনের হাতে দিলেন।

অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকা। প্রতি বছর ধান বিক্রি করে সনাতন যে-তৃপ্তির শ্বাস নেন,

তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা। এত টাকা যে, মিলিয়ে যাওয়া অভিমানকে নতুন করে জমাট বাঁধতে দেয় না। হাতের মুঠোয় টাকাটা খাবলে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল সনাতনের। ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, সেই দিলি বাপ। ইটা ক'দিন আইগ্যে দিইলে লাখিটা আর মইরত না।

লাখির মৃত্যুশোকে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দয়াল সান্যালের হাতটা সনাতন ধরে থাকলেন। এমন সময় দুটো বাচ্চা ছেলে কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলল, তুইমাদের উইঠানে সসানের কালীঠাইকুর এয়েছে গো। পাপ ধুইবে চলো...

ছেলেগুলো কথা শেষ করতে পারল না। সনাতন আর একটা নতুন শহুরে মানুষকে ঘিরে বাড়ির সবাইকে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। 'শ্মশানকালী' কথাটা কেমন খট করে কানে লাগল দয়াল সান্যালের। ডুমুরঝরা গ্রামের বাইরে একটা মরা নদীর চরে শ্মশান। তার পাশেই একটা ভাঙাচোরা কালীর মন্দির। স্কুলে যাতায়াতের পথে পড়ত জায়গাটা। একটা অদ্ভুত পাগলাটে বুড়ো ডোম থাকত ওখানে। দেখা হলেই বলত, 'জিখানেই যাস না ক্যানে, শেইস দিন ইখানেই ইসে জইলতে হবে।' কথাটা সেই বয়স থেকেই ভাল লাগত না দয়াল সান্যালের। এখন মাঝে মাঝে মৃত্যুচিন্তা উঁকিঝুঁকি মারে। তখন শিউরে ওঠেন দয়াল সান্যাল। অনেক অনেক কাজ বাকি। হরিতলা কটন মিলটাকে অনেক বড় করতে হবে। ব্যবসায়ী মহলের কুর্নিশ কুড়োতে হবে। তার মধ্যে 'শ্মশানকালী', 'লাখির মৃত্যু' সেই মৃত্যুচিন্তাটাকেই যেন উসকে দিতে চাইছে।

লাখি কে? উদাস গলায় দয়াল জিজ্ঞেস করলেন।

সনাতন আহত হলেন। খেয়াল থাকল না ছাব্বিশ বছর আগে ছেলে যখন বাড়ি ছেড়েছিল তখন লাখির জন্মই হয়নি। খালি মনে হতে থাকল বড়মানুষ হয়ে ছেলেটা বাছুরটার নাম ভুলে গেল? তা হলে হয়তো এতদিনে মায়ের পেটের ভাইদের নামও ভুলে গেছে। লাখি না খেতে পেয়ে মরল। যাকে নিজের মেয়ের মতো প্রতিপালন করেছেন, শেষের ক'দিন তাকে জাবনাও জোগাতে পারলেন না। যে লাখির নামই ভুলে গেছে, এখন আর কী হবে তার কথা বলে! খুঁট দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে হাত মুঠো করে বললেন, ইতো ট্যাইকা... সৎ পইথ্যে উপায় কইরিস তো বাপ?

দয়াল হাসলেন। তারপর বাবাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আমি একটা কারখানা করেছি বাবা।

কারখানার আয়তন, ওজন, রকমফেরের ওপর বিন্দুমাত্র ধারণা নেই সনাতনের। জীবনে কারখানা গোত্রীয় একটা জিনিসই দেখেছেন। ধানকল। যেখানে ধান ফুটিয়ে সেদ্ধ চাল করা হয়। সিমেন্টের বিশাল বাঁধানো চাতাল থাকে সেখানে। মনে মনে সেই চাতালের মাপ আন্দাজ করে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কত বিঘে জমির ওপর তার কারখানা।

বিঘে নয় বাবা, একর। বিরাট জায়গা।

বিস্ময়ে হতবাক হলেন সনাতন। বাইশ বছর বয়সে যে-ছেলে কপর্দকহীন অবস্থায় বাড়ি ছেড়েছিল, সে আজ বিরাট জমির ওপর এক কারখানার মালিক! গর্বে বুকটা

ফুলে উঠল। ঘরের মধ্যে পরিবার-পরিজনদের দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছিল দয়াল সান্যালের টাকা দেখে আর কথা শুনে। সনাতনও ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে ভুলতে বসলেন, এই ক'বছর সে কী করে কাটিয়েছে, কী করে কারখানা করল। এমনকী বিয়েথা করে সংসারী হয়েছে কিনা সে কথা জিজ্ঞেস করতেও ভুলে গেলেন। লাখির মৃত্যুর দুঃখটা বুকে নিয়েও টাকাটা পেয়ে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ছেলেকে।

দয়াল সান্যালকে নিয়ে ভাইদের, ভাইয়ের বউদের আদর-আপ্যায়ন করার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। দুপুরে সনাতনের সঙ্গে খেতে বসলেন দয়াল সান্যাল। পুরনো স্মৃতি একটু একটু করে ফিরে আসছে। যে-কাঁসার থালা বাটি গ্লাসে দয়াল সান্যালকে খেতে দেওয়া হয়েছে সেটা এককালে বাড়ির সবচেয়ে মূল্যবান বাসন ছিল। অত্যন্ত সম্মাননীয় কেউ বাড়িতে খেলে ব্যবহার করা হত সেই সব বাসন। তবে সেই বাসনে যা খেতে দেওয়া হয়েছে, তাতে গা গুলিয়ে উঠল দয়াল সান্যালের!

রান্নাটা করেছিল বাড়ির ছোটবউ। প্রথম গ্রাসটা তুলে ভাশুরের স্বাদটা কেমন লাগে দেখার জন্য তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল। প্রতিক্রিয়াটা আশানুরূপ না হতে দেখে মেজ জা-কে হালকা কনুইয়ের ঠেলা মারল। মেজবউ নিচু গলায় বলল, দিদি বুইজি খুইব পাইক্যা রাইনধ্যে?

দয়াল সান্যালের পরিবার নিয়ে এতক্ষণ একটা প্রশ্নও কেউ জিজ্ঞেস করেনি। তবে এই বয়সে জীবনে এত সার্থক হয়ে বউ নিয়ে যে সংসার করছে, এটা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সেজভাই গোকুল মন দিয়ে খেতে খেতে বলল, তা, নিয়ে এইলি না ক্যানে, বউদিকে?

দয়াল সান্যালের উত্তরের অপেক্ষা না করে মেজভাই দুলাল বলে উঠল, আহা! বউদি কইলকাতার মাইয়াছিলে। ই ডুইমুরঝরার বোশেখের ভাপ কি সইত্যে পাইরবেক। পোষ পাবনে লিয়ে এইসো।

দয়াল সান্যাল ঢকঢক করে জল দিয়ে গলায় পিণ্ডটা নামাচ্ছিলেন আর এক মনে সবার তৃপ্তি করে খাওয়ার দৃশ্যটা দেখছিলেন। বাড়ির নাম না জানা বছর ছয়েকের একটা শিশু থেকে আরম্ভ করে সনাতন পর্যন্ত সার দিয়ে বাড়ির সব পুরুষেরা খেতে বসেছে। সনাতনের খেতে বসার ভঙ্গিটা একটু অদ্ভুত। শিরদাঁড়াটা সোজা রেখে বাঁ হাতটা টানটান করে মাটিতে গেদে রেখে খান। খাওয়ার সময় একটা ব্রাহ্মণত্বের অনুশাসন পালন করেন। থালার চারদিকে জল ছিটিয়ে আচমন করে খেতে বসেন। খাওয়ার সময় একটাও কথা বলেন না। নিজের পরিবারের প্রসঙ্গটা ওঠার পরও সনাতন একটাও কথা বললেন না দেখে খাওয়ার সময় বাবা যে কোনও কথা বলেন না, এই নিয়মটা মনে পড়ে গেল দয়াল সান্যালের। বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো মাথায় খেলে গেল বুদ্ধিটা। বুদ্ধিটা জানিয়ে দিল, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এতদিন পরে ডুমুরঝরায় আসা, সেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। সব ভাইরা আছে। বাবাও খেতে খেতে কোনও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিতে পারবে না। সকলের দিকে দ্রুত একবার চোখটা বুলিয়ে, গলাটা খাঁকরে পরিষ্কার করে প্রসঙ্গটা তুললেন দয়াল সান্যাল।

আমি গাড়িতে আসতে আসতে একটা কথা ভাবছিলাম। মাইলের পর মাইল এখানে তো কোনও ফসল নেই। ভাবছিলাম আমাদের জমিতে তুলো চাষ করলে কেমন হয়?

তুইলো চাইস? দুলাল খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করল।

আসলে আমার কারখানাটা একটা বড় সুতোকল। এই সুতোর জন্য তুলো আসে মহারাষ্ট্র, গুজরাত থেকে। আমরা যদি তুলোটা এখানেই চাষ করে নিতে পারি...

ই মাইটিতে তুইলো চাইস হয়, তা বাপু শুনি নাই। কাপাস তুইলো, শিমুল তুইলো চাইস কইরত্যেও তো দেইখি নাই...

দয়াল সান্যালের মন নেই ভাইয়ের ভাষণে। ওদের থামিয়ে দয়াল বলতে থাকলেন, আসলে এ-বাড়ির কথাটাও তো ভাবতে হবে। জমি যেরকম ফুটিফাটা হয়ে আছে, তাতে মনে হয় না পরেরবারও ধান উঠবে বলে। আমরা যদি তুলো ফলাতে পারি, পুরো তুলোটাই আমি কিনে নেব আমার কারখানার জন্য। হিসেব করে দেখেছি ধানের তিনগুণ পয়সা আসবে।

সনাতনের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। ধীরেসুস্থে উঠে মুখ ধুয়ে কাঁধের গামছাটায় হাত মুছতে মুছতে বললেন, শুনহ বাপ! বাপের কাইছ থেইক্যে আইট বিইঘ্যা পাইছিলাম। দাদন বাঁচাইয়্যা আইটকে আইঠ্যাশ কইরছি। পরকাল আর দেইরি নাই। আমি চইল্যা গেইলে তুরা পাচ ভাই, পাচ বিইঘ্যা ছয় কাইঠ্যা হয়, ভাইগ কইরা যার যা খুইসি চাইস করিস। ই ক'দিন বাপ ধাইনের লখহ্যিরে তারায়ে দিস না।

একদমে কথাগুলো বলে সনাতন হাঁপাতে থাকলেন। দয়াল সান্যাল অনেক হিসেব করে ভেবেছিলেন এই খরাক্লিষ্ট সময়ে অনায়াসে বাবাকে রাজি করানো যাবে। ঠিক করেছিলেন যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেটা সাধন করে বর্ধমানে ফিরে যাবেন। কালকে আবার সকাল সকাল এসে বাকি কাজের কাজগুলো করবেন। কিন্তু এসে রকমসকম দেখে মনে হতে লাগল এত সহজে সেটা বোধহয় সম্ভব নয়। আরও সময় দিতে হবে, আরও বোঝাতে হবে। আলাদা আলাদা করে ভাইদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। কিছু টাকা ওদেরও আলাদা করে দিতে হবে। তাই রাত কাটাতে বর্ধমানে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে ড্রাইভারকে পরের দিন দুপুরে আসার নির্দেশ দিয়ে বর্ধমানের কোনও একটা হোটেলে চলে যেতে বললেন।

দুপুরে কারও একটা ঘরে দয়াল সান্যালের বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। খাটের ওপর এঁটুলি গদি। তার ওপর শীতলপাটি বেছানো। ডুমুরঝরাতে আজও ইলেকট্রিসিটি আসেনি। গরমকালে কলকাতায় লোডশেডিং হলে এক মিনিটেই অধৈর্য হয়ে যেতে হয়। অথচ এখানে মাথার ওপর ভনভনে ফ্যান নেই, তার অভাব সেরকম বোঝা যাচ্ছে না। বরং ছোটবেলার অভ্যাসটাই ফিরে এসেছে। এককালে বাইরে লু বওয়া দুপুরে খালি গায়ে শীতলপাটিতে পিঠ পড়লেই চোখ বন্ধ হয়ে যেত। আজও বোধহয় সেই আরামের রেশটা রয়ে গেছে। ঝিমমারা শরীরে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতে লাগল দয়াল সান্যালের। আর সেইসঙ্গে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে

শিপ্রার গলাটা গুনগুন করে সেই গানটা গেয়ে চলেছে, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মনে নেই। ঘুমটা ভাঙতে দেখলেন একটা নিস্তব্ধ দুপুর। দুপুরের এই নিস্তব্ধতাটা অন্ধকার রাত্রির চেয়েও গাঢ়। মনে হচ্ছে এই ঘুমটা ভাঙল একটা গলার আওয়াজে। ঠিক যেন সেই বাচ্চা ছেলেটা হাঁক দিয়ে বলে গেল, 'সসানের কালী ঠাইকুর এয়েছে গো। পাপ ধুইবে চলো...' গলার আওয়াজটা মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তার রেশটা রয়ে গেছে। তার জায়গায় কোথাও একটা ঘুঘু ডাকছে। কয়েকবার ডাকার পরে কিছুক্ষণ চুপ। তারপর আবার। এই দুপুরের নিস্তব্ধতা আর থেকে থেকে ঘুঘুর ডাক দয়াল সান্যালের ভেতরে একটা ভয়ের জন্ম দিল। কীসের ভয়, কেন ভয়, পুরোটাই অবোধ্য। এককালে শুনতেন বাস্তুতে ঘুঘুর ডাক খুব অশুভ। ভয়টার উৎস হয়তো সেই শোনাটাই। নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না দয়াল সান্যাল। আবার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও পারলেন না। বরং চড়চড় করে ভয়টা বাড়তে থাকল। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঘরে কোনও জলের কুঁজো নেই। ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের উঠোনে এলেন। দুপুরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে বাড়ির মেয়েরাও তখন ভাতঘুম দিচ্ছে। উঠোনটা সুনসান, নিঝুম। সেই অজ্ঞাত ভয়টা এই নিঝুম উঠোনে যেন আরও বাড়তে থাকল। খালি মনে হচ্ছে, পিছনে একটা কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে আসছে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলতে। একটা ঘোর নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে মাটির রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকলেন দয়াল সান্যাল।

নির্জন রাস্তাটা দিয়ে কিছুটা এগোলেই একটা পুকুর। পুকুরের ওপর নুয়ে পড়েছে একটা তালগাছ। পুকুরের দিকে একঝলক তাকিয়েই পা দুটো পাথর হয়ে গেল দয়াল সান্যালের। কাঁচা বাঁধানো ঘাটটার একপাশে তার দিকে একদৃষ্টে ঠায় তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শ্মশানকালী। মুখটা নিকষ কালো। কালো মুখটার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে দুটো ফ্যাটফ্যাটে সাদা চোখ। মাথায় মুকুট। মুকুটের চারপাশ থেকে নেমে এসেছে রুক্ষ এলো চুল। চারটে হাত। তার দুটো লিকলিকে। আকাশের দিকে ওঠানো। গলায় নরমুণ্ডের মালা।

দয়াল সান্যালের বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে লাগল। পিছনে সেই অশরীরী আর সামনে শ্মশানকালী। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন দয়াল সান্যাল।

৪২

যে-কোনও কারণেই হোক ডুমুরঝরা গ্রামে গিয়ে খোঁজখবর করে আসার দায়িত্বটা সরোজ বক্সীকে দেননি দয়াল সান্যাল। এমনকী ডুমুরঝরা গ্রামেও সঙ্গে নিয়ে যাননি। অনেকদিন পর সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিস যাওয়ার কোনও চাপ নেই। বরং একটা কাজ বহুদিন ধরে পড়ে আছে, সেটা আজ করে নেবেন ঠিক করলেন।

অফিস যাওয়ার মতো সকাল সকাল চান করে ভাত খেয়ে অতসীকে বললেন রেডি হয়ে নিতে। অতসী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে?

পিজি-তে ডাক্তার কী বলেছিল মনে আছে? ছ'মাস পরে আর একবার পরীক্ষাগুলো করিয়ে চেক-আপ করাতে। ছ'মাসের জায়গায় এক বছর হয়ে গেছে... না, না, এত দেরি করা ঠিক হয়নি। আজই চলো।

অতসী হাসল।

আমি ঠিক হয়ে গেছি। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই।

সরোজ বক্সী বিরক্ত হলেন, শরীরের কিছু রোগ নীরবে বাড়ে। সব সময় জানান দেয় না। ডাক্তার যা বলেছে... সেটা মেনে চলো।

অতসী তবু নিজের সিদ্ধান্তে অটুট থাকল।

ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বললাম তো আমার আর কোনও অসুবিধে নেই।

নেই মানে? তোমার তলপেটে ব্যথা হয় না?

অতসী অল্প লজ্জা পেয়ে বলল, ওই মাসের দিনে কখনও কখনও হয়। পেটে তেল-জল লাগালে কমে যায়। ও নিয়ে তুমি ভেবো না। তুমি যখন বলছ তখন আর একদিন না হয় যাব। আজ কি তোমার অফিস নেই?

না, যাব না ভাবছি।

অতসী মুচকি হাসল, যাবে না... একটু পরেই তো আবার অফিস থেকে লোক তোমাকে ডাকতে আসবে। বলবে বড়সাহেব ডাকছেন।

সরোজ বক্সী মাথা নাড়লেন।

না, বড়সাহেব আজ ডুমুরঝরায় গেছেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন।

অতসী খুব খুশি হল। বাড়িতে স্বামীর একটু সান্নিধ্য পাওয়ার মধ্যেই অতসীর খুশি। মেয়েটার খুশি যেন আরও বেশি। বাবার কাছে ঘুরঘুর করছে। কাছছাড়া হতে চাইছে না। মেয়ের মাথার চুলটা ঘেঁটে দিয়ে সরোজ বক্সী বললেন, তা হলে চলো বীথিমাকে নিয়ে আজ এক জায়গায় ঘুরে আসি।

কোথায়?

সান্যালবাড়িতে।

সান্যালবাড়ির নাম শুনে অতসী কুঁকড়ে গেল। বাড়িতে দয়াল সান্যালের কথা প্রায় কিছুই বলেন না সরোজ বক্সী। তবু তার মধ্যে অল্পস্বল্প যেটুকু বলেছেন, অতসী তাতেই বুঝে ফেলেছে দয়াল সান্যাল একজন মেজাজি রাগী লোক।

ওরে বাবা। না, না, ওসব বড়লোক বাড়িতে যাব না।

কেন, যাবে না কেন? ম্যাডাম অনেকদিন বলেছেন তোমাকে আর বীথিমাকে নিয়ে যেতে।

তুমি তা হলে তোমার বীথিমাকে নিয়ে যাও। আমি যাব না।

সরোজ বক্সী আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন, কী আশ্চর্য! তোমার ভয় তো স্যারকে নিয়ে। তাও আমার কাছে শুনে শুনে। তোমাকে তো বললাম উনি এখন ডুমুরঝরায়।

প্রস্তাবটা অতসীর একদমই পছন্দ হয়নি। খুব বলতে ইচ্ছে করছিল, চলো আজ হাতিবাগানে সিনেমা দেখতে যাই। কতকাল তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখিনি। কিন্তু স্বামীকে কোনও ভাবেই প্রভাবিত করতে পারল না। সরোজ বক্সীরও যেন এক রকম জেদ চেপে আছে। সান্যালবাড়িতে অতসী আর বীথিকে নিয়ে যাবেনই।

সেই জেদটাকে বজায় রেখেই অতসী আর বীথিকে নিয়ে বিকেল বিকেল সান্যালবাড়ি চলে এলেন সরোজ বক্সী।

অতসী বসার ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল। শিপ্রা সান্যাল সম্পর্কে সে বহু কথা শুনেছে। বিশেষ করে বিয়ের পরে পরে যখন স্বামী তারই মধ্যে একটু গল্পগাছা করত, শিপ্রা সান্যাল সম্পর্কে অনেক কথা বলত। বিদুষী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। অতসীর মনটা কিন্তু সবসময় খচখচই করত। মহিলার মায়ের ইতিহাসটুকুও যে স্বামী বলে দিয়েছিলেন। অতসী কপট রাগ দেখিয়ে বলত, তুমি যেয়ো না ওর কাছে। সরোজ বক্সী হাসতেন। বলতেন, আমার বয়স কত ভুলে গেলে? বুড়ো হয়ে গেছি। তা ছাড়া ম্যাডামকে যা ভাবছ, তা নয়। একদম অন্যরকম মানুষ।

সেই অন্যরকম কোনওদিন না দেখা মানবী যখন অতসীর সামনে এসে হাজির হল, অতসী একদম বিহ্বল হয়ে গেল। সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা, আভিজাত্যের এরকম মিশেল সে আগে কখনও দেখেনি। জড়তা নিয়েই শিপ্রার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল।

শিপ্রা দ্রুত ঝুঁকে পড়া অতসীর হাত দুটো ধরে ফেলল, কী করছেন? সমবয়সির কেউ পা ছোঁয়?

অতসী মুখের কথা হারাল। শিপ্রা বীথিকে কোলে তুলে নিল। গাল টিপে আদর করে বলল, তুই তো খুব মিষ্টি দেখতে। একেবারে মায়ের মতো।

শিপ্রার কথা শুনে অতসীর গাল লাল হল। শিপ্রা সরোজ বক্সীকে বলল, আপনি বসুন সরোজবাবু। আমি ওদের নিয়ে ওপরে যাচ্ছি।

এভাবে একা এই ঘরটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসে থাকা, সরোজ বক্সীর মজ্জায় ঢুকে গেছে। সরোজ বক্সী জানেন শিপ্রা ওঁর ওপরের ঘরে যাওয়া পছন্দ করে না। দয়াল সান্যাল মধ্যে মাঝে মাঝেই ওপরে একদম শোওয়ার ঘরে ডেকে পাঠাতেন সরোজ বক্সীকে। শিপ্রার সঙ্গে বিরোধটা তখন চরমে ছিল। সরোজ বক্সী শিপ্রার প্রচণ্ড বিরক্ত মুখ দেখে বুঝতে পারতেন, সেটা শিপ্রা সান্যালের একদমই পছন্দ ছিল না। স্বামীর সঙ্গে শোওয়ার ঘর আলাদা হয়ে গেলেও, মালিক-ভৃত্যর সীমারেখা কোথায় টানতে হয় শিপ্রার ভালভাবেই জানা ছিল।

বসার ঘরের এক কোনা দিয়ে ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে অতসী আর বীথির ধাপ ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে মিলিয়ে যাওয়া পাগুলো দেখতে দেখতে সরোজ বক্সীর মনে হল ওরা যেন নিজের গুণেই সেই সীমারেখা পেরিয়ে গেল। এভাবেই বসে থাকতে থাকতে সরোজ বক্সীর সামনে যখন প্লেট সাজিয়ে মিষ্টি এল, সরোজ বক্সীর মনে হল তাঁর স্ত্রী-কন্যা এই বাড়িতে আজ তাঁকে নতুন সম্মান এনে দিয়েছে। চা তো দূর অস্ত, এই বাড়িতে এক গ্লাস জল চাইতেও ইতস্তত লাগে।

সেই যে শিপ্রার সঙ্গে ওপরে গিয়েছিল অতসী আর বীথি, একবারও নীচে নামেনি। ঘণ্টা দু'য়েক পরে যখন নামল তখন অতসীর সেই আড়ষ্ট ভাবটা আর নেই। বীথিও অনেক সাবলীল হয়ে গেছে। অতসী তাড়াতাড়ি দায় স্বীকার করার মতো করে হাতে একটা ছোট লাল ভেলভেটের বাক্স দেখিয়ে অপরাধীর মতো বলল, দেখো উনি জোর করে বীথিকে এটা দিলেন। কোনও কথা শুনলেন না।

ভেলভেটের ছোট বাক্সটা দেখেই সরোজ বক্সী আন্দাজ করেছিলেন। অতসীর হাত থেকে নিয়ে দেখলেন বটফলের মতো ছোট একজোড়া হিরে বসানো সোনার দুল।

সরোজ বক্সী ক্ষীণ প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করলেন, ম্যাডাম, এসব...

শিপ্রা বলে উঠল, এটা কিচ্ছু নয় সরোজবাবু। সামান্য জিনিস। আমার ছোটবেলায় মা দিয়েছিল। আমার তখন বীথির মতো বয়স ছিল।

কিন্তু ওর তো এখনও কান ফুটোই হয়নি...

তাই জন্যই তো। কান ফুটো যখন করাবেন ওগুলো পরিয়ে দেবেন।

বীথিরও বাবাকে কিছু দেখানোর ছিল। বাবাকে জামাটা অল্প টান দিয়ে দেখাল একটা পুতুল।

বাসে অতসী লেডিজ সিটে বীথিকে নিয়ে বসল আর সরোজ বক্সী অর্ধেক রাস্তা দাঁড়িয়ে এলেন। তাই বাসে আর কোনও কথা হয়নি, তবে বাস থেকে নামার পর থেকেই অতসী শিপ্রার প্রশংসায় মশগুল হয়ে থাকল। সরোজ বক্সী মুচকি হেসে বললেন, তবে, তুমি তো যেতেই চাইছিলে না।

সত্যি মানুষের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না মানুষ কত ভাল হতে পারে। বিশ্বাসই হয় না ম্যাডামের মা ওইসব মেয়েছেলে ছিলেন।

সরোজ বক্সী একটু উদাস গলায় বললেন, উনিও খুব ভাল মনের মহিলা ছিলেন।

কী জানি বাপু, ওরকম মেয়েছেলেরা ভাল হলে কেমন হয়, হ্যাঁগো, তুমি তো ম্যাডামের মাকে দেখেছিলে, ওর গায়ের রংও ম্যাডামের মতো ফরসা ছিল?

হঠাৎ করেই সরোজ বক্সীর মার্থার ব্যাপারে আর কোনও কথা বলতে ইচ্ছে হল না। এখনই অতসীর বলা 'মেয়েছেলে' কথাটা কানে কেমন যেন খট করে আটকে গেছে। মার্থার কথা ঘুরিয়ে সরোজ বক্সী জিজ্ঞেস করলেন, আর কী কী কথা হল তোমার ম্যাডামের সঙ্গে?

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতেই অতসী সরোজ বক্সীর আরও কাছে ঘেঁষে এল। গলা নামিয়ে বলল, জানো ম্যাডাম কত বড় কথা বলেছেন? বীথিকে দেখে বলেছেন, এরকম টুকটুকে মেয়েটাকে ইচ্ছে করছে ছেলের বউ করার জন্য এখনই আপনার কাছে চেয়ে রাখি। অতসী কপালে হাত ঠেকাল।

সরোজ বক্সী গম্ভীর হয়ে বললেন, ওসব কথার কথা। মাথায় এসব চিন্তা একদম পুষবে না।

সরোজ বক্সী আত্মবিস্মৃত হতে থাকলেন। শিপ্রা সান্যালের সঙ্গে প্রথম দিন থেকে সম্পর্কটা তৈরির মুহূর্তগুলো মনে পড়ে যেতে থাকল। শিপ্রা প্রথম প্রথম শ্রদ্ধাই করত

সরোজ বক্সীকে। তারপর দয়াল সান্যালের সঙ্গে এক-একটা পাকেচক্রে পড়ে আস্থাটা তলানিতে ঠেকেছিল। সেই সম্পর্কটা আবার একটু একটু করে মেরামত হতে হতে আজকের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। আস্থা, বিশ্বাসগুলো একটু একটু করে ফিরে আসছে।

শিপ্রার দেওয়া সোনার দুলের ভেলভেটের বাক্সটা সরোজ বক্সী পকেটে রেখেছিলেন। বাড়িতে ফিরেই অতসী ওটা আর একবার দেখতে চাইল।

দাও একবার ভাল করে দেখি। ম্যাডাম যখন দিলেন তখন তো ভাল করে দেখতে পারিনি...

ভেলভেটের বাক্সটাকে মুঠোতে নিয়ে সরোজ বক্সী আবার অতসীর গলায় 'মেয়েছেলে' শব্দটার অনুরণন শুনতে পেলেন। বাক্সটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে বললেন, দাঁড়াও, অন্যের ব্যবহার করা জিনিস। আগে শোধন করিয়ে আনি।

কালীবাড়িতে সন্ধ্যারতি চলছে। সরোজ বক্সী জানতেন এসময় এখানে এলে যামিনী ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হবেই। এবং অভ্রান্ত হয়ে সত্যিই দেখলেন যামিনী ভট্টাচার্য আপ্লুত হয়ে আরতি দেখছেন। সন্ধ্যাবতিব সময় অল্প ভিড় হলেও বসে সম্পূর্ণ আরতি দেখাব লোক কম। যামিনী ভট্টাচার্যের পাশের জায়গাটা ফাঁকাই ছিল। সরোজ বক্সী সেখানে এসে চুপ করে বসে পড়লেন। আরতি শেষে যামিনী ভট্টাচার্য গড় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করার পর উঠে বসে সরোজ বক্সীকে খেয়াল করলেন এবং এক লহমায় চোখমুখ দেখেই বুঝে গেলেন আজ সবোজ বক্সী এক অন্য মানুষ।

কী সরোজ, খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে। অফিসে প্রমোশন পেয়েছ না মাইনে বেড়েছে?

সরোজ বক্সী সবাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে বললেন, আপনার আশীর্বাদ যামিনীদা।

তা হলে চলো, চা খাওয়াবে চলো।

সবোজ বক্সী জানেন যামিনী ভট্টাচার্যের দুটো প্রিয় জায়গা হচ্ছে ওদের বাড়ির ছোটখাটো একটা ফুটবল মাঠের মতো বিশাল ছাদটা আর গঙ্গার ধার। যেহেতু এখন বাড়ির বাইরে, তাই গঙ্গার ধারটাকেই বেছে নিলেন যামিনী ভট্টাচার্য। চায়ের দোকানের ছেলেটাকে দু'খুরি চা দিতে বলে গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা নিরালা জায়গায় বসলেন দু'জনে।

বহু দিন পরে আজ মনে বড় শান্তি পেলাম যামিনীদা। সত্যিকারের শান্তি।

কেন? আজ কোনও অপকর্ম করতে হয়নি?

সরোজ বক্সী হেসে ফেললেন।

ভগবান আজ দয়া করেছেন।

কীসে এত শান্তি পেলে?

সরোজ বক্সী নিজেকে আর গোপন করলেন না।

বহু দিন পর আজ বউমেয়েকে নিয়ে ইচ্ছেমতো দিনটা কাটালাম। ওরা এত খুশি যে, মনটা ভরে গেছে। বুকের মধ্যে শান্তির ঠান্ডা স্পর্শটা পাচ্ছি।

শান্তির স্পর্শ বুঝি ঠান্ডা হয়?

এটা যামিনী ভট্টাচার্যের স্বভাব। কথা ধরে নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেন। অধিকাংশ দিনই সরোজ বক্সী চুপ করে যান। তবে আজ করলেন না। গরমকালে ফুরফুরে একটা ঠান্ডা হাওয়া ভেসে আসছে গঙ্গার দিক থেকে। দু'হাত ছড়িয়ে বললেন, আমার কাছে তাই যামিনীদা।

সরোজ বক্সীর হাতে ততক্ষণে উঠে এসেছে লাল ভেলভেটের ছোট বাক্সটা। কালীবাড়িতে শোধন করতে নিয়ে এসেছিলেন হিরে বসানো সোনার দুলজোড়া। বৈশাখ পূর্ণিমার রুপোলি আলোয় শোধন হতে থাকল দুলদুটো। কানে সেই 'মেয়েছেলে' অনুরণনটা আর নেই। আশ্চর্য এক অনুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে মার্থা ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন। যেন বলতে চাইছেন, আপনি কথা রেখেছেন সরোজবাবু। শ্যারনকে আপনি দেখেছেন। আপনার মেয়ের জন্য এটা আমার আশীর্বাদ। ওতে কোনও কলঙ্ক নেই সরোজবাবু। থাকলে কি আমি কোনওদিন শ্যারনকে ওটা দিতে পারতাম?

৪৩

লোকেনের অগুনতি ছোটখাটো পেশার মধ্যে একটা হল বহুরূপী হওয়া। বহুরূপীর পেশাটা শিখেছিল কেঁদুলির মেলায় এক ওস্তাদকে ধরে। তবে পেশাটা অনেক কাজে লেগেছে। যাত্রাদলের সখী সাজা থেকে আরম্ভ করে বরযাত্রীর দলে সঙ সাজা, অনেক ভাবেই কাজে লাগতে পারে ভেক ধরার শিক্ষাটা। ডুমুরঝরা তার নিজের গ্রাম। তবে পেটের টানে সারাটা বছর গঞ্জে গঞ্জেই কাটে লোকেনের। ডুমুরঝরাতে তার পেশায় না আছে পয়সা, না কদর। তবু প্রত্যেক বৈশাখে ধর্মরায়ের পরবের সময় ডুমুরঝরাতে না এসে থাকতে পারে না লোকেন। তার একটা যদি হয় বুড়ো বাপ-মায়ের ওপর টান, আর একটা অন্য এক নেশার টান।

ডুমুরঝরাতে প্রত্যেক বছর ধর্মরায়ের পুজোর সময় একদিন ম্যারাপ বেঁধে যাত্রাপালা হয়। এই যাত্রাপালায় গ্রামের ছেলেরাই পার্ট করে। শুধু মহিলা চরিত্রগুলো ভাড়া করা মেয়েরা এসে করে দিয়ে যায়। সেইসঙ্গে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয় বাজনদারের দল। এই যাত্রাপালা নিয়ে এখানকার ছেলেবুড়োর দলের উৎসাহের অন্ত নেই। দু'মাস ধরে ফি সন্ধ্যায় চলে মহড়া। আজকাল ভাল পার্ট পেতে গেলে গ্রামের ক্লাবে কাউকে কাউকে মোটা চাঁদাও দিতে হয়। একবার ভাল পার্ট নামিয়ে দিতে পারলে এক বছরের জন্য মহিলামহলে রাজেশ খান্নার মতো হিরো হয়ে থাকা যায়। এবার অবশ্য ঘরে ঘরে অনটন। তবু যাত্রাপালা হচ্ছে। মানুষ অনেক দুর্দশা সহ্য করছে। ধর্মরায়ের কোনও আচার বন্ধ করে দুর্ভাগ্য আর প্রলম্বিত করতে চায় না।

লোকেন পালায় পার্ট করে না, তবে যাত্রার মধ্যে একটা বাঁধা কাজ পায়। দু'নম্বর বিরামের পরে মেয়ে সেজে একটা টুইস্ট নাচ দেখায়। সেই নাচে দুলে ওঠে গোটা

ডুমুরঝরা। বিকেল থেকে মঞ্চের সামনে জায়গা দখল করে বসে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়ে যে-কচি-কাঁচার দল, তারা উঠে পড়ে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এক নম্বর বিরামে কালো পোশাকের বিবেকের গান শুনে অঝোরে কেঁদে যায় যে-বিধবা বুড়ির দল, লোকেনের নাচ দেখে তাদেরও চোখ চকচক করে ওঠে। আর এটাই লোকেনের তৃপ্তি। ডুমুরঝরার মেয়েদের চোখে সে কখনও রাজেশ খান্না হতে পারে না, তবে তাদের মনটাকে ছুঁয়ে যেতে পারে।

দিনের বেলায় লোকেন ঠাকুর-দেবতা সাজে। এই গ্রামে ঠাকুর-দেবতা সেজে ঘরের উঠোনে দাঁড়ালে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। একপাল কচিকাঁচা নিয়ে লোকেন ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে। গঞ্জের মতো নগদ টাকা না পেলেও, এটা-সেটা, আনাজকুটো অনেক কিছুই একটু একটু করে জুটে যায়। এই খরার মন্দায় সেটাই বা কম কী? কাল লোকেন বাঘছাল কাপড় পরে শিবঠাকুর সেজেছিল। উদোম গায়ে সাদা খড়িমাটি লেপে হাতে ডুগডুগি বাজিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরেছিল। আজ কালো ভুসি কালি তেলে গুলে শ্মশানেকালী। শিবকে দেখে তাও বা মেয়েরা যদি একটু মজা পায়, শ্মশানেকালীকে রীতিমতো ভয় পায়। খয়ের রাঙানো টকটকে জিভটাকে বার করলেই বুড়িরা চোখ বন্ধ করে কপালে হাত ঠেকায়। তাই শিবের চেয়ে কালীর আয় অল্প হলেও বেশি। তবে কালী সাজার হ্যাপাও শিবের চেয়ে বেশি। এই ব্রহ্মতালু চৌচির হয়ে যাওয়া রোদ্দুরে সাদা রং তবুও বা গায়ে যদি রাখা যায়, কালো রঙে গা তেতে ওঠে। গায়ের ভাপ কমাতে লোকেন ভেবেছিল নিঝুম দুপুরে পুকুরে গলা ডুবিয়ে এক ঘণ্টা বসে থাকবে। কিন্তু পুকুরে নামার আগেই কী যে হয়ে গেল!

বাড়ি বাড়ি কালী সেজে ঘুরে বেড়াবার সময়েই সান্যাল ঘরের বড়ছেলের ফিরে আসার খবরটা শুনেছিল। সে ছেলে আজ যে সে নয়, মস্ত বড়লোক। ইয়া বড় তার গাড়ি। গায়ে দামি জামাকাপড়। কাছে দাঁড়ালে নাকি ভুরভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরোয়। কলকাতায় নাকি মস্ত ব্যাবসা। ডুমুরঝরাতে আজ এটাই তো সবচেয়ে বড় খবর। লোকেন যখন সান্যাল ঘরের উঠোনে কালী সেজে গিয়েছিল, ভেবেছিল ওই মস্ত মানুষটাকে একবার চোখের দেখা দেখতে পারবে। কিন্তু মানুষটা তো ঘরের বাইরে বেরোয়নি, এমনকী বাড়ির একটা লোকও বেরোয়নি। তবে লোকেন হাল ছাড়েনি। ভেবে রেখেছিল বিকেলের দিকে গিয়ে একবার দেখা করবে মস্ত মানুষটার সঙ্গে। এই বহুরূপীর আর ফেরিওয়ালার জীবন ভাল লাগে না। একটা চাকরি চাইবে। যা হোক একটা চাকরি হলেই হবে। বেয়ারা, জমাদার, যা হোক। হাজার হোক একই গাঁয়ের ছেলে। নিশ্চয়ই একেবারে উপেক্ষা করতে পারবে না।

মস্ত মানুষকে চিনিয়ে দিতে হয় না। দূর থেকে পুকুর পাড়ের দিকে রাস্তাটায় ওকে আসতে দেখেছিল লোকেন। কিন্তু কাছাকাছি এসে ওকে দেখেই মস্ত মানুষটা দুম করে ফিট হয়ে পড়ে যাবে, কল্পনাতেও ভাবেনি লোকেন।

এক দৌড়ে লুটিয়ে পড়া শরীরটার কাছে এসেছিল লোকেন। একটু ইতস্তত করে কাঁধটা ধরে দু'বার ঝাঁকিয়ে জ্ঞান ফেরাতে পারেনি। তারপর দৌড় লাগিয়েছিল সান্যাল

ঘরের দিকে। হাঁকডাক করে গোটা বাড়িটাকেই উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল পুকুরপাড়ে। সেই সঙ্গে আশেপাশের বাড়ির লোকজনরাও ছুটে এসেছিল। দুলাল দয়ালের মাথাটা কোলের ওপর তুলে গালে কপালে গলায় হাত ছুঁইয়ে বুঝেছিল বড়দার ধুম জ্বর হয়েছে। ধরাধরি করে ঘরে এনে শুইয়ে বাড়ির বউদের বলেছিল কপালে জলপটি দিতে।

সনাতনের অন্য ছেলেরা এতদিন বারবার বাবাকে বুঝিয়ে এসেছিল, যে-ছেলে বাড়ি ছেড়ে এত বছর চলে গেছে, যে-ছেলে বাপ বেঁচে আছে না মরে গেছে কোনও খোঁজ রাখেনি, যদি সে বেঁচেও থাকে, বাপের সম্পত্তিতে তার কোনও অধিকার নেই। সনাতন অবাক হয়ে দেখলেন সেই ভাইদেরই অসুস্থ বড়দাকে সেবাযত্ন করার ত্রুটি নেই। রাতের বেলায় যে-দুলাল বাপের হাঁপের টান উঠলে বিরক্ত হয়, নিজের ঘর থেকে শুয়ে শুয়ে গালি পাড়ে, সেই দুলালই উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের পকেট থেকে ভিজিটের টাকা দিয়ে বাড়ি নিয়ে এল বিশ্বনাথ ডাক্তারকে। বয়সের জন্য কানে কম শোনেন সনাতন। তবু একথা কান এড়াল না, যখন ভাইরা বড়দাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, বাবা যাই বলুক, তুলো চাষ হবেই।

জলপটি আর বিশ্বনাথ ডাক্তারের ওষুধে জ্বর খানিকটা নামল দয়াল সান্যালের। বহু জনের সেবাযত্নে খানিকটা সুস্থ বোধও করলেন। তবে গুম হয়েই শুয়ে থাকলেন। মুখে একবার কথার আগল খুললেই সবার সঙ্গে নাগাড়ে কথা বলে যেতে হবে। অভাবে জ্বলছে বাড়িটা। কথার পিঠে কী কথা আসবে দয়াল সান্যালের জানা আছে। ভাইরা দুঃখ-দুর্দশার ঝাঁপি খুলে বসবে, আর উনি ওটা শুনবেন, সময় অত সস্তা নয়। তার চেয়ে বরং একাগ্র মনে অনেক ছক কাটার আছে। বাবাকে রাজি করানো, মাটির স্যাম্পেল নেওয়া, গ্রামের আরও কিছু লোককে নিজের আস্থায় নিয়ে আসা, গুছিয়ে করতে হবে একটা একটা করে।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধে হল। উঠোনের তুলসীতলায় কেউ প্রদীপ দিয়ে তিনবার শাঁখ বাজাল। দয়াল সান্যাল অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার চাতালে এসে বসলেন। ঘোমটা টেনে মেজভাইয়ের বউ হাতের কাছে এক কাপ চা এনে রেখে মিনমিনে গলায় জানান দিল, ষইষ্ঠীতলায় পালা আছে। যাবেন?

দয়াল সান্যাল ভাবলেশহীন গলায় বললেন, দেখি... তা তোমরা যাচ্ছ?

আপনি যইদি বাড়িতে থাইকেন... তাইলে...

আমার জন্য চিন্তা কোরো না। জ্বরটা নেমে গেছে। বাইরে একটু ঘুরতে যাব। পারলে ষষ্ঠীতলা ঘুরে আসব। তোমরা যারা যারা যাবে যাও, এনজয় করো।

সন্ধে গড়িয়ে রাত্রিটা ধরতেই বাড়ির সবাই একে একে বেরিয়ে পড়ল যাত্রা দেখতে। বাড়িতে শুধু তখন সনাতন আর দয়াল সান্যাল। দয়াল সান্যালের একবার মনে হল এটা দ্বিতীয় সুবর্ণ সুযোগ। ভাইদের কিছু বোঝানোর আগেই ওরা রাজি। টাকার গন্ধটা শুঁকে ফেলেছে। কিন্তু এখনও আসল হল বাবা। বাবাকে তুলো চাষের ব্যাপারটা বুঝিয়ে রাজি করাতেই হবে। সনাতন উঠোনের এক কোণে ঝিম মেরে বসে আছেন। বাবার কাছে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে আসতেই আবার মনটা ঘুরে গেল। আকাশে

বৈশাখ পূর্ণিমার থালা চাঁদ। সেই রুপোলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে উঠোন থেকে শুরু করে ডুমুরঝরা গ্রামের দিগন্ত পর্যন্ত।

দয়াল সান্যাল বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। সেই রাস্তাটাই ধরলেন, দুপুরে যে-রাস্তাটা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবোধ্য কারণে অস্বাভাবিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে গ্রামের বাইরে। এখন এই রাস্তাটায় কোনও লোক চলাচল নেই। নিজেরই খুব অবাক লাগতে থাকল। তখন ছিল ভর দুপুরবেলা, এখন রাত্রি। অথচ সেই ভয়ের ছিটেফোঁটা এখন নেই। নিজের মনে চুকচুক আওয়াজ করে মাথা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চললেন সেই পুকুরঘাটের দিকে।

পুকুরঘাটের একপাশ দিয়ে নেমে গেছে কয়েক ধাপ ইটের ওপর মাটি লেপা সিঁড়ি। পাড় থেকেই পিচ্ছিল ধাপগুলো। তার এক দিকে একটা ভাঙাচোরা বেদি। দয়াল সান্যাল সাবধানে বেদিটার ওপর এসে বসলেন। পুকুরটার এক দিক থেকে শুরু হয়ে গেছে চাষের জমি। চাঁদের আলোতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ফুটিফাটা হয়ে আছে সেই জমি। কোনও ফলন নেই। এমনকী হালও পড়েনি এঁটেল হয়ে যাওয়া মাটিতে। সেই জমির দিকে তাকিয়েই দয়াল সান্যাল আবার নতুন করে স্বপ্নটা দেখতে আরম্ভ করলেন। মাইলের পর মাইল সেই জমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ফলন্ত তুলোর গাছ। কুঁড়ি ফেটে উপচে উঠেছে মুঠো মুঠো তুলো। তার ওপর ঝলসে পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো।

বৈশাখের রাত্রে একটা ঠান্ডা হাওয়া বইছে। এই ঠান্ডা হাওয়ায় আরও মৌতাত হয়ে যাচ্ছে। একটা বিভোর হয়ে যাওয়া স্বপ্ন। এটা এপ্রিল মাসের শেষ দিক। মে মাসের মাঝামাঝি যদি কাজ আরম্ভ করে দেওয়া যায়, তারপরে মাত্র ছ'মাসের অপেক্ষা। একটা স্বপ্নপূরণের দিন। চাঁদের আলো মাখামাখি করা দুধসাদা তুলোগুলো উঠিয়ে নেবে দয়াল সান্যালের লোকেরা। যে-গবেষণা কমলেশ করেছে, সেটা একবার এই মাটিতে ফলিয়ে দিয়ে পারলে, গুজরাতি মরাঠিদের চেয়ে সুতোর ব্যবসায় হাজার মাইল উল্কার গতিতে এগিয়ে যাবেন তিনি।

দূরে একটা ভট ভট ভট ভট করে আওয়াজ শুরু হল। সুনসান রাত্রে আওয়াজটা একদম স্পষ্ট। এই আওয়াজটা সুখস্বপ্নের চিন্তাসূত্রটা ছিঁড়ে দিল। একটু কান পেতে শুনে আওয়াজটার রকমটা চিনে নিতে পারলেন দয়াল সান্যাল। জেনারেটরের শব্দ। বাড়িতে কে একটা বলছিল যেন, যাত্রার মাঠে জেনারেটর চলবে। তাতে মঞ্চতে জ্বলবে আলো। সেই সঙ্গে থাকবে মাইক। যাতে প্রতিটা সংলাপ উপস্থিত সবাই ভাল করে শুনতে পায়। ভাবতে ভাবতেই বেজে উঠল সেই মাইক। প্রথমে, হেলো হেলো... মাইক টিস্টিং... ওয়াইন... টু... থিরি... তারপর পালটে গেল গলাটা।

শুনহো... শুনহো... শুনহো... আইর কিচুখইনের মইধ্যে শুইরু হুতে চইলছে...

ফুরফুরে হাওয়ায় জ্যোৎস্না রাত্রের স্বপ্নবিলাসটা এক ঝটকায় চলে গেল। পুকুরপাড় থেকে উঠে বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। অনেকটা সময় স্বপ্নবিলাসে কেটেছে,

এবার কাজে ফিরতে হবে। বাবা ঘরে একাই আছে। বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করে ফেলতে হবে।

বাড়ির সামনে এসে দয়াল সান্যাল দেখলেন দাওয়ায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন সনাতন আর তার একটু দূরে একজন বিধবা প্রৌঢ়া চুপ করে বসে আছে। দয়াল সান্যাল আরও কাছে এগোতেই প্রৌঢ়া ঘোমটাটা আরও টেনে নিলেন। সনাতন প্রৌঢ়াকে দেখিয়ে বললেন, উকে চিইনতে পাইরছিস বাপ?

এত বছর পরে, তার ওপর ঘোমটায় অর্ধেক মুখ ঢাকা। দয়াল সান্যাল চিনতে পারলেন না। চেনার চেষ্টাও করলেন না। প্রৌঢ়ার প্রয়োজনটা বিলক্ষণ আন্দাজ করতে পারছেন। সাহায্য চাই। দয়াল সান্যাল অবশ্য ভেবেছিলেন যে-গাড়ির সওয়ার হয়ে এতদিন পরে তিনি এসেছেন তাতে সাহায্য চাওয়ার হাতের লাইন অনেক আগে থেকেই পড়ে যাবে। মনে মনে ভাবতে থাকলেন, হয়তো তাই যেত, কিন্তু মধ্যিখান থেকে ওই কিছুক্ষণের ভুতুড়ে জ্বরটা শাপে বর হয়েছে। বিকেলবেলাটা ঘরবন্দি হয়ে পার করে দেওয়া গেছে। তারপর যাত্রা। তবে এই প্রৌঢ়া অনেক হিসেবি। ঠিক খোঁজপাতি করে জেনে রেখে দিয়েছে যে, কখন উনি বাড়ি ফিরবেন।

দয়াল চিনতে পারছেন না দেখে সনাতনই প্রৌঢ়ার পরিচয় মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, ময়নার মা।

দয়াল সান্যাল খুব বিরক্ত হলেন। বাবার সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনও সৌজন্য না দেখিয়েই প্রৌঢ়াকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে এগোনোর জন্য পা বাড়ালেন।

তুর সাথে ময়নার মা এইকটা পইরামর্শ কইরতে চায়।

দয়াল সান্যাল ভেতরে ভেতরে কঠোর হলেন। পরামর্শের নাম করে তো এবার সেই চাল নেই, নুন নেই গল্প আরম্ভ হবে আর শেষ হবে কয়েকটা টাকা ধার অথবা সাহায্য চেয়ে। এরা ট্র্যাফিক সিগন্যালে দাঁড়ানো ভিখিরির মতো। একজনকে পাঁচ পয়সা ভিক্ষে দিলে মুহূর্তের মধ্যে চারদিক থেকে আরও দশজন জুটে যাবে। প্রৌঢ়া অবশ্য দয়াল সান্যালের বিরক্তিটা বুঝতেই পারলেন না। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে দেখা করতে এসেছেন, সেটাই একদমে উগরোতে থাকলেন, ময়নাকে তু দেখিস নাই বাপ। তু চৈলে যাওয়ার পর ময়না জন্মেছে।

দয়াল সান্যাল চুপ করে থাকলেন। তবে সনাতন প্রৌঢ়াকে সমানে প্রশ্ন করতে থাকলেন। এই প্রশ্নগুলো আগেও করেছেন। তবে এবার ছেলের কানের জন্য করতে থাকলেন।

এ যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের অবিশ্রান্ত কালো চাকার ঘূর্ণি। শ্রোতার ভাল লাগার তোয়াক্কা নেই। কোথাকার কে এক ময়না, বোধহয় এই আধবুড়ির মেয়ে ফেয়ে হবে, তার একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। তা, সম্বন্ধটা কে দিল? ওই পাশের গ্রামে নগেন আছে না, ওই নগেনের শালা দিয়েছে। তো, ছেলে কী করে? কলকাতার একটা কারখানায় বড় কাজ করে। নগেনের শালাও ওই কারখানায় কাজ করে। বাঃ, তা হলে

তো জানাশোনার মধ্যে। তা জাত ঠিক আছে? তা আছে, তবে বাঙালি নয়, উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ। তাই একমাত্র দোষের মধ্যে বাংলা ভাষাটা ঠিক করে বলতে পারে না। তা হলে, পণটন চাইছে নিশ্চয়ই অনেক? না, না, ওরা দেবতুল্য মানুষ। ময়নাকে এক দেখাতেই পছন্দ করে নিয়েছে। আজ সকালেই পাত্র ওর দাদা, দু'জন বন্ধু আর এক বড় ননদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। ময়নার মতো রূপে গুণে মা লক্ষ্মী এরকম অনটনের সংসারে পড়ে আছে দেখে ননদের চোখে জল চলে এসেছে। পণ কী নেবে, উলটে মেয়ের বাড়ির বিয়ের খরচের টাকা নগদ আজই দিয়ে দিয়েছে। ওদের অবস্থা খুব ভাল। গাড়ি করে ময়নাকে দেখতে এসেছে। তা ছাড়া ডুমুরঝরা গ্রামটা খুব ভাল লেগে গেছে। সেই সকালে এসেছে, এখনও নগেনের বাড়ি যায়নি। বলেছে যাত্রাপালা দেখে তবেই যাবে। বেশ! বেশ! তা হলে তো পাকা কথা হয়েই গেছে, তো কবে বিয়ের দিন ঠিক হল? একদম তাড়াতাড়ি, ছেলের ছুটি নেই কিনা। এ তো খুব ভাল খবর, তা আর কী করার আছে?

প্রৌঢ়া শাড়ির খুঁট দিয়ে চোখের কোনা মুছে জানালেন, মন নাকি কীরকম কীরকম লাগছে। ওমা সে কী সর্বনাশের কথা, এমন শ্বশুরবাড়িও পছন্দ নয়? না, নয়। কেন নয়? লোকগুলোর দৃষ্টি নাকি কীরকম কীরকম। তা দয়াল সান্যাল কী করবেন এসব শুনে? চোখে হয়তো ছানি পড়েছে বুড়ির।

সনাতন বললেন, নগেনের শালা সব বইলছে। তুবু তুই পাত্তর ভিটের লোকগুলার সইনগে কইথা বইল ত বাপ। কুন কইলে কাজ কইরে, কুতো বেতন পাইতি পায়... উরা তো ইখনো আইছে। মোতর গাইরিটাও আইছে। পালা দেইখে উটা চেইপে নগেনের ভিটেতে...

এখনও বাতাসে যাত্রার সংলাপ বাজনার ঝংকারের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে। কবজিতে ঘড়িটা দেখলেন দয়াল সান্যাল। রেডিয়াম ফুটকিগুলো বিজবিজ করে জ্বলছে। মনে মনে বাবার ওপর বেজায় চটলেন। কুয়োর ব্যাঙের চোখে বাবা পৃথিবীটা দেখেছে। কলকাতাটা কত বড়, কোনও আন্দাজই নেই। ঠুনকো একটা বিয়ের সম্বন্ধ। এটা নিয়ে বিচারবুদ্ধি দেওয়া কি তার সাজে? এটা বোঝানো যাবে না বাবাকে। দয়াল সান্যালের সামাজিক প্রতিপত্তি, মান, মর্যাদা কিছুই বোঝানো যাবে না। কারণ, সেটা বোঝার মতো পদার্থ নেই বাবার মধ্যে। গলায় সবটুকু বিরক্তি ঝরিয়ে বললেন, কারখানায় যখন ছেলে কাজ করে, সে যেমনই কারখানা হোক না কেন, নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে। খেটে উপার্জন করে। এর পর আপনাদের ইচ্ছে।

এইটুকু বলে দয়াল সান্যাল ঢুকে গেলেন ঘরের মধ্যে। এখন অপেক্ষা কত তাড়াতাড়ি ওই আধবুড়ি বাড়ি চলে যায়। তারপর বাবাকে বোঝাতে বসতে হবে।

প্রৌঢ়া মনেপ্রাণে এরকমই একটা উত্তর চাইছিলেন। মেয়েকে বোঝানো যাবে। সনাতনকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির দিকে হাঁটা লাগালেন।

গলা থেকে মালাটা খুলে ফেলল লোকেন। টুইস্ট নাচের শেষে মঞ্চে উঠে ক্লাবের

বড়কর্তা টাকার মালাটা পরিয়ে দিয়েছে। কথা ছিল পুরো পঁচিশ টাকার মালা হবে। এখন গুনে দেখছে সতেরো টাকা। লোকেন মনে মনে বলল, হারামি শালা, আট টাকা মেরে দিল। ববি প্রিন্টের ফ্রক, তুলোর পুঁটলি গোঁজা কাঁচুলি, পা কামড়ে থাকা স্ল্যাক্স কিছুই এখনও ছাড়া হয়নি। ববি ছাঁটের পরচুলা, চড়া প্রসাধনটাও তোলা হয়নি। এইসব ধড়াচুড়া নিয়েই অভক্তিতে মাটিতে থুথু ছিটিয়ে একটা বিড়ি ধরাল লোকেন। টানা দশ মিনিট টুইস্ট নেচে হাঁপ ধরে গেছে, মাজায় ব্যথা করছে। টুইস্ট নাচ শরীরের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে বের করে নেয়। সেই সকালের তাড়নাটা আবার মাথাচাড়া দিল। পুকুরে গলা ডুবিয়ে শরীরটাকে ঠান্ডা করতে হবে।

ডুমুরঝরাতে পুকুরের অভাব নেই। ছোটবড় মিলিয়ে পাঁচ-পাঁচটা পুকুর। তবু লোকেনকে সেই সকালের পুকুরটাই টানল, যেখানে খটখটে দুপুরবেলায় সান্যাল বাড়ির মস্ত বড়লোক হওয়া লোকটা ভিরমি খেয়ে গেল। পূর্ণিমার আলোকে সম্বল করে সেই পুকুরের দিকে এগোতে থাকল লোকেন।

কিছু দূর এগোনোর পর কাঁচা রাস্তার একপাশে একটা সাদা গাড়ি দেখতে পেল লোকেন। ডুমুরঝরাতে মোটর গাড়ি অতি দুর্লভ একটা দৃশ্য। সকালে একটা লাল গাড়ি প্রত্যক্ষ করেছে ডুমুরঝরার মানুষ। এখন আর একটা দেখছে লোকেন। আয়তনে সান্যাল বাড়ির মস্ত হওয়া লোকটার মতো মস্ত নয় গাড়িটা। তা ছাড়া লোকেন এই গাড়িটার নাম জানে। অ্যাম্বাসাডার। কৌতূহলে পায়ে পায়ে ঝুমুরের আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল অ্যাম্বাসাডার গাড়িটার কাছে।

গাড়িটার সামনের দিকটায় ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে আছে একটা লোক। পাশে একটা মদের বোতল। লোকেন সামনে আসতেই লোকটা কুতকুতে মাতাল চোখ নিয়ে অস্পষ্ট জড়ানো গলায় বলল, বহুত বড়িয়া ড্যান্স কিয়া। আ পাস বৈঠ।

লোকেনের লোকটাকে ভাল লেগে গেল। বা সত্যি কথা বলতে গেলে লোকটার চেয়েও ওর পাশে বিলিতি মদের বোতলটা। মন্ত্রমুগ্ধর মতো সেই বোতলটার টানে লোকটার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাশে এসে বসল। লোকটার সঙ্গে আর একটা ফাঁকা গ্লাস ছিল। মদ আর জল ঢেলে লোকটা গ্লাসটা এগিয়ে দিল লোকেনের দিকে। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিয়েই লোকেন একটা চুমুক দিল। খাসা বিলিতি মদ। স্বাদ-গন্ধই আলাদা। আবার একটা বড় চুমুক দিল লোকেন।

লোকটা একমনে লোকেনের তৃপ্তি করে মদ খাওয়ার দৃশ্য দেখছিল। এবার লোকেনের দিকে তাকিয়ে বলল, ইঁহা ছোকরি মিলেগি?

লোকেনের ভাষাটা বুঝতে অসুবিধা না হলেও, মর্মার্থ বুঝতে একটু সময় লাগল। তবে বুঝেই দু'দিকে মাথা নাড়ল লোকেন। লোকটা একটা স্থির দৃষ্টিতে লোকেনকে দেখেই আচমকা ওকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে বলল, তব তুঝসেই চলেগি, মেরি জান...

রংচটা টিনের সুটকেসটার ভেতর থেকে একটা ভাঙা আয়না বার করে লোকেন নিজের মুখটা মন দিয়ে দেখতে থাকল। এই আয়নাটা জাদু-আয়না। প্রত্যেক দিন সকালে স্নান করে উঠে লোকেন আয়নাটাকে জিজ্ঞেস করে, আজ কী সাজবে? আয়নাটা লোকেনের ভেতর ঠিক সাজের চিন্তাটা পাঠিয়ে দেয়। আজকে যেমন আয়নাটা বলছে মা মনসা সাজতে।

সুটকেসের ভেতর থেকে কালো, খয়েরি, সাদা ডোরাকাটা বেশ কয়েকটা প্লাসটিকের সাপ বার করল লোকেন। তারপর সাপগুলো মাথায় গলায় জড়িয়ে নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠল। হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল কাল রাতের ঘটনাটা।

অ্যাম্বাসাডার গাড়িটার কাছে মদ খেয়ে চুর হয়ে ছিল লোকটা। লোকেনকে দু'ঢোক মদ খাইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওব ওপর। কী ভেবেছিল লোকটা ওকে? সত্যিকারের মেয়েছেলে? নাকি লোকটা জানত লোকেন আসলে একজন পুরুষমানুষ। ঘেন্নায় চোখটা বন্ধ করল লোকেন। ঘিনঘিন করতে লাগল শরীরটা। লোকটা শক্তপোক্ত গড়নের। নেহাত মদে চুর হয়ে ছিল বলে কোনওরকমে ঠেলা মেরে লোকটাকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে বেঁচেছে সে। গলায় জড়ানো সাপগুলোকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার আয়নার দিকে তাকাল লোকেন। আয়নাটা যেন লোকেনকে বলল, আজ তুই নারদ সাজ লোকেন।

এক মুহূর্তে মনটা খুশিতে ভরে উঠল লোকেনের। ঘিনঘিনানিটাও উধাও হয়ে গেল। মনে হল, ঠিকই তো বলছে আয়নাটা। নারদ তো একবারও সাজা হয়নি। নারদ সেজে একটু আমোদের কথা বলতে হবে। ঘরে ঘরে খুনসুটি করতে হবে। সারা গায়ে রং না মাখলেও চলবে। শুধু চাই একটা ঢেঁকি।

লোকেনদের বাড়িতে একটা ছোট ঢেঁকি আছে। ঢেঁকিটা পুজোর কাজে ব্যবহার হয়। তাই ওজনটাও কম। মায়ের কাছে ঢেঁকিটা চেয়ে মাথায় একটা পরচুলা চড়িয়ে বেশি রোদ ওঠার আগে বেরিয়ে পড়ল লোকেন।

কই গো বাড়ির বউরা, বেইরে এইস সব। তুমাদের দুয়ারে নারদ এয়েছে গো।

যে-বাড়ির উঠোনেই ছেলেপুলের দল আর ঢেঁকি নিয়ে নারদ সেজে লোকেন ঢুকে এই হাঁক দেয়, বাড়ির মেয়ে-বউরা মুহূর্তে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে আসে। সেই মেয়েদের ভিড়ে লোকেন খুঁজে নেয় সবচেয়ে লাজুক মেয়েটার মুখ।

কাল রাইতে তুমাদের গেরামে যাত্রা শুইনতে এইছিলাম। একটা মেইয়েমানুষ কী গানটাই না গাইছিল গো, হলদি কাপড়, মোমের বাতি জইলবে সারা রাতিরে, জইলবে সারা রাতি। তো গানের শেষে দেখি তুমার মরদ মেইয়েমানুষটার পিছন পিছন রাতের অন্ধকারে পুকুরপাড়ের দিকে যাইচ্ছে।

এইটুকু বলে লোকেন মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকল। যে-লাজুক বউটার উদ্দেশে কথাগুলো বলল, তার মুখটা আরও লজ্জায় লাল হল।

তাইরপর কী হইল গো নারদ? কয়েকটা কৌতূহলী গলা বলে উঠল।

লোকেন ঢেঁকির দিকে তাকিয়ে বলল, কী রে ঢেঁকি, তাইরপর কী হল?

হাতে ঢেঁকিটা নাচাতে থাকল লোকেন। নাচাতে নাচাতে বলল, বলবে না, ঢেঁকির মুখে ধান না পইরলে বইলবে না কো।

এক কুনকে ধান এনে লোকেনের ঝোলায় ফেলে দিল বাড়ির মেয়েরা। লোকেন আবার ঢেঁকিটা নাচাতে নাচাতে বলতে থাকল, এবার বল ঢেঁকি।

ঢেঁকিটাকে কানের কাছে তুলে নিয়ে এল লোকেন। কিছু শোনার ভান করে বলল, ঢেঁকি বলছে আর দেখে নাই। লজ্জায় চোখ বন্ধ করে দিয়েছে।

এক মুঠো, এক মুঠো, এরকমভাবে ধান জোগাড় করতে করতে লোকেন একসময় সনাতন সান্যালের বাড়ির সামনে এসে পড়ল। বাড়ির সামনে তখন দয়াল সান্যালের বিশাল লাল গাড়িটা। ড্রাইভার সাদা উর্দি পরে গাড়িতে বসে আছে। দোনামনা করে লোকেন সনাতন সান্যালের উঠোনে ঢুকে পড়ল। সবে হাঁক ছেড়ে বাড়ির মেয়েদের ডাকতে যাবে, এমন সময় দেখল বাড়ির সবাইকে ঘিরে বাইরে বেরিয়ে আসছেন দয়াল সান্যাল।

কাল দুপুরে এই মানুষটা লোকেনকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শুনেছে ধুম জ্বরও এসেছিল। অথচ এই মানুষটাই পারে তার জীবনটাকে বদলে দিতে। যদি ওর কারখানায় একটা চাকরি দেয়। ঢেঁকিটা একপাশে নামিয়ে রেখে সোজা গিয়ে দয়াল সান্যালের পা দুটো জড়িয়ে ধরল লোকেন।

আমায় খেমা করে দাও গো দাদা।

দয়াল সান্যাল ছিটকে সরে গিয়ে পা-টা ছাড়াতে গেলেন। কিন্তু লোকেন একদম পা দুটো জাপটে ধরে আছে। দয়াল সান্যাল কিছুই বুঝতে পারছেন না। একটা লোক সঙ সেজে বাড়িতে ঢুকেই তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল কেন?

বাড়ির পুরুষমানুষরা টেনেটুনে লোকেনকে ছাড়িয়ে আনল। লোকেন তখনও বলে চলেছে, বিশ্বাস করুন, শসানিকালী সেইজে আমি ভয় দেখাতে চাইনি।

দয়াল সান্যালের কাছে এবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। এই বহুরূপীটাই তা হলে কাল কালী সেজেছিল। উনি যে ভয় পেয়েছিলেন সেটা কারও কাছে প্রকাশ করেননি। অথচ এই লোকটা ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পেরেছে। ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বললেন, পাগল নাকি তুমি? তোমাকে দেখে ভয় পেতে যাব কেন? কাল গরমে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

লোকেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। স্পষ্ট দেখেছিল ওকে দেখে দয়াল সান্যালের মুখচোখ ভয়ে পালটে গিয়েছিল। তা হলে কি এত বড় মানুষটাকে কোনও বেফাঁস কথা বলে ফেলল? দয়াল সান্যাল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে লোকেনের হাতে দিয়ে বললেন, রাখো, এটা রাখো।

দশ টাকার নোটটা ছুঁয়ে লোকেনের আত্মবিশ্বাসটা আরও বেড়ে গেল। এতগুলো লোকের মাঝে মুখ ফুটে বলেই ফেলল, আমাকে যদি আপনার কারখানায় একটা কাজ দেন...

ঠিক আছে, দেখব। কলকাতায় এলে দেখা কোরো। নাছোড়বান্দা লোকটার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে কথাগুলো কোনওরকমে বলে দয়াল সান্যাল গাড়িতে উঠে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোকেনের মনে খুশি উপচে পড়ল। দশ টাকার চকচকে নোটটা কোঁচড়ে। তার ওপর কলকাতায় চাকরির আশ্বাস। জীবনটাই এবার বদলে যাবে।

এই জীবন বদলে যাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে লোকেন বাড়ির দিকে হাঁটা লাগাল। আজ আর নারদ সেজে বাড়ি বাড়ি ঘোরার দরকার নেই।

লোকেনের অদৃশ্যে কিন্তু আর একটা জীবন পালটে যাওয়ার ডাক অপেক্ষা করছিল।

যে-পথ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দয়াল সান্যালের বিশাল লাল গাড়িটা বেরিয়ে গেল. সেই পথ দিয়েই তখন ডুমুরঝরা গ্রামে ঢুকছে কালকের রাতের সাদা অ্যাম্বাসাডারটা।

লোকেন রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়াল। অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেল। লোকেনের একটা অদম্য কৌতূহল হল দেখার জন্য যে-গাড়িটা রোজ কার বাড়িতে আসছে। বাড়ির পথ ছেড়ে অ্যাম্বাসাডারটার পথ ধরল লোকেন।

দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল ময়নাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়িটা, গাড়িটার কাছাকাছি এসে কৌতূহলটা আরও বহু গুণ বেড়ে গেল লোকেনের। ময়নাদের বাড়িতে প্রাণী সাকুল্যে দু'জন। ময়না আর ময়নার বিধবা মা। সেখানে অ্যাম্বাসাডার গাড়ি করে লোকজন আসছে কেন? কীভাবে দেখা যায় এখন ভেতরে কী হচ্ছে! হঠাৎ নিজের হাতের ঢেঁকিটাতে খুঁজে পেয়ে গেল ভেতরে যাওয়ার চাবিকাঠি।

যদিও জানে এ-বাড়িতে কোনও বউ নেই, তবুও লোকেন গলা ছেড়ে বলে উঠল, কই গো, কার মরদ কাল যেন সেই মেইয়েমানুষটার হাত ধরে গাইছিল— হলদি কাপড়, মোমের বাতি জইলবে সারা রাতিরে, জইলবে সারা রাতি...

বেশিক্ষণ গলা ছাড়তে হল না। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তিনজন অচেনা পুরুষ এবং একজন মহিলা। তিনজনই অবশ্য অচেনা বলা ঠিক নয়, একজনকে চিনতে পারল লোকেন। কাল রাতে যৌন লাঞ্ছনায় যার হাত থেকে কোনওরকমে বেঁচে গেছে।

লোকটা আজও মদে চুর হয়ে আছে। থাকলে কী হবে, হলদি কাপড়, মোমের বাতি গানটা সুর ধরে ঠিকই চিনে ফেলল। তারপর হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, ও তু থা বে? তো তেরা ও দোনও কাঁহা গিয়া?

লোকেনের বুক দুটো দেখিয়ে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করল লোকটা। লোকটা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, সঙ্গের মহিলা থামিয়ে দিয়ে বলল, আঃ চুপ কর না। তুমি ওর কথায় কিছু মনে কোরো না ভাই। মহিলা ব্যাগ খুলে একটা এক টাকার নোট বার করল। নোটটা লোকেনের দিকে এগিয়ে বলল, এটা নাও ভাই।

লোকেন মনে মনে অসংখ্য প্রণাম জানাল নারদকে। জীবনে এই প্রথম। প্রথমে দশ তারপর এখন এক, পুরো এগারো টাকা হল। ময়নার মা-ও যে ততক্ষণে একমাথা ঘোমটা টেনে একমুঠো ধান নিয়ে এসেছে, সেটা আর খেয়ালই করল না লোকেন। কোঁচড়ে দশ টাকার পাশে এক টাকাটাকে গুঁজে রেখে বলল, আপনারা বুঝি...

কথাটা শেষ করতে পারল না লোকেন। আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্নটা শুরু করেছিল কিন্তু ওদের পরিচয় কী করে জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারল না।

মহিলা কিন্তু ঠিকই বুঝে নিল লোকেনের চোখে কৌতূহলের ভাষাটা। মিষ্টি করে বলতে আরম্ভ করল, আমরা এসেছি তোমাদের ময়নাকে আমাদের টুকটুকে বউ করে নিয়ে যেতে।

লোকেন তিনটে লোকের মুখের দিকে একঝলক দ্রুত তাকিয়ে নিল। এই তিনজনের মধ্যে সেই লোকটাও আছে। সে আবার হবে না তো ময়নার বর? হোক না নিজে বহুরূপী, গ্রামের ছেলে হিসেবে তারও তা হলে একটা কর্তব্য আছে লোকটার চরিত্র সম্পর্কে ময়নার মাকে বলে দেওয়া। তা ছাড়া ওরা হিন্দিতে কথা বলে কেন?

মহিলার চোখ দুটো ক্ষুরধার। লোকেনের চোখে দ্রুত পড়ে নিতে পারল যে, কিছু একটা লোকেন সন্দেহ করছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এসো না, ভেতরে এসো।

লোকেনের মাথাটা গুলিয়ে গেল। গ্রামের ছেলে হলেও লোকেনকে কেউ বাড়ির ভেতরে ডাকে না। আর এই মেয়েমানুষটা বাইরের লোক হয়েও ময়নাদের বাড়ির ভেতর ডাকছে।

মহিলার কথা শুনে ময়নার মা-ও খুব নিচু গলায় বললেন, আয় বাপ। উনারা যখন ডাইকছেন।

লোকেন ভেতরে এল। ময়না এতক্ষণ ঘরের বাইরে বেরোয়নি। কিন্তু ঘরের মধ্যে ময়নাকে দেখল লোকেন, খুশিতে মুখচোখ ঝলমল করছে মেয়েটার। লোকেনকে বলল, বসো লোকেনদা।

তারপর ময়নাই লোকেনের পরিচয় দিয়ে সবাইকে বলতে থাকল লোকেন মেয়েমহলে কীরকম জনপ্রিয়। মহিলা লোকেনের পেশার প্রশংসা করে বলল, তোমার এই সাজ এখানে কতটা কদর পায় জানি না কিন্তু কলকাতায় গেলে এর অনেক কদর পাবে।

ময়না খুশিতে উপচে বলে উঠল, লোকেনদা খুব ভাল নাচতেও পারে। কাল যাত্রায় খুব ভাল নেচেছে। সবাই বলছে।

মুঝে ভি মালুম হ্যায়, ম্যায়নে দেখা।

মহিলা চোখেমুখে কপট বিস্ময় ফোটালেন, তাই, ইস আগে জানলে কালকে আমিও দেখতে যেতাম। ওরা তো সব গিয়েছিল।

লোকটা আবার বলে উঠল, উ গানা একবার শুনহা দে না, ও পিলা কাপড়াওয়ালা গানা।

লোকেন বুঝে উঠতে পারল না, হঠাৎ এরা সব উঠেপড়ে ওর গান শুনতে চাইছে কেন! তবে এগারো টাকার গরমে মেজাজটা একদম ফুরফুরে হয়ে আছে। হাঁটু গেড়ে জমিয়ে বসে বলল, তবে শোনেন একখানা ভাদুর গান।

ভাদুর গান? সেটা আবার কেমন? আচ্ছা শোনাও, শুনি।

লোকেন গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল—বলি, ও ললিতা/ ওদের ভাদুরে দিয়াছে ছেঁড়া কাঁথা...

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা হাততালি দিয়ে উঠল। লোকগুলো এসব গানের কথার এক বর্ণ মানে না বুঝে বিরক্তিতে উসখুস করছিল। বেলা দুপুরের দিকে গড়াচ্ছে। আরও কয়েকটা গান শুনিয়ে লোকেন একসময় বলল, এবার উঠি দিদি।

মহিলা লোকগুলোকে চোখের ইশারা করতে লোকগুলো ঘরের বাইরে চলে গেল। ঘরটা একদম ফাঁকা হয়ে গেছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মহিলা খুব নিচু গলায় বলল, তোমাকে আমার খুব ভাল লেগে গেছে ভাই। একদম নিজের ছোট ভাই মনে হচ্ছে, তাই তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আমার এই একটা মাত্র ভাই। দিদি হলেও মায়ের মতো আমি। তা তোমাদের ময়না মেয়েটা কেমন?

লোকেন সেই অর্থে ডুমুরঝরাতে থাকে না। তাই কোনও মেয়ের কী ছোটখাটো প্রেম-পিরিত আছে, অত খোঁজ জানা নেই। তবে সেরকম গরম কিছু থাকলে ঠিকই কানে আসত। ময়না সম্পর্কে সেরকম কিছু কথা কখনও শোনেনি।

খুব ভাল মেয়ে গো দিদি। আপনার ভাইয়ের ভাগ্য খুব ভাল। আপনার ঘর আলো করে থাকবে ময়না।

মহিলা বুকের ওপর হাত রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক বাবা নিশ্চিন্ত করলে। কারও সঙ্গে প্রেমট্রেম থাকলে ছেলেগুলো মাঝে মাঝে জোঁকের মতো চিটে থাকে।

মন্তব্যটা বুঝতে না পেরে লোকেন বলল, মানে দিদি?

না, মানে মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে একটা সম্মানটম্মান আছে তো। পুরনো প্রেমের ছেলে যদি মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে এসে হাজির হয়, তা হলে কি প্রেস্টিজ থাকে বলো? লোকেরা আমাকে কী বলবে— কেমন মেয়ে নিয়ে এলে?

ময়না সেরকম মেয়েই নয় দিদি, খুব ভাল মেয়ে।

তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাই?

বলুন না দিদি।

আমার ভাইয়ের সঙ্গে আর যে দু'জনকে দেখলে দু'জনই ব্রাহ্মণ। আমার ভাইয়ের বন্ধু। তা ওদের এই ডুমুরঝরাতে এসে, ময়নাকে দেখে খুব ভাল লেগে গেছে। ময়নার মতো আরও দু'জন গরিব ঘরের মেয়ে আছে ডুমুরঝরাতে?

গরিব ঘরের মেয়ে কেন? কথাটা কানে খট করে লাগল লোকেনের। লোকে তো বড়লোক শ্বশুরবাড়ি চায়। প্রশ্নটা করেই ফেলল লোকেন।

এরা ভাই খুব বড়লোক। পয়সাকড়ি কিছু দরকার নেই এদের। গরিব মেয়েদের শুধু বিয়েই করবে না, তাদের বাবা-মায়ের দায়িত্বও নেবে। এইখানটা একদম সাচ্চা।

মহিলা নিজের বুকের ওপর হাত রেখে 'সাচ্চা' জায়গাটা দেখাল। মহিলার আঁটোসাঁটো উদ্ধত শরীর। মাঝে মাঝে সেই উদ্ধত শরীরে দৃষ্টি আকর্ষণের ডাক দিলে অস্বস্তি হয় লোকেনের। সেখান থেকে মনটাকে ঘোরাতে এবার নিজের ভাগ্যকে দুষল

লোকেন। সেই যদি জন্মই হল ডুমুরঝরাতে, তা হলে গরিব ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মাল না কেন? বড়লোক বাড়িতে বিয়েও হত। বাপ-মায়ের জন্য চিন্তাও থাকত না।

কী ভাই, কারও কথা মনে পড়ল?

ডুমুরঝরাতে নেই। তবে উসুমপুরে এক গরিব বেধবার মেয়ে আছে।

উসুমপুরে? তুমি চেনো?

না, ঠিক চিনি না, তবে কোন গ্রামে কেমন কেমন আইবুড়ো মেয়ে আছে তা জানি।

ওরে বাবা, তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে, চারদিকের সব আইবুড়ো মেয়েদের খবর রাখো। এত খবর পাও কী করে?

এটা আর তেমন কী? আমার কাজই তো বহুরূপী সাজা। ঠাকুর-দেবতা সেজে দোরে দোরে ঘোরা। ঠাকুর-দেবতার হাতে তো মায়েরা আইবুড়ো মেয়েদের হাত দিয়েই ভিক্ষা দেওয়ায়। ভাল বর পায় যাতে।

মহিলা চুপ করে একদৃষ্টে লোকেনের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বুকের ওপর আঁচলটা অল্প সরিয়ে ব্লাউজের মধ্যে থেকে বার করল দশ টাকার একটা নোট।

নারদ, নারদ। মনে মনে চিৎকার করে উঠল লোকেন, হে নারদঠাকুর এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এবার থেকে আমি রোজ নারদই হব। বেলা দুপুর ছোঁয়নি তার আগেই দশ দশ এক—পুরো একুশ টাকা রোজগার হয়ে গেল। আর এই মেয়েমানুষটা? এর গাড়িটা দয়াল সান্যালের মতো না হলেও টাকা বোধহয় দয়াল সান্যালের চেয়ে কিছু কম নয়। ব্যাগে টাকা, বুকের মধ্যে টাকা!

তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করবে ভাই?

প্রস্তাবটা লোকেনের বোধগম্য হল না। কী কাজের কথা বলছে মেয়েমানুষটা?

না, না, তুমি তোমার কাজটাই করবে। শিব সাজবে, দুর্গা সাজবে, কালী সাজবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরবে। গরিব মেয়েদের কাছে ভিক্ষা নেবে। শুধু সপ্তাহে দু'সপ্তাহে কলকাতায় এসে আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখবে।

কাজটার ধরন ঠিক খোলসা হচ্ছে না লোকেনের কাছে। মুখচোখে সেটা ফুটে উঠেছে।

সব বুঝিয়ে দেব তোমাকে। আমরা একটা সরকারি জরিপের কাজ করছি। তাতে অনেক তথ্য দরকার। তুমি ওই শিব দুর্গা সেজে ঘোরার ফাঁকে ফাঁকে যা যা জানতে চাইব সেই তথ্যটা আমাদের দেবে।

মহিলা উঠে পড়ল। লোকেনকে বলল, যাও, অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম তোমাকে। খুব ভাল লাগল ভাই। তবে তোমাকে একটা জিনিস বলে যাচ্ছি। তোমাকে যে-কাজের কথা বললাম সেটা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বোলো না। এই গ্রামের তিনজন ব্যাপারটা জানতে পেরে গোঁ ধরে বসে আছে এই কাজটা তাদের চাই। কুটুমবাড়ির গ্রাম হতে চলেছে। কাকে ছেড়ে কাকে না বলি বলো তো? তোমাকে একদম নিজের ভাই মনে করে বললাম।

এজ্ঞে কলকাতার ঠিকানাটা?

ময়নার বিয়েটা হয়ে যাক, ঠিক দিয়ে যাব।

বাবলি বেলটা টিপতেই কর্নেল সামন্তর বাড়ির ভেতর থেকে সুলতান গর্জে উঠল। এই ক'বছরে সবার কথা মনে থাকলেও, সুলতানের কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল বাবলি। ডাকটা শুনে এক রাজ্যের ভয় এসে গ্রাস করল বাবলিকে। তাড়াতাড়ি কাঁধের ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দরজার কড়া দুটো গায়ের জোরে বাইরের দিকে টেনে ধরে থাকল, যাতে করে ভেতর থেকে কেউ দরজাটা খুললে সুলতান ওর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়তে পারে।

বন্ধ দরজার ভেতরে পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে সুলতান ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে। কর্নেল সামন্ত সুলতানকে এক ধমক দিলেন। তাতে সুলতানের ডাকটা কিছুটা কমলেও অভিভাবকের দৃষ্টিটার পরিবর্তন হল না।

খুট করে ছিটকিনিটা খুলে দরজাটা ভেতর দিকে খুলতে যেতেই বাধা পেলেন কর্নেল সামন্ত। দুটো দরজার মধ্যে ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন পূর্ববঙ্গের সেই বোকা মেয়েটা বাইরের থেকে কড়া দুটো প্রাণপণে টেনে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটাকে দেখে অবাকই হলেন কর্নেল সামন্ত। ক্যাথি গোমসের কাছে শুনেছিলেন মেয়েটা ব্যারাকপুর ছেড়ে পাকাপাকিভাবে চলে গেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে এটাও দেখা যাচ্ছে, মেয়েটার সঙ্গে একটা ব্যাগ।. ওই অল্প ফাঁক দিয়েই কর্নেল সামন্ত বাবলিকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন, দরজাটা ছাড়ো। সুলতান কিচ্ছু করবে না।

না জেঠু। আপনি ওকে আগে বাঁধুন।

শংকর, সুলতানকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখ।

দরজার সেই চিলতে ফাঁক দিয়ে বাবলি দেখল একটা ছেলে এসে বিশাল মাপের খয়েরি অ্যালসেশিয়ান কুকুরটার বকলশটা ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। সুলতান দৃষ্টিপথ থেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বাবলি আধা নিশ্চিন্ত হয়ে দরজার কড়া দুটো থেকে হাতটা সরাল।

দরজাটা পুরো খুলে দিয়েও কর্নেল সামন্ত দেখলেন মেয়েটা একইরকমভাবে ব্যাগটা পাশে রেখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অল্প বিরক্ত হয়ে বললেন, এবার আবার কী হল? ভেতরে এসো।

বাবলির গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা ঢোক গিলে বলল, জেঠু, ওবাড়িতে মাসি নেই?

কর্নেল সামন্ত একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভেতরে এসো।

বাবলি দু'পা ভেতরে ঢুকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। একটা প্রশ্নেরই উত্তর জানতে এবাড়িতে আসা। উত্তরটা পাওয়ার আশায় কর্নেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

বসো।

কর্নেল সামন্ত সোফাটার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন। বাবলি প্রায় আদেশ পালনের মতো সোফাটায় গিয়ে কাঠ হয়ে বসল।

তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছিল নাকি? চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে!

বাবলি কোনও উত্তর দিল না। পূর্ববঙ্গের বাড়িতে রাজকন্যার মতো থাকত। তারপর রিফিউজির জীবন। অভাব অনটনের চূড়ান্ত। সেই জায়গা থেকে অনেকটাই তুলে এনেছিলেন ক্যাথি গোমস। ভাল খাওয়া, থাকার জায়গা, এমনকী সাধ্যমতো পরার জামাকাপড়ও দিতেন। তবে সে সুখও মাস তিনেকের বেশি স্থায়ী হয়নি। যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর বাবার যে কী একটা বদ্ধ ধারণা হল—ওদেশে আর ফিরে যাওয়া যাবে না, সেটা থেকে বাবাকে আর নড়ানো গেল না। তার জায়গায় বাবার মাথায় জমাট বাঁধল নতুন একটা স্বপ্ন। এনিমি প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ। ওদেশের সম্পত্তির বদলে এদেশে সম্পত্তি পাবে।

কে যে বাবার মাথায় এই কালস্বপ্নটা বুনেছিল বাবলি জানে না। সে নিজেও ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। তবে বাবার সঙ্গে অন্যদের আলোচনা মাঝে মাঝেই কানে এসেছে তার। তাতে টুকরো টুকরো করে বাবলি শুনেছে সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হওয়ার সময় এরকম কিছু হয়েছিল। তবে সেই পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতির আকাশপাতাল তফাত। এক্সচেঞ্জ শব্দটার অর্থ বোঝে বাবলি। বিনিময়। তাই বাবার স্বপ্নটার মাথামুন্ডু মাথায় ঢোকে না। সম্পত্তি বিনিময়টা হবে কার সঙ্গে বুঝতে পারে না। বাংলাদেশ হওয়ার পর এদেশ থেকে জমিজমা ফেলে ওদেশে কেউ চলে যাচ্ছে এরকম একজনের নামও শোনেনি বাবলি।

অথচ বাবার এই অলীক স্বপ্নটা পরিবারের অন্যদের স্বপ্নগুলোকে একটা একটা করে ভেঙে খানখান করে দিয়েছে। সোদপুরে যেটুকু একটা কাজের সংস্থান করতে পেরেছিল বাবা; অলীক স্বপ্নটার সন্ধানে শিয়ালদা-বনগাঁ করতে করতে সেই চাকরিটা খুইয়েছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব্যারাকপুরে যেটুকু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল নিজের পরিবারের, সেটাকেও নিজের হাতে উপড়ে ফেলেছে। বাবলিদের এখন ঠাঁই হয়েছে দত্তপুকুর থেকে আধঘণ্টা ভ্যানরিকশার দূরত্বে একটা গ্রামে। দত্তপুকুরে একটা মনিহারি দোকানে বাবা কী একটা নামকে ওয়াস্তে কাজ করে আর মা করে সেলাইয়ের কাজ। সেটা অবশ্য মা বাড়িতে বসেই করে। দর্জির দালালরা বাড়িতে কাজ পৌঁছে দেয় আবার নিয়ে যায়।

বাবলির ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা ভাবে না। ওদেশে নিজের হৃত সম্পত্তিটুকুর বিনিময় পাওয়া ছাড়া বাবা আর কোনও কিছু নিয়েই ভাবে না। মাঝে মাঝে বাবলির মনে হয় এই স্বপ্নটাই বাবাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে কবে হয়তো বাবা শেষ হয়ে যেত। বরং রাগ হয় মায়ের জন্য। মা যদি এত নরম সরম না হয়ে একটু কড়া ধাতের হত তা হলে ব্যারাকপুর ছেড়ে চলে আসতে হত না। তোমার যদি নিজের সম্পত্তির জন্য এতই মায়া, তা হলে দেশে ফিরে গিয়ে নিজের সম্পত্তিটাই ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছ না কেন? মায়ের প্রতিবাদ, পরামর্শ, অভিমান যাই বলা হোক না এই একটা মাত্র কথাই বাবার উদ্দেশে মাকে বলতে শুনেছে।

মায়ের এই মন্তব্যে কখনও বাবার চোখে আগুন জ্বলে, কখনও চোখ ভিজে ওঠে।

তবে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা কখনওই ভাবে না। নিজের স্কুলের ক্লাসরুমের বেঞ্চের কথাগুলো মাঝে মাঝেই নিঝুম রাতে মনে পড়ে বাবলির। বুকের ভেতরটা ভীষণ ফাঁকা মনে হয়। মা এই জীবনটা মেনে নিতে পারলেও, বাবলি এখনও মেনে নিতে পারেনি। অন্ধকারে রাত্রে এখনও রাজকন্যা হয়ে ফিরে যায় বুড়িমতী নদীর ধারে।

বুকের মধ্যে অনন্ত দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেছে বাবলির। তারপর ক্লান্ত রাত্রে নিজেকেই নিজে ঘুম পাড়ায় শিপ্রার সেই গানটা গেয়ে, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

একাত্তরের ডিসেম্বরেই তুমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলে, তাই না? কর্নেল সামন্ত জিজ্ঞেস করলেন।

বাবলি ঘাড় নাড়ল। কর্নেল সামন্ত মনে মনে হিসেব করলেন, বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে ক্যাথি গোমস চলে গিয়েছিলেন। আর এটা পঁচাত্তরের মে মাসের খাঁ খাঁ কাঠফাটা দুপুর। প্রায় সাড়ে তিন বছরের ওপর হয়ে গেল, ক্যাথি গোমস সেই যে বাড়িটা ছেড়ে চলে গেছেন তারপর থেকে আর কোনও খোঁজখবর নেই। শিপ্রাকে দেওয়া কথা কর্নেল সামন্ত রেখেছেন। বন্ধ বাড়িটার তালা আর দ্বিতীয় ভাড়াটের জন্য খোলেননি। সাড়ে তিন বছর কিছু কম সময় নয়। কোথা দিয়ে যেন দেখতে দেখতে কেটে গেছে। বাবলির ব্যাগটার দিকে তাকালেন কর্নেল সামন্ত। ফুটোফাটা একটা রেকসিনের ব্যাগ। ধাতব চেনটা খারাপ হয়ে গেছে। হাঁ-মুখটা ঢাকতে কষে একটা ফিতে বাঁধা আছে। সেই ফাঁক দিয়ে ঠেলে বেরোনো সস্তার পোশাকের উঁকিঝুঁকিগুলো স্পষ্ট জানান দিচ্ছে, বাবলি শুধু ক্যাথি গোমসের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যারাকপুরে আসেনি। থাকতে এসেছে। এই থাকতে আসার ব্যাকুলতাও বাবলির চোখে আঁকা আছে। তাই সাড়ে তিন বছরের ওপর যে ক্যাথি গোমস ব্যারাকপুরে আর থাকেন না এবং এখন তিনি কোথায় থাকেন সেই খবরটুকুও তাঁর জানা নেই— এটা বলতে কোথায় যেন আটকাচ্ছিল কর্নেল সামন্তর।

তুমি এখন কোথায় থাকো বাবলি?

দত্তপুকুরের কাছে। মাসি নেই এখানে জেঠু?

উত্তর দিতেই হবে। এড়িয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। তবে ঘুরিয়ে কর্নেল সামন্ত জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ঘুরে এসেছ ওবাড়িতে?

হ্যাঁ, দেখলাম তো তালা দেওয়া। ভাবলাম হয়তো বাজারে টাজারে গেছেন। তবে বাড়ির সামনের পানওয়ালা বলল মাসি অনেকদিন হল এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

কর্নেল সামন্ত মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিলেন, ঠিকই বলেছে। মিসেস গোমস এখন আর এখানে থাকেন না।

বাবলির করুণ মুখটা আরও ছোট হল, তা হলে, কোথায় থাকেন?

ঠিকানাটা আমারও জানা নেই।

বাবলির মুখে হতাশার শেষ চিহ্নগুলোও ফুটে উঠল। বয়সে, অভিজ্ঞতায়, বুদ্ধিতে

কর্নেল সামন্ত প্রাজ্ঞ। দ্রুত বুঝতে পারলেন মেয়েটা গভীর কোনও সমস্যায় আছে। যে-মেয়ে সৈনিকের বীরত্বকে পুজো করে, একজন সৈনিকের কর্তব্য থেকেই তাকে সমস্যা থেকে বের করে আনা কর্তব্য বলে মনে করলেন কর্নেল সামন্ত।

তুমি কি কোনও প্রবলেমে আছ বাবলি?

বাবলি মাথা নিচু করে চুপ করে থাকল। কর্নেল নিজের গলাটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন, তুমি খুলে বলো। আমি যদি কোনও সাহায্য করতে পারি।

বাবলি আস্তে আস্তে মুখটা তুলল। চোখ দুটো জলে ভরে আছে।

মা আমার বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছে।

কর্নেল দ্রুত সমস্যাটা বুঝে ফেললেন। হয় মেয়েটার এখন বিয়েতে মন নেই, না হয় পছন্দের বিয়ে হচ্ছে না। মুখ টিপে অল্প হেসে বললেন, তো, মা খারাপ কী করছেন? বিয়ে তো একদিন তোমাকে করতেই হবে, নিজের ঘরসংসার করবে না? বোকা মেয়ে।

ওবাড়িতে বিয়ে হলে আমাকে ওরা আর গান গাইতে দেবে না।

কর্নেল সামন্ত সমস্যার সঙ্গে গানের সম্পর্কটা ধরতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, মানে?

বাবলি এবার সমস্ত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, জড়তা কাটিয়ে উঠে বলল, আমি গানের অনেক বড় আর্টিস্ট হতে চাই জেঠু। সিনেমায় গান গাইতে চাই!

কর্নেল সামন্ত চুপ করে গেলেন। গানের জগৎটার কিছুই তাঁর জানা নেই। বাবলির এই ইচ্ছেটা কতটা ছেলেমানুষের আবেগ আর কতটাই বা দৃঢ় প্রত্যয় ভেবে উঠতে পারলেন না। তবে স্মৃতিতে হঠাৎ ভেসে উঠল নিজের বাবলির বয়সের সময়টা। বাবা ছিলেন নিম্নবিত্ত করণিক। তাঁর ছেলে হয়ে চেয়েছিলেন আর্মিতে যোগ দিয়ে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে। বংশে কেউ কোনওদিন মিলিটারিতে চাকরি করেনি, এমনকী জানাশোনার মধ্যেও কেউ নয়। তবু সেই বয়সে একটা অদম্য জেদ ছিল। একদিন কাকভোরে ফোর্ট উইলিয়ামে মিলিটারিতে চাকরি করতে ইচ্ছুক ছেলেগুলোর লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। বাকিটা তো ইতিহাস।

মিলিটারিতে যোগ দিতে চাইলে তাও একটা প্রতিষ্ঠান আছে। স্বীকৃত পথ আছে। কিন্তু সিনেমায় গান গাওয়া? ভোরবেলায় কোন লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে একদিন সিনেমার গায়িকা হওয়া যায় জানা নেই কর্নেল সামন্তর। মানুষের জেদ আর আত্মপ্রত্যয়কে চিরকাল স্যালুট করে এসেছেন কর্নেল সামন্ত। বাবলির চোখের মধ্যেও কোথাও সেই জেদ আর আত্মপ্রত্যয়টা আছে। তবু প্রকাশ্যে সেটাকে প্রশ্রয় না দিয়ে একটু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বাড়িতে কিছু না বলে চলে এসেছ?

'ঝগড়া হয়েছে মায়ের সঙ্গে। মাকে আমি বলেছি আমি কিছুতেই এই বিয়ে করব না। আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। আমি ঠিক একদিন সিনেমায় গান গাইব।

সব লক্ষ্যে পৌঁছোনোর একটা পথ থাকে। তুমি যে-লক্ষ্যে পৌঁছোবে ভাবছ, তার পথটা তোমার জানা আছে?

বাবলি মাথা নাড়ল।

না, আমি শুধু গান গাইতে পারি।

কর্নেল সামন্ত অসহায় বোধ করলেন। এ মেয়েকে তিনি কী করে সাহায্য করতে পারেন! মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, আর তোমার কী মনে হল? ব্যারাকপুরে মিসেস গোমসের কাছে এসে থাকতে পারলে তোমার পথে তুমি এগোতে পারবে?

জানি না, তবে বিশ্বাস করুন জেঠু, মায়ের কাছে থাকলে আমার বিয়ে হয়ে যাবেই। আর একবার বিয়ে হলে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে।

কর্নেল সামন্ত গভীরভাবে কিছু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, সুলতানের সঙ্গে এবাড়িতে একসঙ্গে থাকতে পারবে?

বাবলির চোখেমুখে পুরনো ভয়ের রেখাগুলো আবার ফুটে উঠল। কর্নেল হেসে ফেললেন, বোকা মেয়ে। তোমাকে আর কতবার বলব যে, সুলতান এখনও কামড়াতে শেখেনি।

কর্নেল সামন্ত বাবলিকে ওঁর কাছে থাকার একটা শর্ত দিয়েছিলেন। বাবলিকে বাড়িতে জানাতে হবে যে, ও এখানে আছে। যদিও বাবলির একদমই ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আশ্রয়দাতার এই শর্তটাকে মানতে বাধ্য হয়েছিল। অতি সংক্ষেপে একটা পোস্টকার্ড লিখেছিল বাবাকে। তার কোনও উত্তর অবশ্য বহুদিন পায়নি।

বাবলি ভেবেছিল, ক্যাথিমাসির বাড়ির যেভাবে ফাইফরমাশ খেটে আশ্রয়ের দামটা মিটিয়ে দিত, কর্নেলের বাড়িতেও সেই একইরকমভাবে কাজকর্ম করে আশ্রয়ের দাম মেটাবে। কিন্তু কর্নেল সামন্ত সেটা একদমই পছন্দ করতেন না। বা বলা চলে বাবলিকে তিনি কখনওই কাজের মেয়ে বলে দেখতেন না। বাবলিকে তিনি অতিথির মর্যাদায় বাড়িতে রাখলেন। নতুন পোশাক কিনে দিলেন। একটা ঘরও বরাদ্দ করে দিলেন।

কর্নেল সামন্ত গানের ব্যাপারে কিছু না বুঝলেও বাবলির যে সংগীতপ্রতিভা আছে, গানের একটা ভাল গলা আছে সেটা বুঝতেন। মেয়েটার রেওয়াজের মতো কোনও নির্দিষ্ট সময় না থাকলেও মাঝে মাঝেই সুরেলা গলায় গুনগুন করত। অধিকাংশই বাজার চলতি হিন্দি গান। তবে শুধুমাত্র গলাটাকে সম্বল করে বাবলি কী করে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবে সেটা কর্নেল বুঝতে পারতেন না। খোঁজখবর শুরু করেছিলেন যদি বাবলিকে কাছেপিঠে কোনও গানের স্কুলে ভরতি করা যায়। ঈশ্বরদত্ত গলাটাকে ঘষামাজা করা দরকার।

এরই সঙ্গে কর্নেল ভেতরে ভেতরে একটা সূক্ষ্ম আতঙ্কে ভুগতেন। মেয়েটা বাড়িতে একটা প্রাণ নিয়ে এসেছে। সুলতানের রুক্ষ ডাকের ভেতর বাড়িতে একটা কোমল মাধুর্য। মেয়েটা সন্ধেবেলায় যুদ্ধের গল্পগুলো একই রকম ভালবাসে। একই রকম সম্ভ্রম জানায় ভারতীয় সেনাকে। হুইস্কির পেগ হাতে নিয়ে যুদ্ধের বিক্রমের গল্পগুলো বলতে বলতে কোথা দিয়ে যেন কেটে যায় সন্ধেবেলাগুলো।

আর একটা ব্যাপার কর্নেল আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করলেন, সুলতানের সঙ্গে বাবলির সখ্যতা। যে-সুলতানের ভয়ে বাবলি কাঠ হয়ে থাকত, ক'দিনে সুলতান সেই বাবলির দাসত্ব স্বীকার করে নিল। সুলতান বাবলির পায়ে পায়ে ঘোরে। বাবলির ধমকে চুপ করে যায়।

কর্নেলের সূক্ষ্ম আতঙ্কের কারণটা ছিল বাড়িতে এই নতুন প্রাণের স্থায়িত্ব নিয়ে। মনে হত, হয়তো কালকেই সদর দরজা খুলে দেখবেন, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বাবলির বাবা-মা, মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। অন্যভাবে কখনও কখনও তিনি এটা বাবলির কাছে প্রকাশও করেছেন।

কী বাবলি, বাড়িতে একবার ঘুরে আসবে না?

বাবলি প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, না, ওরা আমার শত্রু।

কর্নেল নরম গলায় ধমক দিয়ে বলেছেন, দুর বোকা মেয়ে, বাবা-মা কখনও শত্রু হয়?

ওরা আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে চায়।

তাই কখনও হয়? বাবা-মা'র কাছে মেয়ে অনেক সাধের জিনিস। কোনও বাবা-মা-ই চায় না মেয়েকে বিদায় করতে। কিন্তু সমাজের তো এটাই নিয়ম। তোমার তো একটা ভবিষ্যৎ আছে।

তা বলে ওরকম একটা বাড়িতে! অজগ্রামের ভেতর। হাজারটা নিষেধ। আমাদের দেশের গ্রামেও অত নিষেধ ছিল না।

কর্নেল হেসে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, কী করে জানলে হাজারটা নিয়ম। তুমি তো সেই গ্রামে বউ হয়েই গেলে না।

আমি জানি, আমাকে বলেছে।

কে বলেছে?

ওই যারা সম্বন্ধ করতে আমাকে দেখতে এসেছিল।

কর্নেল মশকরা করে বললেন, তা হলে তুমি বিয়ে করবে না, তাই তো?

এর উত্তরে বাবলির মুখে অল্প লাল আভা খেলে গেল। কর্নেল বুঝতে পারলেন— বাবলিও চায় একটা সুস্থ বিবাহিত জীবন। তবে সেটা হবে তার মনের মতো মানুষের সঙ্গে যে তাকে গান গাইতে দেবে। সিনেমার গায়িকা হওয়ার পথে সঙ্গ দেবে।

কর্নেল যেটা জানতেন না, তা হল, বাবলি একটা মনের মানুষকে ব্যারাকপুরে তিন বছর আগেই গেঁথে ফেলেছিল।

সুলতান দিনে দু'বার বাড়ির বাইরে যায় নিয়ম করে। একবার ভোরে যখন কর্নেল মর্নিংওয়াকে বেরোন তখন কর্নেলের সঙ্গে, আর একবার সন্ধ্যায় বাবলির সঙ্গে। বাবলি কর্নেলের একটা লাঠি নিয়ে সুলতানের চেনটা ধরে দিব্যি শিখে গেছে কীভাবে রাস্তায় সুলতানকে বশে রাখতে হয়। সুলতান বাধ্য ছেলের মতো বাবলির সঙ্গে বেরোয়। বরং ফাঁকা জায়গায় বেশ লাগে বাবলির গুনগুন গান। আদুরে হয়ে মাটিতে নাক ঘষে। তখন বাবলি চেনটা ধরে টান দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে ধমকে ওঠে।

সুলতান... নোও... বিহেভ ইয়োরসেল্ভ... মাটি খাবি না...

সেই সুলতানই একদিন কিছু একটা দেখে... গোঁ গোঁ করে ফুঁসতে থাকল।

কী হয়েছে সুলতান? ওরকম করছিস কেন?

বলতে বলতে বাবলি সুলতানের দৃষ্টি অনুকরণ করে অবাক হয়ে গেল। বেশ কিছুটা দূরে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তপাই। বাবলির মুখে একমুখ হাসি খেলে গেল। সেই সঙ্গে একটা ভীষণ ভাল লাগার ছোঁওয়া। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, তপাইদা... তুমি!

এতটাই দূরে ছিল তপাই যে, বাবলির কথাগুলো শুনতে পেল না। তবে বাবলির খুশির ভাবটা দেখতে পেল।

বাবলি হাতছানি দিয়ে তপাইকে ডাকল। তপাই দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারাতেই সুলতানকে দেখাল। বাবলি হেসে উঠল।

ওফ! তুমি সুলতানকে ভয় পাচ্ছ! সুলতান এখনও কামড়াতেই শেখেনি। ও খালি দুষ্টুমি করে একটু ভয় দেখায়।

তপাইয়ের ভরসা হল না বাবলির কথায়। ঠিক যেমন ক'দিন আগেও এই একই কথাগুলোয় ভরসা হত না বাবলির। তপাই সাইকেলটা আড়াল করে দূরেই দাঁড়িয়ে থাকল। বাবলি তপাইকে আশ্বস্ত করে বলল, ঠিক আছে, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি সুলতানকে বাড়িতে রেখে আসছি।

সুলতানকে বাড়িতে রাখতে এসে কর্নেল সামন্তকে একটা আধা মিথ্যেকথা বলতেই হল বাবলিকে।

জেঠু, আমি একটু ঘুরে আসছি।

কোথায় যাচ্ছ?

একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খুব করে ধরল ওর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। একটুখানির জন্য ঘুরেই চলে আসছি।

কর্নেল সামন্ত আপত্তি করলেন না। বাবলিও একবুক উত্তেজনা নিয়ে চলে এল যেখানে তপাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল। তপাই একইরকমভাবে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বাবলি তপাইয়ের কাছে এসে বলল, কেমন আছ তপাইদা?

তুমি এখানে এসে আছ, একবারও আমাকে খবর দাওনি?

বা রে! তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে দেখিয়েছ নাকি কখনও?

কথায় কথায় আমায় নিতাই ফস করে বলল। কিন্তু আমার ঠিক বিশ্বাস হয়নি।

কে নিতাই?

ওই, বুড়ির বাড়ির সামনে যার পানের দোকান। তুমি নাকি একদিন দুপুরে গিয়েছিলে বুড়ির খোঁজ করতে। আমি নিতাইকে বললাম, তোর চোখ গেছে—কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস।। এদিকটায় তো খুব একটা আসা হয় না। আর তুমি যে খোদ মিলিটারির বাড়িতে এসে আছ, মিলিটারির কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়াও, ওসব তো মাথাতেই আসেনি।

আমার মন কিন্তু বলছিল, তোমার সঙ্গে ঠিক দেখা হবে তপাইদা।

কেন মনে হচ্ছিল?

বা রে, ব্যারাকপুরে আসব আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না?

তুমি এখনও আমার কথা ভাবো বাবলি? আমাকে মনে রেখেছ?

কেন মনে রাখব না?

কেন রাখবে?

বাবলি লজ্জা পেয়ে মুখটা নামিয়ে নিচু গলায় বলল, জানি না।

তপাই আশ্চর্য হচ্ছিল। বেকারত্ব আর হতাশা যার ছায়াসঙ্গী, বেঁচে থাকাটা যার কাছে এক এক সময় অর্থহীন, তার জন্য এই পৃথিবীতে এমন কেউ আছে, যে তার কথা ভাবে—এটা নিজেকে আশ্চর্য করে ফেলার মতোই একটা বিষয়। তপাইয়ের অন্যমনস্কতা ভাঙিয়ে বাবলি বলল, তপাইদা, গঙ্গার ধারে সেই জায়গাটা কত দূর গো?

কোন জায়গাটা?

যেখানটায় আমরা যেতাম।

তপাই একটু চিন্তা করে জায়গাটা বুঝতে পারল।

না, খুব দূর নয়। যাবে সেখানে?

চলো।

উঠে এসো সাইকেলে।

সাইকেলের রডে উঠে বসে বাবলি হ্যান্ডেলটাকে শক্ত করে চেপে ধরল।

সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিল তপাই। উষ্ণ নিশ্বাসের দূরত্বে বাবলির এলো চুল, খোলা কাঁধ। হাওয়ায় কয়েকটা চুল এসে তপাইয়ের মুখে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। এ একটা অন্যরকম ভাললাগা। ইচ্ছে করছে বাবলির খোলা চুলের মধ্যে নাকটা ডুবিয়ে দিতে। একটা ঘোরের মধ্যে পৌঁছে গেল গঙ্গার সেই নির্জন ধারে। বাবলি দু'চোখ বিস্ফারিত করে দেখতে থাকল গঙ্গাকে।

দেখো তপাইদা, গঙ্গা একই রকম আছে, একটু পালটায়নি। এখানটায় এলে বড্ড বুড়িমতীর কথা মনে পড়ে...

বাবলির দার্শনিকের মতো কথাটা তপাই ঠিক বুঝল না। গঙ্গা পালটাবে কেন? আবহমানকাল থেকে প্রবহমান একটা নদী। তা ছাড়া এই গঙ্গাকে তপাই প্রায় দু'বেলা দেখে। তপাই বরং দেখতে থাকল বাবলির শরীরকে। সেই ভরন্ত শরীরটা যেন নেই। না থাক, তবুও তো সে তাকে মনে রেখেছে। হয়তো ভালওবাসে। বাবলির পিছনে এসে তপাই ফিসফিসিয়ে বলল, তোমাকে একটু ধরব, বাবলি?

বাবলি কোনও উত্তর দিল না। তপাই আরেক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল বাবলিকে। হাত দুটো বাবলির কোমরে ঘোরাফেরা করল। তারপর একটা হাত উঠে এল বাবলির স্তনের ওপর। একটা আবেশে চোখটা বন্ধ করে ফেলে বাবলি ফিসফিস করে বলল, তুমি আমাকে ভালবাসো তপাইদা?

উত্তরে এক ঝটকায় বাবলিকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল তপাই। নিজের ঠোঁট দুটো চেপে ধরল বাবলির ঠোঁটের ওপর।

৪৬

ভাল সময়, খারাপ সময় চাকার মতো ঘোরে। জুলির আজকাল সবসময় মনে হয় যে, এখন যে খারাপ সময়টা যাচ্ছে, চাকাটা বোধহয় সেখানেই থেমে গেছে। ভাল সময়ের মুখ এ জীবনে আর দেখতে পারবে না। বড়দিনের পার্ক স্ট্রিট অন্যান্য বছরের মতো আলো ঝলমল করে উঠেছে। আলোর রোশনাইটা জুলিকে কয়েক বছর আগের ভাল সময়টাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়। আহা! কী একটা ভাল সময় ছিল সেটা। সুজন দত্ত, দয়াল সান্যালের মতো শাঁসালো খদ্দের। সুজন দত্ত ক্লাবে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল একটা বড়দিনের আগের সন্ধ্যায়। সেই সুজন দত্ত দুম করে মরে গেল। আর দয়াল সান্যাল? আর একটা আজব লোক। জুলির শরীরের প্রতি কোনও আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করাত জুলিকে দিয়ে। মানুষকে সর্বস্বান্ত করাই ছিল লোকটার সবচেয়ে প্রিয় খেলা, সবচেয়ে কড়া নেশা। সেই খেলার বোড়ে হয়ে জুলি অনেক কিছু করেছিল। ব্যারাকপুরে এক বুড়ির বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে কুৎসা রটানো, পলাশ বলে একটা মরে যাওয়া লোকের বউয়ের কাছে গিয়ে কুৎসা রটানো, উকিল অনুপম ঘোষকে মাতাল করে মাঝরাতে বাড়িতে বউয়ের হাতে তুলে ঘর ভেঙে দেওয়া, লিস্টিটা লম্বা। তবে দয়াল সান্যাল লোকটাই তো ছিল খেয়ালি। জুলি সবে যখন মনে করতে আরম্ভ করেছিল যে, দয়াল সান্যালের কাছে ও খুব নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠছে, জুলিকে ছাড়া দয়াল সান্যালের চলবে না, দুম করে একদিন দয়াল সান্যাল মুখ ঘুরিয়ে নিল। নিল তো নিলই, ভাগ্যের চাকাটা ভাল থেকে একেবারে খারাপের গাড্ডায় ফেলে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কাঁচুলিটা আরও আরও শক্ত করে বেঁধেও খারাপ সময়টা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না জুলি।

কয়েকদিন ধরেই পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথের আলোআঁধারি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে পথচলতি পুরুষমানুষদের ইশারা করতে করতে ক্লান্ত চোখে ভাল সময়ের একটা লোকের নাম মনে পড়ছিল জুলির। উকিল অনুপম ঘোষ। দয়াল সান্যালের ইচ্ছায় যার সংসারে দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে এসেছিল। পরে শুনেছে সেই স্ফুলিঙ্গটাই দাউদাউ করে জ্বলেছে। অনুপম ঘোষের বউ অনুপম ঘোষকে ছেড়ে চলে গেছে। তাতে অবশ্য জুলির লাভই হয়েছে। অনুপম ঘোষকে বারবার ফিরে আসতে হয়েছিল জুলির কাছে। তবে কালের নিয়মে অনুপম ঘোষ ক্রমশ হারাতে থাকল জুলির শরীরের আকর্ষণ। জুলির শরীরের আকর্ষণ অনুপম ঘোষ হারিয়েছিল, নাকি জুলিরই খারাপ সময় শুরু হয়ে গিয়েছিল?

খারাপ সময় থেকে ভাল সময়ে ফেরার চেষ্টায় জুলি কোনও কসুর করেনি। তাই

যেই অনেকদিন পর খবরের মতো একটা খবর কানে এল, খবরটা যাচাই করে অনুপম ঘোষকে সেটা দিতে এক মুহূর্তও দেরি করেনি জুলি। খবরটা তো ওকে দিতেই হবে। এক সপ্তাহ ধরে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে অবশেষে ফোনে অনুপমের কানে খবরটা পৌঁছে দিতে পেরেছে জুলি।

মানুষের কী বিচিত্র মতি। যে-দয়াল সান্যাল জুলিকে ব্যবহার করে অনুপম ঘোষের ঘরসংসার সব তছনছ করে দিয়েছিল, সেই অনুপম ঘোষই কিনা আবার জুলিকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল দয়াল সান্যালের ওপর প্রতিশোধ নিতে। তবে সেই কয়েক মাসে জুলি দয়াল সান্যাল আর অনুপম ঘোষকে যতটা চিনেছিল তাতে অন্তত এইটুকু বুঝেছিল যে, দয়াল সান্যালের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে অনুপম ঘোষ নিতান্তই বাচ্চা। বোকা বাচ্চাদের মতো অনুপম ঘোষ কী করত? দুটো কাজ। এক নম্বর গলা পালটে দয়াল সান্যালের বউকে ফোন করত, আর দু'নম্বর জুলির শরীরটা ভোগ করতে করতে দয়াল সান্যালের হাঁড়ির খবর জানতে চাইত।

দয়াল সান্যালের হাঁড়ির খবর? অনুপম ঘোষকে খুশি করতে জুলি প্রাণজুড়োনো খিস্তি করত দয়াল সান্যালকে। আর মনে মনে ভাবত, একটা সময় একসঙ্গে কাজ করেও অনুপম ঘোষ চেনেনি দয়াল সান্যালকে! যে-লোকটা নিক্তি মেপে মদ খায়, পুরো পয়সা দিয়েও বেশ্যাকে বিছানায় তোলে না, তার মনের খবর পাওয়া তো ভগবানেরও অসাধ্যি। জুলি তো কোন ছাড়। তবে এটা অনুপম ঘোষের কাছে কখনওই প্রকাশ করত না জুলি। ধোঁয়াশাটা কেটে গেলেই তো আমদানির একটা রাস্তা বন্ধ। অনুপম ঘোষকে তাই মনগড়া দয়াল সান্যালের হাঁড়ির খবর বলত।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, বেশ কিছুদিন নিষ্ফল ছোবল চালিয়ে অনুপম ঘোষ বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে, ওর ছোবলে কোনও বিষ নেই। প্রথম প্রথম জুলির শরীরের ওপর উন্মত্ত ভালবাসার যে-আকর্ষণটা ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও হারিয়ে ফেলে জুলির সঙ্গে সম্পর্কটাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। এরকম সময়েই খবরের মতো খবরটা কানে এসে, খারাপ সময়ের ওপর বসে যাওয়া চাকাটা ঘোরার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখতে পেল জুলি। সেই আশাতেই আলোআঁধারির ঘুপচিটা ছেড়ে ঝলমলে আলোর তলায় আজ খবরের মতো খবরটা দেওয়ার জন্য জুলি অনুপম ঘোষের জন্য অপেক্ষা করছে।

তিন দিন সময় ফেল করে অনুপম ঘোষ আজ কথা দিয়েছে যে, আসবেই আসবে। জুলিও জানে অনুপম আজ আসবেই। আগের তিন দিন ভুলটা হয়েছিল তারই। অনুপম ঘোষকে আগে থেকে বলেনি খবরটা হল দয়াল সান্যাল সম্পর্কে। ভেবেছিল, অনুপম যেরকম পছন্দ করে, সেই শরীরের খেলাটা খেলতে খেলতে খবরটা দেবে। তা হলে হয়তো হারিয়ে যাওয়া শরীরের উত্তেজনাটা আবার অনুপমের পেশিগুলোতে ফিরে আসবে। কিন্তু তিন দিন ফোনে আসব বলেও না আসার পর বাধ্য হয়ে জুলিকে খবরের রহস্যটা ভাঙতে হয়েছে। জুলি জানে প্রতিশোধ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিশোধস্পৃহা কখনও মরে যায় না। অনুপম ঘোষ আসবেই।

জুলি মেয়েটার জন্য অনুপমের অনুভূতিটা যে ঠিক কী, অনুপমের নিজেরই গুলিয়ে যায়। নিজের পেশায় মেয়েটারই আসলে নিজের কোনও জাত নেই। সমাজের উঁচু মহলের লোকজনদের নিয়মিত অঙ্কশায়িনী হয়েও কেন যে ওকে পার্ক স্ট্রিটের ফুটপাথে নিয়ম করে সন্ধেবেলায় ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াতে হয়, বা অনুপমের মতো নগণ্য লোকের সংসারে আগুন লাগাতে যেতে হয়, এটা উকিলের বুদ্ধিতে সমাধান করতে পারেনি অনুপম। হয়তো মেয়েটা খুব সস্তা আর বোকা বলে। এই ক'বছরে পুড়ে পুড়ে অনুপমও অনেক শক্ত হয়েছে। তাতে বুঝতে পেরেছে জুলি অনুপমকে ধরে রাখার চেষ্টা করত দুটো জিনিস দিয়ে। নিজের শরীর আর দয়াল সান্যালের জন্য প্রতিহিংসার বারুদটা সেঁকে। দুটোর জন্যই চেষ্টার ত্রুটি করত না জুলি। অথচ, জুলি বোধহয় বুঝেও বুঝত না যে, দুটোর মধ্যেই কোনও সারবত্তা নেই। এই যে গত এক সপ্তাহ আকুল হয়ে ডাকছে জুলি, অনুপম জানে এর মধ্যেও কোনও সারবত্তা নেই। জুলির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া মানেই সময় এবং পয়সা নষ্ট। এমনকী দয়াল সান্যাল সম্পর্কে খবরের মতো খবর দেবে একটা, এঁটাও অনুপমকে নতুন কোনও উৎসাহ দেয়নি। জুলি আর কতটুকু খবর রাখে? দয়াল সান্যালের হকিকতের সব খবরই অনুপমের নখদর্পণে। জুলির মতো অনুপমও অপেক্ষা করে একটা ভাল সময়ের জন্য।

তবে জুলি একটা জিনিস করতে পেরেছিল। শরীরের যে-স্পর্শে একদিন তৃপ্ত করতে পেরেছিল অনুপমের কামচক্রগুলোকে, সেই ঘুমিয়ে থাকা কামচক্রগুলো আবার জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত জুলির গলাটা শুনে শুনে অনুপমের হঠাৎ করেই ভীষণ ইচ্ছে হতে শুরু করেছিল জুলির শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিকে আর একবার নিষ্পেষণ করতে।

পার্ক স্ট্রিটে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা হওয়ার পর জুলি অনুপমকে নিয়ে গেল সেই পুরনো জায়গায়। ঘুপচি ঘরটা একটুও পালটায়নি। নিজেকে বিবস্ত্র করে পুরনো দিনের মতোই অনুপমকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করল জুলি। এবং চরম মুহূর্তে পৌঁছোনোর আগে নিজেকে থামিয়ে খবরের মতো খবরটা দেওয়ার চেষ্টা করল।

হারামি দয়াল সান্যাল এখন কী করছে জানো?

অনুপম উৎসাহিত হল না জুলির ইঙ্গিতে। জুলিকে আরও ঘন করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, এখন ছাড়ো না দয়াল সান্যালের কথা...

জুলি একটু অবাক হল। তবে অনুপমকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করার জন্য খবরটা দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত করল না। অনুপমের চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, শোনো না মজার কথা। উজবুকটা এখন তুলোর চাষ করতে বর্ধমানে ওর দেশের বাড়ি গেছে।

উত্তেজনার মধ্যেই অনুপম একটু আশ্চর্য হল। খবরটা অনুপমের কাছে নতুন নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে আগেই পেয়েছে। কিন্তু সে আশ্চর্য হল, জুলি এই খবরটা কী করে পেয়েছে ভেবে। কারণ অনুপমের কাছে খবর আছে দয়াল সান্যাল এটাকে খুব গোপনীয় রাখার চেষ্টা করেছে। জুলির স্তন দুটোর ওপর হাত রেখে বলল, তুমি কী করে জানলে?

জুলি উৎসাহিত হয়ে পড়ল। অনুপমকে আরও আদর করতে করতে আদুরে গলায় বলল, খবর রাখতে হয়...

অনুপম জুলির গালে হালকা একটা চড় মেরে আবার জানতে চাইল, তুমি কী করে জানলে?

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জুলি জানে, রতিক্রীড়ার এই পর্বে অনুপমের এই হালকা চড়টা আর হালকা থাকবে না। ঠিকঠাক উত্তরটা না দিতে পারলে পরের চড়টা সপাটে আছড়ে পড়বে গালে। গলায় তাই নতুন মাদকতা ঢেলে সত্যি কথাটাই বলল, পৃথাদির কাছে শুনলাম।

পৃথাদি কে?

জুলি অনুপমের কানের লতি দুটো নাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার মতোই দুষ্টু একজন মেয়ে।

দয়াল সান্যাল... বর্ধমান... তুলো চাষ... আর একজন দুষ্টু মেয়ে... অনুপমের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল।

তোমার পৃথাদি কী করে জানল?

পৃথাদি গিয়েছিল দয়াল সান্যালের গ্রামে...

অনুপম নতুন একটা খবরের গন্ধ পেতে থাকল।

দয়াল সান্যাল তোমার পৃথাদিকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল?

না, পৃথাদি অন্য একটা কাজে গিয়েছিল...

কী কাজে?

লাইনের মেয়ে তুলতে।

অনুপম কিছুতেই হিসেবটা মেলাতে পারল না। জুলির পৃথাদি আর দয়াল সান্যালের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক কী। জুলির শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে আনমনা হয়ে চিন্তা করতে থাকল। অনুপমকে অন্যমনস্ক দেখে জুলি আরও ভেঙে বলার চেষ্টা করল।

পৃথাদি অনেক খবর রাখে। ও জানত যে, দয়াল সান্যাল আমার খদ্দের। আমাকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে দয়াল সান্যাল বলে একটা লোকের সঙ্গে তুই শুতিস না? আমি বললাম, না ঠিক শুইনি, তবে...

অনুপম উৎসাহ দেখাল না। নিজের শরীরের ওপর থেকে জুলিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, পৃথাদি কাজের কথা কী বলল?

স্পষ্ট করে বলেনি। তবে যেভাবে জিজ্ঞেস করছিল, মনে হয় দয়াল সান্যালকে তোমার মতোই ফাঁসাতে চায়।

অনুপম ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমার পৃথাদির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।

জুলি খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, পৃথাদি কিন্তু তোমার সঙ্গে শোবে না। ওর অন্য ধান্ধা। বললাম না মেয়ে সাপ্লাইয়ের...

জুলির কথা শেষ হল না। একটা ভারী চড় এসে পড়ল গালে, আমি দেখা করতে চাই!

সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে অনুপম আছড়ে পড়ল জুলির শরীরে।

৪৭

দয়াল সান্যাল নিজে যখন ডুমুরঝরায় গিয়েছিলেন তার আগে লোক পাঠিয়ে হাল হকিকতের খোঁজখবর করতে যে-কোনও কারণেই হোক সরোজ বক্সীকে পাঠাননি। কিন্তু নিজে ঘুরে আসার কিছুদিন পর সরোজ বক্সীকে ডুমুরঝরায় পাঠালেন বর্ষার আগে তুলো চাষের জমি জোগাড়ের ব্যাপারগুলো সেরে ফেলতে।

সেইমতো এক ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে গুসকরা স্টেশনে এসে ট্রেন থেকে নামলেন সরোজ বক্সী। ডুমুরঝরায় যাওয়ার সবচেয়ে কাছের স্টেশন এটাই। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে সরোজ বক্সী খানদুয়েক রিকশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলেন না। দয়াল সান্যাল বলেছিলেন স্টেশনের বাইরে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করে নিতে। কিন্তু গাড়ির চিহ্ন কোথাও নেই। স্টেশন চত্বরে দোকানগুলো অধিকাংশই হয় বন্ধ না হয় দোকানিরা ভিজে গামছা গায়ে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। একটা একটা করে দোকান পেরিয়ে অবশেষে একটা মিষ্টির দোকান খোলা পেলেন। শোকেসে কাচের বদলে জাল। তার ভেতর কয়েকটা রেকাবিতে কটকটে গোলাপি আর কালো রঙের কিছু মিষ্টি। তার ওপর ভনভন কবে উড়ছে মাছি।

মিষ্টির দোকানটা খোলা পেয়ে খিদে-তৃষ্ণা দুটোই বেড়ে গিয়েছিল সরোজ বক্সীর। কিন্তু মিষ্টির রং আর মাছি দেখে সেই খিদেটা মরে গেল। তবু ডুমুরঝরা কীভাবে যাওয়া যায় তার অনুসন্ধান করতে মিষ্টির দোকানটার ভেতরে ঢুকে এলেন। একটা বাচ্চা ছেলে খদ্দেরহীন দোকান পাহারা দিচ্ছে। দোকানের ছায়ায় নিজেকে একটু ঠান্ডা করে ঘামটাম মুছে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই ডুমুরঝরা গ্রামে কীভাবে যাব বলতে পারো?

ছেলেটা একটুও চিন্তা না করে বলল, জানিনি।

প্রমাদ গুনলেন সরোজ বক্সী। দয়াল সান্যালের দু'নম্বর কথাটাও মিলল না। এক নম্বর কথা ছিল, স্টেশনের বাইরে ভাড়া গাড়ি পাওয়া যাবে। আর দু'নম্বর ডুমুরঝরা খুব বিখ্যাত জায়গা। গুসকরায় যে-কোনও কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে। হঠাৎ করে মাথায় একটা বুদ্ধি এল সরোজ বক্সীর। মনে হল মালিকের বাবার বাড়িতে যাচ্ছেন। একদম খালি হাতে না গিয়ে একটু মিষ্টি নিয়ে গেলে কেমন হয়?

তোমার মিষ্টি কত করে হে?

ছেলেটা নির্বিকার চিত্তে জবাব দিল, কুইরি পইসা, ট্যাকায় ছ'টা।

দাও দেখি পাঁচ টাকার।

ছেলেটা এবার ভাল করে সরোজ বক্সীকে দেখল। এই মাগনাগন্ডার দিনে একেবারে পাঁচ টাকার মিষ্টি চাইছে—তাও আবার চারদিনের বাসি মিষ্টি। লোকটা মত পালটে

ফেলার আগে তাড়াতাড়ি মিষ্টিটা দিয়ে দিতে হবে।

একটা বিড়ের ওপর মাটির হাঁড়িতে মিষ্টিগুলো টপাটপ পুরতে থাকল ছেলেটা। সরোজ বক্সী একটা পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বললেন, কে বলতে পারবে বলো তো ভাই, ডুমুরঝরা কীভাবে যাব?

শালপাতা দিয়ে হাঁড়ির মুখটা ভালভাবে বন্ধ করে ছেলেটা বলল, বসেন আপনি, দেইখছি।

একছুটে ছেলেটা বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গে করে অদ্ভুত দর্শন একটা লোককে নিয়ে ফিরে এল। লোকটার হাড় জিরজিরে চেহারা। কোমরে একটা নোংরা বাঘছাল প্রিন্টের কাপড়। মাথায় জটা। গায়ে কিছু একটা সাদাটে রং মেখেছিল। গরমে ঘামে সেটা গলে সারা গায়ে সাদা সাদা ছোপ হয়ে গেছে।

ডুইমুরঝইরাতে কাইর বাইরিতে যাবেন?

সরোজ বক্সী খুব বিরক্ত হলেন। শেষকালে এ কার পাল্লায় পড়তে চলেছেন। তবু এই এখন একমাত্র অগতির গতি! গম্ভীর গলায় বললেন, সনাতন সান্যাল।

নামটা শোনামাত্র লোকটার চোখমুখ বদলে গেল। রংমাখা মুখে চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

দয়ালদার লোক আপনি?

সরোজ বক্সী নিশ্চিন্ত হলেন ঠিক লোকের পাল্লাতেই পড়েছেন।

ডুইমুরঝরা ইখান থেকে অনেকখানি। বইরধমান থেকে একটা ভাতারের বাস আইসে। ওই বাইসে উসুমপুরে নেইমে তিন ক্রোশ পথ। তইবে উসুমপুরে গোরুর গাড়ি পাবেন।

লোকটা শেষ পর্যন্ত শুধু নিজের ইচ্ছেতেই নয়, প্রবল উৎসাহে সরোজ বক্সীর সঙ্গী হয়ে গেল। বর্ধমান থেকে ভাতারের বাস, উসুমপুরে নেমে গোরুর গাড়ি কিছুই হত না, লোকটাকে না পেলে। পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিল লোকটা। কাছাকাছি কোথাও একটা গিয়ে ধড়াচুড়া ছেড়ে সাফসুতরো হয়ে এসেছে। সরোজ বক্সী পথে জানলেন লোকটাব নাম লোকেন। লোকটার বাড়ি ডুমুরঝরাতে। বহুরূপী সেজে পয়সা উপার্জনের চেষ্টায় নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

ডুমুরঝরাতে সান্যালবাড়িতে উষ্ণ অভ্যর্থনাই পেলেন সরোজ বক্সী। কয়েকদিন আগে দয়াল সান্যাল ঘুরে গেছেন। যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি উনি লোক পাঠাবেন। তাই কলকাতা থেকে কেউ যে আসবে এটা প্রত্যাশিতই ছিল।

সরোজ বক্সীকে সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দয়াল সান্যাল। সান্যালবাড়ির মোট জমি আঠাশ বিঘে। কিন্তু প্রথম তুলোর চাষটার জন্য চাই একশো বিঘে জমি। বাকি জমিটা পেতে গ্রামের অন্যদের রাজি করাতে হবে। গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলার দায়িত্ব ভাইদের দিয়ে এসেছেন। তাই সরোজ বক্সীব কাজটা খুব একটা কঠিন হবে না। শুধু জমিটা ভালভাবে বুঝে আসতে হবে। তারপরে যাবে কলকাতা থেকে বিশেষ টিম।

দিনদুয়েক সান্যালবাড়ির আতিথেয়তায় কাটিয়ে সরোজ বক্সী বুঝতে পারলেন গুসকরা স্টেশনে ভাড়ার গাড়ি, ডুমুরঝরা বিখ্যাত গ্রামের মতোই দয়াল সান্যালের ভাইরা সব ব্যবস্থা করে দেবে—এটাও দয়াল সান্যালের একটা ভুল ধারণা। ডুমুরঝরা গ্রামটায় উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা জমির মালিক হলেও চাষাবাদ করে নিম্নবর্ণের বাগদিরা। এই চাষিরা ভাগচাষি হলেও মাঠে এদের তলায় অনেক মুনিশ কাজ করে। সুতরাং চাষাবাদ কী হবে এই নিয়ে শেষ সিদ্ধান্ত জমির মালিকরা এককভাবে নিতে পারে না। দয়াল সান্যাল নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য যে-টাকা বরাদ্দ করেছিলেন, তার ব্যবহার সম্পর্কে খানিকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সরোজ বক্সীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সরোজ বক্সী বুঝতে পারলেন, শুধু টাকা ছড়িয়ে একশো বিঘে জমি এক চুটকিতে পাওয়া যাবে না। আর গোড়াতেই তুলো চাষের ঘোর বিরোধী দেখলেন সনাতন সান্যালকে।

দয়াল সান্যালের পরের ভাই দুলাল সান্যাল অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি রাখল না। একে ফলনহীন বছর—তার মধ্যে পুরো বছরের চাষের টাকা আগাম পাওয়া যাবে নগদে। তবে কলকাতা থেকে বড়দা এসে একটা চাপে রেখে দিয়ে গেছে। পুরো একশো বিঘে না হলে চাষ শুরুই করবে না। গ্রামের লোকদের বুঝিয়ে সুজিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা মিটিং-এর ব্যবস্থা করল দুলাল।

গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে মিটিং। সকাল সকাল সবাই জড়ো হতেই স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হল। স্কুলটা দেখে সরোজ বক্সী আঁতকে উঠলেন। স্কুল বলতে একটা মাটির বাড়ি, দুটো ঘর। ঘরগুলোই ক্লাসরুম, বেঞ্চের কোনও অস্তিত্বই নেই। মাটিতে বসে পড়াশুনো হয়। তার অর্ধেকটা আবার খড়ের গাঁটে ভরতি। পড়ুয়াদের মতোই মাটিতে বসে শুরু হল মিটিং।

এই স্কুলের একমাত্র মাস্টারমশাই মিটিং-এর পৌরোহিত্য করার ভার নিলেন। মাস্টারমশাইয়ের কথায় আঞ্চলিক টান অনেক কম। মিটিং-এর ধরনটা অচিরেই হয়ে গেল সরোজ বক্সীকে জেরা করার মতো একটা নাটক। মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন, আপনারা হঠাৎ এখানে তুলো চাষ করার কথা ভাবছেন কেন?

সরোজ বক্সী ঠান্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে উত্তর দিলেন, এ বছর তো দেশে চাষের অবস্থা খুব খারাপ হল। সামনের বছরও যদি এরকম অবস্থা থাকে— বহু পরিবার না খেয়ে মারা যাবে। আমরা চেষ্টা করে দেখছি যদি তুলো চাষ করে মন্দা কাটানো যায়... ধান না ফললেও তুলো ফলবে... তুলোর দামও ভাল, ধানের চেয়ে বেশি।

যে-মাটিতে জলের অভাবে ধান ফলল না, সেখানে তুলো হবে?

খুব কঠিন প্রশ্ন। মিথ্যা উত্তরেও যুক্তি চাই। তা ছাড়া এইসব প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে কে জানত? কোনও প্রস্তুতি নেই। তাই আধা মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধরলেন সরোজ বক্সী।

তুলো চাষ হবে। আপনি রাজস্থানে দেখুন। ওখানেও তুলো চাষ হয়। ওখানেও জলের অভাব আছে।

রাজস্থান?

মাস্টারমশাই একটু চুপ করলেন। ঘরভরতি ব্রাহ্মণ-বাগদির দল চেয়ে আছে মাস্টারমশাইয়ের মুখের দিকে। মাস্টারমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন তিন দিনের পুরনো একটা খবরের কাগজ নিয়ে। দু'হাত দিয়ে কাগজটার প্রথম পাতাটা ধরে মাথার ওপর তুলে দেখালেন মাস্টারমশাই।

সরোজ বক্সী প্রথমেই প্রথম পাতার তিন কলাম জুড়ে ছবিটা দেখলেন। এক ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে চোখে কালো চশমা পরে দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গাঁধী। পিছনে দু'জন অনুগামী। ছবির ওপর মোটা অক্ষরে হেডিং—পোখরানের মরুভূমিতে ভারত পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে বিশ্বের ষষ্ঠ পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়েছে।

খবরটা জানা ছিল না সরোজ বক্সীর। এই ক'দিন খবরের কাগজ পড়া, রেডিয়োতে খবর শোনা, কিছুই হয়নি। পারমাণবিক বোমাটা কেমন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোসিমা নাগাসাকিতে যেরকম বোমা ফেটেছিল সেরকম কি? তাই যদি হবে, ভারত নিজের দেশে নিজেই বোমা ফাটাল কেন?

পোখরানটা কোথায়? সরোজ বক্সী বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

রাজস্থানে। যেখানে আপনি বলছেন তুলোর চাষ হয়।

এইবার গলাটা পালটে গেল মাস্টারমশাইয়ের। রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, আপনাদের তুলোর চাষ আসলে একটা ভেক। দেশে আজ অ্যাটম বোমা ফাটছে। দেশটা সিআইএ-এর দালালে ভরে গেছে। ভারত বিলেত জাপান থেকে ঋণ নিচ্ছে। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিচ্ছে। সেই ঋণের টাকায় কী করছে? আমেরিকা থেকে রেকর্ড পরিমাণ গম কিনছে। সব সিআইএ-এর দালাল। বোমা ফাটিয়ে ফাটিয়ে, তুলো চাষ করে আমাদের দেশে সব ধান-গমের ফলন বন্ধ করে আমেরিকার কাছ থেকে গম কিনবে। শিক্ষা হয়নি নিক্সনের। গত বছর নাক কেটে ফিরে আসতে হয়েছে ভিয়েতনাম থেকে। এর পরেও সিআইএ-এর দালাল হয়ে যদি আপনারা এখানে আসার চেষ্টা করেন—ফল ভাল হবে না।

সবাই মাস্টারমশাইয়ের জোরালো বক্তব্য শুনে চুপ করে থাকল। সরোজ বক্সীর নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক বোধ নেই। কংগ্রেস কমিউনিস্টদের মধ্যে চাপান-উতোর প্রচুর শোনেন কলকাতায়। তবে এরকম জোরালো রাজনৈতিক চাপের মুখে কখনও পড়েননি।

পরের দিন দয়াল সান্যালের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যটা অপূর্ণ রেখেই কলকাতায় ফিরতে বাধ্য হলেন সরোজ বক্সী। ফেরার পথে আবার সঙ্গী হয়েছিল লোকেন। এবার আর গোরুর গাড়ি নয়, একটা সাইকেলরিকশার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সনাতন সান্যালের ছেলেরা। বিদায় জানানোর আগে সরোজ বক্সীকে আশ্বাস দিল— তারা চেষ্টা চালিয়ে যাবে একশো বিঘে জোগাড় করার।

রিকশায় উঠে খানিক দূর যাওয়ার পর একটু উসখুস করে লোকেন বলল, বাবু, কইলকাতার এইকটা টিইকিট কাইটে দিবেন?

কোথায় যাবে কলকাতায় তুমি?

লোকেন ওর ঝোলা ব্যাগটা থেকে খুঁটেখুঁটে একটা চিরকুট বের করল। স্পষ্ট অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখাটা দেখে কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। ইংরেজি অক্ষরে লেখা আছে কাঠবেড়ালি আর তার তলায় একটা ফোন নম্বর।

সরোজ বক্সী গম্ভীর হয়ে বললেন, কে থাকে ওখানে?

এক মেয়েছেলে বাবু। এ গেরামের কুটুম। মনটা বড় ভাল। বলিছিল কইলকাতায় এইলে দেইখা করতে। কাজ দিবে।

কাঠবেড়ালি কথাটা ছাড়া ঠিকানাটায় কোনও নাম লেখা নেই। সরোজ বক্সী তাই সেই মহিলার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

তা জানি না বাবু, তবে ইবার উখানে গিয়েই থেইকে যাব। যইদি দয়ালদা বা উই কুইটুম মেইয়েছেলেটা কুনো কাজ দেয়।

লোকটা কলকাতায় কাজের জন্য যেতে চায়। দয়াল সান্যাল বলেছিলেন একজন এজেন্ট ঠিক করতে। যে যোগসূত্র রাখবে ডুমুরঝরার সঙ্গে কলকাতার অফিসের। ডুমুরঝরায় আসার দিনই পথে লোকেনের মুখে ডুমুরঝরা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলেন। লোকটা একবারে বাড়ি বাড়ি হাঁড়ির খবর রাখে। লোকটাকে এজেন্ট করা যায় না? কাজে আসতে পারে। একদম খালি হাতে কলকাতায় ফেরার সময় লোকটার সঙ্গে আসতে চাওয়া মানে হাতে চাঁদ পাওয়া। ভেতরে ভেতরে একটা উৎসাহ পেলেন সরোজ বক্সী। বললেন, চলো, আমার সঙ্গে চলো।

৪৮

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দয়াল সান্যালের পুরো প্রস্তাবটা শুনে বললেন, না মিস্টার সান্যাল, এত বড় একটা লোন অ্যামাউন্ট স্যাংশন করার এক্তিয়ার আমার হাতে নেই। তাব ওপর পুরো প্রোজেক্টটাতে বড় একটা রিস্ক জড়িয়ে আছে। এক নম্বর, আপনি যে কটন ফার্মিং করবেন বলছেন সেটা কতটা ফিজিবল আপনার সাবমিটেড রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার হচ্ছে না; আর দু'নম্বর, বর্ধমানে কটন ফার্মিংটায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোন না হয়ে এগ্রিকালচারাল লোন হওয়া উচিত। আর সেটা পেতে আপনি এনটাইটেল্ড নন।

দয়াল সান্যাল খানিকটা রাগ দেখিয়ে বললেন, ওয়েল, তা হলে আপনাব সঙ্গে এ ব্যাপারে ডিসকাস করে লাভ নেই। ব্যাবসা করতে টাকার অভাব হয় না। আপনি দিতে না পারেন, অন্য কেউ দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনিও আমার দিক থেকে ফারদার বিজনেস এক্সপেক্ট করবেন না। মে বি, আমার বিজনেস অ্যাকাউন্টও আর ফারদার আপনাদের সঙ্গে কন্টিনিউ করব কিনা চিন্তা করব।

টার্ন ওভারের দিক দিয়ে দয়াল সান্যালের ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজ এই ব্রাঞ্চের সবচেয়ে বড় কাস্টমার। দয়াল সান্যালের ব্যাবসা পরিচালনা পদ্ধতি এবং সময়মতো ঠিক ঠিক ধারের

কিস্তি শোধ করা নিয়ে ব্যাঙ্কের কোনও অভিযোগ নেই। হরিতলা কটন মিলের জন্য বিদেশ থেকে যখন যেমন যন্ত্রপাতি আনতে তিনি ব্যাঙ্কের কাছে ধার চেয়েছেন, ব্যাঙ্ক এক কথায় দিয়ে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক এও বারবার জানিয়েছে, আপনি ব্যাবসাটাকে আরও বড় করুন, আমরা আছি। এমনকী দ্বিতীয় একটা কটন মিলও যদি আপনি তৈরি করেন তার জন্যও আমরা আছি। কিন্তু লোকটা সেসব ছেড়েছুড়ে একটা অদ্ভুত গোঁ ধরে বসে আছেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তুলো ফলাবেন! দয়াল সান্যালের প্রপোজালের ওপর ব্যাঙ্কের এগ্রিকালচারাল এক্সপার্ট নোট দিয়েছে একটি মাত্র শব্দে—ইমপসিবল আর লিগ্যাল এক্সপার্টও সমসংখ্যক শব্দ খরচ করে লিখেছে অ্যাবসার্ড। একগুঁয়ে লোকেরা যুক্তির ধার ধারে না। নিজের গোঁ-তে বিভোর হয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানেন, ব্যাঙ্ক থেকে বিজনেস তুলে নেওয়ার যে-কথা দয়াল সান্যাল বলছেন সেসব রাগ অভিমানের কথা। তবে এত বড় কাস্টমারের রাগ কমাতে যুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতেই হবে।

মিস্টার সান্যাল, আপনি এক্সাইটেড হবেন না, ব্যাঙ্ক সবসময় আপনার পাশে ছিল, আছে, থাকবেও। আমি শুধু বলছি এই মুহূর্তের প্র্যাকটিকাল ডিফিকাল্টিসগুলোর কথা। দশ বছর আগে হলে একরকম কথা ছিল, এখন ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেছে। নানান নিয়মের বেড়াজালে চলতে হয়। আমাদের আরও ভাবতে হবে— কীভাবে উপায় বার করা যায়। বুঝতেই তো পারছেন এতটা রিস্ক ইনভলভ্ড আছে।

রিস্ক? কীসের রিস্ক? ভাবছেন তো যদি শেষপর্যন্ত তুলো না ফলে? কোনও রাজনৈতিক বাধা আসে, তাই তো? ভাবছেন রাজনীতিটা আমি সামলাতে পারব না? আপনার মাথায় যেমন রিস্ক শব্দটা গেঁথে আছে, সেরকমই আমার মাথাতেও রিস্ক শব্দটা গেঁথে আছে। বাইশ বছর বয়সে বর্ধমানের একটা গ্রাম থেকে পকেটে সাত টাকা নিয়ে একলা আপনাদের এই শহরে প্রথম এসেছিলাম। জীবনে প্রথম। কাউকে চিনি না, জানি না। প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাথে রাত কাটিয়েছি। কলের জল খেয়ে পেট ভরিয়েছি। তারপর বড়বাজারে মুটেগিরি করেছি। সেই সূত্রে এক মারোয়াড়ির গদির সঙ্গে পরিচয় হল। খাতা লেখার কাজ পেলাম। সেই প্রথম তুলোর ব্যাবসার সঙ্গে পরিচয়। তারপর তুলোর এজেন্ট হয়ে কাজ করেছি। শেষে একদিন হরিতলা কটন মিলের মালিক হয়ে গেলাম। তখন আমার উনচল্লিশ বছর বয়স। সতেরো বছরে এতটা পথ পেরিয়ে আসতে মোড়ে মোড়ে আমাকে একটা শব্দের সঙ্গেই প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়েছে। রিস্ক। রিস্ক। রিস্ক। তাই আমি জানি রিস্ককে কীভাবে নিজের বশে রাখতে হয়। গোটা পৃথিবীর কাছে যেটা অসম্ভব, আমার রিস্ক সেন্স বলে সেটা সম্ভব যদি ঠিক পথ নেওয়া যায়। বলুন তো যেদিন বর্ধমানের সেই গ্রাম থেকে কলকাতা আসছিলাম সেদিন যদি পাশের লোকটাকে বলতাম—ওহে এই যে আমাকে দেখো। সতেরো বছর পর দেখবে আমি একদিন বত্রিশ কোটি টাকার টার্ন ওভারের কোম্পানির মালিক হয়ে যাব—লোকটা বিশ্বাস করত?

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মন দিয়ে সবটুকু শোনার অভিব্যক্তিটা মুখে রাখলেন। যদিও এই গল্পটা দয়াল সান্যালের মুখ থেকেই বহুবার শোনা। লোকটা নিজের অতীতকে, শূন্য

থেকে উঠে আসাকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে মনে রাখে। এটা যেমন তার আত্মতৃপ্তির কারণ, তেমনই তাকে অফুরন্ত আত্মবিশ্বাসও দিয়েছে। তবে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এটাও জানেন, দয়াল সান্যালের এই এত বড় হওয়ার পিছনে কিছু ভাগ্যও কাজ করেছে। এই লাক ফ্যাক্টরের কথাগুলো দয়াল সান্যাল কখনও বলেন না। অথচ দয়াল সান্যালের ব্যাবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই জানে সেই লাক ফ্যাক্টরের কথা।

দয়াল সান্যাল যখন তুলোর এজেন্ট বা দালালির কাজ করতেন, তখন তাঁর আলাপ হয় ম্যাকার্থি বলে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সাহেবের সঙ্গে। হরিতলায় তার একটা বড় জমি ছিল। একটা কটন মিল করতে গিয়েও পয়সার অভাবে সেটা মাঝপথে আটকে গিয়েছিল। ম্যাকার্থির এক রক্ষিতা ছিল, মার্থা। মার্থা হরিতলার সেই অর্ধনির্মিত কারখানাটা কিনে নিয়েছিল। আর সেখানেই সবচেয়ে বড় দাঁও মারতে পেরেছিল দয়াল সান্যাল। মার্থার মেয়েকে বিয়ে করে বিনাপয়সায় কারখানাটার মালিক হয়ে গিয়েছিল। তবে এখানেও একটা মাস্টার স্ট্রোক খেলার চেষ্টা করেছে। মার্থার সম্পত্তির জন্য নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেনি। মার্থার মেয়েকে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করিয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। সমাজকে বুঝিয়ে দিয়েছে মার্থাও কতখানি আগ্রহী ছিল দয়াল সান্যালকে জামাই হিসাবে পেতে।

ব্যাঙ্কের ডেবিট ক্রেডিট, জেনারেল লেজার, ব্যালান্স শিট, প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টের সঙ্গে এইসব ব্যক্তিগত জিনিসের সম্পর্ক নেইও, আবার আছেও। একজন ব্যবসায়ী যতখানি অঙ্ক নিজের জীবনের জন্য করে রাখে, সেই হিসাবের অংশটাও নিতান্ত ফেলনা নয়। মার্থা নিজে পুঁথিগত শিক্ষার প্রথম মানটা পার করতে না পারলেও নিজের পেশার সুবাদে বহু বিশিষ্ট পেশাদারের পরামর্শ পেয়েছে। তাই নিজের সারা জীবনের সঞ্চয়ে গড়ে তোলা সম্পত্তিটা জামাইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার আগে আইনের অভিভাবকত্বটা যত দূর সম্ভব মেয়ের দিকে রেখে গেছে।

প্রতিবারের মতো ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আবার একই কথা দয়াল সান্যালকে স্মরণ করিয়ে বললেন, মিস্টার স্যান্যাল, সেই পুরনো কথাটাই আবার আপনাকে বলছি। এত বড় হয়ে গেছে আপনার কোম্পানি, এবার সময় হয়েছে স্যার এটাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি করে ফেলার। ট্যাক্সের দিক দিয়েও আপনি প্রচুর সুবিধা পাবেন। বাজারে শেয়ার ছেড়ে ক্যাপিটাল তুলতে পারবেন।

দয়াল সান্যাল গলাটা খাঁকরিয়ে বললেন, করব। শুধু আপনারাই যে এটা বলছেন তা নয়, আমার কনসালট্যান্টরাও এটা বলে যাচ্ছে। আসলে কিছু সমস্যা আছে। সেটাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমার নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা আছে। তার একটা করার জন্যই তো আমি লোনটা চাইছি। দেখুন আমি যখন ঠিক করেছি এটা করব, করবই। আপনারা লোন না দিলে অন্য ব্যাঙ্কে যাব। সেখানেও লোন না পেলে খোলা বাজারে চড়া সুদে লোন নেব—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে মহারাষ্ট্র গুজরাতের মতো হাই কোয়ালিটির কটন আমি ফলিয়ে দেখিয়ে দেবই। আপনারা বরং দেখুন আপনারা কতটা কী করতে পারেন। সরোজকে আমি পাঠিয়েছি ডুমুরঝরায়। একশো বিঘের ব্যবস্থা করে তবেই ফিরতে

বলেছি। দু'মাসের মধ্যে জমিতে বীজ পড়ে যাবে। পুরো প্রজেক্টটার জন্য আই নিড মানি। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অধৈর্য হয়ে বললেন, সবই তো আমি বুঝতে পারছি মিস্টার সান্যাল। তুলো চাষ ছাড়াও আপনার প্রোপোজালের আরেকটা দিক আছে। আপনি ভাববেন না আপনার প্রোপোজালটা আমরা শুধু ঠান্ডা ঘরে বসে ভেবেছি। আমরা সার্ভেয়ার পর্যন্ত পাঠিয়েছি হরির ঝিলটা দেখতে। সার্ভেয়ার তার রিপোর্টে বলেছে হরির ঝিলের জলটা ওখানের স্থানীয় মানুষ ব্যবহার করে। যদিও সেভাবে কোনও মালিকানা নেই, তবুও একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ ওখানে স্থানীয় মানুষেরা মাছ চাষ করে। যারা মাছ চাষ করে তাদের একটা স্ট্রং পলিটিক্যাল বেস আছে। আপনার কারখানা থেকে যদি ওদের ইন্টারেস্টে কোনও আঁচ পড়ে— ওরা বাধা দেবেই। ওদের রুজি-রোজগার ভেসটেড ইন্টারেস্টে মার খাবে। তাই তুলো চাষ আর হরির ঝিলের দিকে কারখানা বাড়ানো, পুরো ব্যাপারটাই আনসার্টেন।

আপনি আমাকে নতুন কিছু শোনালেন না। হরির ঝিল সম্পর্কে স্থানীয়দের কার কী ইন্টারেস্ট আছে—সেটা কীভাবে ট্যাক্‌ল করা যাবে সেটাও আমার ঠিক করা আছে। তুলো চাষ আর হরির ঝিলের দিকে কারখানা বাড়ানো একই প্রজেক্টের অঙ্গ হলেও, দুটো বিষয় আলাদা।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এটাও জানতেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, হরির ঝিল বোজানোর ব্যাপারটায় কিন্তু আপনাকে অনেক সিরিয়াসলি ভাবতে হবে।

দয়াল সান্যাল চোখ কুঁচকে বললেন, কেন বলছেন বলুন তো?

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার একটু দম নিয়ে বললেন, ওয়েল, তার কারণ হচ্ছে, আজ থেকে চার বছর আগে, উনিশশো একাত্তরে, ইরানের তেহেরানে রামসার কনভেনশনে ওয়েট ল্যান্ড বা জলাভূমি নিয়ে প্রচুর হইচই হয়েছে। এর জন্য এই বছর পৃথিবীর বহু দেশ ওয়েট ল্যান্ড ট্রিটি সই করেছে। যারা সই করেছে তারা জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এর জন্য গত বছর আমাদের দেশে ওয়াটার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল এফ পলিউশন অ্যাক্ট, নাইনটিন সেভেনটি ফোর এসেছে। তা ছাড়া...

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার চুপ করে গেলেন।

দয়াল সান্যাল চুপ করে শুনছিলেন। চাপা শ্বাসে বললেন, তা ছাড়া কী মিস্টার গাঙ্গুলি?

আপনার মিসেস এখন আর পাখি-টাখির ব্যাপারে আগ্রহী নন? আই মিন হরির ঝিলের মাইগ্রেটরি বার্ড-এর ব্যাপারে?

দয়াল সান্যাল আরও গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো মিস্টার গাঙ্গুলি?

না, মানে... এই খবরটাও আমাদের কাছে আছে। ঝিল বোজানো, পাখি তাড়ানো এসব একসঙ্গে করতে গেলে আপনি ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল ফিফটি ওয়ান এ লঙ্ঘনের দায়ে পড়বেন। এতে খাল বিল ঝিল জঙ্গল থেকে আরম্ভ করে বন্য জন্তু পর্যন্ত সব কিছু শুধু সংরক্ষণই নয়, উন্নতি সাধনের কথা বলা আছে।

দয়াল সান্যাল একটা বেঁকা হাসি হাসলেন, আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সপ্রতিভ হয়ে বলার চেষ্টা করলেন, আসলে ক্লায়েন্টের অনেক ব্যাপারে...

দয়াল সান্যাল থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে আমি ক্লায়েন্টের কথা বলছি না। আইনের কথা বলছি।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার চুপ করে গেলেন। দয়াল সান্যাল সেটা উপভোগ করে বললেন, আচ্ছা আপনি আমাকে কী ভাবেন বলুন তো, দু'পয়সার বিজনেসম্যান?

না না, আসলে আপনার প্রোপোজালটা নিয়ে বড় বড় কয়েকটা মিটিং হয়ে গেছে, তাতে অনেকরকম প্রশ্ন উঠে আসছে... দেখুন আমি আবার চেষ্টা করব। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে আবার কথা বলব। কিন্তু কতটা সফল হতে পারব জানি না।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার গলাটা নামিয়ে একটু ইতস্তত করে বললেন, মিস্টার সান্যাল, লোনটা পেতে আর একটা কাজ করুন আপনি। যেহেতু আপনাদের অংশীদারি ব্যাবসা, মানে আপনি আর মিসেস সান্যাল দু'জন অংশীদার, লোন অ্যামাউন্টটা কভার করে আপনাদের দু'জন দুটো লাইফ কভার ইনশিয়োরেন্স করিয়ে নিন।

এটা কোন আইনের ধারা মিস্টার গাঙ্গুলি?

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আবার অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। হাজারবার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও দয়াল সান্যাল ব্যাবসাটাকে প্রাইভেট লিমিটেড করেননি। ঋণগ্রহীতার জীবনের ঝুঁকিটাতে ঋণকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বিমা করাটা জরুরি। দয়াল সান্যাল এবার কড়া গলায় বলে উঠলেন, আমার একটা ছোকরা ল'ইয়ার ছিল। আপনার মতো খুব আইন কপচাত। আমি একটা ছোট্ট কাজ দিয়েছিলাম। আইনেরই কাজ। ল্যাজেগোবরে হয়ে ছোকরার প্র্যাকটিসই শুনেছি উঠে গেছে। আমি সেই কাজটা এক তুড়িতে করে নিয়েছি। কাগজটা আপনার ফাইলেই আছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ইঙ্গিতটা ধরতে পারলেন না। দয়াল সান্যাল তুড়ি বাজাতে বাজাতে বললেন, আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না, আমার বউয়ের আর পাখি-টাখির ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে কিনা। সব ইন্টারেস্ট স্ট্যাম্প পেপারে, মানে আপনার আইনের কাগজে বন্দি হয়ে আছে। বার করুন ফাইলটা।

ফাইলটা টেবিলের ওপর আগেই বার করা ছিল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পাতা ওলটাতে ওলটাতে শুনতে পেলেন দয়াল সান্যাল একটা ছন্দে তুড়িটা দিয়েই যাচ্ছেন। শব্দটা অশ্লীল মনে হচ্ছে। তবুও দয়াল সান্যাল এই ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট বলে সহ্য করতে থাকলেন। বাংলো সমেত দু'একর জমি শিপ্রা সান্যাল ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দিয়েছে হরিতলা কটন মিলে বিদেশি যন্ত্রপাতি এনে সম্প্রসারণের ঋণ নিতে। এর মধ্যে আরও কী ব্যবসায়িক বুদ্ধি দয়াল সান্যাল লুকিয়ে রেখেছেন আঁচ পেতে ফাইল থেকে মুখটা তুলেই চমকে উঠলেন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার।

দয়াল সান্যালের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা একেবারে শূন্য। অদ্ভুত একটা যন্ত্রের মতো উদ্দেশ্যহীন ভাবে তুড়ি বাজিয়ে চলেছেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ভয়

পেয়ে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে বললেন, মিস্টার সান্যাল... শরীর খারাপ লাগছে?

দয়াল সান্যাল অস্ফুট স্বরে বলতে থাকলেন, মেয়েটার নাম ছিল জুলি। কিন্তু ছোকরার নামটা... ছোকরার নামটা... আহ্... কিছুতেই মনে পড়ছে না।

৪৯

দয়াল সান্যালের অফিসের টেবিলে একটা ফোল্ডারের মধ্যে বেশ কয়েকটা চিঠি। সেক্রেটারি চিঠিগুলো পড়ে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়ে গেছে ফোল্ডারটার মধ্যে। তার মধ্যে একটা পোস্টকার্ড।

পোস্টকার্ডটা পড়তে পড়তে খুব অবাক হয়ে গেলেন দয়াল সান্যাল। ডুমুরঝরা থেকে ময়নার মা লিখেছে। ময়নার মায়ের বক্তব্য, ময়না বিয়ের পর সেই যে ডুমুরঝরা থেকে চলে গেছে তারপর থেকে তার একটাও খোঁজ পাওয়া যায়নি। জামাই যাওয়ার আগে বারবার বলে গিয়েছিল অষ্টমঙ্গলায় নিশ্চয়ই আসবে, কিন্তু আসেনি। এমনকী একটা চিঠিও দেয়নি।

দয়াল সান্যাল চিঠিটা উলটেপালটে দেখলেন। যত সব বাজে চিঠি। ময়নার মা দয়াল সান্যালকে অনুরোধ করেছে যাতে কলকাতার কারখানায় জামাইয়ের একটু খোঁজ করে ওদের কুশল সংবাদ দেয়।

চিঠিটা পাকা হাতের লেখা। লেখাটা দেখেও মনে হচ্ছে পুরুষালি। ময়নার মা কাউকে দিয়ে চিঠিটা লিখিয়েছে। দয়াল সান্যাল সেই নির্বোধ পত্রলেখককে মনে মনে একটা গালি দিলেন। ময়নার মায়ের না হয় কলকাতার বিশালত্ব সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাও থাকতে পারে, কিন্তু পত্রলেখক কোন আক্কেলে এই চিঠিটা লিখল? অফিসের ঠিকানাটাই বা পেল কোথা থেকে? নিশ্চয়ই ডুমুরঝরার বাড়ি থেকে।

সেক্রেটারিকে ডাকলেন দয়াল সান্যাল। বললেন পরিষ্কার বাংলায় একটা চিঠি লিখতে। চিঠিটা হবে সনাতন সান্যালের নামে, তাতে পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে, দয়াল সান্যালের ঠিকানা যেন কাউকে দেওয়া না হয়।

পোস্টকার্ডটা কুচিয়ে ফেলতে গিয়েও অবজ্ঞায় ফাইলের গাদার দিকে ছুড়ে দিলেন। সেক্রেটারিকে বলে দিলেন ভবিষ্যতে এরকম চিঠি এলে তা যেন ওঁর টেবিল পর্যন্ত না পৌঁছোয়।

দয়াল সান্যাল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তুলো চাষের প্রোজেক্টের ফাইলটা খুলে পড়তে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঁদ হয়ে গেলেন ফাইলের কাগজগুলোর মধ্যে।

বন্ধ দরজায় দুটো মৃদু টোকা পড়ল। তারপর দরজাটা অল্প ফাঁক হল। দরজার বাইরে সরোজ বক্সী।

এসো সরোজ।

সরোজ বক্সীর মুখটা খুব একটা উজ্জ্বল নয়। দয়াল সান্যাল দেখেই বুঝলেন খবর অনুকূল নয়।

কখন ফিরলে?

কাল বিকেলে।

দয়াল সান্যাল গলাটা কড়া করলেন, কাল বিকেলে? আর এখন সওয়া একটা বাজে। কী করছিলে এতক্ষণ?

স্যার মেয়েটার...

থাক! থাক! এদিকে কী হল বলো?

স্যার এবারে খুব এগোতে পারিনি। আপনার ভাইরা খুব চেষ্টা করছেন, কিন্তু গ্রামের অন্য লোকেরা...

অন্য লোকেরা কী?

স্যার, এরকম সময়েই আমাদের দেশে পারমাণবিক বিস্ফোরণটা হয়ে গেল...

দয়াল সান্যাল কপালে ভুরু তুলে বললেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ? তার সঙ্গে ডুমুরঝরা গ্রামের কী সম্পর্ক? তোমার কি গরমে মাথা খারাপ হয়ে গেল সরোজ?

সরোজ বক্সী ডুমুরঝরার সব ঘটনা খুলে বলার চেষ্টা করলেন। শুনতে শুনতে ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকলেন দয়াল সান্যাল।

আমি জানতাম। ব্যাপারটা এভাবেই পাকাবে। একটা সিম্পল জিনিস তোমবা হ্যান্ডেল করতে পারো না। আমেরিকার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই ডুমুরঝরাতে সিআইএ-র চর পাঠাবে! ওই স্কুলমাস্টারটাকে বললে না কেন, ভারত এইসব বোমাটোমা ফাটানোর পর আমেরিকা ভারতের সব গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিচ্ছে। এই খরার বাজারে যেটুকু বিদেশ থেকে আসত সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষ তখন খাবে কী? আসলে এই লোকগুলো কী জানো? রাশিয়ার দালাল। কেজিবি-র চর।

সরোজ বক্সী আমেরিকা, রাশিয়া, ডুমুরঝরার গ্রাম্য রাজনীতি কিছুই বোঝেন না। তিনি শুধু দয়াল স্যান্যালের অনুগত ভৃত্য। তাই আমেরিকা, রাশিয়া নয়—নিজেদের চরটাকে যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এবার সেই কথাটা বললেন দয়াল সান্যালকে।

স্যার একটা অবশ্য মনের মতো লোক পেয়েছি— যাকে দিয়ে আমাদের কাজটা করানো যাবে। লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কে?

লোকটা একটা বহুরূপী স্যার...

বহুরূপী?

দয়াল সান্যালের মনে পড়ে গেল। এ সেই ছেলেটা নয় তো যে শ্মশানকালী সেজেছিল। যাকে দেখে ডুমুরঝরার সেই দুপুরটায় প্রচণ্ড ভয় পেয়ে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছিল, যে-ছেলেটা তারপর পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। সেই ছেলেটা বা ওরকমই যদি একটা বহুরূপী হয়—সে কী কাজে দেবে? বিরক্তিটা আরও বেড়ে গেল দয়াল স্যানালের, ওই বহুরূপী কী কাজে লাগবে?

স্যার ওর সঙ্গে একটু মিলেমিশে মনে হল চারদিকের গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। আমরা যদি ওকে ব্যবহার করে তুলো চাষের ভাল দিকটা প্রচার করতে পারি...

দয়াল সান্যাল দু'হাত দিয়ে কপালের দুটো রগ টিপে ধরলেন, সরোজ! তোমার মাঝে মাঝে বুদ্ধি কোন দিকে যে চলে আমি কেন, স্বয়ং ভগবানেরও বোঝার ক্ষমতা নেই। এত বড় একটা প্রোজেক্ট আর সেটা নাকি করে ফেলবে একটা বহুরূপী! তা কোথায় রেখেছ তোমার বহুরূপীকে?

সরোজ বক্সী একটু ইতস্তত করে বললেন, অফিসের বাইরে বসে আছে।

সর্বনাশ! শেষকালে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের হেড অফিসে একটা লোক শিব সেজে বসে ডুগডুগি বাজাচ্ছে?

সরোজ বক্সী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না স্যার, লোকটা এখন কিছু সেজে নেই। তা ছাড়া লোকটা আপনাকে চেনে বলছিল।

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি দেখা করব না। তুমি যখন দায়িত্ব নিয়ে ডেকে এনেছ, তুমি যেটা চাও করাও। কিন্তু তোমাকে আমি আবার সাবধান করে দিচ্ছি। হাতে সময় খুব কম। এইসব ফালতু লোকের পিছনে বেশি সময় নষ্ট কোরো না। দু'মাসের মধ্যে তুলোর বীজ মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এখনও জমি ঠিক হল না। এর পর কিন্তু সিজন চলে যাবে। তোমাদের বারবার বলছি।

স্যার, বর্ধমান ছাড়া আরও দু'-একটা জায়গা দেখে নিলে হত না। হুগলির দিকে...

না সরোজ! তুমি তো জানোই ব্যাপারটা এই স্টেজে গোপনে করতে হবে। সব জেলায় গিয়ে তুলো চাষ করব, তুলো চাষ করব বলে ব্যাপারটা পাবলিসিটি করা যাবে না। তা ছাড়া ডুমুরঝরার সয়েল টেস্ট করেই কমলেশ রিসার্চটা করেছে। এখন সয়েল ভ্যারিয়েশন আর করা যাবে না।

তা হলে স্যার আর একটা কথা বলি। আপনি ওই বহুরূপী ছেলেটার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা করুন। ডুমুরঝরার চারপাশের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে ছেলেটা।

দয়াল সান্যাল একটু চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে, ডাকো ওকে। কিন্তু ঠিক পাঁচ মিনিট।

লোকেনকে ভিজিটর্স ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রেখেছিলেন সরোজ বক্সী। সেখানে গিয়ে ডাকতেই হাজার বাতির আলো জ্বলে উঠল লোকেনের মুখে। বিশ্বাসই হচ্ছে না ডুমুরঝরার সবচেয়ে বড়লোক মানুষটা ওর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, সত্যি দয়াইলদাদা ডাইকছেন?

সরোজ বক্সী ধমকে উঠলেন, আঃ, এটা অফিস। উনি এই কোম্পানির মালিক। এখানে কেউ ওঁকে দাদা বলে ডাকে না। স্যার বলবে। স্যার। বুঝেছ?

সরোজ বক্সীর পিছন পিছন মনে মনে 'স্যার' শব্দটা উচ্চারণ করতে করতে ঘরে এল লোকেন। ঘরে ঢুকে দয়াল সান্যালকে দেখেই হঠাৎ করে একটা কথা মাথায় এল লোকেনের। এই চাঁদিফাটা গরমের মধ্যেও এত বড় মানুষটাকে কোট-টাই পরে তার মতোই বহুরূপীর কষ্ট করতে হচ্ছে। তবে সেই সঙ্গে মনে মনে নিজের গ্রামের মানুষটার

এলেমকে তারিফ করল লোকেন। ঘন নীল রঙের কোট-টাইয়ের সঙ্গে মানানসই গম্ভীর অফিসঘরটা।

অফিসে দাদা বলা যাবে না, স্যার বলতে হবে কিন্তু পা ছুঁয়ে কি প্রণাম করা যায়? ইতস্তত করে যতটা সম্ভব ঝুঁকে করজোড়ে নমস্কারই করল লোকেন। দয়াল সান্যাল অবশ্য এসবে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। টেবিলে ফাইলপত্তরের গাদায় তখন খুঁজে চলেছেন একটু আগে অবজ্ঞায় ছুড়ে দেওয়া পোস্টকার্ডটা। পোস্টকার্ডটা খুঁজে পেয়ে সরোজ বক্সীকে বললেন, রীনাকে একটা চিঠি করতে দিলাম। ওকে বলো, চিঠিটা এখন করার দরকার নেই। পোস্টকার্ডটায় দ্রুত আর একবার চোখ বুলিয়ে লোকেনের দিকে তাকালেন, ডুমুরঝরায় ময়নাকে চেনো?

হ্যাঁ স্যার চিনি। আইপনাদের ঘরের চাইরটে ঘর পরে বাম দিকে যে রাইস্তাটা... মইনারা তো আপনার আত্মীয়...

হুম বুঝেছি। ময়নার কোথায় বিয়ে হয়েছে জানো?

লোকেন বুঝতে পারছে না, হঠাৎ ময়নার বিয়ের প্রসঙ্গ এখন উঠল কেন। একটু মাথা চুলকে বলল, উর বিয়া তো কইলকাতাতেই হইছে স্যার। খুব বড়লোক বাড়ি, তবে...

ঠিকানাটা জানো?

মইনার বড় ননদ ঠিকানাটা দিয়েছিল বটে।

লোকেন কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগটা ঘেঁটে একটা বটুয়া বার করল। তার মধ্যে চোদ্দো ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজ। তার একটা বার করে এগিয়ে দিল।

ইটা দেইখেন তো স্যার। ইটা ইংরাজিতে লিখা।

দয়াল সান্যাল হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিলেন। কাগজটায় লেখা আছে কাঠবেড়ালি আর তার তলায় একটা ফোন নম্বর।

ভেতরে ভেতরে একটা কৌতূহল হল দয়াল সান্যালের। অদ্ভুত একটা শব্দ— কাঠবেড়ালি আর তার সঙ্গে একটা ফোন নম্বর।

এটা তো একটা ফোন নম্বর—ঠিকানা কোথায়?

লোকেন কানের লতিতে হাত ঠেকিয়ে জিব বার করল।

আপনাকে ভুল বলেছি স্যার। ফোনের কথাই বলেছিল বটে মইনার ননদ।

দয়াল সান্যালের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। চোখটাকে সরু করে বললেন, তা তোমাকে হঠাৎ ফোন নম্বর দিতে গেল কেন ময়নার ননদ?

আইসলে স্যার, ডুমুরঝরা গ্রামটা ময়নার শ্বশুরঘরের খুব পছন্দ হয়েছে। মইনার ননদ বইলছিল—ঠিক ময়নার মতো আইরেকটা মেইয়ে পেলে ময়নার ছোট দেওরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে। যদি আমি সেরকম কোনও আইবুড়ো মেইয়েছেলে জানি।

জানো নাকি?

উরা তো গরিব ঘরের মেইয়া খুঁজছে স্যার। ডুমুরঝরাতে সেরকম গরিব ঘরের মেইয়ে নাই...

তুমি কি ঘটকালিও করো নাকি?

না স্যার। আইসলে...

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তারপর?

মেয়ে নাই... তইবে স্যার উসুমপুরে আইছে একজন মেইয়ে। সেও মইনার মতোই বেধবা মায়ের মেইয়ে। উসুমপুরে গগন মাইস্টার ছিল... তার...

উফ! তো সে রাজি?

দয়াল সান্যাল ক্রমশ অধৈর্য হচ্ছেন। এই লোকটাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না। কেন যে সরোজ ধরে আনল একে। একবারের জন্য মনে হচ্ছিল—একে দিয়ে হয়তো একটা কাজ করানো যাবে। ডুমুরঝরা অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঘোরে ছেলেটা। পাখিপড়া পড়িয়ে দিলে খানিকটা প্রচার করানো যাবে। সেইসঙ্গে দরকার ডুমুরঝরার মানুষের আস্থা অর্জন। যে-পোস্টকার্ডটাকে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় আর বিরক্তিকর বলে ছুড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন একটু আগে, সেটাকে একটা তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এই বহুরূপীটার সঙ্গে যত কথা বলছেন মনে হচ্ছে অপদার্থের গাছ একটা। বেয়ারাকে ডাকার জন্য বেল টিপলেন দয়াল সান্যাল। লোকেন কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেই উৎসাহের সঙ্গে বলেই চলেছে, উসুমপুরের মেইয়েটা স্যার বেয়াড়া। মইনার ননদ কইত ভাল মেয়েমানুষ। টাইকা পইসা দিত। বেধবা মা'টা সুখেশান্তিতে থাকত। এ মেইয়ের সহ্য হল না। বইলে কিনা বিয়াই কইরবে না। মা, মেয়ে একবেলা পান্তা খেয়েই থাকবে... কিছুতেই রাইজি...

চুপ করো।

চিৎকার করে উঠলেন দয়াল সান্যাল। লোকেন থতমত খেয়ে গেল। প্রসঙ্গটা দয়াল সান্যালই তুলেছিলেন। এখন তিনিই যে কেন রেগে যাচ্ছেন লোকেনের মাথায় ঢুকল না।

দয়াল সান্যালের নির্দেশটা ওঁর সেক্রেটারির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে লোকেনের হতভম্ব মুখের চেহারা দেখে সরোজ বক্সীর বুঝতে অসুবিধা হল না যে, দয়াল সান্যালের সঙ্গে লোকেনের সাক্ষাৎকারটা খুব একটা সুখকর হয়নি। সরোজ বক্সীর দিকে একঝলক তাকিয়ে দয়াল সান্যাল লোকেনকে বললেন, যাও, তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।

লোকেন ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে দয়াল সান্যাল গজগজ করতে থাকলেন, অপদার্থ একটা... ওয়ার্থলেস... তোমার মতো আমারও একবার মনে হচ্ছিল লোকটাকে যদি কাজে লাগানো যায়। কিন্তু ও ঘরের ভেতরের হাঁড়ির খবর রাখলেও—আমাদের কোনও কাজে লাগবে না।

সরোজ বক্সী আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু স্যার, ডুমুরঝরাতে ওই মাস্টারমশাই এমন প্রচার করছে আমাদের বিরুদ্ধে—আমাদেরও পালটা প্রচার শুরু করে দেওয়া দরকার।

ওই মাস্টারটা—আমার বিরুদ্ধে প্রচার করছে কেন বলো তো? আমার কী অপরাধ?

হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়াতে দয়াল সান্যাল চুপ করে কিছু একটা চিন্তা করে বললেন, ডাকো তো, ডাকো তো ওই বহুরূপী ছেলেটাকে একবার ডাকো।

সরোজ বক্সী হন্তদন্ত হয়ে লোকেনকে নিয়ে আবার ভেতরে এলেন। দয়াল সান্যাল আপাদমস্তক লোকেনকে আর একবার দেখে বললেন, ঠাকুর-দেবতা তো অনেক সেজেছ, মহাত্মা সাজতে পারবে?

মহাত্মা... মহাত্মা মানে স্যার?

দয়াল সান্যাল গলা চড়ালেন, মহাত্মা গাঁধী... নাম শুনেছ?

লোকেন বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, খুইব জানি স্যার। মহাইত্মা করমচাঁদ গাঁধী।

মোহনদাস করমচাঁদ গাঁধী। যাক গে, সাজতে পারবে মহাত্মা?

কোনও পালাগানে স্যার?

না, পালাগানে নয়। তুমি ঠিক যেরকম ঢেঁকি হাতে নারদ না কী একটা সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলে—তেমনই মহাত্মা গাঁধী সেজে ডুমুরঝরায় ঘুরবে।

লোকেন মনে মনে মহাত্মা গাঁধীর মুখটা একবার মনে করার চেষ্টা করল। টাক মাথা। গোল গোল চশমা। হাসি হাসি মুখ। চেহারাটা ওর মতোই রোগাপাতলা। কিন্তু মাথায় আসছে না মহাত্মা গাঁধী সেজে ও কী করবে। তার চেয়ে বড় সমস্যা...

লোকেন নিজের রুক্ষ চুলগুলোর ওপর কয়েকবার হাত বুলিয়ে সেগুলো নিয়ে কী করবে ভাবতে লাগল। দয়াল সান্যাল সমস্যাটা চট করে বুঝে নিয়ে বললেন, কামিয়ে নেবে মাথাটা। ওটা কোনও সমস্যাই নয়। সমস্যা যেটা সেটা হল, ওটা তোমার একাব কম্ম নয়। অত বড় অঞ্চলে একজন মাত্র লোককে দিয়ে কিছু হবে না। আরও লোক চাই বুঝলে। পারবে আরও জোগাড় করতে কয়েকজনকে?

বহুরূপী পেশাটায় সেরকম কোনও প্রতিযোগিতা নেই। মেলা পার্বণে দু'-একজনকে দেখা গেলেও ডুমুরঝরা অঞ্চলে তার কোনও জুড়ি নেই। দু'-একজন লোকেনের কাছে এই পেশায় আগ্রহ দেখালেও, শাগরেদ হতে চাইলেও, শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। তবে দয়াল সান্যালের প্রস্তাবে রাজি না হলে চাকরি হয়ে যাওয়ার ক্ষীণ আশাটা মিলিয়ে যাওয়ার আগে লোকেন সাতপাঁচ চিন্তা না করে মাথাটা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলল।

গুড। ভেরি গুড। তুমি এক কাজ করো। এখন যাও। কালকে এরকম সময়ে একবার এসো। আমি একটু ভেবে রাখি।

দয়াল সান্যালের ঘরের থেকে আবার বাইরে এসে সরোজ বক্সীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল লোকেন। অফিসে ঢোকার প্রধান ফটকের ঠিক কোণে একটা সুদৃশ্য টেবিল। সেখানে একজন সুবেশা মহিলা বসে আছে। লোকেন মন দিয়ে দেখল সিনেমার নায়িকার মতো দেখতে পুতুল পুতুল সেই মেয়েটার দুটো কাজ। এক নম্বর, ফটক দিয়ে কেউ ঢুকলেই তাকে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা। আর দু'নম্বর কাজ হল টেলিফোন এলে টেলিফোন ধরা।

মেয়েটাকে যত দেখছিল, তত মুগ্ধ হচ্ছিল লোকেন। ইচ্ছে করছিল মেয়েটার কাছে

যেতে, কিন্তু কাছে যাওয়ার কোনও ছুতো পাচ্ছিল না। হঠাৎ করে মেয়েটার টেবিলের ওপর কালো যন্ত্রটা দেখে মনে পড়ে গেল কথাটা।

মনে পড়ে যাওয়া কথাটা মনের মধ্যে চেপে রেখে সরোজ বক্সীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকল লোকেন। খানিকক্ষণ পরে সরোজ বক্সী ফিরে এলে লোকেন মনের কথাটা প্রকাশ করে ফেলল।

স্যার... উখানে যদি এইকটু বইলে দেন, মইনার ননদকে একবারটি ফোনটা করে দেয়।

সরোজ বক্সী ঠিক এই কাজটাই নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন দয়াল সান্যালের ঘর থেকে। ময়নার ননদকে ফোন করে কথা বলতে বলেছেন দয়াল সান্যাল। এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন ওঁর টেবিল থেকেই ফোনটা করতে।

৫০

কর্নেল সামন্ত হুইস্কির সঙ্গে জল মেশাতে মেশাতে লক্ষ করলেন, বাবলি যেন আজ একটু বেশিই খুশি খুশি। গুনগুন করে গান করছে। অন্য দিন গলা যতটা চেপে গুনগুন করে আজ তার চেয়ে গলাটা বেশি ছাড়া। বাবলি যে গুনগুন করছিল, সেটা কর্নেল শুনে ভেবেছিলেন কোনও হিন্দি গান। পরে বুঝলেন বাবলি ইংরেজি গান গাইছে। কর্নেল আশ্চর্য হলেও, তা কিন্তু প্রকাশ করলেন না। সোফার হাতলে তালে তালে আঙুল নাচাতে নাচাতে শেষ পর্যন্ত গানটা মন দিয়ে শুনলেন। মনে হল মেয়েটার সত্যিই একটা ভগবানদত্ত প্রতিভা আছে। গানের অ আ ক খ কর্নেল না বুঝলেও, গানটার মধ্যে সুরের ওঠানামা, ছোট ছোট কাজ, গায়কি— কোনওটাই কর্নেলের কান এড়াল না। গানটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে কর্নেল সামন্ত বললেন, তুমি ইংরেজি গান কোথায় শিখলে বাবলি?

শিপ্রাদিদির কাছে। সেই শিপ্রাদিদি যখন মাসির বাড়িতে ক'দিন থাকতে এসেছিল তখন।

তোমার সুর তাল খুব ভাল বাবলি। শুধু ইংরেজি উচ্চারণটা আরও অনেক ভাল করতে হবে।

কর্নেল নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন। বাবলিকে এর পর দ্বিতীয় গানটা গাওয়ার আর কোনও অনুরোধ করলেন না। বাবলিও তাই চুপ করে থাকল। কর্নেল সামন্তর শিপ্রার কাছে শোনা কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল। শিপ্রা চেয়েছিল বাবলি স্থানীয় স্কুলে ভরতি হয়ে আবার পড়াশুনো শুরু করুক। শিপ্রা বুঝতে পেরেছিল বাবলির আর কোনওদিনও স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরা হবে না। বাবলির অন্যমনস্কতা ভাঙিয়ে কর্নেল বললেন, তুমি আবার স্কুলে ভরতি হয়ে যাও বাবলি।

বাবলি ভুরু কপালে তুলে বলল, স্কুলে? এত বছর পরে? এখন তো আমাকে তা হলে ছোট ছোট মেয়েদের সঙ্গে নিচু ক্লাসে বসতে হবে। তা আমি পারব না।

তুমি বুঝতে পারছ না বাবলি, বড় গায়িকা হতে গেলেও আজকাল পড়াশুনো করাটা খুব দরকারি। এই যে তুমি ইংরেজি গান গাইছ—এই ইংরেজি কথাগুলোর, প্রতিটা শব্দের, প্রতিটা সেনটেন্সের মানে তুমি যদি বুঝতে না পারো, ভেতর থেকে আবেগটা আনবে কী করে? তোমার এই উচ্চারণের শুদ্ধতা পড়াশুনো না করলে, ইংরেজি না শিখলে ঠিক করবে কী করে?

বাবলি একটু চুপ করে থেকে বলল, জানেন জেঠু, আমার বাংলা উচ্চারণ শুনে অনেকে বলে, এরকম চাটগাঁইয়া উচ্চারণ নিয়ে এদেশে তুই সিনেমার সিঙ্গার হবি? দুর দুর করে তাড়িয়ে দেবে তোকে মিউজিক ডিরেক্টররা। আমি খুব চেষ্টা করি জেঠু। রেডিয়োতে সন্ধ্যা, আরতির উচ্চারণ শুনে শুনে ঠিক উচ্চারণ শেখার খুব চেষ্টা করি। দেখবেন এভাবেই ইংরেজিটাও ঠিক শিখে নেব। হিন্দিটাও শিখে নেব।

তোমার কথা মাঝে মাঝে ভাবি বাবলি। ভাবনা হয়, চিন্তা হয়। তোমার লক্ষ্যে তুমি কীভাবে পৌঁছোবে জানি না। কিন্তু তোমার বাবা-মা যদি কালকে এসে জিজ্ঞেস করেন, কোন অধিকারে আমি তোমার একটা একটা করে দিন নষ্ট করছি—তার কী উত্তর হবে তাও আমার জানা নেই।

বাবলি সভয়ে বলে উঠল, বাবা-মা এসেছে নাকি জেঠু?

না আসেননি। তবে নিশ্চয়ই আসবেন। তুমি যখন চিঠি লিখে জানিয়েছ যে, তুমি এখানে আছ, ওঁরা হয়তো একটু নিশ্চিন্ত আছেন। তুমি এভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে আসার জন্য যে-অভিমান ওঁদের হয়েছে, তা কেটে গেলেই আসবেন।

বাবলির চোখ ছলছল করে উঠল। একটা আকুতি নিয়ে বলে উঠল, আপনি আমাকে আর একটা মাস থাকতে দিন। আমি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে নেব।

তুমি থাকো বাবলি, কিন্তু তোমার বাড়ির সঙ্গে চিঠিতে অন্তত যোগাযোগ বাখো। সেই প্রথম চিঠিটার পরে আর কোনও চিঠি দিয়েছ বাবাকে বা মাকে?

বাবলি মাথা নাড়ল। কর্নেল সামন্ত জানেন বাবলি চিঠিটার কোনও উত্তর পায়নি। তবু বাবলিকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, খুব অন্যায় করেছ বাবলি। ওঁবা যদি আগের চিঠিটা না পেয়ে থাকেন? তুমি তোমার বাবাকে আর একটা চিঠি দিয়ে জানাও তুমি এখানে আছ। জানতে চাও ওঁরা কেমন আছেন।

কর্নেল সামন্ত অল্প নেশাধবা জেদে একরকম জোর করেই বাবলিকে দিয়ে আবার একটা চিঠি লেখালেন। চিঠিটা লেখা শেষ করে বাবলি ফোঁপাতে থাকল। বাকি হুইস্কিটা শেষ করে বাবলির মাথায় হাত রেখে বললেন, বোকা মেয়েরা কাঁদে। চলো তোমাকে যুদ্ধের গল্পটা বলি।

দ্বিতীয় যে-চিঠিটা বাবলি বাবাকে লিখেছিল, এক সপ্তাহের মধ্যেই অবশ্য তার উত্তর চলে এল। একদিন দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর কর্নেল সামন্ত অভ্যাসমতো লেটার বক্সটায় কোনও চিঠি এসেছে কিনা দেখতে গিয়ে পেয়ে গেলেন একটা হলুদ পোস্টকার্ড। কর্নেলের বড় একটা চিঠি আসে না। দুই ছেলের কারওই চিঠি লেখার হাত নেই।

চার মাসে ছ'মাসে একবার-আধবার ট্রাঙ্ককলে কথা হয় মিনিট পাঁচেক। তাই আগ্রহ নিয়ে লেটারবক্স খুলে পোস্টকার্ডটা বার করে প্রথমেই প্রেরকের নামটা দেখে নিলেন, ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্তী।

নামটা অচেনা। তবে পোস্টকার্ডটা দু'লাইন পড়েই বুঝে গেলেন, ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্তী হচ্ছেন বাবলির বাবা। ষষ্ঠীচরণবাবু বাবলিকে কোনও উত্তর না দিয়ে কর্নেল সামন্তকে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় তাঁর মনের কথা বলেছেন। চিঠির হাতের লেখা আর ভাষা পড়ে বোঝা যায় ভদ্রলোক শিক্ষিত। কিন্তু আরও কয়েক লাইন এগোলে বোঝা যায়, সেই শিক্ষা নেহাত পুঁথিগত। আসল শিক্ষার মানটা সেই মধ্যযুগেই পড়ে আছে, যেখানে অনূঢ়া কন্যাকে জীবনের সবচেয়ে বড় বোঝা মনে হয়। কন্যা এখনও পাত্রস্থ হয়নি—এটা তাঁর মনে মস্ত বোঝা অথচ সেই কন্যাই যে দূরে এক অচেনা প্রৌঢ়ের আশ্রয় নিয়ে আছে, সে ব্যাপারে কোনও তাপ-উত্তাপ, উদ্বেগ নেই। চিঠিতে উনি লিখেছেন বাবলিকে যেন কর্নেল সামন্ত বুঝিয়ে, সুবুদ্ধির উদয় করিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। বাবলির বিয়ের পাকা কথা হয়ে আছে। পাত্রপক্ষকে বলা আছে, বাবলি এখন মামাবাড়িতে আছে। বাবলি ফিরে এলেই বিয়ের তারিখ পাকা করা হবে।

কর্নেল সামন্ত চিঠিটা পড়ে বিচলিত হলেন। আবেগে এক মহাদায়িত্ব নিয়ে ফেলেছেন। বাবলি যে-স্বপ্ন নিয়ে ব্যারাকপুরে এসে পড়ে রয়েছে—সেই সিনেমার গায়িকা হওয়ার রাস্তায় এক ইঞ্চিও এগোতে পারেনি, অথচ এখানে তার কুমারী জীবনের বয়স একটা একটা করে দিন বাড়িয়ে চলেছে। চিঠিটার ব্যাপারে কর্নেল বাবলিকে কিছু বললেন না। চিন্তা করতে থাকলেন কীভাবে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান করা যায়।

কর্নেল সামন্ত অবশ্য জানতেন না চিঠিটা বাবলি আগে পড়ে লেটার বক্সেই আবার রেখে দিয়েছে। কর্নেল সামন্ত ভেবেছিলেন দু'-একদিনের মধ্যেই বাবলিকে বোঝাতে বসবেন। কিন্তু সেই নিয়ে বসাটা আর হল না। কাটতে থাকল একটা একটা করে দিন।

পনেরোই আগস্ট একটা সিনেমা রিলিজ করল, শোলে। কে নেই সিনেমাটাতে? ধর্মেন্দ্র, হেমামালিনী, জয়া ভাদুড়ি, অমিতাভ বচ্চন, সঞ্জীবকুমার... একটার পর একটা বড় বড় হিরো হিরোইন। ধর্মেন্দ্র-হেমামালিনীর সিনেমা বলে ওপেনিং ডে ওপেনিং শো-তেই দুটো টিকিট কেটেছিল তপাই। নিজের আর বাবলির। তপাইয়ের এককালের বন্ধু ছোট দিলীপ এখন ওয়াগন ভাঙার লাইন ছেড়ে টিকিট ব্ল্যাকের ধান্দায় জুড়েছে। একটা সময়ে ছোট দিলীপের সঙ্গে ভালই দহরম মহরম ছিল তপাইয়ের। তাই ছোট দিলীপকে ধরে করে দুটো স্পেশাল সিট জোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি তপাইয়ের। বন্ধুত্বের খাতিরে ছোট দিলীপ চার কা বিশের টিকিট দশে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাদ সাধল বাবলি। সেদিনই খবর এল বাংলাদেশে শেখ মুজিবর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে পরিবারের অনেকের সঙ্গে নিহত হয়েছেন। খবরটা শোনার পর এত মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বাবলির, সিনেমাটাই আর দেখতে গেল না। তপাই একলাই দেখল সিনেমাটা। দেখার পর থেকেই ভেতরটায় এক উথালপাথাল শুরু হয়ে গেল

তপাইয়ের মধ্যে। সেই যে সিনটা... ধর্মেন্দ্র হেমামালিনীকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে গুলি চালানো শেখাচ্ছে... বাবলির কাঁধে মাথা রেখে সেই সিনটা আর একবার না দেখা পর্যন্ত ভেতরে কোনও শান্তি পাচ্ছে না তপাই। পরের সপ্তাহেই মাত্র পাঁচ টাকা এক্সট্রা দিয়ে আবার ছোট দিলীপের কাছ থেকে ম্যাটিনির দুটো টিকিট কেটে ফেলল। এবারও স্পেশাল সিট।

শোলের টাঙ্গাওয়ালি হেমামালিনীর নাম বাসন্তী। বাসন্তীর উচ্ছলতার সঙ্গে বাবলির একটা মিল খুঁজে পায় তপাই। অন্ধকার সিনেমাহলে বাবলির শরীরের নরম জায়গাগুলো ছুঁয়ে বাসন্তীকে ছুঁয়ে দেখার সুখানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করছিল তপাই। বাবলির সঙ্গে প্রেমটা ক্রমশ দুরন্ত হয়ে উঠেছে। যে-মেয়েটাকে প্রথম যেদিন একটু জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করেছিল—মেয়েটা সেদিন শুধু ছিটকে পালিয়েই যায়নি, ভয়ও পাইয়ে দিয়েছিল। আর এখন, গঙ্গার ধারে ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালে—ঠোঁটটা সরিয়েই নিতে চায় না। সেই বাবলিই শোলের মতো জমজমাট সিনেমা দেখতে এসে এত কাঠ হয়ে বসে আছে কেন—মাথায় ঢুকছে না তপাইয়ের।

স্পেশাল সিটটা একদম পিছনের সারিতে দেওয়াল ঘেঁষে। যেহেতু পিছনে আর কেউ নেই তাই অন্ধকারে স্বাধীনতা একটু বেশি। বাবলি দেওয়ালের দিকে সিটটাতে বসেছে। তপাইয়ের বাঁপাশে একজন ক্যাবলাকান্ত ভালমানুষ বসে আছে। লোকটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না আনলেও চলবে। সিনেমাটা তিন ঘণ্টারও বেশি লম্বা। এরকম সিট, পাশে এরকম একটা নির্লিপ্ত লোক, হেমামালিনীর সমস্ত যৌবন ওথলানো উচ্ছলতা, সব কিছু একসঙ্গে অনেক কপাল না করলে পাওয়া যায় না। তার মধ্যে বাবলির এরকম কাঠ হয়ে থাকাটা যেন একটা চোনা।

তপাই বাবলির কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলল, কী হল বাবলি, শরীর খারাপ নাকি?

বাবলি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। তপাই বাবলির কানে আলতো করে একটা চুমু খেয়ে বলল, তা হলে?

কাল বাবা একটা চিঠি দিয়েছে জেঠুকে।

কী লিখেছে?

বাবলি কোনও উত্তর দিল না। সিনেমাটা দেখতে থাকল। তবে তপাইয়ের মনে হল বাবলি কেমন যেন অন্যমনস্ক। পরদা জুড়ে একটা নীল আলো। অমিতাভ বচ্চন মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে। জয়া ভাদুড়ি একটা একটা করে হারিকেন জ্বালাচ্ছে। আহা কী সিন। তপাইয়ের কল্পনায় মিশে যেতে ইচ্ছে করছে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে। এমন সময় খপ করে বাঁ হাতটা ধরল বাবলি। তপাই মুখটা ঘোরাতেই বাবলি ফিসফিস করে বলল, আমাকে বিয়ে করবে তপাইদা?

গলাটা ফিসফিসে হলেও, প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট। তবু যেন কানে কথাটা ঢুকল না তপাইয়ের। বাবলির সঙ্গে প্রেমটা চুমু আর ওই একটু-আধটু শরীর ছোঁয়াছুঁয়ি পর্যন্ত এগিয়েছে। কোনওদিন যদি সুযোগ পাওয়া যায়..: পঁচিশ পয়সায় তিনটে কন্ডোম

পর্যন্ত কিনে রেখেছে তপাই। কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গ কখনওই ওঠেনি। আর উঠবেই বা কী করে? এটা তো একটা ঘোর অবাস্তব চিন্তা। তপাইয়ের এক পয়সা উপার্জন নেই। ক্লাস ফাইভের একটা টিউশনি পর্যন্ত জোটেনি। নেহাত বাপ-মায়ের একমাত্র ছেলে আর বাপের চাকরিটা আছে তাই ব্ল্যাকে টিকিট কেটে প্রেমিকাকে সিনেমা দেখাতে পারছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সিনেমাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাবলি আর একটা কথাও বলল না। এমনকী হাফ টাইমেও নয়।

কর্নেল সামন্ত এমনিতে মুক্তমনের মানুষ। তবু বাবলি কখনও সাহস করে কর্নেল সামন্তকে তপাইয়ের কথা বলতে পারেনি। কর্নেল জানেন বাবলির এক বান্ধবী আছে। বাবলি তার সঙ্গে ঘোরে, সিনেমায় যায়। কর্নেলের এই ভুলটা যাতে ভেঙে না যায়, তাই বাবলিকে কর্নেলের বাড়ির বেশ কিছুটা দূরে বিদায় জানায় তপাই। আজ বিদায় জানাবার সময় জিজ্ঞেস করল, তুমি বিয়ের কথা বললে কেন?

বাবলি বলল, তুমি যদি আমাকে বিয়ে না করো, বাবা-মা যেখানে আমার বিয়ের ঠিক করেছে সেখানেই বিয়ে দিয়ে দেবে। ওখানে বিয়ে করার আগে আমি আত্মহত্যা করব।

তপাই একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

একটা... শুধু একটা চাকরি যদি আমি জোগাড় করতে পারতাম... ঠিক তোমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলতাম। প্রত্যেকবার ভাবি... নাহ্...

বাবলি নরম করে তপাইয়ের হাতের ওপর হাত রেখে বলল, ঠিক হয়ে যাবে, তপাইদা। দেখো ভগবান আছে। না হলে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়?

তপাই আকাশের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎই একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে মুখে একটা উৎসাহ ফিরিয়ে এনে বলল, এই বাবলি, তোমার একটা খুব বড়লোক পুতুল পুতুল দেখতে দিদি আছে না?

বাবলি অবাক হয়ে বলল, বড়লোক দিদি?

তপাই অধৈর্য হল, আঃ মনে নেই, ওই যে বুড়ির বাড়িতে এসেছিল। গঙ্গার ওপারে মস্ত কারখানা আছে...

আমার দিদি মানে, মাসির বোনঝির কথা বলছ? শিপ্রাদিদি। বড় ভালমানুষ দিদি।

তপাই কথা লুফে নিল, তাই তো বলছি। ভালমানুষ যখন, দিদিকে একবার বলো না ওদের কারখানায় একটা চাকরি দিতে।

বাবলিকে চুপ করে থাকতে দেখে তপাই আবার বলে উঠল, কী হল? কিছু বলছ না যে!

বাবলি আস্তে আস্তে মাথা দোলাল, দিদিকে... দিদিকে কোথায় পাব?

কেন তোমার কাছে ঠিকানা নেই?

বাবলির কাছে শিপ্রার ঠিকানা আছে। কিন্তু বাবলি জানে এটা একবার তপাইয়ের কাছে বললে তপাই নাছোড়বান্দা হবে। দিদির কাছে হয়তো নিয়ে গিয়েই ছাড়বে। অথচ তপাইয়ের চাকরির কথা বলে দিদির কাছে কিছুতেই ছোট হতে পারবে না। বাবলি ঘাড় নাড়িয়ে না বলল।

গঙ্গার পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ছে। নিস্তেজ সূর্যটা ঢাকা পড়ে রয়েছে এক অদ্ভুত দর্শন মেঘের পিছনে। গরমের বিকেলটা অলস। রবিবার। বীথি এখন একটা ছোট তিন চাকার সাইকেল চালাতে পারে। রবিবার বাবাকে পেয়ে বায়না ধরেছিল ছাদে নিয়ে যেতে হবে, সাইকেল চালাবে। খুব অল্প রবিবারই বিকেলবেলায় সরোজ বক্সী এভাবে নিজের জন্য ছুটি পান। রবিবার সকালে দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীকে রেহাই দিলেও, বিকেলের দিকে নানা অছিলায় প্রায় রবিবারই বাড়িতে ডেকে পাঠান। স্বভাবমতোই সরোজ বক্সীও কোনওদিন না বলতে পারেন না।

বীথি গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে বিশাল ছাদটায় সাইকেল চালাচ্ছে। সরোজ বক্সী মুগ্ধ হয়ে বীথির সাইকেল চালানো দেখছিলেন। প্যাডেলে চাপ দিতে এখনও স্বচ্ছন্দ নয়। তবু দিব্যি সাইকেলটা চালাচ্ছে। সরোজ বক্সী অবাক হয়ে নতুন করে আবিষ্কার করতে থাকলেন নিজের বেড়ে ওঠা মেয়েকে। তার মধ্যেই আশ্চর্য এক অনুভূতি হল সূর্যকে আড়াল করা মেঘটা দেখে।

সরোজ বক্সী হাতছানি দিয়ে বীথিকে কাছে ডেকে কোলে তুলে নিয়ে মেঘের টুকরোটা দেখিয়ে বললেন, ওটা কী বল তো?

বীথির একটু সময় লাগল বাবা কী দেখাচ্ছে বুঝতে। তারপর আদুরে গলায় বলল, মেঘ!

সরোজ বক্সীও যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠলেন। বীথির মতো গলা করে বলে উঠলেন, ওটা কীসের মতো দেখতে লাগছে?

কীসের মতো?

তুই বল কীসের মতো?

তুমি বলো।

না, তুই বল।

বীথি সরোজ বক্সীর গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, তুমি বলো না বাবা?

ওটা হচ্ছে বাঘের মতো।

বীথি চোখ বড় বড় করে বলল, ওখানে বাঘ আছে বাবা? চিড়িয়াখানার মতো?

দুর বোকা, বাঘেরা থাকবে কেন? কিন্তু দেখ ওটা একদম বাঘের মতো দেখতে। ওই দেখ কান... ওই দেখ ল্যাজ...

সরোজ বক্সী একে একে নিজের কল্পনাপ্রসূত ছবিটা মেঘের মধ্যে খুঁজে নিয়ে বীথিকে বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেলেন যামিনী ভট্টাচার্যের পরিচিত গলাটা।

ভারত সরকার জরুরি অবস্থা চালু করেছে কেন জানো?

ওই তো রাজনারায়ণ এলাহাবাদ হাইকোর্টে...

না সরোজ, সবাই যাতে ভাল থাকে তাই জন্য জরুরি অবস্থা। দেখছ না দেশের

লোক কী ফার্স্ট ক্লাস আছে। ট্রেন টাইমে চলছে, কালোবাজারি নেই, চালে কাঁকর নেই, খবরের কাগজে খারাপ খবর নেই... আমরা সকলে খুব ভাল আছি।

সরোজ বক্সী খুব অবাক হলেন। গীতা আর শ্রীকৃষ্ণের বাইরে মানুষটার যে কোনও রাজনৈতিক বোধ আছে, এতদিনের পরিচয়ে একবারও মনে হয়নি। বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল কথাটা, কী হয়েছে যামিনীদা?

যামিনী ভট্টাচার্য একটু চুপ করে থেকে বললেন, শীতলপুরুতের কী হয়েছে জানো?

শীতলপুরুত গঙ্গার ঘাটে ছোট কালীমন্দিরে পুজো করেন। সরোজ বক্সী ভদ্রলোককে খুব একটা ভাল করে চেনেন না। তবে লক্ষ করেছেন মানুষটা খুব প্রাণবন্ত। নিত্যপুজোতেও তার প্রভাব পড়ে। উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। সরোজ বক্সী কোনও খারাপ খবর শোনার আশঙ্কায় ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে শীতলপুরুতের?

ওরা শাসিয়ে গেছে, সরকারের বিরুদ্ধে বেশি সমালোচনা করলে ধরে নিয়ে যাবে।

কেন, উনি কি সমালোচনা করেন নাকি?

যামিনী ভট্টাচার্য চটে উঠলেন, মানুষ কথা বলবে না? মানুষের সমালোচনা করার অধিকার থাকবে না? তুমি জানো এতে কী হয়েছে? শীতলপুরুত এত ভয় পেয়ে গেছে যে, পুজোটাও ঠিকমতো করতে পারে না। সবসময় কীরকম ভয়ে মরে আছে। এভাবে থাকাটাকে যদি ভাল থাকা বলো, সরকার বাহাদুর আমাদের খুব ভাল রেখেছে সরোজ।

সরোজ বক্সী এতক্ষণে বুঝতে পারলেন যামিনী ভট্টাচার্যর উত্তেজনার কারণ। সূর্যটা ডুবে গেছে। অন্ধকার নেমে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরে কালীমন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে। সরোজ বক্সীর হঠাৎ করে ইচ্ছে হল, আজ গিয়ে দেখবেন শীতলপুরুত কীরকম পালটে গেছে। বীথিকে সাইকেল থেকে নামতে বলে সাইকেলটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, চলুন যামিনীদা, আমার ঘরে একটু চা খেয়ে নেবেন চলুন। তারপর আরতি দেখে গঙ্গার ধারে একটু বসব। আপনার সঙ্গে বসে গল্প করলে একটা প্রাণবায়ু পাই।

অতসীর হাতে দু'জন চা খেয়ে বাইরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখলেন। আজ যেন সরোজ বক্সী হালকা মনে ভক্তিভরে সন্ধ্যারতি দেখার চেয়ে বেশি মন দিলেন শীতলপুরুতের পরিবর্তনটা দেখতেই। কিন্তু সেরকম কিছুই সরোজ বক্সীর চোখে ধরা পড়ল না। মনে মনে ভাবলেন এ যামিনী ভট্টাচার্যর মনের ভুল। তবে সন্ধ্যারতির পরে গঙ্গার ধারে বসে যামিনী ভট্টাচার্যর কাছে অনেকক্ষণ ধরে গীতার বাণী শুনলেন। সব গ্লানি ধুয়ে বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু।

অতসীর সঙ্গে বাড়িতে সরোজ বক্সীর খুবই কম কথাবার্তা হয়। আসলে দু'জনই স্বভাবে চুপচাপ, বয়সের সঙ্গে যেন আরও চুপচাপ হয়ে গেছেন দু'জনই। তবু অতসীর কিছু চাপা অভিমান আছে। আজ যে-বিরল সন্ধেবেলাটা কপালগুণে বাড়িতে থাকতে পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, সেই সন্ধে থেকে রাত গড়িয়ে যামিনী ভট্টাচার্যর সঙ্গে কাটিয়ে এসেছেন স্বামী। বীথি আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আলোটা নিভিয়ে চিত হয়ে

শুয়ে অতসী জানতে চাইল, যামিনীবাবুর সঙ্গে কী এত গল্প করো গো? বীথি তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল।

সরোজ বক্সীও অন্যমনস্ক হয়ে চিত হয়ে শুয়ে ছিলেন। মাথার মধ্যে ঘুরছিল প্রাণবায়ুর কথাটা, আবছা অন্ধকারে কড়িবরগাগুলো দেখতে দেখতে মনে হল প্রাণবায়ু তো পাশের সঙ্গিনীকেই দেওয়া যায়। কড়িবরগাগুলো দেখতে দেখতেই শুরু করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন মানুষ মৃত্যুর সময় যা স্মরণ করে প্রাণত্যাগ করে, পরজন্মে সেই চিন্তানুসারেই জন্মগ্রহণ করে। মানুষ যদি মৃত্যুকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে পরের জন্মে তা হলে ভগবানকে লাভ করে... তাই...

সরোজ বক্সী হঠাৎ অনুভব করলেন অতসী সোজা হয়ে উঠে বসল। পাশ ফিরে সিল্যুটে দেখলেন অতসী দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজেছে। সরোজ বক্সী উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল তোমার?

অতসী কিছু বলল না। সরোজ বক্সী শুধু দেখলেন একটু পরে অতসী ফোঁপাতে আরম্ভ করল। এবার সরোজ বক্সীও উঠে বসলেন। দু'জনের মধ্যে বীথি। তাই খাট থেকে নেমে ঘুরে গিয়ে আলতো করে অতসীর পিঠে হাত রেখে বললেন, কী হয়েছে?

অতসী স্বামীর বুকে মাথা রেখে ডুকরে উঠল, তুমি জানো তাই না?

কী জানি?

আমি আর বেশিদিন বাঁচব না...

মানে? চমকে উঠলেন সরোজ বক্সী।

নীতিন ডাক্তার বলেছে আমার পেটের টিউমারটা ক্যান্সার হয়ে যাবে...

সরোজ বক্সীর হঠাৎ করে গলাটা খুব শুকনো মনে হল।

নীতিন ডাক্তার এসব বলেছে... কই আমাকে বলেনি তো কখনও... এভাবে বলা যায় নাকি!

বলতে বলতেই সরোজ বক্সী একটা আত্মগ্লানিতে ভুগতে আরম্ভ করলেন। কয়েক বছর আগে পিজিতে একবার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন অতসীকে। কয়েকটা পরীক্ষা ডাক্তার করতে বলেছিল। সেগুলো করিয়েছিলেন, তারপর ওষুধপত্তর কিছু দিয়েছিল। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা মাথা থেকে বেরিয়েই গিয়েছিল। ডাক্তার দেখানো, ওষুধ খাওয়া যা করার অতসী নিজেই করে। কোনও খোঁজও সরোজ বক্সী নেননি কিছু। অতসীকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে, আশার বাণী শুনিয়েও সারা রাত ঘুম হল না।

নীতিন ডাক্তারের চেম্বার খোলে সকালে সাড়ে সাতটায়। ভিজিট চেম্বারে আট টাকা। বাড়ি গেলে ষোলো। এ অঞ্চলের ডাক্তারদের মধ্যে নীতিন ডাক্তারের ভিজিট কম বলে ভিড়টাও বেশি। রোগী পিছু বেশিক্ষণ সময় দিতে পারেন না। এই অবস্থায় রোগী ছাড়া পরামর্শ করার জন্য হয়তো কোনও সময়ই দেবেন না। সরোজ বক্সী তাই প্রথম সুযোগেই পুরো আট টাকা নীতিন ডাক্তারকে দিয়ে সময়টা কিনে নিতে চাইলেন।

নীতিন ডাক্তারের হাতির স্মৃতিশক্তি। এই স্মৃতিশক্তিটা ওঁর ডাক্তারি ব্যবসায়ে একটা বড় মূলধন। অতসীর নাম বলতেই মুখ ঝামরে উঠলেন।

আপনি তো মশাই আসেনই না। সব কথা কি আর খোলাখুলি পেশেন্টকে বলা যায়? তবে কাউকে না পেয়ে আমি বলতে বাধ্য হলাম। যে-গতিতে টিউমারটা বাড়ছে তাতে ক্যান্সার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। ইমিডিয়েটলি বায়োপসি করতে হবে। পিরিয়ড ইরেগুলার হয়ে গেছে।

আর অপারেশন?

অপারেশন তো আর আমি করব না। ভাল একজন সার্জেনের কথা লিখে দিচ্ছি। নিয়ে গিয়ে ইমিডিয়েটলি দেখান।

সরোজ বক্সী মিইয়ে যাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন হাসপাতালে থাকতে হবে ডাক্তারবাবু?

সেটা সার্জেনই বলতে পারবেন। তবে বড় অপারেশন। তারপরে অন্তত তিন-চার মাস বাড়িতে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

সরোজ বক্সী একটা গভীব চিন্তা নিয়ে নীতিন ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। অতসীর অপারেশনের ব্যবস্থা এখনই কবতে হবে। তারপরে অনেক বাধানিষেধ থাকবে। বাড়িতে বীথির মতো একটা ছোট মেয়ে। ওই দিকে ডুমুরঝরায় ষাট বিঘে মতো জমিতে তুলোব বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। দয়াল সান্যাল আদেশ দিয়ে রেখেছেন আর সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে অর্থাৎ আগস্ট মাসের শেষের দিকে লোকেনকে নিয়ে সরোজ বক্সীকে ডুমুরঝরায় চলে যেতে হবে এবং টানা থাকতে হবে একেবারে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো তুলোর সিজন পর্যন্ত। ব্যাপারটা অতসীকেও বলে হওয়া ওঠেনি। ভাগ্যিস!

সরোজ বক্সী খুব অসহায় বোধ করতে শুরু করলেন। ডুমুরঝরায় না গেলে দয়াল সান্যালের হয়তো এক মুহূর্ত সময় লাগবে না এতদিনের বিশ্বস্ত সহচরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিতে। অন্য দিকে অতসী... ক্যান্সার...

দু'হাত মুঠো করে মাথার চুলগুলো টানতে টানতে সরোজ বক্সীর একজনেরই নাম মনে পড়ল। শিপ্রা সান্যাল।

ইচ্ছে করে রাস্তায় খানিকটা সময় নষ্ট করলেন সরোজ বক্সী। যাতে করে তিনি সান্যালবাড়িতে যতক্ষণে পৌঁছোন, দয়াল সান্যাল অফিসে রওনা হয়ে যান। এবং সেইমতো শেষ পর্যন্ত যখন সান্যালবাড়িতে বিশাল বসার ঘরের সোফাটায় এসে বসলেন, দয়াল সান্যাল সত্যিই ততক্ষণে রওনা হয়ে গেছেন অফিসে।

সান্যালবাড়ির বসার ঘরে একটা নতুন জিনিস শোভা পাচ্ছে। টেলিভিশন। সাতই আগস্ট থেকে দূরদর্শন নাম দিয়ে সম্প্রচার শুরু হয়েছে। সন্ধের দিকে কয়েক ঘণ্টা চলে। সরোজ বক্সীর দু'দিন সুযোগ হয়েছে সন্ধেবেলায় কিছুক্ষণের জন্য বাক্সটার ঘোলাটে কাচের পরদায় জ্যান্ত মানুষের নড়াচড়ার ছবি দেখার। প্রথম সম্প্রচারের কয়েকদিন আগেই দয়াল সান্যাল কিনে নিয়ে এসেছিলেন আজব এই যন্ত্রটা। ছাদে একটা বিচিত্র দেখতে অ্যান্টেনা বসানো হয়েছে। সরোজ বক্সী প্রথম যেদিন চালু অবস্থায় দেখেছিলেন যন্ত্রটা সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের কী জয়! ঘরের মধ্যে বায়োস্কোপ।

বাড়ি গিয়ে অতসীকে গল্প করেছিলেন। অতসী খবরের কাগজে পড়েছিল। দেখার আগ্রহ ওরও। যন্ত্রটা দেখতে দেখতে আবার অতসীর কথা মনে পড়ে মনখারাপ হতে থাকল সরোজ বক্সীর। মনের মধ্যে একটা অশুভ চিন্তা। অতসীকে দেখাতে পারবেন তো যন্ত্রটা? মনে মনে ঠিক করতে থাকলেন, দয়াল সান্যালের অনুপস্থিতির আর একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন। সেদিন অতসী আর বীথিকে দেখিয়ে নিয়ে যাবেন যন্ত্রটা। ম্যাডাম তো ওদের জন্য অবারিত দ্বার করেই রেখেছেন।

বন্ধ টেলিভিশনটা দেখতে দেখতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এরকম কোনও চটকদারি জিনিস এসে বাজারে পড়তে না-পড়তেই কিনে ফেলেন দয়াল সান্যাল। অথচ শখের ওখানেই শুরু, ওখানেই শেষ। এই টেলিভিশনটা যেমন কেনার পর তা দেখার কিন্তু আলাদা করে আর কোনও আকর্ষণ নেই দয়াল সান্যালের। এমনকী শিপ্রা সান্যালেরও। ম্যাডাম দিনের অধিকাংশ সময়টাই রেডিয়োর মতো একটা যন্ত্র নিয়ে বসে থাকে।

বলুন সরোজবাবু!

শিপ্রার কথা শুনে চটক ভাঙল সরোজ বক্সীর। উঠে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে নমস্কার করলেন শিপ্রাকে। সরোজ বক্সীর চেহারাটা খুব শুকনো লাগল শিপ্রার।

বসুন।

সরোজ বক্সীকে বসতে বলে শিপ্রা উলটোদিকে সোফায় বসল। সরোজ বক্সী কখনও শিপ্রার কাছে সাহায্য চাননি। ইতস্তত করে বললেন, ম্যাডাম, খুব সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে এলাম।

শিপ্রা সরোজ বক্সীর শুকনো চেহারাটা দেখে চিন্তিত মুখে বলল, কী হয়েছে? বাড়ির সবাই ভাল আছে তো?

সরোজ বক্সী অতসীর কথা বললেন। শিপ্রা আগাগোড়া মন দিয়ে শুনল। সব বলার শেষে সরোজ বক্সী জড়সড় হয়ে অসহায়ের মতো বললেন, ম্যাডাম এখন সব ছেড়ে ডুমুরঝরায় চলে গেলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আর না গেলে আপনার চাকরি চলে যাবে, তাই তো?

সরোজ বক্সী কিছু বলতে পারলেন না। তবে মুখটা আরও করুণ হয়ে উঠল।

আপনার হরিহরের কথা মনে আছে সরোজবাবু? এ-বাড়িতে কাজ করত, হঠাৎ করে কয়েক বছর আগে ওর চাকরিটা চলে গিয়েছিল?

এবারও সরোজ বক্সী চুপ করে থাকলেন। হরিহরও অত্যন্ত অনুগত, মালিকঅন্ত প্রাণ, নিষ্ঠাবান ছিল। দয়াল সান্যাল কিছুতেই ওর নাম মনে করতে পারতেন না। এবং সেই মনে না পড়াটা ওঁকে অস্থির করে তুলত। এই অবোধ্য কারণেই ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হরিহরের হিসেবনিকেশ তো সরোজ বক্সীর নিজের হাতেই হয়েছিল। ঠিক একই রকমভাবে চাকরি গিয়েছিল ড্রাইভার বনোয়ারীলালের।

শিপ্রা উদাস গলায় বলল, ঠিক আপনার মতোই হরিহর একদিন আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু সেদিন আমি ওর জন্য কিচ্ছু করতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কী

কোনও চেষ্টাই করিনি। কারণ আমার মনে হয়েছিল আমি চেষ্টা করলে কোনও লাং
হবে না। হিতে বিপরীত হবে।

সরোজ বক্সীর মুখটা আরও শুকিয়ে যেতে থাকল। এর মানে কী? ম্যাডামের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় এটাই বোঝাচ্ছেন?

আমি বোকা ছিলাম সরোজবাবু। খুব বোকা। তবে এবার আর বোকামো করব না। আপনি নিশ্চিত থাকুন। অতসীর জন্য যা যা করা দরকার আপনি পুরো সময় দিয়ে করান।

সরোজ বক্সী ধীরে ধীরে একটা ভরসা পেলেন। মুখে দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মিলোতে থাকল। কোনওরকমে হাত কচলে বললেন, অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম। আপনি অশেষ...

শিপ্রা যেন শুনেও শুনল না। নিজের মতো বলতে থাকল, আমরা কত অনায়াসে, কত দ্রুত মানুষকে ভুলে যাই। আপনি আজকে আবার হরিহরকে মনে করিয়ে দিলেন। আপনি অফিস থেকে হরিহরের গ্রামের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাবেন তো! কেমন আছে একটা চিঠি লিখে খোঁজ নেব।

কালকেই দিয়ে যাব ম্যাডাম।

শিপ্রা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আর একটা ব্যাপারে আলোচনা করব ভাবছিলাম সরোজবাবু। তারপর একটু চুপ করে থেকে গলাটা পালটে শিপ্রা বলল, আপনাদের স্যারকে অফিসে এখন কেমন দেখছেন সরোজবাবু?

সরোজ বক্সী কিছু লুকোলেন না, যতটা পারেন পরিষ্কার করে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, দয়াল সান্যাল এখন অনেকটা ভাল আছেন। আসলে ডুমুরঝরাতে তুলো চাষটা নিয়ে বিভোর হয়ে আছেন। সেই হঠাৎ হঠাৎ রেগে গিয়ে তুলকালাম করাটা কমেছে...

শিপ্রা ম্লান হাসল।

আপনার অনুমান ভুল। নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন। ওর চরিত্রে এই পরিবর্তনগুলো সত্যিই এসে থাকলে আপনার কি আর আমার কাছে আজ আসার দরকার হত? হত না।

শিপ্রা থেমে থেমে বলতে থাকল, একদিন আপনার কাছে সব শুনে কার্শিয়াং থেকে আমি চলে এসেছিলাম বিট্টুকে বোর্ডিং-এ রেখে। সেই যে এলাম, অদ্ভুতভাবে আটকা পড়ে গেলাম। এতে কারও কিছু উপকার না হলেও আমার অন্তত একটা উপকার হয়েছে। আমার আগের বোকামোগুলো আমি বুঝতে পারলাম।

সরোজ বক্সী আবেগমথিত গলায় বললেন, না ম্যাডাম, আপনি কিছু ভুল করেননি। ভুল করেছি আমি, অন্যায় করেছি আমি। আপনার বিরুদ্ধে অনেক কাজে সায় দিয়েছি।

শিপ্রা দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, আপনি একটাই ভুল করেছেন সরোজবাবু। নিষ্ঠা দিয়ে মালিকের হুকুম তামিল করতে গিয়ে নিজের বিবেককে কখনও জিজ্ঞেস করেননি আপনি ঠিক করছেন, না ভুল।

শিপ্রা সরোজ বক্সীকে নিশ্চিন্ত থাকার যে-কথা দিয়েছিল তা শেষপর্যন্ত রাখতে পেরেছিল। সেটা সরোজ বক্সী বুঝতে পারলেন দিন দুয়েক পরে যেদিন দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীকে ডেকে চিন্তিত মুখে বললেন, ডুমুরঝরায় তোমার যাওয়ার দরকার নেই সরোজ। রামতনু যাবে। হরিতলার ট্রাস্টের ব্যাপারে কিছু ডেভলপমেন্ট হয়েছে। নতুন করে কিছু কাজকর্ম করতে হবে। তুমি এখানে থেকে ওদিকটা দেখো। কী করতে হবে পরে সব বুঝিয়ে বলে দেব তোমাকে। আরেকটা কাজ করো। দু'একরের দু'নম্বর দলিলটা শিপ্রার কাছে পৌঁছে দাও।

সরোজ বক্সী কিছু বুঝে উঠতে না পেরে হতভম্বের মুখ করলেন।

দয়াল সান্যাল বেঁকা হাসি হেসে বললেন, প্রশ্ন কোরো না সরোজ, এটা আমার সতেরো নম্বর চাল।

৫২

ডোরবেলের আওয়াজ শুনে দরজাটা খুলে কর্নেল সামন্ত চমকে উঠলেন। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বাবলি। বাবলির সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর।

একটু আগে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। সেপ্টেম্বর মাসে যখন তখন বৃষ্টিটা বর্ষাকালের মতোই হচ্ছে। সকাল থেকে আকাশ এত কালো করে ছিল যে, সকালটা বুঝতে পারেননি কর্নেল সামন্ত। বিছানা ছেড়ে উঠতে দেরিই হয়ে গিয়েছিল। সকালে চা-টা আজকাল বাবলিই করে দেয়। বাবলির জায়গায় শংকর যখন চা দিয়ে গেল কর্নেল বুঝতে পেরেছিলেন বাবলি বাড়িতে নেই। সেই থেকে চিন্তা একটা হচ্ছিল, এই ঘোর দুর্যোগের সকালে বাবলি কোথায় গেল! তবে মেয়েটার কাছেই এক বান্ধবী আছে, সেখানে যখন তখন দেখা করতে যায়, হয়তো ওর কাছে গিয়ে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে এই ভেবেই নিজেকে আশ্বস্ত করছিলেন তিনি। সেই বাবলিই যে বৃষ্টি থামতে একমাথা সিঁদুর নিয়ে সদর দরজায় হাজির হবে এটা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি।

লাল একটা তাঁতের শাড়িতে মাথায় সিঁদুর নিয়ে বাবলি দেখতে একদম পালটে গেছে। কালকে রাত্রি পর্যন্ত যে কিশোরী ছিল, আজ হঠাৎ করে সে যেন একজন পরিপূর্ণ যুবতী। নাকের ওপর ঝুরো ঝুরো সিঁদুর পড়েছে খানিকটা। সব মিলিয়ে দেখতে এতটাই পালটে গেছে যে, সুলতানও আদুরে হয়ে বাবলির পায়ের কাছে না গিয়ে থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বাবলির মধ্যেও একটা ইতস্তত ভাব। অপরাধীর মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে। মুহূর্তের মুগ্ধতাটা কাটিয়ে নিজে কঠিন হলেন কর্নেল সামন্ত। বাবলিকে উনি স্নেহের প্রবল টানে আশ্রয় দিয়েছেন। সেই বাবলিই জীবনের এত বড় সিদ্ধান্তটা নিল কিছু না বুঝতে দিয়ে। অভিমান গুমরে উঠল ভেতরে।

কর্নেল সামন্ত মুখে কিছু বললেন না। দরজাটা খোলা রেখেই পিঠ ঘোরালেন। দু'পা এগোনোর পরই পিছন থেকে শুনতে পেলেন বাবলির শুকনো গলা।

আমাকে ক্ষমা করবে না জেঠু?

কর্নেলের পা দুটো থেমে গেল। পিছন ঘুরে বাবলির দিকে না তাকিয়েই বললেন, ভেতরে এসো।

কর্নেল এবার সুলতানের তীব্র একটা ডাক শুনলেন। সুলতানের ভাষা কর্নেল বোঝেন। এই ডাকটার অর্থ সুলতান অপরিচিত কাউকে দেখেছে।

ভেতরে ফুটতে থাকা রাগ, অভিমান, অপমান সব এক জায়গায় হয়ে কর্নেল সামন্তর গলায় উঠে এল। অদ্ভুত একটা চিৎকারে ধমকে উঠলেন সুলতানকে।

সুলতান প্রভুর এই ডাকের সঙ্গে পরিচিত নয়। একেবারে চুপ করে গেল। কর্নেল সামন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে সুলতানকে দেখতে গিয়ে দেখতে পেলেন বাবলির পিছনে জড়সড় হয়ে রোগাটে খয়াটে চেহারার একটা ছেলে। বুঝতে একটুও অসুবিধে হল না একেই বাবলি বিয়ে করেছে। দিনের পর দিন বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছি বলে মিথ্যা কথা বলে এর সঙ্গেই মিশতে যেত বাবলি। ছেলেটাকে আগে কখনও দেখেছেন কি না তা নিয়ে মাথা ঘামালেন না। প্রথম দর্শনেই ছেলেটাকে বাবলির পাশে বেমানান মনে হল।

বাবলির ইশারায় ছেলেটা পায়ে পায়ে কর্নেল সামন্তর কাছে এগিয়ে এল। নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই কর্নেল এক পা পিছিয়ে গিয়ে হাতটা তুলে নিষেধ করলেন। ছেলেটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার বাবলি এগিয়ে এল। দু'হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে কর্নেলের দু'পায়ে দু'হাত ছুঁইয়ে ভিজে গলায় আর্তি জানাল, আমাকে তুমি আশীর্বাদ করবে না জেঠু?

কর্নেল সামন্তর চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। বাবলির মাথায় হাত রাখলেন চুপ করে। তারপর চোখটা খুলে নিজের তালুটা দেখে চমকে উঠলেন। তালুতে বাবলির মাথা থেকে খানিকটা সিঁদুর উঠে এসেছে। সিঁদুরটা কেমন যেন আনমনা করে দিল কর্নেলকে। নিচু গলায় বললেন, সুখী হও।

কর্নেলের কথা শুনে বাবলি কর্নেলের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল, আমায় ক্ষমা করে দাও জেঠু।

কর্নেল সামন্ত প্রাথমিক অভিমানটা কাটিয়ে ধাতস্থ হলেন। বাবলির কাঁধ দুটো ধরে উঠিয়ে দাঁড় করাতে করাতে বললেন, এই বোকা মেয়ে। বড় হয়েছ। যা করেছ নিজের ইচ্ছায় করেছ। তা হলে কাঁদছ কেন?

বাবলি তবুও ফোঁপাতে থাকল।

আমি খুব অন্যায় করেছি জেঠু।

শংকর বাড়ির ভেতরে কাজ করছিল। বসার ঘর থেকে বাবলির কান্নাকাটির আওয়াজ শুনে দেখতে এসে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল সামন্ত শংকরকে চা আনতে বলে বাবলির স্বামীকে বসতে বলে পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার?

আজ্ঞে, তপেন্দ্রনাথ মুখার্জি।

কোথায় থাকা হয়?

সদর বাজারে।

কী করো? চাকরি না ব্যাবসা?

তপাইয়ের মুখটা শুকিয়ে গেল। বাবলি বিয়ের জন্য ক্রমাগত চাপ দিচ্ছিল। বেকার ছেলের কপালগুণে একজন প্রেমিকা জুটেছে। শরীরটাকে ছুঁতে দিত। প্রেমিকাকে হারানোর ভয়ে আর তার শরীরটাকে পুরোপুরি পাওয়ার লোভে দোনামনা করতে করতে শেষপর্যন্ত আজ সকালে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কালীবাড়িতে বাবলিকে বিয়েটা করে ফেলেছে। বাড়িতেও মা-বাবা কীভাবে বাবলিকে নেবে জানা নেই। এক দিনেই জেনে ফেলবে বাবলি রিফিউজি মেয়ে, এখানে একটা বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত। কর্নেলকে যেমন উদার মনে হচ্ছে, তার এক শতাংশও যে ওর বাবা নয় এ-ব্যাপারে নিশ্চিত তপাই।

তপাইকে চুপ করে থাকতে দেখে কর্নেল বুঝে ফেললেন অল্প বয়সে ঝোঁকের বশে বাবলি কী ভুলটাই করে ফেলেছে! কর্নেল গলাটা খাঁকরিয়ে পরিষ্কার করে বললেন, চাকরি-বাকরির কিছু চেষ্টা করছ?

তপাই এই প্রথম বলার মতো কিছু সুযোগ পেল। হুড়মুড় করে বলতে থাকল, অনেক চেষ্টা করেছি স্যার। এখনও করে যাচ্ছি... বিশ্বাস করুন... সব চেষ্টা... সবাই বলে এক্সপিরিয়েন্স না থাকলে...

কর্নেল একটা স্থির দৃষ্টি নিয়ে তপাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ফৌজিতে ভরতি হওয়ার লাইনে দাঁড়িয়েছ কখনও?

তপাই থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়ে মাথা নাড়ল। কর্নেল সামন্ত খানিকটা হতাশ গলায় বললেন, তা হলে আর সব চেষ্টা কী করলে?

কর্নেল সামন্তও চুপ করে গেলেন। আজ এই মুহূর্তে উপদেশ দেওয়ার সময় নয়। ছেলেটার কথা পরে ভাবা যাবে। আজ ওদের বিশেষ দিন। ছোট হোক, বড় হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক, আজ দিনটা ওদের। বাবলির দিকে চোখ পড়ল। বারবার একটা কথাই মনে হচ্ছে। মেয়েটা সত্যিই পালটে গেছে। সেই কিশোরীর উচ্ছলতাটা উধাও হয়ে গেছে। একটা অবাক চোখ নিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে।

তপাই চা খাওয়ার পর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করল না। কর্নেল সামন্ত নীরবে বুঝতে পারলেন বিয়েটা করে ফেললেও, বাবলিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সাহস বা সামর্থ্য কোনওটাই এখন তপাইয়ের নেই। বাবলি যখন তপাইকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ওর অপস্রিয়মাণ চেহারাটা দেখার জন্য একটা আকুতি নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, কর্নেলের বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগল। বাবলি দরজাটা বন্ধ করে যে চাপা শ্বাসটা ফেলল সেটাও যেন কর্নেল শুনতে পেলেন। হাতছানি দিয়ে বাবলিকে ডেকে ওঁর সামনে বসতে বললেন।

এবার আমার একটা কর্তব্য আছে বাবলি। ষষ্ঠীচরণবাবুকে এবার আমাকে তোমাদের কথা জানাতে হবে। আজ থেকে তোমার দায়িত্ব তো আর একজন নিয়ে নিল।

এই এতদিনে ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্তীর একটা মাত্র পোস্টকার্ড এসেছে। কর্নেলের তার কোনও উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। বাবাও মেয়ের খোঁজ করতে কখনও আসেনি।

নেহাত কর্নেলের চাপে পড়ে আশ্রয় হারানোর ভয়ে বাবলি বাবাকে কর্নেল সামন্তর বাড়িতে আছে, ঠিকানাসুদ্ধু এই খবরটা দিতে বাধ্য হয়েছিল, না হলে বাবা-মা হয়তো জানতই না বাবলি কোথায় আছে।

কর্নেল একটু চুপ করে চিন্তা করে বললেন, একটা সত্যি কথা বলো তো বাবলি! তপেন্দ্রনাথ এখন ওর বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাবে না... তাই না?

বাবলির মুখটা ভারাক্রান্ত হল। কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল।

একটা কাজ করো। তুমি যে বাড়িতে প্রথম এসেছিলে... মানে মিসেস গোমসের বাড়িতে... ওই বাড়িতে তোমরা দু'জন গিয়ে থাকো। নিজের সংসার করো। বাড়িটা তো এখন তালাবন্ধই পড়ে আছে। তোমাদের যতটা পারি সাহায্য করব। ওখানে মন দিয়ে গানের রেওয়াজ করো। আমার শুধু একটাই শর্ত। যদি মিসেস গোমস ফিরে আসেন, বাড়িটা তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে।

বাবলি আনন্দে হতবাক হয়ে গেল। ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা আনন্দ চোখ ঠেলে জল বের করে আনল।

৫৩

কর্নেল সামন্ত কিছুদিন ধরেই লোকমুখে খবরটা পাচ্ছিলেন। বাবলি আর তপাইকে ওঁর যে-বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন সেটা এখন সন্ধেবেলা লোফার ছেলেদের আড্ডা দেওয়া, মদ খাওয়ার নতুন জায়গা হয়েছে। বাবলি অবশ্য মাঝেমধ্যে কর্নেল সামন্তর সঙ্গে দেখা করে যায়। কিন্তু তপাই কখনওই দেখা করতে আসে না। কর্নেল সামন্তর কোনওদিনই ভাল লাগেনি তপাইকে। এখন বাড়িটা সম্পর্কে যে-খোঁজখবর পেতে শুরু করেছেন তাতে একটা আশঙ্কাই হচ্ছে, যদি কোনওদিন ক্যাথি গোমস ফিরে আসেন বাড়িটায় কী করে আবার ওঁর থাকার ব্যবস্থা করবেন? মাঝখান থেকে লোফার ছেলেগুলোর চক্ষুশূল হয়ে যাবেন। তা ছাড়া বাড়িটায় এমনিতেই বাবলিকে থাকতে দিয়েছেন আর একটা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। বাবলি যাতে গানের চর্চাটা করতে পারে। এখন ওবাড়ির পরিবেশ যা হয়ে যাচ্ছে তাতে কর্নেল সামন্তর মনে হয় না বাবলি পরিবেশটা পাচ্ছে বলে।

ব্যাপারটা কর্নেল সামন্তকে বিচলিত করলেও কোনও সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। সেই সুযোগটাই হঠাৎ করে একদিন হয়ে গেল রবার্ট গোমস আসায়।

কর্নেল সামন্তর সঙ্গে রবার্টের দেখা করতে আসাটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। রবার্টও কোনও বিশেষ কারণে দেখা করতে আসেনি। ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল যদি কর্নেলের কাছে মাম্মির কোনও খবর এসে থাকে, সেটাকে খোঁজ নেওয়া।

কর্নেল সামন্ত একটা হুইস্কি বানিয়ে রবার্টের হাতে দিয়ে বললেন, নাঃ। মিসেস গোমস আমাকেও আর কোনও খোঁজখবর দেননি।

মাম্মি একটা অদ্ভুত বিহেভ করছে। জানি না এত হাইড আউটের কী দরকার। বিশ্বাস

করবেন! আমাকে যে-চিঠি দিয়ে জানায় যে, বেঁচে আছে, সেই চিঠিটা পর্যন্ত অন্য লোককে দিয়ে পোস্ট করায়। যাতে কলকাতায় পোস্ট অফিসের ছাপ দেখে আমি কোনওমতেই না আন্দাজ করতে পারি, কোথায় মাম্মি থাকতে পারে।

কর্নেল সামন্ত ম্লান হাসলেন। রবার্টকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মানুষের জীবনে এক একটা স্টেজ যায়। একটা স্টেজ থেকে আর একটা স্টেজকে ওভাবে বোঝা যায় না। মিসেস গোমসের এই স্টেজে হয়তো এভাবেই ভাল লাগছে। এই আমাকেই দেখো না, আমি এখন ছেলেদের ছেড়ে এখানে দিব্যি আছি।

রবার্ট মুখ নিচু করে বসে থাকল। কর্নেল সামন্ত হুইস্কিতে ধীরেসুস্থে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, দ্যাট ওয়াজ আ গোল্ডেন টাইম। সেই সময়টা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। মিসেস গোমস, শিপ্রা, বাবলি সবাই যখন ওবাড়িতে একসঙ্গে ছিল...

স্মৃতিচারণ করতে গিয়েই বাবলির নামটা এল। কর্নেল পিঠ সোজা করে উঠে বসে বললেন, বাবলিকে তোমার মনে আছে রবার্ট?

হ্যাঁ, মাম্মির কাছে ছিল... ওই পূর্ববঙ্গের মেয়েটা তো?

ইয়েস! শি ইজ ব্যাক হিয়ার অ্যান্ড ম্যারেড নাউ। বিয়েটা অবশ্য নিজেই এখানকার একটা লোকাল ছেলেকে দুম করে করে ফেলেছে। ছেলেটা কাজকর্ম কিছু করে না। ওদের আমি ফর টাইমবিয়িং আমার ওই সদর বাজারের বাড়িতেই থাকতে দিয়েছি। কী জানো তো... জাস্ট লাইক মিসেস গোমস, বাবলির ওপর আমার কোথায় যেন স্নেহের টান আছে। সি হ্যাজ আ ভেরি স্ট্রং ডিটারমিনেশন। বড় গায়িকা হতে চায়। তুমি মেয়েটাকে একটু হেল্‌প করতে পারো রবার্ট?

রবার্ট যেন আকাশ থেকে পড়ল।

আমি কী করতে পারি স্যার?

না, মানে আমার তো এ ব্যাপারে কিছুই জানাশোনা নেই। বাবলিই একবার আমাকে বলেছিল তোমার কথা। তুমি তো বারে গানবাজনা করো...

আমি আর কোনও প্রফেশন না পেয়ে বারে মিউজিক হ্যান্ডস হয়ে জয়েন করেছিলাম। এখন অবশ্য আর বাজাই না। ফ্লোর ম্যানেজার হয়ে গেছি।

সে তো আরও ভাল। তুমি উন্নতি করেছ। দেখো না কিছু যদি করতে পারো ওর জন্য।

কর্নেল সামন্তকে 'না' বলতে পারল না রবার্ট। তার দুটো কারণ। এক নম্বর কর্নেল অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন ক্যাথি গোমসকে। আর দু'নম্বর কারণ বাবলি আদপে তো মাম্মিরই কাজের লোক ছিল। খানিকটা দায়সারা গোছের বলল, ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, পাঠিয়ে দেবেন একদিন...।

সেই একদিনটা এসে দাঁড়াল মহালয়ার দিন। সকালে পার্ক স্ট্রিটে রবার্ট যে-বারে কাজ করে তার সামনে এসে বুকটা একবার কেঁপে উঠল বাবলির। তপাইয়ের জামার হাতাটা খামচে ধরে বলল, ভীষণ ভয় লাগছে গো।

তপাই বিরক্ত হল। কর্নেল সামন্তকে বাবলি বিরক্ত করে মারছিল একটা দিন ঠিক করে দেওয়ার জন্য। আজকে এখানে আসার দিনটা দিন চারেক আগে রবার্ট ফোন করে জানিয়েছে কর্নেল সামন্তকে। শোনার পর থেকে বাবলির উৎসাহ চারগুণ বেড়ে গেছে। এই চারদিন দিন-রাত এক করে শুধু গান গেয়েছে। এত গান যে বাবলি জানত তপাইয়ের ধারণা ছিল না, বাংলা-হিন্দি তো বটেই, এমনকী ইংরেজি গানও বাদ যায়নি। তপাই প্রথমে অতটা উৎসাহ পায়নি কিন্তু বাবলিকে থামানো যায়নি। উৎসাহে লাগাম দিতে তপাই বলেছিল, ওসব জায়গায় লোকে মদ খেতে আসে, প্লেব্যাক সিঙ্গার খুঁজতে আসে না।

বাবলি প্রতিবাদ করে উঠেছিল, তুমি জানো না। মাসি একদিন বলেছিল আমাকে। অনেক বড় বড় লোকেরা আসে রবার্টদাদার রেস্টুরেন্টে। নিশ্চয়ই মিউজিক ডিরেক্টররাও থাকে। একবার যদি আলাপ হয় পায়ে পড়ে বলব, একটা চান্স দিয়ে দেখুন। কী দারুণ ব্যাপার হবে বলো তো, অপর্ণা, মাধবী সবার জন্য আমি গাইব। তারপর...

তারপর বম্বে যাবে...

বাবলির চোখ চকচক করে উঠেছিল, যাবই তো। হেমামালিনী, জয়া ভাদুড়ি, জিনাত আমন, পারভিন ববি—সবার গলার জন্য আমি গাইব।

হায় রে! আশা-লতার জন্য ভীষণ দুঃখ হচ্ছে, ওদের দিন শেষ হয়ে গেল।

তপাই হাসল। যে-মেয়েটা হেলায় মঙ্গেশকর বোনেদের ছাপিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, সে সামান্য এই বারের সামনে স্বামীকে ঢালের মতো ব্যবহার করে পিছনে দাঁড়িয়ে বলছে, তুমি একবার ভেতরে গিয়ে দেখে এসো রবার্টদাদা এসেছে কিনা। তারপর আমি যাব।

তপাই বাবলির হাতটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বারের ভেতরে ঢুকে এল। অবশ্য ভেতরে ঢুকে তপাইয়েরও একটু তটস্থ লাগল। যদিও তপাই কখনও এই রেস্তোরাঁয় আসেনি, তবে অন্দরসজ্জা দেখে তাক লেগে গেল। সকালবেলায় বাইরের লোকেদের জন্য এটা বন্ধ। ভেতরে সাফসুতরোর কাজ চলছে। এক দিকে একটা ছোট্ট নিচু মঞ্চের মতো জায়গা। সেখানে বেশ কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র। আর কয়েকজন জটলা করে গল্প করছে। এদের মধ্যে রবার্টকে চিনতে পারল না তপাই। ক্যাথি গোমস যখন ব্যারাকপুরে থাকতেন তখন রবার্টকে দূর থেকে দু'-একবার চোখের দেখা দেখলেও চেহারাটা আর ভাল করে মনে নেই। বাবলিকে কনুই দিয়ে আলতো খোঁচা দিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, ওদের মধ্যে রবার্ট কে?

তপাইয়ের মতো বাবলিরও ভেতরের পরিবেশটায় তাক লেগে গিয়েছিল। বাদ্যযন্ত্রগুলো দেখে আত্মবিশ্বাসটা তলানিতে চলে গিয়েছিল। স্বপ্ন দেখত ওর গানের সঙ্গে অনেক অনেক মিউজিক থাকবে আর এখন বড় ড্রামটাকে দেখে বুকের ভেতরে যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনছে। জীবনে কখনও হারমোনিয়ামের চেয়ে বেশি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গান গায়নি।

জড়সড় হয়ে তপাই আর বাবলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রবার্ট উঠে এগিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানাল, এসো, এসো।

একটা খাওয়ার টেবিলে বসল ওরা। রবার্ট অল্প কথার পরই জানতে চাইল, তুমি এখানকার সন্ধেবেলার পরিবেশটা দেখেছ?

বাবলি মাথা নাড়ল।

তোমার গলার একটা টেস্ট নেবে আহমেদ। তারপর যদি আহমেদ তোমাকে সিলেক্টও করে, আমি বলব আগে তুমি একদিন সন্ধেবেলা এখানটা দেখে যেয়ো তারপর ডিসিশন নিয়ো। আর একটা জিনিস তোমাকে বলে রাখছি এখানকার জীবনটা অনেক শক্ত। অনেকের অনেক বায়না সহ্য করে তোমাকে টিকে থাকতে হবে। সিনেমার গান গাওয়া পর্যন্ত কতটা এগোতে পারবে সেটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার।

বাবলি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আহমেদ কে রবার্টদা?

এখানকার মিউজিক অ্যারেঞ্জার, ও-ই তোমার টেস্ট নেবে, তুমি রেডি তো?

বাবলি ঘাড় নাড়তেই রবার্ট হাঁক পাড়ল, আহমেদভাই। শি ইজ রেডি।

জটলার লোকগুলো উঠে গিয়ে যন্ত্রগুলোর কাছে বসল। একজন ড্রামে, একজনের হাতে গিটার আর একজন গলায় ঝুলিয়ে নিল পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান। আহমেদ বাবলিকে বলল, আপনাকে তিনটে গান গাইতে বলব। প্রথমটা আপনি আপনার ইচ্ছেমতো কিছু গান। একদম খালি গলায়। কোনও মিউজিক থাকবে না। তবে এখানে সব ভাষারই লোক আসে। হিন্দি গানটাই বেশি লোকে শুনতে চায়। রাকেশ একটা কর্ড দে।

রাকেশ গিটারে কর্ডটা বাজাতে থাকল। আহমেদ বাবলিকে বলল, এই স্কেলে গলাটা লাগান তো।

বাবলি ঢোক গিলল। প্রথাগত শিক্ষার অভাবে বার দুয়েকের চেষ্টায় গলাটা লাগাতে পারল সুরে। আহমেদ এবার বলল, গুড! এবার এই স্কেলে একটা গান করুন।

বাবলি গাইতে শুরু করল—মিল গ্যয়া, দিল দিল সে বোলদে মেহেফিল সে/ আঁখ মিলি মুশকিল সে, বোল দে মেহেফিল সে...

মৃদুভাবে যন্ত্রসংগীত ওকে সংগত করল। বাবলি ঠিক করেছিল গান গাওয়ার সময় ওদের মুখের দিকে চেয়ে নার্ভাস হবে না। তাই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। গানের শেষে চোখ খুলে দেখল ওদের মুখে একটা তারিফের হাসি।

আহমেদ বলল, বেশ, এবার আর একটা গান। আমি গাইব আর যেখানে থেমে যাব, আপনি বাকিটা গাইতে থাকবেন। রেডি ওয়ান... টু...

তীব্র নাদে বেজে উঠল ড্রাম। তার রেশটা মিলিয়ে যেতেই আহমেদ গলা ছেড়ে উঠল—তেরে বিনা জিন্দগি সে কোই শিকোয়া তো নহি/ তেরে বিনা জিন্দগি ভি লেকিন জিন্দগি তো নহি...

এইটুকু গেয়ে চুপ করে গেল আহমেদ। বাবলি চোখ বন্ধ করে গাইতে থাকল—কাশ এইসা হো তেরে কদমো সে চুন কে মঞ্জিল চলে অওর কহি দূর কহি...

সুরটা গলায় তুলে একটু চোখটা খুলে অন্যদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল। আর তখনই অবাক হয়ে দেখল রবার্ট সুরটার সঙ্গে আত্মমগ্ন হয়ে একটা মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে।

ভেতর থেকে একটা খুশির হলকা উঠে এল। প্রবল উৎসাহে পরের লাইনগুলো গেয়ে উঠল—তুম আগর সাথ হো, মঞ্জিল কি কমি তো নেহি...

একটা সময় টেস্ট শেষ হল। আহমেদ কোনও ভণিতা না করে বলল, আপনার গিফটেড ভয়েস আছে। তবে অনেক অনেক প্র্যাক্টিস দরকার। ঘষামাজা দরকার। মডিউলেশন আরও ভাল করতে হবে। এনি ওয়ে, সপ্তাহে তিন দিন সকাল দশটা থেকে বারোটা এখানে প্র্যাক্টিস হয়। এক মাস এখানে প্র্যাক্টিস করুন। তারপর চেঞ্জ সিঙ্গার হিসাবে আপনাকে ভাবতে পারি। মাসে ছশো টাকা পাবেন। এ ছাড়া মাঝে মাঝে আমরা বাইরেও প্রোগ্রাম করি। তার জন্য আলাদা একস্ট্রা পাবেন।

স্বপ্নপূরণের সঙ্গে ছশো টাকা? বাবলির মনটা নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। একবার চোখ পড়ল তপাইয়ের দিকে। মুখটা যেন কীরকম থমথমে কালো হয়ে গেছে ওর!

৫৪

প্রত্যাশিত ভাবেই বর্ধমানের মাটিতে তুলো ফলল না। দয়াল সান্যালের স্বপ্নভঙ্গ হল। এই স্বপ্নটায় বিভোর হয়ে এবং কমলেশের মতো কৃষিবিদের পাল্লায় পড়ে, বাজারে ধার করে নেওয়া বহু টাকা নষ্ট করলেন। ব্যবসায় তার প্রভাব পড়ল। এবং দেনামুক্ত হওয়ার জন্য বিদেশি মেশিনপত্তরগুলোর সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রার দু'একর জমির খদ্দের খুঁজতে থাকলেন। দয়াল সান্যালের ভাইরা দাদার সংস্রব চাইলেও উনি আবার তাদের ছুড়ে ফেলে দিলেন।

শিপ্রা হ্যাম রেডিয়োর জগৎ নিয়েই থাকত। বিট্টুকে ছেড়ে থাকার জীবনটা ক্রমশ দয়াল সান্যাল এবং শিপ্রার কাছে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। দু'জনেই মনে করত ছেলে অন্য জনের থেকে দূরে থাকলে মানুষ হবে। বিট্টুও মানিয়ে নিয়েছিল বোর্ডিং-এর জীবনে। শিপ্রা মাঝেমধ্যে ছেলের জন্য মন খারাপ করলে কার্শিয়াং-এ চলে যেত। শুধু ছেলের সঙ্গে দেখা হলেই নয়, কার্শিয়াং-এর প্রকৃতিও মনটাকে ভরিয়ে দিত শিপ্রার। আর একটা সময়ের দিকে চেয়ে থাকত শিপ্রা। সেটা হল বিট্টুর লম্বা ছুটির দিনগুলো। তবে দয়াল সান্যালের তুলো চাষের মতো হরির ঝিলে পাখির জন্য শিপ্রার মোহভঙ্গ হয়নি।

উনিশশো সাতাত্তর সালে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় মাপের পটপরিবর্তন হল। কেন্দ্রে এল জনতা সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট। দয়াল সান্যাল চিরকালই শাসক দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার নীতি নিয়ে থাকেন। তাই সাতাত্তর সালে নিজের রাজনৈতিক অবস্থানটাকে সম্পূর্ণ বদলে নিলেন। যেরকম একটা সময়ে কংগ্রেসের সান্নিধ্য পেতে সবরকম চেষ্টা চালাতেন, রাতারাতি সেই প্রয়াসটা হয়ে গেল বামফ্রন্টের প্রতি।

এভাবে চলতে চলতেই ঘটনা একটা নতুন মোড় নিল সাতাত্তর সালের আগস্ট মাসে।

একদিন নিউ মার্কেটের পাখি ব্যবসায়ী রাজু বণিককে নিজের বাড়িতে দেখে অবাক হল শিপ্রা। রাজুকে ভদ্রতার খাতিরে নিজের ঠিকানা দিলেও সেরকমভাবে কোনওদিন আসার জন্য বলেনি। আসলে দয়াল সান্যালের বাড়িতে পরিচিত কাউকেই আসতে বলার আগে দশবার ভাবে শিপ্রা।

রাজু বণিক অবশ্য প্রথমেই জানিয়ে দিল—নিজের আগমনের হেতু। হাত দুটো জোড় করে নমস্কার করে বলল, এদিকে সিংঘানিয়া সাহেবের বাড়িতে একটা পাখি ডেলিভারি দিতে এসেছিলাম ম্যাডাম। ভাবলাম অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, একটু খোঁজ নিয়ে যাই।

ভাল করেছেন রাজুবাবু। শিপ্রা আতিথেয়তার উষ্ণতা ছড়িয়ে বলল, কী পাখি দিলেন?

কাকাতুয়া, খুব ভাল জাতের কাকাতুয়া। একবার মনে হয়েছিল ছোটবাবু কাকাতুয়া দেখতে চেয়েছিল। ওকে দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ডেলিভারিটা দিই। কিন্তু আবার মনে হল, আপনার হয়তো ভাল লাগবে না খাঁচায় বন্দি অত ভাল জাতের পাখিটাকে দেখে।

বিট্টু যে এখন হস্টেলে থাকে, সে ব্যাপারটা আর রাজুর কাছে ভাঙল না শিপ্রা। বরং প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে আতিথেয়তা দেখাতেই ব্যস্ত হল।

চা খাবেন, না ঠান্ডা কিছু?

রাজু বণিক লজ্জা পেয়ে বলল, না, না ম্যাডাম। এইমাত্র সিংঘানিয়া সাহেবের বাড়িতে চা খেয়ে এলাম। আর একটা কারণেও ম্যাডাম ক'দিন ধরেই মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হয়। কয়েকটা ছেলেমেয়ে খুব ধরেছে।

শিপ্রা হেসে বলল, কী ব্যাপার?

ওই পাখি। পাখি নিয়ে কাজ করে ওরা।

ব্যাপারটা শিপ্রার কৌতূহল জাগাল। আর একটু গুছিয়ে বসে বলল, ইন্টারেস্টিং।

হ্যাঁ ম্যাডাম। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কতরকম যে বিচিত্র নেশা হচ্ছে। তাও ভাল ম্যাডাম। ভাল ভাল ঘরের ছেলেমেয়েরা তো ক'বছর আগে বন্দুক, খুনোখুনিতে মেতে উঠেছিল।

রাজু বণিক নকশাল আন্দোলনের কথা বলতে চাইছে। এই প্রসঙ্গটা এখনও উঠলে শিপ্রার অস্বস্তি হয়। তাড়াতাড়ি রাজুকে মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনার জন্য বলল, যা বলেছেন। তা কী করে এই ছেলেমেয়েগুলো পাখিদের জন্য?

বার্ড লাভার্স ক্লাব বানিয়েছে। মাঝে মাঝে বইপত্তর কাঁধে নিয়ে আমার কাছে আসে। পাখি চিনতে চায়। ওইসব বইয়ের দুষ্প্রাপ্য পাখি কি আর নিউ মার্কেটের দোকানে থাকে? আমি বলি, যাও চিড়িয়াখানায় যাও। ওরা বলে চিড়িয়াখানায় তো আর পাখি ছুঁয়ে দেখা যায় না। আসলে ম্যাডাম পাখি একটা নেশা। যাদের হয়, তাদের হয়। তা ম্যাডাম ওরা একজন পৃষ্ঠপোষক চায়। ওদের ক্লাবটা চালাতে খরচখরচা হয় কিছু।

সবই অভাবী ঘরের কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে। আর সত্যি কথা বলতে কী ম্যাডাম, ছেলেমেয়েগুলোর ওপর আমার একটু মায়াই পড়ে গেছে। একদিন আপনার কথা মনে হতে বললাম, একটা জায়গার জন্য কাজ করতে পারবে তোমরা?

হরির ঝিলের কথা বললেন?

রাজু বণিকের মুখে অল্প লজ্জার আভা খেলে গেল, আপনার পারমিশন না নিয়েই...

শিপ্রা রাজু বণিকের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটানোর চেষ্টা করে বলল, ওমা, এটা আপনি কিন্তু কিন্তু করে বলছেন কেন? আপনাকে তো আমি বলেইছিলাম হরির ঝিলের পাখিদের ওপর কাজ করার জন্য আমাকে লোক জোগাড় করে দিন। অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা কাজ করতে এগিয়ে এলে—নাথিং লাইক ইট। অনেক সিনসিয়ারলি, অনেস্টলি কাজ করবে ওরা।

তা হলে ম্যাডাম, আপনার ঠিকানাটা দেব ওদের?

এই প্রশ্নটার সাবলীল উত্তর দেওয়ার আগে থমকে যায় শিপ্রা। খুব দ্রুত একটা অঙ্ক কষতে হয় মনে মনে। এখন সেটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। পাখিদের জন্য কেউ আসা মানেই সে দয়াল সান্যালের শত্রু। বিশেষত সেই পাখিরা যদি হরির ঝিলের হয়। তবে দয়াল সান্যাল কয়েক দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাবেন। মনে মনে কষা অঙ্কের উত্তরে সেই দিনগুলোই উত্তর হিসেবে বেরিয়ে এল। মনের ভেতর এই আচমকা সক্রিয়তাটাকে রাজু বণিককে বুঝতে না দিয়ে বলল, সামনের সপ্তাহে বুধ থেকে শনিবারের মধ্যে যে-কোনওদিন সকালের দিকে আসতে বলুন।

রাজু বণিক খুশি হল। গদগদ হয়ে শিপ্রাকে খুশি করার জন্য বলল, একদিন যাব হরির ঝিল দেখতে। আপনার কাছে এত শুনেছি জায়গাটার কথা।

নিশ্চয়ই যাবেন। মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানেন তো? এই যে আমার জন্য আপনি খাঁচাবন্দি পাখিগুলোকে ছেড়ে দেন—তারপর ওদের যা সমস্যা হয় বলেন, সেটা হয়তো হরির ঝিলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে হবে না। পাখিগুলো নতুন জীবন পাবে। আর হয়তো ওই পাখিগুলোর টানে আরও পাখি আসবে।

শিপ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, অনেক কিছুই ইচ্ছে করে—কিন্তু কিছুই করতে পারি না।

শিপ্রার কাজের লোক এসে সেন্টার টেবিলে চা-বিস্কুটের ট্রে নামিয়ে দিয়েছিল। শিপ্রা চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে রাজু বণিকের দিকে এগিয়ে দিল। কুণ্ঠিত হয়ে চায়ের প্লেটটা ধরে রাজু বণিক বলল, আপনার মতো মন ম্যাডাম, সত্যি দুটো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার সঙ্গে কথা বলা মানেও পাপমুক্তি। একা একা মাঝে মাঝে ভাবি জানেন। এই ব্যাবসা করে কত পাপ করছি।

শিপ্রা রাজু বণিককে বলল, আপনাকে আগেও বলেছি—আপনি এটা পাপ বলে ভাববেন না। জিসাস বলেছেন ঠিক পাপবোধটাই একটা মস্ত উপলব্ধি। জিসাস এই পাপের বোঝাটা হালকা করে দেন, আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন।

রাজু চুপ করে থাকল। ভদ্রমহিলা যিশুর কথা বলছেন। উনি যে খ্রিস্টান এই ধারণাটাই ছিল না রাজু বণিকের। নিচু গলায় বলল, একবার নিশ্চয়ই এক খাঁচা পাখিদের ছেড়ে আসব আপনাদের হরির ঝিলে গিয়ে। আপনিও সেদিন যাবেন ম্যাডাম। মুক্তির আনন্দ দেখবেন। আর আমার ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করবেন, বাপের পাপের বোঝা যেন তাদের মাথায় না আসে।

রাজু বণিকের এই উপলব্ধি দেখে শিপ্রা মাঝে মাঝে ধন্দে ভোগে। লোকটা সহজ সরল পাখির ব্যবসায়ী ছিল। নিউ মার্কেটে দোকান আছে, এটাই তার একমাত্র গর্বের বিষয় ছিল। পাখিদের জন্য মায়া মমতা আর দর্শন লোকটার মধ্যে একটু একটু করে ব্যাবসার প্রতি একটা পাপবোধের জন্ম দিয়েছে। এটার জন্য শিপ্রাও কিছুটা দায়ী।

এক তুমুল বর্ষার দিনে শিপ্রার বাড়িতে দেখা করতে এল একদল কলেজ-পড়ুয়া ছেলেমেয়ে। সেদিন ড্রয়িংরুমে এসে শিপ্রা দেখল ছেলেমেয়েগুলো বৃষ্টিতে ভিজে একটু কুণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিজে যাওয়া জামাকাপড়ে সোফায় বসতে ইতস্তত করছে। শিপ্রা ঘরে ঢুকতেই সকলে প্রায় একসঙ্গে করজোড়ে নমস্কার করল শিপ্রাকে। ওদের মধ্যে নেতা ছেলেটি নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, ম্যাডাম, আমার নাম সুশান্ত মিত্র। রাজু বণিকের কাছে আপনার ঠিকানাটা পেয়েছি। একটা বিশেষ দরকারে আপনার কাছে এলাম। মানে, ম্যাডাম একটা সাহায্য চাই আপনার কাছে।

রাজু বণিক এত বছরের পরিচয়েও কোনওদিন কোনও সাহায্যের জন্য কাউকে শিপ্রার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে পাঠায়নি। শিপ্রা ছেলেমেয়েগুলোকে বসতে বলল। সুশান্ত অন্যদের পরিচয় একে একে করিয়ে দিয়ে বলল, ম্যাডাম ও নিলয়, অপর্ণা, সেমন্তী, পুলক, জয়ন্ত, ধীমান। নামগুলো একসঙ্গে বলে একটু লজ্জা পেয়ে বলল, একেবারে সবাই একসঙ্গেই চলে এসেছি ম্যাডাম।

ছেলেমেয়েগুলো নিতান্ত অল্পবয়স্ক। চোখেমুখে একটা সারল্য আছে। দল বেঁধে একজন অপরিচিতর বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে চিন্তা করছে এভাবে চলে আসা উচিত হল কিনা। শিপ্রা হেসে বলল, তোমাদের তুমিই বলছি, বসো তোমরা।

সোফাগুলোয় চেপেচুপে বসে পড়ল ছেলেমেয়েগুলো। শিপ্রা জিজ্ঞাসু চোখে সুশান্তর দিকে তাকাল।

ম্যাডাম আমরা একটা নেচার্স ক্লাব চালাই। মাইগ্রেটরি বার্ড নিয়ে কাজ করি আমরা।

একটু দম নিয়ে ব্যাপারটা খুলে বলল সুশান্তই।

ম্যাডাম জটিঙ্গার নাম শুনেছেন?

শিপ্রা মাথা নাড়ল। জটিঙ্গা কি কোনও পাখির নাম না জায়গার নাম—বিন্দুমাত্র আন্দাজ নেই। শব্দটাই নতুন শিপ্রার কাছে। সুশান্ত আরও খুলে বলতে আরম্ভ করল।

ম্যাডাম জটিঙ্গা হচ্ছে অসমের শিলচরের কাছে একটা গ্রাম। ওখানে একটা অদ্ভুত মিস্ট্রি আছে ম্যাডাম। প্রতি বছর শয়ে শয়ে মাইগ্রেটরি পাখি এসে জটিঙ্গায় আত্মহত্যা করে!

আত্মহত্যা? নড়েচড়ে বসল শিপ্রা। বিষয়টা অদ্ভুত।

হ্যাঁ ম্যাডাম, সুইসাইড। কেন করে কেউ জানে না। বহু বছর ধরে এমনটাই চলে আসছে। তথ্যে আছে বহু দিন আগে নাগারা এটা দেখেছিল।

শিপ্রার মাথায় আসল ব্যাপারটা ঢুকছিল না। শয়ে শয়ে পাখিরা এসে আত্মহত্যা করে! কী জন্য ওরা আসে, কেনই বা আত্মহত্যা করে, কী করেই বা করে, এরকম বহু প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এতক্ষণ কথা বলছিল সুশান্ত। এরপর দলের বাকি ছেলেমেয়েগুলোও বলতে আরম্ভ করল। সবার টুকরো টুকরো কথাগুলো সাজিয়ে শিপ্রা অদ্ভুত এক ধাঁধায় পড়ে গেল। পৃথিবীতে এরকম এক অদ্ভুত রহস্য আছে—জানা ছিল না। শিপ্রার অবিশ্বাসী মুখটা দেখে সুশান্ত বলল, আপনার মতো আমরাও প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে পারিনি ম্যাডাম, কিন্তু পরে খোঁজ করে জেনেছি, ব্যাপারটা একদম সত্যি।

আমার কাছে কী সাহায্য চাও তোমরা?

ম্যাডাম আমরা জটিঙ্গাতে একটা অভিযান করতে চাই। আমরা সকলে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বাড়ির ছেলেমেয়ে। ইচ্ছে থাকলেও খরচ জোগাড় করে উঠতে পারছি না ম্যাডাম। আমরা একজন পৃষ্ঠপোষক খোঁজ করছি। যিনি পাখিদের জন্য আন্তরিক...

শিপ্রা ছেলেটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা এতগুলো ছেলেমেয়ে কষ্ট করে খরচ করে শিলচর যাবে, শুধু পাখিরা আত্মহত্যা করছে এটা দেখতে? একটার পর একটা পাখিকে মরতে দেখে কষ্ট হবে না তোমাদের? নিতে পারবে চোখের সামনে দেখা ঘটনাগুলো!

ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। বার্ড লাভার্সদের পক্ষে চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটতে দেখা খুবই অসহনীয়। তবে এই ঘটনায় মানুষের একটা ভূমিকা থাকে। মানুষ সংযত হলে এই আত্মহত্যার অনেকটাই এড়ানো যায়। আমাদের অভিযানের একটা লক্ষ্য হল মানুষদের বোঝানো। যদি আমরা সফল হই, তা হলে সরকারের সাহায্য নিয়ে আরও বড় করে অভিযান করব আমরা।

কত খরচ লাগবে বলে ধরেছ তোমরা?

আমরা সব মিলিয়ে আটজন যাব ঠিক করেছি। যাতায়াত, থাকা, খাওয়ার খরচ সব ধরে আমরা মাথাপিছু হাজার টাকা বাজেট করেছি। প্লাস আরও দু'হাজার আনুষঙ্গিক খরচ হিসাবে হাতে রাখছি। মোট দশ হাজার। আপনাকে বাজেটের কাগজটা দেখাচ্ছি ম্যাডাম।

সুশান্ত ব্যাগ খুলে একটা কাগজ বার করতে গেল। শিপ্রা বাধা দিয়ে বলে উঠল, থাক। আমার কোনও কাগজ দেখার দরকার নেই। তোমরা যখন মাথা খাটিয়ে করেছ, তখন ধরেই নিচ্ছি হিসেব সব ঠিক আছে। তা, কবে যেতে চাও তোমরা?

ম্যাডাম, বছরে মাত্র দু'মাস এই ঘটনাটা ঘটে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। এর সঙ্গে দরকার হয় আরও কয়েকটা ঘটনার।

কীরকম? আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল শিপ্রা।

প্রথমত, অমাবস্যার রাত্রি হতে হবে। দ্বিতীয়ত, রাত্রে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হতে হবে। তৃতীয়ত, গাঢ় কুয়াশা থাকতে হবে আর শেষ শর্ত হচ্ছে একটা দক্ষিণ থেকে উত্তরে হালকা বাতাস থাকতে হবে।

শিপ্রা অবাক হয়ে বলল, এতগুলো কন্ডিশন ম্যাচ করবে বলে তোমার মনে হয়?

করে যায়। সেপ্টেম্বরের অমাবস্যার দিনটা টার্গেট করেছি ওখানে থাকার। সময় তাই খুব কম ম্যাডাম। এখন তাড়াতাড়ি টাকাটা জোগাড় করার চেষ্টা করছি। ট্রেনের টিকিটগুলো কেটে ফেলতে হবে।

শিপ্রা চুপ করে গিয়ে ছেলেগুলোর মুখের ওপর চোখ বোলাতে থাকল। উদগ্রীব মুখগুলো অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে আছে শিপ্রার মুখের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে শিপ্রা বলল, আমিও যদি যাই তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের কি খুব অসুবিধা হবে?

ওরা প্রথমে যেন কথাটার মর্মোদ্ধারই করতে পারল না। তারপর চোখেমুখে উল্লাস উপচে পড়ল।

আপনি সত্যি যাবেন ম্যাডাম! এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। আমাদের অসুবিধার কথা কী বলছেন? আপনারই হয়তো ওখানে থাকতে অসুবিধা হবে। থাকার সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই তো ওখানে। তবে সবচেয়ে সুবিধা হবে আমাদের দলের মেয়েদের। আপনি সঙ্গে গেলে ওদের বাড়ি থেকে আর কোনও চিন্তাই থাকবে না।

শিপ্রা ছেলেমেয়েগুলোকে দু'দিন পরে দেখা করতে বলল। তার মধ্যে টাকাকড়ির ব্যবস্থা করে রাখবে জানিয়ে দিল। শিপ্রার অনাগ্রহ এবং আপত্তি সত্ত্বেও সুশান্ত একরকম জোর করেই ওদের অভিযান সংক্রান্ত কাগজপত্রের গোছাটা শিপ্রার দেখার জন্য রেখে গেল।

বৃষ্টিঝরা অলস দুপুরে হিসেব আর তথ্যে বোঝাই কাগজগুলো দেখতে দেখতে শিপ্রার জটিঙ্গা সম্পর্কে আগ্রহটা বেড়ে গেল বহু গুণ।

বাইরে থেকে ফিরে আসার বহু দিন পরে আর একবার দয়াল সান্যালের মুখোমুখি বসল শিপ্রা। গম্ভীর গলায় বলল, আমার কিছু টাকা চাই।

দয়াল সান্যাল স্থির দৃষ্টিতে শিপ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কত?

পনেরো হাজার।

দয়াল সান্যাল ভুরু কুঁচকে বললেন, হঠাৎ? এত টাকা তোমার কীসের দরকার?

কৈফিয়ত দিতে আমি বাধ্য নই।

নিশ্চয়ই বাধ্য তুমি, টাকা কিছু গাছের পাকা ফল নয় যে, টুক করে পেড়ে ফেললাম আর দিয়ে দিলাম।

আমি ব্যবসায় আমার যে পার্টনারশিপের শেয়ারটা আছে, তার থেকে টাকাটা চাই।

দয়াল সান্যাল মুচকি হাসলেন, তোমার মায়ের টাকা তা হলে এতদিনে শেষ হয়েছে। ভিক্ষের ঝুলিটা শেষ পর্যন্ত বার করতে হয়েছে।

শিপ্রার মাথা গরম হতে থাকল। আপ্রাণ চেষ্টা করল নিজেকে ঠান্ডা রাখতে।

আমার কোন টাকা আমি কীভাবে খরচ করব, সেটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আই ওয়ান্ট মানি অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফাইনাল। কাল আমাকে টাকাটা দিয়ে দিয়ো।

দয়াল সান্যাল হাতটা তুললেন, তোমার শেয়ারের পোরশনের দাম কত তোমার কোনও আইডিয়া আছে?

যতই হোক, পনেরো হাজারের বেশি সেটা। আমি যখন চাইছি ইউ আর বাউন্ড টু গিভ দ্যাট।

দয়াল সান্যালের মুখ থেকে হাসিটা মেলায়নি। সামনে দাঁড়ানো এই মেয়েটার বল ভরসা দেমাক ছিল মায়ের জমানো পাপের টাকাটাকে ভরসা করে। একদিন সেটা ফুরোনোর ছিল। বহু দিন ধরে সেই দিনটার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। আজ অবশেষে এসেছে সেই দিনটা। শিপ্রা সান্যাল ইজ ফিনিশড অ্যাট লাস্ট। ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি পেলেন দয়াল সান্যাল। মৌজ করে বললেন, কালকে অফিসে এসো। অ্যাকাউন্টসটা দেখে নিয়ো। তোমার কোম্পানি যে এখন লসে রান করছে। তোমার শেয়ারের দাম এক পয়সাও নেই।

তুলো চাষ করে যে আর্থিক বিপর্যয় দয়াল সান্যাল করেছেন সেটার একটা আন্দাজ শিপ্রার আছে। তবে দয়াল সান্যালকে একটুও বিশ্বাস করে না। এত বছর দয়াল সান্যালের এইসব চালে শিপ্রা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হিসেবের খাতায় নয়কে ছয়, ছয়কে নয় করে এসেছে। দু'-তিনটে কাগুজে কোম্পানি খুলে হিসেবের টাকা এধার-ওধার করে হামেশাই।

দয়াল সান্যাল যে-ক্রুর হাসিটা হেসেছিলেন সেটাই পালটা হাসল শিপ্রা।

তোমার কোম্পানি তা হলে লসের মুখটা কেমন দেখছে...

দয়াল সান্যাল চটে উঠলেন। টেবিল চাপড়ে বললেন, আমি তোমার মায়ের মতো বেশ্যাদের ব্যাবসা করি না। আই ডু পিয়োর হার্ড বিজনেস। আমি ঘুরে দাঁড়াবই।

শিপ্রা চোয়াল শক্ত করে ঠোঁট কামড়াল। অকৃতজ্ঞ দয়াল সান্যালের স্বভাবই হচ্ছে কথায় কথায় অকারণে মায়ের অপমান করা। নিজের বড় হওয়ার দুর্বলতাটা ঢাকার একটা ঘৃণ্য চেষ্টা।

পায়ের ওপর পা তুলে নাচাচ্ছেন দয়াল সান্যাল। বুড়ো আঙুলটা হেলিয়ে শিপ্রাকে বললেন, একটা পয়সাও তোমাকে দেব না।

তোমার পয়সার তোয়াক্কা করি না। নিজের পয়সা আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নেব। তবে তোমাকে শেষ করে দেব। মা যেখান থেকে তোমার জীবনটা শুরু করিয়ে দিয়েছিল, সেখানেই ফিরিয়ে দেব তোমাকে।

দয়াল সান্যাল চোখ বড় বড় করে বললেন, কী করবে তুমি? মায়ের ব্যবসায় নামবে? আয়নায় নিজেকে দেখেছ কখনও? হিসেব করেছ কত রাতে পনেরো হাজার হবে?

দয়াল সান্যালের এই ইঙ্গিতটা, এই অপমানের ধরনটাও নতুন কিছু নয়। শিপ্রার রগ দুটো দপদপ করতে থাকল। দয়াল সান্যাল চেয়ারে মাথাটা হেলিয়ে বললেন, তা কোন নাগরকে পাঠাবে তুমি আমাকে শেষ করতে?

শিপ্রা কেটে কেটে বলল, একটা সময়ে মনে হত তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। বিট্টুকে

ছেড়ে তোমার কাছে তাই এসেছিলাম করুণা করে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি, তুমি যাতে হেমন্ত পাঠকের কাছে যাও। তার জন্য জমিটা পর্যন্ত তোমার তুলো চাষ করার মতো আজগুবি কাজে ছেড়ে দিয়েছি। তবে ঈশ্বরের বোধহয় অন্যরকম ইচ্ছে। ঈশ্বর তোমার শাস্তি ঠিক করে রেখেছেন। আমি সেটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করব। যতগুলো অন্যায় তুমি করেছ, মায়ের সঙ্গে, ক্যাথি আন্টির সঙ্গে, পলাশের সঙ্গে, মহেশদার সঙ্গে, এমনকী হরিহরের সঙ্গেও। ঈশ্বরের এক একটা শাস্তি দেখার জন্য অপেক্ষা করব আমি। শুধু আমার সঙ্গে যে-অন্যায় করেছ তার হিসেব করাব তোমার ছেলেকে দিয়ে। তোমাকে টাকা দিতে হবে না। আমার জমিটা ফেরত চাই।

দয়াল সান্যাল হাসলেন, ভুলে গেলে? জমিটা তুমি সই-সাবুদ করে আমার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছ। ওটা ফেরত পাওয়ার কথা ভুলে যাও।

ভুলে কিছুই যাইনি। এবার আর সই জাল করার মতো চালাকি কোরো না। সব খবর আছে আমার কাছে। যদি ওটা ফেরত না দাও, আমার উকিল তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

কিছুই বুঝছি না। এই ভিক্ষা চাইছ, আবার এই বলছ কেস করবে। তা, আমার বিরুদ্ধে কেস করতে কি আমার কাছেই ভিক্ষা করবে নাকি তোমার মায়ের মতো...

সেটা সময়েই দেখতে পাবে।

চরম উত্তেজনায় কথাগুলো বলে ঘর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল শিপ্রা। নিজের ঘরে বিছানায় এসে ধপ করে বসে পড়ল। শরীরটা এখনও কাঁপছে।

বিট্টুর পড়ার টেবিলে এখন ছোট্ট ফ্রেমে মার্থার ছবি থাকে একটা। শিপ্রার চোখ পড়ল মার্থার ছবিটার উপর। মা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। দৃষ্টিটা কীরকম যেন করুণ। ছবিটার কাছে গিয়ে ফ্রেমটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকল, বিশ্বাস করো মা, তুমি এই দিনটার জন্য এত কষ্ট করে আমাকে বড় করোনি। কিন্তু আমি আর পারছি না। তুমি ভাবতে তোমার জীবনটা অপমানের... আমার জীবনটা আরও অনেক বেশি অপমানের মা।

পরের দিন সকালে অফিসে এসে দয়াল সান্যাল প্রথমেই ক্যাশিয়ারকে বললেন পনেরো হাজার টাকা নগদ দিতে। টাকাটা নিজের টেবিলে পাওয়ার পর সরোজ বক্সীকে ডেকে বললেন টাকাটা শিপ্রার কাছে দিয়ে আসতে। মনিবের আজ্ঞা পালন করতে সরোজ বক্সী টাকার বাণ্ডিলটা হাতে তুলে নিতেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন দয়াল সান্যাল, আমি অত সহজে হারব না।

৫৫

বার লাইব্রেরিতে অনুপম ঘোষ একদিন তরুণ ঘোষকে শিপ্রা সান্যালের কথা বলেছিল। অনুপম আর তরুণ পারিবারিক সূত্রে লতায়পাতায় সম্পর্কিত। পেশাদার জায়গা আর আত্মীয়তার জায়গা দু'জনেই খুব সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে। সেই অনুপম যখন আত্মীয়তার

দোহাই দিয়ে শিপ্রা সান্যালের মতো মক্কেলের ডালিটা তরুণের হাতে তুলে দিয়েছিল, ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে তরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, কী কেস?

একটা পুরনো জমির কেস।

বাদী... বিবাদী?

কেসটা দয়াল সান্যালের সঙ্গে ওর বউ শিপ্রা সান্যালের।

অনুপম ঘোষ এককালে দয়াল সান্যালের উকিল ছিল। তারপরে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। আত্মীয়তা থাকার জন্য পারিবারিক সূত্রে অনেক খবরই আসে। অনুপম একটা বাজে মেয়ের পাল্লায় পড়েছিল। একদিন সেই মেয়েটা মাঝরাতে একদম মদে বেহুঁশ অবস্থায় অনুপমকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেছে। তার সূত্র ধরে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল ওর। দয়াল সান্যালের আইনের দিকটা দেখত অনুপম। ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে ওর প্রাক্তন হয়ে যাওয়া শ্বশুরমশাই শশধর দাশগুপ্ত দয়াল সান্যালকে নিজের হাতে টেনে নিয়েছেন। বাজারে অনেক গল্প চালু আছে। তারপর থেকেই হাসিখুশি চনমনে ছেলেটা পালটাতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করব না করব না করেও স্বাভাবিক কৌতূহলে তরুণ জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, তুই নিবি না কেসটা?

অনুপম ঘোষ নিচু গলায় বলেছিল, না রে, অসুবিধে আছে।

উকিলদের আবার কেস নিতে অসুবিধা হয় নাকি?

নিজের জাতকেই ছোট করছিস?

তরুণ দু'দিকে হাত ছড়িয়ে বলেছিল, ওরে বাব্বা। তুই তো এখন ইয়ারকি ফাজলামোও সিরিয়াসলি নিচ্ছিস।

অনুপমকে চাঙ্গা করতে তরুণ পিঠ চাপড়ে বলেছিল, ঠিক আছে, সম্পর্কে দাদা যখন তুই, তোকে তো আর পার্সেন্টেজ অফার করা যাবে না। তবে মক্কেল দেওয়ার জন্য খাওয়াচ্ছি তোকে চল।

অনুপম গলা নিচু করে বলেছিল, তুই নিচ্ছিস তা হলে কেসটা?

ব্রিফিং আছে তোর কাছে?

বার লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এসে একটা খুব নিভৃত জায়গায় উত্তরটা দিয়েছিল অনুপম, না নেই।

তা হলে এটা কার কেস?

কেস হয়নি এখনও। হবে। খবর আছে শিপ্রা সান্যাল একজন ভাল উকিল খুঁজছে। অন্য কাউকে পেয়ে যাওয়ার আগে তুই গিয়ে দেখা কর। তোকে এই মক্কেলের সন্ধানটা দিচ্ছি, এটা তুই কখনও কাউকে বলবি না।

তরুণ একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে চোখ কুঁচকে অনুপমের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ঠিক আছে। তুই তো দয়াল সান্যালের সঙ্গে কাজ করতিস। পয়েন্ট দে।

আস্তে।

দুর বাবা। কেউ তো নেই এখানে।

না থাক। কিন্তু যে-কেউ যখন তখন শুনে ফেলতে পারে।

শুনে ফেললে হবেটা কী? এখানে তো সবাই মক্কেলদের নিয়ে, কেস নিয়ে আলোচনা করে।

অসহিষ্ণুর মতো অনুপম বলে উঠেছিল, সবাই আর দয়াল সান্যাল এক জিনিস নয়।

তরুণ ক্রমশই বুঝতে পারছিল, এভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা যাবে না। সমস্যাটাও বোঝা যাবে না। সরাসরিই কথা বলতে হবে।

তুই কী বলছিস কিছুই বুঝছি না। দয়াল সান্যাল তোর মক্কেল ছিল। এখন আর নেই। তার বউয়ের একটা কেস। তা তুই এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?

শিপ্রা সান্যালকে কিন্তু আমিও চিনি না। মানে মুখোমুখি পরিচয় নেই। তবে কোর্টে যাওয়া ছাড়া শিপ্রা সান্যালের আর অন্য কোনও উপায় নেই। এই কেসটা তোকে জিততেই হবে। শুয়োরের বাচ্চাটার অন্তত একটা হার দেখলেও প্রাণটা জুড়োবে একটু। শালার জাল দলিল আছে জমিটা নিয়ে। এটাই কেসটার তুরুপের তাস। জেলের ঘানিটা যদি একবার টানাতে পারিস...

তরুণের তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। যে-কেসটার জন্মই এখনও হয়নি—তার উকিল হতে বলছে অনুপম। সেটার কারণ না হয় বোঝা যাচ্ছে। অনুপম একটা প্রতিশোধ চায়। কিন্তু একই সঙ্গে তরুণ ভাবতে থাকল—শিপ্রা সান্যালের সঙ্গে তার যোগাযোগ হবে কী করে? সে ভারটুকুও অনুপম নিয়ে বলেছিল, তুই কেসটা নিতে রাজি হলে, তুই নিজে শিপ্রা সান্যালকে গিয়ে অ্যাপ্রোচ না করলেও শিপ্রা সান্যাল তোর কাছে আসবে। কীভাবে আসবে তার দায়িত্ব আমার।

একটা কৌতূহল নিয়েই তরুণ রাজি হল। তবে নিজে থেকে শিপ্রার কাছে যায়নি। অনুপমই ব্যবস্থাটা করেছিল। কী করে করেছিল সেটা অবশ্য তরুণের জানা নেই।

শিপ্রার চেহারায় যে-সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব আর আভিজাত্য আছে সেটা যে-কোনও লোককেই কয়েক মুহূর্তে আবিষ্ট করে ফেলে। তরুণ ঘোষও তার ব্যতিক্রম হল না। নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পরে শিপ্রা তরুণের চেম্বারে এল এবং আর অন্য কোনও প্রসঙ্গে না গিয়ে সরাসরি নিজের প্রসঙ্গে চলে এল।

তরুণবাবু, প্রথমেই আপনাকে বলে রাখি আমার সমস্যাটা আপনার খুব অদ্ভুত মনে হতে পারে। তাই এটা শোনার পর আপনি আমার কাজটা করুন বা না করুন আপনার সঙ্গে আমার আলোচনাটা গোপনীয় রাখতে হবে।

তরুণ ঘোষ একটা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলল, ম্যাডাম, ওকালতির একটা এথিক্সই হল মক্কেলের গোপনীয়তা রক্ষা করা। তবে আপনি শুরু করার আগে আপনাকেও আমি ছোট একটা প্রশ্ন করে নিই। আপনি আমার রেফারেন্স কী করে পেলেন?

শিপ্রা একটু চুপ করে থেকে বলল, পেলাম একজনের কাছ থেকে।

এটা বলাও কি গোপনীয়?

না, ঠিক গোপনীয় হয়তো নয়, কিন্তু খুব প্রয়োজনীয়ও নয়। শিপ্রা আবার খানিকক্ষণ

চুপ করে থেকে বলল, যে আমাকে আপনার রেফারেন্স দিয়েছে—তাকে আমি চিনিই না।

যাকে চেনেন না, তার কথায় ভরসা করে আমার কাছে এলেন?

ভদ্রলোককে কোনওদিন চোখে দেখিনি। উনি নিজের পরিচয় গোপন করে মাঝে মাঝে আমাকে ফোন করেন। পরামর্শ দেন। তবে আমি অনেক ভেবে দেখেছি—উনি ভাল পরামর্শ দেওয়ারই চেষ্টা করেন। তাই অপরিচিত হলেও একেবারে অবিশ্বাস করার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। তা ছাড়া আমি কী ধরনের সাহায্য চাই—সেটা তো আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার সময়ই বলেছি। আপনিও আপত্তি করেননি। আমার মনে হয় আমরা সোজা সেই ব্যাপারটা নিয়েই ডিসকাস করি।

শিপ্রা বলতে আরম্ভ করল হরির ঝিলের কথা।

৫৬

শিলচরে ট্রেন থেকে নেমে হাফলং-এ চলে এল শিপ্রারা। হাফলং-এ একটা মাঝারি মানের হোটেলে দলবেঁধে উঠল ওরা। হাফলং থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে জটিঙ্গা। ঠিক ছিল ওরা পরের দিন জটিঙ্গা যাবে এবং সারা রাত্রিটা জটিঙ্গাতে কাটাবে। সেপ্টেম্বর মাস এবং চাঁদহীন অন্ধকার রাত্রি, এই দুটোর ব্যবস্থা ওরা করতে পেরেছে। শুধু বাকি তিনটে উপকরণ—ঘন কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে মৃদুমন্দ হাওয়া, এগুলোর সমন্বয়ের জন্য একমনে প্রার্থনা করতে থাকল ওরা। গোটা দলটায় সবচেয়ে ছটফটে ছিল সেমন্তী। বন্ধুদের সঙ্গে এই প্রথম বাইরে আসার অভিজ্ঞতা। বাড়ি থেকে এই সম্মতিটুকু জোগাড় করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আসতে পেরে নিজেকে প্রায় আত্মহারা করে ফেলেছে। হোটেলের ঘরে সেমন্তীর মন টিকছে না। শিপ্রাকে এসে ধরল, চলো না দিদি, বাইরে। দারুণ জায়গাটা।

দু'দিনের সফরে যথেষ্ট ক্লান্তি ছিল তবু সেমন্তীর ডাকটা উপেক্ষা করতে না পেরে শিপ্রা বলল, ঠিকই তো, এত সুন্দর একটা জায়গায় এসে হোটেলে বসে থাকব কেন? চলো বাইরে ঘুরে আসি। তা বাকিরা কোথায়?

ছেলেগুলো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। অপর্ণা বলল যেতে ইচ্ছে করছে না।

তাই! শেষকালে শুধু তুমি আর আমি?

নীলয়কে বললে তাও রাজি করানো যেতে পারে। ডাকব?

না থাক। চলো তুমি আর আমিই কাছাকাছি একটু হেঁটে আসি।

সেপ্টেম্বর মাস হলেও একটা শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া আছে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে রাস্তায় নেমে এল শিপ্রা। হাফলং-এর প্রকৃতি, সবুজ নিসর্গ কার্শিয়াং-এর থেকে একদমই আলাদা। দু'জন সুন্দরীর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করার মতোই কঠিন দুটো জায়গাকে বিচার করা। তবু কার্শিয়াং-এর স্কুলজীবনের স্মৃতি বারবার চলে আসছিল

শিপ্রার মনে। আর সেমন্তীর মতো মেয়েকে পেয়ে অনেকদিন পরে আর একজনের স্মৃতি। বাবলির কথা কেন জানি বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল শিপ্রার।

হাঁটতে হাঁটতে শহরটার যে-জায়গাটায় চলে এল ওরা সেখানটা যথেষ্ট ফাঁকা। শিপ্রা এক দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, জটিঙ্গা ওই দিকে, না?

সেমন্তীর সঠিক ধারণা ছিল না জটিঙ্গাটা ঠিক কোন দিকে। জটিঙ্গা সম্পর্কে যেটুকু পড়ার বইতেই পড়েছে। ওর ওপর ভার ছিল সব তথ্যগুলো একটা খাতায় কপি করে দিতে। সুন্দর হাতের লেখায় ও সেই কাজটা করেছে। ম্যাপটা এঁকেছে পুলক। তাতে নর্থের তিরচিহ্নটাও আঁকা আছে। বহুবার ম্যাপটা দেখেছে সেমন্তী, কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিরচিহ্নটা কোন দিকে ঠাওর করতে পারল না। সুশান্ত প্রত্যেকের দায়িত্ব ঠিক করে দিয়েছে। সেমন্তীর দায়িত্ব তথ্য রাখা ও সরবরাহ করা। শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরটা দিতে না পেরে অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, ঠিক জানি না দিদি।

শিপ্রা অন্যমনস্ক হয়ে বলল, তবে তোমরা পাখির জন্য যে-কাজটা করছ, সেটা খুব ইম্পর্টান্ট। মাঝে মাঝে আমি ভাবি জানো, আমিই বোধহয় ভুল। পাখিদের ভালবেসে ওদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না। একটা ছোট্ট জায়গায় কিছু পাখির নিরাপদ আশ্রয়ের একটা ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম—কিছুই পারলাম না।

হরির ঝিল? সেমন্তী জিজ্ঞেস না করে পারল না।

তুমি কী করে জানলে? শিপ্রা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

রাজুদা বলেছে। আমরা কী ঠিক করেছি জানেন, আমরা ফিরে গিয়ে সবাই মিলে হরির ঝিলে যাব।

না। গলা চড়িয়ে সেমন্তীকে থামিয়ে দিল শিপ্রা, আমি না বলা পর্যন্ত তোমরা কেউ যাবে না হরির ঝিলে। আমি চাই না তোমাদের সুন্দর জীবনগুলো নষ্ট হয়ে যাক। ওটা একটা অভিশপ্ত জায়গা।

আবার শিপ্রার ব্যক্তিত্বের বেড়ায় আটকা পড়ে গেল সেমন্তী। বিকেলের আলো মরে আসছে। শিপ্রা ঘড়িতে দেখল মাত্র চারটে কুড়ি বাজে। কথা ঘুরিয়ে সেমন্তীকে বলল, দেখেছ আমরা আরও ইস্টে চলে এসেছি কেমন বোঝা যাচ্ছে। চারটে কুড়িতেই কীরকম আলো কমে এসেছে। চলো ফেরা যাক।

হোটেলের কাছাকাছি আসতেই রাস্তায় চোখে পড়ল সুশান্ত, জয়ন্ত আর পুলককে। শিপ্রা আর সেমন্তী কোথায় গেছে সে ব্যাপারে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল ওরা। ওদের ফিরে আসতে দেখে নিশ্চিন্ত হল।

পুলক ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, বিকেলে চা খেয়েছেন দিদি?

না। চলো একসঙ্গে চা খাই।

হোটেলটা সাধারণ মানের হলেও হোটেলটার পিছনে বেশ খানিকটা জায়গা আছে। জায়গাটা অবহেলাতেই পড়ে আছে। কোনও পরিচর্যা না থাকলেও জায়গাটা নোংরা নয়। কোনও আবর্জনা নেই। হাফলং-এর প্রকৃতির সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে জায়গাটা।

হোটেলে বলে কিছু চেয়ার আর একটা কাঠের বেঞ্চের ব্যবস্থা করে নিল পুলকরা। সেখানেই চা খাওয়ার ব্যবস্থা হল। চা খেতে খেতে সন্ধে নামল।

সুশান্ত বলল, দিদি জটিঙ্গাতে আমরা কাল রাতে থাকব। ইদানীং দেশ-বিদেশ থেকে অনেকেই আসে এই ঘটনাটা দেখার জন্য। আমরা হোটেল থেকে ব্যবস্থা করে দু'জন স্থানীয় লোককে সঙ্গে নিচ্ছি। এক জন হোটেলেরই বেয়ারা, অন্য জন হোটেলের কাছেই একটা স্টেশনারি দোকানে কাজ করে। ওরা পঁচিশ করে মোট পঞ্চাশ টাকা নেবে।

শিপ্রা সুশান্তর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলল, খুব ভাল ডিসিশন নিয়েছ সুশান্ত। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও ওদের তোমাদের আর একটা কাজে দরকার হবে। তোমরা তো ঠিক করেছ জটিঙ্গার গ্রামের লোকদের সঙ্গে কথা বলবে। স্থানীয় ভাষা জানা দোভাষী না পেলে এই কাজটা করতেই পারবে না।

কালকের প্রোগ্রামটা একটু জানিয়ে রাখি দিদি। কালকে কিন্তু আমরা শুধু ঘটনাটা দেখব। সন্ধের আগেই গ্রামটাতে পৌঁছে যাব। মাঝরাত পর্যন্ত ঘটনাটা ঘটে। কিন্তু মাঝরাতে তো আর সাত কিলোমিটার পেরিয়ে হাফলং-এ ফিরে আসতে পারব না। রাতটা ওখানেই কাটাতে হবে। পরশু থেকে তিন দিন আমরা সময় রাখছি গ্রামের মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য। কী কী পাখি আসে তার একটা রেকর্ড তৈরি করা।

সময় তো কম সুশান্ত। তোমাদের সবার কাজ ভাগ করে নিয়েছ তো?

হ্যাঁ দিদি। জয়ন্তর উপর ভার ফটো তোলার, পুলকের ওয়েদার রিপোর্ট তৈরি করা, নীলয়ের পাখির প্রজাতি আইডেন্টিফাই করা, সেমন্তীর পুরো ডেটা লিখে রাখা, আমার আর অপর্ণার লোকাল লোকদের সঙ্গে কথা বলার।

আর আমার? আমাকে কি কোনও কাজ দেবে না?

সুশান্ত লজ্জা পেলে কপাল চুলকোয়। কপাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, দিদি আপনি যদি একটা ভাল রিপোর্ট তৈরি করে দেন। আমাদের ইচ্ছে আছে এই রিপোর্টটা ইউনেস্কোতে পাঠাব। যদি ভাল আন্তর্জাতিক সাপোর্ট পাওয়া যায়, আমাদের অর্গানাইজেশনটাকে আরও অনেক বড় করতে পারব।

ঠিক আছে, তোমরা আমাকে সাহায্য কোরো, সবাই মিলে দেখব কীভাবে একটা সুন্দর কাজের রিপোর্ট তৈরি করা যায়।

অন্ধকারটা গাঢ় হচ্ছিল, ঠান্ডাটাও বাড়ছিল। জয়ন্ত বলল, চলুন দিদি ভেতরে যাই।

অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, কেন? ভেতরে কেন? ভেতরে কী হবে? স্যাঁতসেঁতে ঘর। তার চেয়ে এইখানটাই বেশ ভাল।

জয়ন্ত হাতের পাতা ওলটাল, এই অন্ধকারে কেউ কারও মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না। তা হলে এক কাজ করি, হোটেলওয়ালাদের বলি একটু কাঠফাট দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিক।

সেই সঙ্গে আর এক কাপ করে চা। পুলক ফরমাশ করল।

সেমন্তী শিপ্রাকে জিজ্ঞেস করল, দিদি, তুমি যখন বোর্ডিং-এ ছিলে—এরকম সন্ধেবেলাগুলোয় কী করতে? নিশ্চয়ই সব বন্ধুরা মিলে অনেক মজা করতে, খুব গল্প করতে।

শিপ্রা হেসে উঠল, ওরে বাব্বা। আমাদের স্কুল খুব স্ট্রিক্ট ছিল। সন্ধের আগেই রুমে চলে আসতে হত। পড়াশুনো করতে হত। তবে কখনও কখনও সিস্টাররা আমরা সকলে একসঙ্গে মিলে বনফায়ার করতাম। ওয়ার্ড মেকিং, চাইনিজ হুইসপার খেলা হত। গান গাইতাম আমরা, কোরাস।

স্কুলজীবনের কথা বলতে বলতে সেইসব দিনগুলো যেন শিপ্রার চোখের সামনে টাটকা স্মৃতির মতো ভেসে উঠছে। শিপ্রার ভেতরে তখন বেজে চলেছিল ক্রিসমাস ক্যারলস-এর সুর। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকাল শিপ্রা। আকাশটা বোধহয় মেঘে ঢেকে আছে। একটাও তারা নেই। দুটো হাত আপনিই বুকের কাছে জড়ো হয়ে এল। একমনে ঈশ্বরকে ডেকে শিপ্রা মনে মনে বলতে থাকল, জিসাস, জীবনটা এত সুন্দর থাকে না কেন সবসময়?

ঠিক সেই সময়েই আকাশ থেকে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়তে থাকল শিপ্রার মুখে।

৫৭

স্থানীয় ছেলে দুটোকে নিয়ে পরের দিন বিকেল বিকেলই শিপ্রারা সদলবলে পৌঁছে গেল জটিঙ্গায়। সুশান্তর টেনশন ছিল ঘন কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, দক্ষিণী বাতাস—এগুলো একসঙ্গে পাওয়া যাবে কিনা। স্থানীয় ছেলে দু'জনই আশ্বস্ত করে বলল, এসময় এগুলো পাওয়া প্রায় নিশ্চিত ব্যাপার।

চারদিকের জঙ্গলের দিগন্তে কুয়াশার আভাস আগে থেকেই ছিল। সন্ধের অন্ধকারের সঙ্গে তা ক্রমশ গাঢ় হতে থাকল। মূল গ্রামের ঠিক বাইরে একটা খোলা জায়গাকে বেছে নিয়েছিল ওরা। তার এক দিকে বড় একটা গাছ। এদিক-ওদিক থেকে কাঠ কুড়িয়ে এনে ওরা জ্বালিয়ে নিল আগুন।

আগের দিনের হোটেলের লনের মতো বনফায়ারের মেজাজ কারও মধ্যেই এল না। সবার মধ্যে একটা চাপা টেনশন। পরিবেশটাই যেন ক্রমশ আরও গা-ছমছমে রহস্যময় হয়ে উঠছে। ঘড়ির কাঁটা এগোচ্ছিল। জটিঙ্গা গ্রামটার ভেতর তখন একটা-দুটো করে করে অনেকগুলো আগুনের হলকা শিখা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সোল্লাস চিৎকার। খুব ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে ক্যানেস্তারা পেটানোর আওয়াজ।

সুশান্ত চাপা উত্তেজনায় বলল, চলো, এবার গ্রামের দিকে এগোনো যাক।

স্থানীয় ছেলে দুটো বলল, আরও খানিকক্ষণ পরে।

ছেলে দুটো খুঁজেপেতে কয়েকটা ছোট নুড়ি জোগাড় করল। তারপর বড় গাছটাকে লক্ষ্য করে নুড়িগুলো ছুড়তে থাকল। কয়েকটা নুড়ি ছোড়ার পর অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল। স্যাঁতসেঁতে ঘন অন্ধকার ফুঁড়ে একটা পাখি উড়ে এসে ওদের বনফায়ারের আগুনটার ঠিক পাশে ধপ করে পড়ল।

শিপ্রা চিৎকার করে উঠল, সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও... ও আগুনে পুড়ে যাবে।

পাখিটা বেঁচে আছে কিন্তু অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে। নীলয় লাঠি দিয়ে পাখিটাকে আগুনের পাশ থেকে টেনে সরিয়ে নিয়ে আসার সময়ও পাখিটা উড়ে পালানোর চেষ্টা করল না। নীলয় পাখিটাকে হাতের তালুতে তুলে নিল। পাখিটার নরম তুলতুলে পেটটা উঠছে নামছে। নীলয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পাখিটাকে দেখে বলল, হুডেড পিট্টা।

পাখিটার চোখ দুটোর মধ্যে যে-ঘোরটা রয়েছে সেই ঘোরটা যেন লেগে গেল শিপ্রারও চোখে। অবিকল সেই এক দৃশ্য। বহু বছর আগে হরির ঝিলের পাশে মহেশদার হাতে যেরকম দেখেছিল একটা পাখি। সেদিন মহেশদাকে বলেছিল পাখিটার মুখে জল দিতে। মহেশদা দিয়েছিল কি? অস্ফুট স্বরে শিপ্রা বলল, ওকে জল দাও নীলয়।

অপর্ণা একদম চুপচাপ স্বভাবের মেয়ে। বোতলের থেকে হাতের আঁজলায় জল নিয়ে পাখিটার ঠোঁটের কাছে আনল। কিন্তু পাখিটা জল খাওয়ার কোনও আগ্রহ দেখাল না।

শিপ্রা এগিয়ে এল নীলয়ের কাছে। পরম মমতায় দুটো আঙুল ঠেকাল পাখিটার পিঠে। অদ্ভুত মসৃণ পিঠটা। শিপ্রা একদৃষ্টে চেয়ে থাকল পাখিটার চোখের দিকে।

একে নিয়ে এবার কী করবে?

ওরা সকলে এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। পাখিটাকে নিয়ে কী করবে কেউই ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না। সুশান্ত এগিয়ে এসে বলল, ওকে গাছের ডালের কাছে দিয়ে আয় নীলয়।

বহু প্রতীক্ষিত ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা চলে এল। পুলক আর জয়ন্ত চটপট বার করতে থাকল রেনকোটগুলো। স্থানীয় ছেলেগুলো তাড়া দিল, চলুন এবার গ্রামের মধ্যে যাই।

জটিঙ্গা গ্রামটার মধ্যে যেন উৎসবের রাত। জায়গায় জায়গায় বড় বড় গাছগুলোর কাছে জ্বলছে আগুন। কোথাও কোথাও গ্রামবাসীরা লম্বা লম্বা বাঁশ নিয়ে গাছের চারদিকে হেলাচ্ছে। অন্ধকার ফুঁড়ে পাখিরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে জ্বলতে থাকা আগুনের মধ্যে।

জটিঙ্গায় আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাখিদের এই আত্মহত্যার ঘটনা সুশান্ত ওদের অভিযানের প্রস্তাবনায় লিখেছিল। শিপ্রা বেশ কয়েকবার পড়েছে সেটা। কিন্তু দৃশ্যটা যে এত ভয়ংকর, এত অসহনীয় হতে পারে নিজের চোখে দেখার আগে সেটা বিশ্বাস করতে পারেনি। শরীরের ভেতর একটা যন্ত্রণা দলা পাকাচ্ছে। কোনওরকমে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করল, ওরা এভাবে নিজেদের মেরে ফেলছে কেন?

স্থানীয় ছেলেটি বলল, কেউ এর কারণ জানে না ম্যাডাম। এটা অভিশপ্ত জায়গা। অন্ধকার রাতে, ঘন কুয়াশা, হালকা হাওয়া আর বৃষ্টি থাকলে ওরা এভাবেই বছরের পর বছর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যায়। অদ্ভুত কী জানেন? এটা শুধু জটিঙ্গাতেই হয়। আশেপাশের কোনও গ্রামে আপনি এই ঘটনা দেখতে পাবেন না।

শিপ্রা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, আগুনেই যদি ওরা ঝাঁপ দেয়, তা হলে আগুন জ্বালানো হয় কেন? আগুন তো মানুষই জ্বালাচ্ছে।

ছেলেটা চোখ কপালে তুলে বলল, কী বলছেন ম্যাডাম! এটাই তো এখানে সবচেয়ে মজা, পাখি শিকারের খেলা।

পাখি শিকার?

হ্যাঁ, পাখি শিকার। এই পাখির মাংস খায় অনেকে।

শিপ্রা প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকল, অন্যায়, এটা ভীষণ অন্যায়।

ছেলেটা শিপ্রার যুক্তি বুঝল না, উলটে নিজের যুক্তি শোনাতে থাকল, ম্যাডাম আপনারা মাছ খান না? নদী, পুকুর থেকে মাছ ধরা হয় না? মুরগি খান না? মুরগিও তো এক রকমের পাখি। ছাগল...

সুশান্ত তাড়াতাড়ি তর্কটা বন্ধ করার জন্য বলল, দিদি, আসল ক্ষতিটা হচ্ছে বিরল প্রজাতির প্রচুর পাখি আত্মহত্যা করে মারা যাচ্ছে। তা ছাড়া কারণটাও খুব রহস্যময়। আমাদের কাজটা এটাই দিদি, এখানকার মানুষকে বোঝানো—বিপন্ন প্রজাতির পাখি কীভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এই মিস্ট্রিটা উদ্ঘাটন করারও আমরা একটা চেষ্টা চালাব। অভিশপ্ত জায়গা বলে কিছু হয় না। মানুষই নিজের সুবিধার দোহাই দিয়ে অভিশপ্ত বলে। আমরা এটা আটকাব। কাল সকাল থেকেই আমরা গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলব।

শিপ্রা ছটফট করছিল, আমি পারছি না সুশান্ত। এই দৃশ্য আমি দেখতে পারছি না। আমাকে হাফলং-এ নিয়ে চলো।

পরদিন সকালে হাফলং-এ এসে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলল শিপ্রা। সুশান্তকে ডেকে বলল, তোমরা তোমাদের কাজ কন্টিনিউ করো। আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি।

সুশান্ত খুব আশ্চর্য হল হঠাৎ করে শিপ্রার এই মত পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। বরং চিন্তিত হল শিপ্রার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে।

কী করে ফিরে যাবেন দিদি? টিকিট তো সব ফেরার একসঙ্গে কাটা আছে।

চিন্তা কোরো না। আমি গুয়াহাটি চলে যাচ্ছি। ওখান থেকে ফ্লাইটে কলকাতা ফিরে যাব।

আমরা কেউ যাব আপনার সঙ্গে?

না, দরকার নেই। তোমাদের প্রত্যেকের কাজটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। নিজের নিজের কাজটা মন দিয়ে করো তোমরা। আমার অনেক গুড উইশেস রইল তোমাদের সঙ্গে। আমার জন্য একদম চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক ফিরে যাব। তোমরা কলকাতায় ফিরে আমার কাছে এসো।

গুয়াহাটি থেকে ফ্লাইটে কলকাতা ফেরার সময় কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল শিপ্রা। হরির ঝিলটাকে সে আর অভিশপ্ত ভাববে না। এই কুসংস্কারটাকে আর প্রশ্রয় দেবে না। পারলে এই ছেলেমেয়েগুলোই পারবে। ওদের দিয়ে কাজ করাবে। তার আগে উকিল তরুণ ঘোষকে লাগিয়ে যত দ্রুত সম্ভব দু'একরের একচ্ছত্র অধিকারটা আবার ফিরিয়ে নিতে হবে। যেটাকে এক সময়ে পাখির গবেষণা কেন্দ্র করবে বলে দয়াল সান্যাল সেখানে নিজের কাজ করিয়েছিল, সেটাতে এবার সত্যিই পাখির কাজ

করা শুরু করবে। এতদিনে হ্যাম বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছে। এবার সেটাকে সত্যিই কাজে লাগবে। তবে কাজটা সহজ নয়।

৫৮

রবিবার সকালে তালতলা চার্চ থেকে বেরিয়ে রাস্তার উলটোদিকে রবার্ট দেখল দয়াল সান্যালের বিশাল গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। আন্দাজেই বুঝতে পারল কে দেখা করতে এসেছে। তবে অবাক লাগল এই কারণে যে, শ্যারন ইদানীংকালে ওর সঙ্গে দেখা করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অবশ্য নিজের দিক দিয়েও রবার্ট কোনও উদ্যোগই রাখেনি শ্যারনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। আচমকাই একদিন ব্যাঙ্কে দেখা হয়েছিল, তারপর কয়েকদিন ব্যারাকপুরে মাম্মির কাছে গিয়েছিল শ্যারন। তারপরই মাম্মি অজ্ঞাতবাসে চলে গেছে। সেও তো আজ বহু দিন হয়ে গেল। তবে সেই সময় শ্যারন যেভাবে উঠেপড়ে লেগে মাম্মির খোঁজখবর শুরু করেছিল, রবার্টের মাঝেমধ্যে একটা সন্দেহ হত গোটা ঘটনার পিছনে শ্যারনের কোনও ভূমিকা আছে কি না।

রাস্তাটা পেরিয়ে গাড়িটার কাছে এগিয়ে এল রবার্ট। পিছনে বসা শিপ্রাকে দেখে চমকে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার? শুকনো একটা চেহারা, চোখের তলায় কালি। মুখের শ্রীটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

রবার্ট দরজার কাছে দাঁড়াতে শিপ্রা নেমে এল গাড়ি থেকে। রবার্ট বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, তুই ভাল আছিস তো শ্যারন?

শিপ্রা ম্লান হেসে রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর সঙ্গে অনেকদিন পরে যখন ব্যাঙ্কে দেখা হয়েছিল, তুই আমাকে একটা কথা বলেছিলিস। সেটা আমার আজও মনে আছে। তুই বলেছিলি বড়লোকেরা কেমন থাকে তুই জিজ্ঞেস করিস না। বড়লোকেরা সবসময়ই ভাল থাকে।

বাজে কথা ছাড় শ্যারন, তুই ভাল নেই সেটা এখন জিজ্ঞেস না করলেও চলে। রবার্ট একটু অপরাধীর মতো বলল, শোন, ভাবছিলাম তোকে খবরটা দেব। আজ কাল করে যাওয়াই হচ্ছিল না। মাম্মির খবর পেয়েছি। ভাল আছে।

শিপ্রার চোখের কোনায় একটা চিকচিকানি দেখা দিল।

সত্যি? কোথায় আছে ক্যাথি আন্টি? কেমন আছে?

রবার্ট ঘাড় নাড়ল।

না রে, মাম্মি কোথায় আছে জানায়নি।

তা হলে?

আমার ছেলে জিমির জন্য একটা জামা পাঠিয়েছে। পার্সেলে।

সে কী? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল শিপ্রা, পার্সেলের সঙ্গে কোনও চিঠি দেয়নি? কোথায় আছে, কেমন আছে জানিয়ে।

রবার্ট আবার মাথা নাড়ল, না, আমাকে দেয়নি। দু'লাইন জিমিকে দিয়েছে, তাতে কোনও ঠিকানা লেখেনি। শুধু লিখেছে, ড্যাডিকে বলিস আমার জন্য চিন্তা না করতে। তোদের খুব দেখতে ইচ্ছে করে। জিসাস সেই ইচ্ছে নিশ্চয়ই একদিন পূর্ণ করবে।

তুই বুঝতে পারলি না কোথা থেকে পার্সেলটা এল?

পোস্টমার্ক দেখে বুঝতে পেরেছি, এলাহাবাদ থেকে।

শিপ্রা চিন্তা করতে থাকল।

এলাহাবাদে তোদের জানাশুনো কেউ থাকে?

রবার্ট হাসল, মাম্মির কার সঙ্গে জানাশোনা আছে, আমাকে কি সব বলেছে? তবে এটুকু বুঝতে পারছি মাম্মি ভালই আছে। মাম্মির আর নিজের জমানো টাকার সুদের দরকার হয় না।

শিপ্রা রবার্টের হাতটা ধরে বলল, প্লিজ আন্টিকে ফিরে আসতে বল কর্নেল সামন্তর বাড়িতে। ওখানে আন্টির কোনও অসুবিধা হবে না। আমার নাম করে বল।

রবার্ট শিপ্রার হাতের ওপর আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, সত্যি বলছি রে, মাম্মি কোনও ঠিকানা দেয়নি, দিলে কি আর আমি নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে আসতাম না? আর মাম্মি এভাবেই মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। স্পষ্ট লিখে দেয় পোস্টমার্ক দেখে যেন কোনও খোঁজ না করি। কারণ মাম্মি লোককে দিয়ে অন্য জায়গা থেকে পোস্ট করায়। তবে এখানে ফিরে এলে সামন্তর বাড়িতে মাম্মিকে থাকতে হবে না। আমার কাছেই থাকতে পারে। সুনীতা আর আমার সঙ্গে থাকে না।

মানে?

রবার্ট একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, সুনীতা চলে গেছে।

সে কী? কী হয়েছিল? শিপ্রা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল।

রবার্ট আবার ম্লান হাসল, সরি রে, আমি বোধহয় কথাটা ঠিকভাবে বলতে পারলাম না। চলে গেছে কথাটার অন্য মানেও হয়। তবে সেটা যদি হত আমি তাও জিমিকে কিছু একটা বলার মতো যুক্তি খুঁজে পেতাম। কিন্তু জিমি জানে ওর বাবা থেকেও ওর সঙ্গে থাকে না। মুশকিল কী জানিস? ছেলেটাকে মানুষ কবা।

শিপ্রা আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিছুই ঠিক হবে না শ্যারন! কারও কারও জীবনে কিছুই ঠিক হওয়ার নয়। যাক গে তখন থেকে আমার কথাই বলে যাচ্ছি। তোর কথা বল।

শিপ্রা গম্ভীর হল।

তোর সঙ্গে অনেক কথা ছিল রবার্ট।

রবার্ট এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, এখানে?

শিপ্রাও চারদিকটা তাকিয়ে বলল, না, এখানে অত কথা হবে না। কোথায় একটু বসা যায় বল তো?

রবার্ট একটু চিন্তা করে বলল, মনে আছে একবার ভিক্টোরিয়াতে গিয়ে বসেছিলাম। সেদিনও তুই কিছু বলতে এসেছিলি।

না রে, সেটা বোধহয় শীতকাল ছিল। এই রোদে ওখানে বসা যাবে না।

একটা জায়গা আছে, তোকে বলতে ভরসা পারছি না।

কোথায়?

আমার বাড়ি।

শিপ্রা একটু চিন্তা করল। তারপর গাড়ি থেকে নিজের হাতব্যাগটা নামিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে বলল, তুমি বাড়ি চলে যাও।

রবার্ট খুব অবাক হয়ে শিপ্রাকে বলল, গাড়িটা ছেড়ে দিলি কেন? আমি এখন জানবাজারের পিছনে একটা গলিতে থাকি। হেঁটে অনেকটা... মানে তোর পক্ষে...

কারণ আছে, তাই ছেড়ে দিলাম। তালতলা থেকে জানবাজার কোনও ডিসট্যান্সই নয়। তবু তুই একটা ট্যাক্সি ধর।

রবার্ট ঘাড় চুলকে বলল, ট্যাক্সির পক্ষে আবার ডিসট্যান্সটা খুবই কম।

তা হলে রিকশা নে।

রবার্ট গোমস এখন যে-বাড়িটায় থাকে সেখানে পুরোপুরি অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের বাস নয়। মিলেমিশে অনেক সম্প্রদায়ের লোকেরাই থাকছে, তবে পুরনো আমলের বাড়িটাতে ঠেসাঠেসি করে পরিবারের সংখ্যা অনেক। দেড়খানা ঘরের আধা ফ্ল্যাটের মতো রবার্টের বাসস্থানটা তিনতলায়।

দরজার তালাটা খুলতেই রবার্ট লজ্জা পেল। চরম অগোছালো ঘরটা। কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, সরি, জানিসই তো, চিরকালই আমি ইনডিসিপ্লিনড। এই ঘরটাই সুনীতা যখন ছিল অনেক গুছিয়ে রাখত।

এক দিকের দেওয়ালের ফ্রেমে একটা সাদাকালো ছবি টাঙানো আছে। ছবিতে রবার্টের সঙ্গে এক মহিলা ও ছোট্ট ছেলেটাকে চিনে নিল শিপ্রা—সুনীতা আর জিমি। জিমির ছবি আগেই দেখেছিল ব্যারাকপুরে ক্যাথি আন্টির কাছে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিতে বয়সটা আর একটু বেশি। মিষ্টি মুখটা মায়ের দিক থেকেই পেয়েছে। রবার্টের ঘরে একটাই কাঠের চেয়ার আছে। তার ওপর পুরনো খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা, খবরের কাগজের স্তূপটা মাটিতে নামিয়ে রবার্ট বলল, বস শ্যারন। কী খাবি বল।

শিপ্রা ফটোর কাচের ওপর পাতলা ধুলোর আস্তরণটা মুছতে মুছতে বলল, ব্যারাকপুরে আন্টির বাড়িতে সেই দুপুরগুলো খুব মনে পড়ছে। আন্টি জিমির জন্য একটা লাল সোয়েটার বুনত আর জিমির গল্প করত।

রবার্ট খাটের তলা থেকে একটা প্যাকেট বার করে বলল, এই দেখ মাম্মি জিমির জন্য কী পাঠিয়েছে। আসলে মাম্মি তো আর জানে না জিমি আর আমার কাছে থাকে না।

শিপ্রা প্যাকেটটার মধ্যে থেকে জামাটা বার করে দেখতে দেখতে বলল, তাতে কী

হয়েছে। তুই তো জানিস জিমি কোথায় থাকে। আন্টি পাঠিয়েছে, এত সুন্দর একটা জামা—তুই পৌঁছে দিবি।

রবার্ট চুপ করে গেল। সুনীতার শেষ দিকে শাশুড়ির প্রতি বিদ্বেষ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ছেলের জন্য উনি যেটা পাঠিয়েছেন সেটা দিতে গেলে হয়তো মুখের ওপর ছুড়ে দেবে। শ্রদ্ধা কোনও দিনও ছিল না। ক্রমশ একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল ক্যাথি গোমসের প্রচুর জমানো টাকা আছে। সেই টাকার একটা অংশ দিলে ওদের অসচ্ছলতা আর অনটনটা কমে। কিন্তু ছেলেকে এবং ছেলের বউকে নিজের কবজায় রাখার জন্য উনি সেটা দেন না। নতুন করে শিপ্রার কাছে এসব প্রসঙ্গ আর পাড়ল না রবার্ট, বরং আসল প্রসঙ্গে চলে এল।

তুই বলছিলি আমার সঙ্গে তোর কী দরকার আছে?

শিপ্রা ফটো ছেড়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা মাউথ অর্গান তুলে নিয়ে বলল, তুই এখনও এটা বাজাস রবার্ট?

রবার্ট শিপ্রার কাছে এগিয়ে এসে মাউথ অর্গানটা হাত থেকে নিয়ে তাতে দুটো ফুঁ দিয়ে সুর তুলে বলল, তোকে একটা সত্যি কথা বলব আজকে? তুই যে আমার মাউথ অর্গান শুনে মুগ্ধ হতিস, সেটা মার্থা আন্টির একদম পছন্দ হত না। বোধহয় ভাবত তোকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছি। যাক, তোর কাজের কথাটা বল।

শিপ্রা খানিকক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে থাকল। তারপর ব্যাগটা খুলে একটা ব্যাঙ্কের পাসবই বার করল।

একুশ তারিখ মায়ের জন্মদিন। মা বেঁচে থাকলে এবার ষাট বছর হত। আমার কয়েকটা ইচ্ছে আছে এবার মায়ের জন্মদিনে। তোর হেল্প চাই রবার্ট। তুই ছাড়া আর আমার কাজগুলো করে দেওয়ার কেউ নেই।

রবার্ট শিপ্রার কাঁধে হাত রেখে চেয়ারে বসিয়ে বলল, বল।

মায়ের আর যেটুকু টাকা অবশিষ্ট আছে দয়াল সান্যালের হাতে তা পড়ার আগে আমি চাই মায়ের ইচ্ছেমতো টাকাটা খরচ হয়ে যাক।

রবার্টের ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, একটু খুলে বল।

এক নম্বর, আমি ক্যাথি আন্টির জন্য ব্যারাকপুরে কর্নেল সামন্তর বাড়িটা কিনে দিতে চাই।

অসম্ভব। তুই নিজেই জানিস, কর্নেল সামন্ত ওই বাড়িটা কোনওদিন বিক্রি করবে না। আর যদি করেও, মাম্মির ফিরে আসার কোনও গ্যারান্টি নেই।

তবু তুই কর্নেল সামন্তকে চেকটা দিয়ে আয়।

রবার্ট দু'হাত ছাড়িয়ে বলল, তোর মাথা খারাপ হয়েছে শ্যারন। আমি সাধে বলি বড়লোকদের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে টাকা। বুঝলি শ্যারন তোর মতো আমারও অনেক টাকা থাকলে সুনীতা, জিমি আমাকে ছেড়ে চলে যেত না। আমি একটা সুন্দর ছবির মতো বাড়িতে থাকতাম। জীবনের সব স্বপ্নগুলোকে একটা একটা করে ছুঁতাম।

শিপ্রা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জীবনে চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে টাকার কোনও সম্পর্ক নেই রে রবার্ট।

রবার্ট ঘরের এক কোনা থেকে একটা মদের বোতল নিয়ে এল। ছিপিটা খুলে গলায় খানিকটা ঢেলে মুখটা মুছল। তারপর শিপ্রার দিকে আনমনা হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, ভাবছি, তোকে কী খেতে দেব। দুপুরবেলায় আমার বাড়িতে এলি, কী খেতে বলি তোকে!

তোকে বললাম তো ব্যস্ত হতে হবে না।

না, তুই এসেছিস। কিছু খেয়ে যাবি না হয় না। নিউ মার্কেটের কাছে বিরিয়ানির দোকানগুলো খোলা আছে। কী খাবি? বিরিয়ানি না রুটি মাংস?

কে আনবে?

কেন, আমি আনব? তুই বস, আমি পাঁচ মিনিটেই চলে আসব।

রবার্ট আর শিপ্রার কোনও আপত্তি শুনল না। শিপ্রাকে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে গেল। একা একা বাড়িটাতে কী করে সময় কাটাবে শিপ্রা ভেবে পেল না। একবার মনে হল রবার্টের অগোছালো ঘরটা একটু গুছিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিল—বন্ধুত্বের সম্পর্ক যাই হোক—এতটা অধিকার বোধহয় জন্মায়নি।

কারও অনুপস্থিতিতে কারও বাড়িতে কোনও জিনিসে হাত দেওয়া অস্বস্তিকর। শিপ্রা চারদিকে আলগোছে চোখ বুলিয়ে শেষপর্যন্ত একটা পুরনো ম্যাগাজিন পেল। তারই পাতা উলটেপালটে সময় কাটানোর চেষ্টা করতে থাকল।

রবার্ট কথামতো কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল। হাতে দড়ি দিয়ে বাঁধা বেশ কয়েকটা প্যাকেট আর ভাঁড়। মুখটা খুব খুশি খুশি। শিপ্রা রবার্টের হাতটা দেখে চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞেস করল, এত কী এনেছিস?

যা ইচ্ছে হয়েছে তাই। জানিস কত বছর পরে আজ একটা দুপুরে আমি আর একা একা খাব না। কারও সঙ্গে বসে খাব।

শিপ্রা একটা শুকনো হেসে বলল, আমিও।

রবার্ট খাটের ওপরে থালাতে বিরিয়ানি ঢালতে ঢালতে বলল, সরি, আমার কিন্তু কোনও খাবার টেবিল নেই। তুই তো অবস্থাটা দেখতেই পাচ্ছিস।

তোকে একটা কথা বলব রবার্ট। আমার মনে হয় তোর অবস্থা কিন্তু অতটা খারাপ নয় যেভাবে তুই দেখাচ্ছিস। আসলে তোর ভাল থাকার ইচ্ছেটাই নেই।

না নেই। কেন থাকবে বল তো? কীসের আর টান আছে আমার বাড়ি ফেরার। একটা সময় সারাক্ষণ সুনীতার সঙ্গে ঝগড়া হত এই বাড়িটায়। তখনও বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করত না... আর আজ এই খাঁ খাঁ ফাঁকা বাড়িটাতেও ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না।

কেন জিমি যখন থাকত, তখন জিমির জন্যও ফিরে আসতে ইচ্ছে করত না?

জিমি? জিমি তো সারাক্ষণ আমাদের ঝগড়ার মধ্যে কুঁকড়েই থাকত। ছেলেটা বাড়িতে আছে কি নেই বুঝতেই পারতাম না।

শিপ্রা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী ভীষণ একটা মিল জানিস তোর আর আমার জীবনে।

রবার্ট উঁচু স্বরে হেসে উঠে বলল, মিল? সব মিল থাকলেও একটাই বড় অমিল। সেটা হচ্ছে টাকা।

শিপ্রা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, টাকা? আমার যেটুকু টাকা আছে তোকে দিয়ে দিচ্ছি রবার্ট। তুই দেখ টাকা দিয়ে তুই জীবনের হারানো জিনিস কিছুই ফিরিয়ে আনতে পারবি না।

রবার্ট তর্কটা আর বাড়াল না। চুপ করে গিয়ে বলল, তুই খেয়ে নে শ্যারন। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিরিয়নি ঠান্ডা হয়ে গেলে খেতে ইচ্ছে করে না।

শিপ্রা থালাটার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় করল, তুই কি পাগল হয়েছিস রবার্ট! আমি এত খাব?

রবার্ট হাত দুটো জড়ো করে বলল, প্লিজ শ্যারন। কমিয়ে দিস না। খাওয়াটা এখনই শেষ হয়ে যাক আমি চাই না।

শিপ্রা রবার্টের মনটা পড়ে ফেলতে পারল। থালাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলল, ওয়েস্ট করা কিন্তু ভাল নয় রবার্ট। জানিস, পৃথিবীতে কত লোক খেতে পায় না! আমাকে একজন বলেছিল এই চালটা যারা চাষ করে তাদের ছেলেমেয়েরাই খেতে পায় না।

রবার্ট আবার মদের বোতলটার ছিপি খুলে গলায় খানিকটা মদ ঢেলে বলল, তোর মনটা বড্ড নরম রে শ্যারন। তোকে আমি জিজ্ঞেস করব না তোর বরের সঙ্গে কী প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু তুই যে অশান্তিতে আছিস সেটা ব্যাঙ্কে যেদিন প্রথম তোকে দেখলাম এতদিন পরে সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম।

শিপ্রা রবার্টের হাতের বোতলটার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই এখন ড্রিঙ্ক করছিস কেন? খেয়ে নে, এই তো বলছিলি একসঙ্গে খেতে চাস।

রবার্ট আবার বোতলে মুখটা ঠেকাল। আবার কয়েক ঢোক মদ খেয়ে ভাবুক গলায় বলল, অনেকদিন পরে আজ কী যে ভাল লাগছে শ্যারন তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। মনে হচ্ছে এখনও আমার জীবনে কেউ আছে।

শিপ্রা মিষ্টি করে হাসার চেষ্টা করল, নিশ্চয়ই আছে রবার্ট।

রবার্টের হঠাৎ মনে পড়ে গেল শিপ্রা কয়েকটা কাজের কথা বলতে এসেছিল। সেই প্রসঙ্গে গিয়ে বলল, দেখেছিস, আমরা দু'জনাই ভুলে যাচ্ছি। তুই আমাকে কয়েকটা কাজের কথা বলবি বলেছিলি। কর্নেল সামন্তর ব্যারাকপুরের বাড়ির কথাটা বলেছিস আর ..

তোকে আর কী বলব? তুই তো সিরিয়াসলি নিচ্ছিসই না।

রবার্ট হাতজোড় করে বলল, সরি। তুই বল আমি সিরিয়াসলি শুনছি। তুই খেতে খেতে বল।

শিপ্রা বিরিয়ানিটা অল্প নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, ভাবছিলাম একুশ তারিখটা যদি এবার অন্যভাবে পালন করতাম।

কীরকম, বল?

ব্রাদার ডি'সুজা এখন কার্শিয়াং-এ এসেছেন। মা ভীষণ পছন্দ করত ওঁর পিয়ানো, ওঁর প্রার্থনাসংগীত। ধর বিট্টু যদি সকালবেলাটায়, মানে মায়ের জন্মের সময়টা ব্রাদার

ডি'সুজার কাছে থাকত, ব্রাদার ডি'সুজা বিট্টুকে নিয়ে প্রার্থনা করত মায়ের জন্য, মায়ের আত্মা ভীষণ শান্তি পেত।

খুব ভাল আইডিয়া, তুই চলে যা কার্শিয়াং-এ।

সেখানেই একটা সমস্যা হয়েছে। ওই দিন আমি যেতে পারব না। কারণ ওই দিন ম্যাকার্থির বাংলো আর যেটুকু সম্পত্তি আমার আছে আমি কলকাতার একটা অর্গানাইজেশনের হাতে তুলে দেব। ফাউন্ডেশন করব।

রবার্ট অবাক হয়ে বলল, অতটা সম্পত্তি তুই কাদের দিবি?

কলকাতার একটা বার্ড লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে। ছেলেমেয়েগুলো হয়তো এখন বাচ্চা—কিন্তু আমি ওদের ডেডিকেশনটা দেখেছি। আমি ওদের নিয়ে অর্গানাইজেশনটাকে এই পুরো সম্পত্তিটা দিয়ে দিতে চাইছি যাতে হরির ঝিলের পাখি ফিরিয়ে আনার কাজটা ওরা করতে পারে।

রবার্ট দু'দিকে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে থাকল, তুই সত্যিই পাগল একটা। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে সামলাবে তোর সম্পত্তি। এটা কি পুতুল খেলা!

আমি বলছি তুই দেখে নিস ওরা ঠিক পারবে। তা ছাড়া আমি থাকব তো ওদের মাথার ওপর। ফাউন্ডেশনের কাজটা শুরু করব একুশ তারিখ।

তা হলে ব্রাদার ডি'সুজার কাছে বিট্টুকে কে নিয়ে যাবে?

সেই জন্যই তো তোর কাছে এসেছিলাম রবার্ট। এটা আমার হরির ঝিলে পাখিদের অধিকার রক্ষা করার শেষ চেষ্টা। তুই প্লিজ বিট্টুকে নিয়ে ওই দিন যা।

রবার্ট কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করল। তারপর শিপ্রার দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে।

রবার্টকে রাজি করানো যাবে কি না এ ব্যাপারে শিপ্রার মনে একটা সংশয় ছিল। কর্নেল সামন্তর বাড়ির ব্যাপারে তাও একটা ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিল, কিন্তু কার্শিয়াং-এ রবার্টের যাওয়ায় কোনও স্বার্থ নেই। তা ছাড়া শিপ্রা জানত রবার্টের একটা নিজের সংসার আছে। বউ আর ছেলে আছে। তাদের ছেড়ে শিপ্রার কথায় দিন কয়েকের জন্য কার্শিয়াং যাওয়ার অনেক অসুবিধেও থাকতে পারে।

রবার্টকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে আলতো করে মাথাটা রেখে শিপ্রা বলল, থ্যাঙ্ক ইউ রবার্ট। তোকে আর একটু কষ্ট দেব। মায়ের জমানো শেষ যে-টাকাটা আছে তার থেকে কয়েকটা চেক আরও দু'-একজনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৫৯

একুশ তারিখ সকালে শিপ্রার মনে হল জীবনের আজ একটা খুব পবিত্রতম দিন। শিপ্রা ভাবতে পারেনি আজকের দিনটা এত মসৃণভাবে আসবে। অনেক আশঙ্কা, অনেক অঙ্ক সব এলোমেলো হয়ে গেছে। হরির ঝিলে সুশান্তদের দিয়ে নতুন উদ্যমে যে-কাজটা

শুরু করবে ঠিক করেছিল, আশঙ্কা ছিল তাতে সবচেয়ে বড় বাধা হবে দয়াল সান্যাল। সেই বাধাটা কাটাতে, দরকার হলে, তরুণ ঘোষকে ধরে আইন-আদালত পর্যন্ত যাবে ঠিক করে রেখেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দয়াল সান্যাল কোনও বাধা তো দেনইনি, উলটে না চাইতেই পরের দিন জমি আর বাংলোর দলিলটা শিপ্রার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্য হলেও দয়াল সান্যালের এই ব্যবহারে শিপ্রা খুব সতর্ক হয়েছে। কিন্তু অনেক ভেবেও কূলকিনারা করতে পারেনি, দয়াল সান্যালের অভিসন্ধি বুঝতে। তবে আজ জীবনের পবিত্রতম দিনে শিপ্রা আর এ নিয়ে ভাবছে না। তার আগে আজকের দিনটা ঠিক যেভাবে ভেবেছিল উদ্‌যাপন করতে চায়, সেই চিন্তাতেই সে মশগুল হয়ে গেল।

শিপ্রা আলমারি খুলে মায়ের একটা প্রিয় শাড়ি বার করল, দু'হাতের আঁজলায় নিয়ে শাড়িটার মধ্যে নাক ডোবাল। এখনও যেন মায়ের গন্ধ পায় শাড়িটায়। মাঝে মাঝেই মনখারাপ হলে এই শাড়িটায় নাক ডুবিয়ে কাঁদে শিপ্রা। আজ কিন্তু চোখে আর জল এল না। মনটা ভরে গেল। যে-কাজটা আজ করতে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে মা যেন ঠিক পাশে আছে।

সাড়ে দশটায় তরুণ ঘোষকে বাড়িতে আসতে বলেছে। সুশান্তদের সংগঠনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তরুণ ঘোষ করে নিয়ে আসবে। একদম ভোরবেলা সুশান্তরা হরিতলায় চলে গেছে। তরুণ ঘোষ এলেই শিপ্রা বেরিয়ে পড়বে। তারপর নিউ মার্কেটে রাজু বণিককে তুলে নিয়ে হরির ঝিলে যাবে।

দয়াল সান্যাল রোজকার সময়ের মতো অফিস বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তরুণ ঘোষ এল। শিপ্রা দেখল তরুণ ঘোষের মুখটা কীরকম যেন শুকনো।

শিপ্রা ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন মিস্টার ঘোষ?

না। আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে তরুণ ঘোষ উত্তর দিল।

আপনার শরীর খারাপ নাকি?

আগের মতোই মাথা দোলাতে লাগল তরুণ ঘোষ। শিপ্রার এই প্রথম মনে হল, কিছু একটা খারাপ খবর আছে। জিজ্ঞাসু চোখে তরুণ ঘোষের দিকে তাকাল। তরুণ ঘোষের মুখটা মাটির দিকে নামানো। শিপ্রার দিকে মুখ না তুলেই বলল, সাংঘাতিক একটা গন্ডগোল হয়েছে মিসেস সান্যাল। এরকম যে হবে... ভাবিনি...

শিপ্রার ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল।

কীসের গন্ডগোলের কথা বলছেন আপনি?

তরুণ ঘোষ শিপ্রার দিকে মুখ তুলে চাইল। তরুণ ঘোষের কালো মুখটা দেখে শিপ্রার পায়ের তলায় মনে হল মাটিটা একটু নড়ে উঠল। এ যেন আবার একটা যুদ্ধ শুরুর সংকেত। দয়াল সান্যালের নিশ্চয়ই কোনও চাল। শিপ্রা বুক বাঁধার চেষ্টা করল।

কী হয়েছে?

খুব বাজে ব্যাপার মিসেস সান্যাল। মানে এরকম যে হয়ে যাবে...

শিপ্রা দম বন্ধ করে বলল, ঠিক কী হয়েছে বলুন তো মিস্টার ঘোষ?

তরুণ ঘোষ শুকনো গলায় ইতস্তত করে বলার চেষ্টা করল, ভোরবেলায় যে-ছেলেমেয়েরা গিয়েছিল, দে ওয়ার ব্রুটালি অ্যাটাকড...

শিপ্রা চমকে উঠে চিৎকার করে উঠল, মানে?

তরুণ ঘোষ বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে থাকল, ওরা ওই জায়গাটায় পৌঁছোনো মাত্রই স্থানীয় কিছু লোকজন ওদের ওপর চড়াও হয়েছে। লাঠিসোঁটা দিয়ে বিচ্ছিরিভাবে মেরেছে ওদের। মেয়েদের...

শিপ্রার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

মেয়েদের... কী?

খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার মিসেস সান্যাল।

শিপ্রা যন্ত্রণায় মুখ নীল করে কোনওরকমে বলল, মেয়েদের কী করেছে? রেপ?

না, রেপ নয়... তবে বাজেভাবে মলেস্ট করেছে। যাচ্ছেতাই। সেমন্তী বলে মেয়েটা...

শিপ্রা ছটফট করে দাঁড়িয়ে উঠল, চলুন, আমি এখনই যাব।

তরুণ ঘোষ শিপ্রাকে শান্ত করার চেষ্টা করল, এখন একদম যাওয়া যাবে না। প্রচণ্ড উত্তেজনা আছে ওখানে। ওসি-কে তো আমরা আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে নেমন্তন্ন করেছিলাম। আলাপ ছিল বলেই ফার্স্ট চান্সে খবরটা পেয়েছি। পুলিশ পিকেটিং দিয়েছে। ওদের ওখানকার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। লোকাল লোকেরা ওদের নামে অভিযোগ করে এফআইআর করেছে। ওখানকার থানা থেকেই তো আমাকে ফোন করেছিল। পরিস্থিতি ভীষণ ঘোরালো। বারবার সাবধান করে দিয়েছে, আপনি যাতে কোনওভাবেই ওখানে না যান। গেলে হয়তো পরিস্থিতি আরও ছেলেমেয়েগুলোর বিরুদ্ধে যাবে।

কী বলছেন? আমার একটা দায়িত্ব নেই? ওদের বাড়িতে জানে এসব ঘটনা?

বাড়িতে খবর তো দেওয়ার ব্যবস্থা করব। তবে মিসেস সান্যাল, গোটা ব্যাপারটা এই মুহূর্তে আমাদের হাতের বাইরে। আমাদের যা-কিছু করার চিন্তাভাবনা করে ঠান্ডা মাথায় করতে হবে...

চোখটা বন্ধ করল শিপ্রা। চোখের ওপর ভেসে উঠল সেমন্তীর নিষ্পাপ মুখটা। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে দিয়েও ভেতরের জ্বালাটা যেন কমছে না। বারবার অন্যর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে বাধ্য হচ্ছে। বিড়বিড় করে বলতে থাকল, কেন যে আবার বোকার মতো বিশ্বাস করলাম। ছিঃ... ছিঃ...। ক্ষমার অযোগ্য। আমার আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওকে জীবনের শিক্ষাটা এবার দেবই। দ্য আলটিমেট...

পেশাদার উকিল হিসেবে তরুণ ঘোষ জানে শিপ্রা কার কথা বলছে। ঘটনাটা শোনার পর থেকেই তরুণ ঘোষের কোনও সন্দেহ ছিল না এর পিছনে কার হাত আছে। তরুণ ঘোষের সঙ্গে দয়াল সান্যালের কখনও সাক্ষাত হয়নি। লোকটার চরিত্র সম্পর্কে যেটুকু জেনেছে তা শিপ্রা সান্যালের কাছ থেকেই। অনুপম ঘোষও একই কথা

বারবার বলেছে। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আইনি লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা অনেক। মানুষ অনেক নীচে নামতে পারে সম্পত্তির অধিকারের জন্য। বাবা-ছেলে, স্বামী-স্ত্রীর মতো সম্পর্কগুলো সেখানে ঠুনকো। এরকম অভিজ্ঞতা বারবার হয়েছে।

আপনি একটু সাবধানে থাকবেন মিসেস সান্যাল...

কী ভাবছেন মিস্টার ঘোষ? আমার জীবন বিপন্ন তাই তো! দয়াল সান্যাল আমাকে মেরে ফেলবে?

না, আমি তা মনে করছি না... সমস্ত খারাপ দিকগুলোই তো আমাদের মাথায় আগে আসে। সেই জায়গাটা থেকেই ডিফেন্স তৈরি করতে হয়।

শিপ্রা আবার শুকনো হাসল, ডিফেন্স! কোনও ডিফেন্সই যথেষ্ট নয় মিস্টার ঘোষ। আপনি কী ভাবছেন, আপনার অফিসে দিনের পর দিন গোপনে গিয়ে আমি আইনের যে-ব্যবস্থাটা করতে চেষ্টা করলাম, তার কোনও খবরই দয়াল সান্যাল রাখেনি? সব রেখেছে। চুপচাপ কেন আমাকে দলিলটা দিয়ে দেবে? সন্দেহ তো আমার হয়েছিল। বোকার মতো বুঝেও বোঝার চেষ্টা করলাম না। আমি ইমোশনে আবার এত বড় ভুলটা করলাম।

প্রশ্নটা তরুণ ঘোষেরও। তবে নিজের ভেতর প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে অন্যমনস্ক হওয়াকে এড়াতে শিপ্রার কথাগুলোই মন দিয়ে শুনতে থাকল।

আসলে এটা দয়াল সান্যালের একটা প্রিয় খেলা। এত বছর ধরে এই খেলাটাই দেখছি। ঘুড়ির সুতো লাটাই থেকে ছাড়তে দেয়। ঘুড়িটা যখন আকাশের অনেক ওপরে চলে যায় তখন সুতোটার রাশ এমনভাবে টানে যাতে ঘুড়িটা সোজা এসে মাটিতে গোঁত্তা খায়। আমাকে আর একবার ও মাটিতে আছড়ে ফেলল।

শিপ্রা আবার চুপ করে গেল। শিপ্রা অনেক কথাই তরুণ ঘোষকে বলেছে। তাই ঘুড়ির ইঙ্গিতের ঘটনাগুলো একটা একটা করে চিনে ফেলল তরুণ ঘোষ। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, মিসেস সান্যাল, কখনও ভেবে দেখেছেন কি, উনি কেন আপনার সঙ্গে এই খেলাটা খেললেন? অন্যভাবে নেবেন না—যে সাবধানে থাকার কথা, যে-খারাপ সম্ভাবনার কথা আমি বলছিলাম, সেটা কিন্তু আপনার হাজব্যান্ডের দিক থেকে নয়। কখনও কি ভেবে দেখেছেন উনি তো অনেক কিছু পারতেন—আপনাকে নকশাল প্রমাণ করে জেলে রেখে দিতে পারতেন। তারপর আপনার সম্পত্তিটা দখল করে যা-খুশি করতে পারতেন। কেউ বাধা দেওয়ার ছিল না।

শিপ্রা হাসল।

আপনি আসলে তো ওকে চেনেন না। তবে দয়াল সান্যালের দুর্বলতাটা জানি। পৃথিবীর যত বড় শয়তানই হোক না কেন, তার একটা না একটা দুর্বলতা থাকবেই।

কৌতূহল চাপতে না পেরে তরুণ ঘোষ জিজ্ঞেস করল, কীসের দুর্বলতা?

ধর্মের!

ধর্মের? অস্ফুট স্বরে বলে উঠল তরুণ ঘোষ।

কোনও মানুষের ধর্মের প্রতি দুর্বলতা থাকলে কখনও নিজের স্ত্রীর প্রতি দিনের পর

দিন এই অন্যায় করে যায়? এই ব্যাখ্যাটাও শিপ্রা নিজের মতো দিতে আরম্ভ করল, দয়াল সান্যালকে আমি এখনও সহ্য করে থাকি কেন জানেন? আপনারা হয়তো ভাববেন, আমার ছেলে আমার দুর্বলতা। অথবা আমার আর্থিক নিরাপত্তা আমার দুর্বলতা। হয়তো সেগুলো একটা কারণ। কিন্তু সেই দুর্বলতাটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারতাম। হয়তো এককালে সেটা নিয়ে আমি ভাবতাম। কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন আর ভাবি না, তার কারণ দয়াল সান্যাল একজন মানসিক রুগি। একটা রুগির সঙ্গে কী যুদ্ধ করব! তবে ধর্ম দিয়েই ওকে শিক্ষাটা এবার দেব। অনেক সহ্য করেছি। হি ডিজার্ভস আ লাইফটাইম পানিশমেন্ট। সেটা ওকে আমি দেবই।

শিপ্রার কথাগুলো, যুক্তিগুলো ক্রমশ অসংলগ্ন লাগতে আরম্ভ করল তরুণ ঘোষের। মনের মতো করে সাজিয়ে তোলা দিনটাকে ভেঙে একেবারে খানখান করে দিয়েছে দয়াল সান্যাল। তারপর ছেলেমেয়েগুলোর উপর এই সাংঘাতিক ঘটনা। এই ধাক্কাতে শিপ্রা তো অসংলগ্ন হবেই। তরুণ ঘোষ নিজেও জানে যে-প্যাঁচে গোটা ব্যাপারটা আছে এখন—আইন-আদালত করে তার জট ছাড়াতে বিস্তর সময় লাগবে।

তরুণ ঘোষ সুযোগ খুঁজছিল। বেলা বাড়ছে। হরিতলার থানায় যেতে হবে। ওসি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছে। এবার উঠে পড়তে হবে। আলোচনাটাও তাই চাইছিল শেষ হয়ে যাক। শিপ্রার জড়ানো অসংলগ্ন কথার মধ্যে সেই ফাঁকটাই খুঁজে পাচ্ছিল না। শিপ্রা নিজের মনে তখনও বলে চলেছে, আপনি তো আশ্চর্য হলেন মিস্টার ঘোষ! কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন না তো এই ধর্মের ভয়টা কীরকম?

খানিকটা আমি আন্দাজ করতে পারছি। যেমন ধরুন, উনি আপনাকে বিয়ে করার সময় আপনার ধর্মটা বদলে দিয়েছিলেন।

শিপ্রা আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, হয়তো তাই। এখন মনে হচ্ছে। আগে কখনও ভেবে দেখিনি। আচ্ছা আপনি বলুন তো যারা ধর্মকে ভয় পায়, তারা সবচেয়ে বেশি কাকে প্রথমে ভয় পায়?

তরুণ ঘোষ উসখুস করছিল। এবার সত্যিই দেরি হয়ে যাচ্ছে। শিপ্রাকে শুধু খবরটা দেওয়ার জন্য এসেছিল। এখন একটা অবাস্তব আলোচনায় জড়িয়ে পড়ছে। শিপ্রার প্রশ্নের উত্তরে বলল, ভগবানকে।

না। ভুল ধারণা আপনার। তারা ভয় পায় পাপকে। ভগবানের মধ্যে তারা সেই পাপের মুখটাকে দেখতে পায়। আমি দেখেছি জানেন—নিজের চোখে দেখেছি—একটা মা কালীর ছবি দেখে দয়াল সান্যাল কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল। শীতকালেও ঘেমে উঠেছিল।

তরুণ ঘোষ অহেতুক একবার নিজের ব্যাগটা খুলল বন্ধ করল। সোফার হাতল দুটো চেপে উঠে পড়ার ভঙ্গি করে বলল, আমার একটা অ্যাডভাইস শুনুন মিসেস সান্যাল। আপনি ভেঙে পড়বেন না। আপনার ইচ্ছে সফল হবেই। পথ যতই দুর্গম হোক, আইন যখন আপনার সঙ্গে আছে, আপনার ইচ্ছে সফল হবেই। আমি বলছি। আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনাকে যে অ্যাডভাইসের কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম।

আপনি কয়েকদিন চুপচাপ রেস্ট নিন। তারপর আবার সব নতুন করে ভাবা যাবে। যদি এখানে শান্তি না পান, কার্শিয়াং-এ ছেলের কাছে কয়েকদিন থেকে আসুন না। কয়েকটা দিন যেতে দিন, আবার সব নতুন করে শুরু করব আমরা।

৬০

হরিহর অনেকদিন পরে আবার সান্যাল বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়াল। বছরের পর বছর প্রাণপাত করেছে এ বাড়ির জন্য। তারপর হঠাৎ একদিন মালিকের মর্জিতে দুম করে চাকরিটা চলে গিয়েছিল। মালিক হঠাৎ করে কেন বয়সের দোহাই দিয়েছিল সেদিন বহু ভেবেও হরিহর প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পায়নি।

সেই চাকরি চলে যাওয়াটা মেমসাহেবও অসহায়ের মতো দেখেছিল। তবে নিজের ক্ষমতায় যথাসাধ্য করার চেষ্টা করেছিল। গোছ টাকা দিয়েছিল। এমনকী ব্যারাকপুরে মেমসাহেবের মায়ের বন্ধুর বাড়িতে একটা চাকরিও জুটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল উনি যতটা পারেন মাইনে দেবেন, বাকি টাকাটা মেমসাহেব গোপনে পূরণ করে দেবেন। কিন্তু হরিহরের কপালে তখন দুষ্ট গ্রহ ভর করেছিল। ব্যারাকপুরের ঠিকানায় গিয়ে দেখেছিল সেখানে তালা ঝুলছে। প্রথমে ভেবেছিল তিনি হয়তো কোথাও গেছেন। দু'দিন পর আবার গিয়েছিল। তারপর স্থানীয় জায়গায় খোঁজ করে দেখেছিল—ক্যাথি মেমসাহেব বাড়িতে তালা দিয়ে বহুদিন হল কোথায় যেন চলে গেছেন। কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারেনি।

হরিহর গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। মেমসাহেব কিন্তু হরিহরকে ভুলে যায়নি, অনিয়মিত হলেও মাঝেমধ্যে হরিহরকে মানিঅর্ডার করে কম-বেশি টাকা পাঠিয়েছে। প্রথমবার মানি অর্ডারের ল্যাজে মেমসাহেব লিখেছিলেন, 'তোমার ঠিকানাটা পেতে দেরি হল, তাই তোমাকে টাকা পাঠাতে দেরি হল। কিছু মনে কোরো না।' মনে করবে কী, হরিহরের খুব লজ্জা হয়েছিল। মানি অর্ডারের ল্যাজের একফালি তুলোটে কাগজটায় হরিহর শুধু কাঁপা হাতে সই করেছিল। কোনও উত্তর দিতে পারেনি। একবারই শুধু একটা চিঠি দিয়েছিল মেমসাহেবকে, মেয়ের বিয়ের কথা জানিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই মেমসাহেব দু'হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন। পিয়নের হাত থেকে টাকাগুলো গুনে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে মেমসাহেবকে প্রণাম করেছিল।

সেই মেমসাহেবের একটা নীল ইনল্যান্ড লেটার কয়েকদিন আগে পেয়ে হরিহর খুব অবাক হয়েছিল। ইনল্যান্ড লেটারে যতখানি জায়গা ধরে, তার মধ্যেই গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করেছে মেমসাহেব। লিখেছে, মেয়ের বিয়ে তো দিয়ে দিয়েছ, এবার আর শেষ বয়সে একা একা থাকবে কেন, আমাদের সঙ্গে চিরকাল ছিলে—আমাদের সঙ্গেই বাকি জীবনটা কাটাতে এসো।

চিঠিটার লাইনগুলো হেঁয়ালির মতো। যে-বাড়ি থেকে বয়সের কারণে চাকরি চলে

গেছে, সেই বাড়িতেই আবার সাত বছর বয়স বেড়ে যাওয়ার পর কী করে চাকরি হবে হরিহরের মাথায় ঢোকেনি। মেমসাহেবও হয়তো সেটা বুঝেছিল—তাই ওই ক'লাইনের হেঁয়ালির পরই খুলে বলেছিল আসল কথাটা।

আমার মায়ের স্বপ্নটা এবার বোধহয় সত্যিই বাস্তব হতে চলেছে। হরির ঝিলটার পাখি নিয়ে কিছু ছেলেমেয়ে কাজ করবে। ছেলেমেয়েগুলো হরিতলায় গেলে একটা থাকার জায়গা চাই। মহেশদার বাড়িটা এখনও পড়ে আছে। তুমি ওখানে কেয়ারটেকার হয়ে থাকো। বাড়িটা যেটুকু সারিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন—সেটুকু করিয়ে দেব। আর কিছুদিনের মধ্যেই ম্যাকার্থি সাহেবের বাংলোটার দেখাশোনার দায়িত্বও তোমাকে নিতে হবে।'

মেমসাহেব চিঠিতে তারিখটাও জানিয়েছিল। বাক্স গুছিয়ে তার আগেই চলে আসতে বলেছিল। সাতাত্তর বছর বয়সে নতুন করে আবার কাজের ডাক পেয়ে যুবক বয়সের মতো ধমনিতে রক্ত ছলকেছিল। সত্যিই তো। গিন্নি চলে যাওয়ার পর মেয়েটা দশভুজা হয়ে সংসারটা সামলাত। সেই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার পর এ সংসার আর সংসার কোথায়? চিঠিটা পাওয়ার পরের দিন থেকেই কলকাতা ফিরে যাওয়ার জন্য নতুন করে দিন গুনতে আরম্ভ করে দিয়েছিল হরিহর। আবার যেন নতুন করে জীবনটা শুরু হতে চলেছে। কলকাতায় একদিন আগে চলে এসে, এক পরিচিতর বাড়িতে এক রাত কাটিয়েছে। সাহেবের মুখোমুখি হওয়া এড়াতে, সাহেব অফিস বেরিয়ে যাওয়ার সময়টা হিসেব করে আরও আধঘণ্টা পরে সান্যালবাড়ির গেটের সামনে এল হরিহর।

বেঁটেখাটো চেহারার দারোয়ানটার নাম ছোট গোর্খা। নাম ছোট গোর্খা হলেও তার বয়সও নেহাত কম নয়। হরিহর বহুদিন তাকে কাজে দেখছে। অবশ্য বেঁটেখাটো চেহারা আর চুলে পাক ধরেনি বলে বয়সটা আন্দাজ করা যায় না। সেটাই হয়তো ছোট গোর্খার কাছে ভগবানের আশীর্বাদ। সাহেবের চোখে বয়সটা ধরা পড়েনি বলে আজও চাকরিটা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। তবে লোকটা চিরকালের মতো আজও ভাবলেশহীন। হরিহরকে দেখে উচ্ছ্বাসও দেখাল না, পথও আটকাল না।

তবে উচ্ছ্বাসটা আটকে রাখতে পারেনি মেমসাহেব। এতদিন পর হরিহরকে আসতে দেখে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই খুশি উপচে ফেলল, ওফ্ হরিহর, তুমি শেষ পর্যন্ত সত্যিই এলে, আমি ভাবছিলাম শেষ পর্যন্ত হয়তো আর আসবেই না।

হরিহর লজ্জা পেল। মুখ ফুটে বলতে পারল না, কী করে উপেক্ষা করবে মেমসাহেবের ডাক। জোড় হাতে নমস্কার জানিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, বিট্টুবাবা কি এখন ইস্কুলে মেমসাহেব?

মেমসাহেবের উপচানো খুশিতে যেন একটু বাঁধ এল। মুখটা ছোট হয়ে গেল। বাকি সিঁড়িগুলো ধীরপায়ে নেমে এসে বলল, বিট্টু এখন কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনো করে। ছুটিতে এলে দেখতে পাবে।

হরিহরের মনটাও ঝুপ করে খারাপ হয়ে গেল। এ বাড়িটা বিট্টুবাবা ছাড়া মানায় না। মেমসাহেবের তাড়া ছিল। দু'-একটা কথা বলেই হরিহরকে অপেক্ষা করতে বলে আবার উপরে উঠে গেল।

যে-বাড়িতে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে হরিহর, যে-বাড়িতে নিঃসংকোচে প্রতিটা ঘরে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ছিল হরিহরের, সেই বাড়িটাই কেমন অদ্ভুত অচেনা মনে হতে থাকল হরিহরের। পা দুটো যেন পাথর হয়ে গেছে। সদর দরজার একপাশে নিজের বাক্স-বিছানা নিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক সেই সময়ই দরজায় বেলের আওয়াজ হল। এই পুরনো চেনা ঘণ্টির আওয়াজটাই পা দুটোকে সচল করে দিল। আর কেউ এগিয়ে আসার আগে পুরনো অভ্যাসে খুট করে সদর দরজাটা খুলে দেখল দরজায় কালো কোট-প্যান্ট পরা একজন লোক পেটফোলা একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উকিলবাবুর মতো দেখতে লোকটা।

হরিহর এত বড় বাড়িতে অপেক্ষা করার মতো ঠিক একটা স্বস্তিজনক জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না। পুরনো দিনের চাকরবাকরদের অনেকেই নেই। তাদের জায়গায় নতুন মুখেরা এসেছে। আর পুরনো যারা রয়েছে, তারাও যেন এক বছরে ছোট গোর্খার স্বভাবটা পেয়েছে। কোনও উচ্ছ্বাস দেখাল না। বা উচ্ছ্বাস হলেও এ বাড়িতে উচ্ছ্বাস চেপে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। হরিহর বুঝতে পারল সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেবের সম্পর্কটার একটুও উন্নতি হয়নি। হরিহর যে এবাড়িতে আবার মেমসাহেবের ডাকে ফিরে এসেছে—তাতে খুশি হওয়াটা যেন তাদের গর্হিত অপরাধ। হরিহর ভাবল, মাত্র তো কিছুক্ষণ। কারণ সে নিজেই এ বাড়িতে ক্ষণিকের অতিথি। এ বাড়িতে থাকতে তো আসেনি। কারওই বিশেষ অস্বস্তির কারণ হবে না। মেমসাহেব তো চিঠিতে লিখেই দিয়েছে, এবার যেতে হবে হরিতলায়।

অপেক্ষা করতে করতে উকিলবাবুর সঙ্গে মেমসাহেবের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা কানে আসছিল হরিহরের। উকিলবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পরও মেমসাহেব থ-মেরে বসার ঘরে সোফায় বসে রইল। হরিহর ব্যাপারটায় ক্রমশই আশ্চর্য হচ্ছিল। মেমসাহেব আজকের দিনে বিশেষভাবে ডেকেছে। ইনল্যান্ড লেটারটা পড়ে হরিহরের মনে হয়েছিল, আজকেই বোধহয় মেমসাহেব হরিতলায় মহেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু বেলা বাড়তে যাচ্ছে তাতেও মেমসাহেবের কোনও তাড়া নেই। জড়তা কাটিয়ে হরিহর যখন আবার মেমসাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ভাবছিল, ঠিক তখনই হরিহর দেখল, মেমসাহেব ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দোতলা থেকে একটা ডাক ভেসে এল, হরিহর।

দোতলা থেকে ভেসে আসা ডাকটা অবিকল একই রকম আছে। স্বরটা উঁচু কিন্তু মোলায়েম। শরীর যখন পোক্ত ছিল এই ডাকের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই হুকুম শোনার জন্য ডাকের উৎসে গিয়ে হাজির হয়ে যেত। এখন ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে থাকল। চিরকালের মতো দরজার পরদার ঠিক বাইরে এসে দাঁড়াল।

পরদার তলায় হরিহরের পা দুটো লক্ষ করে শিপ্রা বলল, ভেতরে এসো হরিহর।

পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকল হরিহর। একটা পরিচিত ঘরকে সাত বছর পরে দেখছে। দেওয়ালের রংটা শুধু হালকা বেগুনি থেকে উজ্জ্বল হলুদ হয়েছে। বাকি ঘরটায় সমস্ত ধুলোবিহীন আসবাবপত্রগুলো একই রকম আছে। সাত বছর আগে যেখানে যেমন

ছিল, আজও ঠিক একই রকম আছে। তবে এই ঘরটার স্মৃতিতে আত্মবিস্মৃত হওয়ার সুযোগ পেল না হরিহর। অদ্ভুত একটা ক্লান্ত, হতাশ, বিষণ্ণ মুখ নিয়ে পড়ার টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে আছে মেমসাহেব।

শিপ্রা টেবিলের উপর থেকে একটা মাঝারি মাপের খয়েরি প্যাকেট আর একটা মুখ বন্ধ খাম নিয়ে হরিহরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তুমি এখানকার থানাটা চেনো?

বহুকাল তো এই পাড়াতেই কাটিয়েছে হরিহর। থানাটা অজানা নয়। তবে আশ্চর্য লাগল মেমসাহেবের পরের নির্দেশটায়। মেমসাহেব অবশ্য পরের নির্দেশটা দিয়ে দিল।

তুমি থানার ওসি-র সঙ্গে দেখা করে এই চিঠিটা দিয়ে দিয়ো। তার আগে একবার পোস্টঅফিসে গিয়ে এই প্যাকেটটা পার্সেল করে দাও। প্যাকেটটার উপরেই ঠিকানাটা লেখা আছে।

হরিহরের ভেতর বিস্ময় উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তবে সেই বিস্ময়টা চিরকালের অভ্যাসে গোপন করে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই মেমসাহেব বলে উঠল, দাঁড়াও। টাকা নিয়ে যাও।

শিপ্রা পড়ার টেবিলটার এক পাশের একটা ড্রয়ার খুলল। ড্রয়ারটার পিছন দিকে অনেকগুলো একশো টাকার নোট। পুরো গোছা টাকাটা বের করে হরিহরের হাতে দিয়ে বলল, এটা রাখো। পার্সেল করতে কত টাকা লাগবে জানি না।

হাতের মুঠোতে এতগুলো একশো টাকা নিয়ে হরিহর আর চুপ করে থাকতে পারল না। মুখ ঠেলে বেরিয়ে এল, এত টাকা কী হবে মেমসাহেব?

রাখো তোমার কাছে।

৬১

প্রীতম!

ব্যাডমিন্টন কোর্টে আচমকা পিছন থেকে ডাকটা শুনে উলটো দিক থেকে ভেসে আসা ফেদার কর্কের ফ্লাইটটা থেকে মনঃসংযোগটা হারিয়ে ফেলল বিট্টু। র‍্যাকেটটা শূন্যে হাওয়া কেটে পাক দিয়ে ফিরে এল। বিট্টু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পুলিং লামা। প্রিন্সিপাল ব্রাদারের খাস বেয়ারা।

প্রিন্সিপাল ব্রাদার ডাকছেন তোমাকে।

এবার অবাক হল বিট্টু। বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে আসছে। এসময় কখনও প্রিন্সিপাল ব্রাদার ডাকেন না। কার্শিয়াং-এর এই বোর্ডিং স্কুলে অনেক নিয়মকানুন আছে। বিট্টুর মাঝে মাঝে মনে হয় অনেকগুলো নিয়মই ওদের কলকাতার বাড়ির মতো। সব কিছু সময় মেপে মেপে করা। তার মধ্যে প্রিন্সিপাল ব্রাদারের এই অনিয়মের ডাকে বুকটা একটু ছ্যাঁৎ করেই উঠল।

সেপ্টেম্বরের কুড়ি তারিখ। বিকেল মুড়লেই অল্প অল্প শিরশিরে ঠান্ডা পড়ে। ব্যাডমিন্টন কোর্টের একধারে পুলওভারটা রাখা ছিল। কোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় র্যাকেটটা রাজর্ষিকে দিয়ে দিল বিট্টু। গেমটায় বারো-সাতে এগিয়ে ছিল। রাজর্ষি বারোতে শুরু করে নিশ্চয়ই রাকেশকে হারিয়ে দেবে।

পুলিং অপেক্ষা করছিল। বিট্টুকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত দেখেই সবুজ ঘাস পেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল, পিছন পিছন বিট্টুও। প্রিন্সিপাল ব্রাদার এই সময়ে কেন ডেকে পাঠালেন মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। পুলিংকে জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছে করছে খুব, তবে এই তিন বছরে এই বোর্ডিং স্কুলে থাকার অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে, পুলিং একটা কথাও বলবে না। হয়তো ও কারণটাই জানে না, না হয় জেনে থাকলেও বলবে না।

পুলিং কিন্তু স্কুল বিল্ডিং-এর দিকে গেল না। সবুজ লনটা পেরিয়ে মোরাম বেছানো সরু রাস্তাটা ধরল। এই রাস্তা ধরে এগোলে টিচারদের কোয়ার্টার আর একদম শেষে প্রিন্সিপাল ব্রাদারের বাংলো। তার মানে প্রিন্সিপাল ব্রাদার কি বাড়িতে বিট্টুকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

বিট্টু জানে এই প্রশ্নটার উত্তরও পুলিং-এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে না, গন্তব্য পর্যন্ত বিট্টুকে পৌঁছে দেওয়াই ওর একমাত্র কাজ।

বিরাট স্কুল বিল্ডিংটা এখানের প্রকৃতিটাকে অনেকটাই যেন আড়াল করে রাখে। একটা পরদার মতো। তবে বিল্ডিং-এর পিছনে এলেই কার্শিয়াং-এর প্রাকৃতিক দৃশ্য একেবারে দু'হাত মেলে ধরে। নেহাত মেঘ করে আছে। না হলে কাঞ্চনজঙ্ঘাও এই জায়গাটা থেকে সব থেকে ভাল দেখা যায়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে না পেলেও দূর থেকে প্রিন্সিপাল ব্রাদারকে দেখতে পেল বিট্টু। তবে আরও খানিকটা কাছে আসতে চিনতে পারল। প্রিন্সিপাল ব্রাদারের সামনে বসে আছে রবার্ট মামা। সম্পর্কে মাম্মির কীরকম এক ভাই হয়। কলকাতায় মাম্মি একবার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল রবার্ট মামা যেখানে কাজ করে, সেই জায়গায়।

বিট্টু আর একটু কাছে আসতেই প্রিন্সিপাল স্যার আর রবার্ট মামা, দু'জনারই চোখে পড়ল ও। বিট্টু তবুও রবার্ট মামাকে না দেখার ভান করল। প্রিন্সিপাল ব্রাদার ডেকে পাঠিয়েছেন। ডেকে পাঠানোর কারণটা এখন বুঝতে পারছে। কিন্তু দস্তুর হচ্ছে প্রিন্সিপাল ব্রাদারকে উইশ করে দাঁড়িয়ে থাকা।

স্মিত হেসে অভিবাদনটা ফেরত দিয়ে প্রিন্সিপাল জোসেফ অ্যান্ডারসন বিট্টুকে বললেন, ওয়েল প্রীতম। মিস্টার গোমস এসেছেন একটা স্পেশাল পারমিশন চাইতে। কাল তোমাকে উনি এক জায়গায় নিয়ে যেতে চান। তোমার মায়ের আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট। আমি তোমাকে এখনই বলছি না, কারণ মিস্টার গোমস সেরকমই চাইছেন, বাট ইউ নো দ্য রুলস অফ দ্য স্কুল। কিন্তু তোমার মা ওঁর হাত দিয়ে আমাকে যে-চিঠিটা পাঠিয়েছেন দ্যাট হ্যাভ টাচ্‌ড মাই হার্ট। সো আই গ্রান্ট আ পারমিশন ফর টু আওয়ার্স। টুমরো ফ্রম টেন টু টুয়েলভ। অ্যান্ড ইউ মাস্ট বি ব্যাক টু ইয়োর ক্লাস ইন দ্য আফটারনুন।

বিট্টু কিছু বলার আগেই রবার্ট উঠে দাঁড়িয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

স্মিত হাসলেন প্রিন্সিপাল অ্যান্ডারসন। বেতের সেন্টার টেবিলে এবার চোখ পড়ল বিট্টুর। কাঠের ট্রে-তে টি-পট, চায়ের কাপ-ডিশ, সুগার পটের পাশেই একটা হালকা নীল রঙের খামের ওপর চোখ পড়ল। খামের ওপর মুক্তোর মতো হাতের লেখাটা তার খুব চেনা। মাম্মির। খামটার ওপর কোনও ডাকটিকিট নেই। তার মানে খামটা রবার্ট মামা বয়ে নিয়ে এসেছে। তা হলে মাম্মি নিশ্চয়ই ওর জন্য কিছু জিনিস আর চিঠি পাঠিয়েছে রবার্ট মামার হাতে।

মাম্মির হাতের লেখা দেখে মুহূর্তের জন্য যে মনটা ভিজে গিয়েছিল, মাম্মি কিছু জিনিসপত্তর পাঠিয়েছে এটা ভেবেই মনের মধ্যে উত্তেজনাটা টের পেল বিট্টু। কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারের সামনে সেই উত্তেজনাটা চেপে রাখল। প্রিন্সিপাল ব্রাদার অবশ্য বেশিক্ষণ আর আটকে রাখলেন না বিট্টুকে। বরং বললেন, রবার্ট মামাকে স্কুল কম্পাউন্ডটা ঘুরিয়ে দেখাতে।

ছোট একটা কিটব্যাগ নিয়ে রবার্ট বেরিয়ে এল বিট্টুর সঙ্গে। প্রিন্সিপাল ব্রাদার নিজে বলে দিয়েছেন, রবার্ট মামাকে ঘুরিয়ে সব দেখানোর জন্য। তাই কোনও তাড়া নেই হস্টেলে ফিরে যাওয়ার। কালকে মাম্মি রবার্ট মামার সঙ্গে কোথায় যেতে স্পেশাল পারমিশন চেয়েছে প্রিন্সিপাল ব্রাদারের কাছ থেকে, সেই প্রশ্নটা হারিয়েই গেল বিট্টুর মন থেকে।

ঝুপঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকটা এখনও ঘন মেঘে ঢাকা। বিট্টু মনে মনে ঠিক করতে থাকল রবার্ট মামাকে কী কী দেখাবে। কোনখান থেকে শুরু করবে? আর তার মধ্যেই মনে ভেসে উঠল মুক্তোর মতো হাতের লেখায় হালকা নীল রঙের খামটার কথা।

মাম্মি আমাকে কোনও চিঠি দেয়নি?

বিট্টুর কাছ থেকে প্রশ্নটা শুনে একটু অস্বস্তিতে পড়ল রবার্ট। বিট্টু যে মায়ের কোনও চিঠি আশা করতে পারে এটাই এতক্ষণ মাথায় আসেনি রবার্টের। বিট্টুর মাথার চুলটা আলতো করে ঘেঁটে দিয়ে নরম করে অকপটে মিথ্যা কথা বলল, তোর মাম্মি তোকে বলার জন্য এত কথা বলেছে যে, চিঠি লিখতে গেলে একটা খাতা হয়ে যেত। তোকে সব বলব একটা একটা করে। তবে একসঙ্গে তাড়াহুড়ো করে বলতে গেলে সব গুলিয়ে যাবে। চল আগে তোর স্কুলটা ঘুরে ঘুরে দেখি।

হাঁটতে হাঁটতে রবার্টের কবজিটা মুঠো করে ধরল বিট্টু। পা ফেলায় এখন প্রজাপতির ছন্দ চলে এসেছে। রবার্টকে বলল, মাম্মিকেও একটা কথা বলে দিয়ো। আমার হস্টেলের কার্নিশে দুটো পাখি এসে বসে। আমার খুব পোষ মেনে গেছে। আমি জানলার ধারে বিস্কুট গুঁড়ো করে দিলে ওরা এসে খায়। আমি একদম কাছে এগিয়ে গেলেও ওরা ভয় পায় না।

রবার্ট মুখে একটা কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে হাঁটা থামিয়ে বিট্টুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, তাই?

হ্যাঁ। সত্যি বলছি।

কোথা থেকে এল পাখি দুটো?

জানি না। বোধহয় ওখান থেকে...

আঙুল তুলে কাঞ্চনজঙ্ঘার শেষ বিকেলের কমলা চূড়াটা দেখাল বিট্টু। দৃশ্যটা কীরকম একটা মনখারাপ করা। রবার্টের ভেতরটাও সন্ধের অন্ধকারের মতো একটা ভারী ঝাঁপ ফেলছে। দীর্ঘশ্বাসটা লুকিয়ে ফেলে নিজের সাইড ব্যাগটা খুলে একটা জকি ক্যাপ বের করে বিট্টুর মাথায় পরিয়ে বলল, দেখেছিস একদম ভুলে গিয়েছিলাম, তোর জন্য নিউ মার্কেটে এই টুপিটা কিনেছিলাম।

টুপিটা পেয়ে খুব খুশি হল বিট্টু। মাম্মি রবার্ট মামার সঙ্গে আরও কিছু পাঠিয়েছে কিনা টুপিটা পেয়ে সেই গোপন প্রশ্নটা মনের মধ্যে রেখে দিল সে। রবার্ট দেখতে থাকল স্কুল কম্পাউন্ডটা।

হাঁটতে হাঁটতে রবার্ট একদম বিট্টুর হস্টেলের সামনে চলে এল। বিট্টুকে বিদায় জানানোর আগে বলল, কাল একদম সকাল সকাল উঠে রেডি হয়ে নিবি। আমরা তাড়াতাড়ি বেরোব। তা হলে যেখানে যাব, অনেকক্ষণ থাকতে পারব।

কোথায় যাব কালকে?

চল না দেখবি। সারপ্রাইজ। তোর মা তোকে আগে বলতে বারণ করেছে।

সেদিন সারারাত উত্তেজনায় ঘুম হল না বিট্টুর। রাতটা যেন আর কাটতেই চাইছে না। ঘরে আরও তিনজন রুমমেট অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তবু যেন বিট্টুর দু'চোখের পাতা এক হচ্ছে না।

সকালবেলায় একদম তাড়াতাড়ি ডাইনিং হলে চলে এল বিট্টু। সবার আগে। প্রায় গোগ্রাসে ব্রেকফাস্ট শেষ করে ফেলল। উত্তেজনাটা সারা শরীরে এখন ছড়িয়ে আছে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম না আসার ক্লান্তির রেশটা শরীরে নেই। আজ সকালটা প্রিন্সিপাল ব্রাদার ছুটি দিয়ে রেখেছেন। তাই স্কুল ইউনিফর্মও পরেনি বিট্টু। নিজের সবচেয়ে প্রিয় তুঁতে রঙের জামাটা পরে অধীর আগ্রহে সামনের দিকে চেয়ে আছে, কখন রবার্ট মামা আসবে।

রবার্ট দেরি করেনি। একদম সময়মতো ওয়েটিং লাউঞ্জে চলে এল। একটা জিপ ভাড়া করে এসেছিল। তারপর সেই জিপে করেই বিট্টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বিট্টুর পরিচিত রাস্তায় জিপটা পাহাড়কে পাকদণ্ডী কেটে উঠছিল। বিট্টুর উত্তেজনার পারদটা আরও চড়ে যাচ্ছিল। গাড়িটা দার্জিলিং-এর দিকে যাচ্ছে। তা হলে হয়তো এমনও হতে পারে মাম্মি দার্জিলিং-এ এসেছে। রবার্ট মামাকে পাঠিয়েছে ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চোখমুখ ঝলমল করে উঠে রবার্ট মামাকে জিজ্ঞেস করে ফেলল বিট্টু।

আমরা কি দার্জিলিং যাচ্ছি?

না ডিয়ার, আমরা কাছেই একটা জায়গায় যাচ্ছি। তোর মা আজ সকালে যেখানে নিয়ে যেতে বলেছে। আর দার্জিলিং যাওয়ার সময় হবে না বুঝলি। পরের বার যাব। তারপর তোর প্রিন্সিপাল তো মোটে সকালটা ছুটি দিয়েছেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই একটা পাহাড়ি বস্তি মতো জায়গায় এসে জিপ থেকে নামল ওরা।

বস্তিটায় ঢোকার মুখে অনেকগুলো বৌদ্ধদের পতাকা। লোকজনদের মধ্যে অনেক মাথার চুল কামানো, গাঢ় রঙের মেরুন পোশাকের বৌদ্ধও চোখে পড়ল। বস্তিটায় অনেক লোকজন থাকলেও সেরকম ঘিঞ্জি নয়। হেঁটে বস্তিটার ভেতর বেশ খানিকটা ঢুকে একটা বাড়ির সামনে এসে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ল রবার্ট।

এক পক্ককেশ বৃদ্ধ এসে দরজা খুলে বাইরে রবার্ট আর বিট্টুকে দেখে একগাল অমায়িক হাসি হাসলেন। বিট্টু বৃদ্ধকে দেখেই চিনতে পারল। ব্রাদার ডি'সুজা। স্কুলে একবার প্রিন্সিপাল ব্রাদার ডেকে দেখিয়েছিলেন ব্রাদার ডি'সুজাকে। তা ছাড়া মাম্মির কাছে কত গল্প শুনেছে ব্রাদার ডি'সুজার। বিট্টু জানে, উনি এখন এখানে থাকেন না। মাঝে মাঝে আসেন।

বিট্টুর গালটা টিপে ডি'সুজা বললেন, তুমি আরও মায়ের মতো দেখতে হয়ে গেছ। জানো তোমার মাকে আমি তোমার মতো বয়স থেকেই দেখেছি। শ্যারন ওই বয়সে তোমার মতোই দেখতে ছিল। জানো তো আমি তোমার মায়ের মাস্টারমশাই ছিলাম।

শিপ্রা যে-সংস্কারটা বিট্টুকে শিখিয়েছে সেই অভ্যাসে ব্রাদার ডি'সুজার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল বিট্টু। ব্রাদার ডি'সুজা প্রণামটা নিলেন এবং সস্নেহে বললেন, গড ব্লেস ইউ মাই সন।

ব্রাদার ডি'সুজা তারপর বিট্টুর দু'কাঁধে হাত রেখে বললেন, কোন ক্লাস এখন তোমার?

ক্লাস ফাইভ।

দাঁড়াও তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। কাল যখন রবার্ট এসে বলে গেল তুমি আজকে আসবে, তখন থেকেই খুঁজছি। শেষ পর্যন্ত আজ সকালে খুঁজে পেয়েছি।

ঘরের এক দিকের দেওয়ালে একটা মেহগনি কাঠের বাহারি চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। তার একটা ড্রয়ার খুলে ব্রাদার ডি'সুজা একটা ছোট খামের মধ্যে থেকে একগোছা ছবি বার করলেন। তার মধ্যে থেকে একটা ছবি বেছে নিয়ে বিট্টুর হাতে দিলেন।

সাদাকালো একটা ছবি। অনেক দিনের পুরনো। কিছুটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। তবে ছবিটা দেখে বিট্টুর বুকের ভেতরটা কীরকম একটা হয়ে গেল। প্রথম ঝলকেই চিনে ফেলতে পেরেছে মাম্মিকে। অনেক ছোট তখন মাম্মি। এখন বিট্টুর যা বয়স তার চেয়ে কয়েক বছরের বড় হয়তো হবে। ফ্রক পরা, পাশে দিদিমা। আর পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। বেশ অনেকক্ষণ ছবিটা দেখে বিট্টু ফেরত দিল ছবিটা। মাম্মির ছোটবেলার একটা অ্যালবাম আছে। তাতে মাম্মির, দিদিমার বিভিন্ন বয়সের ছবি আছে। কিন্তু এই ছবিটা কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না বিট্টুর। মনে মনে বিট্টু ভাবছিল ব্রাদার ডি'সুজা যদি ছবিটা দিয়ে দেন, কলকাতায় গিয়ে মাম্মিকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।

ব্রাদার ডি'সুজা ছবিটা আবার খামবন্দি করে ড্রয়ারে রেখে ভেতরের ঘরে গেলেন এবং একটু পরেই একটা প্লেটে কিছু কুকিজ নিয়ে এসে টেবিলে রেখে বললেন, তোমার মা আমার কাছে কী কী শিখেছে জানো? ফিজিক্স, পিয়ানো, অর্কিড আর রান্না।

আর হ্যাম রেডিয়ো। মাম্মি দেখিয়েছে আমাকে।

ব্রাদার ডি'সুজা চোখ গোল গোল করে বললেন, রাইট ইউ আর। বাট ইউ টেল মি ওয়ান থিং। আজকের দিনটা তোমার মায়ের জন্য কেন স্পেশাল, তুমি জানো কি?

দু'দিকে মাথা নাড়ল বিট্টু।

আজ তোমার মাম্মির মায়ের জন্মদিন। তোমার মা তাই আজকে একটা খুব ভাল কাজ করতে যাচ্ছে। আমরা সবাই মিলে গান গেয়ে প্রেয়ার করব।

বিট্টু একটু লজ্জা পেল। সত্যি তো আজ একুশে সেপ্টেম্বর। দিদিমার জন্মদিন। একদম ভুলে গিয়েছিল।

জানো তো তোমার মা যখন এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, আমি এখানে থাকলে একবার করে ঘুরে যায়। কতবার বলেছি একবার তোমাকে নিয়ে আসতে। তা আর ওর হয়ে ওঠেনি। এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছে—আমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছি। কোনওদিন ওপরে চলে যাব। তাই হয়তো তোমাকে পাঠিয়েছে।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল রবার্ট, এবার বলে উঠল, এসব কী বলছেন ব্রাদার। প্রভু যিশু আপনাকে সুস্থ শরীরে শতায়ু করুন। আসলে...

এবার একবার বিট্টুর দিকে তাকিয়ে একটু থেমে আবার বলল, বিট্টু তো এখন বড়ই হয়ে গেছে। ওর সামনেই বলা যায়। শ্যারন এখন খুব খেয়ালি হয়ে গেছে। কী যে ওর কখন খেয়াল চাপে ও-ই জানে। আর আপনার মনে আছে ব্রাদার সেই হরির ঝিল...

ব্রাদার ডি'সুজা স্মিত হাসলেন।

ওর মনটা বোঝার চেষ্টা করুন। ভীষণ নিষ্পাপ আর পবিত্র। ও চিঠিতে আমাকে সব লিখেছে। গড ব্লেস হার।

হরির ঝিল। বিদ্যুতের কয়েকটা ঝলক যেন শরীরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল বিট্টুর, কতদিন আগে ছোটবেলার কথা। কিন্তু সেই রাতটা এখনও ভোলেনি। শুকনো পাতার ওপর ঝটপট মটমট আওয়াজ। নিঝুম রাতে কটন মিলের সাইরেন। হারিকেনের নিভু নিভু আলোয় মায়ের সঙ্গে কয়েকটা লোক। তারপর... তারপর... বাবার চিৎকার...

চোখটা কুঁচকে বন্ধ করল বিট্টু। শিরা-উপশিরায় মুখে ছড়িয়ে দিল ভয় পাওয়ার চিহ্নগুলো।

রবার্ট কিছু বলতে যাচ্ছিল। ইশারায় রবার্টকে চুপ করতে বলে বিট্টুকে বুকে টেনে নিয়ে ব্রাদার ডি'সুজা বললেন, চলো আমরা ভেতরের ঘরে যাই। তোমাকে শোনাই কী সুন্দর সুন্দর ক্যারলস তোমার মায়ের পছন্দ ছিল।

রবার্ট আর বিট্টুকে নিয়ে ভেতরের ঘরে এলেন ব্রাদার ডি'সুজা। ঘরটা ছোট, তার অনেকটা জুড়েই রয়েছে একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো। আর এক দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটা তক্তপোশ। এ ছাড়া একটা ছোট টুল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। পিয়ানোটা যে-দেওয়ালের দিকে আছে সেখানে দুটো বন্ধ জানলা। তার মাঝের জায়গাটায় একটা প্লাস্টার অফ প্যারিসের বড় ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি।

ব্রাদার ডি'সুজা জানলা দুটো খুলে দিলেন। রবার্ট আর বিট্টু আশ্চর্য হয়ে দেখল যে-বস্তির মধ্যে দিয়ে তারা এই বাড়িতে এল, জানলার বাইরের দৃশ্যে তার চিহ্নমাত্র

নেই। তার জায়গায় মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ চা-বাগান। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। তবে আকাশ এখন মেঘমুক্ত ঝলমলে নয়। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘাও সেরকম স্পষ্ট নয়। তবে জানলার পাল্লা দুটো খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভেজা ভেজা কোমল স্নিগ্ধ গন্ধে ভরে গেল ঘরটা।

ব্রাদার ডি'সুজা টুলটা টেনে নিয়ে পিয়ানোর সামনে বসলেন। তারপর বুকে একটা ক্রশ আঁকলেন। পিয়ানোর সাদাকালো চাবিগুলোর ওপর এলোমেলো করে আঙুল বোলালেন। তাতেই একটা অপূর্ব গমগমে সুরতরঙ্গে ভরে উঠল ঘরটা। তারপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে একটু চুপ করে থেকে আবার বিট্টুর দিকে ঘুরে বললেন, আমি যখন তোমার মায়ের স্কুলে ফিজিক্স পড়াতাম, তখন এক-এক দিন ফিজিক্সের বাইরেও ফিজিক্সের কথা বলতাম। আমার আজও মনে হয় আমি যত ছাত্রছাত্রীদের সেসব কথা বলেছি তার মধ্যে তোমার মায়ের মতো এত মনোযোগী ছাত্রী খুব কমই পেয়েছি। এতদিন পরে তোমাকে দেখে এত তোমার মায়ের কথা মনে হচ্ছে, খুব ইচ্ছে করছে তোমাকেও সেসব বলি। জানি না এসবের কতটা তুমি এখন এই বয়সে বুঝতে পারবে।

আবার ঘুরে গিয়ে পিয়ানোতে টুংটাং আওয়াজ তুললেন বৃদ্ধ। এবার যেন সুরটা আর একটু জমাট বাঁধছে। সেই সুরের সঙ্গেই বলতে আরম্ভ করলেন, এই যে এটা শুনছ এটা শব্দ, সাউন্ড।

ব্রাদার ডি'সুজা এবার পিয়ানোর প্রান্তিক দুটো চাবি বাজাতে বাজাতে বললেন, এর একটা চড়া আর একটা খাদ। মানুষ এই শব্দটা শুনতে পায়। একে ফিজিক্সে বলে অডিয়েবল। কিন্তু এর বাইরেও শব্দ আছে। যেটা মানুষ শুনতে পায় না। ফিজিক্সে বলে সুপার সনিক আর সাব সনিক। শুধু শব্দ কেন, মানুষ সব কিছু দেখতে পায় কি? রামধনুর সাতটা রং আছে। ভায়োলেট থেকে রেড। কিন্তু তার ওপর নীচের রংগুলো— আলট্রা ভায়োলেট বা ইনফ্রা রেড। মানুষের দেখা, শোনা, অনুভব করা, স্বাদ নেওয়া সবই একটা লিমিটেশনের মধ্যে আছে। অথচ এর বাইরেও যে সত্যিগুলো আছে মানুষ সেগুলো ধরতে পারে না।

বিট্টু কিছুটা কিছুটা বুঝতে পারছে। কিন্তু অনেকটাই নয়। মাঝে মাঝে রবার্টের দিকে তাকাচ্ছে। রবার্ট প্রায় সম্মোহিতের মতো শুনছে। ব্রাদার ডি'সুজা আপন মনে বলে চলেছেন, মন, মনই হল আসল। চোখ যা দেখতে পায় না, মন তাই দেখতে পায়। কান যা শুনতে পায় না, মন তাই শুনতে পায়। মন অনুভব করতে পারে সব কিছু। তোমার মা এই মনটাকে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। তুমি সেটাই চেষ্টা করো। জানলা দিয়ে সোজা মেঘে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকাও। তারপর চোখ বন্ধ করো। বন্ধ চোখে আবার কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখো। দেখবে মেঘটা কেটে গেছে।

অপূর্ব এক সংগীতের মূর্ছনা গোটা ঘরটা স্বর্গীয় করে ফেলেছে। বিট্টু খোলা জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে চোখটা বন্ধ করল। আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মেঘটা কেটে যাচ্ছে। ঝকঝকে পরিষ্কার। হিমেল একটা হাওয়া লাগছে মুখে। পিয়ানোর সুরের সঙ্গে শুনতে পাচ্ছে অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির। এটাই কি সেই অনুভূতি, যেটা

ব্রাদার ডি'সুজা বলছিলেন? বড় একটা শ্বাস নিল বিট্টু। আশ্চর্য মাম্মির গায়ের গন্ধও পাচ্ছে। মাম্মিকে আঁকড়িয়ে বুকে মাথা দিয়ে শুতে ইচ্ছে করছে। আর মনে হচ্ছে মাম্মি এই পিয়ানোর সুরটার সঙ্গে গুনগুন করে গেয়ে চলেছে, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

বিট্টুর মনেই হচ্ছে না ও এখন চোখ বন্ধ করে আছে। তবে মাম্মির জন্য নিশ্বাস ভারী হচ্ছে। তারপর একসময় হঠাৎই মনে হল হস্টেলেব কার্নিশে থাকা দুটো পাখি অদ্ভুত একটা শিস দিতে দিতে চোখের সামনে দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে উড়ে চলে গেল। চোখটা পট করে খুলে গেল বিট্টুর। আর তখনই দেখল ব্রাদার ডি'সুজা অসম্ভব সুরেলা গলায় গেয়ে উঠলেন—হোয়্যার চিল্ড্রেন আর পিয়োর অ্যান্ড হ্যাপি/ প্রে টু দ্য ব্লেসড চাইল্ড...

এটা শ্যারনের খুব প্রিয় গান ছিল। আমার কাছে এসো মাঝে মাঝে। তোমাকে তোমার মায়ের সব প্রিয় গানগুলো শিখিয়ে দেব।

বিট্টুর এবার মনে মনে হাসি পেল। সে কী করে ডি'সুজা ব্রাদারের কাছে মাঝে মাঝে চলে আসবে? বোর্ডিং স্কুল থেকে তো ওদের একা একা বেরোতেই দেয় না।

সেদিন অনেকগুলো গান শুনিয়েছিলেন ব্রাদার ডি'সুজা। একটা সময়ের পর রবার্ট বারবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দোটানায় পড়েছে। প্রিন্সিপালকে কথা দেওয়া আছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিট্টুকে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে যাবে। অথচ ব্রাদার ডি'সুজা শ্যারনের ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে একটার পর একটা পিয়ানো বাজিয়ে গান শুনিয়ে যাচ্ছেন। আর শ্যারন নিজেও তো ঠিক এটাই চেয়েছিল। রবার্টকে তো এ জন্যই পাঠিয়েছে। আজকের সকালে, ঠিক আজকের সকালটাতেই যাতে ব্রাদার ডি'সুজা বিট্টুকে অনেক অনেক গান শোনান।

ফেরার রাস্তায় একদম চুপ করে থাকল বিট্টু। যাওয়ার সময় চোখেমুখে যে-খুশি, উত্তেজনা ছিল, এখন তার লেশমাত্র নেই। সে জায়গায় বড় বিষণ্ণ করুণ একটা দৃষ্টি বিট্টুর চোখে।

৬২

হরিহর ইংরেজি জানে না। তাই প্যাকেটটার ওপর ঠিকানাটা দেখে বুঝতে পারেনি পার্সেলটার গন্তব্য কোথায়। পোস্ট অফিসের বুকিং ক্লার্কের কাছে যেটুকু জানতে পারল—পৌনে তিন কিলো ওজনের প্যাকেটটার গন্তব্য কার্শিয়াং।

মনে মনে হিসেবটা মিলিয়ে ফেলল হরিহর। তার মানে বিট্টু সাহেবের জিনিস যাচ্ছে পার্সেলটায়। ভেতর ভেতর একটা কষ্ট হল হরিহরের। মায়ের মন। এভাবেই হয়তো পোস্ট অফিসের সিলমোহর মেরে স্নেহকে পাঠাতে চায়।

পোস্ট অফিসের কাজ সেরে থানায় এল হরিহর। হরিহর সেই বিপুল জনগোষ্ঠীর

মধ্যে পড়ে, যাদের কোনও অন্যায় না করেও থানার চৌহদ্দিতে এলে বুক ধুকপুক করে। মেমসাহেব বলে দিয়েছে, থানার ওসির সঙ্গে দেখা করে খামটা দিতে। কিন্তু থানায় ওসির কাছ পর্যন্ত পৌঁছোনো অত সহজ নয় হরিহরদের মতো মানুষের পক্ষে। একশো ঘাটে হাজার বাহানা শুনিয়ে ওসির ঘরে পৌঁছোনো যায়। সামান্য একজন পত্রবাহক হয়ে ধুকপুকে বুকে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে থাকল হরিহর।

প্রথম হোঁচটেই হয়তো বিদেয় হয়ে যেত হরিহর, সেটা হয়নি চিঠির প্রেরক শিপ্রা সান্যাল হওয়াতে। দয়াল সান্যাল এ অঞ্চলে শুধু গণ্যমান্য ব্যক্তি নন, লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগটাও স্থানীয় থানার অজানা নয়। হরিহরকে দাঁড় করিয়ে রেখে তাই শেষপর্যন্ত ওসি চিঠিটা খুললেন। ছোট্ট কয়েকটা লাইনের চিঠি। কিন্তু ওই কয়েকটা লাইন পড়েই চমকে উঠলেন। হরিহরের দিকে তাকিয়ে বললেন, কখন হয়েছে?

প্রশ্নটার মানে বুঝতে না পেরে হরিহর বলল, আমি স্যার কালকে কলকাতায় এসেছি। রাতে এক বন্ধুর বাড়ি...

ওসি ধমকে উঠলেন, আঃ, তোমাকে শিপ্রা সান্যাল যখন এই চিঠিটা দিয়েছিল তখন শিপ্রা সান্যাল কী করছিল?

একজন উকিলবাবু এসেছিলেন তার সঙ্গে কথা বলে ওপরে গেলেন। তারপর আমাকে ডেকে একটা পার্সেল আর আপনার জন্য চিঠি দিলেন।

পার্সেল? কীসের পার্সেল?

কার্শিয়াং-এর ঠিকানাটার কথা চেপে গেল হরিহর। গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল, তা তো জানি না স্যার।

ওসি এবার সশব্দে চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের চিঠিটা হরিহরের মুখের সামনে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, এই চিঠিটায় কী লেখা আছে জানো? লেখা আছে—আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

মৃত্যু! আমার মৃত্যু! এসব কী কথা লিখেছে মেমসাহেব! মাথাটা বনবন করে ঘুরতে থাকল হরিহরের।

ওসি টেবিলের ওপর বেলটা বারকয়েক বাজিয়ে বললেন, সর্বনাশ, একটা হতে চলেছে। চলো, আমাদের সঙ্গে চলো।

মিনিটখানেকের মধ্যে ওসি একটা ছোট দল নিয়ে জিপে উঠে বসলেন। পিছনে কনস্টেবলদের পাশে উঠে বসল হরিহর। ঝড়ের গতিতে জিপটা চলে এল সান্যালবাড়ির ফটকের সামনে। হরিহর অবাক হয়ে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ করল। ফটকে তালা নেই আর গুমটিতে ছোট গোর্খাও নেই।

একজন কনস্টেবল জিপ থেকে নেমে বড় লোহার ফটকটা ঠেলে খুলল, জিপটা সোজা নুড়ি বেছানো পথটা পেরিয়ে সান্যালবাড়ির পর্চে এসে থামল। জিপটা থেকে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল পুলিশের দল। সদর দরজাটাও অবোধ্য কারণে খোলাই ছিল। পুলিশের দলটার পিছু পিছু হরিহরও বাড়ির ভেতরে ঢুকে এল।

দোতলায় একটা হইচইয়ের শব্দ হচ্ছে। সাংঘাতিক একটা গন্ডগোল যেন। একতলাটা

মনে হচ্ছে ফাঁকাই। ওসি দলবল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে সিঁড়ি ভেঙে শব্দের উৎস সন্ধানে উঠতে লাগলেন। বুকের ভেতর একটা ধড়াস ধড়াস শব্দ চেপে পিছুন পিছুন হরিহরও।

ঘরটা এককালে বিট্টুর ছিল। তারপর একদিন শিপ্রার আর দয়াল সান্যালের শোওয়ার ঘর আলাদা হয়ে যাওয়ার পর বিট্টুর সঙ্গে ঘরটা ভাগ করে নিয়েছিল শিপ্রা। বিট্টু বোর্ডিং-এ চলে যাওয়ার পর, ঘরটায় এখন শিপ্রা একাই। সেই ঘরটার অ্যাটাচড বাথরুমের মুখে বাড়ির সব কাজের লোকজন জড়ো হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। পুলিশ দেখে সবাই চুপ করে পুলিশের এগোনোর রাস্তা প্রশস্ত করল। কটু একটা মাংস পোড়া গন্ধে ভরে আছে ঘরটা। প্রথম দমে গা গুলিয়ে উঠল হরিহরের। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াসটা আরও বেড়ে গেছে। শব্দটা মনে হচ্ছে এবার কানে এসে ঠেকবে। হাঁটুর তলা থেকে মনে হচ্ছে পায়ে কোনও জোর নেই। টলটল করছে শরীরটা। পুলিশের সাদা উর্দিগুলোর ফাঁক দিয়ে বাথরুমের ভেতরটায় একবার চোখ পড়তেই চোখ বন্ধ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল হরিহর।

এক লহমার দেখা। কিন্তু চোখের ভেতর দৃশ্যটা গেঁথে আছে। বাথরুমের মেঝেতে পড়ে আছে মেমসাহেবের আধ ঝলসানো শরীর। কেউ একটা আলগোছে চাদর ফেলে দিয়েছে। ঝলসানো শরীরটা একটু নড়ছে না। প্রাণ আছে কি? যে-মানুষটার সঙ্গে একটুখানি আগে কথা বলল—সেই মানুষটা কী করে। শিপ্রার ঝলসানো মুখটা ভেসে উঠতে বন্ধ চোখটা আরও কুঁচকে দৃশ্যটাকে তাড়িয়ে দিতে চাইল হরিহর। ঘর থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে এক কোনায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কুঁকড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রইল। বিট্টুর কথা মনে পড়তেই চোখটা ভিজে গেল। তারপর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গলগল করে কান্না। হরিহরের কান্নার দমকটা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকল। কেউ খেয়াল করল না ঘরের এক কোনায় এক বৃদ্ধের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার দৃশ্যটা।

ওসি বুঝতে পেরেছিলেন গভীর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শিপ্রা সান্যাল যে অবস্থায় আছে, তাতে বাঁচার আশা খুবই ক্ষীণ। গায়ের ওপর ছড়ানো কাপড়টা অল্প তুলে দেখেছিলেন সবচেয়ে মারাত্মক জায়গা পেটটাই সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গেছে। নিজেকে জ্বালানোর জন্য শিপ্রা পেট্রল ব্যবহার করেছিল। দশ লিটারের জারিকেনটা বাথরুমের মধ্যেই পড়ে আছে। মানুষ আত্মহত্যা একটা চরম ঘোরের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে করে। কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে মারার সময় তীব্র যন্ত্রণাটা সহ্য করতে পারে না। শেষ মুহূর্তে বাঁচতে চায়। শিপ্রা যদি বাথরুমের দরজাটার ছিটকিনি না লাগিয়ে এই কাজটা করত, তা হলে হয়তো এতটা পুড়ে যাওয়ার আগে বাড়ির কাজের লোকগুলোর কিছুটা সাহায্য পেত। শিপ্রা যখন যন্ত্রণায় চিৎকার করতে শুরু করেছিল—তখন বাড়ির চাকর বাকরদের বুঝতে খানিকটা সময় লেগেছিল, হতভম্ব ভাব কাটিয়ে মজবুত কাঠের দরজাটা ভাঙতে আরও কিছু সময় নষ্ট হয়েছিল।

শিপ্রা সান্যালের গতিবিধি সম্পর্কে পুলিশের একটা অল্প ধারণা আছে। এককালে মহিলা নাকি নকশাল আন্দোলন করত। মাঝেমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনাও শোনা যায়। ইনফর্মাররা চোর ছ্যাঁচড় ডাকাতের সূত্র বলার ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও

শিপ্রা সান্যালের কথা থানাতে বলত। অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়ে শিপ্রার পরিপাটি করে সাজানো শোওয়ার ঘরটা দেখতে দেখতে এসব কথা ভাবছিলেন ওসি।

অ্যাম্বুলেন্স এবং দয়াল সান্যাল প্রায় একই সঙ্গে এসে পৌঁছোল। দয়াল সান্যাল থম মেরে বাথরুমের মেঝেতে পড়ে থাকা শিপ্রার অচৈতন্য শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা পেশাদারি দক্ষতায় স্ট্রেচারে শিপ্রার শরীরটাকে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন দয়াল সান্যালের সঙ্গে যেতে যেতে ওসি বললেন, উনি কিন্তু থানায় আমার কাছে একটা সুইসাইড নোট পাঠিয়েছিলেন।

দয়াল সান্যাল দাঁড়িয়ে পড়ে ওসির দিকে তাকিয়ে বললেন, মানে?

আপনার বাড়ির একজন বুড়োমতো চাকর আমার কাছে ওঁর চিঠিটা নিয়ে এসেছিল।

বুড়োমতো চাকর? কে বুড়োমতো চাকর? সেরকম তো এবাড়িতে কেউ কাজ করে না।

হরিহরের কোনও কিছু খেয়াল ছিল না। তখন থেকে একইরকম ফুঁপিয়ে যাচ্ছিল, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হরিহরকে এক কোনায় দেখতে পেলেন ওসি। হরিহরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, ওই যে, ওই লোকটা।

দয়াল সান্যালের দু'মুহূর্ত সময় লাগল হরিহরকে চিনতে। একে এত বছর পরে হরিহর একেবারে অপ্রত্যাশিত। তার ওপর শিপ্রার চিঠি নিয়ে থানায় যাওয়াটা আরও বিস্ময়ের। কিন্তু এখন এসব নিয়ে ভাবার সময় নেই। অ্যাম্বুলেন্সটা নীচে অপেক্ষা করছে। দয়াল সান্যাল শুধু ওসিকে বললেন, আপনি এখনই চিঠির কথাটা কাউকে কিছু বলবেন না, পরে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

এর পরে আরও সাড়ে তিন ঘণ্টা বেঁচে ছিল শিপ্রা। সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই এক ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে শেষ হয়ে গেল তার জীবন।

পৃথিবীর সব পুলিশই টাকার গোলাম নয়। ঘুষের আনুগত্য গ্রহণ করে না। ওসি অতীন বাগচীও সেরকমই একজন। দয়াল সান্যালের অনুরোধ উপেক্ষা করে শিপ্রা সান্যালের পুলিশি রিপোর্টে প্রথমেই উল্লেখ করলেন সুইসাইড নোটের কথা। তবে অনুসন্ধানের অঙ্গ হিসাবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হরিহরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন থানায়।

হরিহর বুঝতে পারছিল—সাংঘাতিক একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে।

থানার বাইরে বেঞ্চে অপেক্ষা করছিল হরিহর। ওসি বসতে বলেছেন। হরিহরকে যে থানায় ওসি ডেকে পাঠাবেন এটা প্রত্যাশিতই ছিল। সারাদিন হরিহর কখনও ডুকরে কেঁদেছে কখনও বিড়বিড় করে প্রলাপ বকেছে। মেমসাহেব কি এই দিনটা দেখার জন্যই হরিহরকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সকালে যখন মেমসাহেবের মুখোমুখি হয়েছিল একবারের তরেও তো মনে হয়নি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মেমসাহেব নিজের জীবনটাকে শেষ করে দিতে চলেছে।

হরিহর শ্মশানে যেতে চেয়েছিল। শিপ্রার মৃত্যুর পর দয়াল সান্যাল পোস্টমর্টেম করাটা আটকাতে পারেননি—কিন্তু নিজের প্রভাব খাটিয়ে অতি দ্রুত ময়না তদন্তটা

করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। রাত্রি আটটার মধ্যে সকালের দুর্গা প্রতিমার মতো শরীরটা, পুড়ে কাঁটাছেঁড়া হয়ে মর্গে হাতে পেয়ে গিয়েছিলেন দয়াল সান্যাল। এবং মর্গ থেকে আর বাড়িতে আনেননি সেই শরীর। সোজা শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একটাই প্রশ্ন ঝুলে ছিল। বিট্টু তার মাম্মিকে শেষবার দেখবে না? সিদ্ধান্তটা দয়াল সান্যাল খুব দ্রুত নিয়েছিলেন। উত্তর ছিল—না। ছেলেকে মায়ের এই চেহারা আর দেখাবেন না। যেহেতু শিপ্রার বাপের বাড়ির তরফে কেউ ছিল না—তাই সিদ্ধান্তটা ভেবে দেখার মতো মতামতও কেউ দেয়নি।

এত ঘটনার মধ্যেও কিন্তু দয়াল সান্যাল চিন্তার এক একটা জট নিয়ে অবিচল ছিলেন। সন্ধের দার্জিলিং মেলে সরোজ বক্সীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন শিলিগুড়ির উদ্দেশে। দ্রুত হাতে একটা চিঠিও লিখে দিয়েছেন বিট্টুর স্কুলের প্রিন্সিপালের জন্য।

এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়তো স্বাভাবিক ছিল কিন্তু দয়াল সান্যালকে ভাবাচ্ছিল হরিহরের কথা। শিপ্রা হঠাৎ আজকে হরিহরকে কেন আসতে বলল, তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর হরিহর দিতে পারেনি। অথচ সে এই বয়সে এসেছে এবং বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে এসেছে। আসলে এই জটটা পাকিয়ে দিয়েছে হরিহর নিজেই। মহেশের বাড়িতে যে শিপ্রা হরিহরের থাকার ব্যবস্থা করতে চলেছে—এই খবরটা গোপন রাখতে বলেছিল। এত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও হরিহর এই রহস্যটা কিছুতেই ভেঙে বলেনি।

দয়াল সান্যাল থানার ওসিকে বলেছেন, গোটা ঘটনাটার মধ্যে অনেক রহস্য আছে। শিপ্রার আত্মহত্যাটা আদৌ আত্মহত্যা কি না সে ব্যাপারে তাঁর প্রচুর সংশয় আছে। এটা একটা চক্রান্ত। গভীর চক্রান্ত। যার অনেক কিছুই হরিহর জানে। তাই ওসি যেন হরিহরের বয়সটা ধর্তব্যের মধ্যে না আনেন। প্রয়োজনে থার্ড ডিগ্রি দিতে দ্বিধা না করেন।

আসলে দয়াল সান্যাল কোনও দিশা পাচ্ছিলেন না। খবর নিয়ে জেনেছেন সকালে একজন উকিল এসেছিল বাড়িতে। লোকটার নাম তরুণ ঘোষ। ইদানীং শিপ্রাকে ওই পরামর্শ দিত। জমি বাংলোর কাগজপত্তর করছিল। কোনও একটা ফালতু বাচ্চাদের সংগঠনকে জমিবাড়ির দলিল দেবে বলে আজ ঠিক ছিল। দয়াল সান্যাল একটা মোক্ষম পালটা চাল দিয়ে বাচ্চাগুলোকে বেধড়ক পিটুনির ব্যবস্থা করেছেন। এরপর ওই জমি বাংলোর দিকে আর কেউ তাকাতেই সাহস পাবে না। ওগুলো কবজা করার পথ আরও প্রশস্ত হবে। তার মধ্যে এই কাণ্ড। নিজের আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের আগে শিপ্রা যদি কোনও উইল করে দিয়ে যায়, তা হলে একের পর এক সাজানো চিন্তাভাবনা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

এই ফাঁকেই দয়াল সান্যাল আইনি পরামর্শদাতাদের প্রাথমিক মন্তব্যটা জেনে নিয়েছেন। তাদের একজন একটা আশার কথা শুনিয়েছে, আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা আগে যদি কেউ উইল করে, তা হলে তার মানসিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। সম্পূর্ণ সুস্থ মানসিক অবস্থায় কেউ উইল না করলে—সেই উইলকে গ্রাহ্য নাও করা যেতে পারে।

ওসি যখন হরিহরকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন তখন হরিহরের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল

বৃন্দাবন মিত্র। বৃন্দাবন মিত্র ইদানীংকালে দয়াল সান্যালের কাছের লোক হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ওসি অবশ্য ওর নাম জানতেন না। কিন্তু যতক্ষণ সান্যালবাড়িতে ছিলেন সারাক্ষণ ঘুরঘুর করতে দেখেছেন দয়াল সান্যালের আশেপাশে, লোকটার মেকি উদ্বেগ আর অহেতুক ব্যস্ততা ওসি-র অভিজ্ঞ চোখ এড়ায়নি।

ওসি একটু কড়া মেজাজেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

বৃন্দাবন মিত্র করজোড়ে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আজ্ঞে আমি বৃন্দাবন মিত্র।

ওসি মেজাজ হারিয়ে বললেন, এখানে কী চাই?

আজ্ঞে, হরিহরকে পথ চিনিয়ে থানায় নিয়ে এলাম।

কেন, পথ চিনিয়ে কেন? আপনি জানেন না সকালে হরিহর একাই থানায় এসেছিল আমার কাছে।

বৃন্দাবন মিত্র দেঁতো হেসে বলল, সে তো ঠিকই। খেয়াল ছিল না।

কথাগুলো বলেও বৃন্দাবন মিত্র একইরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। ওসি অধৈর্য হয়ে বললেন, এবার কী চাই?

আজ্ঞে আপনি হরিহরকে প্রশ্নটশ্ন করবেন। যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়। মানে তথ্যটথ্য আর কী।

ওসি এবার সম্পূর্ণ মেজাজ হারালেন। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গলাটা সপ্তমে চড়িয়ে বললেন, মারব শালা উলটো হাতে দু'ঝাপড়, দালাল কোথাকার!

মুহূর্তের মধ্যে বৃন্দাবন মিত্রর মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেল। দয়াল সান্যাল তাকে পাঠিয়েছিলেন ওসি-র সঙ্গে হরিহরের কী কথাবার্তা হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা মুখস্থ করে আসতে। তার মধ্যে এই বিপত্তি। এখন ওসি থাপ্পড় তুলে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে দয়াল সান্যাল আর এক দফায় বাপ-বাপান্ত গালিগালাজ করবে। বলবে, তোমরা কি সরোজের মতো একটুও কাজ করতে পারো না? এই সরোজ বক্সীটা দয়াল সান্যালকে ঘিরে একটা বলয়। এই বলয়টাকে ভেঙে ফেলতে না পারলে কোনওদিনই দয়াল সান্যালের কাছাকাছি পৌঁছোনো যাবে না।

হরিহরের মনে হল এই বৃদ্ধ বয়সে এসে ভগবান যেন আজ শোক, আতঙ্ক, ভয় সব কিছুরই চরম সীমা দেখাচ্ছেন। ওসি-র মেজাজ দেখে তাই নতুন করে আর হাঁটু কাঁপল না হরিহরের। সেই কোন সকালেই হাঁটুর জোরটা হারিয়ে গেছে। নতুন করে হাঁটু কাঁপার শক্তিও আর নেই। হরিহরকে এখন গ্রাস করে নিয়েছে এক বোধশূন্য বিহ্বলতা।

ওসি চেয়ারে বসে হরিহরকে বললেন, পকেটে যা যা আছে সব বার করে টেবিলের ওপর রাখো।

হরিহর সম্মোহিতের মতো দু'পকেট, বুকপকেট হাঁটকে টাকাকড়ি কাগজপত্তর সব কিছু বার করে টেবিলের ওপর রাখল।

ওসি দেখলেন টুকরো-টাকরা কাগজের সঙ্গে অনেক টাকা বেরোল হরিহরের পকেট থেকে। টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, এত টাকা পেলে কোথা থেকে?

কাঁপা গলায় হরিহর বলল, মেমসাহেব দিয়েছিলেন।

কত টাকা?

গুনে দেখিনি স্যার।

হঠাৎ এত টাকা কেন দিয়েছিল তোমাকে?

আমাকে ডেকে পাঠালেন ওঁর ঘরে। বললেন পোস্টঅফিসে একটা পার্সেল করে দিতে আর আপনাকে চিঠিটা পৌঁছে দিতে। পার্সেলের খরচ হিসাবে টাকাটা...

ওসি চোখ দুটো কোঁচকালেন, পার্সেল? কীসের পার্সেল? আর তার জন্য এত টাকা? সকালে বলোনি তো।

সকালে যে মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে তারপর পোস্টঅফিসে পার্সেল করার মতো তুচ্ছ ঘটনাটা ওসির মাথা থেকে বেমালুম বেরিয়ে গেছে। নতুন করে কোনওরকমে ওসি-কে হরিহর ঘটনাটা বলল।

সব শুনে ওসি বললেন, তোমার টাকাগুলো আর কাগজপত্তরগুলো আলাদা করো। টাকাটা গুনে বলো কত আছে। কাগজপত্তরগুলো আমাকে দাও।

কাগজপত্তর অল্পই। মামুলি। তার মধ্যেই অবশ্য মূল্যবান পোস্ট অফিসের চিরকুটটা আছে। পৌনে তিন কিলো ওজনের একটা পার্সেল কার্শিয়াং-এ এক বোর্ডিং স্কুলের প্রিন্সিপালকে পাঠানো হয়েছে। কাগজটাকে একটা পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে ওসি হরিহরের মুখের দিকে তাকালেন, হরিহরের টাকা গোনা শেষ হয়ে গিয়েছিল, শুকনো গলায় বলল, তেইশশো বাহাত্তর টাকা।

তুমি নিজে কত টাকা নিয়ে এসেছিলে?

হরিহর একটু চিন্তা করে বলল, পঁয়ষট্টি টাকার মতো স্যার।

তুমি খুব বিপদে পড়েছ, এটা বুঝতে পারছ?

হরিহর চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া খুন করার মতো অপরাধ এটা জানো? যদি প্রমাণ হয়...

অভিজ্ঞতা একটা অমূল্য জিনিস। হরিহরের নিষ্পাপ মুখটা দেখে তার নিরপবাধ হওয়াটা নিয়ে কোনও সংশয় নেই ওসির কাছে। আত্মহত্যায় প্ররোচনা যদি কেউ দিয়েই থাকে তা সে দয়াল সান্যাল স্বয়ং। এই থানায় পোস্টিং পাওয়ার পর এক সহকর্মীর কাছে অনেক কথাই শুনেছেন ওসি। মানুষ হিসেবে তিনি একটু অন্যরকম। আসল দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা কী করে করা যায়, সেটাই মনে বারে বারে পাক খাচ্ছে। হরিহরের এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বললেন, বসো।

হরিহর জড়সড় হয়ে একটা চেয়ারে বসল।

তুমি সত্যি করে বলো তো হরিহর তোমাকে তোমার মেমসাহেব কি পেট্রল কিনতে দিয়েছিল?

হরিহর ঢোঁক গিলে বলল, না তো স্যার।

আশ্চর্য! শিপ্রা সান্যালকে পেট্রল কে জোগাড় করে দিল...

হরিহরের হঠাৎ পুরনো দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। ড্রাইভার বনোয়ারীলাল

প্রায়ই রাত্রিবেলায় পাইপ ঢুকিয়ে গাড়ি থেকে পেট্রল চুরি করে গ্যারেজে লুকিয়ে রাখত। মেমসাহেবকে একবার বলেছিল ঘটনাটা। তা ছাড়া বাড়িতে একটা জেনারেটরও ছিল। বিদেশি জেনারেটর। পেট্রলে চলত। বাড়িতে পেট্রলের অভাব ছিল না। মেমসাহেব হয়তো জানত পেট্রলের সন্ধান। কোনও চাকরকে হয়তো বলেছিল পেট্রল এনে দিতে। এখন কি সে আর স্বীকার করবে! নিজের যা হচ্ছে, অন্যদের ওপর আর সন্দেহটা না ঘুরিয়ে ক্লান্ত মুখে বসে রইল হরিহর।

আর কাউকে বলেছ পোস্টঅফিসে গিয়ে পার্সেল করার কথাটা?

হরিহর দু'দিকে মাথা নাড়ল।

তোমাকে শিপ্রা সান্যাল যে ইনল্যান্ড লেটারে চিঠি দিয়েছিল, সেটা সঙ্গে আছে?

হরিহর আবার দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল, না স্যার, ওটা দেশের বাড়িতে রেখে এসেছি।

শোনো একটা কথা বলি তোমাকে। পোস্ট অফিসের কথাটা আর কাউকে এখনই বলার দরকার নেই। আর যে-ইনল্যান্ড লেটারটা তোমার কাছে আছে, সেটা খুব যত্ন করে রাখবে। ভবিষ্যতে যদি কোর্ট-কাছারি হয় ওটাই কিন্তু তোমাকে বাঁচাবে। মনে রাখবে কথাগুলো। রাতে কোথায় থাকবে?

হরিহর শূন্য চোখে বলল, জানি না।

কাল রাতে কোথায় ছিলে?

জানাশুনো একজনের বাড়িতে।

কয়েকদিন আরও সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করো। ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যাও। আমাকে না জানিয়ে দেশে ফিরে যাবে না। তবে আজকে এত রাতে তো আর সেই বাড়িতে যেতে পারবে না। রাতটা দরকার হলে থানাতেই কাটিয়ে দাও। আমি বলে দিচ্ছি। তুমি সারারাত থানাতে ছিলে শুনলে তোমার মালিক খুশিই হবে।

হরিহর হাতজোড় করে ওসিকে প্রণাম জানাল। পুলিশ সম্পর্কে ধারণাটাই বদলে গেল আজ। হরিহরকে চলে যেতে দেখে ওসি বিরক্ত হয়ে ডাকলেন, কী হল? তোমার টাকাকড়ি ফেলে যাচ্ছ কেন?

হরিহর টেবিলের ওপর থেকে টাকাগুলো নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। ওসি বললেন, সারাদিন তো বোধহয় কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি। থানার উলটোদিকে একটা খাওয়ার জায়গা আছে। কিছু খেয়ে এসো।

৬৩

বিট্টুর যখন জিয়োগ্রাফির ক্লাস চলছে, প্রিন্সিপাল ব্রাদার ডেকে পাঠালেন বিট্টুকে। ক্লাস চলাকালীন কখনওই প্রিন্সিপাল ব্রাদার ছাত্রদের নিজের ঘরে ডেকে পাঠান না। তাই বিট্টুর খুব অবাক লাগল ঘটনাটায়। তার সঙ্গে একটা ভয়, আশঙ্কাও। অজান্তে

কখন কি ডিসিপ্লিন ব্রেক করে ফেলেছে অথবা অন্যায় করে ফেলেছে। দুরুদুরু বুকে ভাবতে ভাবতে কাঁপা পায়ে হাজির হল প্রিন্সিপাল ব্রাদারের ঘরে। এবং ঢুকে আর একদফা অবাক হল। প্রিন্সিপাল ব্রাদারের টেবিলের উলটো দিকে বসে আছেন হোস্টেল ওয়ার্ডেন আর সরোজ বক্সী।

প্রিন্সিপাল ব্রাদার বিট্টুকে পাশে ডাকলেন, তারপর সস্নেহে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, উনি তোমার বাড়ি থেকে এসেছেন। তোমার বাবা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। যাও কয়েকদিন কলকাতায় ঘুরে এসো।

বিট্টুকে দেখে সরোজ বক্সীও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। বয়সে যতই ছোট একজন কিশোর হোক, আসলে সে তো মালিকপক্ষ। অন্নদাতা।

প্রিন্সিপাল এবার ওয়ার্ডেনকে তাড়া দিয়ে বললেন, একদম কুইক। জাস্ট মিনিমাম এসেনশিয়ালস প্যাক করে দিন। বইপত্তর কিছু দেওয়ার দরকার নেই। সময়ে বাগডোগরা পৌঁছোতে হবে।

প্রচণ্ড কড়া হিসেবে খ্যাত প্রিন্সিপাল ব্রাদারের এই ব্যবহারটাও কীরকম গুলিয়ে দিচ্ছে বিট্টুকে। বাবার কী হয়েছে? কেন এত তাড়াহুড়ো করে সরোজকাকা ওকে নিতে এসেছে? প্রশ্নগুলো অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। প্রিন্সিপাল ব্রাদারকে এসব জিজ্ঞেস করার মতো সাহস নেই। তবে এই ঘরের বাইরে বেরিয়েই প্রশ্নগুলো সরোজকাকাকে করবে বলে মনে মনে ঠিক করল।

ব্রাদার অ্যান্ডারসনের কথা শুনে ওয়ার্ডেন আর একটুও দেরি করলেন না। প্রায় ঝড়ের বেগে বিট্টুকে হস্টেলের ঘরে নিয়ে এলেন। এবং ওরই একটা ব্যাগে দ্রুত কয়েকটা জামাকাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে একেবারে স্কুল কম্পাউন্ড গেটের কাছে নিয়ে চলে এলেন। এই ঝোড়ো সময়টার মধ্যে সরোজ বক্সীকে কিছু জিজ্ঞেস করার ফুরসতই পেল না বিট্টু।

কম্পাউন্ড গেটের কাছেই অপেক্ষা করছিল জিপটা। জিপের মধ্যে আরও দু'জন মুখচেনাকে দেখল বিট্টু। একজনকে দেখেছে কয়েকবার কলকাতার বাড়িতে। আর একজনের নাম জানে না—বোধহয় হরিতলা কটন মিলের।

জিপটা স্কুল কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে মেন রাস্তায় এসে পড়ল। তারপর দ্রুত পাকদণ্ডী কেটে শিলিগুড়ির দিকে নামতে থাকল। মুখচেনা লোকটা আর সরোজ বক্সীর মাঝে বিট্টু বসে এবার মনের প্রশ্নগুলোর ঝাঁপ খোলার অফুরন্ত সময় পেল।

কী হয়েছে বাবার?

শুকনো গলায় বিট্টু সরোজ বক্সীকে জিজ্ঞেস করল। সরোজ বক্সী আনমনা ছিলেন। প্রশ্নটার উত্তরে বললেন, কী হয়েছে... না না কিছু হয়নি... অনেকদিন তোমাকে দেখেননি... খুব মনখারাপ করছে... তোমাকে দেখতে চেয়েছেন...

মাম্মি? মাম্মি কেমন আছে?

ভাল... ভাল... ঠিক আছেন।

শেষ দুপুরে জিপটা পৌঁছে গেল বাগডোগরা এয়ারপোর্টে। বিট্টু এর আগে কখনও

প্লেনে চাপেনি। এতদিন যতবার নিউ জলপাইগুড়ি এসেছে, ট্রেনে এসেছে। এয়ারপোর্টে এসে প্রথম প্লেনে চাপার উত্তেজনায় হঠাৎ করে সরোজ বক্সী এসে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কারণটার প্রশ্নগুলো কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল।

প্লেনে অবশ্য সরোজ বক্সী ছাড়া অন্য লোকগুলো এল না। ওদের কথাবার্তায় বিট্টু বুঝল ওরা ট্রেনে অথবা বাসে কলকাতা ফিরে যাবে।

প্লেনটা গড়িয়ে গড়িয়ে রানওয়ের এক প্রান্তে এল। তারপর তীব্রগতিতে রানওয়ের মধ্যে দিয়ে ছুটে আকাশে ডানা মেলল। এই সময়টুকু তীব্র রোমাঞ্চকর। জানলায় প্রায় নাক ঠেকিয়ে বিট্টু অবাক হয়ে দেখতে থাকল নীচের বাড়িঘরগুলো কেমন ক্রমশ ছোট আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে। হিমালয় আরও বিস্তৃত হয়ে যাচ্ছে। বিট্টুর নিজেকে পাখি মনে হতে থাকল। আর মনে পড়ল মাম্মির কথা, মাম্মি কতবার বলেছে, পাখিদের কত মজা। যেখানে খুশি উড়ে চলে যেতে পারে, আর ওপর থেকে পৃথিবীটা কেমন সুন্দর দেখতে পায়।

একটু পরেই প্লেনটা মেঘের ওপর উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর সেই দৃশ্য খুব ক্লান্তিকর। চারদিকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু থোকা থোকা সাদা মেঘ। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে। শুধু সেই মেঘের সাদা রঙে অনেক রকম আলোর খেলা শুরু হয়েছে। এয়ার হোস্টেসরা খাবার দিয়েছে। পাশে সরোজ বক্সী চুপ করে বসে আছেন। বিট্টুর কোনও অসুবিধে হচ্ছে কিনা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করা ছাড়া আর কোনও প্রশ্ন করছেন না।

কিছুক্ষণ ধামাচাপা পড়ে থাকা প্রশ্নটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। হঠাৎ সরোজ বক্সীর সঙ্গে সে কলকাতায় যাচ্ছে কেন?

বড় লোহার গেটটা পেরিয়ে পর্চে গাড়িটা এসে থামতেই বাড়িটা কেমন অন্যরকম মনে হল বিট্টুর। বিট্টু যখন হস্টেল থেকে বাড়িতে আসে, গোটা বাড়ি যেন সেজেগুজে রেডি হয়ে থাকে। ড্রাইভার গেটের বাইরে থেকেই বারবার হর্ন বাজাতে থাকে। গাড়িটা যখন পর্চে এসে থামে, বাড়ির সবাই ততক্ষণে সদর দরজার মুখে এসে জড়ো হয়ে যায়।

আজ ড্রাইভার কোনও হর্ন বাজাল না। এয়ারপোর্টে এসেছিল বাবার অফিসের সৌমেন সরকার। সারাক্ষণ ড্রাইভারের পাশে চুপ করে বসে ছিল। একটা কথাও বলেনি। সরোজ বক্সীও খুব চুপচাপ। গাড়ি থেকে নেমে ছোট্ট করে বিট্টুকে বললেন, এসো।

বিট্টু তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে বাড়িতে ঢুকল। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল সব কাজের লোকেরা দূর থেকে ইতিউতি ওকে দেখছে, কেউই এগিয়ে আসছে না। মুখগুলোও ওদের কীরকম শুকনো, থমথমে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য মাম্মিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না। অজানা একটা কারণে এই প্রথম বুকের ভেতরটা টিপটিপ করতে থাকল বিট্টুর।

হলের মধ্যে দিয়ে শ্বেতপাথরের বাহারি সিঁড়ি পাকদণ্ডী খেয়ে ওপরে উঠে গেছে। বিট্টু সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে তাকাল। একটা মচমচে জুতোর আওয়াজ। বাবা নেমে আসছে।

দয়াল সান্যাল বিট্টুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিট্টু পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই বিট্টুর কাঁধটা খামচে ধরলেন দয়াল সান্যাল।

মাম্মি কোথায়?

বিট্টুর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না দয়াল সান্যাল। বললেন, চলো, আমরা ওপরে যাই।

পাকানো সিঁড়ি বেয়ে বাবার পিছন পিছন ওপরে উঠে এল বিট্টু। ওপরে উঠে একটা লম্বা করিডর। করিডরটার শেষ প্রান্তে দু'দিকে দুটো ঘর। অনেক ছোটবেলা থেকেই বিট্টু দেখেছে বাবা-মায়ের ঘর দুটো আলাদা হয়ে গেছে। ডান দিকেরটা বাবার ঘর, বাঁ দিকেরটা ওর আর মায়ের। সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ। দরজাটা ঠেলতে যাবে, এমন সময় কাঁধে আবার বাবার হাতের চাপ পেল বিট্টু।

আগে এ ঘরে এসো।

বিট্টুর কাঁধে হাত রেখে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন দয়াল সান্যাল। ঘরে ঢুকে বিট্টু দেখল ঘরের আসবাবপত্র কিছুটা এদিক-ওদিক করে সাজানো রয়েছে। শেষ যখন গরমের ছুটিতে এসেছিল তখন এই ঘরে কোনও টেবিল ছিল না। এখন একটা মাঝারি মাপের টেবিল আর তার পিছনে একটা পুরু গদির কালো পিঠ উঁচু চেয়ার।

প্লেনে খেয়েছ?

বাবার প্রশ্নের উত্তরে বিট্টু ঘাড় হেলাল।

দয়াল সান্যাল বিট্টুর চুলের মধ্যে চিরুনির মতো আঙুল চালাতে থাকলেন। তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, শোনো বাবা, তোমার মাম্মি আর নেই।

কথাটা বলেই দয়াল সান্যাল বিট্টুর মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরলেন। বিট্টু প্রথমে মানেটাই বুঝতে পারল না। তারপর হঠাৎ মনে হতে থাকল পায়ের নীচে আর মাটি নেই। বাবার বুকের মধ্যে দমবন্ধ লাগতে থাকল বিট্টুর।

দয়াল সান্যাল দরজার বাইরে দেখলেন দূরে কাচের গ্লাসে শরবত নিয়ে সরোজ বক্সী দাঁড়িয়ে আছে। ইশারায় ভেতরে ডাকলেন। সরোজ বক্সী ভেতরে এসে টেবিলের ওপর শরবতের গ্লাসটা রেখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দয়াল সান্যাল আবার ইশারায় ওকে ঘরের ভেতর থাকতে বললেন।

কী হয়েছিল মাম্মির?

প্রশ্নটায় চমকে উঠলেন দয়াল সান্যাল। থানা, পুলিশ, আত্মীয়স্বজন, ব্যাবসার বন্ধুবান্ধব সকলের কাছে অনবরত এই প্রশ্নটা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এই এগারো বছরের ছেলেটার কাছ থেকে প্রশ্নটা চাবুকের মতো কানে আছড়ে পড়ল। নিজের চেয়ারটায় ছেলেকে বসালেন উনি।

তোমার মাম্মি নিজের ইচ্ছায় চলে গেছে। সুইসাইড।

ফ্যালফ্যাল করে বাবার দিকে চেয়ে বিট্টু বলল, কেন?

মাটির দিকে চোখ ফেরালেন দয়াল সান্যাল। ছেলের চোখে চোখ রেখে এই প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়া যাবে না। গলাটা গম্ভীর করে বললেন, এই কেনর উত্তরটা তো আমিও

খুঁজছি বাবা। তুমি এখন বড্ডই ছোট। সব বুঝবে না। কিন্তু যখন বড় হয়ে নিজে উত্তরটা খুঁজবে, বুঝতে পারবে তোমার মাম্মি কত বোকা ছিল। আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও, তোমার কথা পর্যন্ত একবার চিন্তা করল না।

মাম্মি, কবে...

প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না বিট্টু। গলাটা কীরকম বুজে আসছে।

মঙ্গলবার বেলা এগারোটায়...

মঙ্গলবার বেলা এগারোটা... মঙ্গলবার বেলা এগারোটা... ভেতর ভেতর আওয়াজটা বাজতে থাকল বিট্টুর মধ্যে। মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় তো ও রবার্ট মামার সঙ্গে ব্রাদার ডি'সুজার কাছে ছিল। তখন মায়ের প্রিয় ক্যারল শুনছিল।

শোনো বাবা, আমাকে একটা ডিসিশন নিতে হয়েছিল। তোমার মাকে দাহ করে ফেলতে হয়েছে। আমি পারতাম না, কিছুতেই পারতাম না তোমার মাকে ওই অবস্থায় তোমাকে দেখাতে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দয়াল সান্যাল আবার বললেন, তোমার মায়ের অস্থিটা রাখা আছে। সরোজ তোমাকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাবে। ওখানে অস্থিটা জলে ভাসিয়ে ভগবানকে বলে এসো তোমার মা যেখানেই থাকে সেখানে যেন ভাল থাকে।

বিট্টু বাবার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা মাম্মিকে পুড়িয়ে দিয়েছ?

প্রশ্নটায় একটু থতমত খেয়ে গেলেন দয়াল সান্যাল। খানিকটা অসহায়ের মতো বিট্টুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, সত্যি বাবা, তোমার মায়ের বডিটাকে রাখা যেত না।

তোমরা মাম্মিকে পোড়ালে কেন?

দয়াল সান্যাল আবার ছেলের মাথায় হাত রেখে বললেন, এটাই তো করতে হয় বাবা। কেউ চলে গেলে তার শরীরকে তো আর রাখা যায় না।

বিট্টু দু'দিকে মাথা ঝাঁকাতে থাকল।

তোমরা মাম্মিকে পোড়ালে কেন? জানো না মাম্মি কী বলত? মাম্মি বলত, আমি চলে গেলে, দিদিমার গ্রেভের পাশে আমাকে শুইয়ে দিবি।

দয়াল সান্যাল চোখটা কুঁচকে বন্ধ করলেন। তারপর একটা বড় শ্বাস নিয়ে বললেন, তুমি এখন অনেক ছোট। হয়তো সব বুঝতে পারবে না। তবু বলছি তোমাকে। তোমার দিদিমা খ্রিস্টান ছিলেন। তখন তোমার মাও খ্রিস্টান ছিল। তখন ওর নাম ছিল শ্যারন। পরে ও হিন্দু হয়ে গিয়েছিল। শ্যারন থেকে শিপ্রা। মুসলিম, খ্রিস্টানদের ধর্মে আছে কবর দেওয়া। আমাদের হিন্দু ধর্মে নিয়ম হচ্ছে দাহ করা। এগুলো তো তোমাকে বুঝতে হবে বাবা।

দু'জনেই চুপ করে থাকল। খানিকক্ষণ পরে দয়াল সান্যাল বললেন, যাও মায়ের ঘরে যাও। অস্থিটা রাখা আছে। নিয়ে সরোজের সঙ্গে গঙ্গায় ঘুরে এসো। সন্ধে হয়ে আসছে।

তুমি সঙ্গে যাবে না বাবা?

দয়াল সান্যাল আবার চোখটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে দু'দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, না, তুমি সরোজের সঙ্গে যাও।

দয়াল সান্যাল দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন বাইরেটা ফাঁকা। একটু গলা চড়িয়ে বাড়ির কাজের লোকজনদের ডাকলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারা চলে এল। দয়াল সান্যাল ওদের বললেন, বিট্টুকে ওঘরে নিয়ে যাও।

কাজের লোকেদের সঙ্গে বিট্টু ঘরের বাইরে গেল: উলটোদিকের ঘরটাই মাম্মির ঘর। সরোজ বক্সী পিছন পিছন যাচ্ছিলেন। দয়াল সান্যাল চাপা গলায় সরোজ বক্সীকে ডেকে নিলেন। ঘরটা ফাঁকা হতেই দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীকে বললেন, ও কিন্তু এখন অনেক প্রশ্ন করবে। বি ভেরি কেয়ারফুল ওকে কী বলবে। এই ক'দিন তোমার অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। এ-বাড়িতেই থাকো। প্যারালাল ফোনে মনিটর করবে বিট্টুকে কে ফোন করছে। কী বলছে। অস্থি ভাসানোটাও একদম চুপচাপ করে ফেলবে।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার? চাপা গলাতে সরোজ বক্সী বললেন।

দয়াল সান্যাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

আপনি অস্থি ভাসানোর ব্যাপারটায় বিট্টুবাবাকে রাখলেন কেন? মানে স্যার, এই প্রশ্নটা যদি ও করে বসে...

কিছু তো একটা রাইটস ওর জন্য রাখতে হবে। এখন অ্যাডোলেসেন্স হতে যাচ্ছে। কোনওরকমভাবে মনটা ঘুরে গেলে একেবারে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে।

সরোজ বক্সী একটু উসখুস করে বললেন, একটা অদ্ভুত খবর ছিল স্যার। বিট্টুবাবার হস্টেল ওয়ার্ডেন বলছিল মঙ্গলবার সকাল দশটা থেকে বারোটা ম্যাডামের চিঠি নিয়ে স্পেশাল পারমিশন করে বিট্টুবাবাকে স্কুলের বাইরে একজন কোথাও নিয়ে গিয়েছিল।

দয়াল সান্যাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, একজন... কে?

সেই... রবার্ট। ক্যাথি গোমসের ছেলে।

তোমাকে কী বলেছিলাম সরোজ? বিরাট একটা চক্রান্ত শিপ্রা করছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে এমনি এমনি রবার্টের সঙ্গে দেখা করতে যেত না। তা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল বিট্টুকে?

সেটা আর জেনে উঠতে পারিনি। শুনলাম প্রিন্সিপাল জানেন। তখন আর হাতে কোনও সময় ছিল না। বাগডোগরায় ফিরে আসার তাড়া ছিল।

দয়াল সান্যাল একটা বিরক্তিসূচক আওয়াজ করলেন, তোমরা যে কেন ডিসিশন নিতে পারো না, বুঝি না। একদিন না হয় পরে আসতে। বুঝতে পারছ না এই ব্যাপারটা জানা কত ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। এনি ওয়ে দুটো কাজ করো। এক নম্বর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের লোক লাগাও। জানো সেদিন এই বাড়ি থেকে কার্শিয়াং-এ কোনও ট্রাঙ্ককল হয়েছিল কি না, আর দু'নম্বর লোক লাগিয়ে রবার্টকে ট্যাপ করো। রবার্ট পার্ক স্ট্রিটে কোনও একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করে। আর ভুলেও বিট্টুকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যেয়ো না। যা করার আমি করব।

ঘরের বন্ধ দরজাটার পাল্লা দুটো ঠেলল বিট্টু। মাম্মির বিছানার চাদরটা টানটান করে পাতা। এক দিকে মাম্মির ড্রেসিং টেবিল। ড্রেসিং টেবিলের ওপরটায় আগে টুকিটাকি জিনিস ভরতি থাকত। যখন ছোট ছিল তখন ওই এক-একটা প্রসাধনীর ছোট ছোট জিনিসে খুব আগ্রহ ছিল বিট্টুর। মাম্মি যখন সাজত তখন হাঁ করে পাশে বসে দেখত। এখন সেসব কিছু নেই। ড্রেসিং টেবিলের ওপরকার জায়গায় দুটো মাত্র জিনিস। একটা মায়ের মাঝারি সাইজের ছবি আর তার পাশে একটা ছোট মাটির হাঁড়ি, তার মুখটা লাল শালুতে ঢাকা।

মায়ের ছবিটা দেখে বিট্টুর একবারও মনে হল না মাম্মি আর নেই। অসম্ভব প্রাণবন্ত একটা ছবি, হাসিহাসি একটা মুখ। সরাসরি চেয়ে আছে বিট্টুর দিকে। খুব জোরে একটা শ্বাস নিল বিট্টু। স্পষ্ট একটা মাম্মির গায়ের গন্ধ যেন এখনও আছে ঘরটায়।

একজন এগিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলটার কাছে। শালুতে বাঁধা মাটির হাঁড়িটা দেখিয়ে বলল, এইটে নাও ছোটবাবু।

বিট্টু হাঁড়িটা উঠিয়ে নিল। ঘরের বাইরে এসে দেখল বাবা আর সরোজ বক্সী দাঁড়িয়ে আছে। দয়াল সান্যাল ছেলের কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পর্চ পর্যন্ত এলেন, বিট্টু হাঁড়িটা কোলে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। পাশে সরোজ বক্সী। এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময় ড্রাইভারের পাশে যেমন চুপচাপ বসেছিল সৌমেন সরকার, সেরকমই চুপচাপ উঠে বসে থাকল ড্রাইভারের পাশে।

বাবুঘাট। ড্রাইভারকে বললেন সরোজ বক্সী।

গাড়িটা গেটের দিকে এগোতেই ড্রাইভারের আয়না দিয়ে বিট্টু দেখল দয়াল সান্যাল বাড়ির ভেতর চলে যাচ্ছেন।

বাইরে আলো নিভে আসছে। শেষ বিকেলের কলকাতা আরও চঞ্চল হয়ে উঠছে। একটা লাল আলোর সিগন্যালে দাঁড়াল গাড়িটা।

সরোজকাকা।

আনমনা ছিলেন সরোজ বক্সী। বিট্টুর কথায় মুখ তুলে চাইলেন।

আপনার বাড়ির কাছে খুব সুন্দর একটা গঙ্গার ঘাট আছে বলেছিলেন না?

হ্যাঁ, শোভাবাজারের ঘাট।

বাবুঘাটে না গিয়ে ওখানে চলুন না।

সৌমেন সরকার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে সরোজ বক্সীর দিকে চাইল।

ওখানে পৌঁছোতে অনেকক্ষণ লাগবে। অন্ধকার হয়ে যাবে। তা ছাড়া স্যারকে...

না, ওখানেই চলুন। দৃঢ় গলায় বলল বিট্টু।

একটু চুপ করে ভাবলেন সরোজ বক্সী। তারপর ড্রাইভারকে বললেন, একটা ওষুধের দোকান দেখে দাঁড় করাও তো গিরীশ, সৌমেন তুমি স্যারকে একটা ফোন করে বলে দাও আমরা শোভাবাজার ঘুরে আসছি।

একটু এগিয়ে রাস্তার একধারে একটা ওষুধের দোকান পেয়ে গাড়িটা দাঁড়াল। সৌমেন সরকার গাড়ি থেকে নেমে ফোন করতে গেল। দু'মিনিটের মধ্যে ফিরে

এসে সরোজ বক্সীকে বলল, স্যার আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন সরোজদা।

সরোজ বক্সী নেমে যাওয়ার পর, ড্রাইভারও গাড়ি থেকে নামল। বনেট খুলে রেডিয়েটরে জল ঢালতে থাকল।

গাড়ির মধ্যে বিট্টু একা। একদৃষ্টে চেয়ে আছে কোলে বসানো হাঁড়িটার ওপর। তারপর আস্তে আস্তে খুলে ফেলল লাল শালুটার এক দিক।

হাঁড়ির ভেতরটা অন্ধকার। কালো ছাইয়ের মধ্যে ভেসে আছে টুকরো টুকরো সাদা কীসব। ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে উঠিয়ে আনল খানিকটা ভিজে ভিজে ছাই।

মাম্মির ছাই। মাম্মির শরীর পুড়ে এই ছাই হয়েছে! ছাইসুদ্ধ হাতটা উঠিয়ে আনল নাকের কাছে। কীরকম একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। একটু ভাবল বিট্টু। তারপর হাতের ছাইটাকে বুকপকেটে নিয়ে নিল। হাঁড়ির মুখে লাল শালুটা আবার আগের মতো বেঁধে নিল।

মিনিট দশেক পরে সরোজ বক্সী আর সৌমেন সরকার গাড়িতে ফিরে এল। সরোজ বক্সী ড্রাইভারকে বললেন, শোভাবাজার চলো।

শোভাবাজারের ঘাটের দিকে যেতে যেতে কী একটা মনে হওয়াতে সরোজ বক্সী গাড়িটাকে একটু ঘুর রাস্তায় নিয়ে গেলেন। যে-চিন্তা করে গাড়িটা ঘোরালেন, প্রত্যাশামতো সেই জায়গায় পেয়ে গেলেন যামিনী ভট্টাচার্যকে। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দ্রুত যামিনী ভট্টাচার্যের কাছে এসে বললেন, যামিনীদা একটা কাজ করে দেবেন?

এসো আগে, বসো তো। কাজের কথা পরে হবে।

না যামিনীদা, খুব তাড়া আছে।

কী কাজ?

সরোজ বক্সী একটু ইতস্তত করে বললেন, যামিনীদা, পরে সব খুলে বলব আপনাকে। আমি আমার মালিকের ছেলেকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছি। ওর মা মারা গেছে। অস্থি বিসর্জন দিতে হবে। ওই সময় তো মন্ত্রটন্ত্র বলতে হয়। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন।

ভয়ানক বিরক্ত হলেন যামিনী ভট্টাচার্য। সেই বিরক্তিটা প্রকাশ করেই বললেন, তুমি আমাকে কেন বলছ? গঙ্গার ঘাটে কোনও পুরুতকে গিয়ে বলো।

সরোজ বক্সী হাত জোড় করে বললেন, অপরাধ নেবেন না। ছেলেটা এত ছোট... ঠিক আছে। ওকে বলব মাকে স্মরণ করে অস্থিটা বিসর্জন দিয়ে দিতে।

যামিনী ভট্টাচার্য এক মুহূর্ত থমকালেন। তারপর বিড়বিড় করে কিছু বললেন, ঠিক আছে চলো।

আকাশে চাঁদের আলোর তেমন জোর নেই। ঘাটের আলোগুলোও টিমটিমে। গঙ্গায় নামার সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো কাদায় পেছল। যামিনী ভট্টাচার্য বিট্টুর হাতের ওপরটা শক্ত করে ধরে সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গঙ্গার কাছে এলেন। হাতে হাঁড়িটা দিলেন। বিট্টুর নিষ্পাপ বিষণ্ণ চোখ দুটো দেখে পরম মমতায় ওর মাথায় হাত রাখলেন। সরোজ বক্সীকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর মায়ের নাম কী ছিল?

শ্রীমতী শিপ্রা সান্যাল।

কী গোত্র?

সরোজ বক্সী ঢোঁক গিললেন, এই রে, জানি না তো। সান্যাল তো বাৎসল্য হতে পারে।

যামিনী ভট্টাচার্য আবার বিরক্ত হলেন, ওভাবে আন্দাজে হয় না সরোজ। উনি কোন তিথিতে মারা গেছেন এসব জানা আছে?

সরোজ বক্সী আবার মাথা নাড়লেন।

যামিনী ভট্টাচার্য আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। বিট্টুকে খুব নরম গলায় বললেন, আমি যা বলছি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো বাবা। বলো, বিষ্ণুরোঁ...

অনেকক্ষণ থেকে কান্নাটা ভেতরে চেপে রাখতে পেরেছিল বিট্টু। এবার হাঁড়িটা বুকে জড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, মাম্মি!

যামিনী ভট্টাচার্য চুপ করে গেলেন। সরোজ বক্সী বিট্টুকে কিছু সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলেন। যামিনী ভট্টাচার্য বারণ করলেন। আর মন্ত্র না পড়ে বিট্টুকে বললেন, এবার হাঁড়িটা ভাসিয়ে দাও।

বিট্টু হাঁড়িটা ভাসিয়ে দিল। একটুখানি ভেসে গিয়েই হাঁড়িটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

সরোজ বক্সী চোখ বন্ধ করলেন। তারপর গঙ্গার জল ছেটাতে লাগলেন বিট্টুর আর নিজের মাথায়। যামিনী ভট্টাচার্য সরোজ বক্সীর কানের কাছে করুণ গলায় বললেন, আমি চললাম সরোজ। এ কাজ আর কোনওদিন করতে বোলো না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বিট্টু দেখল ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন বসে আছে ঘাটে। সরোজ বক্সীকে বলল, কাকা, একটু বসব এখানে?

বসবে? ঠিক আছে বসো।

বিট্টুর পাশে এসে বসলেন সরোজ বক্সী। বিট্টু জিজ্ঞেস করল, কাকা এখন জোয়ার না ভাটা?

ভাটা। যখন হাওড়ার ব্রিজের দিকে জল বয়, তখন ভাটা। জল সমুদ্রের দিকে চলে যায়। আর সমুদ্রের থেকে যখন জল ঢোকে তখন জোয়ার।

তার মানে মাম্মির ছাইটা সমুদ্রের দিকে চলে গেল?

সরোজ বক্সী চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো। এবার তোমার পোশাকটা পালটাতে হবে। তারপর বাড়ি ফিরতে হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে। স্যার চিন্তা করবেন।

আর একটু এখানে বসে থাকি না সরোজকাকা... বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।

সরোজ বক্সী আবার বিট্টুর পাশে এসে বসলেন। বললেন, তাই বললে হয় বিট্টুবাবা? জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে ম্যাডামের জন্য। তবু তো যেতেই হবে। আমার মা যখন চলে গিয়েছিলেন, তখন আমি অনেক ছোট। তোমার থেকেও ছোট। সবাইকেই একদিন এই কষ্টটা পেতে হয়...

কাকা, মাম্মি কেন সুইসাইড করল?

সেটাই তো কেউ বুঝতে পারছে না বিট্টুবাবা। সুইসাইড করাটাও একটা অসুখ, মনের অসুখ। না হলে ম্যাডামের মতো একজন যার কোনও দুঃখ ছিল না...

বিট্টুর ভেতরটা মুচড়ে উঠল, মায়ের কোনও দুঃখ ছিল না, বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা... সেটাই তো... ঝগড়া, অশান্তি, নিজেদের মধ্যে কথা বন্ধ, শোওয়ার ঘর ভাগ হয়ে যাওয়া, বিট্টুকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া। এগারো বছর বয়স হলেও বয়সের তুলনায় অনেক বেশি বোঝে বিট্টু।

চলো এবার আমরা উঠি।

এবার আর বিট্টু আপত্তি করল না। উঠে এল। গাড়িটা একদম অন্ধকার অন্ধকার জায়গায় দাঁড় করানো। বিট্টুদের আসতে দেখে সৌমেন সরকার একটা প্যাকেট নিয়ে এগিয়ে এল। সরোজ বক্সী প্যাকেটটার ভেতর থেকে দুটো সাদা কাপড় বের করে বললেন, তোমায় এবার এটা পরে নিতে হবে বিট্টুবাবা।

এটা কী?

কাছা। মা-বাবা চলে গেলে দশ দিন এটা পরে থাকতে হয়। কম্বলের আসনে বসতে হয়।

এখন পরতে হবে?

হ্যাঁ, এখনই।

এইখানে?

হ্যাঁ, সবাই এখানেই পরে। এখানটা অন্ধকার আছে, গাড়িটাও আড়াল আছে। আমরা ওদিকে দাঁড়াচ্ছি, তুমি পরে নাও। কোমরে জড়িয়ে নাও। তারপর আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

এবার বেঁকে বসল বিট্টু। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুতেই কাছা পরবে না। প্রমাদ গুনলেন সরোজ বক্সী। দয়াল সান্যালের কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে, শোকপালনের কোনও ত্রুটি যেন না হয়। কীসের পর কী করতে হবে, সব নিখুঁতভাবে বলে রেখেছেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে সরোজ বক্সী বললেন, ঠিক আছে, কাছেই আমার বাড়ি। বাড়িতে চলো। ওখানে বাথরুমে পরে নেবে।

গঙ্গার ধার থেকে গাড়িটা একটা সরু রাস্তা ধরে চিৎপুর রোডে ট্রাম লাইনের ওপর এসে পড়ল। সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়াতে বললেন সরোজ বক্সী। সৌমেন সরকার ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়িতেই বসে থাকল। সরোজ বক্সী বিট্টুকে নিয়ে একটা কাঁসার দোকানের পাশ দিয়ে একটা গলি ধরলেন। কয়েকটা বাড়ি এগোতেই একটা বড় বাড়ি এল। দরজা পেরিয়ে বিশাল খোলা একটা উঠোন। উঠোনটাকে ঘিরে চারদিকে তিনতলা বাড়িটা উঠেছে। প্রত্যেক তলার সামনে লম্বা টানা বারান্দা। উঠোন ছাড়িয়ে ওপরে ওঠার জন্য সরু একটা অন্ধকার সিঁড়ি ধরলেন সরোজ বক্সী। তারপর টানা বারান্দাটার মাঝামাঝি এসে একটা দরজায় কড়া নাড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজাটা খুলল অতসী। পিছনে একটা ফ্রক পরা মেয়ে। সরোজ বক্সী শশব্যস্ত হয়ে গলাটা খাদে নামিয়ে বললেন, বিট্টুবাবা... ছোটবাবু।

বিট্টুকে দেখেই অতসীর মুখচোখ পালটে গেল। ম্যাডাম আত্মহত্যা করেছেন এটা এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। সেই সন্ধেটার কথা সেদিন থেকে বারবার মনে হচ্ছে। মালকিন হয়েও কত অনায়াসে কত গল্প করেছিলেন। বীথিকে দিয়েছিলেন কানের দুল। স্বামী ম্যাডামের ছেলেকে আনতে গেছে। অতসীরও ইচ্ছে ছিল কপালপোড়া ছেলেটাকে একবার দেখবার। কিন্তু আজই সন্ধেতে বিট্টু বাড়িতে আসবে ভাবতেই পারেনি। তাড়াতাড়ি দরজার মুখটা থেকে সরে দাঁড়িয়ে অতসী বলল, এসো, এসো বাবা।

শিপ্রা বিট্টুকে শিখিয়েছিল গুরুজনদের সঙ্গে প্রথম আলাপে প্রণাম করতে হয়। সরোজকাকার বাড়িতে যখন এসেছে, তার মানে ইনি কাকিমা। বিট্টু নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল, অতসী প্রায় ছিটকে পিছিয়ে গেল। সরোজ বক্সী বিট্টুকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলেন। হরেক সাংসারিক জিনিস উপচানো একটা শোওয়ার ঘর। বিট্টুর হাতে কাগজের প্যাকেটটা দিয়ে বললেন, তুমি এঘরে এগুলো পরে নাও। আমি দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিচ্ছি।

ঘরের মধ্যে বিট্টুকে রেখে দরজাটা টেনে দিলেন সরোজ বক্সী। দরজার সামনে একটা অপরিসর জায়গা। দরজাটা বন্ধ থাকলেও পাল্লা দুটোর মধ্যে অনেকটা ফাঁক আছে। ঠিক বাইরে কেউ দাঁড়ালে ভেতরটা দেখতে পারে। অস্বস্তি হতে লাগল বিট্টুর। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

বাবা, তুমি আজ এরোপ্লেনে চড়ে এলে?

বিট্টু বাচ্চা মেয়েটার গলা শুনতে পেল বাইরে। তবে সরোজ বক্সীর কোনও উত্তর পেল না। ঠায় দরজাটার ফাঁকটা দিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে নিশ্চিন্ত হল, ঠিক বাইরে কেউ নেই। তবু অস্বস্তিটা পুরোপুরি গেল না। জামার বোতামে হাত রাখল বিট্টু। তারপরেই চমকে উঠল। বুক পকেটটায় কিছু একটা খরখর করছে। মাম্মির ছাই। পকেটটা একবার খামচে ধরল বিট্টু। তারপর খুব সাবধানে খুলে ফেলল শার্টটা যাতে করে একটুও ছাই বাইরে না পড়ে। কোনওরকমে বেড় দিয়ে সাদা কাপড়ের টুকরোটা কোমরে জড়িয়ে আর খালি উর্ধ্বাঙ্গে টেনেটুনে আর একটা টুকরো জড়িয়ে ঘরের বাইরে এল বিট্টু। যে কাগজের প্যাকেটটাতে সাদা কাপড়গুলো ছিল সেটাতেই যত্ন করে ঢুকিয়ে নিয়েছে এতক্ষণ পরে থাকা শার্ট-প্যান্টটা।

বিট্টুকে দেখে তিন জনের তিন রকম প্রতিক্রিয়া হল। অতসী চোখে আঁচল চাপা দিল, ফিক করে হেসে উঠল বাচ্চা মেয়েটা আর সরোজ বক্সী একটা ব্যস্ত মুখ করে এগিয়ে গেলেন কাছাটা একটু ঠিক করে দিতে।

বীথির হাসি থামছিল না। সরোজ বক্সী ওকে মৃদু ধমক লাগালেন। অতসী বীথির হাতটা ধরে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেল। আর খুব দ্রুত একটা প্লেটে কয়েকটা রসগোল্লা আর এক গ্লাস জল নিয়ে এল।

আমি কিছু খাব না। বিট্টু প্লেটটা দেখে বলল।

অতসী জোরাজোরি করতে যাচ্ছিল কিন্তু থামিয়ে দিলেন সরোজ বক্সী, ঠিক আছে, চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি, রাত হচ্ছে, সারাদিন অনেক ধকল যাচ্ছে তোমার।

সকাল থেকে এই কয়েক ঘণ্টায় এত কিছু ঘটে যাওয়া। সকালটা মনে হচ্ছে যেন কতকাল আগের। সরোজ বক্সীর পিছন পিছন দরজার দিকে এগোতে এগোতে বিট্টু বলল, আসছি কাকিমা।

অতসী আবার আঁচলটা চোখে তুলল। পিছনে বীথি চুপ করে দাঁড়িয়ে। অন্ধকার সিঁড়িটা দিয়ে নামতে নামতে বিট্টু জিজ্ঞেস করল, সরোজকাকা, দিদিমার গ্রেভটা কোথায় জানেন?

প্রশ্নটা একটু নাড়া দিল সরোজ বক্সীকে। বড় ম্যাডাম যেদিন মারা গিয়েছিলেন দিনটা মনে পড়ল। তখন বিট্টুর জন্মই হয়নি। দয়াল সান্যাল সেদিন হরিতলা কটন মিলেই ছিলেন। দুপুরের দিকে ফোনে খবর এসেছিল। মার্থা মেমসাহেবের কবরস্থানের জায়গাটা কোথায় তা তাঁর খুব ভালভাবে জানা আছে। পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে। সেদিন শিপ্রা মেমসাহেব আর দয়াল সাহেবের সঙ্গে উনিও ছিলেন। জীবনে সেই প্রথমবার কবর দেওয়া চাক্ষুষ করেছেন। কয়েক মুঠো মাটিও দিয়েছিলেন মার্থা মেমসাহেবের কবরের ওপর। তবে এখন বিট্টুর কাছে এসব কথা চেপে গেলেন সরোজ বক্সী। যেভাবে ছেলেটা বাবুঘাটের বদলে শোভাবাজারে এল সেভাবে বাড়ি ফেরার পথে এখন মার্থা মেমসাহেবের কবরের কাছে যাবে বললে মুশকিল।

অনেকদিন আগেকার কথা তো। ঠিক এখন আর খেয়াল নেই।

একদিন আমাকে নিয়ে যাবেন?

একটু নিশ্চিন্ত হলেন সরোজ বক্সী। ছেলেটা অন্তত এখনই সেখানে যেতে চায় না। আপাতত এড়ানোর জন্য বললেন, ঠিক আছে।

অন্ধকার সিঁড়িটা শেষ হয়ে খোলা উঠোনটায় এসে পড়তেই সরোজ বক্সী মেয়ের গলা পেলেন, টা-টা।

একসঙ্গেই সরোজ বক্সী আর বিট্টু গলার উৎস সন্ধানে ওপরের দিকে চাইল। টানা বারান্দাটায় রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে মেয়েটা। বিট্টু একটু শুকনো হেসে হাতটা নাড়ল।

গাড়ির কাছে আসতেই বিট্টু দেখল একটু দূরে ড্রাইভার আর সৌমেন সরকার দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। বিট্টুদের দেখে সিগারেটটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সৌমেন সরকার নিচু গলায় সরোজ বক্সীকে বলল, আপনি দাদা বাড়ি পর্যন্ত এসে গিয়ে আবার উজান বেয়ে কেন যাবেন, গিরীশ আর আমি ছোটবাবুকে পৌঁছে দিচ্ছি।

দু'দিকে মাথা নাড়লেন সরোজ বক্সী।

তা হয় না সৌমেন। আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে।

কথাটা বিট্টুর কানে আসাতে প্রথমে ভেবেছিল সৌমেন সরকারকেই সমর্থন করবে। কিন্তু সরোজ বক্সীকেও কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করল না। সকাল থেকেই একদম বিট্টুকে আগলে আছেন। ওঁর ওপর একটা ভরসা জন্মাচ্ছে আস্তে আস্তে করে।

সরোজ বক্সী সৌমেন সরকারকে বললেন, তুমি তো দমদমের দিকে যাবে, তুমি বরং এগিয়ে যাও।

সৌমেন সরকার আমতা আমতা করতে থাকল।

আমি এগোব? স্যার কিছু মনে করবেন না?

মাথা ঝাঁকালেন সরোজ বক্সী। জোর দিয়েই বললেন, না, না। আমি হয়তো রাতে ও বাড়িতেই থেকে যাব। তুমি বাড়ি চলে যাও।

বিট্টু খুশিই হল। সৌমেন সরকার লোকটা চুপচাপ ড্রাইভারের পাশে বসে থাকে। চোখ সামনের দিকে কিন্তু কান খাড়া থাকে। বিট্টু কিছু বললেই ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখে। অদ্ভুত একটা লোক।

চিৎপুর রোড ছাড়িয়ে গাড়িটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল। রাত বাড়ছে। আসবার পথে যে যানজট হয়েছিল, এখন অনেকটাই ফাঁকা। বিট্টু আর সরোজ বক্সী দু'জনে জানলার দু'দিকে মুখ করে বাইরেটা দেখতে থাকল।

৬৪

বিট্টু দয়াল সান্যালের সামনে এসে দাঁড়াল। আজ সাত দিন হয়ে গেল, তবু ছেলেটা যখন সাদা কাছা নিয়ে দয়াল সান্যালের সামনে এসে দাঁড়ায় বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। শিপ্রা যেটা করেছে, সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় করেছে। শিপ্রা চলে যাওয়াতে কোনও অনুভূতি হয়নি। আসলে স্ত্রী হলেও শিপ্রার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই তো ছিল না। তবে শিপ্রার এই পরিণতিটা দয়াল সান্যাল স্বপ্নেও ভাবেননি। তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল দুটো তলিয়ে যাওয়া সম্পর্কের মধ্যেও খড়কুটোর মতো ভেসে থাকা বিট্টু। আর এখন সেই এগারো বছরের ছেলেটার চোখে চোখ রাখতে পারেন না। কচি চোখ দুটো কেবল যেন একটা প্রশ্নের জবাবদিহিই চেয়ে যাচ্ছে।

উলটোদিকের চেয়ারটা দেখিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, বসো।

বিট্টু চেয়ারটা টেনে নিয়ে চুপ করে বসল। হাতের কাছে একটা কাচের পেপার ওয়েট নিয়ে একমনে নখের আঁচড় কাটতে থাকল।

আর কয়েকটা দিন কষ্ট করে নাও। শনিবারের পর আর এসব পরতে হবে না।

বিট্টু খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। বাড়ির লনে ডেকরেটরের লোকেরা বাঁশ পুঁতছে। সরোজ বক্সীর কাছে শুনেছে, খুব বড় প্যান্ডেল হবে ওখানে। দু'দিন অনেক লোকজন খাবে। একদিন নিরামিষ আর একদিন আমিষ। দয়াল সান্যাল বিট্টুর দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন, তোমার মায়ের কাজে তোমার কোনও বন্ধুবান্ধবকে বলবে নাকি?

বিট্টু চুপ করে দু'দিকে মাথা নাড়ল। কলকাতায় তার কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। সেটা দয়াল সান্যালই হতে দেননি। একসময় যখন এ বাড়িতে থাকত একটা মালির ছেলের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল দেখে দয়াল সান্যাল তাকে চাকরি থেকেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর কার্শিয়াং-এর যে বন্ধুরা কলকাতার তারা সবাই এখন বোর্ডিং-এই। কেউই কলকাতায় নেই। তবে একজনের নাম মাথায় এল বিট্টুর। রবার্ট মামা। নামটা

মুখে আনতে গিয়েও গিলে ফেলল বিট্টু। সেই সঙ্গেই ভেতরে কয়েকটা বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল। মাম্মির ছাইটা দিদিমার গ্রেভ ইয়ার্ডের পাশে পুঁতে আসতে হবে। দিদিমার গ্রেভ ইয়ার্ডটা কোথায় সরোজকাকা জানে না, তবে রবার্ট মামা নিশ্চয়ই জানে। আর একটা ব্যাপারেও বিট্টু নিশ্চিন্ত, রবার্ট মামার কথা বললে বাবা কিছুতেই মেনে নেবে না।

দয়াল সান্যাল চুপ করে বিট্টুর মুখের দিকে চাইলেন। ছেলেটা ঘরে ঢুকে অবধি একটাও কথা বলেনি। চোখটা এখনও খোলা জানলার বাইরে। ক'দিন ধরে চিন্তাটা মনের মধ্যে পাক দিচ্ছে ছেলেটার এই পরিবর্তন দেখে। ছেলেটা কি এবার ওঁর বিরুদ্ধে ঘুরে যাচ্ছে? দ্রুত সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিলেন দয়াল সান্যাল। যে কাজটা শুরু করতে হবে, সেটা করতে হবে, আজই এবং এখনই। গলাটা একটু খাঁকরিয়ে পরিষ্কার করলেন।

শোনো বাবা। তুমি এখন বড় হচ্ছ। কিছু জিনিস তোমার এখন থেকেই জানা উচিত, বুঝতে শেখা উচিত।

বিট্টু মুখ তুলে বাবার দিকে চাইল।

শোনো, আমি জানি তোমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে। তুমি ভাবছ তোমার মায়ের সঙ্গে আমার কী এমন হয়েছিল যার জন্য তোমার মা এমন কাণ্ড করে বসল। এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব কঠিন। এটা তোমার বয়সের জন্য নয়। তোমার মতো আমিও একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি—তোমার মা এত বড় সিদ্ধান্তটা নেওয়ার আগে কেন একবারও তোমার কথা চিন্তা করল না।

একটু থামলেন দয়াল সান্যাল। বিট্টুর মুখ এখন তাঁর দিকে। চোখের ভাষা পালটেছে। চোখের কোণে কৌতূহল ঝিলিক মারছে। দয়াল সান্যাল আবার শুরু করলেন, আসলে তোমার মায়ের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল, একটা অতীত।

এগারো বছরের একটা ছেলের এসব বোঝার বয়স নয়। সেটা দয়াল সান্যালও বোঝেন। তবু তাঁর মনে হচ্ছে এসব কথা শুরু করার জন্য আর একটা দিনও দেরি করা উচিত নয়। একদিন দেরির মূল্য হয়তো সারাজীবনে একসময় ধরাছোঁওয়ার বাইবে চলে যাবে।

তোমার দিদিমা একটা খুব খারাপ কাজের সঙ্গে সারা জীবন কাটিয়েছেন।

বিট্টুর জিজ্ঞাসু চোখের ওপর ভুরু দুটো একটু কুঁচকোল। দয়াল সান্যাল এবার চোখটা নামিয়ে নিলেন।

সেই খারাপ কাজটা কী ছিল সেটা বোঝার মতো বয়স এখনও তোমার হয়নি। কিন্তু বড় হয়ে একদিন বুঝতে পারবে। দিদিমার পরিচয়ের জন্য সেদিন লজ্জা পাবে। তুমি তো জানো খারাপ কাজ করলে অনেক খারাপ ফল পেতে হয়। যারা খারাপ কাজ করে তাদের চারদিকের লোকজনের ওপর পড়ে তার খারাপ ফল। তোমার মায়ের ওপরও তেমনই তোমার দিদিমার খারাপ কাজের ফল পড়েছিল। তুমি তোমার বন্ধুদের মায়েদের কেমন দেখেছ, তারা বাড়িতে থাকে, বাড়ির কাজকর্ম করে, তোমার মা সেরকম ছিল না। তোমার মা চাইত খালি বাইরে বাইরে খারাপ জায়গায় ঘুরতে। এমনকী তোমাকে

নিয়েও। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই একবার তোমার মা তোমাকে নিয়ে হরির ঝিলের কাছে একটা ভাঙা বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে এত খারাপ কাজ করেছিল যে পুলিশ পর্যন্ত গিয়েছিল। সেদিন... যাক গে। তারপর তোমাকে হস্টেলে পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না।

বাবার সব কথাগুলো শুনে মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করে দিয়েছে। মা খারাপ ছিল? মা খালি বাইরে বাইরে ঘুরত? মা একটুও ভালবাসত না বিট্টুকে? তাই মা হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল?

বাবা আরও অনেক কথা বলছিল মায়ের সম্পর্কে। ছোট্ট মাথায় সেসব কথা আর ঢোকাতে পারছিল না বিট্টু। একসময় দয়াল সান্যালও ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ছাড়া পেয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল বিট্টু। খিদে খিদে পাচ্ছিল। টেবিলের ওপর একটা শ্বেতপাথরের থালায় অনেক ফল কে যেন কেটে রেখে গেছে। এক কুচি আপেলে কামড় দিয়ে খুব বিস্বাদ লাগল। আর হঠাৎ করে তখনই আবার মনে পড়ে গেল মায়ের ছাইয়ের কথা।

সরোজ বক্সী ঘরে ঢুকতে ইশারায় দয়াল সান্যাল ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে বললেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে দয়াল সান্যালের টেবিলের উলটোদিকে এসে দাঁড়ালেন সরোজ বক্সী। দয়াল সান্যাল খুব কম ক্ষেত্রেই বেতনভুক কর্মচারীদের ওঁর সামনে বসতে বলেন। কিন্তু আজ বসতে বলতেই হল। সরোজ বক্সীর সঙ্গে আলোচনা একদম নিচু গলায় করতে হবে।

টেবিলের ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, খবরটা জোগাড় হয়েছে?

সরোজ বক্সী ঘাড় নাড়লেন।

হ্যাঁ স্যার। তবে পুরোটা নয়। বিট্টুবাবার ওয়ার্ডেনের কাছে শিলিগুড়ি থেকে আমাদের লোক গিয়েছিল। ওয়ার্ডেন বলেছে ম্যাডাম প্রিন্সিপালের কাছে চিঠি লিখে স্পেশাল পারমিশন চেয়েছিলেন, রবার্টের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা বিট্টুবাবাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য...

কী কারণ লিখেছিল শিপ্রা?

এর বেশি আর কিছু ওয়ার্ডেন বলতে পারেনি স্যার। আমাদের লোকও আর কোনও চ্যানেল খুঁজে পায়নি প্রিন্সিপালের অফিস থেকে চিঠিটা বের করার। তবে রবার্ট বিট্টুবাবাকে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল সেই জায়গাটার আন্দাজ পাওয়া গেছে।

দয়াল সান্যালের মুখচোখে একটা উত্তেজনা দেখা দিল, কোথায়?

দার্জিলিং থেকে প্রায় আট কিলোমিটার আগে একটা গোর্খা বস্তিতে স্যার। যে গাড়িতে করে রবার্ট আর বিট্টুবাবা ওখানে গিয়েছিল, সেই গাড়িটার ড্রাইভারকে ধরা গেছে স্যার। সে বলেছে রবার্ট সারা দিনের জন্য গাড়িটা ভাড়া করে রেখেছিল। বিট্টুবাবাকে হস্টেলে নামিয়ে দেওয়ার পর রবার্ট হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে ওই গাড়িটা করেই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে চলে এসেছিল বিকেলবেলায়। তারপর রবার্ট...

দয়াল সান্যাল বিরক্ত হলেন, রবার্ট কখন ট্রেনে চেপেছে, কখন ট্রেন থেকে নেমেছে, এসব জানতে আমি ইন্টারেস্টেড নই। বিট্টুকে ও ঠিক কোথায় নিয়ে গিয়েছিল?

সরোজ বক্সী চুপ করে থাকলেন। ড্রাইভার গোর্খা বস্তিটার বাইরে রাস্তার একপাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সেখান থেকে রবার্ট বিটুকে নিয়ে বস্তিটার ভেতরে চলে গিয়েছিল, কিন্তু ঠিক কোথায়, কার কাছে, কী জন্য গিয়েছিল তার কোনও হদিশ ড্রাইভার দিতে পারেনি। অথচ এগুলো জানা সত্যি খুব জরুরি। কারণ ঠিক ওই সময়ই মেমসাহেব এখানে...।

সরোজ বক্সীর ভেতরে ভেতরে একটা অসম্ভব শ্রদ্ধা রয়েছে শিপ্রার জন্য। সেই সঙ্গে বিটুর জন্য আছে একটা অপত্য স্নেহ। ঠিক কী চেয়ে গেছে শিপ্রা বিটুর জন্য? সেটুকু করতে পারলেই মেমসাহেবকে সঠিক শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে। মনের ভাবটা যতটা পারেন দয়াল সান্যালের কাছে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

একটু উসখুস করে সরোজ বক্সী বললেন, স্যার একটা কথা বলব? সময়মতো আস্তে আস্তে করে এটা বিটুবাবাকেই জিজ্ঞেস করি। ও আমার কাছে অনেক কথাই বলতে চায়। ঠিক সুযোগমতো জিজ্ঞেস করলে সবটুকু জানা যাবে।

দয়াল সান্যাল দু'দিকে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

নাঃ সরোজ। তোমাকে আগেও বলেছি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না। বিটুর কাছ থেকে নয়, এটা জানতে হবে রবার্টের কাছ থেকে। বিটুর কাছ থেকে তুমি হয়তো জানতে পারবে কার কাছে শিপ্রা ওকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কেন পাঠিয়েছিল জানতে পারবে না। আমি জানি না মেয়েটা নিজেকে শেষ করে যাওয়ার আগে আর কী কী ক্ষতি আমার জন্য করে দিয়ে গেছে। কিন্তু বিটুর মনটা আমাকে শক্ত করে ধরে রাখতেই হবে। তুমি রবার্টের সঙ্গে দেখা করো। হিতেনকে কাজে লাগাও। শিপ্রার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকেও খুব ইন্টারেস্টিং কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেছে। রবার্টের সঙ্গে দেখা হওয়াটা ঠিক করো। ওকে ভাঙার জন্য তোমাকে বলে দেব পয়েন্টগুলো।

৬৫

পার্ক স্ট্রিটটা আলো ঝলমল করছে। ফুটপাথ ঘেঁষে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সি ড্রাইভার সরোজ বক্সীকে বলল, ছ'টাকা কুড়ি হয়েছে। পুরো সাড়ে ছয়ই দিন।

সরোজ বক্সী তর্ক করলেন না। পুরো সাড়ে ছয় দিয়েই ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ে এদিক-ওদিক চোখ বুলোতে লাগলেন। আর অল্প চোখ বুলিয়েই খুঁজে পেয়ে গেলেন হিতেন মজুমদারকে। হিতেন মজুমদারকে জোগাড় করে দিয়েছে নির্মল চ্যাটার্জি। লোকটা নানান রকম ছুটকো কাজ করে। আর যেসব কাজে অন্ধকার গলিঘুঁজি আছে, সেসব কাজে হিতেনের উৎসাহ আর পয়সার খাঁইয়ের শেষ নেই। রবার্টের সঙ্গে বহুদিন আগে পরিচয় হয়েছিল। তারপর শেষবারের মতো দেখেছিলেন মার্থা মেমসাহেবের কবরে মাটি দেওয়ার দিন। সরোজ বক্সী নিজেই কথা বলতে পারতেন। তবু দয়াল সান্যাল হিতেনকে কাজে লাগাতে চাইলেন। কারণ সরোজ বক্সীর সোজা আঙুলে কাজ

না হলে হিতেনের বেঁকা আঙুলকে কাজে লাগাবেন দয়াল সান্যাল। আর প্রথম দিন থেকেই বার্তাটা পৌঁছে দিতে চান রবার্টের কাছে।

হিতেন মজুমদার কথা রেখেছে। ঠিক সময়মতোই ঠিক করা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। সরোজ বক্সীকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসতে থাকল। খয়াটে শরীরটার ওপর পাতলা ফিনফিনে কাপড়ের একটা গায়ে এঁটে বসা জামা। বিশাল ঘেরের বেলবটম প্যান্টটা পায়ের নীচে ফাতনার মতো পতপত করছে। কাছে এসে কানচাপা চুলগুলোতে আঙুল চালিয়ে বলল, আসুন দাদা। রবার্টের সঙ্গে সব কথা বলে রেখেছি।

সরোজ বক্সী হাতের ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, ঠিক আছে। আমি দাঁড়াচ্ছি এখানে ডাকো ওকে।

হিতেন কাঁধ ঝাঁকাল, সেটা হবে না দাদা। বড্ড দেমাক। ঠাকুরদার বাপ সাদা চামড়া ছিল তো। চলুন না ওর বারে চলুন, খারাপ লাগবে না। চোখ মটকাল হিতেন।

সরোজ বক্সী হিতেনের পিছন পিছন হাঁটতে আরম্ভ করলেন। কয়েকটা নিয়ন ঝলমলে দোকান পেরিয়ে একটা বারের সামনে পৌঁছোলেন। দয়াল সান্যালের সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটে বহুবার এলেও কোনও বারের ভেতর কখনও ঢোকেননি। উর্দিধারী এক বিশাল চেহারার দারোয়ান দরজা খুলে দিতেই সবকটা ইন্দ্রিয়তে একটা ঝাঁকুনি খেলেন সরোজ বক্সী।

ভেতরটায় লাল হলদেটে আলো-আঁধারি। উগ্র বিদেশি পারফিউম আর মদের একটা ঝাঁঝালো গন্ধের অদ্ভুত মিশেল। উঁচু আওয়াজে বাজছে জনপ্রিয় হিন্দি গান। এই গান কালো চাকা নিঃসৃত নয়। বাদ্যযন্ত্রীরা সব সার দিয়ে এক কোণে বাজিয়ে চলছে তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলো। কয়েক পা ভেতরে ঢুকে গেলে রেস্তোরাঁর ভেতর দিকটা আর একটু স্পষ্ট হয়। চকচকে অন্তর্বাসের ওপর ফিনফিনে একটা ঢোলা জোব্বার মতো পরে উদ্দাম শরীর দুলিয়ে যাচ্ছে একটা মেয়ে।

হিতেনের পিছনে পিছনে এসে একটা টেবিলে বসলেন সরোজ বক্সী। হিতেন চকচকে চোখে চেয়ে বলল, কী খাবেন দাদা? হুইস্কি না রাম? অবশ্য ভাল স্কচও দেখতে পারেন।

সরোজ বক্সী মাথা নাড়লেন।

আমার ওসব চলে না। তুমি রবার্টকে ডাকো।

দাঁড়ান দাদা, এসব জায়গায় এসেই চলে যাওয়া যায় না। আমার জন্য একটা ভ্যাট সিক্সটি নাইন বলছি। একবার টেস্ট করে দেখতে পারেন দাদা, দারুণ মাল।

বললাম তো আমি ওসব খাই না। তুমি যা খাবে তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও আর আসল কাজটা করে দাও।

সরোজ বক্সী ভেতরের দিকে চোখ ঘোরালেন। এই রেস্তোরাঁটায় বড়ই বেমানান তিনি। এখানে পুরুষেরা হয় কোট টাই প্যান্ট পরা, না হয় হিতেনের মতো ছকড়া-বকড়া জামার সঙ্গে বড় বড় ফাঁদের বেলবটম পরা। মহিলারা কোথাও চড়া, কোথাও উগ্র। মনের মতো পানীয়ের অর্ডার দিয়ে হিতেন বলল, এখানে কিন্তু অনেক জিনিস দেখতে পাবেন দাদা, শুধু চোখ কান খোলা রাখতে হবে।

সরোজ বক্সী কথাটা ধরতে পারলেন না। ধুতি আর সাদা বাংলা হাফ শার্ট পরে এই পরিবেশে এমনিতেই নিজেকে অন্য গ্রহের আগন্তুক মনে হচ্ছে। এখন তাড়াতাড়ি রবার্টের সঙ্গে কাজটা মিটে গেলে বাঁচেন। সরোজ বক্সীর মুখের অবস্থা দেখে হিতেন ফিক করে হেসে ফেলে বলল, ওই কোনায় টেবিলটা দেখুন। ওখানে মেয়ে দুটোকে দেখছেন? ওরা কারা জানেন? কলগার্ল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরোজ বক্সী একবার তাকালেন। মেয়েগুলোকে দেখে ওঁর চোখমুখের প্রতিক্রিয়া কী হয় দেখার জন্য হিতেন গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে মিটিমিটি হেসে সরোজের দিকে চেয়ে আছে। সরোজ বক্সী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। এই পেশার মেয়েদের দয়াল সান্যালের সঙ্গে কাজের সূত্রে কিছু কম দেখেননি। শিপ্রা মেমসাহেবের মা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে নিজের বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। দয়াল সান্যাল কখনওই সেখানে যেতেন না, এমনকী মার্থা মেমসাহেব শিপ্রা মেমসাহেবকেও কখনও যেতে দিতেন না। মা-মেয়ের দেখা হত বাইরে কোনওখানে। সরোজ বক্সীর দায়িত্ব পড়ত গাড়ি নিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে গিয়ে মেমসাহেবের মাকে নিয়ে আসা আর পৌঁছে দিয়ে আসা। সেইসব সময়ে ওইসব মেয়েদের চটুল মন্তব্য আর আহ্বানে প্রথম প্রথম কান গরম হত তারপর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এসব ইতিহাস হিতেন কিছুই জানে না। ভাবছে মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভদ্রলোকের চোখের সামনে কয়েকজন নির্বিষ কলগার্লকে দেখিয়ে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। নির্লিপ্ত চাহনিটা ছেড়ে এবার অসহিষ্ণু হলেন, কী হল, তোমার রবার্ট কোথায়?

হিতেন বড় একটা চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে একজন ওয়েটারকে ডেকে আর একবার গ্লাসটা ভরতি করতে আর রবার্টের কথা বলল। ওয়েটার একটু পরে এসে ফাঁকা গ্লাসটায় মাপমতো পানীয় ঢেলে গেল আর তার পিছনে পিছনেই টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রবার্ট। এক লহমা দেখেই চিনতে পারল সরোজ বক্সীকে। তবে সেটা প্রকাশ করল না।

সরোজ বক্সী দেখলেন রবার্ট এই ক'বছরে আরও ঝকঝকে হয়েছে। ছেলেটার শরীরে যে বিলিতি রক্তের মিশ্রণ আছে, সেটা শরীরটা দেখলেই বোঝা যায়। টানটান নির্মেদ ফরসা সুপুরুষ চেহারা। তবে মুখের পেশিগুলো একটু কঠিন। হিতেন পরিচয় করিয়ে দিল।

রবার্টভাই, ইনিই সরোজদা। সান্যাল সাহেবের কাছ থেকে আসছেন। তোমাকে তো বলেছিলাম...

সরোজ বক্সী খুঁটিয়ে দেখলেন রবার্টের মুখের পেশিগুলোর কোনও পরিবর্তন হল না। এমনকী অভিবাদনও করল না।

বসুন। সরোজ বক্সী পাশের ফাঁকা চেয়ারটা দেখিয়ে ছোট্ট করে বললেন।

রবার্ট কাটা কাটা গলায় বলল, অন ডিউটি আমরা কাস্টমারদের সঙ্গে বসি না।

সরোজ বক্সী রবার্টের মনোভাবটা দ্রুত বুঝে ফেললেন। এরা হল সেই শ্রেণির লোক যারা শিপ্রা মেমসাহেবের গুণগ্রাহী আর তাঁর জীবনের পরিণতির জন্য দয়াল সান্যালকে ঘেন্না করে। সরোজ বক্সী তাই দ্রুত কাজের প্রসঙ্গে এলেন, চড়া সুরের ঝংকারের ওপর

গলাটা চড়িয়ে বললেন, আমি কিন্তু এখানে আপনার সঙ্গে দেখা করে কয়েকটা কথা বলতেই এসেছি। হিতেন বোধহয় আপনাকে বলেছে।

রবার্টের মুখের কাঠিন্য কমল না। তবে সরোজ বক্সীর উঁচু গলার আওয়াজে একটু সাবধান হল। দ্রুত এপাশ ওপাশ একবার তাকিয়ে বলল, বলুন...

আপনি কার্শিয়াং-এ বিট্টুর হস্টেলে গিয়েছিলেন?

রবার্টকে হিতেন আগেই বলেছিল দয়াল সান্যালের লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে চায়। দয়াল সান্যালের লোক ওর সঙ্গে দেখা করলে অবধারিতভাবে যে প্রশ্নটা উঠে আসবে সবার আগে সেটা হল শ্যারনের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ। অথচ রবার্ট এ বিষয়ে নিজেই বিন্দুবিসর্গ কিছু জানত না। এমনকী খবরটাও পেয়েছিল তিন দিন পরে ইংরেজি কাগজে দয়াল সান্যালের বিজ্ঞপ্তি দেখে। তবে শ্যারন যে ক'দিন বেঁচে ছিল দয়াল সান্যালের বউ শিপ্রা হয়ে, অনেক সাহায্যের চেষ্টা করে গেছে রবার্টদের জন্য। তাই শ্যারনের পবিত্র আত্মার ওপর অকৃতজ্ঞতা দেখাতে পারবে না। তা ছাড়া শ্যারনের জন্যই তো আর কিছু দিনের মধ্যে জীবনটাকে পালটে ফেলতে পারবে...

সরোজ বক্সীর করা প্রশ্নটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে রবার্ট বলল, আপনার আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে?

সরোজ বক্সীও মুখে কাঠিন্য নিয়ে এলেন। হিতেন মজুমদার কিছু বলতে যাচ্ছিল, সরোজ বক্সী হাত তুলে ওকে থামিয়ে বললেন, আপনার কী মনে হয়, এই মুহূর্তে দয়াল সান্যালের আপনার কাছ থেকে আর কিছু জানার আছে?

আমি যদি বিট্টুর হস্টেলে গিয়েই থাকি, বিট্টুর মায়ের প্রপার চিঠি নিয়েই গিয়েছিলাম। ওর প্রিন্সিপালের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

সে খোঁজ আমরা পেয়েছি। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে তারপর আপনি বিট্টুকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন?

রবার্ট চুপ করে গেল। হিতেন একটু উসখুস করে বলল, ভাই রবার্ট, তোমাদের ছেলেটাকে বলো না আরেকটা দিতে...

রবার্ট ইশারায় একজন ওয়েটারকে ডাকল। তারপর নিচু গলায় তাকে বলল, রিপিট! অওর সাব কে লিয়ে এক লেমনেড।

হিতেন আবার ক্যাবারে ড্যান্সারের স্বচ্ছ আবরণে মোড়া শরীরে মন দিল। মৌজ করে চটুল হিন্দি গানের সুরে টেবিলে আঙুল ঠুকতে থাকল। লোকটার এখন আর সরোজ বক্সী আর রবার্টের কথাবার্তায় খুব একটা আগ্রহ নেই। সরোজ বক্সী এই সুযোগটাই খুঁজছিলেন। হিতেন সব জানুক এটাও একদমই ইচ্ছেতে নেই। গলাটা একটু নামিয়ে রবার্টকে বললেন, আপনার এখানে বসতে অসুবিধা। দশ মিনিটের জন্য বাইরে আসতে পারবেন?

রবার্ট একটু ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। তবে বেশিক্ষণ নয়। এখন একদম পিক আওয়ার্স। আপনি একটু বসুন। আমি একবার ম্যানেজারকে বলে আসি।

দু'মিনিটের মধ্যেই রবার্ট ফিরে এল। সরোজ বক্সী হিতেন মজুমদারকে বললেন, তুমি খাও। আমি একটু বাইরে ঘুরে আসছি।

পার্ক স্ট্রিটে সন্ধেবেলায় ফুটপাথের চরিত্রটা একটু বদলে যায়। সকালে ফুটপাথে চলা মানুষগুলোর সঙ্গে সন্ধের মানুষগুলো কেমন যেন অন্যরকম। রবার্ট রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে একটু এগিয়ে গেল। এসময় একদম রেস্তোরাঁর দরজার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে সরোজ বক্সীর সঙ্গে ঠিক খোলামেলা কথা বলা যাবে না। অনেক কাস্টমারই বাঁধা। মুখ চেনা, অনবরত তারা ঢুকবে বেরোবে। সমানে গুডইভনিং, গুডনাইট বলে কেঠো হেসে অভিবাদন করতে হবে। তা ছাড়া একটা সিগারেট খেতেও খুব ইচ্ছে করছে। কাস্টমারদের সামনে ওটা খাওয়াও নিষিদ্ধ।

খানিকটা গিয়ে ফুটপাথ ঘেঁষা গুমটি সিগারেটের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ধরিয়ে বলল, হ্যাঁ, বলুন এবার।

দু'পক্ষের চোখেই আর সেই কাঠিন্যের লড়াইটা নেই। সরোজ বক্সীর গলাটাও একটু আন্তরিক শোনাল।

শুনুন রবার্ট। এমনিতে সান্যাল পরিবারের দিক থেকে আপনার সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই। আপনার সঙ্গে ম্যাডামের যা সম্পর্কই থেকে থাকুক, সেটা নিয়ে সান্যাল সাহেবের কোনও চিন্তা ছিল না। সান্যাল সাহেব আপনাকে তো চেনেনই না। কিন্তু ম্যাডামের আত্মহত্যার সময়টায় বিট্টুকে নিয়ে হস্টেলের বাইরে থাকাটা সান্যাল সাহেবকে ভাবাচ্ছে। আপনি ঠিক করে বলুন তো ম্যাডাম আত্মহত্যা করার আগে বিট্টুর সঙ্গে কোনও কথা বলেছিলেন?

রবার্ট মাথা নাড়ল, না।

তা হলে বিট্টুকে নিয়ে ওই সময় আপনি বাইরে কেন গিয়েছিলেন?

রবার্ট এবার আরও নরম হল। আর কিছুদিনের মধ্যে জীবনটাকে পালটে ফেলবে। দয়াল সান্যালের সঙ্গে আর কোনও নতুন ঝামেলায় যেতে চায় না। এমনিতেই এর মধ্যে হিতেনের মতো একজন লম্পট গুন্ডাকে দয়াল সান্যাল জড়িয়ে দেওয়ায় অস্বস্তিটা বেড়েছে। মনে মনে শিপ্রার আত্মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল রবার্ট।

বিশ্বাস করুন, শ্যারন শুধু আমাকে বলেছিল বিট্টুর কাছে একবার যেতে ওইদিন। তারপর আমাকে বলেছিল বিট্টুকে নিয়ে ব্রাদার ডি'সুজার কাছে ওইদিন সকালবেলাটায় থাকতে...

ব্রাদার ডি'সুজা কে?

আমিও চিনতাম না ওঁকে। বিট্টুকে যেদিন নিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগের দিনই গিয়ে আলাপ করে এসেছিলাম। শ্যারন একটা চিঠি দিয়েছিল সেটা পৌঁছে দিয়ে বিট্টুকে ওঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। কী লিখেছিল শ্যারন চিঠিতে তা জানি না। ব্রাদার ডি'সুজাও বলেননি।

সরোজ বক্সী একটু চুপ করে থেকে আজ সকালে দয়াল সান্যালের দেওয়া তথ্যগুলো আস্তিন থেকে বের করলেন।

আপনি নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু জানেন, কিন্তু বলছেন না। সান্যাল সাহেব কিন্তু ছেড়ে দেবেন না। ম্যাডামের একটা পাসবই পাওয়া গেছে। অ্যাকাউন্টটা গোপনে

ছিল। সেই পাসবইয়ে দেখা গেছে শেষ তিনটে চেকে উনি আপনাকে মোট পনেরো হাজার টাকা দিয়েছেন। দুই, তিন আর দশ—তিন দফায়। এই ব্যাপারটা পুলিশও নোট করেছে। পুলিশ কিন্তু আপনাকে এই আমার মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করবে না।

যে দৃঢ়তা রবার্ট দেখাবে ভেবেছিল সেটা অনেকক্ষণ আগেই ভাঙতে শুরু করেছিল। প্রতিপক্ষ অসম এটা ভেতর ভেতর বুঝতে আরম্ভ করেছে। তা ছাড়া ও পক্ষের খুঁটিটাই উপড়ে গেছে। শ্যারন আগে দয়াল সান্যাল সম্পর্কে কিছুই বলত না। কিন্তু শেষের দিকে টুকরো টুকরো ভাবে কিছু দুঃখের কথা বলেছে। তাতে দয়াল সান্যালের চরিত্রের একটা ছবি আঁকা হয়ে গেছে রবার্টের ভেতর। বড়লোকদের এই চরিত্র রাতের পর রাত রবার্ট দেখেছে বারে। রবার্টের মতো সামান্য লোকেদের এক তুড়িতে শেষ করে দিতে পারে। জীবনটা পালটানোর যে শেষ সুযোগটা শ্যারন করে দিয়েছে সেটা আর কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে রাজি নয় রবার্ট। তবে দয়াল সান্যালের পক্ষ থেকে এই সরোজ বক্সী লোকটা ঠিক কী চাইছে এখনও স্পষ্ট নয়।

অস্পষ্টতা পরিষ্কার করলেন না সরোজ বক্সী। শুধু বললেন, সান্যাল সাহেব নিজে একবার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

রবার্ট আর কোনও চিন্তা না করে বলল, ঠিক আছে আমি দেখা করব। কোথায় কবে আপনি জানিয়ে দেবেন।

সরোজ বক্সীর মুখে প্রসন্নতার রেখাগুলো ফুটে উঠল। দু'মিনিটেই কাজ হয়ে যাবে ভাবতে পারেননি। হিতেন রবার্ট সম্পর্কে যা বলেছিল আর প্রথম দর্শনে লোকটা যেভাবে কড়া ধাতে কথা বলছিল তাতে মনে হয়েছিল, ভাঙতে সময় লাগবে। শুধু 'পুলিশ' শব্দটাই জাদুকাঠির মতো কাজ দিল।

বুকপকেট থেকে কয়েকটা একশো টাকার নোট বার করে রবার্টের হাতে দিলেন সরোজ বক্সী। এটা একদম অপ্রত্যাশিত। হঠাৎ প্রতিপক্ষ টাকা কেন হাতের মুঠোতে গুঁজে দিচ্ছে, বিন্দুবিসর্গও আন্দাজ করতে পারল না। বুকের ভেতরটা একবার ধক করে উঠল। এটা আবার সাংঘাতিক একটা বড়লোকি চাল নয় তো? ফ্যালফ্যাল করে সরোজ বক্সীর দিকে তাকাল রবার্ট। সরোজ বক্সী রবার্টের টাকা ধরা মুঠোটার ওপর দুটো আলতো চাপড় মেরে বললেন, পরশু ম্যাডামের শ্রাদ্ধ। সান্যালবাড়িতে সকালে অবশ্যই আসবেন। সাহেব এক ফাঁকে ঠিক আপনার সঙ্গে কথা বলে নেবেন। আর বিট্টু যেন জানতে না পারে, আপনাকে আমরা আসতে বলেছি। আপনি যেন খবর পেয়ে নিজের থেকেই এসেছেন—এটাই ওকে বলবেন।

ঘড়ি দেখলেন সরোজ বক্সী। তারপর পকেট থেকে আরও দুশো টাকা বার করে রবার্টকে দিয়ে বললেন, এটা হিতেনের বিলের টাকা। আপনি বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবেন না বলছিলেন। ভেতরে যান। হিতেনকে শুধু বলে দেবেন, আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

দয়াল সান্যাল শিপ্রার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানটা খুব জাঁকজমক করেই করলেন। জাঁকজমক এতটাই যে, অকালপ্রয়াতা স্ত্রীর জন্য ভাবগম্ভীর পরিবেশটাই মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছিল। আর সেই দিনই চোরা হাওয়ার মতো দয়াল সান্যালের জীবনে এসে ঢুকল আর এক ভবিষ্যৎ।

পুরোহিত বিট্টুর হাতটা ধরে একটা কুশের আংটি পরিয়ে দিলেন। তারপর চারদিকে সাজানো দানসামগ্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার এক এক করে এক একটা দান তোমার মাকে উৎসর্গ করতে হবে।

দয়াল সান্যাল পাশে বসে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন। হঠাৎ এক মহিলার কণ্ঠস্বর পেলেন, ঠাকুরমশাই, কাঁধে গলায় গঙ্গামাটি লাগালেন না?

পুরোহিতমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, কোনটার পর কোনটা করব আমার জানা আছে মা। যথাসময়ে করে দেব। তিরিশ বছর ধরে কুশের কাজ করছি।

দয়াল সান্যাল ফিরে মহিলাকে দেখলেন। মহিলাকে আগে কখনও দেখেননি। লালপেড়ে সাদা শাড়ি। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের গড়পড়তা উচ্চতাব চেয়ে বেশি লম্বা। মাজা গায়ের রং। কপালে একটা বড় লাল টিপ। তিরিশের আশেপাশে মনে হচ্ছে বয়স হবে।

এই চেহারায় একটা চটক আছে। একবার দেখলে চট করে ভুলবাব নয। এক লহমা দেখেই তাতে দয়াল সান্যালের মনে হল, একে আগে কখনও দেখেননি। অবশ্য নিমন্ত্রিতের সংখ্যা অগুনতি। অনেকেই সপরিবারে এসেছে। অবশ্য কেউই ক্রিয়াকর্ম নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি, এই মহিলাই প্রথম করল।

মহিলা পুরোহিতের কাছাকাছিই বসল, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কখনও ধূপ জ্বালিয়ে, কখনও প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে, কখনও বিট্টুর হাতে ফুল এগিয়ে দিয়ে নিজেকে আরও জড়িয়ে ফেলতে লাগল।

বাড়িতে এত অতিথি। দয়াল সান্যাল টানা বিট্টুর পাশে বসে থাকতে পারছিলেন না। মাঝে মাঝেই উঠে যাচ্ছিলেন। তবে ঘুরেফিরে যখনই বিট্টুর কাছে আসছিলেন, মহিলাকে দেখে অস্বস্তি আর কৌতূহল দুটোই বাড়ছিল। এক ফাঁকে সরোজ বক্সীকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন, সরোজ, ওই ভদ্রমহিলাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমিও চিনি না স্যার। তবে লোকেনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আরও কেউ কেউ এসেছে স্যার, যাদের আমরা বলিনি।

কে?

জুলি।

আঃ! ও আবার কেন এসেছে? কাগজে দেওয়াটাই ভুল হয়েছে দেখছি। নজর রাখো। এখানে যেন একদম কোনও মুখ না খোলে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন দয়াল সান্যাল।

স্যার, রবার্টও এসেছে।

চটক ভাঙল দয়াল সান্যালের। গম্ভীর হয়ে বললেন, ওকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও, আমি আসছি।

রবার্ট স্তূপাকৃতি ফুলের তোড়ার মধ্যে নিজের রজনীগন্ধার স্টিকগুলো রেখে চুপ করে শিপ্রার ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল। বিট্টুকে দেখে চিনতেই পারছিল না। ছেলেটা এই ক'দিনে একটু রোগা হয়ে গেছে, তার ওপর মাথা নেড়া করে আরও রোগা দেখাচ্ছে। একবার চোখাচোখি হয়েছে। রবার্ট আসাতে বিট্টু যে খুব খুশি হয়েছে সেটা চোখের ঝিলিকই বলে দিচ্ছে। এই পরিবেশেও রবার্ট অবাক হয়ে গেছে বিট্টুর পাশে বসা বড় টিপ পরা মহিলাকে দেখে। এই মহিলাকে তাদের বারে বেশ কয়েকবার দেখেছে রবার্ট। মহিলা যে কলগার্ল নয়, সেটা রবার্ট অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে জানে, তবে মহিলার গতিবিধি সন্দেহজনক। পালটে পালটে পুরুষসঙ্গী নিয়ে বারে আসে, আব সাবাক্ষণ নিচু গলায় তাদের সঙ্গে ফিসফাস করে যায়।

এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে দেখল দূর থেকে হাত তুলে সরোজ বক্সী ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। মহিলার ওপর মনোযোগটা ছেড়ে সরোজ বক্সীর দিকে শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল রবার্ট।

লোকেন ছুকছুক করে ঘুরছিল। পৃথাদি পইপই করে শিখিয়ে দিয়েছে এখানে এসে ওর পুরনো নাম ময়না বলতে। শুনে লোকেনের খুব অবাক লেগেছিল। ময়না কেন? ডুমুরঝরাতে ময়নাদের বাড়িতেই তো পৃথাদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল। তখন তো পরিচয় দিয়েছিল ময়নার হবু বরের দিদি। তবে তারপর থেকে পৃথাদির সঙ্গে কাজ করতে করতে লোকেন বুঝে গেছে পৃথাদির আসল ব্যাবসাটা কী। ময়নার মতো মেয়েদের বিয়ের নাম করে গ্রাম থেকে ধরে এনে বিক্রি করে দেওয়া। এই ব্যবসায় লোকেনকেও এখন জড়িয়ে দিয়েছে পৃথাদি। এবার বলেছে অনেক বড় খেলা আছে।

দয়াল সান্যাল ঘুরে ঘুরে অতিথিদের আপ্যায়ন করছিলেন। একটু ফাঁকা পেয়ে লোকেন দয়াল সান্যালকে বলল, স্যার, পৃথাকে নিয়ে এলাম।

কে পৃথা? দয়াল সান্যাল মনোযোগ না দিয়ে বললেন।

ওই যে স্যার, নকুড় জ্যাঠামশাই... আপনার জ্ঞাতি জ্যাঠামশাই... ওনার মেয়ে। গ্রামে ওর নাম ছিল ময়না। এখন ভাল নাম নিয়েছে পৃথা।

দয়াল সান্যাল একটু অবাক হয়ে লোকেনের দিকে তাকালেন। বিস্ময়ের কারণ, এই ক'বছরে হাড়জিরজিরে বহুরূপীটার গায়ে মাংস লেগেছে। কথাবার্তায়ও অনেকটা শহুরে হয়ে উঠেছে।

একরাশ বিরক্তি নিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, কে নকুড় জ্যাঠামশাই?

ওই যে স্যার, আপনার জ্ঞাতি জ্যাঠামশাই।

দয়াল সান্যাল দূর থেকে আর একবার একমাত্র আত্মীয় প্রতিনিধি মহিলাকে দেখে অবজ্ঞা করে বললেন, তা কেন ওকে এখানে নিয়ে এলে? কী চায়?

মাথা চুলকে লোকেন বলল, আমার পাড়ায় থাকে স্যার। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছেন, ম্যাডামের খবরটা। বললেন হাজার হোক ডুমুরঝরা গ্রামের আত্মীয়। এই খারাপ সময়ে গিয়ে তো একটু পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমাকে বললেন, তুই যাবি নাকি লোকেন? আমি বললাম, ওমা সে কী কথা... আজকের দিনে স্যারের পাশে দাঁড়াব না। তো স্যার...

ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু দেখো ওকে, যেন ঠিক করে খেয়েটেয়ে যায়।

দয়াল সান্যালের সামনে এসে রবার্ট এতক্ষণ মনে মনে শানিয়ে নেওয়া ব্যক্তিত্বটাকে আবার হারিয়ে ফেলল। ধবধবে সাদা একটা পাঞ্জাবি-পাজামা পরে মুখে একটা অল্প হাসি ঝুলিয়ে রবার্টকে দয়াল সান্যাল ইশারায় সোফাটা দেখিয়ে বললেন, বসুন। আছেন কেমন?

ভাল!

সংক্ষিপ্ততম উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল রবার্ট।

বসার ঘরের এক দিকের দেওয়ালে টানা কাচের জানলা। জানলার ওপর ফিনফিনে সাদা একটা পরদা ঝুলছে। পরদা ভেদ করে দেখা যাচ্ছে বাড়ির লনে অসংখ্য অতিথিব আনাগোনা। দয়াল সান্যাল হাঁক দিয়ে বাড়ির চাকর স্থানীয় কাউকে একটা ডেকে বললেন বসার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে। তারপর গলায় একটা রুক্ষতা ফুটিয়ে বললেন, আমি আপনাকে একবারও এটা জিজ্ঞেস করতে ডাকিনি যে সেইদিন দুপুরে আপনি বিট্টুকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন। কারণ ওটা আপনি আপসে বলবেন। আমি শুধু চাই শিপ্রা আপনাকে যে টাকাটা দিয়েছিল, সেটা কেন দিয়েছিল জানতে। জানতে পারি কি?

রবার্ট একটা ঢোঁক গিলল। শ্যারন যেদিন বাড়িতে গিয়েছিল সেদিন চারটে চেক দিয়েছিল আর কিছু টাকা। চারটে চেক দেওয়ার একটা শর্ত ছিল। চারজনকে দেওয়া। আর টাকাটা রবার্টের জন্য দিয়েছিল। কিন্তু রবার্ট শিপ্রাকে না জানিয়েই চেকগুলো ভাঙিয়ে ফেলেছিল। নগদ টাকাটা অবশ্য রবার্টকেই দিয়েছিল যার খানিকটা ছিল কার্শিয়াং-এ বিট্টুর কাছে যাওয়ার খরচ আর বাকিটা রবার্টের। আসলে শিপ্রা চেকগুলো তিনজনের নামে লিখলেও অ্যাকাউন্ট পেয়ি করতে ভুলে গিয়েছিল। তাই বেয়ারার চেক হিসাবেই ভাঙিয়ে নিয়েছিল রবার্ট।

দয়াল সান্যাল রবার্টের চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে বললেন, ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক তিনটে আমি দেখেছি। তাই চেকগুলো শিপ্রা কাকে দিতে চেয়েছিল আমার জানা। ভুলটা আপনি কোথায় করেছেন জানেন? তিনটে বেয়ারার চেক উইথড্র করার সময় চেকের পিছনে নিজের নামটা স্পষ্ট করে সই করে দিয়েছেন। রবার্ট গোমস। আর চেকগুলো ভাঙিয়েছেন শিপ্রা মারা যাওয়ার পর।

টাকাটা সবটা খরচ হয়নি। আমি... আমি ফেরত দিয়ে দেব।

দয়াল সান্যাল মাথা নাড়লেন।

সবটা খরচ হয়নি মানে... পুরো টাকাটা এখন আপনার কাছে নেই? আমি কিন্তু পুরো টাকাটাই শুধু ফেরত চাই তাই নয়... শিপ্রার আরও কিছু হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজ চাই। তা ছাড়া আরও একটা চেক আছে।

আর... আর কোনও শ্যারনের জিনিস তো আমার কাছে নেই... চেকও নেই...

ডোন্ট লাই! গর্জে উঠলেন দয়াল সান্যাল।

বিশ্বাস করুন...

কী বিশ্বাস করব? কার কথা বিশ্বাস করব? যে মৃত বান্ধবীর শেষ ইচ্ছে পূরণ করার বদলে তার চেকগুলো ভাঙিয়ে নেয়?

রবার্ট মাথা নিচু করে থাকল।

চেকের লাস্ট ডিজিটগুলো ছিল ছয়, সাত আর নয়। আট নম্বর চেকটা কী হল?

রাজু বণিককে দিতে বলেছিল শ্যারন, ওকে দিয়েছি।

রাজু বণিক কে?

রবার্ট আস্তে আস্তে মুখটা তুলল। রাজু বণিককে রবার্ট চিনত না। শ্যারন শুধু ঠিকানাটা দিয়েছিল। টাকা দেওয়ার কারণটাও খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল রবার্টের।

রাজু বণিক কে? আবার গলা চড়ালেন দয়াল সান্যাল।

রাজু বণিক নিউ মার্কেটে পাখি বিক্রি করে স্যার। শ্যারন ওকে টাকাটা দিতে বলেছিল...

কেন? আপনাকে কেন?

কারণ, আমার বাড়ি নিউ মার্কেটের কাছে। রবিবার নিউ মার্কেট বন্ধ ছিল বলে শ্যারন দিতে পারেনি।

রবার্ট চুপ করে গেল।

কাজের কথা বলুন, কী বলেছিল রাজু বণিককে করতে ওই দিন?

কিছু পাখি হরির ঝিলে গিয়ে ছেড়ে আসতে।

তার জন্য দু'হাজার?

একটা বিশেষ দামি পাখি ছিল।

বিশেষ দামি পাখি? দয়াল সান্যাল বিস্মিত হলেন।

হ্যাঁ স্যার। কী যেন এক ধরনের ম্যাকাও বলেছিল। সেই পাখির টানে অনেক পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে আসে।

আপনার শ্যারন যে কেন আমার জীবনটা নষ্ট করতে এল! ওই বরং ভাল হত মায়ের ব্যাবসাটাকে ধরলে। ওই কী যেন একটা পাখির নাম বললেন, যার টানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসে, ও সেরকম মক্ষীরানি হয়ে থাকত, ঝাঁকে ঝাঁকে খদ্দের আসত। ওর ওই জীবনটাই প্রাপ্য ছিল। ভদ্রবাড়ির জীবন সহ্য হল না। রক্ত যাবে কোথায়...

বাইরে সাড়ম্বরে শিপ্রার শ্রাদ্ধ চলছে আর বসার ঘরে দয়াল সান্যাল তার রক্তের প্রতি বিষোদগার করে যাচ্ছে। একই ধরনের রক্ত রবার্টের শরীরে বইছে। রবার্টের মা আর শিপ্রার মা দু'জনের মধ্যে অনেক মিল ছিল। দু'জনা সমবয়সি, দ্বিতীয় প্রজন্মের

দেহোপজীবিনী, এবং বহু গর্ভপাত করিয়ে দু'জনেই একজন করে পিতৃপরিচয়হীন সন্তান রেখে গেছেন পৃথিবীতে। তাই দয়াল সান্যাল শ্যারনের উদ্দেশে যে ভাষা প্রয়োগ করছে এককালে এই ভাষা শুনলে রাগে মাথা গরম হত রবার্টের। তারপর আর একটু বয়স হলে দুঃখ হত আর এখন কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না।

দয়াল সান্যাল কিছু একটা প্রশ্ন করে আবার রবার্টের দিকে তাকিয়ে থাকছেন। কিছুক্ষণের জন্য আনমনা হয়ে প্রশ্নটা ঠিকমতো কানের মধ্যে ঢোকাতে পারেনি রবার্ট। দয়াল সান্যাল পরিচিত গলায় আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, শকুন্তলা সেন কে? যাকে সাত নম্বর চেকটা দিয়েছিল, দশ হাজার।

আমি জানি না স্যার।

কেন বারবার মিথ্যে কথা বলছেন? শুনুন আপনার এই স্বভাবের কথা শ্রীকান্ত আয়ার জানে কিনা জানি না। তবে শ্রীকান্তকে আমি যতটুকু জানি, জানতে পারলে তিরিশ সেকেন্ডও লাগবে না আপনাকে ওর রেস্তোরাঁ থেকে তাড়িয়ে দিতে। অথবা হিতেনকে বললে...

স্যার শকুন্তলা সেন হচ্ছে...

দয়াল সান্যাল রবার্টকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই শুনুন, আপনি এই প্রথমেই জানি না, চিনি না বলে আরম্ভ করবেন না। শেষপর্যন্ত তো সবই সুড়সুড় করে বলছেন। মধ্যিখান থেকে এত এনার্জি খরচ করে এত কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। এনি ওয়ে বলুন হু ইজ শকুন্তলা সেন?

স্যার বিয়ের আগে শ্যারনের কলেজে এক বন্ধু ছিল। পলাশ সেন। আপনার কটন মিলে কাজ করত। তার বউ শকুন্তলা সেন। এখন অবশ্য আর সেন নেই স্যার, গুহ হয়ে গেছে।

অনেকদিন পর পলাশ সেনের নাম শুনে দয়াল সান্যাল একটু চমকালেন। সেই বেইমানটা। যে পুলিশের গালেও চুমু খেয়েছিল, নকশালদের গালেও চুমু খেয়েছিল। আর এককালে সত্যিই চুমু খেত শিপ্রার গালে। কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরেছিল। তার বউয়ের সঙ্গে শিপ্রার কী সম্পর্ক ছিল?

সোজা উত্তর দিন, শিপ্রা কেন টাকা দিতে চেয়েছিল পলাশ সেনের বউকে?

প্রশ্নগুলো এমনই, অস্বস্তি হচ্ছে রবার্টের ভেতরে। এই উত্তরটা কি দয়াল সান্যাল জানে না? নিজের কর্মচারীকে যে পুলিশের এনকাউন্টারে ফেলে মেরে ফেলেছিল— তার বউকে কী কারণে টাকা দিতে পারে শ্যারন? শ্যারন নিজে বলতে চাইত যখন হরিতলার সেই রাত্রিটার কথা, পলাশের কথা, মহেশের কথা, বলতে গিয়ে কখনওই শেষ করতে পারত না। বুজে আসত গলা। রবার্ট গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল, শ্যারনের ধারণা ছিল পলাশ সেনের মৃত্যুর পর...

কে বলেছে পলাশ সেন মারা গেছে? ওর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল?

রবার্ট ঢোক গিলল, আসলে স্যার, শ্যারনের ধারণা ছিল সেদিন রাতেই পলাশ সেন পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল।

যাক গে তারপরে বলুন...

শ্যারন যেহেতু বিশ্বাস করত পলাশ সেন মারা গেছে, এবং মারা গেছে ওকে সাহায্য করতে গিয়েই তাই একটা গভীর উদ্বেগ ছিল কী হবে ওর ফ্যামিলির কথা ভেবে...

পলাশ সেন নিরুদ্দেশ উনিশশো একাত্তরের নভেম্বর মাস থেকে আর আপনার শ্যারনের তার বউয়ের জন্য শোক উথলে পড়ল এত বছর পরে... এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে...

বোধহয় স্যার শ্যারনের শেষ ইচ্ছে ছিল পলাশ সেনের বউকে...

বেচারি শ্যারন! জানতও না, একটা ফ্রড লোকের হাতে কমপ্যাশনেট চেক দিয়ে যাচ্ছে।

রবার্ট মনে মনে বলল, কে কাকে ফ্রড বলে। যে লোকটার হাতে বিয়ের আগে কিছু ছিল না, যে লোকটা বিয়ের পরে মাত্র এগারো বছরে বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে এক বেশ্যার জমানো টাকায়, সে আজ সাধু। মনের ভেতরের বেড়ে চলা রাগটাকে আর প্রশ্রয় না দিয়ে রবার্ট বলল, আমি কিন্তু স্যার খোঁজ করে শকুন্তলাকে পেয়েছিলাম। ইন ফ্যাক্ট ওকেই প্রথম চেকটা দিতে গিয়েছিলাম। তবে খোঁজ করে জানতে পারলাম, শকুন্তলা আবার বিয়ে করে নিয়েছে। পলাশের মেয়ে আর দ্বিতীয় পক্ষের এক ছেলেকে নিয়ে নতুন সংসার করছে। আমি শ্যারনের চেকটা দিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও রিফিউজ করল। খুব রাফ বিহেভ করল আমার সঙ্গে।

আপনার শ্যারনকে জানিয়েছিলেন যে তার পলাশ সেনের বউ আবার বিয়ে করে সুখেশান্তিতে আছে?

রবার্ট মাথা নাড়ল, না স্যার, বলিনি।

তা কেন বলবেন? তার চেয়ে চেকটা...

দরজায় দুটো টোকা পড়ল। দয়াল সান্যাল থেমে গিয়ে বললেন, ইয়েস কাম ইন।

দরজাটার পাল্লা দুটো খুলল আস্তে করে। বিট্টু আর তার পিছনে সেই মহিলা। কী যেন নামটা বলেছিল লোকেন? পৃথা... পৃথা কী যেন? পদবিটা মনে পড়ছে না। বিট্টুর কাঁধে একটা হাত রেখে পৃথা খুব কুণ্ঠা নিয়ে বলল, দাদা, বারোটা বেজে গেছে, প্রেতলোকে অন্নজল দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। আপনি একবার এসে বউদিকে অন্নজলটা উৎসর্গ করে দিন। আপনি ওনার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বলছেন বলে কেউই সাহস করে আপনাকে ডাকতে পারছে না। তাই ভাবলাম আমিই গিয়ে বলি আপনাকে। আপনার অন্নজল দেওয়া হয়ে গেলে বিট্টু বাকি কাজটা শেষ করবে। বেচারা উপোস করে আছে।

মহিলার সঙ্গে কোনও পরিচয়ই হয়নি। লোকেন বলেছিল ডুমুরঝরার কীরকম আত্মীয় হয়। সেই সূত্র ধরে সোজা চলে এসেছে বাড়ির ভেতরে। কেউ কেউ এরকম হয়। কিন্তু বিট্টুর ওপর দরদটা দেখে বিরক্ত হলেন না দয়াল সান্যাল। রবার্টকে বললেন বসতে, উনি অন্নজল উৎসর্গের কাজটা সেরেই ফিরে আসছেন। পাখার তলায় বসে বিট্টুকেও একটু জিরিয়ে নিতে বললেন দয়াল সান্যাল।

দয়াল সান্যালের সঙ্গে যতক্ষণ পৃথা কথা বলছিল রবার্ট খুঁটিয়ে দেখছিল ওকে। না, কোনও সন্দেহ নেই পার্ক স্ট্রিটের বারে একে বহুবার দেখেছে রবার্ট। এইসব মহিলাদের চরিত্র রবার্টের জানা। শরীরকে বিক্রি না করেও ওরা সাংঘাতিক। এরকম এক সাংঘাতিক মহিলার সঙ্গে দয়াল সান্যালের কী সম্পর্ক?

দয়াল সান্যালের পিছনে পিছনে যেতে একই কথা ভাবছিল পৃথা। কী সম্পর্ক পার্ক স্ট্রিটের বারে কাজ করা লোকটার সঙ্গে দয়াল সান্যালের? কী এমন জরুরি গোপনীয় কাজ যে, বউয়ের শ্রাদ্ধের আসর ছেড়ে দরজা বন্ধ করে আধঘণ্টার ওপর আলোচনা করে যাচ্ছে। লোক লাগাতে হবে খবরটা জোগাড় করতে। যে-প্ল্যানটা করে ও এই বাড়িতে ঢুকেছে তাতে এই ধরনের সম্পর্কগুলোর উপর খুব ভালভাবে নজরে রাখতে হবে।

শিপ্রা সান্যালের মারা যাওয়ার খবরটা মনে পড়ে গেল পৃথার। ইংরেজি খবরের কাগজে শিপ্রা সান্যালের ছবি দেখে লোকেন চিনতে পেরেছিল। এই পাঁচ বছরে গেঁয়ো ভূতটাকে বহুরূপী লোকেন থেকে শহুরে করতে পারলেও অক্ষরজ্ঞানে কোনও উন্নতি করাতে পারেনি পৃথা। অবশ্য সেই চেষ্টাও করেনি। গেঁয়োটা যেরকম ক'-অক্ষর গোমাংস ছিল তাই রয়ে গেছে। আর ইংরেজিতে তো কথাই নেই। তবে চোখটা প্রখর। পৃথার হাতের কাগজে উঁকি দিয়ে শিপ্রা সান্যালের ছবিটা দেখেই বলেছিল, মেয়েছেলেটাকে চেনা চেনা লাগছে দিদি, নামটা পড়ো তো শুনি।

পৃথা কাগজটাকে পাকিয়ে লোকেনকে বলেছিল, কতবার বলেছি তোকে মেয়েছেলে শব্দটা বলবি না। তোর জিব আর কোদাল দিয়ে চেঁছেও পরিষ্কার করতে পারব না।

লোকেন মাথা চুলকে বলেছিল, কী বলো দিদি, আমার মুখের ভাষা শুনে ডুমুরঝরা গ্রামের লোকেরা এখন অবাক হয়ে যায়। বলে লোকেন কলকাতার ভাষা কোথায় শিখলি। যাক গে, দেখো না, দেখো না ছবির তলায় নামটা কার।

পৃথা শিপ্রা সান্যালের এবং শোকজ্ঞাপক দয়াল আর প্রীতম সান্যালের নামগুলো পড়ে দিয়েছিল। লোকেন তালুতে একটা ঘুসি মেরে বলেছিল, দেখো দিদি, কী বললাম এ সেই ডুমুরঝরা গ্রামের দয়াল সান্যাল।

কোন দয়াল সান্যাল?

তোমার মনে নেই? সেই যেবার ডুমুরঝরাতে গিয়েছিল, ইয়া বড় একটা লাল গাড়ি করে মস্ত বড় একটা লোক এসেছিল।

পৃথার খুব আবছা মনে পড়েছিল। ডুমুরঝরার মতো অজ গ্রামে অত বড় একটা বিদেশি গাড়ি মনে রাখার মতোই একটা স্মৃতি। সেই সঙ্গে মনে পড়েছিল, জুলির খদ্দের অনুপম ঘোষ বলে একটা উকিল মধ্যিখানে উঠেপড়ে লেগেছিল দয়াল সান্যালের যথাসম্ভব সর্বনাশ করে দিতে।

পৃথা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলেছিল, তা তোর বউদি মারা গেল, দয়াল সান্যালের গ্রামের বাড়িতে খবর দিবি না?

দয়াল সান্যালের সঙ্গে গ্রামের কোনও সম্পর্ক নেই। ওর বাপ ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছিল।

ত্যাজ্যপুত্র কেন?

আর বলো কেন। কাকে বিয়ে করেছিল জানো? ওই শিপ্রা সান্যাল কে ছিল জানো? এক বেশ্যা বাড়িওয়ালির মেয়ে। তার ওপর খেস্টান ছিল। কেউ জানত না। একবার দয়াল সান্যাল তুলোর চাষ করতে গিয়ে... তোমাকে বলেছিলাম তো... তা তুলো ফলল না। ভাইদের সঙ্গে খুব ঝামেলা হল। ভাইরা তার বিরুদ্ধে কিছু করতে না পেরে গ্রামসুদ্ধু দাদার কেচ্ছার ঢেঁড়া পেটাল। জানাজানির পর ডুমুরঝরাতে ঢিঢি পড়ে গিয়েছিল। দয়াল সান্যালের বাপ সনাতন সান্যালের ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করা ছাড়া উপায় ছিল না।

এই গল্পের বেশ অনেকটাই অনুপম ঘোষ বলেছিল। তখন অনেক ভেবেও কোনও বুদ্ধি বেরোয়নি। এবার একটা সুযোগ হয়েছে। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে বলেছিল, তা তোর যোগাযোগ আছে নাকি গ্রামের দাদার সঙ্গে?

সেটা দিদি রেখেছি। তোমারই শিক্ষা। সব বড়লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি। বছরে একবার দু'বার করে ওঁর অফিসে যাই। পুজোর পরে পেন্নাম ঠুকি একটা। তবে একেবারে অচ্ছেদ্দা করে পেন্নাম নেয়।

তাড়িয়ে তো দেয় না!

তা দেয় না। তা ছাড়া পার্ক স্ট্রিটে সন্ধেবেলায় মাঝে মাঝে মাল খেতে যায়। একা একা। সঙ্গে অবশ্য একটা চামচা থাকে। তবে চামচাটা গাড়িতে ড্রাইভারের সঙ্গেই বসে থাকে।

পৃথা একটু আনমনা হয়ে বসেছিল।

পার্ক স্ট্রিটে যায় সন্ধেবেলায়। তা হলে তো আমি দেখে থাকলেও থাকতে পারি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছ নিশ্চয়ই।

তার মানে তোর দয়াল সান্যালও আমাকে দেখেছে?

দেখে থাকতে পারে।

দেখলে চিনতে পারবে?

চিনতে পারে।

একটু চুপ করে থাকল পৃথা, তারপর লোকেনের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, ভাল করে আমাকে দেখ তো লোকেন, আমার মুখটা।

লোকেন অবাক হয়েছিল।

কী দেখব?

তুই বহুরূপী হতিস না? অনেক রকম সাজতে পারতিস। দেখ তো আমার মুখটা। কীরকম সাজলে আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারবে না।

লোকেন খুঁটিয়ে মুখটা দেখে বলেছিল, সিঁথিটা একটু পালটে নাও আর কপালে একটা বড় টিপ পরো। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ বলো দেখি?

পুলিশ হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছাতিমপুরের মেয়ে দুটো বম্বে থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। এখন ক'দিন একটা নিরাপদ ডেরা চাই। পুলিশ যেখানে

স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না আমি লুকিয়ে থাকতে পারি। ভাবছি ক'দিন তোর বউদির খালি হয়ে যাওয়া বিছানাটায় গিয়ে শোব কিনা।

রবার্ট বিট্টুর সঙ্গে কথা বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। এমনিতেই দয়াল সান্যাল একটা প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে গেছে, তার ওপর এই নিষ্পাপ ছেলেটার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারছে না। এর মায়ের সঙ্গে বেইমানি করেছে।

বিট্টুর মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল কিছু একটা বলার জন্য ইতস্তত করছে। ঘরে একদম দু'জন আছে আর ধারে কাছে কেউ নেই এটাও যেন তাকে আশ্বস্ত করতে পারছিল না। রবার্টের পাশে বসে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, রবার্ট মামা।

বল।

তুমি দিদিমার গ্রেভ ইয়ার্ডটা কোথায় জানো?

রবার্ট প্রশ্নটা শুনে অবাক হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, জানি।

একটা কাজ একটু করে দেবে?

কী কাজ?

তুমি একটু বসো, আমি এখনই আসছি।

বিট্টু প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রবার্ট হতভম্বের মতো বসে আছে। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শ্যারনের টাকাটা দয়াল সান্যালকে ফেরত দিতে হবে। ফেরত দেওয়া মানে ক'দিনের মধ্যে পালটে যেতে চলা নতুন জীবনের সম্ভাবনাটা খুন করে দেওয়া। শ্যারন যদিও টাকা দিয়েছিল খানিকটা কিন্তু সেই টাকা যথেষ্ট ছিল না। আর শকুন্তলা সেনের জন্য শ্যারনের চেকটা ভাঙিয়ে নেওয়ার সময় বিবেকের অনেক দোটানা হলেও, শেষপর্যন্ত কিন্তু যুক্তি বিবেককে হারিয়ে দিয়েছিল। শকুন্তলা সেন ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছে। সচ্ছল। তা ছাড়া মনেপ্রাণে যত দূর পারে শ্যারনকে ঘৃণা করে। শ্যারন পলাশের বাড়ির ঠিকানাটা দিয়েছিল। সেখান থেকে খোঁজ করতে করতে শকুন্তলার ঠিকানাটা জোগাড় করে বাড়ি খুঁজে পেতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। সারা দিনের ক্লান্তি নিয়ে যখন শকুন্তলার ফ্ল্যাটের দরজায় এসেছিল, আসার উদ্দেশ্য শুনে দরজার চৌকাঠও পেরোতে দেয়নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছিল। তবে শকুন্তলা যে ভাল আছে সেই খবরটা হয়তো শ্যারনকে বলা উচিত ছিল, বলব বলব করেও বলে ওঠা হয়নি। তারপর এত কিছু ঘটে গেল।

যেরকম দৌড়ে গিয়েছিল প্রায় সেরকমই দৌড়ে ফিরে এল বিট্টু কিছুক্ষণের মধ্যেই। ডান হাতের মুঠোতে শক্ত করে কিছু ধরা। রবার্টের পাশ ঘেঁষে বসে হাতের মুঠোর জিনিসটা রবার্টের হাতে দিয়ে আগের মতোই ফিসফিস করে বলল, এটা একটু দিদিমার গ্রেভের পাশে পুঁতে দেবে?

রবার্ট হাতের তালুতে বিট্টুর দেওয়া জিনিসটা কী অনুমান করার চেষ্টা করল। একটা খবরের কাগজের ঠোঙা। তার ভেতর কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর বিস্ময় বাড়াচ্ছে জিনিসটা কী, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, কী আছে এতে?

মাম্মির ছাই।

রবার্টের হাতটা কেঁপে উঠল। মনে হচ্ছে ছোট ছোট বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যাচ্ছে হাতের মধ্যে। কাঁপা গলায় বলল, শ্যারনের ছাই? কোথায় পেলি তুই?

গঙ্গায় ভাসানোর আগে একটু রেখে দিয়েছিলাম। তুমি প্লিজ একটু দিদিমার গ্রেভের পাশে পুঁতে দিয়ো। মাম্মি বলত...

তোর বাবা জানেন?

চুপ করে গিয়ে দু'দিকে মাথা নাড়াল বিট্টু। চুপ করে রবার্টও ঠোঙাটা পুরে নিল বুকপকেটে। হাতের তালুতে যে-চিনচিনানিটা ছিল সেটা এবার বুকের ভেতর সঞ্চারিত হয়ে গেল।

দয়াল সান্যাল ঘরে ফিরে এলেন। বিট্টুর নেড়া মাথায় হাতটা রেখে বললেন, যাও বাবা, আর একটু বাকি আছে। মায়ের কাজটা শেষ করে এসো।

দয়াল সান্যাল বসলেন না। দেখাদেখি রবার্টও উঠে দাঁড়াল। বিট্টু বেরিয়ে যাওয়ার পর দয়াল সান্যাল বললেন, দেখুন আজকে আমার হাতে আর সময় নেই। খুব সংক্ষেপে আপনাকে কথাটা বলছি। আপনার কাছে দুটো চয়েস আছে। হয় আপনি শিপ্রার টাকাটা ফেরত দিন। শিপ্রা যাকে যাকে টাকাটা দিতে চেয়েছিল আমি তাদের পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। না হয়...

এই না হয়টা আর মুখ ফুটে বললেন না দয়াল সান্যাল। শুধু বললেন, দু'দিনের মধ্যে পুরো টাকাটা যদি ফেরত দিতে না পারেন, আমার অফিসে এসে দেখা করুন। অন্য উপায়টা তখন বলব।

৬৭

হিতেন মজুমদারকে দেখে রবার্টের চোয়াল শক্ত হল। আজ এই নিয়ে পরপর তিন দিন হল। লোকটা সন্ধেবেলায় এসে বারে বসে পড়ে। মদ এবং খাবার খায়। কোনও পয়সা দেয় না। প্রথম দিন রবার্ট স্টাফ ডিসকাউন্টে নিজের পকেট থেকে পয়সা মিটিয়ে দিয়েছিল। পরের দিন ম্যানেজার একই লোকের জন্য আবার ডিসকাউন্ট দিতে রাজি হয়নি। পুরো নগদ পয়সায় রবার্টকে বিলটা মেটাতে হয়েছিল। আজ রবার্টের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। হিতেন মজুমদারের উলটোদিকের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে কেটে কেটে বলল, কী চাও?

হিতেন চওড়া হাসল।

এক কথা রোজ বারবার বলাও কেন ভাই। আমি তো... কী যেন বলে... ওই... দূত! দয়াল সান্যালের টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও ভাই।

রবার্ট কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, দেব।

হিতেন টেবিল বাজাতে বাজাতে বলল, যত দিন না দিচ্ছ, আমাকে তো ভাই রোজ

একটু আসতেই হবে।... কী যেন বলে... কর্তব্য। তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার কর্তব্য। বলতে বলতে হিতেন একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, তোমাকে একটা বুদ্ধি দেব ভাই রবার্ট! টাকাটা যখন খেয়ে বসে আছ, থাকো না। ফেরত দেওয়ার কী দরকার? তোমাকে তো দয়াল সান্যাল আর একটা শর্ত দিয়ে রেখেছে।

হিতেন কি শর্তটা জানে? রবার্টের কাছে শর্তটা এসে পৌঁছে দিয়েছিল সরোজ বক্সী। শর্তটা মনে পড়লেই একটা অস্বস্তি হয়। তবু হিতেনকে বাজিয়ে দেখার জন্য রবার্ট জিজ্ঞেস করল, কীসের শর্ত?

তা আমি কী জানি! ছোট খোপরি। ছোট ছোট কাজ করি। তোমাকে তো অফিসে দেখা করতে বলেছিল দয়াল সান্যাল। দেখা করোনি?

হিতেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। রবার্ট অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। শিপ্রার শ্রাদ্ধের দিনই 'এটা না হলে ওটা' বলে চাপটা দিয়ে দিয়েছিল দয়াল সান্যাল। তার পরে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে রবার্ট অনেক চিন্তা করেছে। ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিজের জীবনেরও 'এটা না ওটা'। এক দিকে একটা স্বপ্নের হাতছানি, আর এক দিকে স্বপ্নভঙ্গের আতঙ্ক। নিজের বিবেককে বহুবার প্রশ্ন করেছে রবার্ট। এবং বিবেকের কাছে প্রত্যেকবার একই উত্তর পেয়ে রবার্ট নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছে।

চারটে চেক। শ্যারন চেয়েছিল চেক চারটে যেন একটু চার জায়গায় পৌঁছে দেয়। ছ'নম্বর চেকটা ছিল রাজু বণিকের নামে। সাত নম্বরটা, পলাশের বউয়ের নামে..., আট নম্বরটার সন্ধান পাননি দয়াল সান্যাল, আর ন'নম্বরটা?

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল রবার্ট। এক-একটা চেক ধরে যেভাবে পুলিশি জেরা শুরু করেছিলেন, হঠাৎ কী করে ন'নম্বরটা ভুলে গেলেন? নাকি গোটা ব্যাপারটা সেই মেয়েটা এসে গুলিয়ে দিয়েছিল? অথবা দয়াল সান্যালের চেকগুলোর ব্যাপারে কোনও আগ্রহই ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল চাপটা তৈরি করা।

ভাবতে ভাবতে আরও অন্যমনস্ক হয়ে গেল রবার্ট। অন্যমনস্কতা টেনে নিয়ে গেল সেই ক্ষণিকের স্মৃতিটায়। অদ্ভুত একটা শিহরন। শিপ্রা কাঁধে মাথা রেখে বলছিল, তোকে আমার আরও কয়েকটা কাজ করে দিতে হবে রবার্ট। রবার্ট নিজেকে সামলাতে পারেনি। আরও ঘন করে কাছে টেনে নিয়েছিল শিপ্রাকে। শিপ্রা কোনও আপত্তি করেনি। রবার্টের সাহস ইচ্ছাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মাতাল গলায় রবার্ট বলেছিল, তোকে একটা চুমু খাব শ্যারন?

এই কথাটা শুনেও আপত্তি করেনি শিপ্রা। আবার সম্মতিও দেয়নি। দু'হাতের বেড়ের মধ্যে শিপ্রাকে পেয়ে ভেতরে ভেতরে শুরু হয়ে গিয়েছিল রাসায়নিক বিক্রিয়াটা। রবার্ট শুষে নিতে চেয়েছিল শিপ্রার ঠোঁট দুটো। হাত দুটো বল্গাহীন হয়ে ক্রমশ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল শিপ্রার শরীরের ওপর।

তুই কেন কোনওদিন আমার হলি না শ্যারন? দু'জনের জীবনটাই হয়তো অন্যরকম হত। আমরা ভাল থাকতাম। দু'জনেই ভাল থাকতাম।

সত্যি কি আমরা ভাল থাকতাম রবার্ট? শিপ্রা উদাস হয়ে বলেছিল।

শিপ্রার বাধাহীন শরীরটাতে ডুবে যেতে যেতে দার্শনিকের মতো কথাগুলো তখন আর শুনতে ইচ্ছে করছিল না। এই শরীরটাকে ছোটবেলা থেকে কামনা করেছে রবার্ট। সেই কামনার আগুনটা তো কবে জ্বালিয়ে দিয়েছিল মাম্মি। সেই কোন ছোটবেলায় বলেছিল, শ্যারন তোর টুকটুকে বউ হবে। যে-পরিবেশে মানুষ হয়েছে, কোনও মেয়ের সঙ্গে কোনও ছেলের শরীরের সম্পর্কটা ঠিক কীভাবে হতে পারে, অনেক ছোটবেলায় সেটা জেনে গিয়েছিল রবার্ট।

শিপ্রাকে নিয়ে যে-স্বপ্ন রাতের পর রাত দেখেছে, এতদিন পরে বাস্তবায়িত হয়েছে। চরম তৃপ্তির পরে, তৃপ্তির রেশটা কিন্তু স্থায়ী হয়নি। অদ্ভুত একটা পাপবোধ এসে গ্রাস করেছিল শরীরটাকে।

শিপ্রা চুপ করে উঠে বাথরুমে গিয়েছিল। তারপর পোশাক ঠিক করে ঘরের একমাত্র চেয়ারটায় এসে চুপ করে বসেছিল। রবার্ট কোনওরকমে বলার চেষ্টা করেছিল, আয়্যাম সরি শ্যারন। কিছু জিনিস হয়ে যায়... যার ওপর কোনও কন্ট্রোল থাকে না।

শিপ্রা কোনও উত্তর দেয়নি। ব্যাগটা খুলে একটা চেকবই বার করে বলেছিল, আমার কাজগুলো করে দিবি প্লিজ! বিশ্বাস কর, আমার কেউ নেই।

বিয়ারের নেশাটা কেটে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে অপরাধবোধও বেড়ে যাচ্ছিল। অসহায় মেয়েটাকে কি তা হলে শরীর দিতে হল সামান্য কয়েকটা কাজ করার জন্য? রবার্টের মাথাটা হেঁট হয়ে গিয়েছিল।

সাত নম্বর চেকটা রাজু বণিকের। শিপ্রা বলেছিল, এই চেকটা আমিই দিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু আজ রবিবার। যাকে দিতে হবে তার নিউ মার্কেটে দোকান আছে। কাল সকালে একটু দিয়ে দিবি, প্লিজ!

'প্লিজ' শব্দটা প্রতিবার পিনের মতো ফুটছিল রবার্টের গায়ে। পরের চেকটা দিয়ে বলল, এই চেকটা আমি নিজে গিয়ে দিতে পারব না...

কার চেক এটা?

শিপ্রা বলেছিল, পলাশের বউয়ের। নামটা শুনেই চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল রবার্টের। সেই ছেলেটা। শিপ্রা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে যাকে ভালবাসতে শুরু করেছিল। যে ছেলেটা প্রথম রবার্টের আশাভঙ্গ করেছিল। রবার্ট চুপ করে মাথা নাড়িয়েছিল।

পলাশের বউয়ের ঠিকানাটা দিয়ে দিলাম।

রবার্ট অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, পলাশের বউয়ের জন্য চেক?

শিপ্রা একটু চুপ করে থেকে মুখটা কালো করে বলে উঠেছিল, পলাশ আর নেই রে রবার্ট। জানি না ও কোনওদিন সত্যি আমাকে ভালবাসত কি না, তবে ওর চলে যাওয়ার পুরো দায় আমার।

রবার্ট খাটে উঠে পড়ে বসে বলেছিল, তোর কী ব্যাপার বল তো শ্যারন? তুই এভাবে টাকা বিলোচ্ছিস! তোকে বললে তুই রেগে যাস। সত্যি কথাটা মানতে চাস না। কিন্তু সত্যিটা সত্যিই। বড়লোকদের একটাই সমস্যা। সেটা হল টাকা। এই টাকা নিয়ে কী করবে বড়লোকরা বুঝে উঠতে পারে না।

শিপ্রা ম্লান হেসেছিল।

তোকে বললাম না? টাকাটা আমার নয়, মায়ের। মা বেঁচে থাকলে টাকাটা ঠিক যেভাবে খরচ করতে চাইত আমি সেভাবেই খরচ করতে চাই। মায়ের টাকা, সম্পত্তি আর কিছুই আমার কাছে রাখব না। আমি আর পারছি না। এবার ভারমুক্ত হতে চাই।

কিন্তু পরের দুটো চেক... আট নম্বর আর ন'নম্বর খুব অবাক করেছিল রবার্টকে। আট নম্বরটা কর্নেল সামন্তর নামে আর ন'নম্বরটা জিমির নামে।

রবার্ট চেক দুটো ধরে বলেছিল, তুই সত্যি পাগল হয়ে গেছিস শ্যারন। এ দুটো নিয়ে আমি কী করব?

যাদের জন্য নাম লেখা আছে তাদের দিয়ে দিবি।

কর্নেল সামন্ত আর জিমির সঙ্গে মার্থা আন্টির কী সম্পর্ক? মার্থা আন্টি ওদের কাউকেই দেখেনি।

কর্নেল সামন্তর চেকটা, ব্যারাকপুরে ক্যাথি আন্টির বাড়িটার জন্য। কর্নেল কখনও যদি মত পালটান। ধর এটা ক্যাথি আন্টির জন্য মায়ের শেষ গিফ্‌ট।

রবার্ট চুপ করে গিয়েছিল। টাকা মেয়েটাকে পাগল করে দিয়েছে। তবে ছলছল করে উঠেছিল চোখটা।

কর্নেল কখনও মত পালটাবেন না। তোকে বিক্রি করবেন না বাড়িটা। কর্নেলের সঙ্গে মাম্মির সম্পর্ক কী, যার জন্য বাড়িটা বিক্রি করে দেবেন?

হয়তো বিক্রি করবেন না। কিন্তু আমি জানি, চিরকাল ক্যাথি আন্টির জন্য রেখে দেবেন ওটা। কর্নেল আমাকে কথা দিয়েছেন। মানুষটা খাঁটি। আমি জানি উনি কথা রাখবেন। তাই ধর মায়ের তরফ থেকে টাকাটা কর্নেলকে গ্র্যাটিটিউড।

তুই সত্যি বদ্ধ পাগল হয়ে গেছিস। কর্নেল সামন্ত খামোকা মার্থা আন্টির গ্র্যাটিটিউড নিতে যাবেন কেন? তা ছাড়া কর্নেল সামন্ত ওখানে মাম্মির জন্য বাড়িটা আর ফাঁকা রেখে দেননি। তোর মতো সবাই ইমোশনাল ফুল নয়। কর্নেল ইতিমধ্যেই বাড়িটা একটা কাপ্‌লকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন।

শিপ্রা একটু আহত গলায় বলেছিল, কর্নেল ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন? কিন্তু উনি যে আমাকে কথা দিয়েছিলেন।

বললাম না, কর্নেল প্র্যাকটিকাল। তোর মতো ইমোশন ক্যারি করে বেড়ায় না। তবে তোর একটা সান্ত্বনা আছে। কর্নেল বাড়িতে যাকে থাকতে দিয়েছে সেই মেয়েটা একসময় ব্যারাকপুরে কাজ করত। কর্নেল একবার যেন বলেছিলেন, তুই তাকে চিনিস।

বাবলি?

সেই প্রথম মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল শিপ্রার। রবার্টেরও অপরাধবোধটা কেটে যাচ্ছিল।

হ্যাঁ বাবলি। মেয়েটাকে দেখেছিস তুই?

সুইট গার্ল বাট শি ওয়াজ ভেরি আনহ্যাপি। সিঙ্গার হতে চাইত।

শি ইজ আ সিঙ্গার নাউ। নাম করছে। একটা বাংলা সিনেমায় প্লেব্যাকেরও অফার পেয়েছে বোধহয়।

শিপ্রার বিস্মিত ভাবটা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল, বাবলি... তাই?

বাবলির গায়িকা হওয়ার পিছনে রবার্ট নিজের ভূমিকাটাও বলতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। কীভাবে এক মহালয়ার দিন সকালে রবার্ট ওর ট্রায়ালের ব্যবস্থা করেছিল। কী করে আনোয়ার ওকে ঘষেমেজে তৈরি করে নিয়েছিল। বাবলি একটু একটু করে নাম করেছে তারপর।

বাবলির কথা বলতে বলতে আর শিপ্রার উজ্জ্বল মুখটা দেখতে দেখতে পাপবোধটা প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছিল রবার্টের মধ্যে। একটু রসিকতা করেই বলেছিল, তা হলে এবার মার্থা আন্টির টাকাটা কি বাবলিকেই দেওয়ার কথা বলবি যেহেতু ও মাম্মির সঙ্গে থাকত?

শিপ্রা আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়েছিল।

নাঃ, তুই টাকাটা কর্নেল সামন্তকেই দে।

রবার্ট অসহিষ্ণু হয়ে আবার বলার চেষ্টা করেছিল, তুই কেন বুঝতে পারছিস না শ্যারন কর্নেলের একটা ইগো আছে। সেন্টিমেন্ট আছে। যে-বাড়িটা বিক্রি করবে না, খামোকা সেই টাকাটা নিতে যাবে কেন?

রবার্টের গলার সঙ্গে সঙ্গে শ্যারনও জ্বলে উঠেছিল। গলার ওপর গলা চড়িয়ে বলেছিল, আমার মন বলছে ক্যাথি আন্টি ফিরে আসবে। আর ক্যাথি আন্টি ফিরে এলে কর্নেলও ওটা বিক্রি করে দেবে।

রবার্ট উদাস হয়ে মাথা নাড়িয়ে বলেছিল, মাম্মি আর কোনওদিনই ফিরে আসবে না শ্যারন।

শিপ্রার মুখটা মুহূর্তে কালো হয়ে গিয়েছিল।

মানে? কী বলছিস তুই?

রবার্ট মাথাটা নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, তোকে তো অনেকবার বলেছি শ্যারন, মাম্মি কোথায় আছে সেটাই কাউকে জানাতে চায় না। ফিরে আসা তো দূরের কথা। আর কীসের টানে ফিরে আসবে বল তো?

শিপ্রার মুখে আশঙ্কার রেখাগুলো মিলিয়ে গিয়েছিল আস্তে আস্তে।

আন্টিকে ভীষণ মিস করি জানিস তো? ভীষণ ইচ্ছে ছিল মায়ের জন্মদিনে যদি আন্টিও হরিতলায় থাকত।

ছয়, সাত, আট, নয় চেকগুলো পড়েই ছিল টেবিলে। শিপ্রা আর ফেরত নেয়নি ওগুলো। উলটে আরও কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল রবার্টকে। কার্শিয়াং-এ যাওয়ার খরচ। রবার্ট টাকাটা ফেরত দিয়ে দিতে চেয়েছিল।

শ্যারন, আমার কাছে অন্তত তোর ছেলেকে ব্রাদার ডি'সুজার কাছে নিয়ে যাওয়ার টাকা আছে। শিপ্রা কোনও কথা শোনেনি।

এবার রবার্ট পালটা অনুনয় করেছিল, প্লিজ শ্যারন। তুই যেটা চাইছিস, ধর, এটা মার্থা আন্টির জন্য আমার বার্থ-ডে গিফ্‌ট...

টেবিলের ওপর একটা আওয়াজে রবার্টের চটকটা ভাঙল। রবার্টের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কোনও এক ফাঁকে হিতেন মজুমদার মদের অর্ডারটা দিয়ে দিয়েছে। আরাম করে গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে হিতেন মজুমদার বলল, মেনে নাও রবার্টভাই, মেনে নাও। যে মালটা ফেরত দেওয়ার দরকার নেই সেটার বদলে অন্য কাজটা করার জন্য দু'বার ভাবছ কেন?

রবার্ট দমবন্ধ করল। এই লম্পট, গুন্ডাটা কি জানে দয়াল সান্যালের অন্য শর্তটা কী? আর জেনে থাকলেও বা কী? যার কোনও নীতি নেই, তার কাছে এই কাজটা করা তো জলের মতো সোজা। কয়েকদিন আগে হলেও রবার্ট হয়তো পারত। কিন্তু শিপ্রা তো ওকে শুদ্ধ করে চলে গেছে। এর পরেও কি দয়াল সান্যালের শর্তটা মানা সম্ভব?

শিপ্রার শ্রাদ্ধের দিন দয়াল সান্যালের প্রচ্ছন্ন হুমকিতে যতটা বিবেকের তাড়নায় ভুগেছিল ঠিক ততটাই ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল রবার্ট। কার্শিয়াং যাওয়ার আগের দিন নিউ মার্কেটে রাজু বণিকের দোকানে গিয়ে দেখা পায়নি। ভেবেছিল ফিরে এসে দেবে। সেইমতো ফিরে এসে রাজু বণিকের দোকানে গিয়ে চেকটা দিতে গিয়েই শুনেছিল পৃথিবী শূন্য হয়ে যাওয়ার কথাটা। রাজু বণিক কিছুতেই আর চেকটা নিতে চায়নি। বারবার বিলাপ করে বলেছিল, আমার নিজের বোন চলে গেল দাদা। একটা ম্যাকাও চেয়েছিল। হরির ঝিলে গিয়ে ছেড়ে আসতে বলেছিল। আমি তো এমনিতেই দাম নিতাম না, তাই বোধহয়.আপনাকে দিয়ে চেক ..

দোকান থেকে বেরিয়ে পৃথিবীটা অন্যরকম লেগেছিল রবার্টের। টালমাটাল পায়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। বাইরের পৃথিবীটার মতোই নিজের অগোছালো ঘবটাকেও অপরিচিত লেগেছিল রবার্টের। এই ঘর, যেখানে মাত্র কয়েকদিন আগে শ্যারন তাকে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নটার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল।

ব্যাগ থেকে আস্তে আস্তে চেকগুলো বার করেছিল রবার্ট। আনমনে একটা চেক কুচিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তারপরে পরের চেকটা কুচিযে ফেলার আগে হাতের আঙুলগুলো থেমে গিয়েছিল। কোনও এক অদৃশ্য জায়গা থেকে শ্যাবন যেন বলে উঠেছিল, কী করছিস রবার্ট! মায়েব এত কষ্টের টাকা তুই দয়াল সান্যালকে দিয়ে দিবি?

প্রথমে ঘাবড়ে গিয়ে, পরে সামলে নিলেও ঘাবড়ে যাওয়ার অভিনয়টাই করে গিয়েছিল রবার্ট। দয়াল সান্যালকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যেই বলেছিল। বলেছিল টাকাটা খরচ করে ফেলেছে। পলাশ সেনের বউ শকুন্তলা সেন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেয়ারার চেকগুলো তুলে খরচ করে ফেলেছে। কিন্তু টাকাটা?

খ্যাকখ্যাক করে হাসছে হিতেন মজুমদার। রবার্টের দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে বলল, ভাই রবার্ট তোমার শুকিয়ে যাওয়া মুখটা দেখে কী মনে হচ্ছে জানো?

রবার্ট কোনও উত্তর দিল না। চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়াল। চোয়াল শক্ত করে বলল, কালকে সন্ধেবেলায় এসো। টাকাটা নিয়ে দয়াল সান্যালকে ফেরত দিয়ে দেবে।

পরদিন হিতেন মজুমদারকে সন্ধেবেলায় লোয়ার সার্কুলার রোড আর পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়াতে বলেছিল রবার্ট। নির্দিষ্ট সময়ে হিতেন মজুমদার এসে দেখল রবার্ট আগের থেকেই দাঁড়িয়ে আছে।

হিতেন কাছে আসতেই রবার্ট গম্ভীরভাবে বলল, চলো।

হিতেন অবাক হয়ে বলল, কোথায়?

টাকাটা পেতে হলে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

হিতেন মজুমদার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, চলো, তোমার যা ইচ্ছে।

রাস্তাটা পেরিয়ে গোরস্থানের পাঁচিলের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হিতেন মজুমদার বলল, শোনো ভাই রবার্ট। তুমি বন্ধু। রোজ মাল খাওয়াও বলে বলছি। কী দরকার ভাই টাকাটা ফেরত দেওয়ার। তোমার কাছে অন্য উপায় তো আছে। কিছু আমাকে দাও। বাকিটা তুমিই রাখো।

না। টাকাটা আমি দিয়ে দেব তোমার হাতে, আজই। টাকাটা আমি চুরি করিনি।

হিতেন গলা ছেড়ে হেসে উঠল, ও বুঝেছি। সেন্টু খেয়ে গেছ তো। তা টাকাটা দিতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ভাই? ফালতু কেস নেই তো?

রবার্ট একইরকম গম্ভীর গলায় বলল, একটা নিরিবিলি জায়গায় তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা চাই। চিন্তা করে দেখো। দয়াল সান্যালের অন্য শর্তটায় আমি রাজিও হয়ে যেতে পারি। তবে সব টাকাটা দিতে পারব না। যতটা দিতে পারব না তার একটা পার্সেন্ট তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। দয়াল সান্যালকে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

অন্ধকারেও হিতেন মজুমদারের চোখটা চকচক করে উঠল।

এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার হিস্যাটা কত?

দুই দিতে পারি।

হিতেন মজুমদার প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না ভাই, ওই ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না। এমনিতেই ভাই টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে দয়াল সান্যাল চার দেবে...

রবার্ট হাত তুলে বলল, চার? আমার পক্ষে অসম্ভব।

হিতেন মজুমদার হাসতে থাকল।

তুমি বড় বোকা ভাই রবার্ট। তোমার খানিকটা টাকা ফেরত দেওয়ার কী দরকার? কিছুই দিতে হবে না তোমাকে। আমাকে পুরো পাঁচ দিয়ে দাও। বাকি আমি সামলে নেব।

রবার্ট একটু চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে।

রবার্ট দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকল। ক্রমশ জায়গাটা আরও অন্ধকার নিরিবিলি হয়ে যাচ্ছে। হিতেন মজুমদারের অল্প অল্প সন্দেহ হতে থাকল।

কলকাতা শহরে কি আর জায়গা নেই? রাতদুপুরে কবরখানার পাশ দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রবার্ট পকেট থেকে একটা মদের বোতল অল্প বার করে দেখিয়ে বলল, খোলা জায়গায় বসে মাল খেলে মাথা খোলে ভাল।

বোতলটার উঁকি দেখে হিতেন মজুমদারের চোখটা আবার চকচক করে উঠল।

শ্মশানে বসে মাল খেলে অন্যরকম মজে। চলো কবরখানার পাশে মালের নেশাটা ট্রাই করে নিই। তা রবার্টভাই, ঢুকবে কোথা দিয়ে?

পাঁচিল ঘেঁষে একটা গলি ধরল রবার্ট। জায়গাটা আরও অন্ধকার। গলিটা গিয়ে একটা পরিত্যক্ত গ্যারাজের কাছে শেষ হল। মল্লিকবাজারের কালোয়াররা ওজনদরে কেনা ভাঙা গাড়ি রাখে এখানে। সন্দেহটা ঘনীভূত হতে হিতেন মজুমদার দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে বার করল একটা ফোল্ডিং ছোট ছুরি। খুট করে একটা চাপ দিতেই চাঁদের আলোয় ঝলসে উঠল ধারালো ফলাটা। গলাটা পালটে গেল হিতেন মজুমদারের। পালটে গেল চিকন ভাষাটাও।

শোন রবার্ট। আনসান কিচাইনের চেষ্টা করবি না।

রবার্ট হাসল। দু'হাত অল্প তুলে বলল, আমার কাছে কিছু নেই।

হিসহিসিয়ে হিতেন মজুমদার বলল, টাকাটা?

ওটা পাবে। এখানেই আছে। চুরির টাকা কি বাড়িতে রাখা যায়? তার ওপর যেখানে দয়াল সান্যালের মতো লোক পিছনে লেগেছে।

হিতেন মজুমদার একটু হতভম্ব হয়ে রবার্টের কলারটা চেপে ধরে শরীরটা হাতড়ে নিশ্চিন্ত হল রবার্টের কাছে লুকোনো কোনও অস্ত্র নেই। এক মদের বোতল আর পিছনের পকেটে একটা জীর্ণ মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই। তল্লাশি শেষ করে দাঁত চিপে বলল, যা করার জলদি কর। টাকাটা বার কর।

একটা ভাঙা গাড়িতে ঠেস দিয়ে শান্তভাবে বসল রবার্ট। মনের ভেতর খচখচানিটা নিয়ে উলটোদিকে আলগোছে বসল হিতেন মজুমদার। রবার্টের উদ্দেশ্য নিয়ে তখনও সংশয় কাটেনি। নিজের স্নায়ুকে টানটান রেখে দিল।

রবার্ট পকেট থেকে মদের বোতলটা খুলে দু'জনের মধ্যে রাখল। ছিপিটা খুলল। হিতেন মজুমদারকে বলল, খাও।

রবার্টের চোখে চোখ রেখে বোতল থেকে খানিকটা বিশুদ্ধ মদ গলায় চালান করল হিতেন মজুমদার। গলাটা জ্বলে উঠল। তবে দামি বিলিতি মদের আমেজটা জড়ানো মুখের মধ্যে। হিতেন আবার বলল, টাকাটা?

হবে, ভয় পাচ্ছ কেন? তোমার সঙ্গে আরও আলোচনা আছে।

হিতেন আবার গলায় কয়েক ঢোক মদ ঢালল। তারপরই মাথায় যেন বুদ্ধিটা খেলে গেল।

অ্যাই রবার্ট! তুই শালা মদে বিষ মিশিয়ে আনিসনি তো?

রবার্ট শান্ত গলায় বলল, বিষ? বিষ কী করে মিশিয়ে আনব? তোমার সামনেই তো সিল খুললাম...

কোনও চালাকি নয়। বিষ যদি না মেশানো থাকে, তা হলে তুই খাচ্ছিস না কেন?

হিতেন মজুমদারকে নিশ্চিন্ত করতে রবার্ট দু'ঢোক গলায় ঢেলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠোঁটের কোনাটা মুছে বোতলটা আবার হিতেনের সামনে রাখল। হিতেন পুরনো মেজাজে ফিরে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, একটু চাট আনতে পারতে ভাই রবার্ট। কিছু না পেলে পকেটে করে অন্তত বাদামভাজা। যাক গে। চলো মালটা তাড়াতাড়ি শেষ করে টাকাটা নিয়ে কেটে পড়ি। কাল থেকে দয়াল সান্যালের ব্যাপারে তোমাকে কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না।

আমি জানি সেটা।

নেশা জড়ানো গলায় হিতেন মজুমদার আবার তুমি থেকে তুইতে নেমে গেল, তোর শিপ্রা সান্যাল মালটা কেমন ছিল রে? ছবি দেখেছি একটা, একেবারে পদ্মিনী কপিলা।

পুরো পাঁচ নেবে?

হিতেন মজুমদার পা দুটো ছড়িয়ে গলা ছেড়ে হাসতে থাকল।

শালা... তুই দেখছি ভুলতে পারছিস না। আরে কথা তো হয়েই গেছে। দয়াল সান্যালকে সামলে দেব। কী চাঁদু আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না?

বিশ্বাস তো তোমাকে করতেই হবে। কারণ দয়াল সান্যালকে আমার পিছন ছাড়াতে পারলে একমাত্র তুমিই পারবে।

রবার্ট উঠে দাঁড়াল। হিতেন মজুমদার দ্রুত টানটান হয়ে বলল, কী হল?

রবার্ট হাসল। কড়ে আঙুলটা দেখিয়ে বলল, একটু মাইনাস করে আসছি।

ভাঙা গাড়িগুলোর পিছনে এসে রবার্ট প্যান্টের হিপপকেট থেকে ব্যাগটা বার করল। ব্যাগের থেকে বের করে আনল একটা ব্লেড। কয়েন পাউচের মধ্যে থেকে বার করল দুটো ট্যাবলেট। জিনিস দুটো বুকপকেটে রাখল। তারপর হিতেন মজুমদারের সামনে এসে প্যান্টের চেনটা তুলে তলপেটটা হাত বোলাতে বোলাতে বলল, উফ! ব্লাডার একদম ফেটে যাচ্ছিল। এই মদটার এই এক দোষ। নেশাটা জমে, কিন্তু খুব হিসি পায়। কই দাও, নেশাটা ধরছে। সব শেষ করে দিলে নাকি?

না, আমি ওরকম বেইমান নই। নাও খাও।

একটু পরেই হিতেন মজুমদার উসখুস করে উঠল। রবার্ট ভুরু তুললে জিজ্ঞেস করল, কী হল? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

না ভাই, তুমি ঠিকই বলেছিলে। যাই জল ছেড়ে আসি।

হিতেন মজুমদার একটু আড়াল হতেই রবার্ট দ্রুত পকেট থেকে ট্যাবলেট দুটো বার করে মদের বোতলটার মধ্যে ফেলে দিল। একরাশ বুদবুদ তুলে ট্যাবলেট দুটো তলিয়ে গেল বোতলের নীচে। হিতেন মজুমদার ফিরে এসে বলল, কী ভাই, শেষ করে দিলে নাকি?

মদের বোতলটা এগিয়ে রবার্ট বলল, না ভাই, আমিও বেইমান নই। চলো তাড়াতাড়ি শেষ করে টাকাটা নিয়ে চলে যাই।

হিতেন মজুমদার ঢকঢক করে খেতে থাকল মদটা।

কিছুক্ষণ পরেই হিতেন মজুমদারের শরীরটা কীরকম অবশ মনে হতে থাকল। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। তারপরেই মনে হল রবার্টের সপাট একটা লাথি এসে বসল তলপেটে। যন্ত্রণাটা মেলাবার আগেই পরের লাথিটা একেবারে মুখে। অসাড় শরীরে কোনও প্রতিরোধই করতে পারল না। মার খেতে খেতে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার আগে শুধু মনে হল হাতের কবজির ওপর দিয়ে গভীরভাবে চলে যাচ্ছে একটা ধারালো ব্লেড।

হিতেন মজুমদারের নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকা শরীরটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল রবার্ট। দু'কবজি বেয়ে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। হিতেন মজুমদারের পকেট থেকে ব্যাগ আর ছুরিটা বার করে গায়ের ওপরে একদলা থুতু ছিটিয়ে দিয়ে রবার্ট পা চালাল।

রবার্টের একটাই কাজ বাকি ছিল, যে কাজটা করতে পরের দিন ভোরবেলা হাজির হল গোরস্থানে মার্থা গঞ্জালেসের কবরে। পকেট থেকে বার করে আনল বিট্টুর দেওয়া একটা কাগজের প্যাকেট। যার মধ্যে আছে শিপ্রার ছাই। পকেট থেকে হিতেনের ছুরিটা বার করে মার্থার কবরের পাশে খানিকটা গর্ত করল। তারপর সেই গর্তে ছাইটা ফেলে ফিরে মাটি চাপা দিয়ে উপুড় হয়ে জমিটায় একটা চুমু খেয়ে ফিসফিস করতে বলতে থাকল, দয়াল সান্যালের অন্য শর্তটা ছিল, বিট্টুর মনটাকে তোর বিরুদ্ধে বিষিয়ে দেওয়া। সে শর্তের জবাব আমি তোর আর মার্থা আন্টির কাছে রেখে গেলাম। তোর জন্য আমি শুধু এটুকুই করে যেতে পারলাম রে শ্যারন... আর একটা কথা তোকে সেদিন বলতে পারিনি শ্যারন... এতদিনে তুই নিশ্চয়ই জেনে গেছিস। মাম্মি আর মার্থা আন্টি এখন একসঙ্গেই থাকে। মাম্মিকে শুধু আমার হয়ে বলে দিস, আই অ্যাম স্যরি... রিয়েলি স্যরি...

হিতেন মজুমদারের ব্যাগটা আর ছুরিটা মার্থা গঞ্জালেসের কবরের ওপর রেখে শান্ত মনে গোরস্থান থেকে বেরিয়ে এল রবার্ট। রবার্টকে এরপরে আর কোথাও দেখা যায়নি।

৬৯

দয়াল সান্যাল ফোনটা ছেড়েই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, সরোজ... সরোজ...

দয়াল সান্যালের চেম্বারের বাইরে থেকে যারা এই ডাকটা শুনতে পেল, ব্যস্ত হয়ে উঠে গেল সরোজ বক্সীর ছোট্ট ঘরে ডাকটা রিলে করে পৌঁছে দিতে। সরোজ বক্সী ঘরে চুপ করে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসে ছিলেন। ডাক পেয়ে দয়াল সান্যালের ঘরে ঢুকে দেখলেন দয়াল সান্যাল উত্তেজিত হয়ে পায়চারি করছেন। সরোজ বক্সীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, শুনেছ?

এভাবে কথা শুরু করাটাই দয়াল সান্যালের স্টাইল। কিন্তু সরোজ বক্সীর আশ্চর্য

লাগল দয়াল সান্যালের উত্তেজনার মাত্রা দেখে। যেদিন শিপ্রা সান্যালের মৃত্যুর খবরটা এসেছিল সেদিনও এতখানি বোধহয় উত্তেজিত হননি দয়াল সান্যাল।

সরোজ বক্সীকে চুপ করে থাকতে দেখে দয়াল সান্যাল একইরকম বিস্ফারিত চোখে বললেন, হিতেন মজুমদার খুন হয়ে গেছে!

খবরটা খুব আশ্চর্যজনক মনে হল না সরোজ বক্সীর। লোকটা তো এমনিতেই অন্ধকারের কারবারি ছিল। এদের পরিণতি তো এই হয়। আশ্চর্য লাগল দয়াল সান্যালের উত্তেজনা দেখে। সেটা তারপরেই ভেঙে বললেন, খুন হয়েছে কোথায় জানো? মল্লিকবাজারে একটা গাড়ির গ্যারেজে আর ওর মানিব্যাগ পাওয়া গেছে মার্থা গঞ্জালেসের কবরের ওপরে। ওখানে কে ওকে খুন করল? কেন করল? মানিব্যাগটাই বা কী করে কবরখানায় এল...

সরোজ বক্সী এবারও চুপ করে থাকলেন। তাঁর কাছে যে উত্তর আছে, প্রশ্নকর্তার কাছে একই উত্তর আছে। দয়াল সান্যাল, সরোজ বক্সী, মার্থা মেমসাহেব আর হিতেন মজুমদার, সম্পর্কগুলোর সমাপতনে একটাই উত্তর আছে। রবার্ট গোমস। দয়াল সান্যাল আবার উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন, রবার্ট! রবার্ট ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। মার্থা গঞ্জালেসের কবরের ওপরে হিতেনের মানিব্যাগটা পেয়ে পুলিশ আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করছিল, কে মারতে পারে হিতেনকে? আমি বলেছি রবার্টের কথা। হিতেন তো রবার্টের পিছনে ফেউয়ের মতো লেগে ছিল। সেখান থেকে... তুমি কি হিতেনকে বাড়াবাড়ি কিছু করতে বলেছিলে?

সরোজ বক্সী মাথা দোলালেন, না স্যার...। হিতেনকে তো আমরা লাগিয়েছিলাম শুধু টাকাটা ফেরত দেওয়ার জন্য চাপ দিতে...

আঃ সরোজ। টাকাটা তো আমি ফেরত চাইনি। তার পরিবর্তে যা চেয়েছিলাম সেটা তোমার ভাল করেই জানা... তোমাকে না সরোজ... মাঝে মাঝে আমি বেশিই ছাড় দিই। সব পাকিয়ে দাও তুমি... হিতেনের মানিব্যাগটা কেন মার্থা গঞ্জালেসের কবরের কাছে পাওয়া গেল... কেন খুন হল ওখানে...

দয়াল সান্যাল প্রশ্নটার উত্তর না পেয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকলেন। ভেতরের ঝড়টা উঠতে থাকল সরোজ বক্সীর মধ্যেও। সেদিন রবার্টকে অফিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দয়াল সান্যাল। ব্যাঙ্কের নিয়মের অনেক ধারা, উপধারা এবং নিজের প্রভাব আমলাতন্ত্রে কত দূর বিস্তৃত তার ফিরিস্তি শুনিয়েছিলেন। তারপর শুনিয়েছিলেন বিকল্প শর্তটার কথা। রবার্ট চমকে উঠেছিল। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। রবার্টের প্রতিক্রিয়া দেখে দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীকে ডেকে বলেছিলেন রবার্টকে আরও বুঝিয়ে বলার কথা।

সরোজ বক্সী নিজের ছোট্ট ঘরে দরজা রুদ্ধ করে রবার্টকে বলেছিলেন, আপনি মেনে নিন রবার্ট। অশান্তি বাড়িয়ে রেখে লাভ নেই। উনি যেরকম বলেছিলেন...

দয়াল সান্যালের ব্যক্তিত্বের কাছে রবার্টের যে ফ্যাকাশে মুখটা ছিল সেটা অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছিল। এক গ্লাস জল খেয়ে বলেছিল, আপনি জানেন নিশ্চয়ই উনি কী বলছেন?

সরোজ বক্সী আস্তে আস্তে নীরবে মাথা দুলিয়েছিলেন। রবার্ট মুখে চুকচুক আওয়াজ করে বলেছিল, এর পরেও আপনি... শ্যারনের জন্য আপনার একটু কৃতজ্ঞতা নেই?

সরোজ বক্সী একদৃষ্টে কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন তারপর খুব নিচু গলাতে আবার বলতে চেয়েছিলেন, আপনি মেনে নিন রবার্ট। আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। আপনি যদি পারেন। অন্তত এই শর্তটার অছিলায় ছোট ছেলেটার সঙ্গে কিছুটা একান্তে সময় কাটাতে তো পারবেন।

রবার্ট ফুঁসে উঠল, একান্তে সময় কাটিয়ে কী করব? দয়াল সান্যাল যা বোঝাতে বলছে তাই বোঝাব? শ্যারন মিথ্যেবাদী ছিল, শ্যারন নোংরা চরিত্রের ছিল, শ্যারন...

উত্তেজিত হয়ে রবার্ট চুপ করে গেল। সরোজ বক্সীর যেন সেসব খেয়াল নেই। আপন মনেই বলতে থাকলেন, মার্থা মেমসাহেব ম্যাডামের বিদায়ের দিনে বলেছিলেন, আপনি ওকে একটু দেখবেন সরোজবাবু। বিশ্বাস করুন চেষ্টা করেছিলাম। যতই দাসত্ব থাকুক, পেটের খাতিরে যত অন্যায় করতে বাধ্য হই, আমিও একটা মানুষ, একটা মেয়ের বাপ। আপনি মেনে নিন রবার্ট, দু'-চারটে মিথ্যে বলতে পারবেন না?

রবার্ট মুখ কোঁচকাল, মিথ্যে? ওই একরত্তি ছেলেটাকে?

না, মিথ্যে আমার মালিকের জন্য। ওঁকে বলবেন আপনি ওঁর মতো কাজ করছেন।

রবার্টের গোটা ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছিল। দয়াল সান্যালের অফিসে, তার সবচেয়ে বশংবদ ভিতু ভিতু ব্যক্তিত্বহীন লোকটা এ কীবকম কথা বলছে? লোকটার কি সত্যিই একটা বিবেক, নরম মন আছে? নাকি লোকটা আরও গভীর জলের মাছ, গভীর ষড়যন্ত্রকারী?

সরোজ বক্সীর অন্যমনস্কতা ভাঙাতে দয়াল সান্যাল গর্জে উঠলেন।

আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি সরোজ। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকো না। ভেবে উত্তরটা বার করো, হিতেন কেন ওখানে খুন হল?

প্রশ্নটা করে সরোজ বক্সীর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেন দয়াল সান্যাল। হঠাৎ দয়াল সান্যালের মুখের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করতে থাকলেন সরোজ বক্সী। যে-মুখটায় এতক্ষণ দপদপ করছিল রাগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সেই রেখাগুলো পরিবর্তন হতে হতে একটা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে পরিবর্তিত হতে থাকল। প্রায় শুকিয়ে যাওয়া গলায় দয়াল সান্যাল বলে উঠলেন, শিপ্রা... শিপ্রার... প্রেতাত্মা নেই তো সরোজ... ও কিন্তু আমাকে শেষ করতে না পারলে...

একটা কাঁপুনি দিতে থাকল দয়াল সান্যালের শরীরে। তারপর ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেলেন। সরোজ বক্সী ছুটে এসে দেখলেন দয়াল সান্যালের গা'টা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে লোক ডাকতে আরম্ভ করলেন উনি।

সান্যালবাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক ডা. কৈলাস মুখার্জিকে খবর দেওয়া হল। ডা. মুখার্জি পরীক্ষা করে দেখলেন সেরিব্রাল বা কার্ডিয়াক কোনও আক্রমণের শিকারই দয়াল সান্যাল নন। অফিসেই প্রাথমিক শুশ্রূষা করে বললেন, হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে ভরতি করার কোনও দরকার নেই। হি নিডস আ কমপ্লিট রেস্ট।

অফিসের সকলে যখন দয়াল সান্যালের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, ডা. মুখার্জি সরোজ বক্সীকে ডেকে বললেন, কত বছর পর আবার এরকম হল?

সরোজ বক্সী মনে মনে বছর হিসেব করে বললেন, চারের ওপরই হবে।

সেই হঠাৎ হঠাৎ নাম ভুলে যাওয়া... ইদানীংকালে কি আর হচ্ছিল?

না, দেখিনি তো। আমরা তো ভাবছিলাম ভাল হয়েই উঠেছেন।

ডা. হেমন্ত পাঠকের ওষুধ খাচ্ছিলেন?

যত দূর জানি, না। ওষুধপত্তর তো আমাকেই আনতে দেন।

ডা. মুখার্জি গম্ভীর গলায় বললেন, এই রোগের অ্যাটাক এরকমভাবেই হয়। আপনার মনে আছে সুজন দত্ত মারা যাওয়ার পর ওঁর একবার ঠিক এরকমই হয়েছিল। মিসেস সান্যালের মৃত্যুটা ওঁকে আবার একই আঘাত দিয়ে গেল।

সরোজ বক্সী অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, ম্যাডাম নন। আর একজনের মৃত্যু... হিতেন... হিতেন মজুমদার।

কথাটা এত আস্তে সরোজ বক্সী বললেন যে ডা. মুখার্জি শুনতেই পেলেন না। জানতে চাইলেন, কিছু বললেন?

না স্যার! বলছিলাম এখন কী চিকিৎসা?

চিকিৎসা তো ওই একটাই, জ্বরটা চড়তে না দেওয়া। ব্লাড টেম্পারেচার ব্রেনের অনেক ক্ষতি করে। তার আমি ওষুধ দিচ্ছি। ডা. পাঠককে নিয়েও একবার যাব। কতটা ঘুমের ওষুধ, নার্ভের ওষুধ দেওয়া হবে, উনিই ঠিক করবেন। কিন্তু এই ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে উনি সেদিনও যা বলেছিলেন আজও তাই বলবেন। ওঁর দরকার একটু সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ এবং চারিদিকে কিছু সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

ম্যাডাম চলে গেছেন। তবে বাড়িতে চাকর বাকরের কমতি নেই। সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না।

ডা. মুখার্জি হাসলেন, এখনও আপনি কী লুকোনোর চেষ্টা করছেন সরোজবাবু? আপনি আমি তো ছেড়ে দিন, পৃথিবীর কারওই জানতে বাকি নেই কত্তা-গিন্নির সম্পর্কটা কী ছিল। আর চাকর বাকরদের কথা বলছেন! সব কিছু চাকর বাকরদের দিয়ে হয় না সরোজবাবু।

৭০

যামিনী ভট্টাচার্য গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলেন সরোজ বক্সী চুপ করে গঙ্গার দিকে মুখ করে একফালি ঘাসের ওপর বসে আছেন। সূর্য পশ্চিমে সবে ডুবেছে। দিনের শেষ আলো দ্রুত মরে আসছে। বুধবারের সন্ধেবেলায় সরোজ বক্সীর মতো চাকরিসর্বস্ব মানুষের গঙ্গার ধারে এরকম সময় উপস্থিতি বেশ আশ্চর্যজনক ঘটনা। যামিনী ভট্টাচার্য প্রথমে ভাবলেন, মানুষটা একদিন নিজের সঙ্গে কাটাচ্ছে কাটাক, অহেতুক বিরক্ত করবেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত পারলেন না। সরোজ বক্সীর পার্শে এসে বসলেন।

সরোজ বক্সী একবার যামিনী ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে আবার পশ্চিম দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বললেন, সূর্যটা ডুবে গেল যামিনীদা।

যামিনী ভট্টাচার্য হাত দুটো পিছনে ছড়িয়ে আধশোওয়া হয়ে বললেন, সূর্য কখনও ডোবে না সরোজ। আমরাই ঘুরে চলে যাই অন্ধকারে।

সরোজ বক্সী কোনও উত্তর দিলেন না। যামিনী ভট্টাচার্য সরোজ বক্সীর মগ্নতা ভাঙাতে বললেন, তোমার চাকরিটা আছে তো সরোজ? এই সময়ে এখানে?

সরোজ বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

চাকরি যাওয়া আমার ভাগ্যে নেই যামিনীদা, মাঝে মাঝে মনে হয় এইটুকু দুর্ভাগ্য ভগবান কেন আমাকে দিলেন না।

এটা ভেবে তুমি আনন্দ পাও সরোজ? বেকারির জ্বালা জানো? পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যাটা কত জানো? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের সামনে লাইন দেখেছ কখনও? মোরারজি দেশাই, চরণ সিংহ, জগজীবন রাম ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে কত বড় বড় কথা বলল। কী হল? বেকারি ইন্দিরা জামানাতে যা ছিল এখনও তাই আছে। তুমি অনেক ভাগ্যবান সরোজ। এই বাজারে খেয়ে-পরে বউ-মেয়েকে নিয়ে সংসার করছ। নিজের সৌভাগ্যটাকে দুষছ? এ মহাপাপ সরোজ। মহাপাপ।

আপনি আমাকে.প্রায়ই একটা কথা বলতেন না যামিনীদা, আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে চেনো। বিশ্বাস করুন নিজেকে চেনার খুব চেষ্টা করি। কিন্তু কখনও চিনতে পারি আবার কখনও হারিয়ে যাই। তখন নিজেকে একদম চিনতে পারি না। আমার ছায়াটাকে মনে হয় অন্য মানুষের ছায়া। বুঝতে পারি না, কোনটা আসল আমি? রক্তমাংসের আমিটা, না আমার ছায়াটা।

কোনওটাই নয় সরোজ। তোমার আত্মাটাই আসল আমি। তোমাকে আমি বহুবার বলেছি সরোজ তোমার আত্মা যা চাইবে না, তোমার রক্তমাংসের শরীরের কোনও ক্ষমতা নেই সেটা করে। একটা উদাহরণ শুনবে? সেদিন যে বাচ্চাটাকে তুমি অস্থি বিসর্জন দেওয়াতে নিয়ে এসেছিলে মন্ত্রের একটা শব্দ ওর চোখে একটা ভয়ংকর শূন্যতা এনে দিয়েছিল। আমার আত্মা সঙ্গে সঙ্গে আমার টুঁটি চেপে ধরেছিল। মনে হচ্ছিল দম বন্ধ হয়ে যাবে। ছটফট করেছিলাম আমি...

একটা শব্দ! মাত্র একটা শব্দেই আপনার আত্মা আপনার টুঁটি চেপে ধরেছিল? আর এই যে আমি, বছরের পর বছর ধরে শ'য়ে শ'য়ে অন্যায় করে যাচ্ছি, কই আমার আত্মা তো কখনও আমার টুঁটি চেপে ধরে না।

যামিনী ভট্টাচার্য উত্তেজিত হয়ে ওঠা সরোজ বক্সীকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, এভাবে ব্যাপারটা দেখো না। তুমি তো শুধু তোমার কর্তব্য করো। যে তোমাকে দিয়ে পাপের কাজটা করায়, পাপের দায়ভাগ তার।

মানতে পারলাম না যামিনীদা। আপনি যদি আমাকে দিয়ে একটা খুন করাতে চান আর খুনটা আমি করি, তা হলে সে পাপের দায়ভাগ আমার নেই?

তুমি আমাকে একটা কথা বলো তো সরোজ। মিলিটারিরা যুদ্ধ করতে গিয়ে কত কত

মানুষ মারছে, তা হলে কি তারা খুনি? পাপী? না, কেউ তাদের খুনি বা পাপী বলবে না। কারণ তারা দেশের অনেক বড় স্বার্থের জন্য তাদের কর্তব্য করছে। কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধতে পাণ্ডবরা...

সরোজ বক্সী অসহিষ্ণুর মতো বলে উঠলেন, আমি, আমি কীসের কর্তব্য করছি আপনি বলতে পারেন যামিনীদা?

তুমি, তোমার সংসারের জন্য কর্তব্য করছ।

সরোজ বক্সী দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে এবার ডুকরে উঠলেন, কার জন্য কর্তব্য? সংসারটা কে? অতসী আর বীথি? আপনি জানেন অতসী আর বাঁচবে না সরোজদা। বিট্টুর মতো বীথিও মা-হারা হয়ে যাবে আর কয়েকদিনের মধ্যে। আমিও ক'দিন পরে এই গঙ্গায় এসে অতসীর অস্থি ভাসাব...

চমকে উঠলেন যামিনী ভট্টাচার্য। নিজেকে সামলে নিয়ে সরোজ বক্সীর পিঠে হাত রাখলেন। নরম গলায় বললেন, কী হয়েছে সরোজ?

সরোজ বক্সী ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ঈশ্বর পাপের জঙ্গলে একটা পবিত্র ফুল ফুটিয়েছিলেন। শিপ্রা সান্যাল। সেই ফুলটা ঝরে যাওয়ার পর ঈশ্বর বিচার করতে বসেছেন। আমার হাতে অতসী খুন হল যামিনীদা। ঈশ্বর নিক্তির ওজনে আমার সব পাপের হিসেব করে দিলেন।

যামিনী ভট্টাচার্য বিস্মিত হলেন। সরোজ বক্সীর কাঁধ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, কী হয়েছে ঠিক করে খুলে বলো সরোজ।

সরোজ বক্সী নিজেকে একটু সামলানোর চেষ্টা করলেন।

ডাক্তার বলল যদি সময়ে নিয়ে এসে চিকিৎসা করাতেন তা হলে ও বেঁচে যেত। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্যান্সারটা পেটে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পাপ আমাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে যামিনীদা। কত বছর আগেই তো রোগটা তার জন্মের জানান দিয়েছিল। কিচ্ছু করিনি যামিনীদা... কিচ্ছু না। একবার শুধু পিজি-তে নিয়ে গিয়েছিলাম... তারপর নীতিন ডাক্তারের চিকিৎসা। ওষুধটা পর্যন্ত আমি নিজে কিনে আনতাম না।

অতসী জানে? কোনওরকমে জিজ্ঞেস করলেন যামিনী ভট্টাচার্য।

এখনও জানে না। তবে আন্দাজ করতে পারছে খুব খারাপ কিছু একটা হয়েছে। মেয়েটার কথা ভেবে ভীষণ কান্নাকাটি করছে। ডাক্তার বলেছে কালই চিত্তরঞ্জনে ভরতি করতে। চিত্তরঞ্জনে গেলেই তো সব বুঝতে পেরে যাবে।

যামিনী ভট্টাচার্য শুকনো গলায় সরোজ বক্সীর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, তুমি এত ভেঙে পোড়ো না সরোজ। চিকিৎসা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। দেখো না ঠিকও হয়ে যেতে পারে... ঈশ্বর করুণাময়। ওঁর ওপর বিশ্বাস রাখো।

সরোজ বক্সী উদাস গলায় বলতে থাকলেন, জীবনটা কী অদ্ভুত তাই না যামিনীদা? এতগুলো বছর পেটে ব্যথা ব্যথা করে, ওষুধ খেয়ে খেয়ে সংসার করল। মেয়েটাকে বড় করল। সন্ধেবেলায় লেখাপড়া শেখাতে বসাল। আমি বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত ভাতের

থালা নিয়ে বসে থাকল। মনপ্রাণ দিয়ে নিজের কর্তব্য করল। হঠাৎ একটা বায়োপ্সি রিপোর্ট মৃত্যু পরোয়ানাটা জানান দিয়ে দিল। যে ক'দিন আগে একটা বাচ্চা ছেলের মাতৃহারার খবর শুনে হাপুস নয়নে কাঁদল, সে নিজেও সেদিন জানে না ক'দিন পরে নিজের মেয়েকে এভাবে ছেড়ে চলে যেতে হবে।

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে যামিনী ভট্টাচার্য জানার চেষ্টা করলেন, তুমি কাকে দেখিয়েছ? দরকার থাকলে সেকেন্ড ওপিনিয়ন, থার্ড ওপিনিয়ন নাও। আমি তোমার সঙ্গে যাব। একটা রিপোর্টেই এরকম ভেঙে পোড়ো না।

সরোজ বক্সীর কানে কথাগুলো ঢুকল না। আপন মনে বলে যেতে থাকলেন, ম্যাডামের শ্রাদ্ধের দিন অতসী ও বাড়ি গিয়েছিল। সারাক্ষণ কান্নাকাটি করছিল। তারপরেই পেট ব্যথা শুরু হয়েছিল। অত লোকের মাঝে কিছু বলেনি। কোনওরকমে বাড়ি ফিরে এসেছিল। সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে... তারপরে আর জি করে.. সরোজ বক্সী কথা শেষ করতে পারলেন না।

যামিনী ভট্টাচার্য জানতে চাইলেন, এখন ও কি হাসপাতালে?

না, ওরা মৃত্যু পরোয়ানাটা জানিয়ে দিয়ে চিত্তরঞ্জনে রেফার করেছে... অতসী এখন বাড়িতেই আছে।

তোমার মেয়ে? ও কোথায় থাকবে?

এখন ক'দিন তো শেফালিদের বাড়িতে... তারপর সারাটা জীবনই তো..

আবার ডুকরে উঠলেন সরোজ বক্সী। কথা শেষ করতে পারলেন না।

৭১

ঘুমটা ভেঙে দয়াল সান্যালের মনে হল আজ যেন কিছুটা সুস্থ। গত কয়েকদিন একদম তন্দ্রা আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে কেটেছে। সেটা ঠিক কতদিন হিসেব করতে পারলেন না। তবে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে শরীরটা বেশ দুর্বল মনে হল। মাথাটা টলটল করছে।

সরোজ... সরোজ...

চিৎকার করে সরোজ বক্সীকে ডাকার চেষ্টা করলেন দয়াল সান্যাল। এবং আশ্চর্য হয়ে দেখলেন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়াল এক নারীমূর্তি। সকালবেলাতেই চান করে ভিজে চুল পিঠেব ওপর খোলা। কপালে একটা বড় গোল টিপ। এই মুখটাকে দেখেছেন। শিপ্রার শ্রাদ্ধের দিন এই মহিলা সারাক্ষণ বিট্টুর পাশে বসে পুজোয় সাহায্য করছিল। বলেছিল ডুমুরঝরায় কী যেন সম্পর্ক আছে। নামটা মনে পড়ছে না। সেদিন 'দাদা' 'দাদা' করে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছিল।

দয়াল সান্যাল গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি...

মহিলা দয়াল সান্যালের কাছে এগিয়ে এসে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না দাদা? আমি পৃথা।

পৃথা?

পৃথা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে দয়াল সান্যালের খাটের কাছে এসে বসে বলল, আমায় ভুলে গেলেন দাদা? আমি ডুমুরঝরার ময়না...

দয়াল সান্যালের মনে পড়ল। সেদিন সরোজ বক্সী এরকমই কিছু একটা বলেছিল। ডুমুরঝরার ময়না। লোকেন ওকে নিয়ে এসেছে। বা বলা ভাল ওই মেয়েটাই কাগজে পড়ে লোকেনকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই দেখা করতে এসেছিল। সেদিন অত লোকের মধ্যে আলাদা করে এ ব্যাপারে আর মন দেওয়ার সময় ছিল না। তবে সেদিনে অনিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা তো ছিল প্রচুর। ভেবেছিলেন সেদিনের ব্যাপারটা সেদিনই মিটে গেছে। কিন্তু মেয়েটা আবার এল কেন? এবং তাও আবার দোতলায় শোওয়ার ঘরে বিছানার পাশে। একটা অস্বস্তি নিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, সরোজ কোথায়?

সরোজবাবু এখন বোধহয় কয়েকদিন আসতে পারবেন না।

দয়াল সান্যাল বিস্মিত হলেন। সরোজ বক্সী ক'দিন আসতে পারবে না, সেটা এই মেয়েটা জানল কী করে? আর সরোজের তো আস্পর্ধা কম নয়। নিজে আসতে পারবে না, এই খবরটা এই অজানা অচেনা মেয়েটার কাছে বলে চলে গেছে। দয়াল সান্যাল আর একটু উঠে বসে আরও গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করলেন, কী হয়েছে সরোজের?

পৃথা অল্প কাঁধটা ঝাঁকাল।

বলল তো বউয়ের শরীর খারাপ। হাসপাতালে ভরতি হয়েছে।

দয়াল সান্যাল স্নায়ুর মধ্যে চিনচিনানিটা অনুভব করলেন। সরোজ বক্সী বউকে হাসপাতালে ভরতি করতে হবে বলে এখন এই অবস্থায় এ বাড়িতে আসা ছেড়ে দিল? এবং সেই খবরটুকু নিজে মুখে এসে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল না। দয়াল সান্যালের মুখের নীরব প্রতিক্রিয়াটা দেখে পৃথা বলল, দাদা, মানুষের খারাপ সময়ে কে পাশে এসে দাঁড়াল, তাকে দিয়েই মানুষের আসল সম্পর্কটা বোঝা যায়। আমি কি পারলাম এসময়ে এখানে না এসে থাকতে?

তুমি... মানে... আপনি...

পৃথা দয়াল সান্যালের হাতটা ধরে বলল, দাদা আমাকে আপনি আপনি বলে দূরে রাখবেন না।

দয়াল সান্যাল হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, কী হয়েছে আমার?

ডাক্তার বলেছে আপনার এখন কমপ্লিট রেস্ট নেওয়ার দরকার। মনের ওপর অনেক ঝড় গেছে। অনেক করেছেন দাদা। এবার নিজের দিকটা একটু দেখুন। আমি তো সেদিনই আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। ডুমুরঝরায় যেদিন আপনাকে দেখেছিলাম কী রাজপুত্রের মতো চেহারা দেখেছিলাম। আর সেদিন দেখে চমকে উঠলাম। এ কী চেহারা হয়েছে আমার দাদার? আর বিট্টুর? বিট্টুর দিকে তো তাকাতেই পারছি না। মুখটা এইটুকু হয়ে গেছে। সেদিন থেকেই মনটা দাদা এ বাড়িতেই পড়ে ছিল। থাকতে না পেরে পরশু আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এসে দেখলাম আপনার এই অবস্থা। ধুম জ্বর। বাড়িতে এত লোকজন। ডাক্তার। সবাই আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত,

কিন্তু ছেলেটাকে দেখার কেউ নেই। মনের অবস্থা তো ছেড়েই দিন। কী খাচ্ছে, কখন খাচ্ছে, এসব খেয়াল করারও কেউ নেই। তাই আর পারলাম না দাদা, থেকে গেলাম।

দয়াল সান্যাল চমকে উঠলেন। 'থেকে গেলাম'! মানে পরশু থেকে মেয়েটা এ বাড়িতে থাকছে। কার অনুমতি নিয়ে থাকছে? কারও ওপর রূঢ় হতে দয়াল সান্যাল দু'বার ভাবেন না। এই মেয়েটাকেও এখনই গলা ধাক্কা দিয়ে এ বাড়ির থেকে বার করে দিতে পারেন। কিন্তু বিট্টুর কথাটা শুনে ভেতরে একটু নরম হলেন। সত্যি তো, ছেলেটার কে দেখাশোনা করছে? সরোজ বক্সী থাকলে একটা কথা ছিল। সময় বুঝে সেও তার আসল রংটা দেখিয়েছে।

সুযোগ বুঝে পৃথা বলল, আপনি চিন্তা করবেন না দাদা। বিট্টু যতদিন না হস্টেলে ফিরে যাচ্ছে, আমি যতটুকু পারি...

বাড়ির একজন কাজের লোক চা নিয়ে এসেছিল। পৃথা চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে একটু তুলে ধরে লোকটাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, আঃ স্বপন। তোমাকে বললাম না লিকার ঠিক দেড় মিনিট ভেজাবে। এত কড়া চা কেউ দাদাকে দেয়, যাও পালটে নিয়ে এসো।

স্বপন চায়ের কাপটা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দয়াল সান্যালের বিস্মিত মুখটা দেখে পৃথা বলল, সরি দাদা, আপনার কাজের লোকেদের হয়তো আমার এভাবে বলা উচিত নয়। কিন্তু কিছু জিনিস দেখলে না বলে থাকতে পারি না দাদা। দু'দিন ধরে দেখছি তো। এ বাড়িতে সব আছে। কোনও কিছুরই অভাব নেই। শুধু ধরে রাখার মানুষটাই চলে গেছে। সেটা এখন প্রতিপদে বোঝা যাচ্ছে।

পৃথা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দয়াল সান্যাল হতভম্বের মতো খাটে বসেই থাকলেন। সেই ঘোরটা থেকে গেল সারাদিনই। পৃথা কখনও যত্ন করে ব্রেকফাস্ট এনে দিচ্ছে। সময়মতো ওষুধ খাওয়াচ্ছে। টেবিলের ওপর কাগজপত্তর গুছিয়ে রাখছে। নিজের জন্য এই যত্ন আগে কখনও দেখেননি দয়াল সান্যাল।

৭২

প্রায় পাঁচদিন পর সরোজ বক্সী একদিন সন্ধেবেলায় দয়াল সান্যালের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মুখটা অসম্ভব শুকনো। শরীর ভেঙে পড়েছে। অত্যন্ত ক্লান্ত হাতে দয়াল সান্যালকে নমস্কার করলেন।

এই পাঁচদিনে অনেকটাই সেরে উঠেছেন দয়াল সান্যাল। ক্রমশই যেন পৃথার সেবাযত্নের দাস হয়ে উঠেছেন। সেই চড়া মেজাজ অনেক সংযত হয়েছে। তবে সরোজ বক্সীকে দেখেই ভেতরে নিভে যাওয়া আগুনটা জ্বলে উঠল। চিৎকার করে উঠলেন, কী ব্যাপার তোমার সরোজ? তুমি ভেবেছটা কী?

সরোজ বক্সী বলার চেষ্টা করলেন, স্যার, আমি...

দয়াল সান্যাল ধমকে উঠলেন, শাট আপ, একটাও কথা বলবে না তুমি। শিপ্রা তোমাকে কত টাকা দিয়ে গেছে সরোজ? ক'দিন চালাতে পারবে?

সরোজ বক্সী চুপ করে গেলেন। দয়াল সান্যাল একতরফাই চিৎকার করতে থাকলেন, নেমকহারাম, তোমার জাতটাই নেমকহারাম সরোজ। কাল নির্মল চ্যাটার্জি এসে ঠিকই বলছিল, তোমার মনে গিজগিজ করছে প্যাঁচ।

সরোজ বক্সী কোনওরকমে বললেন, স্যার অতসী হাসপাতালে...

দয়াল সান্যাল মেজাজ হারালেন আরও। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে বললেন, তা হলে আর কী? দু'হাত তুলে নৃত্য করো।

সরোজ বক্সী নিজেকে সামলে এবার একটু স্পষ্ট করে বললেন, স্যার, আমার কিছুদিনের ছুটি চাই।

দয়াল সান্যাল আরও চটে উঠলেন।

ছুটি? ছুটি কারা চায় সরোজ? যারা চাকরি করে। তুমি কি মনে করো এখনও তোমার চাকরিটা আছে?

ঠিক এই সময়ই পৃথা ঘরে এসে ঢুকল।

দাদা, আপনি এত এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন?

দয়াল সান্যাল আঙুল তুলে সরোজ বক্সীকে দেখিয়ে বললেন, পৃথা... পৃথা... এই নেমকহারামটাকে চলে যেতে বলো এখনই।

পৃথা ইশারায় সরোজ বক্সীকে শান্ত থাকতে বলল। এরপর দয়াল সান্যালের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, আপনি উত্তেজিত হবেন না দাদা। সরোজবাবু রোজ দু'বেলা ফোন করে আপনার খোঁজ নিয়েছেন।

সরোজ বক্সী অবাক হলেন। অতসী হাসপাতালে। হাসপাতালের বেডেই নার্সদের কাছে জেনে গেছে তার অসুখটা কী, আন্দাজ করে নিয়েছে পরমায়ু কতদিন। সেই থেকে সরোজ বক্সীর কাছে সে একটা করুণ জেদ ধরে বসে আছে। মারা যাওয়ার পর সরোজ বক্সী যেন আর একটা ভাল মেয়েকে বিয়ে করে, যে বীথিকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করবে। সৎমার চোখে দেখবে না। কখনও অতসীর বিছানার পাশে, কখনও ডাক্তার, ওষুধপত্তরের পিছনে ধাওয়া করতে করতে সরোজ জেরবার হয়েছেন। একবারই শুধু ফোন করে অতসীর অসুখের খবরটা জানিয়েছিলেন। আর জীবনে প্রথমবার দয়াল সান্যালকে আর ফোন করার প্রবৃত্তি হয়নি। অথচ এই মেয়েটা অবোধ্য কারণে সরোজ বক্সীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

সরোজ বক্সীকে চুপ করে থাকতে দেখে পৃথা দয়াল সান্যালকে বলল, বউদির খুব অসুখ। আপনি সরোজবাবুকে ছুটি দিয়ে দিন দাদা।

পৃথার কথায় দয়াল সান্যাল একটু নরম হলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, জিজ্ঞেস করো ওকে, কতদিন ছুটি চাই!

পৃথা সরোজ বক্সীর দিকে তাকাল। সরোজ বক্সী কিছু বলছেন না। মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছেন। পৃথা নিজের মনে একটু হাসল। তারপর নরম গলায় বলল, ওভাবে

কি বলা যায় দাদা। বউদির কঠিন অসুখ, হাসপাতালে আছে। আপনার দরকার হলে আমি ওনাকে খবর পাঠিয়ে দেব।

দরজার মুখে একজন চাকর এসে বলল, নীচে হরিতলা মিলের ম্যানেজারবাবু দেখা করতে এসেছেন।

দয়াল সান্যাল শুনে বললেন, বসতে বলো। আমি আসছি।

হাঁ হাঁ করে আপত্তি করে উঠল পৃথা।

না দাদা, আপনি একদম আর নীচে যাবেন না। এইমাত্র এত রাগারাগি করেছেন। শীতলবাবুকে দেখলে আবার এটা-ওটা নিয়ে রাগারাগি করবেন। আপনি পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আর কারও সঙ্গে কোনও দেখা নয়। আপনি আসুন সরোজবাবু। বাড়িতে তো আপনার মেয়েটা আবার একা আছে।

সরোজ বক্সী একদম অন্যমনস্ক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এই ক'দিন অতসীর পাশে থেকে অবহেলার গ্লানি মেটানোর চেষ্টা করেছেন। অন্য কোনও কিছু নিয়ে ভাবেননি। এই প্রথম মনে সেটা চাপা পড়ে একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা ভাবিয়ে তুলল। ওই মেয়েটা... লোকেন বলেছিল ও ডুমুরঝরার ময়না... এখন ওর নাম হয়েছে পৃথা, মেয়েটা মাত্র ক'দিনেই কী করে বশ করে ফেলল দয়াল সান্যালের মতো মানুষকে?

অন্যমনস্কতা এতই গভীর ছিল যে বসার ঘরে শীতল ভট্টাচার্যকেও খেয়াল করলেন না সরোজ বক্সী। সেই গভীর অন্যমনস্কতাটা ভাঙল বাড়ির বাইরে লনটা পেরোনোর সময়।

সরোজকাকা।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে সরোজ বক্সী বিট্টুকে দেখতে পেলেন। নেড়া মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল উঠতে আরম্ভ করেছে। ওকে দেখে সরোজ বক্সীর বুকের ভেতরটা মোচড় দিল। বিট্টু কাছে এগিয়ে এসে বলল, আপনি এখন আসছেন না কেন সরোজকাকা?

সরোজ বক্সী একটা ঢোঁক গিললেন। নিচু গলায় বললেন, তোমার কাকিমার খুব শরীর খারাপ।

বিট্টুর কয়েকদিন আগে সরোজ বক্সীর বাড়িতে দেখা অতসীর মুখটা মনে পড়ল।

কী হয়েছে কাকিমার?

সরোজ বক্সী উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, তোমার দেখাশোনা সব ঠিক হচ্ছে তো বিট্টুবাবু? আমি তো একদমই আসতে পারছি না।

বিট্টু উদাস গলায় বলল, হ্যাঁ, ওই কে একজন এসেছে না, ওই সব দেখাশোনা করছে।

সরোজ বক্সী একটু বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন, ও কে তুমি জানো?

বিট্টু মাথা হেলাল। বলল, আমাদের আসল বাড়ি যেখানে, ডুমুরঝরায়, ওখানকার। আমাদের রিলেটিভ হয়।

সরোজ বক্সী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন বাড়ির থেকে বেরিয়ে এল লোকেন। বিট্টুর কাছে এসে বলল, অ্যাই দেখো, তুমি এখানে। তোমাকে কখন

থেকে পৃথাদিদি খুঁজছে। খোলা আকাশের নীচে নেড়া মাথায় ঠান্ডা লেগে যাবে যে। চলো চলো, ভেতরে চলো। পৃথাদিদি ডাকছে।

বিট্টু একটা স্থির দৃষ্টিতে লোকেনের দিকে তাকাল। তারপর প্রায় ধমকে উঠল, কথার মধ্যে কথা বলতে এসো না। যাও।

বিট্টুর গলা শুনে চমকে উঠলেন সরোজ বক্সী। বাবা না মা, কার ব্যক্তিত্বটা পেতে চলেছে এই কিশোর?

লোকেন একটু থতমত খেয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল।

ঠিক আছে, ঠিক আছে... বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।

বিট্টু আর কোনও উত্তর দিল না। লোকেন চলে যাওয়ার পর সরোজ বক্সী জানতে চাইলেন, লোকেনও এখন এখানে থাকছে বুঝি?

তাই তো দেখছি। আমার একটুও ভাল লাগে না। বিচ্ছিরি লোক।

বিচ্ছিরি কেন?

কোনও ম্যানার্স জানে না, যখন তখন ঘরে ঢুকে পড়ে। এটা সেটা জিনিসে হাত দেয়।

সরোজ বক্সী টের পেলেন সান্যাল বাড়িতে সাংঘাতিক একটা পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। ভাবলেন, মালিকের বাড়ি, মালিকের মর্জি। তার ভেতরে ঢোকার কী দরকার! স্ত্রী, কন্যা, পরিবার ভুলে কোনও প্রশ্ন না করে মুখ বুজে এতদিন নিরন্তর সেবা করার পর, এই তো একটু আগেই কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে ব্যবহার করার মতো করে মালিক চাকরিটাই খেয়ে নিচ্ছিল। এ বাড়ির চেয়ে নিজের জীবনের আশু সংকটটা অনেক বেশি। কিন্তু সামনে দাঁড়ানো খোঁচা খোঁচা চুলের নেড়া মাথা ছেলেটাকে দেখে না বলে থাকতে পারলেন না, তুমি খুব সাবধানে থেকো বিট্টুবাবা।

৭৩

বিট্টুকে আবার কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং-এ পাঠাবেন কিনা এই নিয়ে একটা দ্বিধায় ছিলেন দয়াল সান্যাল। নানান ছলাকলায় পৃথা ততদিনে দয়াল সান্যালকে একটা মায়াজালে আবদ্ধ করে নিয়েছে। পৃথার ক্রমাগত পরামর্শে শেষ পর্যন্ত আর বেশি দিন নিজের কাছে ছেলেকে আটকে রাখলেন না দয়াল সান্যাল। কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিলেন। সেবার ফিরে যাওয়াটা একদম অন্যরকম ছিল বিট্টুর কাছে। চারদিকের চেনা পৃথিবীটা পালটে গেছে। স্কুলের বিশাল বাড়িটা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত সব কিছু। আরও অসহ্য লাগতে আরম্ভ করল যখন দেখল বন্ধুবান্ধব থেকে আরম্ভ করে মাস্টারমশাইরা, এমনকী ব্রাদাররা পর্যন্ত ওকে করুণার চোখে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এই অবস্থা থেকেই ক্রমশ একটা নিরাপত্তাহীন একাকিত্বের জীবন গ্রাস করতে থাকল বিট্টুকে। না ভাল লাগত বোর্ডিং-এ থাকতে, না টানত কলকাতা।

এরকম সময়ে একদিন বিট্টুর স্কুলে এলেন ব্রাদার ডি'সুজা। দিনটা ছিল রবিবারের সকাল। প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার অ্যান্ডারসন সকালে চ্যাপেলে যাওয়ার আগে অল্প সময়ের জন্য নিজের অফিসে আসেন। বিট্টুকে সেই সময় ওঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। বিট্টু প্রিন্সিপ্যালের অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল ওর দিকে পিছন করে সাদা একটা জোব্বা পরে বসে আছেন বৃদ্ধ ব্রাদার ডি'সুজা। পাশে আরও দু'জন টিচার দাঁড়িয়ে। টিচারদের মাথা নিচু করে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্রাদার ডি'সুজাকে· ওঁরা চেনেন এবং খুব শ্রদ্ধা করেন। বিট্টু পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ব্রাদার ডি'সুজার কাছে। প্রথমবার যখন দেখা হয়েছিল, পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল। এবার টিচারদের সামনে ইতস্তত লাগল। ব্রাদার ডি'সুজা বিট্টুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকলেন বিট্টুর দিকে। তারপর বিট্টুর কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে খুব নিচু গলায় বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন, ইটস হার্ড টু লস সামওয়ান হু ইজ ইয়োর মাদার। .. মে গড ব্লেস হার সোল...

বিট্টুর কাঁধে হাতটা রেখে ব্রাদার ডি'সুজা চুপ করে চোখটা বন্ধ করে আছেন। প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার অ্যান্ডারসনও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাত দুটো টানটান করে সামনের দিকে জড়ো করা। মাথা অবনত। অন্য টিচাররাও একইরকম ভাবে মাটিব দিকে মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে। এই অনুচ্চার শোকপ্রকাশ এতদিন অসহ্য লেগেছে বিট্টুর, কিন্তু আঁজ, এই প্রথম কাঁধে ব্রাদার ডি'সুজাব হাতটা অদ্ভুত একটা শান্তি এনে দিচ্ছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দলা পাকাচ্ছে একটা কান্না।

চোখটা খুলে ব্রাদার ডি'সুজা ঠোঁট দুটো শক্ত করে বুকে ক্রুশ এঁকে বিট্টুর কাঁধটা দু'বার ঝাঁকালেন। তারপর শান্তভাবে চেয়ারে বসলেন। উনি বসার পর প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার অ্যান্ডারসন নিজের চেয়ারে বসে বিট্টুকে বললেন, প্রীতম, ইট ইজ আওয়ার এক্সট্রিম প্রিভিলেজ যে ব্রাদার ডি'সুজা আজকে চ্যাপেলে আমাদেব গান শোনাবেন। আজ আমরা সবাই প্রভু যিশুর কাছে তোমার মায়েব জন্য প্রার্থনা করব। চ্যাপেলে যাওয়ার আগে ব্রাদার ডি'সুজা তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। তুমি এখানেই ওনার সঙ্গে কথা বলো, তারপর ওঁকে ব্রাদার ফেডরিকের কাছে পৌঁছে দিয়ো।

ব্রাদার ডি'সুজাকে বিট্টুর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ করে দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার অ্যান্ডারসন অন্য দু'জন শিক্ষককে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রাদার ডি'সুজা এবার নরম করে হেসে বললেন, সেই তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল আমার বাড়িতে। তারপরে অনেকদিন পরে তোমাদের স্কুলে এলাম। তবে একটা সময়ে তোমাদের স্কুলে প্রায়ই আসতাম। কখনও চার্চের কাজে। কখনও যখন এখানকার স্কুলগুলোর একসঙ্গে মিটিং হত।

বিট্টু আনমনা হয়ে বলল, আপনি তো মাম্মিদের স্কুলে ছিলেন। একদিন নিয়ে যাবেন মাম্মির স্কুলটা দেখাতে?

ব্রাদার ডি'সুজা আলতো করে বিট্টুর বুকে একটা ঘুসি মেরে বললেন, উমম... দুষ্টু ছেলে... মেয়েদের স্কুলে কেন যাবে?

মাম্মির স্কুলটা যে শুধু মাম্মির স্কুল নয়, মেয়েদের একটা স্কুল সেটা প্রথম উপলব্ধি করল বিট্টু। গালে রক্তের আভা খেলল। ব্রাদার ডি'সুজা সকৌতুকে সেটা লক্ষ করলেন। বিট্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, নিশ্চয় নিয়ে যাব। তোমার মাম্মিকে আমি কোন কোন ক্লাসরুমে পড়িয়েছি দেখাব। কিন্তু তার আগে বলো তুমি বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো কেন ছেড়ে দিয়েছ?

বিট্টু চুপ করে থাকল। মনে মনে ভাবতে থাকল ব্রাদার ডি'সুজা কী করে জানলেন ওর আজকাল আর খেলতে ভাল লাগে না! একা একা থাকতে ভাল লাগে!

বিট্টুকে চুপ করে থাকতে দেখে ব্রাদার ডি'সুজা বোধহয় ওর মনের ভেতরের প্রশ্নটা পড়ে ফেললেন। বিট্টুর পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, ব্রাদার ফেডরিকের সঙ্গে শিলিগুড়িতে দেখা হয়েছিল। শুনলাম, মায়ের জন্য মন খারাপ করে সারাদিন একলা একলা কাটাও। তাই তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। দেখো বাবা, জিসাস পরম করুণাময়। জিসাস শ্যারনকে তাঁর স্নেহের ছায়ায় টেনে নিয়েছেন। এটা নিয়ে মন খারাপ করলে জিসাসকে অবমাননা করা হয়। জিসাসের ওপর বিশ্বাস রাখো। সবসময় তাঁকে স্মরণ করো। পবিত্র থাকো। ঠিক সেরকমই থাকো, যেরকম শ্যারন তোমাকে দেখতে চায় সব সময়। হাসিখুশি, প্রাণবন্ত।

অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে ব্রাদার ডি'সুজাকে, কিন্তু ভেতরে প্রশ্নগুলো কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছে না। ইচ্ছে করছে ব্রাদার ডি'সুজার বুকে মুখ গুঁজতে। অনেক কষ্টে নিজেকে পাথরের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছে বিট্টু।

তোমার জন্য একটা জিনিস আছে। ব্রাদার ডি'সুজা পকেট থেকে একটা ছোট হলদে খাম বের করে বিট্টুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন।

বিট্টু খামটা খুলে দেখল ভেতরে একটা সাদা-কালো ছবি। এই ছবিটা বিট্টু ক'দিন আগেই ব্রাদার ডি'সুজার বাড়িতে দেখেছে। দিদিমার সঙ্গে মায়ের ছবি। পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা। মা তখন অনেক ছোট ছিল। বিট্টুর বয়সি। একমনে ছবিটা দেখতে দেখতে বিট্টুর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ব্রাদার ডি'সুজা তো দিদিমাকে চিনতেন। তা হলে নিশ্চয়ই জানবেন উত্তরটা। বুকে দম বেঁধে জিজ্ঞেস করে ফেলল মাঝে মাঝে মনে খোঁচা তোলা প্রশ্নটা।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব ব্রাদার? আমার দিদিমা কি খুব খারাপ কাজ করত?

আকস্মিক অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটায় চমকে উঠলেন ব্রাদার ডি'সুজা। শ্যারনের মায়ের ইতিহাস তাঁর জানা। কিন্তু এই একরত্তি ছেলেটা এই প্রশ্ন করছে কেন? ওর তো এখনও বয়সই হয়নি এসব জানার বোঝার। ভ্রূ দুটো একটু কুঁচকে বিট্টুকে পালটা জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমাকে বলেছে এসব কথা?

বাবা। বাবা তাই বাড়িতে দিদিমার সব ছবি নষ্ট করে দিয়েছে। বাবা বলেছে দিদিমার খারাপ কাজের জন্যই মাম্মিকে মারা যেতে হয়েছে!

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ব্রাদার ডি'সুজা। মনে পড়ে গেল শ্যারনের শেষ চিঠিটার কথা। সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও একটু মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় শ্যারন বোঝাতে

চেয়েছিল তার দাম্পত্য জীবনের অশান্তির কথা। স্বামীর সন্দেহবাতিক মনের কথা। কী সাংঘাতিক একটা আকুতি ছিল শান্তির জন্য। লিখেছিল, বিট্টুকে তার প্রিয় ক্যারলগুলো একটা নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে শোনাতে। সেই সময়টা সে হরির ঝিলে একমনে ঈশ্বরকে ডাকবে। বিট্টুর সঙ্গে পবিত্র আত্মিক যোগাযোগে সেই শান্তির বাণী পৌঁছে যাবে ওর কাছে। এই শুদ্ধিকরণটা না হলে কোনওদিন হরির ঝিলে পাখিরা ফিরে আসবে না। এই শেষ কথাগুলো গোলমেলে লেগেছিল ব্রাদার ডি'সুজার। শ্যারনের সঙ্গে তো হ্যাম রেডিয়োতে নিয়মিত যোগাযোগ থাকত। শ্যারন তো কোনওদিন মর্স কোডের ডি ড্যাটে বলেনি এসব কথা। ভেবেছিলেন গভীর হতাশার প্রলাপ। তবু এককালের প্রিয় ছাত্রীর আর্তিটুকু ফেলতে পারেননি। বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন রবার্টের চিঠিতে শ্যারনের আত্মহত্যার কথা এবং আত্মহত্যার সময়টা জেনে। স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কীভাবে শ্যারন গুছিয়েছিল নিজের আত্মহত্যার সময়টা।

ব্রাদার ডি'সুজা গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, বড়রা কী কাজ করে গেছেন, সেটা ভাল না খারাপ, তা বিচার করা ছোটদের কাজ নয়। তিনি আজ আর নেই। তোমার জন্মের আগেই তিনি জিসাসের শরণাগত হয়েছেন। সব মানুষই পৃথিবীতে কম বেশি খারাপ কাজ, পাপ করে ফেলে। জিসাস তাকে চিরশান্তির আশ্রয় দেওয়ার আগে সব পাপ ক্ষমা করে দেন। জিসাসের করুণায় বিশ্বাস রাখো, গুরুজনদের শ্রদ্ধার আসনে রাখো। চলো, ব্রাদার ফেডরিকের সঙ্গে দেখা করে চ্যাপেলে যাই।

সেই রবিবারের সকালটা কোনওদিন ভুলতে পারেনি বিট্টু। চ্যাপেলের এক কোনায় গ্র্যান্ড পিয়ানোটার সামনে বসে আছেন ব্রাদার ডি'সুজা। দু'হাতের আঙুলগুলো পরম মমতায় পিয়ানোর ওপর বুলিয়ে যাচ্ছেন। স্বর্গীয় একটা সংগীতের মূর্ছনা।

সুরটা শুনেই বিট্টুর চোখ ছলছল করে উঠেছে। সামনের দেওয়ালে একটা বিশাল ক্রুশ। একমনে চেয়ে আছে ক্রুশটার দিকে। ব্রাদার ডি'সুজা আরম্ভ করলেন প্রার্থনাসংগীত—দিস ইজ দ্য ডে, দিস ইজ দ্য ডে,/ দ্যাট দ্য লর্ড হ্যাজ মেড...

সেদিন ব্রাদার ডি'সুজা চলে যাওয়ার আগে আবার বুঝিয়েছিলেন বিট্টুকে, মন দিয়ে পড়াশুনো করতে, প্রাণভরে বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে আর খেলাধুলো করতে, ঈশ্বরের করুণার ওপর বিশ্বাস রাখতে।

বিট্টু শুধু ব্রাদার ডি'সুজাকে বলেছিল, আমি পিয়ানো শিখতে চাই, মাম্মির প্রিয় সব গানগুলো শিখব, পিয়ানো বাজিয়ে ওই গানগুলো গাইব।

বিট্টুর মধ্যে এই হঠাৎ করে জন্মানো আগ্রহটা দেখে ভেতরে একটা খুশির রেশ বয়ে গিয়েছিল ব্রাদার ডি'সুজার মধ্যে। প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার অ্যান্ডারসনকে বলে গিয়েছিলেন বিট্টুর ইচ্ছের কথা। স্কুলে এমনিতেই পিয়ানো শেখার ব্যবস্থা ছিল। প্রিন্সিপ্যাল ব্রাদার অ্যান্ডারসন তার ওপর বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন, যাতে বিট্টু ভালভাবে পিয়ানো শিখতে পারে।

বিট্টু মন দিয়ে শিখতে থাকল পিয়ানো। চিনতে থাকল একটা একটা কর্ড। কোনটা

এ মেজর, কোনটা বি ফ্ল্যাট মেজর, কোনটা সি শার্প মাইনর। শিখতে থাকল কীভাবে দু'হাতের আঙুলে একসঙ্গে কর্ড ধরতে হয়, কীভাবে গলা মেলাতে হয়।

ব্রাদার ডি'সুজা মাঝে মাঝে রবিবার বিট্টুদের স্কুলে চলে আসতেন। শেষ বয়সে এক অদ্ভুত মায়ার টানে জড়িয়ে গেলেন বিট্টুর সঙ্গে। বিট্টুকে শেখাতেন পিয়ানোর আরও অনেক খুঁটিনাটি, পিয়ানোর সঙ্গে গলা মেলানোর চর্চা। শুধরে দিতেন ভুল-ত্রুটি। তারপর একদিন নিজের চোখই ছলছল করে উঠল যখন দেখলেন ছেলেটা আস্তে আস্তে ঠিক ঠিক কর্ড ধরে গাইতে পারছে, শ্যারনের একটা প্রিয় ক্যারল—হোয়াট চাইল্ড ইজ দিস, হু, লেড টু রেস্ট/ অন মেরি'জ ল্যাপ ইজ স্লিপিং।

৭৪

শিপ্রা মারা যাওয়ার পর বিট্টুর প্রথম ছুটি, বড়দিনের ছুটি। আগেও ঋতুর আবর্তনে ঘুরে ঘুরে আসত গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটি। আগে ছুটি শুরু হওয়ার দিনটার অপেক্ষায় একটা একটা করে দিন গুনত বিট্টু। ছুটি পড়লে ইদানীংকালে সরোজ বক্সীই এসে তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন। সরোজ বক্সীকে দেখেই যেন শুরু হয়ে যেত ছুটি। এবার সরোজ বক্সীকে দেখে কোনও উৎসাহই পেল না বিট্টু। বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি যাওয়া যেন পিরিয়ডের পরে একটা ক্লাস থেকে আর একটা ক্লাসে যাওয়ার মতোই সাধারণ একটা ব্যাপার।

সরোজ বক্সীকে দেখে বিট্টু জিজ্ঞেস করল, ভাল আছেন সরোজকাকা?

সরোজ বক্সীর মুখটা আগে থেকেই শুকনো ছিল। বিট্টুর প্রশ্নটায় চশমার কাচের পিছনে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, তোমার কাকিমা... আর নেই।

চরম শোকের প্রকৃতি এখন বুঝতে পারে বিট্টু। মনে পড়তে থাকল অতসীর মমতায় মোড়া মায়াভরা চোখ দুটো। মনে পড়তে লাগল সেই ছোট্ট মেয়েটার কথা, বীথি। কষ্টটা বুঝতে পারে কিন্তু শোক প্রকাশের ভাষা জানে না। মাথাটা ঝুলিয়ে নিচু করল বিট্টু।

ট্রেনের জানলা দিয়ে উদাস হয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে বিট্টুর মনে হল, এ কোথায় চলেছে? মাম্মি নেই। শোকের আবর্তটা যেন আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছে ক্ষণিকের দেখা অতসী কাকিমার মৃত্যু। সরোজ বক্সী এমনিই কথা কম বলতেন। এবার যেন আরও চুপচাপ হয়ে গেছেন। রাত্রিবেলায় খাওয়াদাওয়ার পর কামরার আলোগুলো একে একে নিভে টিমটিমে নীল আলোগুলো জ্বলে উঠল। বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে বিট্টুর কিছুতেই ঘুম এল না। অনেকদিন পরে ট্রেনের ঝিকঝিকানি আওয়াজের মধ্যে যেন শুনতে পেল অনেক দুর থেকে ভেসে আসা মাম্মির একটা গুনগুনানি গলা, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

শিয়ালদা স্টেশনে বিট্টু প্রথম দেখাতেই চিনতে পেরেছিল। দার্জিলিং মেল সকালে

শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যখন ঢুকছে, অভ্যাসমতো বিটু এগিয়ে গিয়েছিল দরজার কাছে। পিছনে সরোজ বক্সী তখন ওর মালপত্তর সামলাচ্ছেন। বিটু দূর থেকে দেখতে পেল দৃশ্যটা। বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বুকের ভেতরটা আবার হুহু করে উঠল, বাবার পাশে মাম্মি নেই। কিন্তু সেই ধাক্কাটার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট বিস্ময়ও ধাক্কা মারল। বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই বড় টিপ পরা মহিলা, পৃথা। অন্যান্যবার বাবার সঙ্গে দু'-একজন কাজের লোক আসে স্টেশনে। এবার পৃথা ছাড়া কেউ নেই।

ট্রেনটা তখনও পুরোপুরি থামেনি। দয়াল সান্যাল দরজায় বিটুকে দেখতে পেয়েছেন। উঁচু করে হাত নাড়ছেন। মুখে খুশির ঝিলিক উপচে পড়ছে। বিটুর তখন চোয়াল শক্ত। মনে একটা ঝড় বইছে। রানিং ট্রেনে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে কুলিরা। তাদের ধাক্কার তোয়াক্কা না করে বিটু একমনে ভেবে চলেছে, কেন এসেছে পৃথা? বাবা তো কোনও চিঠিতে এর কথা লেখেনি। পৃথাকে কী বাবা বিয়ে করেছে?

এই ভাবনাটা কোনও একসময়ে বিটুর মাথায় ঢুকিয়েছিল প্রসুন, বিটুর স্কুলের বন্ধু। প্রসূনও বিটুর মতো দুর্ভাগা। অল্প বয়সে মাকে হারিয়েছিল। প্রসূনের বাবা তারপর ওকে বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে আবার বিয়ে করেছিলেন। নতুন মায়ের সঙ্গে কোনওদিনই ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি প্রসূনের। সেই সঙ্গে একটু একটু করে বুকের ভেতর পুঞ্জীভূত হয়েছিল পাহাড়প্রমাণ ক্ষোভ। বাবার পাশে পৃথাকে দেখতে দেখতে বিটুর মনে হচ্ছিল, তাকে জানাতে কী লজ্জা হয়েছিল বাবার? এই মহিলাই কি এখন বিটুর নতুন মা? সরোজকাকাও পর্যন্ত চেপে গেছেন এত বড় একটা খবর!

ট্রেনটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। দয়াল সান্যাল শশব্যস্ত হয়ে প্রায় দৌড়ে এলেন ট্রেনের দরজার কাছে। বিটু প্রাণপণে ওই পৃথার উপস্থিতি অগ্রহ্য করার চেষ্টা করছে। একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখছে না। তবু যেন ভেতরের চোখ দুটো মনে হচ্ছে দেখে যাচ্ছে, পৃথা একটা তির্যক হাসি নিয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

বিটুর এখন বয়স মাত্র বারো। মায়ের মৃত্যু তাকে অনেক আগেই সাবালকত্ব এনে দিয়েছে। তবু মনে তোলপাড় হয়ে যাওয়া প্রশ্নটা কিছুতেই মুখে ফুটছে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না, কেন ওই মহিলা স্টেশনে এসেছে?

ট্রেন থেকে নেমে বাবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল বিটু। কাঁধ দুটো ধরে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন দয়াল সান্যাল। বিটুর কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে চললেন প্ল্যাটফর্মের বাইরে। বিটুকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। এতদিন পর্যন্ত এই ভূমিকাটা ছিল মাম্মির। ট্রেন থেকে নামার অপেক্ষা। অনর্গল প্রশ্ন করে যেত। বাবা থাকত গম্ভীর। কখনও বিটুর ব্যাপারে উদাসীনও। তবে ভীষণ সচেতন থাকত চারিদিক সম্পর্কে। সেই বাবা এখন প্রগল্‌ভ। তবু কিছুতেই ঢুকতে পারছে না বিটুর মনের ভেতর। বুঝতে পারছে না কী ঝড় বয়ে চলেছে ছেলেটার ভেতর।

বিরাট ইম্পালা গাড়িটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল বিটু। এতদিন পর্যন্ত একটা নিয়ম চলে এসেছিল। বিটু বসত সামনে, ড্রাইভারের পাশে আর পিছনে বাবা আর মাম্মি। সরোজ বক্সী হয় স্টেশন থেকেই নিজের বাড়ি চলে যেতেন, না হলে একটা ট্যাক্সিতে

কাজের লোকদের নিয়ে ইম্পালার অনুগামী হতেন। এবার কী ব্যবস্থা হবে? ওই মহিলা কি সরোজ বক্সীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে আসবে না ইম্পালাতে পিছনের সিটে বাবার পাশে বসবে?

নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতাটা বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো খেলে গেল বিট্টুর শরীরে। অস্বাভাবিক তৎপরতায় উঠে গুম হয়ে বসল পিছনের সিটে। দয়াল সান্যাল উঠে এসে বসলেন বিট্টুর পাশে। তারপর সেই মহিলাও অন্য দিকের দরজাটা দিয়ে ঢুকে পাশে এসে বসলেন।

গাড়ির সিটটা যথেষ্ট প্রশস্ত। তবু বিট্টুর মনে হল পৃথা অহেতুক তাকে ঘেঁষে বসে আছে। অবাঞ্ছিতভাবে শরীর ঠেকে আছে শরীরে। একটা অস্বস্তি নিয়ে বিট্টু নিজেকে কুঁকড়ে নিয়ে শরীরটাকে ছাড়িয়ে আরও ঘেঁষে বসল বাবার দিকে। একবার চোখ পড়ল ড্রাইভারের মাথায় ওপর লুকিং গ্লাসটায়। সেই আয়নার দেখল পৃথা এখনও সেই অদ্ভুত তির্যক হাসি নিয়ে ঠায় চেয়ে আছে বিট্টুর দিকে। বিট্টুর অস্বস্তিটা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। বাবাও একটা কথা বলছে না পৃথার সঙ্গে। বন্ধ গাড়িতে একটা দমআটকানো পরিবেশ। বিট্টুর বারবার মনে হতে থাকল, বাবার সঙ্গে এই গাড়িতে না উঠে, সরোজ বক্সীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠলেই ভাল হত।

বাড়ির গাড়িবারান্দায় নেমে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বিট্টু। ততক্ষণে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে। বাবা এই মহিলাকে বিয়ে করে থাকলেও কিছুতেই 'মা' বলবে না ওকে।

বাড়ির ভেতর ঢুকে অন্যরকম লাগল বিট্টুর। বাড়িটা অনেক বেশি নিপুণ করে গোছানো। পরিপাটি করে গোছানো সব কিছু। এক ফোঁটা ধুলো নেই কোথাও। এত সাজানো গোছানো বাড়িটা ছিল না কখনও। এমনকী মাম্মি বেঁচে থাকার সময়ও নয়। আর মাম্মি মারা যাওয়ার পর ক্রমশ ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছিল বাড়িটা। সব ঘরে শুধু দামি দামি জিনিস এলোমেলো স্তূপ হয়ে থাকত।

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বিট্টু। ওর ঘরটার দরজাটা টেনে বন্ধ করা। প্রত্যেকবার বাড়ি এসে সবার আগে নিজের ঘরে আসে বিট্টু। সেই অভ্যাসমতো বন্ধ দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল বিট্টু। ঢুকেই ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল।

গোটা বাড়িটার মতো এই ঘরটাও নিখুঁত করে কেউ সাজিয়ে দিয়েছে। আর তাতেই মাম্মির সঙ্গে এই ঘরটায় থাকার স্মৃতিগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মাম্মি হয়তো কোনওদিন এত গুছিয়ে ঘরটা রাখত না, কিন্তু ভীষণ একটা প্রাণ ছিল ঘরটার মধ্যে। মাম্মি মারা যাওয়ার পর বহুবার এই ঘরটায় ঢুকে মনে হয়েছে, মাম্মি আছে। একটু হয়তো ঘরের বাইরে গেছে, এখনই ঘরে আবার ফিরে আসবে। এখন এই সাজানো ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে মাম্মি আর কোনওদিন ফিরে আসবে না এই ঘরটাতে। ভেতরে জমতে জমতে বাড়তে থাকা শব্দগুলো এবার বাঁধনহারা হল। চিৎকার করে উঠল বিট্টু।

কে করেছে আমার আর মাম্মির ঘরটা এরকম?

সব রাগ মুখে জমিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল বিট্টু। প্রশ্নটায় খানখান হয়েছে দোতলা। তবু উত্তরটা কেউই দিচ্ছে না। এগিয়ে এল আর একটা অদ্ভুত লোক। মাম্মি মারা যাওয়ার পর থেকে পৃথার মতোই এ বাড়িটা যেন অবারিত দ্বার হয়ে গেছে লোকেনের কাছে।

লোকেন বিট্টুর কাঁধে একটা হাত রাখতে গেল।

কেমন আছ, ছোটবাবু?

লোকেনের কুতকুতে চেহারাটা দেখে একটা ঘেন্না হল বিট্টুর। লোকেন কাঁধে হাত রাখতে গিয়েছিল। এক ঝটকায় বিট্টু সরিয়ে দিল হাতটা। এগিয়ে এসেছিল পৃথাও।

বিট্টু চিৎকার করে উঠল, যাও এখান থেকে।

পৃথাও থতমত খেয়ে দু'পা পিছিয়ে থমকে গেল। তারপর বিট্টুর চোখে পড়ল দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দয়াল সান্যাল দৃশ্যটা দেখছেন। বিট্টুর কাছে এগিয়ে এলেন দয়াল সান্যাল। গম্ভীর গলায় বললেন, এসো, আমার ঘরে এসো।

বাবার এই গম্ভীর গলাটাই অনেক বেশি আন্তরিক আর পরিচিত লাগে বিট্টুর। বাবা গম্ভীর হয়ে গেলে 'তুই' থেকে 'তুমিতে' উঠে আসে। এই 'তুমি' করে বলাটাই যেন ঠিকঠাক। 'তুই' 'তুই' করে নরম করে অনর্গল কথা বলে যাওয়া বাবাকে কেমন যেন মানায় না। কীরকম যেন মেকি-মেকি মনে হয়। চুপ করে বাবার পিছনে পিছনে দয়াল সান্যালের ঘরে এসে ঢুকল বিট্টু।

দয়াল সান্যাল নিজের টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে এসে বসে বিট্টুকে বললেন, তোমার মাম্মি কোনওদিন এই বাড়িটা সুন্দর করে রাখায় মন দেয়নি। আসলে এই বাড়িটায় কোনও মনই থাকত না তোমার মাম্মির। আজ কেউ যদি সুন্দর করে বাড়িটা সাজিয়েগুছিয়ে রাখে, তা হলে তুমি রাগ করছ কেন? তোমার ভাল লাগছে না বাড়িটা এত সুন্দর দেখতে?

না, লাগছে না। একটুও ভাল লাগছে না। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে শক্ত করে সংযত রাখল বিট্টু। দয়াল সান্যাল ওর কঠিন মুখটা দেখে বললেন, পৃথা, লোকেন এরাই সত্যি করে ভাবে তোমার কথা। যাও, তোমার ঘরটায় দেখো। কী সুন্দর করে সাজিয়েছে পৃথা। নিজে গিয়ে পছন্দ করে পরদা কিনে এনেছে। তোমার নতুন পড়ার টেবিল করেছে...

বাবার কথা আর কানে ঢুকছিল না বিট্টুর। মনে মনে অবিরাম আবার প্রশ্নটা শুরু হয়ে গেছে। পৃথা কে? এখনই হয়তো বাবা জানিয়ে দেবে, এই পৃথাই তার নতুন মা। নতুন মায়ের যেমন ইচ্ছে এই বাড়িটা সাজাবে। এটা এখন ওরও বাড়ি। বিট্টুর একার অধিকারটা ভাগ হয়ে গেছে। ভেতরে উত্তরগুলো একটা একটা করে এই বাড়িটার মতোই পরিপাটি করে সাজানো, তবু বিট্টু প্রশ্নটা করল, পৃথা কে?

দয়াল সান্যাল বললেন, সেকী, তুমি পৃথাকে চেনো না?

বিট্টু বিলক্ষণ বুঝতে পারছে বাবা কার কথা বলছে, তবু চুপ করে দু'দিকে মাথা

নাড়ল। দয়াল সান্যাল অল্প হাসি ফুটিয়ে বললেন, পৃথা... তোমাকে স্টেশনে আনতে গেল। পৃথাকে তো তুমি দেখেছ আগে। মনে নেই?

ও কী করছে আমাদের বাড়িতে?

শোনো, ওরকমভাবে বলতে নেই। পৃথা এখন এবাড়ির গভর্নেস। বাড়ির সব দেখাশোনার কাজটা ও-ই করে। খুব নিষ্ঠা নিয়ে, যত্ন করে করে। এত বড় বাড়ি, এত জন কাজের লোক, কাউকে তো একটা দেখতে হবে সব কিছু। আমি পৃথাকেই দায়িত্বটা দিয়েছি। তোমার যা দরকার লাগবে বোলো ওকে, দেখবে কেমন করে গুছিয়ে দেয়।

ভেতরে ভেতরে নিশ্চিন্ত হল বিট্টু। পৃথা নামের ওই মহিলাকে বাবা অন্তত নতুন মা বলতে বলল না। এতক্ষণের চাপা টেনশনটা কেটে মনটা হালকা লাগছে। বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এল বিট্টু। ঘরের মধ্যে সরোজ বক্সী বিট্টুর সুটকেস খুলে পড়ার বইগুলো একটা একটা করে সাজিয়ে রাখছেন নতুন পড়ার টেবিলে। কিন্তু পৃথা আসেনি ওর ঘরে।

৭৫

কয়েকদিনের মধ্যে বিট্টু বুঝে গেল বাড়ির সব ব্যাপারে এই পৃথাই এখন সর্বময় কর্ত্রী। পৃথা কতদিন এ বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করছে ঠিক জানা নেই, তবে পাঁচ মাসের বেশি নিশ্চয়ই নয়। কারণ শেষ ছুটিতে বাড়ি এসেছিল পাঁচ মাস আগে। তখন পৃথা ছিল না এ বাড়িতে। তবে যে ক'দিনই গভর্নেস হয়ে এ বাড়িতে এসে থাকুক, বাড়িতে একটা আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সেটা শুধু বাড়ির গৃহসজ্জাতেই নয়, বাড়ির প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও। আর একটা ব্যাপারও খেয়াল করে দেখল বিট্টু। একটা পরিবর্তন। স্পষ্ট মনে আছে এই পৃথা একটা সময়ে বাবাকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করত। এখন 'স্যার' বলে। সেটা কি এ বাড়িতে গভর্নেস হওয়ার জন্য?

দয়াল সান্যালের বরাবর ব্রিটিশ সাহেবদের জীবনযাপন, আদবকায়দা, শিষ্টাচার পছন্দ। পৃথা যেন একটা একটা করে সেগুলো সাজিয়ে ফেলেছে গোটা বাড়ির সংস্কৃতিতে। বদলে গেছে খাবারের বাঙালিয়ানা। লুপ্ত হয়ে গেছে বিট্টুর প্রিয় খাবারের পদগুলো। খাবার টেবিলের ওপর এখন তটস্থ হয়ে থাকে ন্যাপকিন, কাটলারি, স্যুপের চামচ। ঠিক সেরকমই তটস্থ হয়ে রোবোর মতো দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির পুরনো কাজের লোকেরা। আর সব কিছু নিখুঁতভাবে তদারকি করে যায় পৃথা সিনহা।

একদিন রাতে নিজের ঘরে বই পড়তে পড়তে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল বিট্টু। আলোটা জ্বলছিল। আলো জ্বলা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বিট্টু। কে যেন এসে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নীল বেডল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল। ঘুমটা গাঢ় হয়নি তখনও। চটকা ভেঙে বিট্টু দেখল পৃথা। সুইচবোর্ডটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এ যেন সেই

পৃথা নয়। কপালে সেই বড় টিপটা নেই। শাড়ির জায়গায় পাতলা একটা রাতপোশাক। টিমটিমে আলোয় উদ্ধত শরীরের অদ্ভুত এক মানবী মনে হচ্ছে।

বিট্টুর চোখটা খুলে যেতে দেখে এগিয়ে এল পৃথা। বিট্টুর পায়ের কাছে নিখুঁতভাবে ভাঁজ করে রাখা ছিল গায়ে দেওয়ার চাদরটা। পাট খুলে সেটা ছড়িয়ে দিল বিট্টুর শরীরের ওপর। বিট্টুর বুকের কাছে চাদরটা টানতে গিয়ে ঝুঁকে ঘন হয়ে এগিয়ে গেল শরীরের কাছে। ওই অবস্থায় অনেকক্ষণ সময় নিল বিট্টুর দু'কাঁধ পর্যন্ত চাদরটা ঠিক করতে। অদ্ভুত একটা গন্ধে শিরশির করে উঠল বিট্টুর ভেতরটা। এতদিন যে-মহিলার শরীরের স্পর্শে ছিটকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, যে-মহিলাকে মনেপ্রাণে ঘেন্না করে গেছে, এখন হঠাৎ করে আপ্লুত হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে উষ্ণ সান্নিধ্যে আসা সেই শরীরটায়। নিজের শরীরের উষ্ণায়ন অনুভব করতে থাকল বিট্টু।

আবার সেই অস্বস্তি ঝরানো তির্যক হাসিটা। বিট্টুর কানের কাছে ফিসফিস করে পৃথা বলল, আমাকে তোমার একটুও পছন্দ নয়, তাই না?

দম বন্ধ লাগছে বিট্টুর। নিশ্বাস আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। কোনওরকমে বলল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।

তাই? চোখে একটা মাদকতা এনে পৃথা বলল।

বিট্টুর মনে হচ্ছে নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নিজেই শুনতে পাচ্ছে। বিট্টুর মাথার কাছে বিছানার এক কোণে বসে পৃথা সেই ফিসফিসে গলায় বলল, তুমি ঘুমোও, আমি বসছি এখানে।

বিট্টু কোনও কথা বলতে পারল না। ভাললাগা, লজ্জা, অস্বস্তি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মহিলা জাদুকরি। কয়েক মুহূর্তে বশ করে নিয়েছে বিট্টুর অনুভূতিগুলো। পাশবালিশটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে উলটোদিকে ঘুরে শোওয়ার চেষ্টা করল বিট্টু। সর্বশক্তি দিয়ে চোখটা বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করল কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করতে থাকল দ্বিগুণ বয়সি পৃথার উষ্ণ অনুভূতি।

বাইরের থেকে দয়াল সান্যালের গলা ভেসে এল, 'পৃথা...'

উলটোদিকে মুখ করে শুয়ে থাকা বিট্টুর গালে একবার হাতটা বুলিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পৃথা। সেই সঙ্গে নিয়ে চলে গেল বিট্টুর ঘুমের শেষ কণাটুকুও। হাতের ছোঁয়ার রেশটা কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে ছটফট করতে থাকল বিট্টু। কানটা কীরকম গরম লাগছে। লম্বা শ্বাস টেনে শোঁকার চেষ্টা করল পৃথার ছেড়ে যাওয়া সেই অদ্ভুত গন্ধটা। জীবনে কখনও এরকম নারীশরীরের আকর্ষণ অনুভব করেনি। একই সঙ্গে মাথায় আছড়ে পড়ছে নতুন নতুন হাজারো প্রশ্ন। বাবা কেন এত রাতে পৃথাকে ডাকল? পৃথা কি বাবাকেও শরীরে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে?

দরজাটা পৃথা বাইরের থেকে টেনে দিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত পর্যন্ত বিট্টুর ঘুম আসছিল না। অদ্ভুত একটা অস্বস্তি শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল পৃথা। পাশবালিশ আঁকড়ে বিট্টু ছটফট করতে করতে এপাশ ওপাশ করছিল। কত রাত জানে না। হঠাৎ বিট্টু দরজার বাইরে প্যাসেজটায় একটা আওয়াজ পেল। অদ্ভুত একটা আওয়াজ। ঠিক

যেন ঝুমুর পরে হালকা পায়ে কেউ যাচ্ছে। আওয়াজটা পিঠে একটা ঠান্ডা স্রোত নামিয়ে দিল বিট্টুর।

এক অপ্রতিরোধ্য টানে বিছানা ছেড়ে আলগা পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে এল বিট্টু। দরজাটা সাবধানে আলগা করে টেনে বুঝতে পারল, বাইরের থেকে হ্যাচবোল্ট টেনে বন্ধ করা আছে। অথচ আওয়াজটা! ঝুমঝুম আওয়াজটা ঘরের ঠিক বাইরের প্যাসেজটায় চলাফেরা করছে।

দম বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে দরজার সামনে বসল বিট্টু। চোখ রাখল চাবির গর্তটায়। গলায় দমটা আটকেই রইল। গর্ত দিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্যাসেজের টিমটিমে আলোতে দেখতে পেল, হেঁটে বেড়াচ্ছে মা কালী। মুখটা কালো। মাথায় একটা সাদা শোলার মুকুট। গলায় নরমুণ্ডের মালা। পায়ে ঘুঙুর।

একটু আগে বিট্টুর পিঠ দিয়ে যে ঠান্ডা স্রোতটা নামছিল, বিট্টু খেয়াল করল সেটা আর নেই। তার জায়গায় জন্ম নিয়েছে অদম্য এক কৌতূহল। সেই কৌতূহলে গর্তটা থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না বিট্টু। একসময় দেখতে পেল মা কালী ঢুকে গেল বাবার ঘরে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিট্টু ফিরে এল নিজের খাটে।

কখনও মা কালী, কখনও পৃথার শরীরের নিষিদ্ধ গিজগিজে চিন্তার আশ্লেষে কাটতে থাকল বিট্টুর বিনিদ্র রজনী। বিট্টু জীবনে প্রথম বুঝল রাত দুটো আর তিনটের মধ্যে দৈর্ঘ্যটা অনেক বড়। এই আটকে থাকা সময়ের মধ্যে বিট্টুর আস্তে আস্তে ভীষণ মন খারাপ করতে থাকল মাম্মির জন্য। মাম্মি যখন ছিল, তখন তো বাড়িটা এরকম ছিল না। ঘুম না এলে মাম্মি আলতো করে মাথার চুলে বিলি কেটে সেই ঘুমপাড়ানি গানটা গাইত, 'আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়...'

ক্লান্ত চোখে বারবার মাম্মির গলায় সুরটা মনের ভেতর বাজাতে চেষ্টা করতে থাকল বিট্টু।

আকাশের মিশকালো রংটা একসময় ফিকে হতে থাকল। বাইরে একটা পাখি ডেকে উঠল। তারপর আরও একটা পাখি... আরও একটা পাখি... কিচিরমিচির কিচিরমিচির। এই কিচিরমিচির আওয়াজটা অবিকল যেন মাম্মির গাওয়া সুরটা। চোখের পাতাটা ভারী হয়ে আসতে থাকল বিট্টুর।

চোখে কড়া আলো নিয়ে ঘুমটা ভাঙল। সামনের জানলা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে রোদ ঢুকছে। কোনওরকমে চোখটা খুলে দেখল পৃথা একটা একটা করে জানলার পরদা সরিয়ে দিচ্ছে। বিট্টুর পিটপিটে চোখটা দেখে বলল, গুডমর্নিং! ঘুম ভাঙল?

ঘুমচোখেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল পৃথার দিকে। এই কি সেই, যে কালকে রাতের ঘুমটা কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল? কিছুতেই মেলাতে পারছে না বিট্টু। সকালে টানটান ভিজে চুল। কপালে সেই বড় টিপটা।

বোর্ডিং-এ তোমাদের এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে দেয় বুঝি? পৃথা নাকটা একটু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

বিট্টুর মুখ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাতে ঘুম না হওয়ার কথাটা। নিজেকে সামলে নিয়ে বাথরুমে চলে গেল। মুখেচোখে জল দিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নিজেকে জিজ্ঞেস করল, আমি কি বড় হয়ে গেছি?

ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে দয়াল সান্যাল মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিট্টু আসাতে চেয়ার সরানোর আওয়াজে কাগজটা নামিয়ে রেখে বললেন, তোর শরীর ঠিক আছে তো?

হুম!

বিট্টু ছোট্ট করে বলে মুখ গোঁজ করে বসে থাকল। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কাল রাতে দেখা মা কালীর কথাটা। পৃথা দয়াল সান্যালের সামনে থেকে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া দুধ-কর্নফ্লেকসের বোলটা উঠিয়ে নিতে নিতে বলল, গরম লেগেছে তোমার তাই না? কার্শিয়াং-এ তো এখানের চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা। তাই প্রথম প্রথম একটু...

দয়াল সান্যাল পৃথাকে থামিয়ে দিয়ে বিট্টুকে বললেন, ওমা, তাই? আমার ঘরে চলে এলি না কেন? আমার ঘরটা অনেক ঠান্ডা।

পৃথা বিট্টুর দিকে চেয়ে একটা অর্থপূর্ণ হাসল। তারপর দয়াল সান্যালকে বলল, তার চেয়ে স্যার, আপনি ওর ঘরে সরোজবাবুকে বলে আজই একটা এসি লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

দয়াল সান্যাল একটা মুগ্ধ দৃষ্টিতে পৃথার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখেছ এই সিম্পল সলিউশনটা আমার মাথায় একবারও এল না। আমার নিজের এসি সহ্য হয় না বলে স্বার্থপরের মতো ওর কথাটা একবারও ভাবিনি কোনওদিন। থ্যাঙ্ক ইউ পৃথা। সত্যি তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। তুমি বাড়ির এত খুঁটিনাটি জিনিস মাথায় রাখো কী করে বলো তো?

এটাই তো আমার কাজ। আপনি তো এসব খেয়াল রাখার জন্যই আমাকে রেখেছেন স্যার।

না পৃথা, একটা বাড়ির জন্য ভেতর থেকে গভীর ভালবাসা না থাকলে এসব আসে না।

আপনার দুধ-কর্নফ্লেকসটা কিন্তু আবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে স্যার।

দয়াল সান্যাল চামচটা মুখে তুলে বিট্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর হোমওয়ার্ক লোড কেমন? একজন টিউটরের ব্যবস্থা করব?

কেন জানি না, বিট্টুর কোনও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। দু'দিকে মাথা নাড়ল। বিট্টুর চোখের শূন্যতাটা দয়াল সান্যালের চোখ এড়িয়ে গেল। ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটের কোনা মুছতে মুছতে বললেন, গুড! তবে তোর জন্য অন্য একটা ব্যবস্থা করেছি। লম্বা ছুটি আছে। এর মধ্যে গল্ফ খেলাটা শিখতে আরম্ভ করে দে। দিস ইজ দ্য রাইট এজ। নির্মল চ্যাটার্জিকে বলে গল্ফ ক্লাবে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। একজন ট্রেনার আর একজন ক্যাডিবয় থাকবে। রোজ সকালে ঘণ্টা দুয়েক করে ঘুরে আয়।

দয়াল সান্যালের খুশি খুশি মুখটার দিকে তাকিয়ে বিট্টু বলল, তার চেয়ে বাবা, আমাকে একটা পিয়ানো কিনে দাও।

দয়াল সান্যালের মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। ভ্রূটা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, পিয়ানো... হঠাৎ?

আমার খেলতে ভাল লাগে না বাবা। একটুও ভাল লাগে না। বরং পিয়ানোটা অনেক ভাল বাবা।

দয়াল সান্যাল হাতের ন্যাপকিনটা প্লেটের পাশে ছুড়ে ফেললেন। গলাটা গম্ভীর করে বললেন, পিয়ানো... গান-বাজনা, এসব... নট আওয়ার কাপ অফ টি... নাইদার অফ আওয়ার ক্লাস। এসব তোমার ওই দিদিমার ক্লাসের লোকেরা করত। তোমার মা তোমার মাথার মধ্যে যে সর্বনাশের জিনিসগুলো ঢুকিয়ে গেছে, সেগুলো এবার ভুলতে শুরু করো। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। তোমার সোসাইটির অ্যাট পার হতে হবে। আমি অনেক যুদ্ধ করে আজকের জায়গাটা তৈরি করেছি। বড় বিজনেসম্যানদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছি। অল বিগ বিজনেসমেন প্লে গল্‌ফ। আমি শিখতে পারিনি বলে আমার ভেতর একটা ইয়ে হয়। এই আনইজিনেসটা যাতে তোমার কোনওদিন না হয়, আমি তোমাকে একটু একটু করে তৈরি করে দেব। সেখানে পিয়ানো হ্যাজ নো প্লেস অ্যাটঅল। যেটা ঠিক করেছি, সেটাই করো।

বিট্টুর তখনও খাওয়া শেষ হয়নি। দয়াল সান্যাল সশব্দে চেয়ারটা সরিয়ে ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এলেন। পৃথা এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিট্টুকে খুব নিচু গলায় বলল, দাঁড়াও, মন খারাপ কোরো না। আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলছি। আমি পিয়ানোর ব্যবস্থা করছি। তোমার যেটা ভাল লাগে সেটা তো তুমি করবেই। খালি ঠিক করে বাবাকে বোঝাতে হবে।

দয়াল সান্যালের ফাঁকা করে যাওয়া চেয়ারটায় পৃথা বসল। এটাও বিট্টুর কাছে একটা নতুন জিনিস দেখা। দয়াল সান্যাল চিরকাল ডাইনিং টেবিলের যে নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসেন, পরিভাষায় সেটা 'হেড অফ দ্য ফ্যামিলি'র নির্দিষ্ট চেয়ার। এই চেয়ারটায় আর কারও বসার অধিকার নেই। বিট্টু কখনও কাউকে বসতে দেখেওনি। প্রশ্নটা করতে গিয়েও বিট্টুর গলায় আটকে গেল। তবে পৃথা বাবাকে বুঝিয়ে বলে পিয়ানোর ব্যাপারটায় রাজি করাবে, এই ভরসাটায়, বাবার চেয়ারে পৃথার বসাটা নিয়ে অত মাথা ঘামাল না। পৃথা বিট্টুর পাঁউরুটির ওপর মাখন বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করতে থাকল, তুমি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতে পারো বুঝি?

বিট্টু দায়সারাভাবে বলল, শিখছি। ব্রাদার বলেছেন খুব প্র্যাকটিস করতে হবে। ছুটির মধ্যেও প্র্যাকটিস করতে হবে।

পৃথা চোখ গোল গোল করল, ওমা, তাই! তা হলে তো শুনতে হবে একদিন। কে শেখায় তোমাকে স্কুলে পিয়ানো?

কথাগুলো বোধহয় এতদিন গলায় আটকে ছিল। বলব না, বলব না করেও শেষ পর্যন্ত বিট্টু একটু একটু করে সব বলে ফেলল পৃথার কাছে। ব্রাদার ডি'সুজার কথা। মাম্মির প্রিয় ক্যারলগুলো শেখার কথা। এমনকী ব্রাদার ডি'সুজা যে মাঝে মাঝে ওর

জন্যই রবিবার রবিবার স্কুলে আসেন, ওকে পিয়ানো শেখাতে, সেসব গল্পও করে ফেলল বিট্টু। ব্রাদার ডি'সুজার কথা পৃথা আগেও শুনেছে। পিতা-পুত্রের মধ্যে যে ক'টা মিসিং লিঙ্ক আছে, ব্রাদার ডি'সুজা তার একটা। এই মিসিং লিঙ্কগুলো খুব যত্ন করে হিসেব করে পৃথা। এগুলো নিজের কাছে যথাসম্ভব পরিষ্কার করে নিয়ে অন্যদের যতটা ধন্ধে রাখতে পারবে, দুই প্রজন্মের মধ্যে প্রাচীরটা তত মজবুত হবে। সান্যাল বাড়িতে নিজের প্রভাবও তত বাড়িয়ে নিতে পারবে সহজে। তাই পৃথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছিল নিজের জন্য দরকারি তথ্যগুলো। বিট্টু খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বলল, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলো?

কাল রাতে তুমি আমার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলে কেন?

পৃথা বিট্টুর মুখের দিকে চেয়ে একটা অর্থপূর্ণ হেসে বলল, যাতে একটা দুষ্টু ছেলে মাঝরাতে আমার ঘরে চলে না আসে।

বিট্টু নিচু গলায় বলল, আমি জানি...

কী জানো?

আমি দেখেছি।

পৃথা অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, কী দেখেছ?

মা কালীকে...

পৃথা কয়েক মুহূর্ত থমকে তাকিয়ে থাকল বিট্টুর দিকে। তারপর গলা ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করল, লোকেন... লোকেন...

ভেতর থেকে বাইরে এল লোকেন। পৃথাকে জিজ্ঞেস করল, ডাকছিলেন দিদি?

পৃথা দ্রুত লোকেনের দিকে চোখের কয়েকটা ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, কাল রাতে তুমি মা কালী সেজেছিলে?

লোকেন একবার বিট্টুর দিকে, একবার পৃথার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল কী উত্তর দিতে হবে।.

পৃথা ধমকে উঠল, কেন? রাতে মা কালী সেজেছিলে কেন?

লোকেন মাথা চুলকে বলল, ওই যে দিদি, বলেছিলাম না আপনাকে... যাত্রাপালায় আমার একটা পার্ট আছে, শ্মশানকালীর। পালার মহড়া দিচ্ছিলাম।

বিট্টু জিজ্ঞেস করল, রিহার্সাল দিচ্ছিলে তো বাবার ঘরে গিয়েছিলে কেন?

লোকেন দ্রুত একটু চিন্তা করে অস্বীকার করল।

স্যারের ঘরে তো যাইনি...

আমি দেখেছি... বাবাকে জিজ্ঞেস করো।

পৃথা বিট্টুর কাঁধে হাত রাখল।

বাবাকে আর এসব জিজ্ঞেস করে ডিস্টার্ব না করাই ভাল। এমনিতেই উনি খুব আপসেট হয়ে আছেন তোমাকে নিয়ে। লোকেন, তুই আর একদম তোর ওই যাত্রার রিহার্সাল রাতদুপুরে দিবি না তো!

লোকেন কান ধরে জিভ কেটে বলল, আর ভুল হবে না, দিদি। আর ভুল হবে না ছোটবাবু।

৭৬

দয়াল সান্যাল নিজের ঘরে আলমারি খুলে একটা ফাইলে চোখে বোলাচ্ছিলেন। পৃথার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ফাইলটার থেকে চোখটা তুললেন। পৃথা একটা আঙুল কামড়ে চোখ সরু করে দয়াল সান্যালকে দেখে বলল, স্যার, আজকে আবার আপনার টাইয়ের নটটা পারফেক্ট হয়নি।

এই ঘরে কোনও আয়না নেই। দয়াল সান্যাল তাই তখনই টাইয়ের বাঁধুনিটার ত্রুটিটা নিজের চোখে পরখ করতে পারলেন না। পৃথাকেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হল আজকে আবার?

পৃথা কোনও উত্তর না দিয়ে কাছে এগিয়ে এসে টাইয়ের নটটাকে দু'আঙুলে চেপে আর একটু টানটান করে দিল। দয়াল সান্যাল টাইয়ের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

ইটস মাই প্লেজার স্যার। আপনি কি এখনই বেরুচ্ছেন?

দয়াল সান্যাল ঘড়ি দেখে বললেন, উমম... এই ধরো মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে। কেন বলো?

আসলে, আপনার সঙ্গে কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা ছিল। বিট্টুর ব্যাপারে। আমার মনে হয় যেটুকু আমি জেনেছি আপনাকে ইমিডিয়েটলি বলা উচিত।

একটু চিন্তা করে দয়াল সান্যাল বললেন, বিট্টু কোথায় এখন?

লনে।

ঠিক আছে তুমি বসো।

দয়াল সান্যাল চেয়ারে বসে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইলেন পৃথার দিকে।

পৃথা সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে থাকল নিজের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গল্প।

স্যার, সবটুকু আপনাকে বলতে আমার একটু আনইজি লাগছে। কিন্তু স্যার, যে ভরসা আপনি করেছেন, তাতে আপনার কাছে সব খুলে না বলা অধর্ম হবে...

তুমি নিঃসংকোচে বলো। তোমার অনেস্টি নিয়ে আমার কোনও ডাউট নেই।

আমি জানি স্যার, আপনি আমাকে সেই বিশ্বাসটা করেন।

তুমি বলো।

স্যার, আপনি তো আমাকে সবই বলেছেন। আপনার মনে এখনও সেই প্রশ্নটা রয়েই গেছে, ম্যাডাম সুইসাইড করার সময়টা কেন বিট্টুকে ওই ব্রাদার ডি'সুজার কাছে পাঠিয়েছিলেন। উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি স্যার।

দয়াল সান্যালের চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে গেল। এই প্রশ্নটার উত্তর জানার জন্য

সবরকম চেষ্টা করেছেন। সরোজ বক্সীকে দু'বার কার্শিয়াং-এ পাঠিয়েছেন। রবার্টকে অন্যভাবে চাপ দিয়েছিলেন। হরিতলা কটন মিলটা আরও অনেক অনেক বাড়ানোর স্বপ্নের সাধটার চারদিকে নিজের জীবন দিয়ে লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়ে গেছে শিপ্রা। সেই লক্ষ্মণরেখাটা মুছে ফেলতে অনেক অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেই সঙ্গে খুব সাবধানে জেনে রাখতে হবে আর কোথায় কোথায় শিপ্রা রেখে গেছে অদৃশ্য বিষাক্ত ছোবল। মুখে একরাশ বিস্ময় ফোটালেন দয়াল সান্যাল।

তুমি জেনেছ পৃথা?

হ্যাঁ স্যার। ম্যাডাম ব্রাদার ডি'সুজাকে শেষ দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন বিট্টুকে যেন ওই দিন খ্রিস্টান করে দেওয়া হয়। ওঁর মৃত্যু যাতে হয় একজন খ্রিস্টান পুত্রকে পৃথিবীতে রেখে গিয়ে।

দয়াল সান্যাল উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠলেন, কী বলছ তুমি? বিট্টু কি খ্রিস্টান হয়ে গেছে? করে দিয়েছে ওরা?

না, পারেনি। তবে ওর মনটাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিচ্ছে ব্রাদার ডি'সুজা। এখন প্রত্যেক রবিবার ব্রাদার ডি'সুজা আসে বিট্টুর স্কুলে ওকে পিয়ানো আর ক্যারল শেখাতে।

দয়াল সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তালুতে একটা জোরে ঘুসি মেরে গলা উঠিয়ে বললেন, স্কুলের এত সাহস হল কী করে? আমার ছেলেকে আমার পারমিশন না নিয়ে বাইরের একটা লোক পিয়ানো শিখিয়ে যাচ্ছে। হাউ ডেয়ার দে... আমি এখনই প্রিন্সিপ্যালকে ফোন করছি। আমার দরকার নেই আর ওকে ওখানে রাখার। ছাড়িয়ে নিয়ে এসে কলকাতার কোনও স্কুলে ভরতি করে দেব। এখন তো তুমি আছ এখানে সব দেখাশোনার জন্য।

স্যার আবার একটা কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না। বিট্টুকে স্কুল ছাড়িয়ে এখানে আনার ভুলটা করবেন না। তার এক নম্বর কারণ হচ্ছে, আমরা এখনও জানি না, ম্যাডাম কলকাতায় আর কোথায় কোথায় কী করে গেছেন। সব না জেনে কলকাতায় এখনই বিট্টুকে আনা ঠিক হবে না। ব্রাদার ডি'সুজাকেও কিচ্ছু সন্দেহ করতে দেওয়া ঠিক হবে না। বলা তো যায় না কোথায় আবার কী চাল চেলে বসে। রবার্টের কাছে শুনেছেন তো ম্যাডামের মায়ের সময় থেকে ব্রাদার ডি'সুজার সম্পর্ক। আর দু'নম্বর কারণ, বিট্টুর এখন বয়ঃসন্ধির সময় হতে চলল। দুম করে কিছু করলে, ওর মনটা হয়তো চিরদিনের জন্য আপনার বিরুদ্ধে হয়ে যাবে। ওকে ওখানেই পড়তে দিন আর পিয়ানোটাও শিখতে দিন। ও বুঝবে ওর মায়ের চেয়ে ওর বাবা ওকে অনেক বেশি ভালবাসে। আমি ওকে এক জায়গায় পিয়ানো শোনাতে নিয়ে যাব। সেটা শুনে ওকে নিজেকেই বুঝতে দিন ক্যারলের চেয়েও পিয়ানোতে আরও অনেক ভাল ভাল জিনিস বাজানো যায়। তারপর নিজের থেকেই ক্যারল শেখার ইন্টারেস্টটা ওর কমে যাবে।

কিন্তু ওরা যদি ওকে খ্রিস্টান করে দেয়?

তার আগেই আমরা ওর পইতে দিয়ে পাকাপাকি ব্রাহ্মণ করে দেব।

দয়াল সান্যাল একটা অবাক মুখ করে পৃথার দিকে চেয়ে থাকলেন। সেই মুখটা দেখে পৃথা বলল, আমার যা মনে হয়েছে আমি তাই বললাম স্যার, আপনি কিছু মনে করলেন না তো? আমি ভুলও হতে পারি...

না, একদমই তুমি ভুল নও পৃথা। তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার এত লজিক্যাল আর অ্যানালিটিক্যাল মাইন্ড, তোমার মতো কাউকে যদি বিজনেসে আমার পাশে পেতাম, আজ হয়তো অনেক অনেক এগিয়ে যেতে পারতাম। আমার এগেনস্টে এত কনস্‌পিরেসি হতে পারত না।

আপনার স্যার দেরি হয়ে যাচ্ছে...

তোমার সঙ্গে আর একটা কথা ছিল পৃথা।

বলুন স্যার।

দয়াল সান্যাল জানলার কাছে এগিয়ে গেলেন। শূন্য দৃষ্টিতে বাইরেটা দেখতে দেখতে বললেন, কাল আবার সেই স্বপ্নটা দেখলাম পৃথা।

কোন স্বপ্নটা? উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল পৃথা।

সেই, ডুমুরঝরার শ্মশানকালী। চুপ করে আমার দিকে চেয়ে আছে... আর অনেক দূর থেকে কে যেন বলছে...

পৃথা দয়াল সান্যালের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'সসানের কালী ঠাইকুর এয়েছে গো। পাপ ধুইবে চল...'

দয়াল সান্যাল জানলার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী করে জানলে, তোমাকেও কি স্বপ্নে...

পৃথা একটু বেঁকা হেসে হিসহিসে গলায় বলল, তারপর ডুমুরঝরার শ্মশানের সেই পাগলা বুড়ো ডোমটা অন্ধকার থেকে বলল, 'জিখানেই যাস না ক্যানে, শেইস দিন ইখানেই ইসে জইলতে হবে।'

দয়াল সান্যাল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি... তুমি সব কী করে জানলে?

আপনি তো আমাকে সব বলেছেন স্যার। মনে নেই, আগেও এই স্বপ্নটা দেখে আপনার ঘুম ভেঙে আমার ঘরে এসে আমার বুকে মাথা গুঁজে আপনি থরথর করে কেঁপেছেন। আপনাকে বললাম রাতে আপনার কাছে শুই। আপনি তো রাজি হচ্ছেন না।

দয়াল সান্যাল মাথা ঝাঁকালেন।

তুমিই একটু আগে বললে না, বিট্টুর এখন বয়ঃসন্ধির সময় হতে চলল। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্কটা নয় সেটা ধরে নিয়ে ও হয়তো অন্য মানে করবে। তোমাকে আমি হারাতে চাই না পৃথা।

পৃথা হাসল। দয়াল সান্যালের টাইটার ওপর হাত বুলিয়ে বলল, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার...

হ্যাঁ, আমি এগোই। তোমার সঙ্গে পরে ঠান্ডা মাথায় বসে সব আলোচনা করতে হবে। হরিতলায় সমস্যার যেন আর শেষ নেই।

আর একটা কথা স্যার, আজকে অন্তত বিট্টুকে গল্‌ফের জন্য পাঠাবেন না।

ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ। চলি... সন্ধেবেলায় একটা পার্টি আছে। সিংহানিয়াদের। রেডি হয়ে থেকো। তোমাকে বিশেষভাবে যাওয়ার জন্য বলেছে সিংহানিয়া।

দয়াল সান্যাল চিন্তিত হয়ে ঘর থেকে দু'পা বেরোতেই পৃথা আবার পিছন থেকে ডাকল, স্যার, আলমারিটা বন্ধ করে গেলেন না... চাবিটাও গায়েই লাগানো।

একটু থমকে দাঁড়ালেন দয়াল সান্যাল। পিছন ঘুরে পৃথাকে বললেন, ওটা তোমার কাছেই রাখো।

৭৭

সেবার কার্শিয়াং ফেরত যাওয়ার আগে তড়িঘড়ি করে অনাড়ম্বরভাবেই বিট্টুর উপনয়নটা সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছিলেন দয়াল সান্যাল। পৃথা এবং দয়াল সান্যাল ধর্মীয় ব্যাপারটা সারার দায়িত্ব যথারীতি দিয়েছিলেন সরোজ বক্সীকে। কাউকে কিছু না বলে সরোজ বক্সী এই দায়িত্বটা হাতবদল করেছিলেন যামিনী ভট্টাচার্যকে। যামিনী ভট্টাচার্য কোনও পেশাদার পুরোহিত ছিলেন না। তাই সরোজ বক্সীর অনুরোধটায় প্রথমে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু সরোজ বক্সী যখন বিট্টুর কথা বলেছিলেন, যামিনী ভট্টাচার্যর অস্থি বিসর্জনের রাত্রিটা মনে পড়ে গিয়েছিল এবং ভেতর থেকে নিজের আত্মার ডাকটা শুনতে পেয়েছিলেন। সেই ডাককে না বলতে পারেননি। ব্রাহ্মণত্বে উত্তরণের কাজটুকু শেষ করে নব ব্রহ্মচারীকে একটা ছোট্ট গীতা দিয়ে বলেছিলেন, আজ থেকে সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে, জিতেন্দ্রিয় হয়ে নিষ্কাম কর্ম করো বাবা।

সেই থেকে কোনওদিন বিট্টু কাছছাড়া করেনি গীতাটা। যেমন কাছছাড়া করেনি ব্রাদার ডি'সুজার দেওয়া বাইবেল, মাম্মি আর দিদিমার ছবিটা।

এভাবেই আরও কিছু বছরের মধ্যে কার্শিয়াং-এ পড়াশোনাটা শেষ করে বিট্টু একসময় পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে এল। দয়াল সান্যালের ব্যাবসা এবং শরীর কোনওটাই তখন ভাল যাচ্ছিল না। বিট্টু বাবাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করে দেখল, বাবার চোখের তলায় কালি, ঋজু শরীরটা একটু যেন ঝুঁকে পড়েছে। চেহারা রোগার দিকে। আর সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা চোখে পড়ল বাবার সেই দম্ভটাও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বাড়ির কর্তৃত্বটা পৃথার হাতে যেন মহীরুহর মতো হয়ে গেছে। বাড়ির প্রতিটি ইঙ্গিতে যেন কর্তৃত্বের রাশ ধরে রেখেছে পৃথা।

বিট্টু পারতপক্ষে এড়িয়েই চলত পৃথাকে। চিরকালের মতোই মহিলা সকলের সামনে একরকম আর বিট্টুকে একা পেলেই অন্যরকম। অদ্ভুত একটা হাসি, আরও অদ্ভুত একটা মাদকতা মেশানো চাহনি। গোটা শরীরে অস্বস্তি ধরিয়ে দেয়। এই ক'বছরে যতবার ছুটিতে এসেছে, কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পৃথা যেন মুখিয়ে থাকত নারীশরীরের আগুনের আঁচটা দিয়ে কিশোর বিট্টুকে উত্তেজিত করতে। নারীশরীরের

সান্নিধ্যের উত্তেজনার স্বাদটা রোমকূপে সঞ্চারিত করে দিতে। বিট্টু পালাতে পালাতে কখনও ক্লান্ত হয়েছে, কখনও মনে হয়েছে সংযমের বাঁধটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে দগ্ধ হতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হয়ে সংযমকেই জেতাতে পেরেছিল।

যৌন সম্পর্কের জ্ঞানটা স্কুলের বন্ধুদের কাছে আগেই পেয়েছিল। বন্ধুরা যখন হস্টেল ওয়ার্ডেনের চোখ লুকিয়ে ফিল্মি ম্যাগাজিনে স্বল্পবসনাদের ছবি দেখে ভেতরে উত্তাপ সঞ্চারিত করার চেষ্টা করত, বিট্টু একবারের জন্যও মুখ ফুটে কাউকে বলেনি নিজের লব্ধ অভিজ্ঞতার কথা, নিজের চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক নারীর সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলার কথা।

এই নিষিদ্ধ হাতছানিটাই বয়ঃসন্ধিক্ষণ থেকে বিট্টুর মনে নারীদের প্রতি অদ্ভুত একটা মানসিকতা জন্ম দিয়েছিল। নারী মানেই যৌনসর্বস্ব একটা আবেদন। দিদিমা সেটা ব্যবহার করেছিল পেশার জন্য, মাম্মি সেটা ব্যবহার করেছিল নিজের বন্ধু পলাশের সঙ্গে জীবন রঙিন করে তুলতে আর পৃথা সেটা ব্যবহার করে সান্যাল বাড়িতে নিজের জীবনটা টিকিয়ে রাখতে। পৃথাকে, পৃথার শরীরকে ক্রমশই অসহ্য লাগতে শুরু করেছিল বিট্টুর।

কলকাতায় পাকাপাকিভাবে বিট্টু ফিরে আসার পর প্রথম যে রাতে নিজের ঘরে শুতে এল, পৃথা দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, এই ঘরটা তো আমার হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি কোথায় শোব?

বিট্টু চোখ তুলে চাইল, না, এই ঘরটা আমার। ছোটবেলা থেকে আমি থাকতাম। তুমি তো অন্য ঘরে থাকতে।

পৃথা এগিয়ে খাটের এক কোনায় এসে বসল। অদ্ভুত একটা হেসে বলল, না, তা তো হয় না, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। অন্য ঘরে গেলে আমার ঘুম হবে না।

বিট্টু মাথা ঝাঁকাল, আমার ঘর আমাকে ছেড়ে দাও।

পৃথা আর একটু বিট্টুর কাছে এগিয়ে এল, তা বললে হয়! তারচেয়ে চলো আমরা দু'জনাই এখানে ঘুমোই।

না, আমি একা থাকব। তুমি অন্য ঘরে যাও। যেখানে খুশি।

বিট্টুর কাঁধে ঠেলা দিয়ে পৃথা ওকে খাটে ফেলে দিল। হিসহিসিয়ে বলে উঠল, তোমাকে অনেক আদর করে দেব। মনে নেই তোমাকে আমি কীরকম আদর করে দিতাম। তুমি ছুঁয়ে দেখবে আমাকে...

বিট্টুর গলাটা শুকনো লাগল। শরীরের ওপর পৃথার ভরন্ত শরীরটা ঝুলে রয়েছে। কোনওরকমে বলল, তুমি চলে যাও। চলে যাও...

পৃথার মুখটা আরও এগিয়ে এল বিট্টুর মুখের কাছে। অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরোচ্ছে ওর মুখের থেকে। আর সেই আগুনে টিপটা...

আমি বাবাকে ডাকব...

পৃথা হেসে উঠল, ডাকো। বাবাকে ডাকো... ডেকে কী বলবে? তুমি যখনই ছুটিতে আসতে, রাতে আমার কাছে শুতে চাইতে? আমাকে ছুঁয়ে দেখতে চাইতে?

বিট্টু ঢোক গিলল। পৃথা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলতে থাকল, মনে নেই তোমাকে বলেছি, তোমার মা নিজের জীবনটা উপভোগ করেছে। তোমার বাবা নিজের জীবনটা উপভোগ করছে। ওদের নিজেদের সুবিধের জন্য তোমাকে কত দূরে হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এখন যখন ফিরে এসেছ, তুমি তোমার জীবনটাকে উপভোগ করতে শেখো। কতটুকু জানো তুমি জীবনের আসল আনন্দ কী? আমি তোমায় সব শিখিয়ে দেব।

বিট্টু কোনওরকমে চিৎকার করে উঠল, বাবা...

পৃথা বিট্টুকে ছেড়ে দিল। শাড়ির আঁচলটা ঠিক করতে করতে বলল, বোকা ছেলে, ঠিক আছে আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি। ঘুম আসবে না আমার। তুমি ডাকলেই চলে আসব। তোমার ডাকের অপেক্ষায় থাকব।

কলকাতায় ফিরে এসে নির্বান্ধব নিস্তরঙ্গ জীবনে পৃথার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে বিট্টু পাগলের মতো খুঁজছিল একটা আশ্রয়। একটা অবলম্বন। হঠাৎ করে একটা অবলম্বন একদিন পেয়ে গেল শিপ্রার আলমারির মধ্যে।

শিপ্রার আলমারির মধ্যে থেকে শাড়ি, গয়না, প্রসাধন সব বার করে নিলেও পৃথা ওর ভেতরে রেখে দিয়েছিল শিপ্রার হ্যাম রেডিয়োর সেটটা। যন্ত্রটার ব্যবহার কেউ জানত না। জঞ্জাল ভেবে ছুড়ে ফেলে দিতেও পারত। কিন্তু পৃথা সেটা করেনি। হ্যাম ব্যাপারটা সেভাবে না বুঝলেও ক্ষুরধার বুদ্ধিতে বিট্টুকে সে একসময় বুঝিয়েছিল তার মা দিনরাত পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত একটা রেডিয়ো দিয়ে। তার প্রমাণ হিসেবেই যন্ত্রটা রেখে দিয়েছিল। তার সঙ্গেই ছিল শিপ্রার একটা খাতা। বিভিন্ন কিউ.এস.এল। নাম ঠিকানা। সেখান থেকে একটা ঠিকানা জোগাড় করে বিট্টু একদিন চলে এল চাঁদনিচকের এক গলিতে।

একটা ভাঙাচোরা দোকানে এক প্রৌঢ় বিভিন্ন সার্কিট বোর্ডের ওপর মুখ ঝুলিয়ে কাজ করছেন। রাংঝালের গন্ধে ম-ম করছে দোকানটা। বিট্টু হাতের হ্যাম সেটটা বৃদ্ধর সামনে নামিয়ে বলল, এটা ঠিক করে দিতে পারবেন?

হাতের কাজটুকু সেরে প্রৌঢ় সেটটা নাড়াচাড়া করে বললেন, এ অনেক পুরনো সার্কিট। তবে সেটটা তো ঠিকই আছে। কী অসুবিধে হচ্ছে তোমার?

বিট্টু ইতস্তত করে বলল, আমি এটা চালাতে জানি না।

চোখের চশমাটা খুলে নামিয়ে রেখে প্রৌঢ় বললেন, এ তো হ্যাম রেডিয়ো বাবু। এতে তো গান শোনা যায় না।

জানি।

তা হলে...

আমাকে শিখিয়ে দিন।

কী?

এই হ্যাম রেডিয়ো কী করে চালায়।

প্রৌঢ় একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার?

আমার মায়ের।

প্রৌঢ় হাসলেন, তা হলে মায়ের কাছে শিখে নাও।

বিট্টু চোয়াল শক্ত করে বলল, মা নেই। মারা গেছে।

সামনে দাঁড়ানো কিশোরকে দেখে একটু মায়াই হল প্রৌঢ়র। গলাটা নরম করে বললেন, এর অনেক আইনকানুন আছে। আমি মিস্ত্রি। শুধু সার্কিট ধরে ধরে রেডিয়ো বানাই। তবে আমার কাছে নাম-ঠিকানা আছে কয়েকজনের। ওদের কাছে গিয়ে কথা বলে দেখতে পারো।

এভাবেই প্রৌঢ়র কাছে ঠিকানা পেয়ে বিট্টু পৌঁছে গেল কলকাতার এক হ্যাম ক্লাবে। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র নয়। অল্প কয়েকজনের অদম্য উৎসাহে চলে ক্লাবটা। তারা শিপ্রা সান্যালকে একজন হ্যাম অপারেটর হিসাবে চিনত। তাই তাদের ক্লাবের সদস্য হতে উৎসাহিতই করল বিট্টুকে। হ্যাম লাইসেন্স পাওয়ার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিল। এবং কয়েক মাসের মধ্যেই বিট্টুকে একজন সফল হ্যাম অপারেটর হিসাবে তৈরি করে দিল।

শিপ্রা হ্যামে যোগাযোগ স্থাপন করত মর্স কোডে। অর্থাৎ ডিট-ডাহ্... বা প্রচলিতভাবে যেটাকে টরেটক্কা বলা হয়। শিপ্রা সেই প্রাচীন পদ্ধতিটা ব্যবহার করত নিজের কথোপকথন দয়াল সান্যালের কাছ থেকে গোপন করার জন্য। বিট্টু কিন্তু প্রথম থেকেই সহজতর পদ্ধতি 'ভয়েস কমিউনিকেশন'-এ হ্যাম অপারেট করতে আরম্ভ করল। তাই শিপ্রার ডিট ডাহ্... যে রহস্যের বলয় সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য দয়াল সান্যাল একসময় লালবাজারে স্ত্রীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনেছিলেন, বিট্টুর ক্ষেত্রে সেই রহস্য হয়নি। বিট্টুর কথোপকথন স্পষ্ট শোনা যেত। এবং সেটা গভীরভাবে খেয়াল রাখত পৃথা। যদিও বিট্টুর সাহেবি উচ্চারণের ইংরেজি অনেক সময়ই বুঝতে পারত না, আর বিট্টুর কানে হেডফোন থাকাতে অন্য পক্ষের কথাও কিছু শুনতে পারত না।

একদিন সুযোগ বুঝে পৃথা ব্যাপারটা দয়াল সান্যালের কানে তুলল, স্যার, বিট্টুর একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন?

দয়াল সান্যাল আশঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

ম্যাডাম আরও একটা খারাপ নেশা ছেলেটার মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

কীসের নেশা?

ওই সেই দেশ-বিদেশের অচেনা অজানা লোকেদের সঙ্গে রেডিয়োতে কথা বলা।

তাই নাকি? এসব শুরু করেছে বিট্টু?

পৃথা দয়াল সান্যালের সামনে এসে বসল, খুব খারাপ খারাপ লোকের সঙ্গে কথা বলে...

দয়াল সান্যাল চিন্তিত হয়ে বললেন, তাই! কখন কথা বলে?

বেশির ভাগ সময়ই রাতে কিংবা আপনি যখন বাড়ি থাকেন না তখন।

কী কথা বলে? আমি তো শুনতে পাই না।

আপনি তো রাতে ঘুমের ওষুধ খান। আর ও তো রাতে দরজা বন্ধ করে শোয়।

দয়াল সান্যাল অসহায় গলায় বলে উঠলেন, তুমি খেয়াল রাখো পৃথা। ওর মায়ের কোনও প্রভাব ওর মধ্যে পড়তে দিয়ো না। ওকে বলে দিয়ো দরজা খুলে শুতে। শুনতে না চাইলে বলবে আমি বলেছি।

৭৮

দয়াল সান্যাল ব্রেকফাস্ট টেবিলে খেতে খেতে বিট্টুকে বললেন, তোর রেজাল্ট বেরোতে কত দেরি আছে?

তিন মাস।

এই তিন মাস কী করবি? আমার ইচ্ছে আছে তোকে ম্যাঞ্চেস্টারে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পাঠাব। আমি যখন ম্যাঞ্চেস্টাবে গিয়েছিলাম তখন দেখে এসেছিলাম। বিরাট কলেজ। চিঠিপত্তর পাঠিয়েছি। তুলোর ব্যাবসাটা তার আগে যতটা বুঝে ফেলতে পারিস, ততটাই লাভ হবে তোর। কয়েকদিন তো জিরিয়ে নিয়েছিস, এবার আমার সঙ্গে অফিসে চল। সপ্তাহে দু'দিন হরিতলা কটন মিলে চল। ব্যাবসাটা বুঝতে আরম্ভ কর। ডি এস ইন্ডাসট্রিজের ভবিষ্যৎ তো তুই।

পৃথা প্রমাদ গুনল। দয়াল সান্যালকে সে একটা সম্মোহনে বেঁধে রেখেছে। সেই সম্মোহনের প্রধান হাতিয়ার দয়াল সান্যালের অসুখ। দয়াল সান্যালকে যে যৌনতা দিয়ে বাঁধা যাবে না, সেটা অনেক আগেই জেনেছিল পৃথা। জুলি বলেছিল, দয়াল সান্যালকে তুমি বিছানা চেনাতে পারবে না পৃথাদি। লোকটা পাগল, বদ্ধ পাগল। কী চায় নিজেই জানে না। তাই পৃথা অন্য পথ ধরেছিল। লোকেনের পথ। শ্মশানকালীর ভয়। এবং সে পথে ফলও পেয়েছিল। একটা একটা করে ঘুটি নিজের মতো সাজিয়ে ফেলতে পেরেছে। শুধু বিট্টুকে পারেনি ইচ্ছেমতো ঘরটায় বসাতে। বিট্টুকে বেঁধে ফেলতে পারলেই বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত। বিট্টু বয়সে ছোট হলেও বুদ্ধিমান। ব্যবসায় যদি একবার মাথা ঢোকাতে শুরু করে বিট্টু অনেক কিছুই জেনে যাবে, তার চেয়ে কার্শিয়াং-এ বোর্ডিং স্কুলে যেমন ছিল, বিদেশেও তেমনই চলে যাক। কয়েক বছরের জন্য নিশ্চিন্তি। আর সেই ক'বছরে সে নিজেকে এমন গুছিয়ে নেবে যে বিট্টু ফিরে এসেও আর কিছু করতে পারবে না।

পৃথা দয়াল সান্যালকে থামিয়ে বলল, না স্যার, এটা আপনার খুব অন্যায়। কত বছর বাড়ির বাইরে মানুষ হল ছেলেটা, এবার আবার বিলেতে চলে যাবে। কিছুদিন অন্তত বাড়িতে থাক।

বিট্টু হঠাৎ থমকে পৃথার দিকে তাকাল। বিট্টুর বারবার মনে হয়েছে ও বাড়িতে না থাকলেই যেন পৃথা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়। এখন একদম উলটো কথা বলছে। পৃথার দিকে চেয়ে কেটে কেটে বলল, আমাদের কথার মাঝে কথা বোলো না।

দয়াল সান্যাল একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন, আঃ বিট্টু! ওরকম করে কথা বোলো না।

আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই বাবা।

দয়াল সান্যাল ব্রেকফাস্টটা অর্ধসমাপ্ত রেখে ন্যাপকিনে মুখ মুছে বললেন, বেশ বলো।

বিট্টুও চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এখানে নয়, তোমার ঘরে চলো।

দয়াল সান্যাল অবাক হলেন। বিট্টু চাপা স্বভাবের। তার ওপর কখনও এভাবে কথা বলতে চায়নি। কী বলতে চায় জানার জন্য উৎসুক হয়ে বললেন, চলো।

দয়াল সান্যালের ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল বিট্টু। তারপর দয়াল সান্যালের চেয়ারের উলটোদিকের চেয়ারে বসে বলল, তুমি আমাকে সত্যিই ইউ.কে-তে পাঠিয়ে দিতে চাও বাবা?

হ্যাঁ, এটা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন।

কেন বাবা?

ছেলের জন্য বাবার স্বপ্নের কোনও উত্তর হয় না। হয়তো আসলে এটা আমার নিজের জন্যই দেখা স্বপ্ন। তুই এখন বড় হয়েছিস। প্রথম বোধহয় আমার কাছে এভাবে কিছু জানতে চাইছিস। তাই তোকে খুলেই বলি। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে আর ঠোক্কর খেতে খেতে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি। ডুমুরঝরা গ্রামে এক অকর্মণ্য অলস বাবার বড়ছেলে ছিলাম আমি। স্বপ্ন দেখেছিলাম বড় হব। তবে সেটা স্বপ্নই ছিল, পথ জানতাম না। সেই পথটার খোঁজে বাইশ বছর বয়সে জীবনে প্রথম কলকাতা শহরে চলে এলাম পকেটে সাত টাকা নিয়ে। সেটাও একটা স্বপ্ন ছিল। মগন শেঠের গদিতে লাথিঝাঁটা খেতে খেতে একটা স্বপ্ন দেখলাম আমিও একটা কটন মিলের মালিক হব। ম্যাকার্থি সাহেবের সন্ধান পেলাম। তোর দিদিমার মতো একজন প্রস্টিটিউটের মেয়েকে বিয়ে করতে হল স্বপ্নটাকে ছুঁতে। সেই স্বপ্নটাও একদিন ছুঁয়ে ফেললাম। কিন্তু তারপর তোর মা পদে পদে আমার সব স্বপ্নকে নষ্ট করেছে। স্বপ্ন দেখেছিলাম বিদেশি মেশিন এনে কারখানাটা আরও বড় করব, স্বপ্ন দেখেছিলাম এখানকার মাটিতে তুলোর চাষ করে ভারতের এক নম্বর তুলোর ব্যবসায়ী হব—এসবের কিছু আর হল না একটি মাত্র মহিলার জেদের জন্য। তোর মা।

বিট্টু নরম গলায় বলল, মাম্মি তো চলে গেছে বাবা। এসব আর ভেবে লাভ কী?

ভাবতে হয় বাবা, ভাবতে হয়। তোর মা আমার কী ক্ষতি করে দিয়ে গেছে তুই ভাবতেও পারবি না।

মাম্মি কেন তোমার ক্ষতি করতে যাবে?

কারণ তোর মা কোনওদিন হয়তো আমাকে চায়নি। পলাশকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু তোর দিদিমার জন্য বাধ্য হয়েছিল আমাকে বিয়ে করতে।

এটা তোমার ভুল ধারণা বাবা, তোমার যেমন স্বপ্নগুলো ছিল, তেমনই মাম্মিরও একটা স্বপ্ন ছিল। হরির ঝিলের পাখিদের নিয়ে। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছ তোমাদের

দু'জনার স্বপ্নের মাঝে পড়ে আমার কী হয়েছে? একবার ভাবো বাবা। একবার অন্তত ভাবো তোমার আর একটা স্বপ্নের জন্য কেন আমাকে আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে?

দয়াল সান্যাল ছেলের দিকে দু'চোখ মেলে তাকালেন। আজ প্রথম ছেলেটাকে যেন অনেক বড় দেখাচ্ছে। একটু ভেবে বললেন, এটা শুধু আজ আর আমার স্বপ্নই নয়। তোর ভবিষ্যৎ। আমার ব্যাবসার ভবিষ্যৎ। আমার স্বপ্নটা তোর কাছে ভীষণ বাস্তব। তোকে কোনওদিন ব্যাবসার কথা বলিনি। আজ বলছি। আমাদের ব্যাবসার অবস্থা খুব খারাপ। এক্সপোর্ট মার্কেট খারাপ। আমাদের সুতোর কোয়ালিটি অনেক জায়গায় কমপিট করতে পারছে না। ব্যাঙ্কে লোন বেড়ে গেছে। যে হরিতলা কটন মিলে কোনওদিন লেবার প্রবলেম ছিল না, সেখানে কথায় কথায় এখন ধর্মঘটের হুমকি শুনি। ঘেরাও হতে হয়। আর হয়তো কয়েকটা বছর আমি টানতে পারব। তারপর নতুন করে নতুন ভাবে তোকে হাল ধরতে হবে। না হলে পুরো ব্যাবসাটাই শেষ। আর এই নতুন ভাবে নতুন করে কিছু করার জন্য বিদেশ থেকে টেকনোলজি শিখে আসা, বিদেশের বাজারটা শেখা খুব জরুরি। তবে ব্যাবসার অবস্থা খারাপ শুনে তুই কিচ্ছু চিন্তা করিস না। তোর বিদেশে পড়াশুনোর টাকা আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি।

আমাকে একটু ভাবতে দাও বাবা। তোমার কাছে আমি আর একটা জিনিস জানতে চাই। এই পৃথাকে তুমি কত ক্ষমতা দিয়ে রেখেছ?

কতটা দিয়েছি জানি না। কেন দিয়েছি জানি না, তবে ওকে আমি বিশ্বাস করি। তোর মা আত্মহত্যা করার পর পৃথা যদি না এসে হাল ধরত এ বাড়িটা এরকম থাকত না। চারিদিকে শত্রুর মধ্যে ওকে বিশ্বাস করতেই হয়।

সরোজকাকার চেয়েও বেশি?

কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তাই।

কেন?

সরোজ হয়তো অনুগত। খুব অনুগত, কিন্তু পৃথার মতো বুদ্ধি ধরে না। এই ব্যাবসার অবস্থায় পৃথা এমন কিছু কিছু বুদ্ধি দেয় যে আমি চমকে উঠি।

দরকার নেই ওর বুদ্ধির। তুমি ওকে চলে যেতে বলো।

দয়াল সান্যাল হতাশ গলায় বললেন, এখন সেটা সম্ভব নয় বাবা। ও যে একেবারে জড়িয়ে আছে। এত খারাপ সময়ের মধ্যেও সব কিছুর হাল ধরে আছে।

বিট্টু ছটফট করে উঠল। মুখ ফুটে বলতে পারছে না পৃথা বিট্টুর সঙ্গে কী সম্পর্ক করতে চায়। হয়তো বাবার সঙ্গেও সেই সম্পর্ক। খুলে না বলতে পারলেও ইঙ্গিতটা ধরানোর চেষ্টা করল বিট্টু।

বাবা, তুমি জানো না ও ভীষণ বাজে মহিলা।

দয়াল সান্যাল ম্লান হাসলেন।

তোর বয়স অনেক কম। আমি জীবনে আরও অনেক বাজে মহিলা দেখেছি। কোনও

বাজে মহিলা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। এসব তোকে ভাবতে হবে না। তুই বাইরে গিয়ে পড়াশুনো করে এসে আবার সব নতুন করে গড়ে তোল।

বিট্টু একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও বাবা।

৭৯

বাবাকে ছেড়ে বিদেশে পড়তে যাবে কিনা, বিট্টু এই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। বাড়ির পরিবেশে, পৃথার একচ্ছত্র আধিপত্য এবং তার কাছে দয়াল সান্যালের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বিট্টুকে দিনে দিনে আরও অস্থির করে তুলছিল।

তাকে আরও অস্থির করে তুলছিল পৃথার ব্যবহার। সেই কত বছর থেকে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছে বিট্টুকে নিজের শরীরের দাস বানাতে। ক্রমাগত এই চেষ্টা বিট্টুকে আরও বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল। আর সেই সঙ্গে ছিল লোকেন। বিট্টুকে এড়িয়ে চললেও লোকেন পৃথার প্রশ্রয়ে বাড়িতে ক্রমাগত প্রভাবশালী হয়ে উঠছিল। বিট্টু কিছুতেই ভেবে পেত না, দয়াল সান্যাল কীভাবে সহ্য করেন এই দু'জনকে। পৃথার সঙ্গে বাবার কোনও শারীরিক সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না প্রতিটি ক্ষেত্রে বাবা পৃথার ওপর এত নির্ভরশীল কেন। নাকি লোকেনের সেই বহুরূপী শ্মশানকালীর সাজই বাবাকে সম্মোহন করে রাখার মূল সূত্র! এই অস্থির প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে বিট্টু কানে তুলে নিত হ্যাম সেটের হেডগিয়ারটা। হারিয়ে যেতে চেষ্টা করত অদেখা বন্ধুদের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা এবং গভীর আলোচনায়।

ঘটনা একটা নতুন মোড় নিল উনিশশো চুরাশি সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিনটায়। একটু বেলার দিকে হ্যাম রেডিয়োতে একটা খবর শুনে বিট্টু অস্থির হয়ে উঠল। খবরটা কোনও একজনের কাছ থেকে নয়, বিদেশ থেকে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে পেল। বাড়ির টিভিটা নীচে বসার ঘরে। খবরটার আরও বিশদ পেতে বিট্টু ঘর থেকে দৌড়ে নীচে নেমে টিভিটা খুলল। কোনও সম্প্রচার নেই। আবার দৌড়ে ওপরে উঠে এসে রেডিয়োটা খুলল। নব ঘুরিয়ে শর্ট ওয়েভ, মিডিয়াম ওয়েভে সবকটা সম্প্রচার কেন্দ্র ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু যে সাংঘাতিক খবরটা শুনল হ্যামবন্ধুদের কাছ থেকে তার কোনও উচ্চবাচ্য নেই রেডিয়োতে।

বিট্টুর এই দৌড়োদৌড়িটা লক্ষ করেছিল পৃথা। বিট্টুর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? এত ছটফট করছ কেন?

বিট্টু একবার পৃথার দিকে তাকাল। কোনও উত্তর দিল না। দ্রুতপায়ে আবার নিজের ঘরে এসে কানে তুলে নিল হ্যাম রেডিয়োর হেডগিয়ারটা। মাইক্রোফোনটার সামনে এসে উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকল, দিস ইজ আ কল... দিস ইজ আ কল...

পৃথা দরজাটা ঠেলে বিট্টুর ঘরে ঢুকল। বিট্টুর চেয়ারের পিছনে এসে ওর কাঁধ দুটোতে হাত রেখে বলল, আমাকে তোমার একটুও পছন্দ নয়, তাই না?

প্রশ্নটা ক্লিশে এবং অত্যন্ত বিরক্তিকর। পৃথা হাজারবার এই প্রশ্নটা কয়েক বছর ধরে করে যাচ্ছে। বিট্টু কাঁধ ঝাঁকিয়ে পৃথার হাত দুটো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। কানের কাছে হেডগিয়ারে তখন ভেসে আসছে, কিউ.এস.এল প্লিজ...

পৃথা নিজের মুখটা নামিয়ে আনল বিট্টুর কাঁধে। গালে গাল ঠেকিয়ে বলল, কী শুনছ, আজ আমি শুনে দেখবই।

কিউ এস এল প্লিজ...

হেডগিয়ারে সমানে ভেসে আসছে অন্য প্রান্তের গলা, ভি টু এল...

বিট্টু শেষ করতে পারল না। পৃথার দাঁত হঠাৎ করে চেপে বসল বিট্টুর ঠোঁটের নীচে।

কোনওদিন যে-প্রতিক্রিয়াটা দেখায়নি আজ সেটাই দেখিয়ে ফেলল বিট্টু। এতদিন ধরে যে রাগ, ঘৃণা, আক্রোশ জমে ছিল সব যেন লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। পৃথার চুলের মুঠিটা ধরে সজোরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে দিল নিজের মুখের ওপর থেকে। তারপর চুলের মুঠিটা ঝাঁকিয়ে বলল, হাউ ডেয়ার ইউ... আই উইল গিভ ইউ আ টাইট স্ল্যাপ...

পৃথা প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর ফুঁসে উঠল, তোমার এত সাহস...

জাস্ট গেট আউট অফ মাই রুম...

আমি তোমাকে শেষ করে দেব।

বিট্টু কেটে কেটে বলল, আই সে... জাস্ট... গেট... আউট। ইউ বিচ।

বিট্টু আর পৃথার দিকে তাকাল না। একটা বড় শ্বাস নিয়ে কানে আবার হেডগিয়ারটা নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, দিস ইজ ভি টু এল...

পৃথা বিট্টুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কান দুটো গরম হয়ে আছে। মাথার চুলে হ্যাঁচকা টানের ব্যথাটা সারা মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের ঘরে এসে একটা মদের বোতল খুলে ঢকঢক করে খানিকটা মদ খেয়ে গুম হয়ে খাটে বসে থাকল।

সাপ্তাহিক রুটিনে দয়াল সান্যাল সকালেই হরিতলা কটন মিলে গেছেন। পৃথা নিজের ভেতর একটার পর একটা গল্প সাজাতে থাকল দয়াল সান্যালকে ফোন করে কী বলবে বিট্টুর বিরুদ্ধে। ছেলেটাকে তো নিজের রাস্তায় আনা যায়ইনি, উলটে দিনে দিনে যেরকম বেপরোয়া সাহসী হয়ে উঠছে, পৃথাকে শেষ করে দিতে পারে। সেই শেষ করার আগে ওকেই শেষ করে দিতে হবে। অনেক ভেবেচিন্তে একটা কূটবুদ্ধি বার করে দয়াল সান্যালকে ফোন করার জন্য ঘরের দিকে গিয়েই দরজায় থমকে দাঁড়াল পৃথা। বিট্টু রিসিভারটা হাতে নিয়ে চাপা গলায় কথা বলছে, হ্যালো বাবা... হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ... হ্যাঁ... আজ সকালে দিল্লিতে ইন্দিরা গাঁধীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে... ওঁর সিকিওরিটি গার্ডরা... না না... কনফার্মড নিউজ... রেডিয়োতে টিভিতে কিছু বলছে না... বলছি তো তোমাকে হ্যামে বাজে খবর আসে না... খবর আছে খুব গন্ডগোল হতে পারে... তুমি কলকাতায় ফিরে এসো... ছাড়ছি এখন।

ফোনটা ছেড়েই বিট্টু ঘুরে দেখল দরজার মুখে পৃথা একটা বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে বিট্টুর

দিকে তাকিয়ে আছে। বিট্টু কোনও কথা না বলে পৃথাকে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

বিট্টু সারাদিন আর দরজা খুলল না। পৃথাও দুপুরে খাওয়ার জন্য বিট্টুকে ডাকল না। বিট্টু যে-খবরটা দয়াল সান্যালকে জানাল সেই খবরটার সত্যাসত্য জানার জন্য পৃথাও রেডিয়ো খুলেছে। কোনও খবর নেই। তবে রেডিয়োতে যেরকমভাবে করুণ সুরে বেহালা বাজছে, তাতে পৃথার মনে হল কিছু একটা হয়েছে দেশে।

দুপুরে চোখটা একটু লেগে দিয়েছিল পৃথার। ঘুমটা ভাঙতেই প্রথমেই মনে পড়ল সকালের অপমানের কথা। অপমানটা মনে পড়লেই ভেতরে একটা জ্বালা হচ্ছে। আস্তে আস্তে খাট থেকে নেমে আলতো পায়ে বিট্টুর ঘরের সামনে এল। দরজাটা এখনও বন্ধ। একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে দম বন্ধ কবল পৃথা। নিজের ঘরে এসে ড্রয়ার খুলে একটা ছোট্ট ফোনের বই বার করে দয়াল সান্যালের ঘরে এসে ফোনের চাকতিটা ঘোরাতে থাকল।

জুলি পানের দোকানে এসে ফোনটা ধবেই গলাটা চিনতে পাবল।

পৃথাদি তুমি?

তোর এখন রেট কত জুলি? কেটে কেটে বলল পৃথা।

প্রশ্নটা গায়ে মাখল না জুলি। উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকল, খবর শুনেছ পৃথাদি? ইন্দিরা গাঁধীকে ওর বডিগার্ডরা গুলি করে মেরে দিয়েছে। খুব গন্ডগোল শুরু হয়েছে। একটা গাড়ি বাসও চলছে না। সব বন্ধ করে দিয়েছে। সবাই রাস্তায় হাঁটছে।

পৃথা একমুহূর্ত থমকাল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, তোকে একবার আসতে হবে এবাড়িতে...

কোথায়?

আঃ! দয়াল সান্যালের বাড়িতে।

ওরে বাবা নিউ আলিপুরে। যাব কী করে? বললাম না বাস ট্যাক্সি কিচ্ছু চলছে না।

তোর রেট এখন কত জুলি?

রেটের কথা নয় পৃথাদি। তোমাকে কথা দিচ্ছি বাস ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলেই আমি যাচ্ছি।

না জুলি তোকে এখনই আসতে হবে। যত চাস দেব।

পৃথাকে বহুদিন ধরে চেনে জুলি। পৃথা শুধু জেদিই নয়, স্বভাবেও সাংঘাতিক। একটা ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করল, কী কাজ পৃথাদি?

পৃথা হাসল। একটা রহস্যময় গলায় বলল, তুই অনুপম ঘোষের সংসার পুড়িয়েছিলি জুলি মনে আছে? অনুপম ঘোষকে আমার ঘরে এনেছিলি। অনুপম ঘোষ আমার কাছে কথা আদায় করেছিল, দয়াল সান্যালকে শেষ করে দিতে হবে। সেটার এবার সময় হয়েছে জুলি। আমি আমার কথা রাখব।

কলকাতা শহরে এমন দৃশ্য দেখেনি কখনও জুলি। স্কুলের ছেলেমেয়েদের থেকে

শুরু করে অফিসবাবুরা সবাই হাঁটছে। গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। পথ চলতে চলতে খবর আসছে নানা জায়গায় ভয়ানক গন্ডগোল হচ্ছে। পার্ক সার্কাস থেকে নিউ আলিপুর দূরত্ব কিছু কম নয়। বেশ কিছুটা হেঁটে একসময় মনে হল আর পারবে না। পৃথাদির কথা না শুনলেই হত। কিন্তু তখন আর ভেবে লাভ নেই। তখন জুলি মাঝনদীতে। দু'পারের দূরত্বই সমান। অনেক কষ্ট করে একসময় দয়াল সান্যালের বাড়িতে পৌঁছে গেল জুলি।

পৃথা জুলিকে দেখে খুশি হল। পৃথা জানত ওর ডাক জুলি উপেক্ষা করতে পারবে না। তবে আশঙ্কা একটা ছিল। জুলি শেষ পর্যন্ত আসতে পারবে তো? যেমন দয়াল সান্যাল হরিতলা থেকে ফোন করে জানিয়েছেন যে আজকে আর ফিরতে পারবেন না। চারদিকে গন্ডগোল হচ্ছে। বাড়িতে সবাই যেন সাবধানে থাকে।

জুলিকে সাদরে ডেকে পৃথা বলল, আয় জুলি, আমার ঘরে আয়।

সন্ধেবেলায় বসার ঘরে টিভি দেখতে এসে বিট্টু দেখল সোফায় একটা অচেনা মেয়ে বসে আছে। বিট্টুকে দেখে একগাল হেসে বলল, আমায় চিনতে পারছ, আমি জুলি।

বিট্টু একঝলক দেখল জুলিকে। আগে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। জুলি আরও খুলে বলল, তোমার মনে নেই? তোমার মায়ের কাজের দিন আমি এসেছিলাম। আমি পৃথাদির বোন।

বিট্টু তবুও চিনতে পারল না। মনে মনে ভাবল পৃথার বোন যখন এড়িয়ে চলাই ভাল। ওর যত্নআত্তি করার জন্য ওর দিদিই যথেষ্ট। ভদ্রতা করে বিট্টু একটু শুকনো হাসল।

জুলি নিজের মনেই বলতে থাকল, কী কাণ্ড, ভাবা যায়! সর্ষের মধ্যেই ভূত। নিজের বডিগার্ডরাই ইন্দিরা গাঁধীকে মেরে দিল। আর কী ভোগান্তি বলো। এই আমাকেই দেখো বাড়ি ফিরতে পারলাম না। ভাগ্যিস দিদি এখানে থাকে। রাতটা থাকার একটা জায়গা পেয়ে গেলাম।

এই রাত্রিবাসের আসল উদ্দেশ্যটা বিট্টু রাতেই টের পেল। সন্ধের পর থেকে জুলিকে আর দেখেনি। সেই জুলিই রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ বিট্টুর ঘরে এসে ঢুকে বলল, তোমার ঘরটা একটু দেখতে এলাম।

পৃথার বোন যখন তখন পৃথার স্বভাবেরই হবে। তবে এভাবে ঘরে আসাটা বিট্টুর পছন্দ না হলেও রূঢ় হতে পারল না।

বসতে বলবে না আমাকে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু বিরক্ত হয়ে বিট্টু চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, বসুন।

জুলি চোখের দৃষ্টিটা পালটিয়ে বিট্টুর দিকে চেয়ে বলল, আমাকে এরকম আপনি-আজ্ঞে বললে ভাল লাগে না। আমাকে জুলি বলবে, শুধু জুলি।

বিট্টুর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিট্টুকে সাবধান করল। আর তখনই দেখল ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে কেউ টেনে বন্ধ করে দিল। ভালভাবে উপলব্ধি করার আগেই দেখল জুলি শাড়িটা খুলতে আরম্ভ করেছে।

বিট্টুর গলাটা শুকনো লাগল। কোনওরকমে বলল, কী করছেন আপনি?

একটা কামাতুর দৃষ্টিতে বিট্টুর দিকে তাকিয়ে জুলি পটপট করে ব্লাউজের বোতামগুলো

খুলতে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে গেল। কয়েক হাত দূরে বিট্টু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

জুলি আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বিট্টুর গলাটা পেঁচিয়ে ধরল। ঘাড়ের কাছে মুখ ঘষতে ঘষতে ফিসফিস করে বলতে থাকল, তোমাকে আজকে দেখাব আসলি মজা কেমন হয়!

বিট্টুর মধ্যে তখন এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব চলছে। ঝড়, পালটা ঝড়। একবার মনে হচ্ছে যে-প্রতিরোধ সংযম এতদিন পৃথার সঙ্গে দেখিয়ে এসেছে তা আজ ভেঙে চুরচুর হয়ে যাক, আর একবার মনে হচ্ছে এসব করা উচিত নয়।

শেষ পর্যন্ত জুলির স্তনটা কাঁপা হাতে স্পর্শ করে ফেলল বিট্টু। ঘন নিশ্বাসে খুলে ফেলল সমস্ত জামাকাপড়। আত্মসমর্পণ করল জুলির শরীরে।

অনাস্বাদিত সম্পর্কটার শেষটুকু জেনে নেওয়ার পর চিত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ল বিট্টু। নিজের ঘরটাকে অন্যরকম মনে হতে থাকল। ঘরের মিটমিটে আলোয় হঠাৎ টেবিলের ওপর চোখে পড়ল মাম্মি আর দিদিমার ফ্রেমে আটকানো ছবিটা। ব্রাদার ডি'সুজা যেটা দিয়েছিলেন। মাম্মি আর দিদিমা সোজা চেয়ে আছে বিট্টুর দিকে। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল বিট্টু। ভীষণ একটা পাপবোধ হতে থাকল ভেতরে ভেতরে।

বিট্টুর দৃষ্টি অনুসরণ করে জুলি বলল, ওটা কার ছবি?

মাম্মি আর দিদিমার। অস্ফুট স্বরে বলল বিট্টু।

জুলির মনে পড়ে গেল। বিট্টুর দিদিমাও ওর মতো বেশ্যা ছিল। পৃথা আজ অনেক কথা বলেছে। জুলি চোখ মটকে বলল, খারাপ লাগছে? যাও গিয়ে ছবিটা ঘুরিয়ে রেখে এসো। তারপর আরও অনেক...

বিট্টু জুলির দিকে মুখ ঘুরিয়ে করুণ গলায় বলল, দিদিমার খুব কষ্ট হত...

কষ্ট? জুলি ম্লান হাসল, এটাই তো আমাদের কাজ... এটাই আমাদের জীবন। তোমাকে আনন্দ দিতেই আজ সারারাত আমি থাকব। তুমি যা ইচ্ছে করো, যতক্ষণ ইচ্ছে...

তোমার ঘুম পায় না?

ঘুম পেলেই কি আর আমাদের কেউ রাতে ঘুমোতে দেয়? ঘুম পেলে চলবে কী করে?

তুমি শুয়ে পড়ো। ঘুমোও।

এই বাচ্চা ছেলেটার এরকম ব্যবহার জুলি আশা করেনি। সারাদিন প্রচুর হেঁটে জুলির পা ব্যথা করছে। কোমরেও যন্ত্রণা। নেহাত পৃথাদি বলেছে সারারাত ছেলেটার সঙ্গে... ঘুমের কথা শুনে চোখ দুটো যেন ক্লান্ত হয়ে ভারী লাগছে। ক্লান্ত গলায় বলল, সত্যি ঘুমিয়ে পড়ব?

বিট্টু মাথা হেলিয়ে নিজের বালিশটা এগিয়ে বলল, সত্যি ঘুমোও। আরাম করে ঘুমোও।

জুলির গায়ের ওপর একটা চাদর টেনে দিল বিট্টু। পাশে শুয়ে মাথায় আলতো করে হাত বোলাতে বোলাতে আনমনা হয়ে গুনগুন করতে থাকল, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

পরের দিন পৃথার সকালে উঠতে একটু দেরিই হল। সকালটাকে একটু বেশিই উজ্জ্বল মনে হল। বেয়াদপ ছেলেটাকে শিক্ষার পরের পর্বটা বাকি। দয়াল সান্যাল ফিরে এলে কী নাটক করতে হবে শেখানো আছে জুলিকে। জুলি যে কথামতো কাজ করেছে, দরজার বাইরে থেকেই কাল আওয়াজ পেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গিয়েছিল।

বিট্টুর ঘরে বাইরে থেকে হ্যাচবোল্ট টেনে দিয়ে গিয়েছিল। ঘরের সামনে এসে দেখল হ্যাচবোল্টটা খোলা। ভেতরে জুলি বা বিট্টু কেউই নেই। গোটা ওপরতলায় জুলিকে খুঁজে নীচে এসে দেখল দয়াল সান্যাল ফিরে এসেছেন। টেবিলে বসে বিট্টুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। পৃথা সেদিকে মন না দিয়ে বাড়ির বাকি অংশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও জুলিকে না পেয়ে গেটে এসে ছোট গোর্খাকে জিজ্ঞেস করল, কাল রাতে যে মেয়েটা এসেছিল...

ও তো আজ সুবা চলি গ্যয়ি...

পৃথা অঙ্ক মেলাতে না পেরে অন্যমনস্ক হয়ে বাড়ির ভেতরে ফিরে এল। ডাইনিংরুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দয়াল সান্যাল খুব খুশি হয়ে বললেন, শুনেছ পৃথা। বিট্টু ম্যাঞ্চেস্টারে পড়তে যেতে রাজি হয়ে গেছে।

৮০

মানসিক প্রস্তুতি ছিলই। কিছুদিনের মধ্যেই বাকি ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। বিট্টু ম্যাঞ্চেস্টারে চলে গিয়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরতি হয়ে পড়াশুনো শুরু করল। নতুন করে আর একটা জীবন শুরু হল। ভুলতে চেষ্টা করল কলকাতার বাড়ির পরিবেশ। তবে বাবার বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত অভিমান বেড়েই চলল।

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করলেও কয়েক মাসের মধ্যে বিট্টু বিষয়টার ওপর সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল। ওখানকার সহপাঠীদের একটা জীবন ছিল। ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের যেরকম উচ্ছল জীবন হয়। তারা অবাক হত। সুদূর ভারত থেকে পড়তে আসা ছেলেটা একদম অন্তর্মুখী সবসময়, কেমন যেন বিষণ্ণ থাকে। জীবনের কোনও ব্যাপারেই যেন কোনও উৎসাহ নেই। শুধু ফাঁকা সময়ে চ্যাপেলে গিয়ে পিয়ানো বাজায়।

উৎসাহ অবশ্য বিট্টু অন্য একটা বিষয়ের ওপর খুঁজে পেতে শুরু করে দিয়েছিল। পৃথিবীর বাজারে তখন একটা নতুন বস্তুর আমদানি হয়েছে। পার্সোনাল কম্পিউটার। এটা এমন এক যন্ত্র যেন গোটা পৃথিবীকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলতে এসেছে। আর তার বিস্তারের গতিতে কোনও লাগাম নেই।

বিট্টুকে এই সময়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করল একটি ম্যাগাজিনের এক প্রচ্ছদ নিবন্ধ। আমেরিকার এক যুবক। তার নাম বিল গেটস। নিজের গ্যারেজ থেকে কয়েক বছর আগে এই কম্পিউটারে সফটওয়্যার তৈরি করার এক ব্যাবসা শুরু করেছে এক

সহপাঠীকে সঙ্গী করে। কোম্পানিটার নাম মাইক্রোসফট। কোম্পানিটার দিনে দিনে আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওদের তৈরি ডস নামের একটা অপারেটিং সিস্টেম খুব জনপ্রিয় হচ্ছে।

বিট্টুর পড়াশুনোর জন্য লন্ডনের একটা ব্যাঙ্কে নিয়মিত পাউন্ডের জোগান দিতেন দয়াল সান্যাল। মাঝেমধ্যে চিঠিও দিতেন বিট্টুকে। বাবার চিঠি থেকে একটা জিনিস জানার ব্যাপারেই বিট্টু আগ্রহী ছিল। পৃথা এখনও বাড়িতে আছে কিনা। ভেতরে ভেতরে একটা প্রতিজ্ঞা করেছিল বিট্টু। পৃথা যতদিন কলকাতার বাড়িতে থাকবে, ওই বাড়িতে কখনওই যাবে না।

নিজের ভেতর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এক বছরের মধ্যেই বিট্টু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে এসে কম্পিউটার নিয়ে পড়াশোনার জন্য ভরতি হয়ে গেল। বাবার ওপর যতই পুঞ্জীভূত অভিমান থাক, এই সিদ্ধান্তটা প্রথম কয়েক মাস দয়াল সান্যালকে জানাতে ইতস্তত করেছিল বিট্টু। তারপর একদিন একটা এরোগ্রামে জানিয়েই দিল নিজের সিদ্ধান্তর কথা।

ততদিনে পৃথিবীতে যোগাযোগের আরও একটা নতুন সম্ভাবনা ভূমিষ্ঠ হয়েছে, ইন্টারনেট। পৃথিবীজুড়ে যে-কোনও কম্পিউটারের সঙ্গে যে-কোনও কম্পিউটার মুহূর্তে জুড়ে যায়। ইন্টারনেটে বিট্টু নতুন করে হ্যাম দুনিয়ার উত্তেজনা খুঁজে পেতে শুরু করল এবং দিনরাত এক করে বুঁদ হয়ে থাকল কম্পিউটার নিয়ে। দয়াল সান্যাল অবশ্য বারবার বিট্টুকে চিঠি দিতে থাকলেন, বিপথগামী না হওয়ার জন্য, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফেরত যেতে।

এভাবেই বছর গড়ানোর পর হঠাৎ একদিন বন্ধ হয়ে গেল দয়াল সান্যালের পাউন্ড পাঠানো। বিট্টু ততদিনে লন্ডনে এই বয়সে স্বাবলম্বী হওয়ার পথগুলো জেনে গিয়েছিল। বিট্টু ভেবেছিল, এটা বাবার স্বপ্নভঙ্গের বহিঃপ্রকাশ। বিট্টুর সিদ্ধান্তর জন্য রাগ করে, অভিমান করে চিঠি দিয়েও কোনও ফল না হওয়ায় শেষ অস্ত্র হিসাবে বন্ধ করেছেন পাউন্ড পাঠানো। বাবার এই পালটা সিদ্ধান্তকে বিট্টু পরোয়া করল না। বরং নিজের উপার্জনের উপায়ে নিজের পছন্দের বিষয় নিয়ে আরও বুঁদ হয়ে থাকতে আর দ্বিধাগ্রস্ত থাকল না।

হঠাৎই একদিন কলকাতা থেকে একটা চিঠি পেল বিট্টু। চিঠিটা লিখেছেন সরোজ বক্সী। বিদেশে আসার পর এই প্রথম কোনও চিঠি পেল সরোজ বক্সীর কাছ থেকে। বাবাও সেই যে পাউন্ড পাঠানো বন্ধ করেছিল তার সঙ্গে চিঠি পাঠানোও যে কবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে খেয়ালও করেনি। তবে চিঠিটা পড়ে বিট্টু খুব উতলা হয়ে গেল। সরোজ বক্সী লিখেছেন—

'পৃথা চলে গেছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চলে গেছে। তাই এবার তুমি ফিরে এসো। নিতান্ত অপারগ হয়ে এবং কর্তব্য খাতিরেই তোমাকে এই চিঠিটা লিখছি। সব কিছু তছনছ হয়ে গেছে এখানে...

বিট্টু চিঠিটা পড়তে পড়তে ক্রমশ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। কলকাতার থেকে চলে

আসার শেষের দিকে দয়াল সান্যালের কাছে শুনত ব্যাবসার অবস্থা ভাল নয়। নানান সমস্যায় জর্জরিত। তবে নিজে যেহেতু ওই বয়সে কখনওই ব্যাবসার ভেতরে ঢোকেনি, তাই সমস্যার গভীরতা কোনওদিনই অনুভব করতে পারত না। তা ছাড়া ব্যাবসা খারাপ চলার কোনও কিছুর প্রভাবই বাড়িতে দেখেনি, কোনও অভাব বা আর্থিক অনটনের চিহ্ন সান্যালবাড়িতে ছিল না। অথচ সংকট যে কত গভীরে সেটা সরোজ বক্সীর চিঠির ছত্রে ছত্রে জানতে পারল বিট্টু।

'পরপর তিন বছর লোকসানে চলে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজ এখন বিআইএফআর-এ চলে যাওয়ার মুখে। কারখানাটা বাঁচাতে গেলে অনেক লোক ছাঁটাই করতে হবে। তার আঁচ পেয়ে তীব্র লেবার প্রবলেম শুরু হয়েছে। লক আউট অথবা ধর্মঘট, যে-কোনওদিন হবার জন্যই যেন সবাই প্রস্তুত হয়ে আছে। অথবা ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজ বিক্রিও হয়ে যেতে পারে। খরিদ্দারেরা হরিতলায় যাতায়াত করতে শুরু করে দিয়েছে। নানারকম প্রস্তাবও আসছে।'

চিঠিটা পড়তে পড়তে বিট্টুর মন ভার হয়ে উঠল। অর্ধেকটা চিঠি পড়ে একটা হুইস্কি বানিয়ে নিয়ে এসে আবার বাকি চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করল। আর সেখানেই ছিল একেবারে চমকে দেওয়ার মতো সরোজ বক্সীর শেষ কথাগুলো।

'হয়তো এসব কিছুই হত না। এত খারাপ দিন দেখতে হত না স্যারকে। কিন্তু নিয়তি অদ্ভুত। যে-নিয়তি ম্যাডামকে সংসার থেকে তুলে নিয়ে পৃথার মতো মহিলাকে এনে বসিয়ে দিয়েছিল তাতে এই পরিণতি বোধহয় অবধারিত ছিল। পৃথা যখন সব শেষ করে দিয়ে চলে গেছে, তারপরেও স্যার পারতেন ঘুরে দাঁড়াতে, ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজকে তার সোনার দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে সঙ্গে পৃথা তো স্যারকেও শেষ করে দিয়ে গেছে। চলে যাওয়ার আগে স্যারের জন্য রেখে গেছে সেই পুরনো রোগটা। স্যার এখন এক খারাপ অবস্থার মানসিক রোগী।'

বিট্টু আবার চিঠিটা পড়া বন্ধ করে চোখ দুটো বন্ধ করে নাকের ওপরটা চিপে ধরল। চোখের ওপর ভেসে উঠল পুরনো একটা দৃশ্য। রাত্রির অন্ধকারে দরজার চাবির গর্ত দিয়ে দেখা একটা দৃশ্য। ঝুম ঝুম করে মৃদু একটা আওয়াজ। গলায় নরমুণ্ডের মালা পরে মা কালী হেঁটে চলেছে বাবার ঘরের দিকে। পৃথা আর লোকেন কি এভাবেই চেয়েছিল বাবাকে পাগল করতে?

লম্বা লম্বা চুমুকে হুইস্কিটা শেষ করে ফেলল বিট্টু। এবং পড়তে থাকল সরোজ বক্সীর চিঠির শেষ লাইনগুলো।

'স্যার বাহাত্তর সালে একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন। সেই সময় সম্ভবত লন্ডনে কিছু চিকিৎসা করিয়েছিলেন। সেই চিকিৎসায় হয়তো সুফল ছিল। এতদিন ভাল ছিলেন। এখানে ডা. হেমন্ত পাঠক বলে একজন মনোবিদের কাছেও বারকয়েক গিয়েছিলেন তখন। তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। উনি বলেছেন এইরকম অবস্থায় বেশিদিন চললে হয়তো মেন্টাল অ্যাসাইলামে রাখতে হবে ওঁকে। তার চেয়ে তোমার কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করালে ভাল হয়। বিদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থাও উন্নত, তা ছাড়া পারিবারিক

সান্নিধ্যটাও পাবেন। তোমার কাছে থাকলে উনি ভাল থাকবেন। ঈশ্বর ওঁকে সুস্থ করে দিন, এই কামনাই করি।'

চিঠি পড়া শেষ করার আগেই বিট্টু তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে উড়ে এসেছিল কলকাতায়। এবং বাড়িতে পা দিয়েই বুঝেছিল সরোজ বক্সী এক বর্ণও মিথ্যে বলেননি। যে ঝাঁ-চকচকে বাড়িটা ছেড়ে গিয়েছিল তার প্রতিটি কোনায় এখন আর্থিক সংকটের ছোঁয়া এবং বাবার অবস্থা সরোজ বক্সী যা বলেছিলেন তার চেয়েও খারাপ।

দয়াল সান্যালের মানসিক অবস্থা তখন এমন যে, সব ছেড়েছুড়ে লন্ডনে বিট্টুর সঙ্গে চলে যাবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও নেই। বিট্টু কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল। বাবাকে নিয়ে যাবেই। অথচ ব্যাবসার অবস্থা যেমনই হোক, এত বড় ব্যাবসা, সম্পত্তি ছেড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য যাওয়া সহজ ছিল না। বিট্টু সরোজ বক্সীকে বলেছিল, সরোজকাকা, আপনাকে সব পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। বাবা সুস্থ হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি দায়িত্ব নিন।

সরোজ বক্সী আঁতকে উঠেছিলেন, না বিট্টুবাবা, এত বড় দায়িত্ব আমাকে দিয়ো না।

বিট্টু একটু চুপ করে ভেবে বলেছিল, বেশ তা হলে আপনি বিক্রি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

সরোজ বক্সী উদাস গলায় বললেন, এই শেষটা আমার হাতেই করাবে বাবা বিট্টু। মার্থা মেমসাহেবের স্বপ্ন...

সরোজ বক্সীর এই সেন্টিমেন্টটাকে কাজে লাগাতে পেরেছিল বিট্টু। কিছুদিনের জন্য কোম্পানির দায়িত্ব সরোজ বক্সীর হাতে সঁপে দিয়ে দয়াল সান্যালকে নিয়ে লন্ডনে চলে আসার সব ব্যবস্থা করেছিল।

কলকাতা থেকে চলে আসার কয়েকদিন আগে সরোজ বক্সী একটা মোটা খয়েরি খাম বিট্টুকে দিয়ে বললেন, তোমার স্কুল থেকে এই খামটা পাঠিয়েছে, আর তোমার হাতেই দিতে বলেছে।

বিট্টু অবাক হয়ে খামটা খুলে দেখল, খামটা স্কুলের হলেও ভেতরের চিঠিটা ব্রাদার ডি'সুজার। চিঠির সঙ্গে দুটো মোটা বান্ডিলে টাকা আর দুটো ডায়েরি। চিঠিতে ব্রাদার ডি'সুজা লিখেছেন—

'জিসাসের শরণে চলে যাওয়ার আগে একটা কর্তব্য আমার রয়ে গেছে। শ্যারন জিসাসের কাছে চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে আমি একটা পারসেল পেয়েছিলাম। শ্যারনের দুটো ডায়েরি ছিল তাতে। ওগুলো ও আমাকে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি আমাকে একবার প্রশ্ন করেছিলে তোমার দিদিমা খারাপ ছিলেন কিনা। সেদিন তোমাকে আমি আমার উত্তরটা বলেছিলাম। ডায়েরিগুলো পড়ে তুমি নিজের উত্তরটা খুঁজে নিয়ো। এর কিছুদিন পরে রবার্ট একদিন আমার কাছে এসেছিল। ও বলেছিল নেপাল হয়ে ও কোথাও চলে যাচ্ছে। শুধু যাওয়ার আগে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল। অনুরোধ করেছিল তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হলে তোমাকে যেন টাকা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি। এই

টাকাটা তোমার দিদিমা শ্যারনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। টাকার দায়িত্ব নেওয়া আমার কাছে চিরকালই ভীষণ ভারী মনে হয়েছে। তাই রবার্টের অনুরোধমতো এই দায়িত্বটুকুও আমি ব্রাদার অ্যান্ডারসনের কাছে দিলাম, সময়ে তোমাকে টাকাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

বিট্টু টাকাটা পেয়ে এর কারণ কিছু বুঝতে পারেনি। তবে যত্ন করে টাকাটা আর ডায়েরিগুলো নিজের সুটকেসের মধ্যে রেখে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল দয়াল সান্যালের ভিসার প্রস্তুতি করতে। লন্ডনে ফিরে নানা কাজের চাপে ভুলে গেল ডায়েরিগুলো।

লন্ডনে দয়াল সান্যালের চিকিৎসা শুরু হল এবং চিকিৎসকরা দয়াল সান্যালের ভাল হয়ে ওঠার কোনও ভরসা দিলেন না। অধিকাংশ ডাক্তাররাই রোগটাকে শনাক্ত করলেন অ্যালঝাইমার্স বলে।

৮১

বাবার স্বপ্নভঙ্গ করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনো ছেড়ে নিজেরটুকু চালিয়ে নেওয়ার মতো কম্পিউটারের কাজ করত বিট্টু। আর দশটা খুচরো পেশার চেয়ে ছোটখাটো প্রোগ্রাম লিখে উপার্জনটা বেশি। তবে দয়াল সান্যালকে লন্ডনে নিয়ে আসার পর বিট্টু বুঝতে পারল, দু'জনের জন্য উপার্জনটা যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে দয়াল সান্যালের চিকিৎসার খরচ মেটানোর জন্য অনেক পাউন্ডের দরকার। আর এক দিকে ছিল সেই মার্কিন যুবকের সাফল্যের জলজ্যান্ত উদাহরণ। একটা কোম্পানি খোলার জন্য সবরকম চেষ্টা চালাতে থাকল বিট্টু। এবং এই সময়ই খুঁজে পেয়ে গেল এক সমমনস্ক বন্ধু পিটারকে।

পিটার বড়লোক বাড়ির ছেলে। পারিবারিক নানা ব্যাবসা আছে। তবু অল্প বয়সেই পিটারের নিজের কিছু একটা স্বাধীন ব্যাবসা করার তাড়না ছিল। যে ব্যাবসাটা হবে এ যুগের। কম্পিউটারের প্রসারটা এই ভাবনায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। কম্পিউটার বস্তুটাকে বাড়ির কেউ সেভাবে অনুমোদন করেনি। ওঁরা মনে করতেন বস্তুটা খেলনা ধরনের কিছু। লোকের মনে প্রাথমিক ক্রেজটা কেটে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ল্যাবরেটরির চৌহদ্দির বাইরে কম্পিউটারের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তবু পিটার দমেনি। এবং রাজযোটকের মতো পেয়ে গিয়েছিল বিট্টুর মতো সমমনস্ক এক বন্ধুকে।

একদিন লন্ডনের এক ক্যাফেটারিয়াতে জন্ম হল বিট্টু আর পিটারের কোম্পানির। নতুন এক স্বপ্নে বুঁদ হয়ে সেদিন ক্যাপাচিনোতে চুমুক দিয়ে পিটার বলেছিল, সবার আগে কোম্পানির একটা নাম ঠিক করতে হবে। ভেবেছিস কিছু?

বিট্টুর ধ্যানে জ্ঞানে আদর্শে সবসময়ই এক মার্কিন যুবক, যার সফটওয়্যারের কোম্পানি তরতর করে আকাশকে সীমা ধরে বেড়ে চলেছে। বিট্টু ধ্যানমগ্ন হয়ে, চিন্তা করে বলেছিল, ভেবেছি। আমাদের কোম্পানির নাম হবে মিলকি সফট।

পিটার চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে ভুরু দুটো ঈষৎ তুলে জানতে চেয়েছিল, মিলকি সফট? তোর মাথায় হঠাৎ এই নামটা এল কেন?

মিলকি... মানে দুধ। দুধ হচ্ছে সাদা এক পবিত্রতার প্রতীক। ওর সঙ্গে সফটওয়্যারের সফট...

পিটারের পছন্দ হয়নি নামটা। দু'হাত নাড়িয়ে বলেছিল, না, না... নামটা ঠিক জুতের হচ্ছে না। আমাদের কোম্পানি একদিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কোম্পানি হবে। একটা পিয়োর ব্রিটিশ সফটওয়্যার কোম্পানি, তাতে একটা আমেরিকান কোম্পানির নামের সঙ্গে এত মিল থাকবে কেন? আমাদের কোম্পানির নাম হবে একেবারে আমাদের মতো...

বিট্টু চুপ করে চেয়ে ছিল পিটারের দিকে। পিটারের ক্যাপাচিনো শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর একটা অর্ডার করে বলেছিল, আমার মাথায় কয়েকদিন ধরে একটা নাম ঘুরছে...

পিটারের চকচকে চোখটা দেখে বিট্টু বলেছিল, বলে ফেল।

বিটল্‌স...

এবার বিট্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, বিটল্‌স... এটা কী করে আমাদের কোম্পানির কাজের সঙ্গে মিলল?

পিটার চেয়ারে ছড়িয়ে বসে আবেগে উদাস হয়ে বলেছিল, বিটল্‌স... যারা গোটা বিশ্বকে মাতিয়ে দিয়েছিল। সেই নামটা আবার ফিরে আসবে। সেবার বিশ্বকে কাঁপিয়েছিল গানে এবার আবার বিটল্‌স ফিরে আসছে গোটা কর্পোরেট দুনিয়াকে সফটওয়্যারে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য।

কিন্তু ওরা চারজন ছিল, আমরা তো দু'জন।

পিটার বিট্টুর হাতের ওপর হাত রেখে বলেছিল, নামটাই ইম্পর্ট্যান্ট। নামের পিছনে ক'জন আছে সেটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়। বিটল্‌সদের জন্ম কোথায় জানিস? এই ইংল্যান্ডে। লিভারপুলে। তা ছাড়া...

তা ছাড়া কী?

তুই নামটার মধ্যে একটা ভাললাগা খুঁজে পাচ্ছিস না?

কীসের ভাললাগা?

চিন্তা করে দেখ, কিছু একটা মিল!

বিট্টু মাথা চুলকে মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করল, একটা মিল আছে। ফোনেটিক্যালি বিট কথাটা ঢুকে আছে নামটার মধ্যে। বিট-ই তো কম্পিউটারের আসল...।

পিটার বিট্টুর মাথায় একটা চাঁটা মেরে বলেছিল, আর একটা মিল চিন্তা করে দেখ। তোর ডাকনাম, বিট্টু নামটার সঙ্গে একটা মিল!

বিট্টু বিহ্বল হয়ে পিটারের দিকে তাকিয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত কোম্পানিটার নাম দাঁড়াল বিটল্ সফটস।

বিটল্ সফটস একটু একটু করে বাড়তে থাকল। স্বপ্ন বাস্তব করার অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেও দয়াল সান্যালের চিকিৎসার জন্য একের পর এক ডাক্তারের কাছে ঘুরত বিট্টু।

দয়াল সান্যাল যখন পৃথাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে আরম্ভ করেছিলেন তখন এক বুক অভিমান হয়েছিল বিট্টুর, তারপর দয়াল সান্যাল যখন লন্ডনে পাউন্ড পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তখন মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল, ভেবেছিল এটাও পৃথার বুদ্ধি। এখন আপশোস বিট্টুর ভেতরটা কুরে কুরে খায়। খালি মনে হয় বাবা যে রোগ আর চক্রান্তের স্বীকার সেটা অনেক আগে বোঝা উচিত ছিল। অনেক আগে বাবার পাশে থাকলে আজকের দিনটা দেখতে হত না। তাই যে-রোগটা নিরাময়ের সেরকম কোনও চিকিৎসাই নেই, তার জন্য কেউই বিশেষ আশা-ভরসা দিতে না পারলেও বিট্টু আশা ছাড়ত না। দয়াল সান্যালের রোগটা যে ঠিক কী এ নিয়েও ডাক্তারদের দ্বিমত ছিল। এক দল বলতেন অ্যালঝাইমার্স আর এক দল বলতেন পিক ডিজিজ। বিট্টু একজনের পর একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেত দয়াল সান্যালকে। নতুন দিশার আশায় বুক বেঁধে অক্লান্ত হয়ে বলে যেত নিজের জটিল পারিবারিক ইতিহাস।

শেষপর্যন্ত অবশ্য একজন মনোবিদ ডক্টর স্টিভ ব্রাউনের কাছে এসে স্থিতু হয়েছিল। নতুন কোনও আশা-ভরসা না দিলেও, ওষুধ আর কাউন্সেলিং-এর বাইরেও দয়াল সান্যালকে অন্য অনুকম্পায় দেখতেন ডক্টর ব্রাউন। ডক্টর ব্রাউন অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। পেশাদারি ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বার করে নিয়ে বিট্টুর সঙ্গে নানান গল্প করতেন। বিট্টুর মাঝে মাঝে মনে হত ধীরস্থির ডক্টর ব্রাউন যেন ব্রাদার ডি'সুজার আর একটা সংস্করণ। এক-এক দিন অনেক সময় নিয়ে বিট্টুকে অনেক কিছু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতেন।

যেমন একদিন ডক্টর ব্রাউন রুটিন মাফিক অনেকক্ষণ ধরে দয়াল সান্যালকে পরীক্ষা করে, প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে নাকের ওপর রিডিং গ্লাসটা ঝুলিয়ে রেখে বিট্টুকে বললেন, কোনও পরিবর্তন নেই। তবে আশার কথা আর কিছু খারাপের দিকেও যায়নি।

একই উত্তর শুনে বিট্টু হতাশ হল। পুরনো প্রশ্নটাই আবার করল।

তা হলে আর কোনও আশাই নেই ডক্টর?

তোমাকে আগে যে কথাগুলো বলেছিলাম, সেটাই আবার বলব। তুমি ইয়াং। কিন্তু যে জটিলতার মধ্যে তুমি বড় হয়েছ এবং এই অল্প বয়সে বিদেশে এসে একটা কোম্পানি খুলে ফেলেছ তাতে আমি বিশ্বাস করি তোমার বয়সি আর দশটা ছেলের চেয়ে তোমার ম্যাচিয়োরিটি লেভেল হাই। তাই তুমি হয়তো বুঝতে পারবে, তোমার বাবার সমস্যা পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাওয়ার কোনও গ্যারেন্টি নেই। তোমাকে শুধু অনেক ধৈর্য ধরে ওঁর চিকিৎসা করিয়ে যেতে হবে।

ধৈর্য আমি ধরতে পারব ডক্টর। কিন্তু বাবাকে ভাল করে দিতেই হবে। আপনাকে তো সব খুলে বলেছি। আমি হয়তো বাবার ওপর অনেক অভিমান করেছি, কখনও কখনও অন্যায়ও করেছি। বাট হি ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন মাই লাইফ।

হতাশ না হয়ে তোমাকে ধৈর্য রাখতেই হবে।

মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন তো। পৃথিবীটা একটা অদ্ভুত অঙ্কে চলে।

ডক্টর ব্রাউন হাসলেন।

আজকে আবার তোমার ভেতর থেকে কী ফিলজফি বেরিয়ে আসছে ইয়াং ম্যান?

না, মানে ভাবছিলাম। বাবা একদিন দাদুর স্বপ্নভঙ্গ করে গ্রাম থেকে শহরে চলে এসেছিল। আর আমিও ঠিক তাই করেছি লন্ডনে এসে। দাদুর কষ্টটা বাবার কাছে পে-ব্যাক হয়ে গেল। তফাতটা হচ্ছে বাবা এই পে-ব্যাকের কষ্টটা বুঝতে পারছে না। এরকমভাবে আমাকেও হয়তো একদিন পে-ব্যাক করতে হবে।

তা হলে তোমাকে আগে বিয়ে করতে হবে। জোকস আপার্ট। আমাকে বলো তো, তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন? তোমার ভেতরটা আর একবার মন দিয়ে পড়তে হবে দেখছি।

আপনি বলুন না মাথার রোগ কী হেরিডিটারি?

ডক্টর ব্রাউন গম্ভীর হলেন, এটা কি আজকে আমার জন্য নতুন প্রশ্ন প্রীতম?

বিট্টু একটু ম্লান হাসল, বলুন না...

ওয়েল, ফ্র্যাঙ্কলি যদি উত্তরটা দিতে চাই তা হলে বলতে হয়, ডেফিনিটলি, হেরিডিটারি রিস্ক তো থাকেই। কিন্তু তার আগে বলো তোমার মাথায় কবে থেকে প্রশ্নটা আসছে, দিনে কতবার তোমাকে বিরক্ত করে প্রশ্নটা?

আমার হেরিডিটারি রিস্ক ফ্যাক্টরটা দেখুন। আপনাকে যা বলেছিলাম সেটা মনে করে দেখুন। মিস্টার ম্যাকার্থি যদি আমার দাদু হয়ে থাকেন, উনি প্রথম ফ্যাক্টর। বাবা নাম্বার টু। মাম্মি নাম্বার থ্রি। মাথা সুস্থ থাকলে কেউ নিশ্চয় আত্মহত্যা করে না।

ডক্টর ব্রাউন আরও গম্ভীর হলেন, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটার উত্তর দিলে না। কবের থেকে দিনে কতবার তোমার মনে এই প্রশ্নটা খোঁচা দিচ্ছে?

খোঁচাটা উসকে দিয়েছে আমার মাম্মি। আপনাকে আগে বলেছি কি? মাম্মির দুটো ডায়েরি আছে। ডায়েরি মানে ঠিক দিনপঞ্জী নয়, নানা রকম অনুভূতির কথা লিখেছে মাম্মি। সেখানেই এক জায়গায় লিখেছিল ওই আশঙ্কাটার কথা।

ডক্টর ব্রাউন একটু চিন্তা করে বললেন, তোমার মায়ের ডায়েরিটা তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে?

না, খুব মনমরা করে দেয়। বিশ্বাস করুন খাপছাড়া করে পড়া ছাড়া কোনওদিন মন দিয়ে ডায়েরিটা পড়িইনি আমি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আজকে হঠাৎ কেন জানি মনে হল কথাটা।

তোমার স্বর্গগতা মায়ের ডায়েরি। কিছু মনে কোরো না। আমার উপদেশ হল, কিছুদিন ওই ডায়েরিটা আর পড়বে না।

বিট্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

পড়ি আর কই। কী-ই বা হবে পড়ে!

তোমার মায়ের ডায়েরির ভাষাটা যদি ইংরেজি হয় আর তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তা হলে আমাকে একবার পড়তে দিয়ো। যদি নতুন কিছু ক্লু খুঁজে পাওয়া যায়।

আমার কোনও আপত্তি নেই। দিয়ে যাব আপনাকে। বাবার জন্য সবরকম চেষ্টা তো করতেই হবে। নতুন করে যদি কোনও রাস্তা পাওয়া যায়।

আমি তো সবসময় সেই চেষ্টাই করছি প্রীতম। তুমি তো জানো, তোমার বাবার কেসটা ডিফিকাল্ট কেস। মনের মধ্যে অনেক ড্যামেজ অ্যাডভান্স স্টেজে চলে গেছে। সেগুলো কতটা রিভারসিবল বলতে পারব না। মাইল্ড কগনিটিভ ডিক্লাইনের স্টেজটা উনি পেরিয়ে এসে এখন মডারেট স্টেজে আছেন। তবে আমরা সবরকম চেষ্টা করব যাতে এটা সিভিয়র স্টেজে না যায়। তুমি লন্ডনে এনে বাবার চিকিৎসা করাতে গিয়ে সব থেকে বড় যে অসুবিধাটা করেছ সেটা হচ্ছে ওঁকে চেনা পরিবেশ থেকে একদম ডিট্যাচ করে এনেছ।

মানে ডক্টর?

মানে এই দেশটায় চারিদিকে উনি পরিচিত কিছু তো দেখতে পাচ্ছেন না। অচেনা শহর। তার চারিদিকের দৃশ্যগুলো সব অচেনা। অচেনা মানুষের গায়ের রং, অচেনা ভাষা মানে চারদিকের ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টেড ইংলিশ, এমনকী তোমার বাড়ির প্রতিটা আসবাবপত্র ওঁর কাছে অচেনা।

বিট্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনাকে তো বলেছি ডক্টর, আমার কোনও উপায় ছিল না। কলকাতার বাড়িতে আর একজনও নেই যে বাবার যত্ন নিয়ে বাবার দেখাশোনা করতে পারবে আর আমিও যে কলকাতায় গিয়ে সেট্‌ল করব তাতে আমারও কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

ডক্টর ব্রাউন মাথা ঝাঁকালেন।

আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আসলে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি বুঝেছি উনি প্রতি মুহূর্তে ওঁর কলকাতার চেনা পরিবেশটা মিস করছেন। লন্ডনটা একটুও ভাল লাগছে না ওঁর। মনের রোগের চিকিৎসায় রোগীর চেনা পরিবেশে থাকাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট।

বিট্টুর মুখের পেশিগুলো শক্ত হল।

কিন্তু সেই চেনা পরিবেশটা বিষিয়ে গিয়েছিল ডক্টর। আপনাকে তো সব বলেছি।

হ্যাঁ বলেছ, কিন্তু আসল ব্যাপার হল লিভিং অবজেক্টের সঙ্গে সঙ্গে নন লিভিং অবজেক্টগুলোও খুব ইম্পর্ট্যান্ট। যেমন ধরো খাট, আলমারি, বাড়ির গেট, বাগান এসব অসংখ্য চারধারের জিনিসগুলো কখনও বিষিয়ে যায় না। দিনের পর দিন চোখের সামনে এগুলো বারবার দেখতে দেখতে মানুষের সাবকনশাসে এগুলোর ঘেরাটোপে থেকে মনে এক ধরনের সেন্স অফ সিকিয়োরিটি জন্মায়। তোমার এই সেন্স অফ সিকিয়োরিটির কথা কখনও মনে হয়নি যখন কলকাতার বাড়ি ছেড়ে লন্ডনে চলে এলে?

বিট্টু একটু চুপ করে থেকে বলল, না, হয়নি। কলকাতার বাড়িটাকে আমার অসহ্য মনে হয়েছিল। ওখানে একটা জিনিসের জন্যও আমার কোনও বিলংগিংনেস নেই।

ডক্টর ব্রাউন খানিকক্ষণ চুপ করে বিট্টুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে থমথমে মুখটা কোমল করে বললেন, আছে প্রীতম আছে। তোমার অভিমানে সব চাপা পড়ে আছে। তুমি একটা কাজ করো তো। একটা দিন বার করো, যেদিনটায় তোমার মনে কোনও চাপ থাকবে না। সেদিন ঠান্ডা মাথায় তোমার মনে যা আসছে একটা সাদা কাগজে দু'পাতা আমার জন্য লেখো।

বিট্টু ম্লান মুখে সম্মতি জানাতে ডক্টর ব্রাউন কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বললেন, মনের মধ্যে আগাছা বাড়তে দিয়ো না। এনিওয়ে, পরে আমরা এসব নিয়ে একদিন কথা বলব। আপাতত তোমার বাবার ব্যাপারে কথাটা শেষ করি। তুমি তোমার বাবাকে একটা চেনা পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করো। তোমাকে তো বললাম অ্যাডভান্সড ড্যামেজ হলেও ওঁর রোগটা এখনও অ্যাকিউট স্টেজে যায়নি। চেনা পরিবেশ দেওয়ার কথাটা সিরিয়াসলি ভাবো।

কীভাবে?

ওয়েল, কীভাবে দেবে সেটা তোমাকেই মাথা খাটিয়ে বার করতে হবে। কারণ ওঁর চেনা পরিবেশটা তো আমি দেখিনি। আমি তোমাকে কিছু ক্লু দিতে পারি। ধরো বাড়িতে তোমাদের বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলার কেউ থাকল।

অসম্ভব ডক্টর। বাবার দেখাশোনার জন্য অনেক চেষ্টা করে একজন আইরিশ ভদ্রমহিলাকে জোগাড় করেছি, কিন্তু বাংলায় কথা বলতে পারে এরকম কাউকে দরকার হলে কলকাতা থেকে নিয়ে আসতে হবে। সেটা অনেক ঝামেলার, খরচের। একরকম ইমপসিবল। তবে আমি একটা কথা ভেবে রেখেছি। চেষ্টা করে দেখব, ভবিষ্যতে যদি কখনও সরোজকাকাকে নিয়ে আসা যায়...

তোমার সরোজকাকা না হয় পরে হবে, আপাতত ওঁর প্রিয় বইপত্তরগুলো কলকাতা থেকে আনাতে পারো...

সেটাতেও কোনও লাভ নেই। কারণ, প্রথমত, বাবার বইপত্তর পড়ার হ্যাবিটই নেই আর বই পড়ার কোনও কনসেনট্রেশনই এখন নেই।

প্রিয় গানের রেকর্ড বা ক্যাসেট...

বাবা গানবাজনাকে দু'চোখের বিষ মনে করে...

ডক্টর ব্রাউন এবার প্রায় অসহায়ের মতো বলে উঠলেন, সিনেমা...

ডক্টর ব্রাউনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে অবধি বিট্টুর মাথায় ঘুরতে থাকল শব্দটা— 'সিনেমা', 'সিনেমা'। যদিও বিট্টু জানে গানবাজনার মতো চিরকাল সিনেমাটাকেও ব্রাত্য বলে মনে করে এসেছেন দয়াল সান্যাল। আসলে মানুষটার ধ্যান জ্ঞান-স্বপ্ন তো ছিল তুলো আর সুতোকে ঘিরেই। তবু বাবা কি কখনওই কোনও সিনেমা দেখেনি? এ-প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারে একজনই। অনেকদিন পরে সরোজ বক্সীর কথা মনে পড়ল বিট্টুর।

বাড়ি ফিরে বিট্টু ঘড়ি দেখল। সবে দুপুর একটা বেজেছে। মনে মনে হিসেব করে দেখল কলকাতায় এখন সন্ধে প্রায় সাড়ে ছ'টা। সপ্তাহের কাজের দিন। কলকাতার অফিসে ফোন করলে সরোজ বক্সীকে এখনও পাওয়া যেতে পারে।

বহুদিন পরে বিট্টুর ফোন পেয়ে একটু বিহ্বলই হয়ে পড়লেন সরোজ বক্সী। আগে নিয়মিত ফোন করে ধুঁকতে থাকা ব্যাবসাটার হাল-হকিকত জানানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু ক্রমশ বুঝেছিলেন এ-ব্যাপারে ফোন করলে বিট্টু বিরক্তই হয়। কোনও আগ্রহ দেখায় না। শেষবার যখন ফোন করেছিল তখন তো বলেই দিয়েছিল, ব্যাবসার ব্যাপারে

কোনও ফোন করতে হবে না কাকা। ওটা আপনি যেমন চালাচ্ছেন চালান। যদি আমার কিছু জানার দরকার হয় আমিই ফোন করব। এবারে প্রথমে ফোন করার কারণটাও ধরতে পারলেন না সরোজ বক্সী। গলায় যথাসম্ভব আন্তরিকতা ফুটিয়ে বিট্টু জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন কাকা?

ভাল। বড়সাহেব কেমন আছেন?

ওই একইরকম। বীথি কেমন আছে?

ভাল আছে। এবার ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হল এমএ পড়তে।

তাই! খুব ভাল খবর। কোন ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হল? কলকাতা না যাদবপুর?

কলকাতা। ওটাই তো বাড়ির থেকে কাছে।

বিট্টু এবার একটু ইতস্তত করে বলল, কাকা... আপনার কি মনে আছে বাবা কখনও সিনেমা দেখত?

সিনেমা? অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটায় সরোজ বক্সী একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। মগন শেঠের গদিতে যখন দয়াল সান্যাল সরোজ বক্সীর অধীনে সামান্য খাতা লেখার কাজ করতেন তখন দু'-একবার সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন শখ করে। তবে সেসব বহু যুগ আগেকার কথা। সংক্ষেপে জানালেন বিট্টুকে সে কথা। বিট্টু যেন শুনে একটু উৎসাহিতই হল।

কী সিনেমা দেখেছিলেন আপনার মনে আছে কাকা?

সরোজ বক্সী চিন্তা করে মনে করতে গিয়ে হোঁচট খেলেন।

না... অতদিন আগেকার কথা। নাম আর মনে পড়ছে না।

বিট্টু হত্যোদম না হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে হিরো হিরোইন ছিল মনে আছে কাকা?

আবার আপ্রাণ মনে করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে সরোজ বক্সী হতাশ হয়ে বললেন, নাহ্, সেসবও মনে পড়ছে না। আসলে অনেকদিন আগেকার কথা তো! তখন বোধহয় অশোককুমার, গুরু দত্তরা নায়কের পার্ট করত...

বলতে বলতেই হঠাৎ একটা স্মৃতির ঝলক ঝলসে উঠল সরোজ বক্সীর মনে।

একটা মনে পড়েছে। বিয়ের পরে পরেই সাহেব-মেমসাহেব একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। পথের পাঁচালী। সত্যজিৎ রায়ের। আমি টিকিট কেটে এনে দিয়েছিলাম।

ভিসিআর যন্ত্রটা বিট্টুর কোনওদিন কেনা হয়ে ওঠেনি। হয়তো বাবার মতোই সিনেমা দেখার আগ্রহ কোনওদিন তৈরি হয়নি। পিকাডেলি সার্কাসের কাছে একটা দোকান থেকে জাপানি একটা ভিসিআর কিনে ফেলল বিট্টু। ভিসিআর-টা কেনার পর সেলস গার্লের কাছে জানতে চাইল, বাংলা সিনেমার ক্যাসেট কোথায় পাওয়া যাবে?

উত্তরে বেশ কয়েকটা ভিডিয়ো লাইব্রেরির ঠিকানা দিয়ে দিল মেয়েটা।

সেই ঠিকানা ধরে একটা ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে ঢুকে চোখ গোল হয়ে গেল বিট্টুর। বিনোদনের এই নবতম সংযোজিত বস্তুটার বিস্তার যে একটা লাইব্রেরির মধ্যে এত বিশাল হতে পারে, কখনও কল্পনাও করতে পারেনি। চারিদিকে শুধু থরেথরে কালো

ক্যাসেট খাড়া করে রাখা আছে। আর আছে স্পাইরালে বাঁধাই ক্যাটালগ। যেটা দেখলেও বিশ্বাস হয় না, এত সিনেমা তৈরি হয়েছে পৃথিবীতে।

ব্যস্ত দোকানটার ভেতর একজন কর্মচারীকে ধরে বিট্টু জানতে চাইল, ইন্ডিয়ান সিনেমা পাওয়া যাবে কিনা।

কর্মচারীটি বিনীতভাবে বিট্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল একটা কাউন্টারের সামনে। যেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ছিল কাঁচা হলুদ রঙের সালোয়ার-কামিজ পরা এক সুন্দরী। এক লহমায় মেয়েটাকে দেখে চমকে উঠল বিট্টু। ভীষণ চেনা একটা ছিপছিপে শরীরের আদল। ঠিক জুলির মতো।

মেয়েটা গালের হাসিটা আরও চওড়া করে বলল, কী ধরনের সিনেমা খুঁজছেন স্যার? অ্যাকশন, রোমান্স, থ্রিলার...

আসলে আমি বাংলা সিনেমার খোঁজ করছিলাম...

কী ধরনের বাংলা? ইন্ডিয়ান বাংলা অর বাংলাদেশি বাংলা? আমাদের কাছে সব ধরনের সিনেমা আছে। বাংলাদেশি সিনেমার খুব ভাল কালেকশন আছে স্যার। মেয়েটা একটা ক্যাটালগ টেনে গড়গড় করে বলে যেতে থাকল।

বিট্টু এবার ঠোঁট চিপে হাসল।

আপনি ইন্ডিয়ান না বাংলাদেশি?

ভারতীয় স্যার।

বাংলাটা তো বেশ ভালই বলেন, বাঙালি নিশ্চয়ই?

মেয়েটা আবার মিষ্টি করে হাসল।

হাফ বাঙালি স্যার। আমার মা বাঙালি আর বাবা মরাঠি।

খুব ভাল। আপনাদের কালেকশনে ইন্ডিয়ান বেঙ্গলি সিনেমা নেই?

কী বলছেন স্যার? কেন থাকবে না?

মেয়েটা আবার দ্রুত ক্যাটালগ ওলটাতে ওলটাতে নামগুলো বলতে থাকল, দাদার কীর্তি, গুরুদক্ষিণা, শত্রু... আর আপনি যদি উত্তমকুমারের চান তা হলে সপ্তপদী, অমানুষ...

অ্যাকচুয়ালি আয়াম লুকিং ফর পথের পাঁচালি।

পথের পাঁচালি... অফকোর্স পথের পাঁচালি ইজ দেয়ার। অল টাইম গ্রেট ক্লাসিক অফ সত্যজিৎ রে।

কত দাম?

মেয়েটা সেই মিষ্টি হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এখানে তো ক্যাসেট বিক্রি হয় না। শুধু ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়া নিতে গেলে আপনাকে কুড়ি পাউন্ড দিয়ে একটা মেম্বারশিপ করতে হবে। একটা ক্যাসেট পাবেন। ক্যাসেটটা আপনি দু'দিন রাখতে পারেন। অবশ্য আপনি যদি আরও বেশি ক্যাসেট রাখতে চান তা হলে আপনাকে প্রিমিয়ার মেম্বারশিপ নিতে হবে...

মেয়েটার অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা দেখে অবাক হচ্ছিল বিট্টু। বারবার জুলির কথা

মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। জুলি ঠিক এরকমই দোহারা ছিল। লম্বা পাট চুল। মুখশ্রীটা এতদিন পরে আর অত খুঁটিয়ে মনে নেই। তবে খুঁটিয়ে এই মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে এর মুখের আদলটা জুলির চেয়ে আলাদা। মুখটা আরও মিষ্টি। মেয়েদের চিরকালই এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেছে বিট্টু। কোনও আকর্ষণও বোধ করে না। আর জুলির সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতার রাতটা, প্রথম যৌন অভিজ্ঞতার রাতটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে থাকার চেষ্টা করে। একটা সময় লন্ডনের সহপাঠিনীরা বিট্টুর লিঙ্গ পছন্দের ব্যাপারেই সংশয় প্রকাশ করত। ডক্টর ব্রাউন পর্যন্ত জুলির বৃত্তান্ত শুনে বলেছিলেন, মনের ভেতর থেকে বিতৃষ্ণার ব্লকটা সরিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে। তবু হঠাৎ হঠাৎ মনের ভেতর থেকে উঁকি দেয় জুলি। যেমন আজ হঠাৎ করে এই মেয়েটাকে দেখে জুলির কথা মনে পড়ছে। আর সেই বিতৃষ্ণার পাথরটা সরিয়ে একই সঙ্গে মেয়েটাকে কেন ভাল লাগছে বুঝতে পারল না বিট্টু।

মেয়েটা অনর্গল কথা বলতে বলতেই ফর্ম ভরতি করে বিট্টুর মেম্বারশিপটা করিয়ে দিয়ে পথের পাঁচালির ক্যাসেটটা বিট্টুর হাতে তুলে দিল। তবে তখনও ওর কথা বলা শেষ হল না।

স্যার আপনি শুধু বাংলা সিনেমা দেখেন, হিন্দি সিনেমা দেখেন না? অবশ্য এটা জিজ্ঞেস করার কোনও মানেই হয় না। কারণ, কোনও ইন্ডিয়ান হিন্দি সিনেমা দেখে না এটা হতেই পারে না। এখন ম্যাযনে পেয়ার কিয়া খুব চলছে। নতুন হিরো হিরোইন। সলমন খান আর ভাগ্যশ্রী। সলমন খান কে জানেন তো? সেলিমের ছেলে। শোলের গল্প লিখেছিল যে সেলিম জাভেদ, সেই সেলিমের ছেলে। শোলে আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। এটা তো জিজ্ঞেস করার কোনও মানেই হয় না...

আনফরচুনেটলি শোলে আমার দেখা হয়নি। তবে নাম শুনেছি।

মেয়েটা একটা অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে চোখ কপালে তুলে বলল, সে কী! আপনি শোলে দেখেননি?

বিট্টু ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল।

ঠিক আছে স্যার, শোলেটা আপনাকে কমপ্লিমেন্টারিতে দেখিয়ে দেব। আপনি প্রিমিয়ার মেম্বারশিপটা করিয়ে নিন। কিন্তু 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া'টাও দেখে নেবেন। এত ভাল সিনেমা। শুধু নতুন হিরো হিরোইন নয় স্যার, অলোকনাথও আছে। গানগুলো সব সুপার হিট। প্রথমেই যে গানটা... আতে যাতে... লতা মঙ্গেশকর গেয়েছে। সুরটা কোথাকার জানেন তো? স্টিভ ওয়ান্ডার গেয়েছিল... নো নিউ ইয়ার্স ডে টু সেলিব্রেট... একদম ওখান থেকে নেওয়া... আপনি প্লটটা শুনবেন স্যার?

এরকম অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে কথা বলতে আগে কখনও কাউকে বিট্টু দেখেনি। কাউন্টারে কনুইয়ে ভর দিয়ে গালে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, মে আই নো ইয়োর নেম প্লিজ?

উপাসনা। এখানে তিনজন কাজ করে। অবশ্য আমি একাই ইন্ডিয়ান মেয়ে... তাই আপনি যদি আমার নাম ভুলেও যান, জাস্ট বলবেন ইন্ডিয়ান...

ভুলব না। প্লটটা শুনি তা হলে?

অলোকনাথ ওর মেয়ে ভাগ্যশ্রীকে নিয়ে একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকে। একদিন অলোকনাথ ভাবল পয়সা কামাতে দুবাইয়ে যাবে। মেয়েকে এক বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে রেখে গেল। ওদের ছেলে সলমন খান...

বিট্টু অবাক হয়ে উপাসনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। নিষ্পাপ মুখে গাঢ় লিপস্টিক মাখানো ঠোঁটগুলো অক্লান্তভাবে নড়ে যাচ্ছে। হিন্দি সিনেমার গল্পটা কানে না ঢুকলেও ভাললাগার একটা আবেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তা হলে কি ডক্টর ব্রাউনের কথাটাই ঠিক! ঘৃণার পাথর অবচেতন মনে অনেক সূক্ষ্ম ভাললাগার অনুভূতিকে চাপা দিয়ে রাখে। তারপর একদিন হঠাৎ লাভার স্রোতের মতো সেই অনুভূতি যখন বেরুতে আরম্ভ করে, তখন বল্গাহীন হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে উপাসনার গল্পটা বলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিট্টু ঘড়ি দেখল। ভাললাগাটায় লাগাম টেনে এবার বাড়ি ফিরতে হবে।

বাই উপাসনা। পরের দিন 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া'টা নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভীষণ ভাল লাগল। থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং।

ক্যাসেটটা নিয়ে ভিডিয়ো লাইব্রেরিটা থেকে বেরিয়ে ভেতরটা খুব হালকা লাগল বিট্টুর। বাড়ি ফিরে শিশুর সারল্য দেখিয়ে টিভির পিছনে ভিসিআর-এর তারটা গুঁজতে গুঁজতে গলা খুলে ডাকতে থাকল, বাবা তাড়াতাড়ি দেখবে এসো। একটা মজার জিনিস এনেছি।

দয়াল সান্যাল ঘরের ভেতর ছিলেন। শান্ত পায়ে বেরিয়ে এসে বললেন, কলেজ থেকে এত তাড়াতাড়ি চলে এলি? এমারসন সাহেব ছুটি দিয়ে দিল? কী জিনিস এনেছিস?

পথের পাঁচালির ক্যাসেটটা ভিসিআর-এর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বিট্টু বলল, দেখো না কী মজার জিনিস। এটায় তুমি বাড়িতে বসেই ইচ্ছেমতো সিনেমা দেখতে পাবে।

সিনেমা শব্দটা দয়াল সান্যালের মাথায় একটা বিক্রিয়া ঘটাল। চোখ দুটো কুঁচকে গেল। বিট্টু সেটা খেয়াল করে দয়াল সান্যালের কাঁধ দুটো ধরে সোফায় বসিয়ে বলল, আরে তুমি দেখোই না সিনেমাটা। মজার সিনেমা।

রিমোটের বোতামে চাপ দিল বিট্টু। টিভির স্ক্রিনে ফুটে উঠল পথের পাঁচালি। দয়াল সান্যাল ঠায় চেয়ে রইলেন টিভির দিকে। তবে মুখে আর একটা শব্দও করলেন না। অনেকদিন পরে সোফায় বাবার গা ঘেঁষে বসে একটা উষ্ণতা পেল বিট্টু। ভাললাগার উষ্ণতা।

কতক্ষণ মগ্ন হয়ে পথের পাঁচালি দেখছিল বিট্টুর মনে নেই, তবে চটকটা ভাঙল ফোনের শব্দে। দয়াল সান্যালের মনোযোগ বিঘ্নিত না করে কর্ডলেস রিসিভারটা নিয়ে ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল বিট্টু। ফোনটা করেছেন কলকাতা থেকে সরোজ বক্সী। সাগরপারের প্রান্ত থেকে কুণ্ঠিত গলায় বললেন, অসময়ে কি ফোন করে ফেললাম...

বিট্টু সময় হিসেব করে বুঝতে পারল কলকাতায় এখন ভোরবেলা।

এত সকালে কাকা...

আসলে কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি।

বিট্টু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, কেন?

কাল তোমার সঙ্গে ফোনে কথা হল। কিন্তু আসল কথাটাই তোমাকে জানাতে পারলাম না।

কী কথা?

সরোজ বক্সী ভেঙে পড়লেন।

ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজ আমি আর চালাতে পারছি না বিট্টুবাবা। সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে।

এ কথাটা নতুন কিছু নয়। আগেও সরোজ বক্সী একই কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আগের মতোই বিট্টু নিজের উত্তরের অবস্থানটা একই কথায় রাখল।

আপনি আবার সেই একই চিন্তা করছেন কাকা।

আমি যোগ্য নই বিট্টুবাবা। আমি পারব না। চোখের সামনে সব একটা একটা করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বড়সাহেবের তিল তিল করে গড়ে তোলা এত বড় একটা ব্যাবসা...

বিট্টু একটু চুপ করে থেকে বলল, কে যোগ্য কাকা? বাবা নিজেও কি যোগ্য ছিল? বাবার শরীর খারাপের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু তার আগেও কি বাবা পারছিল নিজের ব্যাবসাটাকে ধরে রাখতে?

সরোজ বক্সী চুপ করে গেলেন। বিট্টু জানে উত্তরটা মোক্ষম দিয়েছে। সরোজ বক্সীকে চুপ করিয়ে দেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভাল উত্তর আব হয় না।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে সরোজ বক্সী মিয়ানো গলায় বলার চেষ্টা করলেন, তবু বিট্টুবাবা আমি পারছি না। হরিতলায় ইউনিয়নের অশান্তি। অন্য দিকে ক্রমাগত মিলটা কিনে নেওয়ার চাপ, এমনকী কলকাতার বাড়িটা পর্যন্ত প্রমোটাররা কিনে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। তোমার একবার কলকাতায় আসা খুব দরকার ..

বিট্টু, বিট্টু...

ভেতর থেকে অত্যন্ত উত্তেজিত দয়াল সান্যালের গলা ভেসে এল। বিট্টু তাড়াতাড়ি ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ভেতরে গেল। দয়াল সান্যাল সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। বিট্টু কাছে আসতেই কাঁধটা খামচে ধরে বললেন, দেখ, দেখ... কে বলল বাংলার মাটিতে তুলো ফলে না? দেখ তোর সিনেমায় কী দেখাচ্ছে। তোর লেখাপড়াটা শেষ হয়ে যাক, তারপর আমরা বাপ-ব্যাটাতে ডুমুরঝরাতে তুলো ফলাবই।

বিট্টু টিভির দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল, রাশি রাশি সাদা ধবধবে কাশফুলের মধ্যে অপু আর দুর্গা দৌড়োচ্ছে আর দূর থেকে কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে একটা ট্রেনের ইঞ্জিন।

আজকাল এত খাটাখাটনি যায় যে বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। মনের ফাঁকফোকরে যেটুকু অবসর লুকিয়ে থাকে কম্পিউটারের ব্যাবসার নানা চিন্তায় অথবা বাবার চিন্তায় সেটা গ্রাস হয়ে যায়। তবে সেইসব চিন্তাগুলোকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয় ক্লান্তি। ঘুমের ধ্বজা তুলে দেয় চোখে। শুয়ে শুয়ে বিট্টু ভাবছিল,

কলকাতায় বাবার যে নিস্তেজ ভাবটা দেখেছিল লন্ডনে এসে তার কোনও পরিবর্তন দেখেনি। তবে আজ বহুদিন পরে সাদাকালো একটা সিনেমায় দয়াল সান্যাল যেরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, যেভাবে সারা শরীর থরথর করে কাঁপছিল সেটা চিন্তার বিষয়। ডক্টর ব্রাউন এগুলোকে নজর রাখতে বলেছেন। কাল ব্যাপারটা জানাতে হবে ডক্টর ব্রাউনকে। বিট্টু নিজে আর কতক্ষণ বাড়িতে থাকে? এমনিতেই ডেভি বলে বয়স্ক যে মহিলা দয়াল সান্যালের দেখাশোনা করে সে সবসময় দয়াল সান্যালের সব কথার প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারে না। দু'জনের কথাবার্তা বলায় যথেষ্ট ভাষার সমস্যা আছে। ডেভির ভগবানদত্ত দুটো জিনিস আছে। এক, অসীম ধৈর্য; আর দুই, একটা স্নেহশীল মন। দয়াল সান্যালকে ঠিকঠাক দেখাশোনার কাজটা যথাযথ পালন করে। কিন্তু অবস্থা যদি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, যেমন আজকে যেরকম হয়েছিল, তা হলে ডেভি সামলাবে কী করে। ডক্টর ব্রাউন বলেছেন রোগটা এখনও অ্যাকিউট স্টেজে যায়নি। আগে একদিন বুঝিয়েছিলেন অ্যাকিউট স্টেজে রোগটা নাকি ভয়ংকর। এতটাই ভয়ংকর যে মানুষ মুখের মধ্যে খাবারের গ্রাস নিয়ে ভুলে যায় চিবোনোর কথা, হাঁটতে গিয়ে একটা পা ফেলে ভুলে যায় পরের পা-টা ফেলার কথা।

অন্ধকার ঘরে ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে নিজের খাতে বইতে লাগল। সেই বল্গাহীন চিন্তার স্রোতটায় কখন যেন চোরা স্রোতের মতো ঢুকে পড়ল উপাসনা। একটা উচ্ছল মেয়ে, যে জুলির মতো দেখতে, যে অনর্গল বলে যেতে পারে সিনেমার গল্প। কোলবালিশটা আঁকড়ে একটা মানুষীর উষ্ণতা খুঁজে পেতে থাকল বিট্টু। উপাসনাকে মনে খেলে যেতে প্রশ্রয় দিল। প্রকৃতির নিয়মে চোখ দুটো একসময় ভারী হয়ে বন্ধ হল। অনেকদিন পরে বিট্টু একটা কখনও না-দেখা স্বপ্ন দেখল। একটা বিশাল অজানা ঘরে ধবধবে একটা সাদা বিছানায় বিট্টুর কোলে মাথা দিয়ে জুলি ঘুমোচ্ছে। বিট্টু আলতো করে ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে গেয়ে চলেছে, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

৮২

অকৃতদার যামিনী ভট্টাচার্য একদিন চলে গেলেন। বয়সোচিত চলে যাওয়া। শোক বিলাপ করার জন্য রক্তের সম্পর্কে কাছের মানুষ কেউ নেই। তবে চলে গিয়ে একদম নাড়িয়ে দিয়ে গেলেন সরোজ বক্সীকে। অতসীও অসময়োচিত গিয়ে, অবজ্ঞার গ্লানি রেখে যে-নাড়াটা সরোজ বক্সীকে দিয়ে গিয়েছিল, যামিনী ভট্টাচার্যর মৃত্যুর জন্য শোকের ক্ষতটা তার চেয়ে অনেক বেশি হল।

নিমতলা শ্মশানে শেষকৃত্য করে আসার পর সরোজ বক্সী নিজের ঘরে ঢুকে একদম গুম হয়ে গেলেন। বীথি প্রথমে ভেবেছিল শোকের এই ধাক্কা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তিন-চার দিনেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন দেখল না। ছোটবেলা থেকেই বীথি একটা জিনিস

দেখে এসেছে। বাবার সান্যালবাড়ির জন্য অপরিসীম আনুগত্য। ঝড় জল গ্রীষ্ম, সব উপেক্ষা করে সান্যালবাড়ির আনুগত্য মেটাতে বাবা এই বয়সেও নিয়ম করে অফিস যায়। সেই মানুষটাই একটা মৃত্যুর শোকের ধাক্কায় রাতারাতি অফিস যাওয়াই ছেড়ে দিলেন।

সরোজ বক্সী ইদানীংকালে ব্যাবসার সমস্যার কথা কখনও কখনও বলেন। বীথি জানে সান্যালদের ব্যাবসাটা পাহাড়প্রমাণ সমস্যা নিয়ে আর ক্ষয় রোগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তবে বাবা কেন এই ব্যাবসাটার জন্য প্রাণপাত করে বীথি বুঝতে পারে না। সরোজ বক্সী সান্যালবাড়ির ইতিহাস বীথিকে কখনও গুছিয়ে সবিস্তারে বলেননি। হয়তো ইতিহাসটার শুরু যেখানে সেই মার্থা গঞ্জালেসের পেশা কী ছিল, সংস্কারবশে কখনওই মেয়ের সামনে মুখ ফুটে বলতে পারেননি। কিন্তু প্রকারান্তরে যে অসংখ্য টুকরো টুকরো কথা বীথিকে বলেছেন সেগুলো ঠিকঠাক জোড়া লাগিয়ে বীথির সান্যালবাড়ির পুরো ইতিহাসটাই জানা হয়ে গেছে। সেই ইতিহাসটা খুঁড়েও সান্যালবাড়ির জন্য বাবার এই অপরিসীম আনুগত্যের রহস্যটা কী, বীথি উত্তর পায়নি। যে মালিকপক্ষ সব ছেড়েছুড়ে লন্ডনে চলে গেছে, সেই ব্যাবসা আগলে রাখার বাবার কীসের এত টান? বাবার এই একরোখা আনুগত্যটা দেখে মাঝে মাঝে রাগ হয় বীথির। মাঝে মাঝে মনে হয় বিট্টুকে প্রশ্নটা করবে, কী এত দায়িত্ব দিয়ে গেছে বাবাকে? তবে বিট্টু কখনও ফোন করলে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা করতে পারে না বীথি। ছেলেটা এত নরম করে আন্তরিক হয়ে কথা বলে যে মনেই হয় না, ও মালিকপক্ষ। সেই সঙ্গে অবশ্য আর একটা জিনিসও লক্ষ করেছে বীথি। হাজারো সমস্যা জর্জরিত হয়েও বাবা যেন অফিস নিয়েই ভাল থাকে। আজকাল বাবা মাঝে মাঝেই মুদ্রাদোষের মতো একটা কথা বলে, 'চিরটাকাল জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ালাম। সত্যিকারের কর্তব্য আর করলাম কোথায়?' হয়তো নিজের জীবনটা থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে বাবার এই একটাই থাকার আস্তানা। অফিস।

জানলা দিয়ে উদাস হয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকা সরোজ বক্সীর পাশে এসে লেবুজলের শরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে বীথি বলল, বাবা, তুমি এবার বাইরে বেরোও, অফিসে যাও। অফিসে গেলেই তুমি ভাল থাকবে।

সরোজ বক্সী মুখটা না ঘুরিয়েই একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলি মা, যামিনীদা বারবার একটা কথাই বলতেন, আত্মানং বিদ্ধি, নিজেকে চেনো সরোজ, নিজেকে চেনো।

বীথি বাবার হাতটা টেনে শরবতের গ্লাসটা ধরিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, তুমি কেন বুঝতে পারছ না বাবা, যামিনীজেঠু যে বয়সে চলে গেছেন ভালই হয়েছে। এই বয়সেও হেঁটেচলে বেড়াতেন। কোনও ভুগলেন না, কাউকে ভোগালেন না, কোনও কষ্টও পেলেন না, টুক করে চলে গেলেন। আরও বেশি দিন বেঁচে থাকলে কী হত বাবা? অথর্ব হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতেন। কে ওঁর দেখাশোনা করত?

কেন, তুই আর আমি পারতাম না? সরোজ বক্সী ঘুরে দাঁড়ালেন।

বাবা প্র্যাক্টিক্যাল চিন্তা করো।

সরোজ বক্সী শরবতের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, যামিনীদার শ্রাদ্ধ করার কেউ নেই। আমি যামিনীদার শ্রাদ্ধ করব।

বীথি কথা না বাড়িয়ে বলল, ঠিক আছে তুমি করবে। তোমার যামিনীজেঠুর জন্য যা ইচ্ছে হয় করবে। তবে বাবা তুমি এটা গোপনে করো। কারণ ওঁর আত্মীয়রা কিছু করুক না-করুক, তোমার ইচ্ছে জানতে পারলে আবার অন্যরকম মানে করবে। দশটা কথা রটাবে।

সরোজ বক্সী ভেঙে পড়লেন, আমি আর কতদিন জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াব বল তো মা? আর কত লুকিয়ে থাকব?

বীথি বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল, তুমি পালিয়ে বেড়াওনি বাবা। তুমি লাইফকে ফেস করেছ। তুমি দায়িত্বকে কোনওদিন এড়িয়ে যাওনি।

ওকথা বলিস না মা। আমি তোর জন্য, তোর মায়ের জন্য কিচ্ছু করিনি। মার্থা মেমসাহেব একটা দায়িত্ব দিয়েছিল...

শোনো বাবা, মৃত্যুর ওপর কারও হাত থাকে না। মায়ের যে রোগ হয়েছিল সেটাকে ঠেকিয়ে দেওয়ার উপায় কারও জানা নেই। আর আমার জন্য যদি কিছু না করেই থাকো, আমি কি এমনি বড় হয়ে গেলাম? এমনিই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি?

সরোজ বক্সী মেয়ের মাথায় হাত রাখলেন, তোর একটা বিয়ে দিলেই আমি নিশ্চিন্ত। তারপর তোর মায়ের মতো কষ্ট পেয়ে মরি বা যামিনীদার মতো টুক করে চলে যাই, কিছুই এসে যাবে না।

এই রে, তোমার আবার বস্তাপচা কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। তোমাকে আমি বলেছি কিনা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও গিয়ে থাকতে পারব না। এই নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। কাজের কথা শোনো। তুমি যদি অফিসে না বেরোও আমিও কিন্তু ইউনিভার্সিটি যেতে পারছি না। পাঁচদিন কামাই হয়ে গেল আমার।

সরোজ বক্সী চিন্তিত হলেন, কেন, তুই ইউনিভার্সিটি কামাই করছিস কেন?

বীথি কপট অভিমান দেখাল, যাব? কেমন করে যাব? যা আপনভোলা হয়ে আছ তুমি! আমি আজ কোনও কথা শুনতে চাই না। আজ তোমাকে অফিসে যেতেই হবে। ট্যাক্সি করে যাওয়ার সময় আমাকে কলেজ স্ট্রিটে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

সরোজ বক্সী বেশ কয়েকদিন পর অফিসে এসে নিজের ঘরে চুপ করে বসে রইলেন। হরিতলা কটন মিলের ম্যানেজার শীতল ভট্টাচার্য এখন কলকাতার অফিসেই বেশি বসেন। শীতল ভট্টাচার্য একসময় দয়াল সান্যালের খাস আজ্ঞাবাহক লোক হিসেবে সরোজ বক্সীকে সমীহ করেই চলতেন। কিন্তু যবে থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি সরোজ বক্সীকে দিয়ে দয়াল সান্যাল অনির্দিষ্টকালের জন্য ছেলের কাছে লন্ডনে চলে গেছেন, সরোজ বক্সীর ক্ষমতাভোগটাকে খোলা মনে নিতে পারেননি শীতল ভট্টাচার্য। সরোজ বক্সী অবশ্য কখনওই একচ্ছত্র ক্ষমতাটাকে জাহির করে আনুগত্য দাবি করেন না, তবু বুকের ভেতর শ্রেণিস্থানের খচখচানিটা রয়েই যায়। যতই অসীম ক্ষমতার অধীশ্বর হন

না কেন সরোজ বক্সী আদপে কোম্পানির খাতায় তো একজন কেরানি আর শীতল ভট্টাচার্য সেখানে ম্যানেজার। লোকে যে পিছনে উপহাস করে, সেটা বিলক্ষণ জানেন শীতল ভট্টাচার্য।

শীতল ভট্টাচার্য বেয়ারার মুখে শুনলেন সরোজ বক্সী এসেছেন। খবরটা শোনামাত্র ভেতরে ভেতরে ফুটতে থাকলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন নিজে উঠে গিয়ে সরোজ বক্সীর ঘরে কথা বলবেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজের অবস্থানের ভারটা প্রকাশ করার জন্য বেয়ারাকেই বললেন সরোজ বক্সীকে ডেকে দিতে।

কিছুক্ষণ পর সরোজ বক্সী শ্রান্ত ক্লান্ত পায়ে শীতল ভট্টাচার্যের কেবিনে এলেন। চোখে পড়ার মতো শুকনো মুখ। শীতল ভট্টাচার্য কারণটা জানেন। তবে কোনও সমবেদনা না জানিয়ে ঝামরে উঠলেন, কী ব্যাপার বক্সীবাবু? দায়িত্ব নেওয়ার সময় তো দশটা হাত বার করে দায়িত্ব নিয়েছিলেন আর ক্রাইসিসের সময় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে আছেন। ফোন করলে আজ আসছি, কাল আসছি বলে কাটিয়ে দিচ্ছেন। সব ঝড়ঝাপটা সামলান্যের দায় আমার একার নাকি?

এই ক'বছরে শীতল ভট্টাচার্যের বিনীত ব্যবহার থেকে ক্রমশ রুক্ষ ব্যবহারে সরোজ বক্সী অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এধরনের কড়া ব্যবহার করার ধৃষ্টতা শীতল ভট্টাচার্য আগেও করেছেন। সরোজ বক্সী কারণটাও খানিকটা আন্দাজ করেন, তাই চেষ্টা করেন এটা গায়ে না মাখার জন্য। কিন্তু এখন মনের যা অবস্থা তাতে আজ শীতল ভট্টাচার্যের ব্যবহারে আহত হলেন। একবার মনে হল বলেন যামিনী ভট্টাচার্যের মৃত্যু তাঁকে কোথায় স্পর্শ করে গেছে সেটা বলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যামিনী ভট্টাচার্যের মৃত্যুটা বড় পবিত্র, স্বর্গীয়। সেটা কারও অশ্রদ্ধা অর্জনের যোগ্য নয়। তাই শুকনো মুখেই বললেন, নতুন কী সমস্যা হয়েছে শীতলবাবু?

শীতল ভট্টাচার্য খেঁকিয়ে উঠলেন, পুরনো সমস্যাতেই রক্ষে নেই আবার নতুন সমস্যা খুঁজছেন। বলি কোম্পানি চালানোর টাকাটা কোথা থেকে আসবে? সাপ্লায়াররা বলছে ক্রেডিটে আর র'কটন দেবে না, আর লেন্ডাররাও এক পয়সা দিতে রাজি নয়। মেশিনপত্র ধুঁকছে। কোনও ওভারঅলিং নেই। বিগড়োলে তবে সারাব, এই বুদ্ধিতে একটা কারখানা চলে না। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এর ওপর আবার পুজো আসছে। বোনাস বোনাস করে হরিতলা কিন্তু ফুটছে।

সরোজ বক্সী আস্তে আস্তে মাথা দোলালেন, খেয়াল আছে শীতলবাবু। আমারও তো খুব ইচ্ছে লোকেরা বোনাস পাক। সন্তান পরিবার নিয়ে আনন্দে পুজো কাটাক। কিন্তু উপায় কী বলুন। দিনে দিনে আমরা তো সব দিক দিয়ে আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছি।

যাচ্ছি, কারণ আপনি সেদিকেই যাওয়াচ্ছেন...

সরোজ বক্সী করুণ মুখে বলতে থাকলেন, বড়সাহেব ঠিক যেভাবে কোম্পানিটা চালানোর চেষ্টা করতেন আমি শুধু ঠিক সেইভাবেই...

শীতল ভট্টাচার্য সরোজ বক্সীকে থামিয়ে অসমাপ্ত কথাটা পূরণ করে দিলেন,

কোম্পানিকে চালানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু সমস্যা কী জানেন তো? আপনি আর দয়াল সান্যাল এক নন। বই পড়ে যে ফুটবল খেলা শেখা যায় না এটা লেন্ডাররা বোঝে। তাই আপনার শ্রীমুখটা দেখে কেউ টাকা দেবে না।

সরোজ বক্সী কিছুক্ষণ মাথা ঝুলিয়ে ধীর গলায় বলার চেষ্টা করলেন, আর ভাল লাগছে না শীতলবাবু। কিছু ভাল লাগছে না। এবার আমায় মুক্তি দিন। আমায় ছুটি করে দিন।

শীতল ভট্টাচার্য একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, আমি ছুটি দেওয়ার কে? ছুটি আপনি সেই সইটার কাছে নিন। সম্মতি দিয়ে যে সইটায় আপনি দায়িত্বটা নিয়েছিলেন।

প্রাথমিকভাবে গায়ের ঝালটা মিটিয়ে শীতল ভট্টাচার্য একটু শান্ত হলেন। তারপর চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে বললেন, নিউ আলিপুরের সান্যালবাড়ির জন্য খদ্দের আছে। প্রায় কোটির কাছাকাছি। যদি বাড়িটা ঝেড়ে দেন ভাল রসদ আসবে। সান্যালরাও তো আর কোনওদিন থাকতে আসবে না। বাড়িটা বেচলে কোম্পানির ঘুরে দাঁড়ানোর একটা সুযোগ আছে। না হলে বড় একটা তালা নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে আসুন হরিতলা কটন মিলের গেটে।

শীতল ভট্টাচার্যের মুখ থেকে এই প্রস্তাবটার কথা সরোজ বক্সী আজ প্রথম শুনলেন না। কয়েক মাস ধরে ঘুরেফিরে শীতল ভট্টাচার্য নিউ আলিপুরের সান্যালবাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলছেন। সরোজ বক্সী জানেন প্রমোটারদের লোভী চোখ ওই বাড়িটার ওপর পড়েছে। সরোজ বক্সী ওদের বহুবার জানিয়েছেন সান্যালবাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার ওঁর নেই। সরোজ বক্সীকে সুবিধা করতে না পেরে ওরা শীতল ভট্টাচার্যকে কবজা করতে চাইছে। টোপ দিয়ে রেখেছে, বহুতল হলে একটা ফ্ল্যাট নাকি শীতল ভট্টাচার্যকে দেবে। সরোজ বক্সী আজ চুপ করে থাকলেন। এই মৌনী হয়ে থাকাটা আগের উত্তরগুলোর সঙ্গে সমার্থক হল। সেটা দেখে শীতল ভট্টাচার্য অধৈর্য হলেন।

আর কতদিন যক্ষের ধন আগলে রাখবেন বক্সীবাবু! শেষকালে পাওনাদাররা কোর্ট-কাছারি করে কেড়ে নিলে যেটুকু টাকা এখন পাচ্ছেন সেটাও হারাবেন।

সরোজ বক্সী নিচু গলায় বলতে থাকলেন, আপনাকে আগেও বলেছি শীতলবাবু, সে ক্ষমতা আমার নেই। তা ছাড়া আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

জানি আপনার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নির ক্ষমতা কতটুকু। কিন্তু আপনি তো বড়সাহেবের ছেলেকে কথাটা জানাতে পারেন। ওই তো আপনাকে দায়িত্বটা দিয়ে গেছে কোম্পানিটা চালানোর। আপনি কি ভাবছেন বিলেত ছেড়ে ও আর কোনওদিন এ-বাড়িতে থাকতে আসবে, না বাপকে থাকতে আসার জন্য পাঠাবে! মধ্যেখান থেকে আমরা বউ-বাচ্চা নিয়ে পথে বসব।

সরোজ বক্সী আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে থাকলেন,' এত বড় দায়িত্ব একটা কাঁটার মুকুট।

শীতল ভট্টাচার্য বক্রোক্তি করলেন, সেটা আপনার দায়িত্বটা নেওয়ার আগে বোঝা উচিত ছিল।

সরোজ বক্সী চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে আরম্ভ করলেন, যামিনীদা বলতেন...

সরোজ বক্সীকে গীতার পদ্য শুরু করতে না দিয়ে শীতল ভট্টাচার্য ঝামরে উঠলেন, শুনুন মশাই আপনার ওই যামিনী ভট্টাচার্যর জ্ঞান আর দিতে আসবেন না। শুনে শুনে কান পচে গেছে।

যামিনী ভট্টাচার্যর সম্পর্কে এই মন্তব্য সরোজ বক্সীর ভাল লাগল না। ভেতরে ভেতরে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হল। ভেতরে ভেতরে একটা ঝড় উঠল। একটুখানি চুপ করে থেকে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সরোজ বক্সী বললেন, আমার শেষ কথা আমি বলে দিচ্ছি। আমরা যদি চালাতে না পারি তা হলে আপনি আইনি পরামর্শ করে হরিতলা কটন মিল লক আউট করে দিন শীতলবাবু।

শীতল ভট্টাচার্য চমকে উঠলেন। গত দশ বছরে শ্রমিক অসন্তোষে তিন-তিনবার মিলে ধর্মঘট হয়েছে। তার মধ্যে একবার ধর্মঘট বিয়াল্লিশ দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল কিন্তু মালিকপক্ষ কোনওদিন লক আউট করেনি। 'লক আউট' কথাটাকে সরোজ বক্সী পাপ বলে মনে করতেন। কোথাকার কে এক যামিনী ভট্টাচার্য মরল আর সরোজ বক্সীর মুখে 'লক আউট' কথাটার খই ফুটল। নাকি মোসাহেবটা তলেতলে মালিকের ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে ছিল? অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চল পায়ে কয়েকবার পায়চারি করে ধপ করে আবার নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ে শীতল ভট্টাচার্য কঠিন মুখে বললেন, কী বলছেন বক্সীবাবু? যা বলছেন ভেবে বলছেন তো...

ভেবেই বলছি। কারণ এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আপনি যে সান্যালবাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলছেন সেটার যেমন উপায় নেই তেমনই টাকার সংস্থান করারও কোনও উপায় নেই। তুলো তুলতে পারছি না, মেশিনপত্তর সারাই করতে পারছি না, বেতন মেটাতে নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। সুতরাং লক আউট না করা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই।

আপনি ছোটর সঙ্গে কথা বলে কী বলছেন?

না বলিনি। এবার বিট্টুবাবাকে বুঝিয়ে বলব। তোমার জিনিস তুমি বুঝে নাও। আমাকে ছুটি দাও।

শীতল ভট্টাচার্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সরোজ বক্সীর দিকে চাইলেন। লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলে অভিনয় করে যাচ্ছে। সব ঠিক করেই আজ অফিসে এসেছে। শীতল ভট্টাচার্য আরও কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলেন। তারপর স্বগতোক্তি করতে থাকলেন, পুজোর ঠিক আগে আগে কারখানার গেটে লক আউটের নোটিশ আমি ঝোলাতে পারব না। এতগুলো লোকের সংসার... আপনার কাছে একটা বাড়িই বড় হল! চিরটাকালই তো মালিকের আঁচলের তলায় থেকে তেলবাজি করে নিজেরটা গুছিয়ে নিলেন। খুব ধম্মোর কথা বলেন, যামিনী ভট্টাচার্য, যামিনী ভট্টাচার্য বলেন, জীবন থেকে পালিয়ে বেড়াবার দুঃখের কথা বলেন, এ পাপের বোঝাটা বইতে পারবেন তো?

সরোজ বক্সী আর কোনও উত্তর দিলেন না। ধীর পায়ে শীতল ভট্টাচার্যের চেম্বারের

ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গোটা অফিসটাতেই দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকল। অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মাথার মধ্যে একটা টলটলানি। শরীরটাও দুর্বল লাগছে। বীথি আজকাল ফরমান দিয়ে রেখেছে, অনেক বয়স হয়েছে, জীবনে অনেক কষ্ট করেছ, এখন ট্যাক্সি করে যাতায়াত করবে। তবে আজকে আর ট্যাক্সিতে উঠতে ইচ্ছে করল না। অচেনা লোকের ভিড়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। বাড়ি ফেরার জন্য একটা চেনা রুটের বাসের নম্বর পেয়ে দুপুর দুপুর তাতে উঠে বসার জায়গাও পেয়ে গেলেন। বাইরে চলন্ত দৃশ্য আনমনে দেখতে দেখতে চেনা চেনা মুখগুলো ভেসে উঠতে থাকল। হরিতলা কটন মিলের এক-এক জনের মুখ। শ্রীদাম, সুবল, অনন্ত, সুকুমার, রফিক, তপন, নির্মল, তৌসিফ... বাইরে রাস্তায় জামাকাপড়ের দোকানগুলোর কাউন্টারে কাউন্টারে ভিড়। শোকেসে মা দুর্গার মুখ। মা আসছেন। সরোজ বক্সীর ভেতরে ভেতরে তখন একটাই কথা বাজছে—এ পাপ সহ্য হবে তো?

বাড়ি ফিরে এসে খাটে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। বীথি আজ অনেকদিন পরে কলেজে গেছে। ফিরতে সেই বিকেল গড়াবে। লক আউটের কথাটা কি মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল? যে দায়িত্বটা নিয়েছেন, কোনও অশুভ চিন্তা তো কোনওদিন করেননি। বিট্টুর সঙ্গে আগে একটু পরামর্শ করে দেখলে হত না? নাকি শীতল ভট্টাচার্য ঠিক বলছে? নাকি বিট্টুকে জানানো উচিত, অনেকগুলো পেটের জন্য হরিতলা কটন মিলটা বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে সান্যাল বাড়িটা বিক্রি করে টাকার জোগান তৈরি করে নেওয়াই একমাত্র রাস্তা। নাকি বিট্টুকে বলা উচিত, তুমি ফিরে এসে নিজের ব্যাবসাটা নিজে বুঝে নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। নাকি খরিদ্দারদের হাতেই কারখানাটা বিক্রি করে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত বিট্টুকে?

ক্রিং... ক্রিং... ক্রিং ক্রিং...

চটকটা ভাঙিয়ে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলেন সরোজ বক্সী। ফোনটা শুধু ধরার অপেক্ষা। অচেনা একটা গলায় ওপ্রান্ত থেকে অশ্রাব্য গালিগালাজ আরম্ভ হল।

শুয়োরের বাচ্চা... লক আউট করবি... হারামি দালাল...

বীথিকেও রেহাই দিচ্ছে না। কানের মধ্যে মনে হচ্ছে গলানো সিসে ঢেলে দিচ্ছে কেউ। এর মধ্যেই ওরা জেনে গেল... শীতল ভট্টাচার্য বলে দিল ওদের... বুকের মধ্যে অল্প অল্প চিনচিনানি ব্যথা শুরু হয়ে গেল সরোজ বক্সীর।

৮৩

পিকাডেলি সার্কাসের কাছে ভিডিও লাইব্রেরিটায় ঢুকে বিট্টু চারিদিকে চোখ বুলিয়ে উপাসনাকে কোথাও দেখতে পেল না। কাউন্টারে প্রথম যে মেয়েটাকে সামনে পেল তার কাছে জানতে চাইল, উপাসনা আছে?

মেয়েটা একগাল অমায়িক হেসে উত্তর দিল, উপাসনা আজ একটু দেরি করে আসবে। আপনাকে কি আমি সাহায্য করতে পারি?

আমার একটা ভিডিয়ো টেপ ফেরত দেওয়ার ছিল।

বিট্টু পথের পাঁচালির ভিডিয়ো ক্যাসেটটা কাউন্টারের ওপর রাখল।

কোনও সমস্যা নেই স্যার। আমি নিয়ে নিচ্ছি।

বিট্টু হতাশ গলায় বলল, আসলে, উপাসনা আমাকে একটা সিনেমা সাজেস্ট করেছিল...

সবসময় সাহায্য করতে প্রস্তুত মেয়েটা এবার একটু অর্থপূর্ণ হেসে বলল, ও নিশ্চয়ই আপনাকে সেই সিনেমার গল্পটা বলেছে।

খানিকটা তাই, বিট্টু আঙুল দিয়ে চারদিকের থাক থাক ভিডিয়ো ক্যাসেটগুলো দেখিয়ে বলল, আপনাদের বুঝি এই এত সিনেমার গল্প সব মুখস্থ?

মেয়েটা এবার শব্দ করে হেসে উঠল, নাহ্... নাহ্... সবার নয়। ওই উপাসনাই পারে সব গল্প মনে রাখতে। বিশেষ করে ভারতীয় সিনেমা, হিন্দি সিনেমা। আসলে ও তো ভারতীয়। আপনিও বুঝি ভারতীয় স্যার?

বিট্টু মনে মনে ভাবল ভারতীয়, অভারতীয়, বিশ্বের যে-দেশেই জন্ম হয়ে থাক না, আদপে এই ভিডিয়ো লাইব্রেরির সুন্দরী সুবেশা মেয়েগুলোর বোধহয় একটাই গুণ। আন্তরিকভাবে অনর্গল কথা বলে যাওয়া।

মেয়েটা ভারতীয় সিনেমার ক্যাটালগটা বার করে বিট্টুর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনি দেখুন না স্যার, কোন সিনেমাটা চাইছেন...

সমস্যাটা তো সেখানেই। সিনেমার নামটা মনে নেই। গল্পটা একটু একটু মনে আছে, আর একটা গান যেটা স্টিভ ওয়ান্ডারের 'নো নিউ ইয়ার্স ডে' থেকে নেওয়া।

মেয়েটা ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ল।

আপনি যদি একটু কষ্ট করে সন্ধের দিকে আসেন, উপাসনা রাত ন'টা পর্যন্ত থাকে। আমি ওকে বলে রাখব।

বিট্টু দু'মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর পকেট থেকে নিজের একটা বিজনেস কার্ড বের করে মেয়েটাকে দিয়ে বলল, আপনি যদি দয়া করে উপাসনাকে একবার আমাকে ফোন করতে বলেন। আমি সারাদিন অফিসে থাকব। কার্ডে আমার অফিসের ফোন নম্বরটা আছে।

মেয়েটা কার্ডটা একঝলক দেখে বলল, আমি নিশ্চয়ই বলব মিস্টার সানিয়াল।

বিট্টু আর পিটারের যৌথ মালিকানার 'বিটল্‌স সফট'-এর অফিসটা ছোট। এর মধ্যেই চাপাচাপি করে বাইশ জন প্রোগ্রামার বসে। মালিকদের ঘরটা একই অনুপাতে ছোট। আগে ওরা একই টেবিলের দু'দিকে বসত। সম্প্রতি টেবিল দুটো আলাদা হয়েছে। গত ছ'মাসে যা ব্যাবসা হয়েছে সেটা গত বছর এই সময়ের ছ'মাসের তুলনায় আট গুণ বেশি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের প্রয়োগ বেশি করে বাড়ছে। তত বাড়ছে কাস্টমাইজড প্রোগ্রামের চাহিদা। ইদানীংকালে টেক্সট বেসড সফটওয়্যারের চেয়ে নতুন

উইন্ডোজ জিইউআই বেসড সফটওয়্যার হু হু করে জনপ্রিয় হচ্ছে। পিটার ক্রমাগত বলছে আরও অনেক বেশি কাজ ধরা যায়, কিন্তু তার জন্য আরও বড় অফিস স্পেস দরকার। আরও অনেক প্রোগ্রামার নিতে হবে।

গতকাল পিটারের সঙ্গে বিট্টুর এ ব্যাপারে সবিস্তারে কথা হয়েছে। পিটার বলছিল ওদের বাড়ির সাবেকি ব্যাবসা চালানো বড়দের নাকি এত অল্প বয়সে পিটারের এই উল্কাগতির বাড়ন্ত ব্যাবসা দেখে ক্রমশ চক্ষু চড়কগাছ হচ্ছে। আজ একজন এজেন্টের আসার কথা। সে কিছু বড় অফিস স্পেসের সন্ধান নিয়ে আসবে। পিটারকে গতকাল এ নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজিত দেখেছিল বিট্টু। কিন্তু আজ অফিসে এসে দেখল পিটার কেমন যেন গুম মেরে বসে আছে।

বিট্টু নিজের টেবিলে ব্যাগটা রেখে বলল, কী হয়েছে পিটার?

পিটার থমথমে মুখে বলল, ব্যাড নিউজ। একসঙ্গে চারজন প্রোগ্রামার আজকে চাকরি ছেড়ে দিল।

কারা ছাড়ল? উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল বিট্টু।

শ্যাম, আদিত্য, আনোয়ার আর হুসেন।

হুসেন! বিট্টু ভুরু কুঁচকে বলল। হুসেন ওদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রোজেক্ট লিডার ছিল। এই মুহূর্তে ওদের কোম্পানির সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কিং প্রোজেক্টের নেতৃত্ব দিচ্ছিল হুসেন। কাজটা অনেকটা এগিয়ে আছে। এইসময় হুসেনের ছেড়ে দেওয়া মানে গোটা প্রোজেক্টটাতে একটা বড় ধাক্কা। তা ছাড়া হুসেনের সঙ্গে কোনও মনোমালিন্য হয়নি, কোনও মতবিরোধও হয়নি। বিট্টু মিয়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, ছেড়ে দিল কেন?

একরাশ বিরক্তি নিয়ে পিটার বলল, ওরা চারজন স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করতে চায়। আমাদের প্রফিট, গ্রোথ, এক্সপানশন সবই দেখছে। নিজেরাও দেখতে চায়। কিন্তু বোকাটা বুঝল না, সবার দ্বারা সব কিছু হয় না...

ওদের দ্বারা হবে নাই বা ধরে নিচ্ছিস কেন! আমরাও তো একদিন ওদের মতোই ছিলাম।

কিন্তু হুসেনের হাতের প্রজেক্টগুলো কী হবে? এত তাড়াতাড়ি নতুন...

বিট্টু পিটারকে থামিয়ে বলল, চিন্তা করছিস কেন? যদি কাউকে না পাওয়া যায়, আমি তা হলে প্রজেক্টটাতে লিড দেব।

পিটার অল্প ভরসা পেল। তবু চিন্তিত হয়ে বলল, আমি জানি। কিন্তু একটা প্রোজেক্ট লিডারের কাজে তোকে আটকে থাকলে হবে না প্রীতম। তোর জন্য আরও অনেক অনেক ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে। আমাদের কিছু একটা ভাবতে হবে। এভাবে দুম করে যদি কেউ পথে বসিয়ে ছেড়ে চলে যায়...

বিট্টু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল, আজকে একটা ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে দেখলাম ওখানকার এমপ্লয়িরা কী দারুণ চার্জড। মোটিভেটেড। শুধু পাউন্ড দেখিয়ে এমপ্লয়ি আটকে রাখা যাবে না।

পিটার কথাটাকে পাত্তা দিল না। হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া সংকটটা নিয়ে আলোচনা

করতে থাকল। এই আলোচনায় একসময় সকাল গড়িয়ে বিকেল হল এবং একসময় বিট্টু উপাসনার ফোনটা পেল।

স্যরি স্যার, আপনি সকালে এসেছিলেন, আমার খোঁজ করছিলেন...

উপাসনার গলাটা বিট্টুর ভাল লাগল। ক্ষণিকের আলাপে মনে গেঁথে থাকা মুখটা ভেসে উঠল।

আপনি মিশেলের কাছে যে ভিডিয়োটার খোঁজ করছিলেন সেটার নাম ম্যায়নে পেয়ার কিয়া। যে-গল্পটা সেদিন আপনাকে শোনালাম, বাই দ্য ওয়ে, আপনার পথের পাঁচালি কেমন লাগল?

বিট্টু গলাটা যথাসম্ভব অমায়িক করে বলল, আপনি দেখেছেন সিনেমাটা?

উপাসনার গলাটা এবার করুণ শোনাল।

দেখা হয়নি স্যার। সত্যজিৎ রে-এর অত নামকরা সিনেমা, এবার আমি ঠিক দেখে নেব স্যার...

আপনি আজ ক'টা পর্যন্ত আছেন?

ন'টা পর্যন্ত আছিই। আপনি আসবেন? আসুন না। আমি 'ম্যায়নে পিয়ার কিয়া'টা সরিয়ে রেখে দিচ্ছি। আরও অনেক সিনেমা আছে .. আজ আপনি প্রিমিয়ার মেম্বারশিপটা নিয়ে নিন স্যার।

বিট্টু গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, আপনার কি আমাব জন্য একটু সময় হবে?

নিশ্চয়ই, আমি সব সময় আছি আপনার জন্য।

আমরা কি কাছাকাছি কোথাও একটু কফি খেতে পারি?

উপাসনা এই আচমকা প্রস্তাবে চুপ করে গেল। এত অল্প আলাপেই এক কাস্টমার দুম করে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে! তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বিট্টু আর একটু সবিস্তারে বলার চেষ্টা করল, আপনাদের লাইব্রেরির চার-পাঁচটা বিল্ডিং পরে একটা ইতালিয়ান ক্যাফেটারিয়া আছে। আপনাকে আমি পথের পাঁচালির গল্পটা বলতে পারি। আর আপনি প্রিমিয়ার মেম্বারশিপের ফর্মটাও নিয়ে আসবেন, কফি খেতে খেতে ফিল-আপ করে দেব।

এরকম কোনও প্রস্তাব কোনওদিন কোনও কাস্টমার দেয়নি। একটু অবাক হলেও গল্পের টানে উপাসনা রাজি হয়ে গেল। তা ছাড়া প্রিমিয়ার মেম্বারশিপটাও। একটা করাতে পারলে দেড় পাউন্ড কমিশন।

ক্যাফেটারিয়াতে বসে দশ মিনিটের মধ্যে উপাসনা বুঝে ফেলল বিট্টু একজন অত্যন্ত মার্জিত যুবক। ছেলেটার যে অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই, সেটা নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে ফেলল। পথের পাঁচালির হরিহর রায়ের পরিবারের গল্পটা যে করুণ সেটা যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে বলছে ছেলেটা অথচ কোথাও কোনও নাটুকেপনা নেই। এই গোটা অভিজ্ঞতাটাই অন্য রকম উপাসনার কাছে। চিরটাকাল খদ্দেরদের সিনেমার গল্প বলে ক্যাসেট দেখতে আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেছে। মাইনে ছাড়া ক্যাসেট ভাড়া

পিছু আলাদা কমিশন আছে। খদ্দেরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য ক্যাসেট ফেরত নেওয়ার সময় জানতে চায় সিনেমাটা কেমন লেগেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও খদ্দের এভাবে কফিশপে নিয়ে এসে ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া সিনেমার গল্পটা কোনওদিন বলেনি। ছেলেটাকে ভাল করে জানা বোঝার আগেই তার এরকম প্রস্তাবে রাজি হতে ইতস্ততভাব এসেছিল ঠিকই, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতাটা খারাপ হচ্ছে না।

বিট্টু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে গল্পটা বলা শেষ করল। শেষের দিকটায় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল উপাসনা। সংবিৎ ফিরে বলল, স্যরি, ওই সোনার হারটা কী হল?

বিট্টু উপাসনার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি শুনছিলেন না, তাই না?

নাহ্, নাহ্, শুনছিলাম। হরিহর রায় গ্রামে ফিরে এলেন। এসে জানতে পারলেন দুর্গা মারা গেছে। তারপর ওঁরা ঠিক করলেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন...

এবার শেষটা একবার ভিডিও চালিয়ে দেখে নেবেন। আমার মনে হয় শেষটা আপনি বুঝে যাবেন। অবশ্য যদি আবার অন্যমনস্ক না হয়ে যান।

স্যরি মিস্টার সানিয়াল।

এই প্রথম বিট্টু উপাসনার সদাহাস্যময় মুখটা করুণ দেখল। নিজের গাম্ভীর্যটা ঝেড়ে বলল, আপনি আমাকে প্রীতম বলতে পারেন। নামটা আমার খুব পছন্দের।

একটু অস্বস্তি নিয়ে উপাসনা বলল, ঠিক আছে, প্রীতম।

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। পথের পাঁচালির গল্পও। দশ মিনিটের জায়গায় পঁচিশ মিনিট কেটে গেছে। যদিও লাইব্রেরি থেকে একদম ছুটি নিয়েই বেরিয়ে এসেছে তবুও এবার ফেরা দরকার। উপাসনা উঠে পড়ার ভঙ্গি করল।

ওকে প্রীতম। আপনি আসবেন। আমি আপনাকে বেছে বেছে খুব ভাল সিনেমা দেব।

কফির দাম মিটিয়ে বিট্টুও উঠে পড়ল। ক্যাফেটারিয়ার বাইরে এসে বিট্টু উপাসনাকে বলল, আপনি কি বাড়ি ফিরবেন এখন? আমি আপনাকে ড্রপ করে দিতে পারি।

উপাসনা মাথা নাড়ল।

ধন্যবাদ। আসলে আমার হাজবেন্ড আসবেন। আমরা রাতে একসঙ্গে ফিরি।

মার্জিত হলেও ছেলেটার চোখে মুগ্ধতাটা উপাসনার নজর এড়ায়নি। একটা চকিত দৃষ্টিতে বিবাহিত জেনে ছেলেটার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারল না উপাসনা।

বিট্টুর বাড়ি ফিরতে বেশ রাতই হল। দয়াল সান্যাল ঘুমিয়ে পড়েছেন। ডেভিও বেরিয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে লিভিংরুমে টেলিফোনের তলায় একটা ছোট্ট নোট পেল বিট্টু। ডেভি লিখে রেখেছে কলকাতা থেকে বীথি বক্সী তিনবার ফোন করেছিল।

বীথি আগে কখনও সরাসরি বিট্টুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করেনি। তবে সরোজ বক্সীকে ফোন করলে কখনও কখনও বীথি প্রথমে ফোনটা ধরলে বীথির সঙ্গে টুকটাক কথা হয়। আর আজকে একেবারে তিনবার? নিশ্চয়ই খুব জরুরি কিছু। কলকাতায় এখন ক'টা বাজে সেটা আর হিসেব না করেই সরোজ বক্সীর বাড়িতে ফোন করল বিট্টু।

বেশ অনেকগুলো রিং হয়ে যাওয়ার পর বীথি ধরল ফোনটা। ঘুম জড়ানো গলা। গম্ভীর গলায় বিট্টু জানতে চাইল, কী হয়েছে বীথি?

বীথি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গলায় ঘুমের রেশটা পুরো কাটিয়ে বলল, বিট্টুদা, তুমি এবার বাবাকে মুক্তি দিয়ে দাও।

কী হয়েছে বীথি? হোয়াটস রং?

বীথির গলায় ঝাঁঝটা আরও বেড়ে গেল, বাবা তো চিরটাকাল নিজের ফ্যামিলির চেয়েও তোমাদের ফ্যামিলির কথা বেশি ভেবেছে। চিরটাকাল নিজের ভেতর থেকে তোমার ভাল চেয়েছে। তোমার বাবা একটার পর একটা দায়িত্ব চাপিয়ে গেছেন, তারপর এখন তুমিও। বাবা তোমাকে ভালবাসে বলেই কি তোমাদের বাবাকে এক্সপ্লয়েট করতে হবে? হরিতলা কটন মিল নিয়ে তোমাদের কোনও দায় নেই, যত দায় আমার বাবার তাই না? কী অন্যায় করেছে আমার বাবা?

বীথির গলায় ক্রমশ আগুন ঝরছে। বিট্টু মৃদু ধমকে উঠল, বীথি তোমার মাথার ঠিক নেই এখন। সরোজকাকা কোথায়? সরোজকাকাকে দাও।

বীথি এবার ভেঙে পড়ল, বাবা হাসপাতালে। ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে আর সেটাও তোমার জন্য।

খবরটা শুনে এবং তার চেয়েও বেশি করে অভিযোগটা শুনে বিট্টু স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। তারপর একটু একটু করে বীথির মুখে জানতে থাকল হরিতলা কটন মিলের সাম্প্রতিক বৃত্তান্ত। ফোনে কারা যেন হুমকি দিচ্ছে। লক আউট হয়ে যাবে ভেবে অশ্লীল গালিগালাজ করছে। বোনাস না পেলে বীথিকে তুলে নিয়ে যাবে বলছে। সরোজ বক্সী এত সব কিছুই বলেননি। সমস্যাগুলো খুচরো সমস্যার মতোই বলতেন। বিট্টুও গুরুত্ব দিয়ে শুনত না। কোনও সমস্যা বোঝার চেষ্টা করত না। আজ সবটুকু শুনে শান্ত গলায় বীথিকে বোঝাতে থাকল, শোনো বীথি। সরোজকাকাকে ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাও। খরচের জন্য কিচ্ছু চিন্তা কোরো না। কাল সকালেই আমি টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

বীথির গলায় পুরনো অভিমানটা ফিরে এল।

থাক, এত সব কষ্ট তোমাকে করতে হবে না বিট্টুদা। আমাদের ক্ষমতায় যেটুকু কুলোবে...

এবার আরও জোরে ধমকে উঠল বিট্টু।

আঃ বীথি। ঠিক যা বলছি তাই করো। তুমি কী ভাবো জানি না, কিন্তু সরোজকাকা আমার জীবনে এক বিরাট মাপের মানুষ। প্রোবাবলি দেশে আমার ভরসা করার একমাত্র জায়গা।

ফোনটা ছেড়ে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকল বিট্টু। তারপর ফোন করল শীতল ভট্টাচার্যকে।

আপনি আমাকে স্পষ্ট করে জানান, এই মুহূর্তে হরিতলা কটন মিল সামলাতে ঠিক কত পাউন্ড দরকার আপনার?

পিটার খুব অবাক হল। পার্টনার হিসেবে বিট্টু নিবেদিতপ্রাণ। কোনওদিন লাভের অংশ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। নিজের সাধাসিধে জীবনযাপন এবং বাবার চিকিৎসার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি এক পাউন্ডও আশা করেনি কোম্পানির কাছ থেকে। এই জায়গাতে পিটারের সঙ্গে মনের খুব মিল। দু'জন মিলে লভ্যাংশের পুরোটাই ঢালে কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধিতে। সেই প্রীতমই কিনা সরাসরি আশি হাজার পাউন্ড চাইছে ব্যক্তিগত কাজের জন্য।

আশি হাজার পাউন্ড! আমাদের এই সময়ে এতটা পাউন্ড নিজের জন্য বের করে নেওয়া, অ্যামাউন্টটা কি খুব বেশি নয়, পিটার জানতে চাইল বিট্টুর কাছে।

হ্যাঁ বেশিই। স্পেশালি যখন দু'-এক মাসের মধ্যে আমরা বার্মিংহামে আমাদের নেক্সট ব্রাঞ্চ অফিস খুলব, তখন বেশিই। আমি মানছি। কিন্তু পিটার আমার কোনও উপায় নেই। আমাদের পারিবারিক কারখানাটা চালিয়ে রাখতে গেলে ওই অ্যামাউন্টটা আমার দরকার।

পিটার একটু চুপ করে থেকে বলল, তোদের ফ্যামিলি বিজনেস। আমার নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু একজন বন্ধু হিসেবে তোকে আমি একটা কথাই বলতে চাই। তোর বাবা অসুস্থ। খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে ওঁর যা অসুখ তাতে পুরোপুরি সেরে উঠে নিজের হাতে গড়া ব্যাবসাটা আবার ধরার আগে একটা প্রশ্নচিহ্ন আছে। আশা করি তুই কিছু মনে করছিস না। কিন্তু এটাই বাস্তব। বাস্তবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যেমন বাস্তব হচ্ছে তোর বাবার ব্যবসায় তোর কোনও আগ্রহ নেই। তোর ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন এখন সব 'বিটল্‌স সফট' নিয়ে। তাই হঠাৎ করে পারিবারিক ব্যাবসার জন্য...

বিট্টু উঠে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল। বাইরে প্রবহমান লন্ডন। প্রাণচঞ্চল। একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, আসলে কী জানিস তো, হৃদয়ের ডাক। মানুষ হৃদয়ের ডাককে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। বাবার ব্যাবসাটাই হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে অভিশাপ। ছেলেবেলা পাইনি। মাম্মিকে হারিয়েছি। ভেতরে ভেতরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়েছি। কিন্তু দিনের শেষে ব্যাবসাটাকে অস্বীকার করতে পারিনি। বাবা অসুস্থ। এই মেন্টাল স্টেটে বাবা বিশ্বাস করে আমি এখানে এমারসন সাহেবের কলেজে পড়াশুনো করি। পড়াশুনোটা শেষ হয়ে গেলেই আমি হরিতলা কটন মিলের হাল ধরব। বাবা বুঝুক না-বুঝুক এই মিথ্যে অভিনয়টা চালিয়ে যেতে আমার সত্যিকারের কষ্ট হয়। আর হরিতলা কটন মিলের কথা যদি বলিস, ওখানের প্রতিটা লোক জানে তাদের ভবিষ্যৎ বাবার ভাল হয়ে ওঠার ওপর নির্ভরশীল। আমার একটা বিশ্বাস আছে, ওদের আশীর্বাদটা উঠে গেলে বাবা আর কোনওদিনই ভাল হবে না। ব্যাবসাটার ব্যাপারে কোনওদিন কিছু চেষ্টা করিনি। একটা চেষ্টা করব। যদি সফল হই ভাল, না হলে ব্যাবসাটা অন্য লোকের হাতেই তুলে দিতে হবে। যারা আমাদের জন্য প্রাণপাত

করেছে, তাদের ভবিষ্যতের জন্য আমি ছিনিমিনি খেলতে পারি না, নিশ্চেষ্ট হয়েও বসে থাকতে পারি না।

পিটার নিজের ব্যাবসার অংশীদারের পাউন্ডের দাবিটা নিয়ে ভাবতে থাকল। নিজের ব্যাবসার অংশীদারের আবেগমথিত দাবির জন্য 'বিটল্ সফট'-এর বৃদ্ধির বেড়াজালকে কোনও যুক্তিতেই মেনে নিতে পারা যায় না। পাউন্ডের জোগান যদি বিট্টুর জন্য করতেই হয়, তার ব্যবস্থা করে দেবে কিন্তু সেটা কোনওমতেই নিজের ব্যাবসার স্বার্থের বিনিময়ে নয়। শান্ত গলায় বিট্টুকে সেটাই বোঝাতে লাগল পিটার।

ঠিক আছে, তোর পাউন্ডের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। কিন্তু তোর এই পাউন্ডটার সঙ্গে বিটল্স সফট-এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

মানে? বিট্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

আমি আমার ফ্যামিলি কানেকশনে পাউন্ডটা ধার হিসাবে তোকে জোগাড় করে দেব। কিন্তু আমার ফ্যামিলিকে আমি জানি। শোধ করার শর্ত থাকবে।

বিট্টু ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে বলল, আমি রাজি। থ্যাঙ্ক ইউ বন্ধু! আর একটা অনুমতি চাই তোর কাছে, আমি এক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় যাব।

ডেভির ওপর দয়াল সান্যালের ভার ছেড়ে পাঁচ বছর পর এক সপ্তাহের জন্য কলকাতায় এল বিট্টু। এয়ারপোর্টে কাস্টমস ক্লিয়ার করে বেরিয়ে এসে গেটের মুখেই বিট্টু দেখতে পেল শীতল ভট্টাচার্যকে। অল্প স্থূল, মাথার চুল খানিকটা হালকা আর বয়সের স্বাভাবিক ছাপ ছাড়া চেহারায় আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। একগোছা রজনীগন্ধা নিয়ে গদগদ মুখে দূর থেকে এগিয়ে আসতে থাকা বিট্টুর দিকে তাকিয়ে আছেন।

ওয়েলকাম টু ক্যালকাটা স্যার।

ঘন কাচের রোদচশমার পিছনে বিট্টুর চোখে অল্প কৌতুক ঝিলিক মারল। 'স্যার'! সম্বোধনে পূর্ণমর্যাদা। বিট্টুর স্পষ্ট মনে আছে কযেক বছর আগেও বিট্টুকে নাম ধরেই ডাকতেন শীতল ভট্টাচার্য। এমনকী সরোজ বক্সীর মতো কখনও নামের পিছনে বাবা বা ছোটবাবু বলতেন না।

লাগেজ ট্রলির একপাশে রজনীগন্ধার স্টিকগুলো অবহেলায় রেখে বিট্টু ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি আবার কষ্ট করে এলেন কেন?

শীতল ভট্টাচার্য প্রায় জিভ কাটা বাকি রেখে বললেন, ছি ছি স্যার! কষ্ট কী বলছেন। আপনি এতদিন পরে আসছেন। আর আমরা নিজের মানুষরা আসব না।

আবেগ ঝরিয়ে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলেও বিট্টু তার মধ্যে প্রাণ খুঁজে পেল না। শীতল ভট্টাচার্য বিট্টুর হাত থেকে ট্রলিটা নিতে চাইলেও বিট্টু উপেক্ষা করল।

শীতল ভট্টাচার্য যে-গাড়িটা নিয়ে বিট্টুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন, সেই গাড়িটা ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের। আশা করা যায় শীতল ভট্টাচার্য কোম্পানির শ্রেষ্ঠ গাড়িটা নিয়েই মালিককে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। কিন্তু গাড়িটার সর্বাঙ্গে চোট জর্জরিত চিহ্নগুলো দেখেই বিট্টু বুঝতে পারল কোম্পানিটার বর্তমান অবস্থা সত্যিই কীরকম।

গাড়িতে উঠে বসে চোখ থেকে রোদচশমাটা খুলে ভাঁজ করে পকেটে রেখে বিট্টু জানতে চাইল, সরোজকাকা কেমন আছেন?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিট্টু লক্ষ করল শীতল ভট্টাচার্যের মুখের অভিব্যক্তির কোনও পরিবর্তন হল না। খানিকটা দায়সারা গোছের বললেন, ভাল, মনে হচ্ছে এ-ধাক্কায় বেঁচে গেলেন। আইসিসিইউ থেকে জেনারেল বেডে দিয়েছে। ডাক্তাররা বলছিল আরও সপ্তাহখানেক হয়তো থাকতে হবে।

সপ্তাহখানেক কেন, যতদিন থাকতে হয় থাকুন। আপনি বীথিকে অযথা তাড়াহুড়ো করতে বারণ করবেন। আমিও বলব বীথিকে।

কলকাতার পথে সরোজ বক্সীর প্রসঙ্গ থেকে ক্রমশ ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যাবসার কথায় চলে এল। প্রকারান্তরে শীতল ভট্টাচার্য বোঝানোর চেষ্টা করলেন ব্যাবসা চালানোর ক্ষেত্রে সরোজ বক্সীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমাবদ্ধতায় কী নিদারুণ ক্ষতি হচ্ছে ব্যাবসাটায়। বিট্টুর এসব শুনতে বিরক্ত লাগছিল। বরং শীতল ভট্টাচার্যর কথা কানে না ঢুকিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিল পাঁচ বছরে কতটা বদলে গিয়েছে কলকাতা।

দয়াল সান্যালকে বিট্টু লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার পর, নিউ আলিপুরে সান্যালবাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন সরোজ বক্সী। এই সিদ্ধান্তটা অবশ্য বিট্টুর সঙ্গে পরামর্শ করেই নিয়েছিলেন। বিট্টুর ইচ্ছে ছিল কলকাতায় এসে নিজের বাড়িতেই ওঠে। সরোজ বক্সী সুস্থ থাকলে এই ইচ্ছেটা হয়তো সরোজ বক্সীকেই জানাত। কিন্তু শীতল ভট্টাচার্যকে ব্যাপারটা বলেনি। লন্ডন থেকেই কলকাতার এক হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে এসেছে।

গাড়িটার ভেতর নানারকম ঝনঝনানি আওয়াজ। ভিআইপি রোড দিয়ে যেতে যেতে শীতল ভট্টাচার্য দু'দিকে কলকাতা বর্ধিষ্ণুতার নতুন নতুন স্বাক্ষরগুলো বিট্টুকে দেখানোর চেষ্টা করছেন এবং কখনও কখনও প্রকারান্তরে ব্যাবসার কথা বলে খুব সূক্ষ্মভাবে সরোজ বক্সীর খামতির কথা বলার চেষ্টা করছেন। সরোজ বক্সী অসুস্থ এবং বর্তমানে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকের পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিয়ে ক্ষমতাবান মানুষ। শীতল ভট্টাচার্যের মনে একটা তীব্র আশা, এইবার অসুস্থ সরোজ বক্সীর থেকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তার ওপর হস্তান্তর হবে।

বিট্টু কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে চুপচাপ বাইরের দৃশ্য দেখছিল। এ শহরটার জন্য তার কোনও টান নেই, মায়া নেই। আর থাকবেই বা কী করে? এ শহরটাতে তো কোনওদিন সেভাবে থাকেইনি। যেটুকুও বা ছিল তার স্মৃতিগুলো খুব সুখকর নয়। বিধাননগর মোড় পেরোনোর পর বিট্টু তার প্রথম প্রতিক্রিয়া দিল।

একটা জিনিস নতুন দেখছি। কলকাতায় এরকম হলুদ হলুদ অটোরিকশা আগে দেখিনি।

ঠিক, বলেছেন স্যার। রোজ লাফিয়ে লাফিয়ে অটো বাড়ছে। ভাড়া অল্প বেশি। হরিতলায় তো ইউনিয়নের একটা ডিম্যান্ড রয়েছে রেলস্টেশন থেকে এবার মিলের গেট পর্যন্ত অটোয় যাতায়াত ভাড়া দিতে হবে। আমি সোজা বলে দিয়েছি, নো ওয়ে। এসব আবদার আমি বরদাস্ত করব না। সাইকেলের ব্যবস্থা যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

সাইকেলের ব্যবস্থা মানে?

সে স্যার বহুদিনের পুরনো ব্যবস্থা। বড়সাহেব একেবারে প্রথম দিক থেকেই এই ব্যবস্থাটা করেছিলেন। তখন তো কটন মিলটার ওদিকে কোনও বাসের রুট ছিল না। তো বড়সাহেব প্রচুর সাইকেল কিনেছিলেন। স্টেশনে অত সাইকেল রাখার আলাদা ব্যবস্থা ছিল। ট্রেন থেকে নেমে লোকেরা সেই সাইকেল নিয়ে মিলে গিয়ে ডিউটি ধরত আবার রিলিভাররা সেই সাইকেলগুলো নিয়েই মিল থেকে স্টেশনে চলে আসত। সারাদিন সাইকেলগুলো এইভাবে স্টেশন আর মিল যাতায়াত করত।

শীতল ভট্টাচার্য বারবার আড়চোখে বিট্টুর দিকে তাকাচ্ছিলেন। বিট্টু একমনে বাইরের দিকেই তাকিয়ে আছে। বিট্টুর চুপ করে থাকা দেখে শীতল ভট্টাচার্য ভাবলেন, এসব পুরনো দিনের কথা শুনতে বিট্টুর ভাল লাগছে। বহু দিন পরে বিদেশ থেকে ফিরলে মানুষ একটু স্মৃতিমেদুর হয়েই থাকে।

আসলে কী জানেন তো স্যার, বড়সাহেব একেবারে নিজের হাতে মিলটা গড়েছিলেন তো। আলাদা একটা কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলেছিলেন। আমি মাত্র একুশ বছর বয়সে মিলে ঢুকেছিলাম। দশ বছরের মধ্যে বড়সাহেব আমাকে ম্যানেজার করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ম্যানেজারই থেকে গেলাম। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি সারাজীবন একটা মিলেই কাজ করে কাটিয়ে গেলে কীভাবে? এর কি কোনও উত্তর হয়! নিজের জীবন আর কাজের জায়গাটাকে তো কোনওদিন আলাদা করে দেখিনি। সরোজবাবু আমার চেয়ে বয়সে বড়। তবু সরোজবাবুকে বারবার একটা কথাই বলি, ব্যবসায় চাপান-উতোর আছে, ওঠা-নামা আছে কিন্তু এই সংস্কৃতিটাই আসল, এটাই আমাদের আসল মূলধন। উনি অনেক সময় মানতে চান না...

বিট্টু মুখটা ঘুরিয়ে বলল, পেমেন্ট নিয়ে যে-সমস্যার কথাগুলো আপনি বলেছেন, যা যা হিসেব দিয়েছেন আপাতত পঞ্চাশ লাখ পেলে চলবে?

শীতল ভট্টাচার্যর মুখটা চকচক করে উঠল, পঞ্চাশ লাখ পেলে অনেকটাই সুবিধে হয় স্যার। র' স্টকটায় ইনভেস্ট করে নিতে পারলে ক্রেডিটে আরও দু'কোটির স্টক তুলে নিতে পারব। সব মিলিয়ে আড়াই কোটি। তবে আমার নিজের আর একটা এস্টিমেট করা আছে। চল্লিশ লাখ মতো আরও লাগবে মেশিনপত্তরগুলোর কিছু ওভারঅলিং-এর জন্য। সরোজবাবু তো নন-টেকনিক্যাল। এই ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে চান না। অবশ্য এটার টাকার জন্য আপনি চিন্তা করবেন না। আড়াই কোটির স্টকের এগেনস্টে আরও কিছু লোন এদিক-ওদিক থেকে জোগাড় হয়ে যাবে...

আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন। আপনি বলেছিলেন পুজোর আগে বোনাস দেওয়া না গেলে শ্রমিক অশান্তি হবে। বীথি বলছিল সরোজকাকাকে কারা যেন ফোনে গালিগালাজ করেছে। বীথিকেও উত্যক্ত করে মারছে।

একটা কথা বলব স্যার? সরোজবাবুর দোষ আছে। ফস করে চারদিকে বলে বেড়িয়েছে, টাকা নেই। মিল লকআউট করে দেবে। আমি সরোজবাবুকে বুঝিয়েছিলাম, বোনাসের আইনে আছে অ্যালোকেবল সারপ্লাস না থাকলে...

আমরা কিন্তু যতটুকু পারি বোনাস দেওয়ার চেষ্টা করে এসেছি এতদিন, তাই না? এর পরেও সরোজকাকাকে এরকম গালিগালাজ করা... আর বীথিকে? আমাদের কোম্পানির জন্য একটা মেয়েকে দিনের পর দিন অপমান করবে এটা তো আরও অন্যায়। আমাদের লজ্জা। কারা এটা করছে খুঁজে বার করুন মিস্টার ভট্টাচার্য।

ও আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। বীথি বলে আপনাকে বলেছে। আমার বউ মেয়েকেও ফোন করে কম গালিগালাজ করেছে নাকি। এসব আর কী বলব স্যার? এতগুলো পলিটিক্যাল পার্টির ইউনিয়ন। সবসময় কিছু না-কিছু অশান্তি, দাবিদাওয়া লেগেই আছে। এটা দেবেন তো ওটা চাই। ওটা দেবেন তো সেটা চাই। এর কোনও শেষ নেই। বোনাস তো পরে, আগে কোম্পানিটাকে তো বাঁচাই আমরা...

বিট্টু আবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাইরে বড় বড় হিন্দি সিনেমার হোর্ডিং। হোর্ডিংগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে উপাসনার কথা মনে পড়ছে। উপাসনার কথা মনে পড়লেই আজকাল ভেতরে একটা আরাম হয়। শীতল ভট্টাচার্যর মুখ বন্ধ করতে চোখ বুজে গাড়ির সিটে মাথাটা হেলিয়ে দিল।

হোটেলে বিট্টুকে নির্দিষ্ট ঘরে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেওয়ার আগে শীতল ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্যার কী কী প্রোগাম ঠিক করে রেখেছেন?

বিকেলে একবার সরোজকাকাকে হাসপাতালে দেখতে যাব।

ঠিক আছে স্যার। গাড়িটা আপনার সঙ্গে সবসময় থাকবে। আপনি কবে অফিসে আসবেন স্যার?

ঠিক করিনি। জানাব আপনাকে। কাল কিংবা পরশু...

আর হরিতলায় কবে যাবেন?

বিট্টু একটু চুপ করে থেকে বলল, হরিতলায় যাব কিনা ঠিক করিনি...

সেই ভাল স্যার। অহেতুক বিক্ষোভ টিক্ষোভের মধ্যে পড়ে...

আমাদের বাড়িটার এখন কী অবস্থা মিস্টার ভট্টাচার্য?

শীতল ভট্টাচার্য গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললেন, এখন তো তালাবন্ধই পড়ে আছে। সরোজবাবু মাঝে মাঝে তালা খুলে দেখতে যান। শুনেছি অব্যবহারের ফলে...।

চাবি কি সরোজকাকার কাছেই আছে?

ওঁর কাছে আছে। তবে ডুপলিকেট সেট অফিসে গালা দিয়ে সিল করা আছে। আলমারির চাবিটাবিগুলো অবশ্য সরোজবাবু বাড়িতে নিজের কাছেই রেখেছেন। আমিই সরোজবাবুকে বলেছিলাম...

বাড়িতে একবার যাব। দেখব যদি বাবার কিছু ছোটখাটো জিনিস নিয়ে যাওয়া যায়।

বিট্টুর শেষ কথাগুলো ঠিকমতন বুঝতে পারলেন না শীতল ভট্টাচার্য।

কলকাতায় এখন একটা-দুটো করে আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল হয়েছে। বিট্টু বারবার বীথিকে বলেছিল সরোজ বক্সীকে কলকাতার সবচেয়ে ভাল হাসপাতালে ভরতি করিয়ে

চিকিৎসা করাতে। খরচের চিন্তা না করতে। তবু বীথি নিজের জেদে অবিচল ছিল। এক অতি সাধারণ বেসরকারি হাসপাতালে এনে ভরতি করেছে।

এই হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ার্সে রোগীকে দেখতে গেলে ভিজিটিং কার্ডের কড়া অনুশাসন নেই। রিসেপশনে সরোজ বক্সীর কেবিনের নম্বরটা জেনে বিকেলে বিট্টু সোজা এসে হাজির হল সরোজ বক্সীর সামনে।

প্রথম চোটেই বিট্টুর চোখ ধাক্কা খেল। বিছানায় যে-মানুষটা শুয়ে আছেন তাঁর সঙ্গে পাঁচ বছর আগের মানুষটার কোনও মিল নেই। বার্ধক্য যেন সরোজ বক্সীকে পূর্ণগ্রাস করে নিয়েছে। মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। চামড়া শিথিল হয়ে গেছে। ঋজু শরীরটা কঙ্কালসার। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অবসন্ন চোখ দুটোর তলায় কালি। এক ঝটকায় মানুষটা চেনা মনেই হয় না। আর তার পাশে টুলে বসে থাকা এক পূর্ণ যুবতী। লাবণ্য উপচে পড়ছে। সেও যেন অচেনা। শুধু চোখ দুটোয় পূর্বপরিচয়ের চিহ্ন রয়েছে।

বিট্টু যে কলকাতায় আসবে তার দিনক্ষণ বীথি বা সরোজ বক্সীর কারও কাছেই ছিল না। শীতল ভট্টাচার্য বিট্টুর কলকাতায় আসার দিনক্ষণ সব জানতেন, কিন্তু খবরটুকু সরোজ বক্সীকে দিতে আসার প্রয়োজন বোধ করেননি। আসলে দায়সারাভাবে দু'-একবার সরোজ বক্সীকে দেখতে আসা ছাড়া সরোজ বক্সীর চিকিৎসার কোনও দায়িত্বই নেননি শীতল ভট্টাচার্য। এবং সেটা লন্ডন থেকে বিট্টু অনুরোধ করার পরও। বিট্টুকে শুধু জানিয়ে দিয়েছেন সরোজ বক্সীর চিকিৎসার ব্যাপারে বীথি কোনও সাহায্য নিচ্ছে না।

বীথি অবাক হয়ে দেখছিল বিট্টুকে। সেদিন যখন বিট্টু ফোন করে বাবার খবর নিয়ে বলেছিল, তুমি চিন্তা কোরো না বীথি। হরিতলা কটন মিল যদি সরোজকাকাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে থাকে, তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। একটা ব্যবস্থা করব। তখনও বীথির শরীরের রক্তের প্রতিটা বিন্দু ফুটছিল। একসময় মাথায় আগুনের আঁচ নিয়ে বলেছিল, কী করবে বিট্টুদা তুমি কলকাতায় এসে? তোমাদের কোম্পানির কথা যতটা জানি সব তো বলেছি। কিচ্ছু করতে পারবে না তুমি। এর পর তুমি এলে আবার বাবার...

সেদিন বিট্টু কোনও উত্তর দেয়নি। অস্থিরভাবে পায়চারি করেছে। তবে আসল উত্তরটা আজই দিয়েছে। সত্যি সত্যি এসে হাজির হয়েছে সরোজ বক্সীর হাসপাতালের বেডের পাশে।

বিট্টু একটা পোশাকি সৌজন্যের হাসি ছাড়া বীথির দিকে আর একবারও তাকায়নি। এটা কি বীথিকে অবজ্ঞা নাকি সেদিন ফোনে কড়া কথাগুলো বলার জন্য খুব রেগে আছে? বিট্টুর সঙ্গে তো ওভাবে কখনও কথা বলেনি বীথি। বীথি যেদিকে টুলে বসে ছিল তার অন্য দিকে দাঁড়িয়ে সরোজ বক্সীর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বিট্টু বলল, কেমন আছেন কাকা?

সরোজ বক্সী চোখ মেলে চাইলেন। এই অসুস্থ শরীরে মনে হল সামনে মালিক এসে দাঁড়িয়েছেন। ছোট মালিক যে আসছেন, সেটা বীথি জানিয়েছিল। প্রথমে বিশ্বাস

হয়নি। তারপরে একটা ভাললাগায় ভরে গিয়েছিল বুকের ভেতরটা। সুদূর লন্ডন থেকে মালিক উড়ে এসেছে শুধু ওঁকে দেখার জন্যই। বয়সে যতই ছোট হোক, যতই এককালে কোলে-পিঠে নিয়ে থাকুন, মালিক মালিকই। মনে হল তার সামনে আস্পর্ধা নিয়ে তিনি শুয়ে আছেন। শরীরের মধ্যে যেন ছোট্ট একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। অশক্ত শরীরেই একটু ওঠার চেষ্টা করলেন। খানিকটা বিহ্বল হয়ে সরোজ বক্সী প্রথমেই জানতে চাইলেন, বড়সাহেব কেমন আছেন?

ভাল। বাবা একদম ভাল আছে। আপনি কেমন আছেন কাকা?

কেবিনটাতে একটাই মাত্র বসার টুল। বীথি উঠে দাঁড়িয়ে টুলটা বিট্টুর দিকে এগিয়ে বলল, তুমি বসো না বিট্টুদা...

না... না, তুমি বসো।

বীথি তবুও পীড়াপীড়ি করতে থাকল। বিট্টু বীথির কাঁধ দুটো শক্ত করে চেপে ধরে ওকে টুলের ওপর বসিয়ে দিল।

সাড়ে সাত ঘণ্টা বসে বসে ফ্লাই করে এসে এখন দাঁড়িয়ে থাকতেই কম্ফর্টেবল লাগছে।

সরোজ বক্সী অস্বস্তি নিয়ে বললেন, দেখো তো বীথির কাণ্ড। শুধু শুধু তোমাকে কী কী সব বলে টেনে আনল। তুমি আজকাল কত ব্যস্ত মানুষ।

বিট্টু একবার আড়চোখে বীথিকে দেখে বলল, এলাম। অনেকদিন আসা হয়নি। তার ওপর আপনি একটা খুব খারাপ সুযোগ করে দিলেন...

বীথির ভেতরেও একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। বিট্টুর কথা শুনে লজ্জায় কানও গরম হল। সরোজ বক্সী চিন্তিত হয়ে বললেন, তুমি চলে এলে বড়সাহেবের কাছে এখন কে আছে?

ডেভিকে এই ক'দিন আমাদের বাড়িতে থাকতে রাজি করিয়ে এসেছি।

ডেভির কথা সরোজ বক্সী শুনেছেন। বিট্টু ফোনে ওর আন্তরিক যত্ন-আত্তির প্রশংসা করেছে। ছোটখাটো কথাবার্তার মধ্যেই সরোজ বক্সী খোঁজখবর করলেন বিট্টু কোথায় এসে উঠেছে, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি।

আপনি কাকা একটুও বদলাননি। আমাকে এখনও সেই ছোট্ট বিট্টুই ভাবেন। ভুলে যাচ্ছেন, আমিও এখন একটা মস্ত ব্যাবসার মালিক। সামনের মাসে লন্ডন ছাড়িয়ে বার্মিংহামে আমাদের পরের অফিসটা খুলছে।

সরোজ বক্সীর ভেতরটা একটা নির্মল ঠান্ডায় শান্ত হল। হাতটা অল্প তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন, তুমি অনেক অনেক বড় হও বিট্টুবাবা।

আবেগে ভেতর থেকে যেন যামিনী ভট্টাচার্য বলে উঠলেন—

পৃথিবীতে থেকে যারা সমজ্ঞানী হয়।
তাহারাই জয় করে সংসার নিশ্চয় ॥

বিট্টুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

আপনি তো দারুণ ছড়া বলেন কাকা!

ইদানীংকালে এরকম হয়। যখন তখন যামিনী ভট্টাচার্য কথা ফুটিয়ে দেন ঠোঁটে।

সরোজ বক্সী লজ্জা পেলেন। অস্বস্তি কাটাতে সাধারণ কয়েকটা কথা বলে বলার চেষ্টা করলেন, তোমাকে আমি ব্যাবসার অনেক সমস্যার কথা বলেছি বিট্টুবাবা। কিন্তু তুমি এখনই সব সমস্যার মধ্যে ঢুকতে যেয়ো না...

সরোজ বক্সী আরও বলতে যাওয়ার আগে বিট্টু সরোজ বক্সীকে চুপ করিয়ে দিল।

এসব কথা এখন থাক কাকা।

৮৫

ভিজিটিং আওয়ার্সের পর বীথি আর বিট্টু একসঙ্গেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। সৌজন্যবশত বীথি বিট্টুকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। বিট্টু জিজ্ঞেস করল, তুমি কীভাবে ফিরবে?

আমি... আমি রোজ যেমন করে ফিরি। এখান থেকে সোজা বাস পেয়ে যাব।

বিট্টুর গাড়ির দরজাটা খুলে ভেতরটা দেখিয়ে বলল, উঠে পড়ো। আমি তোমাকে ড্রপ করে দিচ্ছি।

বীথি আপত্তি করল, না... না... এখান থেকে একটুখানি। তোমাকে ঘুরে যেতে হবে।

বিট্টু আপত্তিটা আমল না দিয়ে মৃদু ধমকে উঠল, কিচ্ছু দেরি হবে না। আর আমার এখন তাড়াটাই বা কী আছে। কাম অন... গেট ইন।

বীথি বিট্টুর নাছোড়বান্দা মনোভাবটা বুঝতে পেরে একটু ইতস্তত করে গাড়িতে উঠেই পড়ল। গাড়িটা চলতে আরম্ভ করলে বিট্টু হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, ইস তোমার জন্য কিছু চকোলেট আর ক্যান্ডি এনেছিলাম। একদম সঙ্গে করে আনতে ভুলে গেলাম।

বীথি আবার লজ্জা পেয়ে বলল, ওমা, আমি কি বাচ্চা মেয়ে নাকি, তুমি আমার জন্য চকোলেট এনেছ!

বিট্টু গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিকই তো, তোমার জন্য আমার অন্য কিছু আনা উচিত ছিল। বড়দের জিনিস।

বীথির লজ্জাটা আরও বেড়ে গেল।

এমা! আমি তাই বলেছি নাকি? তোমার কিছু আনারই দরকার...

বিট্টু এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল, তুমি সত্যিই একটা বাচ্চা মেয়ে। খুকি মেয়ে। আই ওয়াজ জাস্ট জোকিং। চকোলেট খাওয়ার কোনও বয়স আছে নাকি?

ড্রাইভার যোগিন্দর লুকিং গ্লাস দিয়ে বিট্টুকে আর বীথিকে বারবার দেখছিল। ছোটেমালিককে এই প্রথম দেখছে। মালিক পরিবারের যা গল্প এতদিন শুনে এসেছে, তার সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে চিন্তা করল, ছোটেমালিক রইস আদমি। সকালবেলা যখন এয়ারপোর্ট থেকে আনতে গিয়েছিল, সারাটা রাস্তায় ছোটেমালিককে কেমন উদাস

উদাস গম্ভীর দেখেছিল। বেশির ভাগ রাস্তাটাই শীতল ভট্টাচার্যর কোনও কথা না শুনে গম্ভীর মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন সেই ছোটেমালিকের অন্য রূপ। সরোজ বক্সীর তাজা মেয়েটাকে নিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে। আবার চকোলেট দেওয়ার কথা বলছে। ছোটেমালিক নিশ্চয়ই জানে সরোজ বক্সীর বাড়িটা এখন একদম ফাঁকা। তার মানেই...

একটা মিনিবাস খুব জোরে গাড়িটার গা চেপে চলে গেল। আর একচুল হলেই গাড়ির বাঁদিকটা ঘষে যেত। আনমনা ভাবটা কাটিয়ে সন্ধের ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে এবার সাবধানে গাড়িটাকে চালাতে থাকল যোগিন্দর। চিৎপুর রোডটা ওয়ান ওয়ে। সরোজ বক্সীর বাড়িতে পৌঁছোতে গেলে ঘুরে রাস্তাটা ধরতে হবে।

সরোজ বক্সীর বাড়ির মুখের গলিটার কাছে ট্রামলাইন বাঁচিয়ে রাস্তার এক দিকে পার্ক করল যোগিন্দার। প্রত্যাশামতোই বীথি বলল, এসো বিট্টুদা।

বীথির পিছন পিছন বিট্টু গাড়ি থেকে নেমে চারদিকটা দেখতে দেখতে বলল, জায়গাটা একটুও বদলায়নি। সেই একইরকম আছে। কাঁসা-পেতলের দোকানটা, চুড়ির দোকানগুলো...

বীথি চুপ করে গেল। বীথি জানে বিট্টু এর আগে মাত্র একবারই এসেছে ওদের বাড়িতে। সেই স্মৃতিটা একেবারেই সুখের নয়। নিজের মায়ের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে ওদের বাড়িতে এসে কাছা পরেছিল। নিচু গলায় বীথি আবার বিট্টুকে ডাকল, এসে বিট্টুদা।

তুমি আমাকে একটা হেল্প করবে বীথি?

বলো...

বিট্টু রাস্তার একধারে চুড়ির দোকানটা দেখিয়ে বলল, আমাকে কিছু চুড়ি কিনে দিতে সাহায্য করবে?

বীথি একটু অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করল না। বিট্টু সেটা বুঝতে পেরে বলল, আসলে কিছু গিফ্‌ট কেনার ছিল। এদিকে যখন এলামই...

বীথি একটা দোকানের কাছে এগিয়ে এল। দোকানদার বীথির পরিচিত। বীথি জিজ্ঞেস করল, তুমি কীরকম চুড়ি নেবে বিট্টুদা?

বিট্টু আঙুল তুলে কিছু সাদা আর লাল চুড়ি দেখিয়ে বলল, ওই রেড আর হোয়াইট ব্যাঙ্গলসগুলো...

ওগুলো হল শাঁখা আর পলা। এয়োরা পড়ে...

এয়ো মানে?

মানে বিবাহিত মেয়েরা।

বিট্টু তির্যক হেসে বলল, অ্যাজ আ মার্ক অফ ম্যারেজ? আই গেসড অ্যাজ মাচ। অ্যাকচুয়ালি আমি যার জন্য কিনছি, আ সুইট লেডি... শি ইজ ম্যারেড।

কে সে? বিট্টুদা কি বিয়ে করে ফেলেছে? করে ফেললে এত বড় খবরটা বাবাকে অন্তত বলত। নাকি ওদেশে বিয়ে না করে একসঙ্গে যেমন থাকে, সেরকমই কারও সঙ্গে থাকে বিট্টুদা? ভেতরে একটা অদম্য কৌতূহল হলেও সেটা ভেতরে চেপে রেখে বীথি

মন দিয়ে বিট্টুকে দেখতে থাকল। একমনে নিষ্ঠার সঙ্গে শাঁখা-পলা বেছে চলেছে। শাঁখা-পলা কেনা হয়ে গেলে বীথি আবার নিজেদের গলিটা দেখিয়ে বলল, এসো...

বিট্টু এবার বীথির কাঁধে নরম করে হাতটা রেখে বলল, আজ নয়, প্লিজ, সাম আদার ডে...

বীথি বিস্মিত হল, সে কী! তুমি তো বলছিলে আর কোনও কাজ নেই?

ঠিকই। কিন্তু আজ ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। এখন তো ক'দিন আছি। সরোজকাকাকে তো রোজ দেখতে আসব। আর একদিন আসব। কিছু মনে কোরো না...

যোগিন্দরকে ভুল প্রমাণ করে গাড়িতে উঠে বসল বিট্টু।

পরেরদিন শীতল ভট্টাচার্য সকাল সকালই বিট্টুর হোটেলে চলে এলেন। বিট্টু তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে। শীতল ভট্টাচার্যকে রিসেপশনে অপেক্ষা করতে বলে লন্ডনে বাড়িতে ফোন করল। বাবার খোঁজখবর করতে স্বভাবগম্ভীর ডেভি বলল, সবে তো দু'দিন হল। এখনও সেরকম কমপ্লেন কিছু নেই। লক্ষ্মীছেলে হয়েই আছেন মিস্টার সানিয়াল।

বিট্টু নিশ্চিন্ত হল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করে কলকাতা চলে এসেছে। আসার আগে বাবাকে বহুক্ষণ বুঝিয়েছে। যে ক'দিন সে থাকবে না, ডেভি থাকবে সবসময়ের জন্য। বাবা যেন শান্ত হয়ে থাকে। ডেভির কথা শোনে। ডেভির কথা শুনে নিশ্চিন্ত হল বিট্টু। আপাতত বাবার ব্যাপারে কোনও চিন্তা নেই। নিজের সময় নিয়ে তৈরি হয়ে হোটেলের রেস্তোরাঁতে ব্রেকফাস্ট করতে এল। ভদ্রতার খাতিরে শীতল ভট্টাচার্যকেও ডেকে নিল ব্রেকফাস্ট টেবিলে।

আপনার রাতে ঠিকঠাক ঘুম হয়েছিল তো স্যার?

বিট্টু মেনুকার্ডের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, আপনার জন্য কী বলব?

না... না... আমি খেয়ে একদম অফিস বেরোনোর জন্য রেডি হয়ে এসেছি। একদম সকাল সকাল না পৌঁছোতে পারলে অনেক কাজই ভালভাবে শুরু করা যায় না। আমি সরোজবাবুকে সেইজন্য বলি, আপনিও অফিসে একদম সকাল সকাল চলে আসুন...

বিট্টু শীতল ভট্টাচার্যর দিকে না তাকিয়ে পাশে দাঁড়ানো ওয়েটারকে খাবারের অর্ডার দিতে থাকল। সব শেষে একদম তাচ্ছিল্যের মতো শীতল ভট্টাচার্যর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার জন্য কী বলব চা না কফি?

শীতল ভট্টাচার্য আগেই কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। মেয়ানো গলায় বললেন, চা... চা-ই ভাল।

ওয়েটার চলে যাওয়ার পর বিট্টু শীতল ভট্টাচার্যকে বলল, বাড়ির চাবিটা নিয়ে এসেছেন মিস্টার ভট্টাচার্য?

আমি কালকেই ব্যবস্থা করে দিয়েছি স্যার। দুটো লোক কাল থেকেই ঝাড়ামোছার কাজ করছে। আজ সকালে একজন প্লামবার আর ইলেকট্রিশিয়ান যাবে। দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা একদম অর্ডারে নিয়ে আসবে। এমনিতে বাড়িতে একজন দারোয়ান ওর ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। কিন্তু আমিই সরোজবাবুকে বারণ করেছিলাম ওর কাছে ভেতরের ঘরের চাবিটাবিগুলো দিতে...

আমি আজ রাতে বাড়িতে থাকব।

বাড়িতে... বাড়িতে কি থাকতে পারবেন স্যার?

নিজের বাড়িতে থাকতে পারা যায় না বলে কোনওদিন তো শুনিনি মিস্টার ভট্টাচার্য।

না, আমি সে কথা বলছি না। আসলে, এতদিন তো বাড়িটা বন্ধ পড়ে আছে... আমি ভাবছিলাম আপনি একটু ঘুরে আসবেন, কিন্তু রাত্রে থাকা...

কেন আপনি তো বললেন দুপুরের মধ্যে সব অর্ডারে চলে আসবে...

না মানে স্যার... দরজা-টরজাগুলোর চাবিগুলো অফিসে থাকলেও আলমারির চাবিগুলো বোধহয় সরোজবাবুর কাছেই রয়ে গেছে...

আমার আলমারির দরকার নেই।

শীতল ভট্টাচার্য কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেলেন। অনুমান করতে পারছেন ওর প্রতি বিট্টু ক্রমশ রুক্ষ হচ্ছে। ব্যাবসা, বাড়ির কথা ছেড়ে এবার তাই দেশের খবরে মন দিলেন।

রাজীব গাঁধী ওভাবে মারা যাওয়ার পর নরসিমা রাও...

বিট্টুর খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর শীতল ভট্টাচার্য তাঁর মনের একান্ত বাসনাটা প্রকাশ করেই ফেললেন, আজ সকালে একবার অফিসে চলুন না স্যার। এতদিন পরে আপনাকে দেখে সবাই খুব খুশি হবে।

আমি হোটেল থেকে কয়েকজন কলকাতার লিডিং হার্ট স্পেশালিস্টের নাম, ফোন নম্বর জোগাড় করেছি। আপনাকে নামগুলো দিচ্ছি। দেখুন কে সময় করে হাসপাতালে গিয়ে সরোজকাকাকে দেখে আসতে পারেন।

হ্যাঁ স্যার, ব্যবস্থা হয়ে যাবে...

এই ব্যবস্থাটা আপনাদের আগেই ভাবা উচিত ছিল।

চেয়েছিলাম তো স্যার। কিন্তু সরোজবাবুর মেয়ে... আপনি অফিসে চলুন স্যার। অফিস থেকে সব যোগাযোগ করে দিচ্ছি।

শীতল ভট্টাচার্যের মধ্যে যে একটা চাপা টেনশন আছে সেটা বিট্টুর নজর এড়াল না। শুধু সরোজ বক্সীর জন্যই কলকাতায় আসা নয়, ব্যাবসার জন্যও আসা। বিট্টুর মনে একটা ক্ষীণ আশা আছে বাবার ভাল হয়ে ওঠা নিয়ে। সেই দিনটার জন্যই ব্যাবসাটাকে বাঁচিয়ে রাখা। সারা জীবনে তিলতিল করে ব্যাবসাটা গড়ে তুলেছেন, সুস্থ হয়ে যেন না দেখতে হয় সেটা চুরমার হয়ে গেছে। তা ছাড়া শীতল ভট্টাচার্যই বা এত পীড়াপীড়ি করছেন কেন বোঝা দরকার।

যে-অফিসটাকে একটা বয়সে বেশ আধুনিক কাজের জায়গা মনে হত পরিণত বয়স আর বিদেশি অভিজ্ঞতায় নিজেদের সেই অফিসটাকেই বেশ পুরনো মনে হল বিট্টুর। সেই পুরনো দিনের খটখট করে আওয়াজ তোলা টাইপরাইটার, কাঠের চেয়ারটেবিল, টেবিলের ওপর গাদা গাদা দড়ি বাঁধা ফাইল, সবই প্রাচীনতার সাক্ষ্য বইছে। কর্মচারীদের মুখগুলোও এক, শুধু বয়সের তুলির টান পড়েছে তাতে।

শীতল ভট্টাচার্য যেমন বলেছিলেন, কর্মচারীদের মধ্যে সেই উদ্দীপনা দূরে থাক যথেষ্ট উষ্ণ অভ্যর্থনাও দেখতে পেল না বিট্টু। সবার মধ্যেই যেন একটু এড়িয়ে চলার মনোভাব। দু'-একজনের কাছে এগিয়ে কথা বলতে গিয়ে এটা আরও ভালরকম বুঝতে পারল বিট্টু। তারপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এল দয়াল সান্যালের চেম্বারে। মনে পড়ে গেল লন্ডনে ডাক্তার ব্রাউনের কথা। উনি বলেছিলেন বাবার ব্যবহার করা জিনিসপত্তর যদি কিছু জোগাড় করা যায়। বড় টেবিলটার দু'পাশের সার দেওয়া ড্রয়ারগুলো খুলে খুলে সেরকমই টুকিটাকি জিনিসগুলো বাছতে থাকল বিট্টু। পেন, পেপারওয়েট, ছুরি, কোম্পানির প্যাড ইত্যাদি।

শীতল ভট্টাচার্য যে কেন বিট্টুকে পীড়াপীড়ি করছিলেন অফিসে আসার জন্য তার কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারল বিট্টু। শীতল ভট্টাচার্য হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, স্যার, বিনয় আগরওয়াল আর অভয় আগরওয়াল বলে দু'জন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

বিট্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কে ওরা? আমি এসেছিই বা জানল কী করে? কী চায়?

এতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিট্টুর অনুমতি না নিয়েই উলটোদিকের চেয়ারে বসে পড়লেন শীতল ভট্টাচার্য।

আসলে স্যার কালকে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল না,... আপনি পঞ্চাশ লাখ দিলে আরও দু'কোটি জোগাড় হয়ে যাবে প্লাস রেনোভেশনের ষাট লাখ। ব্যাঙ্ক থেকে তো অত পাওয়া যাবে না, এরা স্যার আমাদের সাপ্লায়ার। আবার প্রাইভেট মানি লেন্ডারও। তবে এদের সুদের রেট বাজারের চেয়ে অনেক কম।

বিট্টু কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। শীতল ভট্টাচার্য কী চায় বোঝা দরকার। এই দেখা করতে আসা লোক দু'জনের সঙ্গে কথা বললে হয়তো তার একটা আভাস পাওয়া যাবে। বিট্টুর সম্মতি পাওয়ার পর শীতল ভট্টাচার্য নিজে গেলেন ওদের আপ্যায়ন করে বিট্টুর কাছে নিয়ে আসার জন্য।

বিনয় আর অভয় আগরওয়ালকে খুঁটিয়ে লক্ষ করল বিট্টু। দু'জনেই হাফ হাতা সাফারি সুট পরে রয়েছে। বিনয়কে দেখে মনে হচ্ছে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। ঘিয়ে রঙের সাফারি, খোলা গলাটার ভেতরে মোটা সোনার চেন উঁকি মারছে। অভয়ের বয়স বছর দশেক কম। মুখের আদলে বিনয়ের সঙ্গে বেশ মিল। দু'জনেরই একটা বিনয়ী ভাব। মুখে একটা অমায়িক হাসি লেগেই রয়েছে। চেয়ারে বসে হাতজোড় করে নমস্কার করে বিনয় বললেন, সানিয়াল সাব, আপনাদের সঙ্গে কিন্তু আমাদের বহুত পুরানা বিজনেস রিলেশন।

শীতল ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করলেন, আমাদের বহু পুরনো র'কটন সাপ্লায়ার। বড়সাহেবের খুব ভরসার লোক আগরওয়াল ভাইরা। আমাদের অনেক বিপদের সময় উদ্ধার করেছেন।

বিনয় টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে বললেন, আগে বলেন, কেমন আছেন আমাদের বড়া সানিয়াল সাব?

বিট্টু ছোট্ট করে উত্তর দিল, ভাল।

খুব ভাল। খুব ভাল। সানিয়াল সাবের যবে থেকে তবিয়ত খারাপ হচ্ছিল, আমি তো প্রথম থেকেই বলছিলাম সরোজবাবুকে, লন্ডনে নিয়ে যান। ওঁর যখন এত সুবিধা আছে, আপনার মতো হিরা লড়কা আছে, ওখানে ট্রিটমেন্ট করান। তা এখন ওঁর মেমারি কাজ করছে তো?

বিট্টুর বাবার শরীরের ব্যাপারে খোঁজখবর দিতে বিরক্ত লাগছিল। দায়সারাভাবে উত্তর দিল, ইম্প্রুভিং।

বিনয় চেয়ারে আয়েশ করে বসে বলতে থাকলেন, একবার কী হল জানেন তো? আমাকে এক লাখ বিশ হাজার ক্যাশ দিলেন নিজের হাতে। আর দশ মিনিট পরেই বিলকুল ভুলে গেলেন। আমাকে বললেন বিনয়জি আপনার রুপায়াটা কোথায় যে রাখলাম। ড্রয়ারগুলো খুঁজতে লাগলেন। এই ঘরে।

অভয় দাদাকে আর একটা ঘটনা মনে করানোর চেষ্টা করল, আওর একবার ভাইয়া...

বিনয় হাত তুলে অভয়কে থামিয়ে দিলেন।

তো, চার সাল তো হয়ে গেল বড়া সানিয়াল সাহেব লন্ডনে। কবে ফিরবেন?

বিট্টু এবার কঠিন মুখ করে বলল, এখনও কিছু ভাবিনি। এদিকে তো কিছু অসুবিধা হচ্ছে না। মিস্টার বক্সী, মিস্টার ভট্টাচার্য তো ঠিকই চালাচ্ছেন এখানে।

আওর আপনি? আপনি দেখবেন না এই বিজনেস?

এই আচম্বিত প্রশ্নটার জন্য বিট্টু প্রস্তুত ছিল না। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে, দেখছি বলেই তো এই অফিসে এসে এখন বসেছি।

বিনয় একটা অর্থপূর্ণ হাসলেন।

আমি ভি খবর রাখি সানিয়ালসাব। আপনার এখন নিজেরও একটা বিজনেস আছে লন্ডনে। কম্পিউটারের বিজনেস। আমাদেরও রিলেটিভ আছে লন্ডনে। আমার ভানজা, গজেন্দ্র। সে বলছিল কম্পিউটারের বিজনেস এখন খুব ভাল বিজনেস। বহুত পয়সা।

বিট্টু শীতল ভট্টাচার্যর দিকে তাকাল। অনুমান করার চেষ্টা করল ওর সম্পর্কে আর কী কী তথ্য দিয়ে রেখেছেন। লোক দুটো যে নেহাত সৌজন্য সাক্ষাৎকার করতে আসেনি সেটা বুঝতে পেরেছে। তবে বিট্টুও যে এখন একটা ব্যাবসা চালায় এবং সেটা যে নেহাত দুগ্ধপোষ্য শিশুর অভিজ্ঞতা নয় সেটা বোঝাতে শীতল ভট্টাচার্যকে বলল, উইল ইউ প্লিজ এক্সকিউজ আস ফর সাম টাইম মিস্টার ভট্টাচার্য।

শীতল ভট্টাচার্য এটা আশা করেননি। একটু অপমানিতই বোধ করলেন। তবে তার অভিব্যক্তিটা মুখে না ফুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। শীতল ভট্টাচার্য বেরিয়ে যেতেই বিনয় মুখে অমায়িক হাসিটা ছড়িয়ে বললেন, আপ বিলকুল সহি কিয়া। কুছ বাত এয়সা হোতা যো নওকরকে সামনে...

লেটস টক বিজনেস মিস্টার আগরওয়াল।

বিনয় এবার গম্ভীর হলেন। গলাটা পরিষ্কার করে বললেন, আপনার কোনও ধারণা আছে সানিয়ালসাব আপনাদের এই বিজনেসটা কেমন চলছে এখন? দ্য রিয়েল পিকচার?

খুব একটা ভাল নয়।

আপনি ইনটেলিজেন্ট আছেন। কিন্তু ব্যালান্সশিট দেখে সব মালুম করা যায় না সানিয়ালসাব। বিজনেসটা খারাপ চলতে আরম্ভ করেছে বড়া সানিয়াল সাবের আমল থেকেই। ওনার তবিয়ত খারাপের পর থেকেই বিজনেসটা খারাপ হতে শুরু করেছিল। আসলি বাত হ্যায় কি বড়া সানিয়াল সাব ও বাজার কী অওরত কা সোচ...

বিট্টু গলাটা আরও কঠিন করে আবার বলল, লেটস টক অনলি বিজনেস মিস্টার আগরওয়াল।

বিজনেস। ইয়ে পুরা বিজনেসকাই বাত হ্যায় সানিয়ালসাব, ফির ভি, আপ অগর না চাহে তো... ছোড়িয়ে ও বিত গ্যায়া জমানা কো ছোড়িয়ে। আজ কা দিন দেখিয়ে। ক্যায়সে চল রহা হ্যায় আপকা বিজনেস। মালিক বিনা কুছ নওকরকে সালহা সে। ইসকা আনজাম... ভেরি স্যরি সানিয়ালসাব, আপনার এই বিজনেস বেশিদিন চলবে না।

বিট্টু এবার অধৈর্য হয়ে বলল, আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না মিস্টার আগরওয়াল।

ভেরি সিম্পল। আপনার বিজনেসে এখনও সোনা আছে। পিয়োর গোল্ড। শুধু আপনার বিজনেসে দরকার ঠিকঠাক ম্যানেজমেন্ট। যেটা নওকরদের দিয়ে হয় না। আমি আপনার কাছে একটা অফার নিয়ে এসেছি। আপনি আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে আসুন। ফিফটি-ফিফটি। হরিতলা কটন মিলে যত ইনভেস্ট করতে হয় সব আমি করব। আপনাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না। পাঁচ ক্রোড়-ছে ক্রোড় মতো লাগবে মিলটাকে মডার্ন করতে। আমি দেব। প্রফিট যা হবে ফিফটি-ফিফটি। তা ছাড়া দু'ক্রোড় আমি আপনাকে দেব পার্টনারশিপ শেয়ারের জন্য।

বিট্টু চুপ করে থাকল। এদের মতো লোকদের কথা বিট্টু সরোজ বক্সীর কাছে বহুদিন ধরে শুনছে। তারা পুরো কটন মিলটাই কিনে নিতে চায়। পার্টনারশিপের প্রস্তাবটা শুধু ছুঁচ হয়ে ঢোকার একটা রাস্তা। তবে সরোজ বক্সী কখনও বিট্টুর মতামত জানতে চাননি। কারণ মতামতটা তাঁর জানা। হরিতলা কটন মিলটা সান্যাল পরিবারের তরফ থেকে বাঁচিয়ে রাখাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

বিট্টুকে চুপ করে থাকতে দেখে বিনয় বললেন, কী ভাবছেন সানিয়াল সাব? আমি একেবারে পাউন্ডে দেব আপনাকে। হাওলা আছে। চিন্তা করছেন কেন? দো পেটি গজেন্দ্র নিজে গিয়ে আপনার লন্ডনের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর দেখছেন তো নরসিমা রাওয়ের সরকার ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সব ওপেন করে দিচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন-এর পরে পার্টনারশিপের নাফা আপনি হোয়াইটেও চাইলে পেয়ে যাবেন...

বিট্টু আগরওয়াল ভাইদের একটু ধন্ধে রাখার চেষ্টা রাখল। কোম্পানি বিক্রি করে দেওয়ার জালটা কতটা বিস্তৃত হয়েছে আরও জানা দরকার। শান্ত গলায় বিনয়কে বলল, আপনার প্রপোজালে বাবার সঙ্গে কথা না বলে আমি কিছু বলতে পারব না।

বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলেন, আমি আপনার উত্তরের প্রতীক্ষা করব।

আগরওয়ালরা বেরিয়ে যাওয়ার পরই শীতল ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠিয়ে বিট্টু জিজ্ঞেস করল, এরকম আর কতজন খদ্দেরকে আপনি দেখা করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন মিস্টার ভট্টাচার্য?

আগরওয়াল ভাইরা যাওয়ার সময় অভয় দু'মুহূর্তের জন্য শীতল ভট্টাচার্যর সঙ্গে দেখা করে বলে দিয়েছিল, চারা খেয়েছে। কাজ হয়ে গেলে শীতল ভট্টাচার্য তার কমিশনটা পেয়ে যাবেন। খবরটায় মন খুশি খুশি হয়ে গিয়েছিল শীতল ভট্টাচার্যর। বিনয় আগরওয়াল বলে রেখেছে কাজ হলে সরোজ বক্সীর রিটায়ারমেন্ট আর শীতল ভট্টাচার্যর জেনারেল ম্যানেজার হওয়া পাক্কা। টাকাটা না এটা কোনটা উপরি পাওনা ভাবতে ভাবতে শীতল ভট্টাচার্য বিট্টুকে বলে ফেললেন, আরও ইন্টারেস্টেড পার্টি আছে স্যার। তবে আগরওয়ালদের অফারটা সবথেকে ভাল বলে ওদেরই আপনার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে বললাম।

আর কী অফার আছে?

শীতল ভট্টাচার্যর চোখ দুটো চকচক করে উঠল, আপনাদের বাড়িটা স্যার। সামনের ওই ছড়ানো বাগানটা প্রমোটাররা চাইছে। ছ'তলা নাকি করা যাবে। আশি লাখ আর দুটো ফ্ল্যাট দিতে চাইছে...

বাড়িটার কী অবস্থা?

বাড়িটা স্যার যেমন থাকার তেমনই থাকবে। গাড়ি ঢোকার প্যাসেজও থাকবে। শুধু সামনের বাগানটার দশ কাঠা জায়গাটা...

বিট্টু এবার ধমকে উঠল, ড্যাম ইট! আমি জানতে চাইছি, বাড়িটায় আজকে থাকার মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে কিনা।

৮৬

সন্ধেবেলায় সরোজ বক্সীকে দেখতে আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল বিট্টুর। বীথিকে আজ আর দেখতে পেল না বিট্টু। অপেক্ষা করে করে বীথি ধরে নিয়েছিল বিট্টু বোধহয় আজকে আর আসবে না। বীথির কলেজের কয়েকজন বন্ধু দল বেঁধে সরোজ বক্সীকে দেখতে এসেছিল। বীথি ওদের সঙ্গেই ফিরে গেছে। খবর নিয়ে বিট্টু জানল বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর অমূল্য হাজরা সরোজ বক্সীকে দেখে গেছেন। রিপোর্ট দেখে বলেছেন, এ যাত্রায় সেরকম ভয়ের কিছু নেই। তবে সাবধানে নিয়ম মেনে চলতে হবে।

অফিসে আগরওয়াল ভাইদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে সেসব আর সরোজ বক্সীকে কিছু জানাল না বিট্টু। টুলটা টেনে নিয়ে বসে সরোজ বক্সীর হাত দুটো ধরে নরম গলায় বলল, কাকা, এবার চলুন না লন্ডনে। বাবার সঙ্গে থাকতে আপনার ভালই লাগবে। ওখানে অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে। বাড়িতে থাকার জায়গার কোনও অভাব নেই। ডেভি আছে...

•সরোজ বক্সী বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকলেন বিট্টুর দিকে। চোখটা চিকচিক করে উঠল। সামনে মালিক না পুত্রের অধিক এক নরম মনের মানুষ! ফিসফিস করে বললেন, তা কি সম্ভব বিট্টুবাবা? সব ছেড়ে...

হরিতলায় আমি আর আপনাকে যেতে দেব না কাকা। যা ব্যবস্থা করার করব। আপনি চলুন লন্ডনে...

বীথিকে ছেড়ে আমি কী করে যাব বিট্টুবাবা?

ওমা! আপনি বীথিকে ছেড়ে যাবেন কেন? ও যাবে। লন্ডনে পড়াশুনো করবে। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। ডক্টর ব্রাউনও বলছিলেন, চেনা মানুষের সঙ্গে থাকলে বাবা ভাল থাকবেন।

বিট্টুর হাতের ওপর হাতটা নরম করে রেখে সরোজ বক্সী বিষণ্ণ চোখে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব বিট্টুবাবা? তুমি বীথিকে একটু বুঝিয়ে যাও। ও কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না। ও একবার নিজের সংসারে চলে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হব বাবা। তখন তুমি আমাকে যেখানে যেতে বলবে...

সরোজ বক্সীর শীর্ণ হাতের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বিট্টু বলতে থাকল, বুঝতে পারছি কাকা। আমি নিশ্চয় কথা বলব বীথির সঙ্গে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বিট্টু যোগিন্দরকে বলল, নিউ আলিপুরের বাড়িতে চলো।

নিউ আলিপুরের বাড়িতে পৌঁছোতে সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে গেল। বাড়ির পাঁচিলের মধ্যে বড় লোহার গেটটার সামনে যোগিন্দরকে গাড়িটা দাঁড় করাতে বলল বিট্টু। গাড়ি থেকে নেমে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল বাড়িটার দিকে। প্রাণহীন নিঝুম দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। কত বছর পর বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। অনেক মন খারাপ করা স্মৃতি আছে বাড়িটায়। তবু মন খারাপ করল না বিট্টুর। বাড়িটার জন্য কোনও আত্মিক টানও অনুভব করল না। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করল, তা হলে খারাপ লেগেছিল কেন যখন শীতল ভট্টাচার্য বলেছিলেন সামনের বাগানটায় প্রমোটার ছ'তলা বাড়ি করতে চাইছে?

জং ধরে যাওয়া গেটটা পেরিয়ে মোরাম বিছানো ড্রাইভওয়েতে পা রাখল বিট্টু। ড্রাইভে নুড়িপাথরের সংখ্যা পাতলা হয়ে এসেছে। এককালের কেয়ারি বাগানে এখন পরিচর্যার অভাবে বড় বড় ঘাস। বিট্টুকে দেখে দৌড়ে এল এ-বাড়িতে এখন অধিবাসী দারোয়ান দুলাল। খুলে দিল সদর দরজাটা।

খুব দ্রুত বাড়িটা যথাসম্ভব পরিষ্কার করানোর চেষ্টা করেছেন শীতল ভট্টাচার্য। কিন্তু দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে জীর্ণতাটুকু ঢাকার কোনও উপায় করতে পারেননি। আসলে বছরের পর বছর অব্যবহারই শুধু নয়, তার আগেও বেশ কয়েক বছরে ব্যবসায় মন্দার জন্য বাড়িটার সেরকম রক্ষণাবেক্ষণ করাতে পারেননি দয়াল সান্যাল। বিট্টু ভেতরে ঢুকে দেখল এককালের দামি প্লাস্টিক পেন্টসগুলো কাগজের পাতার মতো জায়গায় জায়গায় উঠে এসেছে। মেঝেতে কার্পেটের ঠাসবুননটা জায়গায় জায়গায় খাবলা করে উঠে গেছে। সোফার স্প্রিংগুলো কড়াইয়ের মতো বসে গেছে। বাহারি ল্যাম্পশেডগুলো অদৃশ্য। তার জায়গায় দেওয়ালে লাগানো হয়েছে সস্তার টিউবলাইট।

যোগিন্দর পিছনে পিছনে ঘুরছিল। একসময় জানাল, স্যার, ম্যানেজার সাহেব বলে দিয়েছেন, রাতে আমি এখানেই থাকব গাড়ি নিয়ে। আপনার যদি কোনও অসুবিধা হয়...

দুলাল এক কাপ চা আর বিস্কুট নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রেখে বলল, ওপরের বাথরুমে সাবান তোয়ালে সব দেওয়া আছে স্যার। শুধু গিজারটা ঠিক করানো যায়নি। আপনার গরম জলের দরকার হলে বলবেন স্যার। রান্নাঘরে গ্যাসে গরম করে দেব।

বিট্টু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, বাঃ, চা-টা তো ভাল হয়েছে। এখানে তোমরা কে কে থাকো?

আমার ফ্যামেলি নিয়ে থাকি। আমি, আমার বউ আর ছেলে।

ছেলে কত বড়?

এই পাঁচ হবে স্যার।

স্কুলে পড়ছে?

কাছেই একটা স্কুলে পড়ে স্যার, কেজিতে।

বাঃ, খুব ভাল। আমিও ছোটবেলায় এখানে কেজিতে একটা স্কুলে পড়তাম। জানি না স্কুলটা এখনও আছে কিনা। মাম্মির সঙ্গে গাড়িতে স্কুলে যেতাম।

বিট্টুর শেষের কথাগুলো ভারী শোনাল দুলালের। বিট্টুর কথা শেষ হতে বলল, স্যার, রাতে কী খাবেন?

তুমি তৈরি করবে?

দুলাল লজ্জা পেল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, না না স্যার, আমার রান্না নয়। হোটেল থেকে নিয়ে আসব। খুব ভাল হোটেল। ম্যানেজারবাবু বলে দিয়েছেন...

যোগিন্দর বলে উঠল, গাড়ি তো আছে স্যার। বড় দোকান থেকেও নিয়ে আসতে পারি।

বিট্টু পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে দুলালের হাতে কয়েকটা একশো টাকার নোট দিয়ে বলল, ভাল ভাল খাবার নিয়ে এসো। সক্কলের জন্য। যার যা পছন্দ। দুলাল তোমার ছেলের যা ফেবারিট সেটাও নিয়ে এসো। ওর কথা ভুলো না।

যোগিন্দর বিট্টুর সুটকেসটা নিয়ে বলল, স্যার, ওপরে কোন ঘরটায় আপনি থাকবেন?

বিট্টু বুঝতে পারল যোগিন্দরের জানা আছে, কোন ঘরটা কার। অল্প হেসে বলল, কেন? আমার ঘরটায়।

নিজের ঘরে ঢুকে বিট্টু দেখল আসবাবপত্রগুলো সব একই জায়গায় একই রকমভাবে আছে। এই ঘরটার দশাও অন্য ঘরগুলোর মতোই। শুধু বিছানাটায় একটা নতুন বেডশিট পাতা। অর্ধেক দেওয়াল জোড়া ক্যাবিনেটের পাল্লাগুলো তালা দেওয়া। বিট্টু দুলালের কাছে জানতে চাইল, আলমারির চাবিগুলো আছে দুলাল?

দুলাল মাথা নাড়ল, চাবি তো স্যার সব সরোজবাবুর কাছে থাকে। উনিই মাঝে মাঝে এসে সব দেখে যান। কিন্তু উনি তো স্যার হাসপাতালে। ওঁর মেয়ের কাছ থেকে কাল সকালে নিয়ে আসব স্যার?

বিট্টুর মনে পড়ে গেল শীতল ভট্টাচার্য আলমারির চাবিগুলোর ব্যাপারে একই কথা বলেছিলেন। দুলালকে আশ্বস্ত করল, এখনই দরকার নেই। ফোনটা আছে বাড়িতে?

দুলাল সংকোচের সঙ্গে বলল, লাইন কাটানো আছে স্যার। আমার দরকার হলে আমি উলটোদিকে একটা দোকান থেকে করি।

বিট্টু যোগিন্দর আর দুলালের দিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে। এসো তোমবা। দরকার হলে ডাকব।

ঠান্ডা জলে চান করে পোশাক পালটে খাটে আধশোওয়া হয়ে পাঁচ মিনিট কাটিয়ে বিট্টুর মনে হল সময় যেন এখানে অস্বাভাবিক লম্বা। ঘড়ির কাঁটা যেন ঘুরতেই চাইছে না। কিছু পয়েন্ট লিখে রাখার আছে। কিন্তু নোটবুকটা ভুলে হোটেলের টেবিলে ফেলে এসেছে। একটা পেপারব্যাক কিনেছিল হিথরোতে। সেটাও হোটেলে ফেলে এসেছে না সুটকেসে আছে দেখার জন্য সুটকেসটা ঘাঁটতে বসল। এবং পেপারব্যাকের বদলে পেয়ে গেল একটা হুইস্কির বোতল। এটাও ডিউটি ফ্রি শপে কিনেছিল।

দুলাল, দুলাল...

বিট্টুর গলার ডাক শুনে দুলাল ছুটে এল।

এখানে ঠান্ডা সোডা পাওয়া যাবে কাছাকাছি কোথাও?

দুলাল আড়চোখে খাটের ওপর হুইস্কির বোতলটা দেখে বুঝে গেল বিট্টুর প্রয়োজনটা।

এখনই এনে দিচ্ছি স্যার। আর কিছু আনব? বাদাম টাদাম...

আনতে পারো, তাড়া নেই। আর একটা জিনিস এনো তো। একটা খাতা আর একটা পেন।

হুকুম তামিল করতে দুলাল বেরিয়ে যাচ্ছিল। বিট্টু আবার পিছু ডাকল। ফ্লাইটে পাওয়া একটা চকোলেটের গিফ্‌ট প্যাক ছিল। প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা তোমার ছেলের জন্য।

দুলাল ইতস্তত করে চকোলেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় বিট্টু আবার ডাকল দুলালকে।

আমাদের বাড়ির টিভিটা কোথায় দুলাল?

দুলাল বছর তিনেক এই বাড়িতে রয়েছে। আসা ইস্তক কোনওদিন কোনও টিভি দেখেনি। তবে একবার কালীপুজোর আগে সরোজ বক্সী একটা ছোট পুরনো সাদাকালো টিভি কিনে দিয়েছিলেন। টিভিটা দুলালের নিজের পয়সায় কেনা নয়। সুতরাং এটা এ বাড়ির টিভিই বলা যায়। চিন্তিত হয়ে বলল, দেখছি স্যার, অ্যানটেনার তার এ ঘরে আসে কিনা।

কোথায় আছে টিভিটা?

বাইরে... আমার ঘরে... ঢোক গিলে বলল দুলাল।

ঠিক আছে... তোমার কাছে রেডিয়ো আছে?

দুলালের মুখটা এবার নিশ্চিন্ত দেখাল। একটা রংচটা ট্রানজিস্টার আছে। তার আওয়াজটা নেহাত মন্দ নয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুলাল বিট্টুর প্রয়োজনের সব ব্যবস্থাটা গুছিয়ে করে দিল। কিছু মাছভাজা, শসা-পেঁয়াজের স্যালাড, ঠান্ডা সোডা, পরিষ্কার কাচের গ্লাস আর রেডিয়ো।

পরিপাটি করে ঘরের টেবিলে জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে বলল, রাতে যখন খাবেন, বলবেন স্যার।

আমি বেশি খাই না দুলাল। তুমি আমার খাবার টেবিলে ঢাকা দিয়ে নিশ্চিন্তে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো। আমি দরকার হলে ডাকব।

দুলাল বুঝতে পারল মালিক একা থাকতে চাইছে। ঘরের সুইচ বোর্ডে একটা সুইচ দেখিয়ে বলল, ম্যানেজারবাবু এটা আজ সকালে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছেন। এটা টিপলেই আমার ঘরে বেল বাজবে।

দুলাল দু'বার সুইচটা টিপল। নীচে ক্ষীণ কোথাও একটা বেলের আওয়াজ শুনতে পেল বিট্টু। দুলালের দিকে তাকিয়ে হাসল, ঠিক আছে, দরকার পড়লে তোমাকে বেল টিপে ডাকব।

ট্রানজিস্টারটা হাতে নিয়ে এরিয়ালটা টেনে বার করে নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আকাশবাণীর সম্প্রচারগুলো শুনতে থাকল বিট্টু। একটা কেন্দ্রে গম্ভীর আলোচনা চলছে সম্প্রতি ভারতের সোনা বিক্রি হয়ে টাকার দাম পড়ে যাওয়া নিয়ে। স্কচে চুমুক দিতে দিতে আলোচনাটা দিব্যি লাগছিল বিট্টুর। মনে হচ্ছে, এবার ঘড়ির কাঁটাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় ঘরের দরজার পরদার পিছন থেকে আবার দুলালের গলার আওয়াজ পেল বিট্টু।

স্যার আসব?

এসো দুলাল।

দুলাল একটা অপরাধী মুখ করে বলল, স্যার একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আপনার খাতা...

দুলাল বিট্টুর দিকে একটা খাতা এগিয়ে দিল। খাতাটা নিয়ে পাতাগুলো উলটে বিট্টু দেখল প্রথম কয়েকটা পাতায় কাঁচা হাতে পেনসিলে এবিসিডি লেখা আছে।

এ কী তুমি তোমার ছেলের খাতা নিয়ে এলে কেন?

দুলাল মাথা চুলকে বলল, বড্ড ভুল হয়ে গেছে স্যার। খাতার দোকান এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়িতে এইটে ছিল।

বিট্টু খাতাটা ফেরত দিয়ে বলল, ওমা, তাই বলে তুমি তোমার ছেলের খাতা নিয়ে আসবে। এটা ঠিক নয় দুলাল। নিয়ে যাও। আর খাতা লাগবে না।

দুলাল বিট্টুর আপত্তি শুনল না। গুচ্ছ বাহানা দিয়ে একরকম জোর করেই খাতাটা রেখে গেল টেবিলে।

সোনা বিক্রির আলোচনাটা ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে। চাষআবাদ নিয়ে। নতুন করে এই আলোচনাটায় আর কোনও আগ্রহ খুঁজে পেল না বিট্টু। এলোমেলো করে ট্রানজিস্টারের নবটা ঘোরাতে ঘোরাতে বিবিধ ভারতীতে এসে থেমে গেল বিট্টু। অদ্ভুত সুরেলা একটা গান হচ্ছে তখন। শিল্পী যেসুদাস। ক্যা করু সজনী, আয়ে না বালম।

গানটা শুনতে শুনতে অদ্ভুত একটা মৌতাত ধরে গেল বিট্টুর মধ্যে। গ্লাসটা শেষ করে পরের গ্লাসটা বানিয়ে নিল। খাটের বাজুতে তাল ঠুকতে থাকল। রেডিয়োতে ততক্ষণে পরের গানটা শুরু হয়েছে, মেরা কুছ সমান, তুমহারে পাস...

তাল ঠুকতে থাকা আঙুলগুলো এবার নিশপিশ করতে থাকল। পিয়ানোর জন্য সেই ভালবাসাটা কোথায় হারিয়ে গেল। খুব ইচ্ছে ছিল লন্ডনের বাড়িতে একটা পিয়ানো কেনে। পৃথিবীটাকে যখন অসহ্য মনে হবে, তখন ডুবে থাকবে পিয়ানোতে। বাবার অপছন্দ বলে সেই ইচ্ছেটাকেও জলাঞ্জলি দিয়েছে। খাটের ওপর চিত হয়ে শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসল বিট্টু, একদিন এই খাটটায় জুলিকে আবিষ্কার করেছিল। সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এই শহর থেকে অনেক দূরে চলে যাবে। দুটোর মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল? ডক্টর ব্রাউন কি এই উত্তরটা দিতে পারবেন? কখনও এসব চিন্তা করার অবকাশই পায় না। নিজের মনকে বাঁধনহীন হয়ে মেলে ধরে নিজের সঙ্গে প্রশ্ন উত্তরের খেলাটা করার জন্য, আজকের রাতটার মতো নির্জন একটা রাতের সত্যিই দরকার ছিল। আবছায়ার মতো ভেসে উঠছে জুলির মুখ। খাটের গদির ওপর হাত বোলাল বিট্টু। এখনও যেন জুলির উষ্ণতাটা রয়ে গেছে।

চোখের পাতাগুলো ক্রমশ ভারী লাগছে। সত্যি কি বিতৃষ্ণা, না মনের অনেক গভীরে জুলি আজও রয়ে গেছে? অদ্ভুত হালকা লাগছে পৃথিবীটাকে। গায়ের জামাটা খুলে ফেলে আরও একবার গ্লাসটা ভরে নিল বিট্টু।

পাখার হাওয়ায় পতপত করে দুলালের ছেলের খাতাটার পাতাগুলো উলটোচ্ছে। বিট্টু একমনে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল খাতাটার দিকে। ঈষৎ টলটলে পায়ে উঠে গিয়ে রেডিয়োর ভল্যুমটা কমিয়ে দিয়ে নিয়ে এল খাতাটা। খাতার মধ্যিখানের পাতাটা একটানে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর একমনে অনেকক্ষণ সাদা পাতাটার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁপা হাতে এলোমেলো করে লিখতে আরম্ভ করল—

প্রিয় উপাসনা,

ভীষণ মনে হচ্ছে তোমার কথা। কেন জানো তো? আমার সামনে একটা রেডিয়ো বাজছে। তাতে গুনগুন করে খুব সুন্দর সুন্দর হিন্দি গান হচ্ছে। আমি জানি এই গানগুলো যে-হিন্দি সিনেমার তার সব গল্পগুলো তুমি নিশ্চয় জানো। এই মুহূর্তে কী ইচ্ছে হচ্ছে জানো? তোমাকে যদি কাছে পেতাম তা হলে তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকতাম। তুমি আমার চুলে আলতো করে বিলি কেটে সেই রূপকথার মতো গল্পগুলো শোনাতে। খুব মিস করি জানো তো। সেই কোন ছোটবেলায় মাম্মি আমাকে কার্শিয়াং-এ হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কেউ কোনওদিন আমাকে রূপকথার গল্প বলেনি। মাম্মি আমাকে জিসাসের গল্প বলত, কৃষ্ণর গল্প বলত, পাখিদের গল্প বলত কিন্তু কোনওদিন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প বলেনি। হয়তো মাম্মির জীবনে কোনও রূপকথাই ছিল না। মাম্মি শুধু একটা লালাবাই জানত। আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়... আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার ম্যাজিক। মাই মাম্মি ওয়াজ এসকেপিস্ট। তাই জীবনকে ফেস না করে নিজের চিরতরে ঘুমটা নিজেই ডেকে নিয়েছিল। মাই মাম্মি ওয়াজ কনফিউজড... মাই মাম্মি ওয়াজ... আই হ্যাভ গ্রেট ডাউট... মাম্মি যে ঠিক কী চেয়েছিল সেটা নিজেই জানত কিনা। আমি কোনওদিন এই কথাগুলো কাউকে বলিনি। জানি না আজ তোমাকে এসব লিখছি কেন। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমার হিন্দি গানগুলো আমার ভেতর থেকে এগুলো বের করে নিয়ে আসছে হুড়মুড় করে। আমার ভীষণ পিয়ানো বাজাতে ইচ্ছে করছে আজ। কিন্তু আমি এসব কথা তোমায় লিখছি কেন? তোমায় কেন? হয়তো তোমার সঙ্গে জুলির কোথাও একটা মিল আছে। সেই মিলটা কোথায় আমি কিছুতেই খুঁজে পাই না উপাসনা। জুলিকে কি আমি সত্যিই ভুলতে পারি না? এই ঘরে এই খাটে সে আমাকে নারীর শরীরের স্বাদ চিনিয়েছিল আর...

বড় বড় অক্ষরে লেখা বিট্টুর চিঠিটা দু'পৃষ্ঠা ভরে গিয়েছিল। আঙুলটা ব্যথা ব্যথা করছিল। বহুদিন এভাবে গড়গড় করে লেখার অভ্যাস নেই। আজকাল আর লেখা হয় কই? পেনকে ছুটি দিয়ে আঙুলগুলোর দখল নিয়েছে কি-বোর্ড। ক্লান্ত হয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে রেডিয়োতে গানের গুনগুনানি শুনতে থাকল, গাতা রহে মেরা দিল, তুহি মেরি মঞ্জিল। কহি বিতে না ইয়ে রাতে, কহি বিতে না ইয়ে দিন... গান শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল বিট্টু।

হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল। ঠিক কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিল খেয়াল করতে পারল না। তবে ঘুমটা ভেঙে মনে হল কেউ যেন কিছু একটা হেঁকে বলছিল। মাথার ভেতর অস্পষ্ট একটা আওয়াজ আর ঘুটঘুটে অন্ধকারে তার একটা রেশ। কার ডাক ছিল? কী বলছিল? ঘুমের রেশটা একদম কেটে গেল। শহর কলকাতা এত নিঝুম হয় নাকি? একটা ঝিঁঝি পোকার ডাকও নেই। হাত বাড়িয়ে বেডসাইড টেবিল থেকে ঘড়িটাকে টেনে নিল। রেডিয়াম বিন্দুতে জ্বলজ্বল করে সময়টা জানান দিচ্ছে রাত দুটো পঞ্চান্ন। দরজাটা খোলা আছে। এত রাতে তা হলে কি দুলাল এসেছিল? পরক্ষণেই মনে হল দুলালের তো রাতদুপুরে আর আসার কথা নয়। থেকে থেকে মনটা অস্থির হয়ে উঠছে।

ভ্যাপসা মনে হচ্ছে চারদিকটাতে। অন্ধকার হাতড়ে ফ্যানের রেগুলেটারটাকে বাড়িয়ে দিল।

ঠিক এরকম সময়েই বিট্টু দরজার দিক থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেল। খ্যাস...খ্যাস...খ্যাস। যেন পা ঘষটে চলার আওয়াজ একটা। আওয়াজটা শুনে ঘুমের শেষ তলানিটুকুও চলে গেল। কান দুটো খাড়া হয়ে গেল বিট্টুর। একটু পরে খ্যাস খ্যাস আওয়াজটার সঙ্গে আর একটা আওয়াজ অনুষঙ্গ হল। টুং টুং...টুং টুং...টুং টুং...।

কান খাড়া করে শুনল বিট্টু। আওয়াজগুলো কিছুক্ষণ থেমে থেমে হচ্ছে। তারপর নিজেই একসময় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পরে একইরকম ভাবে শুরু হচ্ছে। বিট্টুর সেই ছোটবেলা থেকেই একা থাকার অভ্যাস। কার্শিয়াং থেকে লন্ডন, সিংহভাগ দিনগুলোই রাতে একা একা কাটিয়েছে। এমনকী কলকাতার বাড়ির এই ঘরটাতেও। কিন্তু কখনও এরকম অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করেনি। দম বন্ধ করে একটা ছমছমে অনুভূতি নিয়ে বুঝতে পারল ভেতরে ভেতরে ঘামতে আরম্ভ করেছে। এক-একবার মনে হচ্ছে উঠে গিয়ে আলোগুলো জ্বেলে দেয়। চিৎকার করে ডাকে দুলালকে, যোগীন্দরকে। কিন্তু একই সঙ্গে বুঝতে পারল মনের মধ্যে সাহসটা হঠাৎ করে যেন উবে গেছে। পা দুটো অসাড়। গলা শুকনো খটখটে।

একটা সময় বিট্টু শুয়ে পড়লে পৃথা বাইরে থেকে দরজা টেনে দিত। চাবির গর্ত দিয়ে বিট্টু একদিন দেখেছিল মা কালী প্যাসেজটা দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাবার ঘরের দিকে। সেই আওয়াজটাও ছিল পা ঘষটে চলার আওয়াজ। মা কালীর পায়ে ছিল ঘুঙুর। তার আওয়াজটাও ছিল ঠিক এরকমই ছন্দে, ঝুম... ঝুম... ঝুম... ঝুম। পরের দিন মা কালীর ব্যাপারটা পৃথাকে জিজ্ঞেস করেছিল বিট্টু। পৃথা বলেছিল সেটা ছিল লোকেনের কাজ। যাত্রা না নাটক কীসের যেন একটা রিহার্সাল ছিল। নির্ঘুম ভয়ের রাতে বিট্টুর মনে হতে থাকল সেদিন কি পৃথা ঠিক বলেছিল? লোকেনই কি সত্যি মা কালী ছিল? না অন্য কোনও রহস্য ছিল, যেটা কেউ কোনওদিন ওকে বলেনি?

ক্রমশ বিট্টুর মনে হতে থাকল এই নিকষ অন্ধকার ঘরটাতেও ও একা নেই। চারদিকে যেন অসংখ্য অশরীরী মানুষ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়টা কীরকম আচ্ছন্ন করে ফেলল বিট্টুকে, যেটা শরীর ছেড়ে চলেও যায় না অথবা যুক্তিবাদী হয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার সায়ও দেয় না। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখটা গুঁজে কান দুটো চাপা দিল বিট্টু।

কা...কা...কা...কা... বাইরে কয়েকটা কাকের ডাকের আওয়াজ পাওয়া গেল। মুখটা ঘুরিয়ে চোখটা অল্প খুলল বিট্টু। ঘুটঘুটে অন্ধকারটার মধ্যে জানলা দিয়ে ফুটে উঠেছে খুব ফিকে একটা আকাশ। আলোর এই সামান্য রেশটা দেখে এতক্ষণের জমাট বেঁধে যাওয়া ভয়টা যেন গলতে শুরু করল। সমস্ত শক্তিটা এক জায়গায় সঞ্চয় করে তড়াক করে বিছানার থেকে উঠে গিয়ে ঘরের আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল বিট্টু। নিশ্চিত হল ঘরে আর দ্বিতীয় কোনও প্রাণী নেই। ঘরের দরজাটা খুলে বাইরের প্যাসেজের আলোগুলো জ্বেলে বাইরেও কাউকে দেখতে পেল না বিট্টু।

দুলালের দেখিয়ে দেওয়া কলিংবেলের সুইচটা বারবার টিপতে থাকল। একটু পরে ঘুমচোখে কোনওরকমে গায়ে জামাটা গলিয়ে ছুটে এল দুলাল। এবার শুধু একা নয়। পিছন পিছন দুলালের বউও। রোগা পাতলা শ্যামলা দুলালের বউ বিস্ফারিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিট্টুর দিকে। অস্বস্তি এড়াতে বিট্টু দুলালকে জিজ্ঞেস করল, যোগিন্দর কোথায়?

দুলাল আমতা আমতা করে উত্তর দিল, নীচে কোনার ঘরটাতে ঘুমোচ্ছে স্যার...

ডাকো ওকে।

এখন স্যার...

ইয়েস। রাইট নাও। আমি বেরোব?

একরাশ বিস্ময়ে দুলালের মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল, এখন স্যার?

বিট্টু ধমকে উঠল, আঃ! তোমাকে যেটা বলছি সেটা করো না। ডাকো যোগিন্দরকে।

দুলালের বউ যেমন পিছন পিছন এসেছিল তেমনই পিছন পিছন গিয়ে একতলায় এসে ফিসফিস করে দুলালকে বলল, ছোটসাহেবের মুখটা দেখলে?

দুলাল বউয়ের কথার কোনও উত্তর দিল না। দুলালের বউ তবুও বলতে থাকল, এবার তোমার বিশ্বাস হল তো?

কীসের বিশ্বাস?

এ-বাড়িতে ভূত আছে...

দুলাল চটে উঠল, কীসের ভূত!

দুলালের বউ গলাটাকে আরও নামিয়ে ফেলল, ছোটসাহেবের মায়ের ভূত। আগুনে পুড়ে অপঘাতে মরেছিল না? এখন সারারাত প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছেলে এসেছে, ছেলেকে একবারটি দেখা দিতে আসবে না? আমি রাতের বেলায় কতরকম দেখেছি। তেনাকে রাতের অন্ধকারে ছাদেও দেখা যায়...

যোগিন্দরদা, এ যোগিন্দরদা... ওঠো...

দুলাল যোগিন্দরের কানের কাছে মুখটা এনে ডাকতে থাকল। ঘুম ভেঙে যোগিন্দর বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? চেল্লাচ্ছিস কেন?

ওঠো, ছোটসাহেব ডাকছেন।

যোগিন্দর কোনওরকমে চোখটা খুলে দেখল সেভাবে আলোই ফোটেনি। দুলালের কথাটা ঠিক ঘুমের ঘোরে বিশ্বাস হল না। মুখ খারাপ করে আবার চাদরটা টেনে পাশ ফিরে শুল। দুলাল যোগিন্দরকে ধরে ঝাঁকাতে থাকল, যোগিন্দরদা, ওঠো... সত্যি সাহেব ডাকছে।

যোগিন্দর এবার খুব বিরক্ত হয়ে উঠে বসল। তারপর তেতো মুখে দুলালকে বলল, তুই যা, আমি আসছি...

দুলালের বউয়ের তখনও আতঙ্ক কাটেনি। দোতলার সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে গা ছমছম করছিল। কোনওরকমে দ্রুত এক কাপ চা করে বিট্টুর কাছে নিয়ে এল। গরম

চায়ে চুমুক দিয়ে বিট্টুর ভাল লাগল। দুলালের বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যরি, এত ভোরে তোমাদের কষ্ট দিচ্ছি।

দুলালের বউ লজ্জা পেয়ে মিনমিনে গলায় বলল, ড্রাইভারজি উঠে পড়েছে।

গুড। ওকে বলো আমি আসছি।

৮৭

গাড়িটা গেট পেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার পর যোগিন্দর জানতে চাইল, কোথায় যাব স্যার?

ভোরের কলকাতাটাকে, চেনা পাড়াটাকে অদ্ভুত লাগছিল বিট্টুর। মায়াবী, কোমল। পবিত্র পবিত্র একটা ভাব। দুঃস্বপ্নের রাতটাকে একেবারে মুছে দিয়েছে। তন্ময় হয়ে বাইরেটা দেখতে দেখতে বিট্টু নিচু স্বরে নির্দেশ দিল, সরোজকাকার ওখানে চলো...

যোগিন্দর অল্প চিন্তিত হয়ে বলল, হসপিট্যাল স্যার?

না... সরোজকাকার বাড়ি!

যোগিন্দরের আশ্চর্য হওয়ার মাত্রাটা বাড়ল। কালকে অঙ্ক মেলেনি। সরোজবাবুর মেয়েটার সঙ্গে একলা বাড়িতে সুযোগ পেয়েও ছোটসাহেব দেখা করতে যায়নি। এত ভোরে আবার সেই বাড়িতেই? মতলবটা ঠিক ধরতে পারল না যোগীন্দর।

এত ভোরে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই। ওয়ান ওয়ের শাসনও নেই। দ্রুতই যোগিন্দর চিৎপুর রোড ধরে সরোজ বক্সীর বাড়ির গলির মুখে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এল। রাস্তার একপাশে গাড়িটা পার্ক করে তাড়াতাড়ি নেমে এসে পিছনের দরজাটা খুলে দাঁড়াল। বিট্টু একটু ধন্ধে পড়ল। বহু বছর আগে সরোজ বক্সীর বাড়িতে একবার এসেছিল। সেটাও রাতেরবেলায়। জীবনে এক নিদারুণ শোকের দিন। বিশাল বাড়িটায় একটা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে লম্বা একটা বারান্দার মাঝ বরাবর সরোজ বক্সীর ঘরের দরজা। বাল্যস্মৃতি নির্ভর করে সেই দরজায় পৌঁছোনো কিছুতেই সম্ভব নয়।

তুমি সরোজকাকার বাড়িটা... আই মিন ঘরটা চেনো?

যোগিন্দর দ্রুত বুঝে ফেলল। বিনীতভাবে গলিটা দেখিয়ে হাত পেতে বলল, আসুন স্যার।

বাড়ির সদর দরজাটা খোলাই থাকে। সেটা পেরিয়ে বিশাল এক উঠোন। ভোরটা কেটে গেলেও বাড়িটা সেভাবে জেগে ওঠেনি। তিন দিকে সার দেওয়া বারান্দা। ইতস্তত কয়েকজন সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁতে ব্রাশ ঘষছে। উঠোনে কয়েকটা তোলা উনুনে কাঁচা কয়লা জ্বলে ধোঁয়া উঠছে। ঊর্ধ্বগামী ধোঁওয়াটা বেয়ে ওপরে তাকাল বিট্টু। কিন্তু এদের মধ্যে বীথিকে কোথাও দেখতে পেল না। যোগিন্দর আবার পথ দেখাল, আসুন স্যার।

সিঁড়িটা দিনের আলোতেও অন্ধকার। যোগিন্দর বিট্টুকে সাবধানে উঠিয়ে নিয়ে এল

ওপরের বারান্দায়। কয়েকটা দরজা পেরিয়ে একটা সবজে রং করা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজার উপরে কাঁচা হাতে কালো রং দিয়ে লেখা সরোজ বক্সী আর তার নীচে বীথি বক্সী। চৌকাঠের এক কোণে একটা পুশ সুইচ। যোগীন্দর সুইচটা টিপতে ভেতরে একটা খ্যারখ্যারে বেলের আওয়াজ পেল বিট্টু। যোগিন্দরের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি গাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।

যোগিন্দর চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরেও বন্ধ দরজাটা খুলল না। দাঁড়িয়ে থাকতে বিট্টুর ক্লান্ত লাগছিল। দরজায় কড়ায় তালা নেই। তার মানে বীথি ভেতরেই আছে। দরজার চৌকাঠে হাত দিয়ে ক্লান্ত শরীরটার ভার ছেড়ে বিট্টু আবার বেল টিপল। এবার ভেতরে একটা পায়ের আওয়াজ পেল।

দরজাটা খুলেই এত সকালে ঘুমচোখে সামনে অবসন্ন শুকনো মুখে বিট্টুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বীথি ঘাবড়ে গেল। মুহূর্তে গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেল। কোনওরকমে বলল, কী হয়েছে বিট্টুদা?

ভেতরে আসব বীথি?

বীথি দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে বলল, বাবা... বাবা ঠিক আছে তো বিট্টুদা!

সরোজকাকা... হ্যাঁ, সরোজকাকা ঠিকই আছেন। স্যরি... এভাবে এত সকালে দেখে কোয়াইট ন্যাচারালি তোমার সরোজকাকার কথাই মনে হচ্ছে। সরোজকাকা ঠিক আছেন, কিচ্ছু হয়নি।

তা হলে? বীথির বিহ্বলতা তখনও কাটেনি।

বিট্টু বীথির আতিথেয়তার জন্য অপেক্ষা কবল না। একপাশের সোফা কাম বেডটায় বসে পড়ে বলল, কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি বীথি। তাই হয়তো এরকম হ্যাগার্ড দেখতে লাগছে।

বীথি অল্প নিশ্চিন্ত হল। বুকটা ধক্ করে উঠেছিল। ক্রমশ প্যালপিটিশনটা স্বাভাবিক হতে লাগল।

তুমি খুব ভুল ডিসিশন নিয়েছ বিট্টুদা। তুমি তোমার নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকবে বলে কিছু বলিনি। কিন্তু এতদিন যে বাড়িটা ওরকম বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেখানে ওরকম দুম করে গিয়ে থাকা যায়? এখন নিশ্চয়ই বাড়িটায় ইঁদুর, আরশোলা, টিকটিকিব স্বর্গরাজ্য।

বিট্টু হেসে ফেলল, না, সেরকম কিছু নয়। বাড়িটা ভাল করেই পরিষ্কার করানো হয়েছে। আসলে অনেকদিন না থাকলে নিজের বাড়িটাও পর হয়ে যায়। আমার নিজের ঘরটাই আর নিজের মনে হচ্ছিল না। তার ওপর অদ্ভুত সব ফিলিংস... যাক গে, ভোরবেলাতে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। কোথায় আর যাব? তোমার কথাই মনে পড়ল।

ভাল করেছ। তুমি বসো। আমি চা করে নিয়ে আসি।

বিট্টু হাতের কাছে একটা বাসি খবরের কাগজ নিয়ে পড়তে থাকল। কিছুক্ষণ পরে বীথি দু'কাপ চা নিয়ে এসে রাখল। মুখের ওপর থেকে খবরের কাগজটা নামিয়ে বিট্টু

বলল, তুমি সেদিন ফোনে হরিতলা কটন মিলের অনেক খবর বলেছিলে। অনেক কিছু জানা তোমার। তোমার জানা থাকলে তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে বীথি?

বীথি জিজ্ঞাসু মুখে বিট্টুর দিকে তাকাল।

মাম্মি মারা যাওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে পৃথা আর লোকেন বলে দু'জন থাকত। বাবাকে ওরা প্রায় বশ করে নিয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ ওদের কথা।

বীথি একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বলল, জানি।

ডু ইউ নো। কেন ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল?

বীথি মাথা নাড়ল, না।

তুমি সত্যি জানো না? সরোজকাকা কোনওদিন কিছু বলেননি তোমায়?

বাবা তো তোমাদের বাড়ির কথা, অফিসের কথা কখনও বাড়িতে ওভাবে গল্প করত না। তবে জেঠুকে তুমি লন্ডনে নিয়ে যাওয়ার আগে বাবা ভীষণ ডিস্টার্বড ছিল। তখন অবশ্য আমার বয়সও কম ছিল। বাবা তো আরওই কিছু বলত না।

কিন্তু পরে কোনওদিন কিছু বলেনি? তুমি যথেষ্ট বড় হয়ে যাওয়ার পর।

বলেছে হয়তো কখনও কখনও। টুকরো টুকরো। তোমাদের টাকা ওই পৃথা কেমন করে নয়ছয় করত। বাড়ির দামি দামি জিনিস সবার চোখের সামনে দিয়ে পাচার করে দিত, এইসব। ওই পৃথা যে খুব বাজে ধরনের মহিলা ছিল তার ইঙ্গিতও বাবা দিত। আর বাবার একটা আক্ষেপ ছিল... তোমাদের দেশের বাড়ি, কী যেন নাম..

ডুমুরঝরা।

হ্যাঁ ডুমুরঝরা। ডুমুরঝরা থেকে বাবাই নাকি ওই বহুরূপী লোকটাকে সঙ্গে করে কলকাতায় জেঠুর কাছে নিয়ে এসেছিল।

বিট্টু আনমনা হয়ে চুপ করে গিয়ে চা খেতে লাগল। একটু উসখুস করে বীথি জিজ্ঞেস করল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব বিট্টুদা? তুমি কি এটা জানার জন্যই এত সকালে এলে?

হয়তো তাই। কাল যখন সারারাত ঘুম হয়নি, অদ্ভুত কিছু ফিলিংস হয়েছিল। আর মনের মধ্যে অদ্ভুত অনেকগুলো প্রশ্ন জেগেছে। তার একটা হল পৃথা আর লোকেনের কী হয়েছিল? কেন ওরা চলে গিয়েছিল? ওরা তো চলে যাওয়ার জন্য আসেনি।

বাবাকে কখনও জিজ্ঞেস করোনি?

না, আসলে ওরা আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এই খবরটাই আমার কাছে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ছিল। সরোজকাকা বলেছিলেন যা ড্যামেজ করার, যতটা ড্যামেজ করার, সবটা করে ওরা চলে গেছে, আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। তাই কেন চলে গিয়েছিল সেটা আমার কাছে একদম ইনসিগনিফিক্যান্ট। কিন্তু কাল রাতে মনে হল প্রশ্নটার উত্তরটা জানা দরকার।

হঠাৎ তোমার এরকম মনে হল কেন?

কারণ, ওদের এগজিসটেন্স এখনও রয়ে গেছে। সেই লোকেনের ঘষটে চলা পায়ের আওয়াজ। ঝুম ঝুম শব্দ...

শেষের কথাগুলো বীথির হেঁয়ালির মতো লাগল। যেটুকু জানে সেইটুকু গুছিয়ে বলার চেষ্টা করল।

আমি যেটুকু জানি, ওদের অদ্ভুত একটা অসুখ হয়েছিল। সেই অসুখটার ভয়েই ওরা বোধহয় তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

কী অসুখ?

বীথি হাত ওলটাল।

সেটা বলতে পারব না বিটুদা। তবে ওদের ধারণা হয়েছিল... বোধহয়... তোমাদের বাড়িতে থেকেই অসুখটা হয়েছে।

বিটুর ভুরু দুটো আরও ঘন হল।

স্ট্রেঞ্জ! এসব কথা তো আমাকে কেউ বলেনি। অবশ্য বলবেই বা কে? আমিও তো কোনওদিন জানতে চাইনি। একমাত্র সরোজকাকাকে জিজ্ঞেস করলে যদি বলতে পারে।

তোমাকে একটা রিকোয়েস্ট করব বিটুদা। তুমি প্লিজ বাবাকে এখন এসব কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। ওদের কথা উঠলেই বাবা ভীষণ রেস্টলেস হয়ে পড়ে...

বিটু আস্তে আস্তে মাথা দোলাল। মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগে লন্ডনে পাওয়া বীথির ফোনের কথা। সেদিন বীথির গলায় একটা ঘৃণা আর ঝাঁজ ছিল। আজ গলার স্বর অনেক নরম।

তোমাকে কথা দিচ্ছি বীথি। সরোজকাকাকে আমি কোনওরকমভাবে ডিস্টার্ব করব না। আর তুমি আমাকে লন্ডনে ফোন করে যে কথাগুলো বলেছিলে সেগুলোও আমি মনে রেখেছি। আমাদের ফ্যামিলির জন্য সরোজকাকা অনেক করেছেন। এবার ওঁকে একটা পিসফুল রিটায়ার্ড লাইফ দেব। উনি যাতে খুব ভালভাবে জীবন কাটাতে পারেন তার জন্য যথোপযুক্ত পেনশনের ব্যবস্থা আমি করব। ভেবো না তোমাদের জন্য এটা করা আমার কর্তব্য ভেবে বা তুমি বলেছ বলে আমি এটা করছি। এটা আমি করছি এইখান থেকে।

বিটু বুকের বাঁদিকে আলতো করে হাতটা ঠেকাল। বীথির চোখে একটা কৃতজ্ঞতার ভাষা ফুটে উঠেছিল। বীথি উঠে গিয়ে একটা টেলিফোনের নম্বর লেখা ডায়েরি নিয়ে এল। তারপর খুঁজেপেতে একটা নাম আর টেলিফোন নম্বর এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে বিটুর দিকে এগিয়ে বলল, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করতে পারো। উনি হয়তো অনেক কিছু জানতে পারেন।

বিটু হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে দেখল নাম লেখা আছে, তরুণ ঘোষ। বিটুর নামটা মনে পড়ে গেল। মাম্মির ডায়েরিতে নামটা পড়েছে। খাপছাড়া করে যেটুকু পড়েছে তাতে মনে হয়েছে মাম্মি খুব ভরসা করত ভদ্রলোককে। এই তথ্যটা নিজের মধ্যে চেপে রেখে বিটু জানতে চাইল, ইনি কে?

একজন ল'ইয়ার। যতদূর জানি উনি জেঠিমার ল'ইয়ার ছিলেন। আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসেন ভদ্রলোক। ওঁর সঙ্গে বাবার কথা ওভার হিয়ার করে অনেক কিছু জেনেছি। ভদ্রলোক কিন্তু তোমার জন্য খুব সিমপ্যাথেটিক।

আমার জন্য? হেসে ফেলল বিট্টু। আমি তো ভদ্রলোককে চিনিই না।

বীথি ঠোঁট ওলটাল, তা জানি না। আমার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে।

বিট্টু কাগজের টুকরোটা পকেটে রেখে দিয়ে বলল, সরোজকাকা বলতেন, তোমাদের এই বাড়ির ছাদ থেকে নাকি দুর্দান্ত গঙ্গার একটা ভিউ পাওয়া যায়। যাওয়া যায় এখন একবার তোমাদের ছাদে?

বীথি একটু ইতস্তত করল। বাড়িতে এখন একদম একা আছে। সবে সকাল হতে শুরু করেছে। বাড়িটা জেগে উঠছে। এই সময় বিট্টুকে নিয়ে বেশি ঘোরাফেরা করলে লোকের নজরে পড়লে সাত কথা তৈরি হবে। নিন্দুকের মুখে আগল নেই। সবার আগে হয়তো বলে বসবে অচেনা ছেলেটার সঙ্গে বীথি রাত কাটিয়েছে। বাবা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে না-আসতেই কুৎসাটা কানে পৌঁছোবে। বিট্টুর ইচ্ছেটা এড়াতে মিথ্যে করে বলল, ছাদের দরজাটা তো চাবি দেওয়া থাকে। কার কাছে চাবি থাকে জানি না। আর একটু বেলার দিকে দরজাটা খোলে।

বিট্টুর মনে পড়ল এ-বাড়িতে ঢোকার সময় ওপর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল ছাদেও কিছু লোক পাঁচিলে ভর দিয়ে আলসেমি ভাঙছে। আনমনা হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, মাম্মির ছাইটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে তোমাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম।

বীথি চুপ করে শুনতে থাকল। এই গল্পটা অসংখ্যবার বাবার মুখে শুনেছে। সেদিন সঙ্গে ছিলেন যামিনীজেঠুও। যামিনীজেঠু যে চলে গেছেন, সেই খবরটা কি বিট্টুদা জানে? যামিনীজেঠু মারা যাওয়ার পরই তো বাবা এরকম ভেঙে পড়েছে। সবটাই তো হরিতলা কটন মিলের দোষ নয়। সাতসকালে একটা মৃত্যুসংবাদ দেবে কিনা ভাবতে ভাবতে বীথি যখন দোনামনা করছে, তখনই বিট্টু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে। নেক্সট যেদিন বেলার দিকে আসব, ছাদটা দেখব। আজ উঠি।

দরজার মুখ পর্যন্ত এসে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে বিট্টু ঘুরে দাঁড়াল।

বাই দ্য ওয়ে... আমাদের বাড়ির আলমারির চাবিগুলো শীতল ভট্টাচার্য বলছিলেন সরোজকাকার কাছে আছে। বাই এনি চান্স তুমি কি জানো চাবিগুলো কোথায়?

জানি। বাবার আলমারির লকারে আছে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি।

দু'মিনিটের মধ্যে একটা টিনের টিফিনবাক্স আর একটা লাল ভেলভেটের বাক্স নিয়ে ফিরে এল বীথি। বাক্সটা বিট্টুর হাতে দিয়ে বলল, এটার মধ্যে তোমাদের সব আলমারির চাবি আছে। তারপর লাল ভেলভেটের বাক্সটা খুলে বিট্টুকে দেখাতে দেখাতে বলল, তোমাদের বাড়ি যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম, সেদিন জেঠিমা এইটা আমাকে দিয়েছিলেন।

বিট্টু দেখল বাক্সটার মধ্যে দুটো ছোট্ট সোনার দুল। ছোট্ট করে মন্তব্য করল, ভেরি কিউট। চলি।

বিট্টু চলে যাওয়ার পরে অনেকক্ষণ একা একা ভাবতে বসেও বীথি কিছুতেই বুঝতে পারল না, বিট্টু এত ভোরে কেন এসেছিল? ওরকম রাত জাগা পরিশ্রান্ত মুখই বা ছিল

কেন? পৃথা লোকেনের কথা কেন জিজ্ঞেস করল? খুব কি নিজের মায়ের কথা মনে হচ্ছিল? সত্যি কি ছাদ থেকে ভোরের গঙ্গা দেখতে এসেছিল? লোক জানাজানির ভয় যাই থাক, বিট্টু কিন্তু দারুণ একটা ভোরের টাটকা আবেশ ছড়িয়ে দিয়ে গেল বীথির শরীরে, মনে।

রাতটা বাড়িতে কাটলেও, হোটেল থেকে চেক-আউট করা হয়নি। সরোজ বক্সীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিট্টু ঠিক করল হোটেলে ফিরে যাবে। গরম জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করবে। তারপর অল্প কিছু প্রাতঃরাশ করে নির্ঘুম রাতের ক্লান্তিটা এসির ঠান্ডায় চোখ বুজে দূর করবে। হোটেলের পর্চে গাড়ি থেকে নেমে বিট্টু যোগিন্দরকে বলে দিল শীতল ভট্টাচার্য আর দুলালকে জানিয়ে দিতে যে, সে এখন হোটেলেই বিশ্রাম করবে। কেউ যেন ডিসটার্ব করতে না আসে।

হোটেলের রিসেপশনের মাথায় পাঁচটা দেশের সময়ের পাঁচটা একইরকম ঘড়ি। সিডনি, টোকিও, দিল্লি, লন্ডন আর নিউ ইয়র্ক। লন্ডনের সময়টা ভোর সাড়ে চারটে। ঘড়িটা দেখে বিট্টুর হঠাৎ খেয়াল হল আজকে বাবার খোঁজ করা হয়নি। যদিও সময়টা এখন ঠিক রুটিন ফোন করার সময় নয়, তবুও রিসেপশন ডেস্ক থেকে লন্ডনের বাড়িতে ফোন করেই ফেলল বিট্টু। ডেভি গম্ভীর গলায় বলল, উনি কিন্তু তোমার জন্য এবার অস্থির হতে শুরু করে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে আরও পাঁচদিন সামলে রাখার মতো পরিস্থিতি থাকবে না। তুমি পারলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

ডেভি বোঝার চেষ্টা করো প্লিজ। লন্ডন থেকে কলকাতাটা নিউ ক্যাসেলের দূরত্ব নয়। তা ছাড়া তোমাকে তো সব বলেছি। সরোজকাকা এখনও হাসপাতালে। ওঁর জন্য আমার একটা কর্তব্য আছে। ইম্পর্ট্যান্ট বিজনেস মিটিংও আছে।

কর্তব্যটা তোমার বাবার জন্যও আছে। অসুখটা বাড়িয়ে তুলে আরও ডাক্তার দেখিয়ে আর ওষুধ খাইয়ে সারিয়ে তোলাটা ছেলের কর্তব্য নয়। তুমি তো ডাক্তার নও যে হাসপাতালে মিস্টার বক্সীর চিকিৎসা করছ। তোমার ওদের পাশে দাঁড়ানোর দরকার ছিল। এত দূর থেকে উড়ে গিয়ে তুমি প্রমাণ করেছ ওদের পাশে তুমি আছ...

বিট্টু চুপ করে শুনতে থাকল। ডেভি এরকমই অভিভাবকসুলভ। তবে তাতে কোনও ভণ্ডামি নেই। ডেভিকে আবার বোঝানোর চেষ্টা করল বিট্টু।

শুধু সরোজকাকাই নয়, তোমাকে বলছি না, আমাদের বিজনেসটার জন্য কয়েকদিন থাকা দরকার। অনেক কিছু সেট্‌ল করা দরকার।

তোমার বাবা। তোমার ব্যাবসা। সিদ্ধান্তটা তোমারই। কোনটায় তুমি অগ্রাধিকার দেবে। শুধু জানানোটা আমার কর্তব্য প্রীতম।

চোখটা বন্ধ করল বিট্টু। তারপর গলার স্বরটা নরম করে বলল, বাবার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

নিশ্চয়ই পারো। উনি তো শেষ রাতের দিকে ঘুমোতে যান। ঘণ্টা দুয়েক হয়েছে হয়তো ঘুমিয়েছেন। সিদ্ধান্ত তোমার। ইচ্ছে তোমার। তুমি চাইলেই আমি ঘুম থেকে তুলে দিতে পারি।

ডেভির শ্লেষভরা কথাগুলো শুনে বিট্টু অসহায়ের মতো বলল, তুমি এখনও রাগ করে আছ। আমি সত্যি দুঃখিত ডেভি। তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে যাচ্ছি।

অবসন্ন শরীরে যে ঘুম ভাবটা ছিল সেটা কেটে গেল। গরমজলে চান করে এসির ঠান্ডা হাওয়াতেও আর ঘুম এল না। হোটেলের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বিট্টু। যোগিন্দরকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাই একটা ট্যাক্সি ধরে চলে এল সরোজ বক্সীর হাসপাতালে।

সকালের ভিজিটিং আওয়ার্সে বিট্টু দেখল সরোজ বক্সী গতকালের তুলনায় অনেকটা যেন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো পরিষ্কার করে কামিয়ে দেওয়াতে মুখটাও অনেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

বিট্টু টুলটা সামনে এগিয়ে নিয়ে সরোজ বক্সীর হাতটা ধরে বলল, এই তো, একদম ঠিক হয়ে গেছেন কাকা।

কবে ছাড়বে কিছু বলল ওরা?

তাড়ার কী আছে? একদম সুস্থ হয়ে নিন, তারপরে বাড়ি ফিরবেন। আর যেন ফিরে আসতে না হয়।

সরোজ বক্সী ম্লান হাসলেন, অনেকদিন তো পৃথিবীতে কাটানো হয়ে গেল। এবার বোধহয় ওপরে যাওয়ার ডাক আসছে।

একদম এসব চিন্তা করবেন না কাকা। বীথির কথাটা একবারও ভাবছেন না! সরোজ বক্সীর মুখের ম্লান হাসিটা মিলিয়ে গেল।

ওই একটাই চিন্তা বাবা। মেয়েটার বিয়ে... তুমি বাবা একটু বুঝিয়ে বলে যেয়ো. .

দুশ্চিন্তাটা গতকালও দেখিয়েছিলেন সরোজ বক্সী। বীথিকে বোঝানোর কথাও বলেছিলেন। আজ সকালে একান্তে একটা সুযোগ এসেছিল। কিন্তু কথাটা খেয়ালই ছিল না। সরোজ বক্সী বোধহয় জীবনে প্রথমবার বিট্টুর কাছে কিছু চেয়েছেন। বিট্টু মনে মনে ঠিক করল ফিরে যাওয়ার আগে বীথির সঙ্গে কথা বলে যাবে। তবে আপাতত কথাটা ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, আমি পরশু ফিরে যাচ্ছি কাকা। কিন্তু যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা আছে। আপনার এখন কমপ্লিট রেস্ট দরকার। আপনি কিন্তু কোনও ভাবেই এখন আর অফিস যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।

সরোজ বক্সী মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু একটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট হাসি হাসলেন।

বিট্টু গলাটা খাঁকরিয়ে বলল, আমি এই ক'দিনে অনেক চিন্তা করে একটা ডিসিশন নিয়েছি কাকা। এই হরিতলা কটন মিল আমাদের কাউকে কোনও শান্তি দেয়নি। দিদিমাকে দেয়নি। বাবাকে দেয়নি। মাম্মিকে দেয়নি। আর এখন যখন সব দায়িত্ব আপনার, আপনাকেও কোনও শান্তি দিচ্ছে না।

সরোজ বক্সী আনমনা হয়ে বললেন, মেমসাহেবও এরকমই ভাবতেন। মেমসাহেব ভাবতেন হরির ঝিলে অভিশাপ আছে।

কথাটা শুনে বিট্টু অল্প উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সুপারস্টিশন আর পজেসিভনেস এক নয় কাকা। মাম্মি আসলে খুব ইমোশনাল

ছিল। মানছি হরির ঝিল নিয়ে মাম্মির একটা সেন্টিমেন্ট ছিল। কিন্তু সেটা যে এক্সটেন্টে মাম্মি নিয়ে গিয়েছিল, নিজের জীবনটাই...

থাক বাবা এসব কথা...

কাউকে তো এসব বলতে পারি না কাকা। বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াই। কিন্তু খুব অনেস্টলি যদি ভাবি, আমার আজকের এই জীবন... এটা কিন্তু মাম্মির জন্যই। উইথ অল মাই রেসপেক্ট, রিগার্ডস অ্যান্ড সেন্টিমেন্টস ফর মাম্মি, দিনের শেষে ওটাই কিন্তু সত্যি কথা।

সরোজ বক্সী মাথাটা ঝুলিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দয়াল সান্যাল এটাই চেয়েছিলেন। নিজের মায়ের জন্য বিট্টুর মনটাকে পুরোপুরি বিষিয়ে দেওয়া। অসুস্থ হয়ে নিজে আজ চিন্তাভাবনা করার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। কিন্তু বহু বছর আগে ছেলের কিশোর মনে যে বীজটা বপন করেছিলেন সেটা আজ একটা সার্থক বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

থাকগে কাকা। বিট্টুর কথায় সরোজ বক্সীর সংবিৎ ফিরল।

আপনাকে যে ডিসিশনটার কথা বলছিলাম। আমার কাছে দুটো অপশন আছে। এক, আমি লাখ পঞ্চাশেক টাকা ইনভেস্ট করে হরিতলা কটন মিলটাকে কিছুটা বাঁচাতে পারি। দুই, ব্যাবসাটার অর্ধেক শেয়ার বিক্রি করে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যেতে পারি। প্রথমটার প্রস্তুতি নিয়েই আমি কলকাতায় এসেছিলাম। কিন্তু শীতল ভট্টাচার্যকে ঠিক ভরসা করতে পারছি না। আমার কাছে বিনয় আর অভয় আগরওয়াল এসেছিল। ওরা অর্ধেক শেয়ার কিনে মিলটা চালানোর প্রস্তাব দিয়েছে। আমি অনেক ভেবে ঠিক করেছি, আগরওয়াল ভাইদের প্রস্তাবে আমি রাজি হয়ে যাব।

সরোজ বক্সী চমকে উঠলেন। এটা মালিকের সিদ্ধান্ত। একজন কর্মচারী হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধিতা করার কিছু নেই। তবু সিদ্ধান্তটায় বুকের মধ্যে যেন একটা শেল বিঁধল। একদম শূন্য থেকে ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজকে বড় হতে দেখেছেন। অনেক ঝড়ঝাপটা সামলেছেন। ইদানীংকালে নিজের একক বুদ্ধিতে সামলে রাখার চেষ্টা করেছেন। আগরওয়াল ভাইদের হাতে চলে যাওয়া মানে কোম্পানিটার সঙ্গে নিজের সংস্রব ছিন্ন করে ফেলা।

বিট্টু সরোজ বক্সীর নীরব প্রতিক্রিয়া বুঝে ফেলে বলল, আপনার পজিশনটা কিন্তু একই থাকবে কাকা। আপনি সান্যাল পরিবারের তরফ থেকে ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে রিপ্রেজেনটেটিভ থাকবেন। আপনাকে উপযুক্ত স্যালারি এবং সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করব। শুধু কটন মিলটা চালানোর জন্য ডে টু ডে অ্যাফেয়ারে ইনভল্‌ভড হতে হবে না। ফোনে কেউ আর উত্ত্যক্ত করবে না আপনাকে।

বিট্টু দেখল সরোজ বক্সীর উদাস চোখের কোণটা চিকচিক করছে।

সরোজদা, কী বাধালেন আপনি?

বিট্টু আর সরোজ বক্সী দু'জনেই একসঙ্গে দরজার দিকে তাকাল। প্রশ্নকর্তার দিকে সরোজ বক্সী তাকিয়ে নিজের আবেগ সামলে নিয়ে বললেন, আসুন, আসুন।

ভাল জায়গাতেই আপ্যায়ন করছেন সরোজদা। আমি তো কিছুই জানতাম না। বীথি আজ সকালে আমাকে ফোন করে বলল এই ব্যাপার। আমি তো ওকে খুব বকেছি। বললাম এক সপ্তাহ হতে চলল, এতদিনে তোর আমাকে খবর দেওয়ার কথা মনে পড়ল!

সরোজ বক্সী এবার ভদ্রলোকের সঙ্গে বিট্টুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, উনি হচ্ছেন তরুণ ঘোষ। মেমসাহেবের ল'ইয়ার ছিলেন।

বিট্টু একমুখ হেসে হাত মেলাল তরুণ ঘোষের সঙ্গে।

খুব ভাল হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে। বীথি আমাকে আপনার ফোন নম্বর দিয়েছে। এখান থেকে বেরিয়েই ফোন করতাম আপনাকে।

সরোজ বক্সী আর একবার মাথাটা নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। অর্ধেক মালিকানা হস্তান্তরের জন্য বিট্টুর তো সত্যি একজন পাশে আইনজ্ঞ চাই। ডি. এস. ইন্ডাস্ট্রিজ হাতবদল এবার সত্যিই আইনের হাত ধরে পাকা হতে চলেছে।

৮৮

তরুণ ঘোষ বিট্টুকে নিজের অফিসে নিয়ে এলেন। বীথি ফোনে শুধু সরোজ বক্সীর হার্ট অ্যাটাকের খবরটাই সকালে দেয়নি, সেই সঙ্গে বলেছিল বিট্টু কলকাতায় এসেছে এবং পৃথা আর লোকেনের খোঁজ জানতে চাইছে। গলাটা খাঁকরিয়ে তরুণ ঘোষ এই প্রসঙ্গটাই আগে তুললেন, বীথি বলছিল আপনি আমার কাছে জানতে চান লোকেনদের কোনও খোঁজ জানা আছে কিনা। প্রথমেই আপনাকে বলি, ওদের খোঁজ আমি জানি না। আমি ওদের চিনতামও না আর আমার কোনও আগ্রহও ছিল না ওদের খোঁজ রাখার।

বিট্টু ঠিক বুঝতে পারল না তরুণ ঘোষ সত্যিই ওদের খবর জানে না, নাকি বিট্টুর কাছে কিছু বলছেন না। বীথি বলেছিল ও নিজের কানে ওদের কথা আলোচনা করতে শুনেছে। তরুণ ঘোষের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলল, আপনি জুলিকে চিনতেন?

আপনি তো জানেন আমি আপনার মায়ের ল'ইয়ার ছিলাম। এবং সেটাও খুব গোপনে। আপনার বাবা জানতেন না। পৃথা আপনাদের সংসারে এসে বসেছিল আপনার মা মারা যাওয়ার পর। আর সরোজবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আপনি আপনার বাবাকে নিয়ে লন্ডনে চলে যাওয়ার পর। পৃথা, জুলি, লোকেন যাদের কথা আপনি জানতে চাইছেন, তাদের আমি যেটুকু জানি সেটুকু বক্সীবাবুর কাছ থেকে। তাতে আপনার মনের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারব না। আপনার মনের প্রশ্নগুলো অনুমান করতে পারছি। কারণ আমি যেটুকু জানি সবই টুকরো টুকরো। বলুন আর কোনও উপকার করতে পারি আপনার?

বিট্টু মাথা ঝাঁকাল, আর একটা উপকার নিশ্চয়ই করতে পারেন। আমাদের ডি এস

ইন্ডাস্ট্রিজের অর্ধেক শেয়ার আমি বিক্রি করে দেব। ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের ব্যাবসা হরিতলা কটন মিল নিয়ে। আমি চাই হরিতলা কটন মিলে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সবার যেন উপকার হয় এতে।' বিশেষ করে সরোজকাকার যেন পুরো ক্ষমতা আর সম্মান থাকে। লিগ্যাল পেপার ভেরিফিকেশন থেকে আরম্ভ করে পুরো প্রসেস এক্সিকিউশনটায় আপনি থাকুন।

তরুণ ঘোষ বিট্টুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এত ভরসা করে কাজটা দিচ্ছেন কেন?

কারণ আপনি মাম্মির ল'ইয়ার ছিলেন। তা ছাড়া ইংল্যান্ডে আমার যে জানাশুনো ল'ইয়াররা আছেন, তাঁরা কেউ ইন্ডিয়ান ল' নিয়ে ডিল করেন না।

আমি আপনার মায়ের ল'ইয়ার ছিলাম, এটা আপনাকে বীথি বলেছে বুঝি?

বীথি বলার আগের থেকেও আমি জানতাম। মাম্মির ডায়েরিতে আপনার কথা পড়েছি।

তরুণ ঘোষ একটু আত্মবিস্মৃত হয়ে বললেন, মিসেস সান্যালের ডায়েরিটা তা হলে শেষপর্যন্ত আপনি পেয়েছিলেন?

আপনি দেখেছিলেন মাম্মির ডায়েরিটা?

না দেখিনি। তবে জানতাম। শেষ দিন তো মিসেস সান্যাল ওই ডায়েরিটাই হরিহরকে দিয়েছিলেন পার্সেল করে ব্রাদার ডি'সুজাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। বেচারা হরিহর। পুলিশ নাকাল করে ছেড়েছিল।

বিট্টু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি চিনতেন হরিহরকাকাকে?

চিনতাম। হরিহর বড় ভালবাসত আপনাকে।

বিট্টু অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় আছে এখন হরিহরকাকা?

জানি না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছিল। তারপর দেশে চলে গিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই আর এমুখো হয়নি। এতদিনে বেঁচে আছে কিনা, তাও জানি না।

বিট্টুর ভেতরটা ভারাক্রান্ত হল। তরুণ ঘোষ একটু দম নিয়ে বললেন, দেখুন আপনি কিন্তু এখন যেটা চাইছেন, আইনের এই কাজটা করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি সম্পত্তি নিয়ে কাজ করি। আপনার দরকার একজন ভাল কোম্পানি ল'ইয়ার।

এরপর একটু চিন্তা করে বললেন, আমি একজনের কথা বলতে পারি। উনি একসময় আপনাদের হয়ে কাজও করেছিলেন। উনি হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলোও দিতে পারবেন এবং আপনাকে আইনের ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি খুব খুশি মনেই সাহায্য করবেন।

কে? উৎসুক হয়ে জানতে চাইল বিট্টু।

অনুপম ঘোষ। সম্পর্কে আমার দাদা হন। ইনফ্যাক্ট অনুপমদাই আমাকে মিসেস সান্যালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু...

তরুণ ঘোষ চুপ করে গেলেন।

কিন্তু কী মিস্টার ঘোষ?

মাথার চুলের মধ্যে হাতের আঙুলগুলো চালিয়ে তরুণ ঘোষ বলতে থাকলেন, আপনি আপনাদের হরিতলার সম্পত্তিটার বিরোধ... মানে... আপনার বাবা-মায়ের বিরোধটা কতটা ডিটেলসে জানেন?

বিট্টু গম্ভীর হয়ে বলল, সেভাবে বলতে গেলে পুরো কনফ্লিক্টটাই জানি। দু'জন দু'জনের জেদের জায়গায় বসে ছিলেন। একজনের স্বপ্ন ছিল তুলো আর একজনের পাখি।

খানিকটা হয়তো তাই। তবে উকিল হিসেবে একটা সোজাসাপটা কথা বলি। খুব খোলাখুলি অনেস্টি আর ডিজঅনেস্টির কথা বলতে গেলে অনেস্টিটা ছিল আপনার মায়ের দিকে আর ডিজঅনেস্টিটা ছিল আপনার বাবার দিকে।

থাক এসব কথা। মাম্মি চলে গেছে। আর বাবা থেকেও এসব বিষয়-সম্পত্তির ঊর্ধ্বে। তা ছাড়া বাবার যা বয়স হয়েছে, বাবা সুস্থ হয়ে উঠলেও এই সম্পত্তিটাকে নিয়ে নতুন করে বিরোধ হওয়ার আর কোনও চান্স নেই। কারণ যুদ্ধ করার অন্য পক্ষটাই তো আর নেই। এই সম্পত্তিটা নিয়ে বাবা যা ইচ্ছে করতে পারেন।

তরুণ ঘোষ সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললেন, হয়তো পারতেন। কিন্তু আপনার মা ওই সম্পত্তিটাকে পুরো একটা অর্গানাইজেশনকে দান করে দিতে চেয়েছিলেন। পুরো কাগজপত্তর আমি তৈরি করেছিলাম। যেদিন ওদের দেওয়ার কথা ছিল, সম্ভবত আপনার দিদিমার জন্মদিনের দিন, সেদিনই আপনার মা...। যাই হোক, আপনার বাবা খুব সহজেই কোর্টে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, যিনি এই ইচ্ছাপত্রটাতে সই করে আত্মহত্যা করেছেন তিনি সুস্থ মাথায় ছিলেন না। ওই বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো, যারা মাইগ্রেটরি বার্ড রিসার্চ সেন্টার করবে ভেবেছিল, তাদের মধ্যে আইনি মামলা লড়ার কোনও শক্তিই ছিল না। তা ছাড়া সেই ঘটনাটার পর ওরা নিজেরাই এত...

তরুণ ঘোষ একবার দম নেওয়ার জন্য থামলে সুযোগ পেয়ে বিট্টু বলল, আমার হাতে সময় খুব কম মিস্টার ঘোষ। পরশু আমি ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি আপনার দাদার কথা বলছিলেন, ওঁর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাবে কি আজকে? আমি ব্যাপারটা ইনিশিয়েট করে যেতাম।

মাথা ঝাঁকালেন তরুণ ঘোষ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলুন এখনই নিয়ে যাচ্ছি দাদার কাছে। শুধু যাওয়ার আগে আপনাকে একটু পুরনো দিনের কথাগুলো বলে রাখতে চাইছিলাম। আপনি তখন তো খুব ছোট ছিলেন...

বিট্টুর শুনতে চাওয়ার অনীহাকে অগ্রাহ্য করে তরুণ ঘোষ বলতেই থাকলেন পুরনো দিনের বিট্টুর অজানা কথাগুলো।

অনুপম ঘোষের বৃত্তান্ত বিট্টু যেটুকু শুনল তরুণ ঘোষের কাছ থেকে, তাতে করে কিছুতেই বুঝতে পারল না লোকটা ওকে সাহায্য করতে পারলে কেন খুশি হবে। বহু বছর আগে বাবার উকিল ছিল। বাবা নিজের স্বার্থে ওকে ব্যবহার করতে না পেরে জুলিকে দিয়ে

ওর সংসারে চরম অশান্তি ডেকেছিল। লোকটা প্রতিহিংসা নিতে ফুঁসেছিল। মাম্মির আত্মহত্যার জন্য আসল দায়ী কি তা হলে ওই লোকটাই? লোকটাকে দেখতে একটা আগ্রহ জন্মাল বিট্টুর ভিতর।

তরুণ ঘোষের অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে বসে তরুণ ঘোষের বলা ইতিবৃত্তান্ত শুনতে শুনতে বিট্টুর মনের তেতর এই কথাগুলোই ঘুরপাক খাচ্ছিল। তরুণ ঘোষ অনুপম ঘোষের অফিস বলে যে জায়গাটায় নিয়ে এল সেটা কোনও উকিলের অফিস না বলে অদ্ভুত একটা বৈঠকখানা বলাই ভাল।

এই বৈঠকখানাটার দেওয়ালে কোনও আইনের বই ঠাসা আলমারি নেই। এমনকী কোনও চেয়ার-টেবিলও নেই। ঘরের একটা দেওয়ালে এক মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়াধারীর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গির অয়েল পেন্টিং। সর্বত্র ধূপধুনোর একটা গন্ধ। বসার জন্য একটা বড় ফরাস পাতা আছে।

বিট্টুর অবাক হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে তরুণ ঘোষ বললেন, এটা দাদার মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলার ঘর। ক্লার্ক টাইপিস্ট জুনিয়ররা ভেতরে বসে। ওদের ঢোকার রাস্তা অন্য দিকে। বসুন আপনি, আমি দাদাকে ডেকে নিয়ে আসছি।

তরুণ ঘোষ ভেতরে চলে গেলেন। বিট্টু একটা অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে জুতোটা দবজার বাইরে খুলে ফরাসের ওপর এসে বসল। একটু পরেই তরুণ ঘোষ সঙ্গে করে যে ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন তাঁকে দেখেও একইরকম অবাক হল বিট্টু। বুঝতে অসুবিধা হল না ইনিই অনুপম ঘোষ। একমুখ দাড়িগোঁফ। পিছনের চুলটাও লম্বা। টানটান করে গার্টার দিয়ে বাঁধা। পরনে লুঙ্গির মতো বেড় দিয়ে পরা একটা সাদা ধবধবে ধুতি। গায়ে একটা ফতুয়া।

অনুপম ঘোষ ঘরে ঢুকে প্রথমেই হাতজোড় করে নতমস্তকে অয়েল পেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নমস্কার করলেন। তারপর বিট্টুর দিকে ফিরে তাকালেন। বিট্টু উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নমস্কার করল। বয়সে অনেক ছোট বিট্টুকে 'আপনি' বলাব সৌজন্য না দেখিয়ে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলেন অনুপম ঘোষ।

গুরুদেব তোমার মঙ্গল করুন।

বিট্টু ঠিক বুঝতে পারছিল না, এখানে এসে বৃথা সময় নষ্ট হচ্ছে, না সত্যিই কাজের কাজ কিছু হবে। অনুপম ঘোষের ইশারায় বিট্টু আবার ফরাসে বসে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এল।

আমি দয়াল সান্যালের ছেলে। আমি জানি বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কোথায় শুরু হয়েছিল আর কোথায় শেষ হয়েছে।

শেষ হয়নি। সম্পর্কটা আছে বলেই তুমি আজ এখানে এসেছ। গুরুদেব বলেছিলেন তুমি একদিন আসবে আমার কাছে। গুরুদেবের কোনও কথা আজ পর্যন্ত না-ফলা হয়নি।

অনুপম ঘোষ গুরুদেবের অয়েল পেন্টিং-এর দিকে তাকিয়ে আবার জোড় হাতে একটা নমস্কার করলেন। তরুণ ঘোষ বলে উঠলেন, দাদা, উনি ভাবছেন তোর আর

দয়ালবাবুর মধ্যে এত কিছু হয়ে যাওয়ার পর এখনও তোর মনে ওঁর সম্পর্কে কোনও ইয়ে আছে কিনা?

তরুণ ঘোষের অব্যক্ত শব্দগুলোর অর্থ বিট্টু বুঝতে পারল। নিজের মনের ভেতর এধরনের একটা প্রশ্ন থাকলেও এতক্ষণ কখনওই সরাসরি তরুণ ঘোষের সামনে প্রশ্নটা করেনি বিট্টু। নিজের উদ্যোগেই তরুণ ঘোষ বরফটাকে গলিয়ে রাখতে চাইছেন। অনুপম ঘোষ তরুণের প্রশ্নটা শুনে চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে বললেন, গুরুদেব বলতেন তিনটে জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। ক্রোধ, গর্ব আর ক্ষমা না করা। বলো তুমি কী জানতে চাও?

অনুপম ঘোষ চোখ খুলে চাইলেন। এতক্ষণ গাড়িতে আসতে আসতে যতটুকু শুনেছিল তরুণ ঘোষের মুখ থেকে তাতে কল্পনার একটা চেহারা এঁকে নিয়েছিল অনুপম ঘোষের সম্পর্কে। বাস্তবে তার কোনওটাই মেলেনি। না চেহারায়, না আচরণে। এই মানুষটার ওকালতি পেশার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে সেটাও যেমন বোঝা যাচ্ছে না, সেরকমই বোঝা যাচ্ছে না কোনও কালে বাবার সঙ্গে একটা চরম সংঘাত ছিল। বরং মনে হচ্ছে কোনও আশ্রমে বসে আছে। লোকটার কাছে দুটো মাত্র জানার ব্যাপার আছে। এক, পৃথা, লোকেন, জুলির খোঁজ; আর দুই, ব্যাবসার ব্যাপারে কিছু আইনি পরামর্শ করে কাজটা করার দায়িত্ব দেওয়া। ক্রমানুসারে প্রথম প্রশ্নটাই করল বিট্টু।

পৃথা-লোকেনদের কোনও খবর আপনি জানেন?

অনুপম ঘোষ প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, ওরা কেন তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল তুমি জানো?

লোকটা কি মনের কথা পড়তে পারে? এই প্রশ্নটাই তো কালকের অস্থির রাতটার পর থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সরোজ বক্সীর কাছে বহু বছর আগে চিঠিতে জেনেছিল ওরা চলে গেছে। সান্যাল বাড়ির যতটা সম্ভব ক্ষতি করে চলে গেছে। ক্ষতিটা অপূরণীয়। তবে চলে গেছে খবরটাই বিট্টুকে চরম নিশ্চিন্ত করেছিল। কেন চলে গেছে এই প্রশ্নটা এতদিন মনেই হয়নি। কিন্তু কালকের সেই অদ্ভুত নির্ঘুম রাতের পর থেকে এই প্রশ্নটাই তো নিরন্তর খুঁচিয়ে যাচ্ছে ভেতর থেকে।

বিট্টুকে চুপ করে থাকতে দেখে অনুপম ঘোষই বলতে আরম্ভ করলেন, ওদের দু'জনের একটা অদ্ভুত রোগ হয়েছিল। গায়ে অল্প অল্প করে ফোসকার মতো ঘা হতে আরম্ভ করেছিল। আর্সেনিক পয়জনিং থেকে যেরকম হয়।

জল থেকে? আমাদের বাড়ির জলে আর্সেনিক ছিল?

একই জল তো সবাই খেত। তোমার বাবা থেকে আরম্ভ করে তোমাদের বাড়ি ভরতি চাকরবাকর, দারোয়ান, মালি, সবাই। শুধু বেছে বেছে দু'জনের কেন হল?

বিট্টু একটু চিন্তা করে বলল, তা হলে তো একটাই মানে হয়, কেউ ওদের স্লো পয়জনিং করে, পরিকল্পিতভাবে...

অনুপম ঘোষ মৃদু হাসলেন, ওরা কিন্তু তা মনে করত না, ওরা ভাবত অভিশাপ আর তোমার মায়ের... থাক। গুরুদেব বলতেন তিনটে জিনিসের শেষ একসময় না একসময় আসেই। দুঃস্বপ্ন, দুঃসময় আর দুঃখ। ঘটনাটা তোমাদের বাড়ির তিনটে জিনিসই শেষ করেছিল।

কিন্তু ওদের কী হল?

লোকেন গ্রামে ফিরে গিয়েছিল। হয়তো বহুরূপী পেশায় বাকি জীবনটা কাটাচ্ছে। আর পৃথা কলকাতা ছেড়ে অন্য কোনও বড় শহরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত যদি অন্য শহরের কোনও উপায়ের কথা বলতে পারি। তারপর একদিন আসা বন্ধ হল। বুঝতে পারলাম ও অন্য কোথাও চলে গেছে।

কী করে জানলেন ও সত্যি কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে?

কলকাতাটা খুব ছোট জায়গা। ওর খবর ঠিকই পেতাম। আমিও খুঁজেছিলাম ওকে। গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাব বলে, কিন্তু ওর খোঁজ আর পাইনি।

আর জুলি?

অনুপম ঘোষ আবার চোখ দুটো বন্ধ করলেন। এবার চোয়াল দুটো শক্ত দেখাল।

গুরুদেব বলতেন জীবনে তিনটে জিনিস খুব ক্ষণস্থায়ী। সৌভাগ্য, সাফল্য আর স্বপ্ন। আমি চেয়েছিলাম জুলিও গুরুদেবের আশ্রমে বাকি জীবনটা কাটাক। কিন্তু পৃথার মতো জুলিও সেই চিরস্থায়ী শান্তির পথ নিল না। সৌভাগ্য, সাফল্য আর স্বপ্নকে ধরতে আরব দেশে চলে গেল।

খবরটা শুনে বিট্টু চুপ করে গেল। শুধু মনে হল মনের ভেতরটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে লাগল। একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। গাড়িতে আসতে আসতে আপনার সঙ্গে বাবার সম্পর্কের কথা শুনতে শুনতে আমি এটা ভেবে খুব অবাক হচ্ছিলাম যে মিস্টার ঘোষ কেন আপনার কাছে আমাকে নিয়ে আসছেন। এখন মনে হয় উত্তরটা আমি ঝাপসা হলেও বুঝতে পারছি।

আমি গুরুদেবের নির্দেশ অনুভব করতে পারি। তুমি আমার কাছে যে-পরামর্শের খোঁজেই এসে থাকো, জানবে তা গুরুদেবের নির্দেশিত পথেই এসেছ।

বাবা আর কোনওদিনই কলকাতায় ফিরে আসবেন না। আমার নিজেব লন্ডনে অন্য ব্যাবসা। সুতরাং কলকাতার, হরিতলার ব্যাবসার ঝঞ্ঝাট বইবার আর কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। ব্যাবসার একটা বড় অঙ্কের শেয়ার আমি বিক্রি করে দিতে চাই। আপনার ফার্ম যদি এই লিগ্যাল কাজটা আমার হয়ে করে দেয় তা হলে প্রক্রিয়াটার একটা অংশের জন্য নিশ্চিত হই।

অনুপম ঘোষ চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার আমার. ব্যাপারে কোনও সংশয় নেই?

না নেই, কারণ এই ব্যাবসায় আমার হারানোর কিছু নেই।

তুমি তা হলে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও, গোটা ব্যাবসাটাই তুমি বিক্রি করে দিচ্ছ না কেন?

কারণ, কোথাও হয়তো আমার ছোট্ট একটা সেন্টিমেন্ট রয়ে গেছে। বাবা এত কষ্ট করে ব্যাবসাটা গড়ে তুলেছিলেন। বুঝুন বা না-বুঝুন ওঁকে আর শোনাতে চাই না তুমি এই ব্যাবসাটার আর মালিক নও।

আর তোমার দিদিমা? জানো উনি কত কষ্ট করে সম্পত্তিটা করেছিলেন। তোমার মা,

তিনি কত কষ্ট করে তোমার দিদিমার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। হরিতলা শুধু তোমার বাবার একার নয়। তোমার মায়ের স্বপ্নটা আন্তরিক ছিল।

মাম্মি ভুল করেছিল। অবাস্তব একটা স্বপ্ন দেখেছিল। ওই যে বললেন আপনার গুরুদেব বলেছেন স্বপ্ন খুব ক্ষণস্থায়ী।

অনুপম ঘোষ চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চোখটা খুলে খুব শান্ত গলায় বললেন, গুরুদেব কোন স্বপ্নের কথা বলেছেন, তুমি হয়তো তার মানেটাই বুঝতে পারোনি। যেমন তুমি তোমার মায়ের মনটাই বুঝতে পারোনি।

বিট্টুর বিরক্ত হয়ে অধৈর্য লাগছিল। এখন বসে বসে এই লোকটার কাছে শুনতে হবে নাকি মাম্মি আসলে কেমন ছিল? মাম্মির মনটা কেমন ছিল? বহু বছর ধরে বুকের মধ্যে অভিমান পাথরচাপা পড়ে রয়েছে। সেই পাথরটা একবার নড়ে গেলে দুর্বার লাভাস্রোতের মতো বুক ঠেলে উঠে আসবে সেই অভিমান। খুব সচেতনভাবে অদৃশ্য পাথরটাকে শক্ত করে চেপে রাখার চেষ্টা করতে থাকল বিট্টু। অনুপম ঘোষের অবশ্য এসবে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

তুমি কবে যেন ফিরে যাবে বললে?

পরশু। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল বিট্টু।

আমি তার আগে জানিয়ে দেব আমার পরামর্শ।

ব্যাবসার শেয়ার বিক্রির জন্য যাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে সেই আগরওয়ালদের সঙ্গে কাল এ-ব্যাপাবে আমার ফাইনাল মিটিং। আমাকে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিতে হবে। তারপর কাগজপত্তর তৈরির কাজ। অবশ্য আপনি খুব ব্যস্ত থাকলে...

অনুপম ঘোষ ইঙ্গিতটা ধরে নিয়ে বললেন, বুঝেছি। ঠিক আছে আমাকে দশটা মিনিট সময় দাও।

বিট্টু হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। অনুপম ঘোষ ধ্যানমগ্নের মতো গুরুদেবের ছবির দিকে কিছুক্ষণ ঘুরে বসে বললেন, গুরুদেবের সংকেতটা স্পষ্ট হচ্ছে।

৮৯

কাজের দিন দুপুরবেলা রেস্তোরাঁটা বেশ ফাঁকা। বীথিকে নিয়ে তার মধ্যেও একটা নির্জন কোণে বসল বিট্টু। ওয়েটার এসে দু'জোড়া মেনুকার্ড দিল। মেনুকার্ডটা খুলে পড়তে অস্বস্তি হল বীথির। বিট্টু সেটাকে লক্ষ করে বলল, কী খাবে বলো!

বীথির লজ্জাটা যেন আরও বেড়ে গেল। বিট্টু আজ দুম করে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছে। বিট্টু তো কলকাতায় এসেছে বীথিরই কথায়। অথচ বীথি কিনা সেদিন সকালে যখন বিট্টু গিয়েছিল এক কাপ চা ছাড়া আর কিছু দিয়ে আপ্যায়নই করতে পারেনি।

আমার না খুব খারাপ লাগছে বিট্টুদা। তুমি এতদিন পরে এলে, কোথায় তোমাকে রান্না করে একদিন খাওয়াব, তা না তুমিই আমাকে খাওয়াতে নিয়ে এলে।

তুমি বুঝি খুব ভাল রান্না করো?

ভাল কিনা জানি না, তবে যারা খেয়েছে খুব একটা নিন্দামন্দ করেনি।

বিট্টু মেনুকার্ডটায় চোখ ডুবিয়ে বলল, নেক্সট টাইম যখন আসব, ট্রাই করে দেখব নিন্দেমন্দ করা যায় কিনা। কী স্যুপ ভালবাসো?

অ্যাঁ?

চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ, কোরিয়েন্ডার স্যুপ, থাই স্যুপ... বিট্টু গড়গড় করে মেনুকার্ড থেকে স্যুপের নামগুলো পড়ে যেতে থাকল।

এনিথিং। বীথি বিট্টুকে থামানোর চেষ্টা কবল।

মেনুকার্ডটা নামিয়ে রেখে বিট্টু বলল, আমার কোনও খাটনি নেই, পরিশ্রম নেই, শুধু মুখ ফুটে একটা স্যুপের নাম বলে দেওয়া...

ওফ্। আমি যদি তোমাকে বাড়িতে রান্না করে খাওয়াই, তা হলে কিন্তু তোমাকে প্রতিটি পদ এভাবে জিজ্ঞেস করে রাঁধব না। আমার যেটা বেস্ট মনে হবে সেটাই রাঁধব।

ব্যাপারটায় ইতি টানল বিট্টু। বীথির সঙ্গে বেশ কিছু কথা আছে। হাতে সময় কম। রেস্তোরাঁর নিরিবিলিটা উপযুক্ত স্থান। চিকেন ক্লিয়ার স্যুপ, ফ্রায়েড গোল্ডেন প্রন আর ঠান্ডা বিয়রের অর্ডার দিয়ে বীথির চোখের দিকে তাকিয়ে বিট্টু বলল, থ্যাঙ্ক ইউ বীথি।

কীসের জন্য?

কলকাতায় আসার খুব দরকার ছিল। তুমি না বললে..

বীথির মধ্যে পুরনো লজ্জাটা ফিরে এল। সেদিন মাথার ঠিক ছিল না। বাবার ওই অবস্থায় নিজেকে পাগল পাগল লাগছিল। মনটা কুচিন্তায় ভরে গিয়েছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, বাবা চলে গেলে এই পৃথিবীতে একেবারে একলা হয়ে যাবে। আর সবটুকু রাগ গিয়ে পড়েছিল বিট্টুর ওপর।

আমি সত্যি সরি বিট্টুদা।

বিট্টু মাথা ঝাঁকাল, সরি. . সরি কেন হতে যাবে? তুমি জানো না তুমি আমার কী উপকার করেছ।

কথাটা হেঁয়ালির মতো শোনাল। এর মধ্যে উপকারের কী দেখল বিট্টুদা! বীথি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেলল, কী তোমার উপকার হল বিট্টুদা?

উপকার একটা নয়, অনেক। হরিতলা কটন মিলটা নিয়ে একটা ডিসিশনে আসার দরকার ছিল অনেকদিন আগে। শেষ পর্যন্ত সেটায় আসা গেল।

বীথি চোখটা একটু ছোট করে বলল, বিক্রি করে দিতে হল তাই না? জেঠু কতটা ফিল করতে পারবেন জানি না। কিন্তু বাবার ডেফিনিটলি খুব মন খারাপ হবে. .

বিট্টু বিয়ারে একটা চুমুক দিয়ে মাথা ঝাঁকাল, বিক্রি হয়নি। অদ্ভুত একটা সলিউশন দিলেন অনুপম ঘোষ। পনেরো বছরের জন্য লিজ দিয়ে দেওয়া।

লিজ দিয়ে দেওয়া মানে?

মানে সম্পত্তিটা আমাদেরই থাকল। আগরওয়ালরা কারখানাটা চালাবে। লাভ, লোকসান, দায় সব ওদের। লিজ দেওয়ার জন্য একটা টাকা আমরা পাব।

তারপর পনেরো বছর পর?

অতদিনের পরের কথা কি কেউ বলতে পারে? হয়তো আরও পনেরো বছরের জন্য লিজটা রিনিউ হবে। আসল শান্তিটা কোথায় জানো? বাবাকে অ্যাটলিস্ট মিথ্যেটা বলতে হবে না যে, বাবা তোমার ব্যবসার অর্ধেকটা বিক্রি করে দিয়েছি। এনি ওয়ে, অনুপম ঘোষের ফার্ম পুরো ব্যাপারটা দেখবে। হরিতলা থেকে তুমি সরোজকাকার ছুটি চেয়েছিলে না? আমি সরোজকাকার ইন্টারেস্টের পুরো ব্যাপারটা দেখতে বলেছি। তোমাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়...

আমি এসব জানতে চাইনি।

আবার তুমি ইমপ্র্যাকটিকালের মতো কথা বলছ। সরোজকাকার ছুটি হয়ে যাওয়ার আগে, তোমার উচিত সরোজকাকার প্রাপ্যটা পুরো বুঝে নেওয়া।

সব জায়গায় প্র্যাকটিকাল হওয়া যায় না।

বিট্টু উত্তেজিত হয়ে বিয়ারের মাগে লম্বা চুমুক দিল।

প্র্যাকটিকাল না হলে ভুগবে। সারা জীবন ভুগবে। মাম্মি যেমন...

বিট্টু চুপ করে গিয়ে আবার বিয়ারের মাগে চুমুক দিয়ে আনমনা হয়ে গেল। বীথি নিচু গলায় বলল, জেঠিমা একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। আমি খুবই কম দেখেছি জেঠিমাকে, কিন্তু ভুলতে পারিনি। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই।

বিট্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তারপর পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করে টেবিলের উপর রাখল। বীথি চাবিগুলো চিনতে পারল। সান্যালবাড়ির আলমারির চাবি।

রেখে দাও চাবিগুলো। শেষপর্যন্ত হয়তো ভুলে পকেটেই থেকে যাবে।

ওরা সব নিয়ে গেছে, তাই না?

বিট্টু ম্লান হাসল, হয়তো। কী নিয়ে গেছে জানি না। ইন ফ্যাক্ট কী ছিল তাই তো জানি না। তবে যেটা থেকে যাওয়ার সেটা থেকেই গেছে।

যেমন?

অনেক কিছু। আমার হ্যাম রেডিয়ো সেট।

চালিয়ে দেখলে?

ঠোঁট ওলটাল বিট্টু।

নাঃ! তবে পরেরবার যখন আসব ওটা নিয়ে যাব। ছোটবেলার স্মৃতি। একসময় খুব ভাল বন্ধুর সঙ্গ দিয়েছে।

পৃথার কোনও খোঁজ পেলে?

না। কোথাও একটা চলেটলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে জানাটা আর ইম্পর্ট্যান্ট নয়। তবে কেন চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল, বোধহয় বুঝতে পেরেছি।

সেদিন সকালে তুমি কিন্তু ওদের কথা জানতেই ছুটে এসেছিলে।

বিট্টু বিয়ারটা শেষ করে মেন কোর্সের অর্ডার দিয়ে বলল, আমি কেন ছুটে গিয়েছিলাম, আসল কারণটা শুনবে?

বীথি উৎসুক মুখ করে চেয়ে থাকল।

সেদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনেছিলাম। টুং টুং... টুং টুং...। কেউ যেন অন্ধকার বারান্দায় ঝুমুর পরে হেঁটে যাচ্ছে। বহু বছর আগে আমি ঠিক এরকম একটা আওয়াজ শুনেছিলাম। ঘুম থেকে উঠে বন্ধ দরজার চাবির গর্ত দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম। মা কালী হেঁটে চলেছেন।

বিট্টুর বর্ণনা শুনে ভরদুপুরে নির্জন রেস্তোরাঁতেও বীথির গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। বিট্টু ওর বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলল, সেটা ছিল লোকেন। এখন বুঝতে পারি ওরা দিনের পর দিন এভাবে বাবাকে দুর্বল করে দিত।

কিন্তু সেদিন রাতে কে ছিল?

কাউকে দেখতে পাইনি। সত্যি কথা বলতে কী একটু ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলাম। আনক্যানি ফিলিংস একটা।

বীথি চোখ বন্ধ করে কপালে হাত ঠেকাল, ভয় পাওয়ারই কথা।

বিট্টু মুচকি হাসল, রহস্যটা কিন্তু কালকে রাতেই বুঝতে পারা গেল।

কী? আবার চোখ বড় বড় করে বীথি জিজ্ঞেস করল।

দোনামনা ছিল, কাল রাতে আবার বাড়িটায় একা থাকব কিনা। শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম, উত্তরটা জানতে আমাকে থাকতেই হবে। দুলালের বউও ইতস্তত করে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল আমি যাতে না থাকি।

তারপর?

আমারও জেদ চেপে গেল থাকবই। এবং থেকে শেষমেশ রহস্যটা উদ্ধার হল। দুলাল টেবিলে একটা খাওয়ার জলের বোতল রেখে যায়। বোতলের ওপর একটা গ্লাস উলটে রাখে। ফ্যানটা ফুল স্পিডে ঘুরলে গ্লাসটা হাওয়ায় দোলে আর বোতলের ধাক্কা খেয়ে টুং টুং... টুং টুং আওয়াজ করে। আর একটা ক্যালেন্ডার হাওয়ায় দুলে দেওয়ালে খসখস আওয়াজ করে।

বীথির মুখের দুশ্চিন্তার রেখাগুলো দূর হল।

উফ্ বাবা, আমার তো শুনেই কীরকম গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আমি হলে কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর থাকতে পারতাম না। এরকম আনক্যানি ফিলিংস।

আনক্যানি তো ডেফিনিটলি। কিন্তু সেটার বাইরেও আরও কিছু ফিলিংস রয়ে গেছে। যাক গে সেসব কথা...

বিট্টু মন দিয়ে খেতে খেতে বলল, তোমার সঙ্গে আরও একটা কথা ছিল বীথি। ব্যাপারটা হয়তো পারসোনাল। তবু তোমার সঙ্গে যা সম্পর্ক, তাতে করে তোমাকে বলাই যায়। সরোজকাকাকে নিশ্চিন্ত করতে তুমি এবার বিয়ে করো বীথি।

খাওয়া থামিয়ে বীথি মুখ তুলে তাকাল, তোমাকে বাবা বলতে বলেছে তাই না?

না, সেভাবে সরোজকাকা বলেননি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই সরোজকাকার এই দুশ্চিন্তাটা আরও বাড়বে।

আমি বিয়ে করলে বাবার কী হবে বিট্টুদা? বাবা ভীষণ একা হয়ে যাবে। বয়স হচ্ছে। তার ওপর শরীর খারাপ...

বিট্টু একটা লম্বা শ্বাস টেনে বলল, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ দেখলে, এটাই তো প্র্যাকটিকাল।

আমার বিয়ের কথা বাদ দাও। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব বিট্টুদা? তোমার ওপর খুব রাগ করে বলেছিলাম, বাবাকে মুক্তি দাও। তুমি সত্যিই দিলে। কিন্তু ভয় হচ্ছে, সব কিছু ছেড়ে বাবা থাকতে পারবে তো?

নিশ্চয়ই পারবেন। আমি চেষ্টা করব সরোজকাকার শরীরে মনে চাপ না পড়ে এরকম কিছু ছোট ছোট কাজ সরোজকাকাকে দিয়ে রাখতে। আর তোমার বিয়ের পর, ধরো আমি যদি সরোজকাকাকে লন্ডনে নিয়ে যাই? বাবার কাছে... তোমার কি আপত্তি আছে?

বীথি চুপ করে গেল। তারপর ফিসফিস করে বলল, আমার কথা ভাবলে না? আমার যদি বাবাকে দেখতে ইচ্ছে হয়, মন খারাপ করে, একছুটে কি আমি বাবার কাছে লন্ডনে যেতে পারব? তা ছাড়া বাবাও রাজি হবে না বিট্টুদা। নিজের জায়গাটা ছাড়া বাবা আর কোথাও গিয়ে থাকতে পারবে না। বিশেষ করে যামিনীজেঠু মারা যাওয়ার পর। যামিনীজেঠু বাবার মেন্টর ছিলেন বলতে পারো। দিন দশেক হল মারা গেছেন। অফিসের ঝামেলা আর যামিনীজেঠুর মৃত্যু, দুটোই একসঙ্গে হয়ে বাবাব হার্ট অ্যাটাকটা হল। যামিনীজেঠুর কেউ নেই। আজকে বোধহয় ওঁর শ্রাদ্ধের দিন হত। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যামিনীজেঠুর শ্রাদ্ধটা করার। তুমি চিনতে যামিনীজেঠুকে...

বিট্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, চিনতাম? আমি দেখেছি ভদ্রলোককে?

হ্যাঁ দেখেছ। বাবার কাছে শুনেছি গঙ্গায় জেঠিমার যখন অস্থি বিসর্জন দিয়েছিলে তখন যামিনীজেঠু...

বিট্টুর দৃষ্টি ঝাপসা হল। মনে পড়তে থাকল মায়ের ছাইয়ের কলস হাতে গঙ্গার ঘাটে এক নিদারুণ শোকের সন্ধ্যার অন্ধকারের কথা। সরোজকাকার সঙ্গে ঝাপসা এক প্রৌঢ়। খুব খারাপ একটা মন্ত্র বলেছিল লোকটা। মন্ত্রতে মাম্মিকে প্রেতাত্মা বলেছিল। সব হয়ে যাবার পর লোকটা ভেঙে পড়ে বলেছিল, এ তুমি আমাকে দিয়ে কী করালে সরোজ? এর পরেও আরেকবার দেখা হয়েছিল যামিনী ভট্টাচার্যর সঙ্গে। বিট্টুর উপনয়ন উনি নিজে হাতে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন একটা গীতা। বলেছিলেন এটা সবসময় নিজের কাছে রেখো। বিট্টু লন্ডনের বাড়িতে আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছে গীতাটা। ভদ্রলোকের নামটা ভুলে গেলেও স্নেহপ্রবণ মুখটা মনে পড়ে গিয়ে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল বিট্টুর।

খাওয়াটা অর্ধসমাপ্ত রেখে ন্যাপকিন দিয়ে মুখটা মুছে প্লেটটা অল্প সরিয়ে দিয়ে বিট্টু বুঝিয়ে দিল ওর খাওয়া হয়ে গেছে।

আয়াম স্যরি বিট্টুদা। এসব কথা তোমাকে মনে করানো উচিত হয়নি।

নেভার মাইন্ড। তুমি আরাম করে খাওয়াটা শেষ করে নাও। আমি একটা ফোন করে আসছি।

শেষ দুপুরের দিকে বিট্টু বীথিকে শোভাবাজারে নামাতে এল। এবারেও বীথি যথারীতি

বিট্টুকে বাড়িতে আসতে বলল। বিট্টু বীথিকে জিজ্ঞেস করল, গঙ্গার সেই ঘাটটা কোথায় জানো?

বীথি বুঝতে পারল বিট্টু কোন গঙ্গার ঘাটের কথা বলছে।

যাবে তুমি?

পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিট। শেষ দুপুরে সেরকম ভিড় নেই ঘাটটায়। সূর্য ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়ছে। ঘাটের সিঁড়িগুলো ভেঙে বিট্টু গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

বীথি আজকে তোমার যামিনীজেঠুর শ্রাদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সরোজকাকা, তাই না?

বীথি মাথা নাড়ল।

এখানে কোথাও ফুল পাওয়া যাবে?

দেখছি বিট্টুদা, দোকানটা এখন খোলা আছে কিনা।

বীথি ঘাট থেকে উঠে গিয়ে একটা ফুলের দোকান খোলা পেয়ে গেল। অল্প কিছু কুচো ফুল একটা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে নিয়ে এসে বিট্টুর হাতে দিল। আঁজলা করে ফুলগুলো নিয়ে নিচু হয়ে বিট্টু গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে দু'হাত জোড় করে তাকিয়ে থাকল। ভাটার টানে দুলতে দুলতে পাপড়িগুলো ভেসে চলল।

৯০

লন্ডনে ফিরে এসে ডক্টর ব্রাউনের কাছে দয়াল সান্যালকে নিয়ে এল বিট্টু। ডক্টর ব্রাউন দয়াল সান্যালকে রুটিনমাফিক পরীক্ষা করে বললেন, নতুন করে কিছু খারাপ তো দেখছি না প্রীতম। ওঁর রোগটা একই জায়গায় ফ্রিজ করে আছে।

নিশ্চিন্ত করলেন ডক্টর। আসলে ডেভি বলছিল বাবা খুব রেস্টলেস হয়ে পড়ছিল।

সেটা স্বাভাবিক প্রীতম। ইদানীংকালে তোমাকে ছেড়ে থাকার অভ্যাস তো ওঁর নেই। তুমি কাছে না থাকলে একটা সেন্স অফ ইনসিকিয়োরিটি গ্রো করে যায়।

সেই জন্যই তো বাবাকে ছেড়ে একদিনের বেশি বাইরে কোথাও থাকতে পারি না। কিন্তু এবার তো বিজনেসের কাজে একটু বেশি বাইরে বাইরে থাকতে হবে। তাই ভাবছি কীভাবে ম্যানেজ করব!

তোমাকে বলেছিলাম না, ওঁকে একটা চেনা পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করো। তুমি দেশ থেকে ওঁর ব্যক্তিগত ব্যবহার করা জিনিস কিছু এনেছ?

বিট্টু হাতের ব্যাগটা থেকে দয়াল সান্যালের ব্যবহার করা অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস বার করে দেখিয়ে বলল, আপনার কথামতো চেষ্টা করেছি যতটা আনা যায়।

পেন, পেপারওয়েট, চাবির রিং, কৌটো—এইসব দেখতে দেখতে ডক্টর ব্রাউন বললেন, গুড, ভেরি গুড। এগুলো তোমার গোটা ফ্ল্যাটে ছড়িয়ে রাখো।

বিট্টু ব্যাগ থেকে আর একটা প্যাকেট বার করে ডক্টর ব্রাউনের দিকে এগিয়ে বলল, আর একটা ছোট্ট উপহার, আপনার জন্য।

ডক্টর ব্রাউন হাসিমুখে প্যাকেটটা নিয়ে জানতে চাইলেন, কী এটা?

ইন্ডিয়ান শাল। দুটো কিনেছি। একটা বাবার আর একটা আপনার।

বিট্টুর পিতৃসম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন দেখে ডক্টর ব্রাউন আবেগমথিত হয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ মাই চাইল্ড। এই বুড়ো লোকটার কথা শপিং করার সময় তোমার মনে ছিল।

শালটা বার করে দেখতে যাওয়ার সময় প্যাকেটটার মধ্যে থেকে কয়েকটা কাগজ বেরিয়ে মাটিতে পড়ল। ডক্টর ব্রাউন নিচু হয়ে কাগজটা তুলে বিট্টুর হাতে ফেরত দিলেন। বিট্টু একটু ইতস্তত করে বলল, এটাও আপনার জন্য এনেছিলাম। আসলে আপনাকে যাতে দিতে ভুলে না যাই তাই এই প্যাকেটটার মধ্যে রেখেছিলাম।

ডক্টর ব্রাউন কাগজগুলো এক লহমা দেখে স্কুলের খাতার লাল-নীল রুলটানা পাতাগুলোয় চোখ বুলিয়ে হেসে ফেললেন।

আমার জন্য রিকার্সিভ হ্যান্ড রাইটিং করে এনেছ?

আপনি আমাকে একদিন বলেছিলেন না, খোলা মনে দু'পাতা লিখতে। কলকাতায় একদিন সুযোগ হল...

ডক্টর ব্রাউন এবার গম্ভীর হলেন। আগাগোড়া বিট্টুর লেখাটা পড়ে জিজ্ঞেস কবলেন, এই উপাসনা কে?

বিট্টু জানে এই প্রশ্নের পর ডক্টর ব্রাউন আর কী কী প্রশ্ন করবেন। তাই সবটুকু একবারেই বলতে আরম্ভ করল।

উপাসনা একজন বিবাহিত মহিলা। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। পিকাডেলি সার্কাসের কাছে একটা ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে কাজ করে। অনর্গল কথা বলতে পারে। বিশেষ করে হিন্দি সিনেমার গল্প। ওকে দেখে আমার ভীষণ জুলির কথা মনে হয়। ওর সঙ্গে আমার কিন্তু বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই।

ডক্টর ব্রাউন গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার মনের সঙ্গে মেয়েটার কতটা সম্পর্ক আছে সেটা তোমার লেখাটা থেকেই বুঝতে পারছি। লেখাটা থাক আমার কাছে। তোমাকে শুধু একটাই অ্যাডভাইস দেব, জুলিকে যদি ভুলতে চাও, মহিলা জাতটার ওপর চরম বিতৃষ্ণার পাথরটা যদি ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলতে চাও, তা হলে এই মেয়েটার সঙ্গ ছেড়ো না। তবে মেয়েটা যেহেতু বিবাহিত, সম্পর্কটাকে অহেতুক জটিল করে বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে যেয়ো না।

বিট্টু উঠে পড়ে বলল, মনে রাখব।

ডক্টর ব্রাউন ড্রয়ার খুলে শিপ্রা সান্যালের ডায়েরি দুটো বার করে ফেরত দিয়ে বললেন, তোমাকে আমি আগে বলেছিলাম তোমার মায়ের ডায়েরিগুলো পোড়ো না। আমি ভুল বলেছিলাম। ঠিক যে-পরিস্থিতিতে নিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দু'পাতা লিখেছ, সেরকমই নিজের মনকে একদম শূন্য করে দিয়ে ডায়েরিগুলো পড়ো। মহীয়সী

মহিলা ছিলেন তোমার মা। ঠিক করে যদি বুঝতে পারো, হতাশা নয়, তোমার মায়ের লেখা তোমাকে উদ্বুদ্ধই করবে।

ডায়েরি দুটো নিয়ে অবশ্য বিশেষ ভাবার সময় পেল না বিট্টু। কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর প্রথমবারের মতো পিটারের সঙ্গে একটা জটিলতা শুরু হল। সেটা হল সেই আশি হাজার পাউন্ড নিয়ে। যে জন্য পিটারের কাছে বিট্টু অর্থটা চেয়েছিল, আগরওয়ালদের লিজে হরিতলা কটন মিলটা দিয়ে দেওয়াব জন্য তার আর কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পিটার জেদ ধরে বসল বিট্টুর জন্য একবার যখন পাউন্ডটা পাওয়া গেছে, নিজেদের কোম্পানির জন্যই লাগানো হোক পাউন্ডটা। বিট্টুকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হয়েছিল কিন্তু ক্রমশ লক্ষ করতে থাকল কোথায় যেন পিটারের সঙ্গে একটা তাল কেটে যাচ্ছে। বিট্টু কয়েকবার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, এটা হয়তো মনের ভুল। একদিন পিটারের সঙ্গে বসে খোলাখুলি আলোচনা করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিলেই হবে। কিন্তু নিজের ইতস্ততায় সেই আলোচনাটায় আর বসা হচ্ছিল না। একদিন বেশ রাতের দিকে পিটারই বিট্টুকে ডেকে নিল কথা বলার জন্য।

প্রীতম উই নিড টু টক অন সার্টেন থিংস।

ইয়েস। আমিও ভাবছিলাম তোর সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার।

পিটার সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এল।

উই নিড টু পার্ট।

মানে? চমকে উঠল বিট্টু।

তুই তো জানিস আমাদের কোম্পানিতে আমার ফ্যামিলির একটা বড় ইনভেস্টমেন্ট আছে। এবার বাবা খুব সিরিয়াস। কোম্পানিটা অনেক বড় হয়েছে। টার্নওভার বেড়েছে। দেরিতে হলেও বাবা বুঝতে পেরেছে কম্পিউটারের ব্যাবসাটা আর খেলনার ব্যাবসা নয়। হয়তো বাবার যে-কোনও কোম্পানির চেয়ে এই কোম্পানির অনেক বেশি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। বাবা চায় এখানে আরও অনেক বেশি ইনভেস্ট করতে। কিন্তু শর্ত একটাই। কোনও পার্টনারশিপ চলবে না। আসলে আমাদের ফ্যামিলি পার্টনারশিপে কোনও ব্যাবসা করে না।

বিট্টু চুপ করে শুনছিল। পিটারের বলা শেষ হয়ে গেলে বলল, হঠাৎ করে কেন ব্যাপারটা সামনে এল?

পিটার উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হঠাৎ করে নয়। এটার জন্য তুই-ই দায়ী। তুই ইন্ডিয়ায় যাওয়ার আগে হঠাৎ করে একগাদা পাউন্ড চাইলি। আমি সিরিয়াসলি চেষ্টা করেছিলাম। বাবার কাছে পাউন্ড চেয়েছিলাম। প্রয়োজনটা শুনে বাবা বলল, তোর আসল ইন্টারেস্ট এই ব্যাবসায় নেই। তোর আসল ইন্টারেস্ট তোর বাবার ইন্ডিয়ায় সুতোর ব্যাবসায়...

তুইও কি তাই বিশ্বাস করিস। পাউন্ডটা তো শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ায় লাগেনি। আমাদের কোম্পানিতেই ব্যবহার হচ্ছে।

পিটার মাথা ঝাঁকাতে থাকল, আমি কী বিশ্বাস করি সেটা ইম্পর্ট্যান্ট নয়। বাবা তোর কী অ্যাটিটিউড দেখেছে, আরও ইনভেস্টমেন্ট করার আগে সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট।

বিট্টু টেবিল চাপড়ে বলল, আলবত ইম্পর্ট্যান্ট। তুই তোর বাবাকে কনভিন্স করাতে পারতিস। সত্যিটা বলতে পারতিস।

না, পারতাম না। কারণ বাবা অভিজ্ঞ। ব্যাবসাটা হৃদয় দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে বোঝে।

বিট্টু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ঠিক আছে আমার উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি।

পিটার এগিয়ে এসে বিট্টুর কাঁধে হাত রেখে বলল, এটা মান-অভিমানের কথা নয়। হয়তো বিটল্ সফটের এটাই ভবিষ্যৎ ছিল। আজ না হলে কাল হত। আমাদের পার্টনারশিপ ভেঙে গেলে কী হবে, আমরা ভাল বন্ধু হয়ে, ভাল অ্যাসোসিয়েট হয়ে কাজ করতে পারি।

অথবা ভাল রেষারেষি নিয়ে।

পিটার শ্রাগ করে বলল, সেটা আমাদের দু'জনের অ্যাটিটিউডের ওপরই নির্ভর করবে।

বিট্টু উদাস হয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বলল, কলকাতায় গিয়ে এবার একজন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে আলাপ হল জানিস তো। ভদ্রলোক কথায় কথায় ওঁর গুরুদেবের তিনটে করে উপদেশ শোনান। খুব সহজ সরল উপদেশ কিন্তু খুব দামি। সেরকমই একটা কথা বলেছেন। তিনটে জিনিস একবার ভেঙে গেলে আর কখনও জোড়া লাগে না। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আর বন্ধুত্ব। ঠিক আছে। পার্টনারশিপটা কীভাবে ভাঙবে আয় আমরা বসে সেটা ঠিক করি।

পিটার খুশি হয়ে চেয়ারে বসে বলল, ঠিক। তিক্ততায় না গিয়ে ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। কাগজে পার্টনারশিপের যাই থাক, এক্ষেত্রে আমি বাবার মতো মাথা দিয়ে ভাবিনি। হৃদয় দিয়ে ভেবেছি। তোর একটা পুরো ক্লায়েন্টবেস ঠিক করে রেখেছি। এগুলোতে আমি আগামী পাঁচ বছর হাত দেব না। লন্ডনের একটা অফিস তোর। ছ'টা অনগোয়িং প্রজেক্ট তোর। এমপ্লয়িদের ব্যাপারটা আমরা ঠিক করে নেব। ওদের ফ্রি চয়েস দেওয়া হবে। ব্র্যান্ডনেমটা উইথ সাম সাফিক্স তুই উইজ করতে পারিস। আর তোর শেয়ারের অংশটার কত দাম হবে, অ্যাকাউন্ট্যান্ট সেটা ঠিক করে নেবে...

বিট্টুর বুকের ভেতরটা খালি খালি লাগছিল। পিটার সব গুছিয়ে ঠিক করে রেখেছে। বিট্টুর সঙ্গে কথা বলার অপেক্ষায় ছিল। নিজের পরিকল্পনাটা তুবড়ির মতো ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। ঠিক হয়ে গেল ভেঙে দুটো কোম্পানি হবে। বিট্টুর বিটল্ সফট ইউনিভার্সাল আর পিটারের বিটল্ সফট ইন্টারন্যাশনাল।

ফ্ল্যাটের দরজাটা খুলে অবসন্ন বিট্টুকে দেখে চমকে উঠল ডেভি।

তোমার শরীর খারাপ নাকি?

না। ক্লান্ত পায়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বিট্টু বলল।

তোমাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। কী হয়েছে?

বিট্টু ম্লান হাসল, কিছু হয়নি। বাবা কোথায়?

চোখের ইশারায় ডেভি শোওয়ার ঘরটা দেখিয়ে বলল, ওখানে...

ঘরে ঢুকে বিট্টু দেখল দয়াল সান্যাল মন দিয়ে টিভিতে কার্টুন দেখছেন। বিট্টুকে দেখে একগাল হেসে বললেন, তুই কোথায় ছিলি বাবা?

এই তো একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

দয়াল সান্যালের পাশে এসে বসল বিট্টু। দয়াল সান্যাল বিট্টুর মাথায় হাত রেখে বললেন, এমারসন সাহেব এসেছিলেন। বললেন তুই আজকে কলেজে যাসনি।

বিট্টু ডেভির দিকে তাকাল। ডেভি এখন অল্প বাংলা বোঝে। বিট্টুকে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল, কেউ আসেনি। এটা দয়াল সান্যালের অলীক চিত্রণ। বিট্টু বাবার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, কী বলল এমারসন সাহেব?

বলল, তুই খুব ভাল লেখাপড়া করছিস। হরিতলা কটন মিলটা তুই অনেক অনেক বড় করবি। তোর মা ফোন করেছিল। বলল, তুই ব্যাবসাটা করলে হরিতলার দু'একর জমিটা তোকে দিয়ে দেবে।

ডেভির দিকে তাকিয়ে বিট্টু ইশারায় জানতে চাইল, বাবা ওষুধ খেয়েছেন কিনা। ডেভি নীরবে ঘাড় হেলাতে, চোখের ইঙ্গিতে বিট্টু ডেভিকে বাইরে যেতে বলল।

বিট্টুর চোখটা জ্বালা জ্বালা করছিল। বুকের ভেতর কী যেন একটা দলা পাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তালগোল পাকাচ্ছে। দয়াল সান্যালের হাত দুটো ধরে নিজের চোখের ওপর চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, আমার ব্যাবসাটা আজ ভেঙে গেল বাবা।

দয়াল সান্যাল একটা শূন্য দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে বিট্টুর দিকে চেয়ে বললেন, মগন শেঠ বলত কাউকে বিশ্বাস করবি না। তুই সরোজকেও বিশ্বাস করবি না। তোর মায়ের সঙ্গে ও চক্রান্ত করেছিল আমাকে মেরে দেবে বলে...

বিট্টু এবার ফুঁপিয়ে উঠল, বাবা আমার দুঃখ-যন্ত্রণা শোনার জন্য কি পৃথিবীতে একজনও নেই? কার সঙ্গে আমি কথা বলব বাবা?

সপ্তাহের কাজের দিনে ভরদুপুরে ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে বিট্টুকে দেখে অবাকই হল উপাসনা। এসময় কাস্টমার এমনিই কম। তার ওপর বিট্টুর মতো ব্যস্ত কাজের ছেলেরা এসময় প্রায় আসেই না।

কেমন আছেন প্রীতম? অনেকদিন পরে এলেন। আমি আপনার জন্য একটা বাংলা ক্যাসেট অনেকদিন ধরে সরিয়ে রেখেছি। গুরুদক্ষিণা। মিউজিকাল সিনেমা। বেঙ্গলে খুব হিট হয়েছে।

বিট্টু একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে উপাসনাকে দেখছিল। এই দৃষ্টিটা অন্যরকম। একটা অস্বস্তি আছে। তবে ওর জন্য বিট্টুর মুগ্ধতাটা এতদিনে জানা হয়ে গেছে উপাসনার।

তুমি কি খুব ব্যস্ত?

উপাসনা চুপ করে গেল। সত্যিকার সেরকম ব্যস্ততা তো এখন নেই। কাস্টমারের ভিড় তো হয় বিকেল থেকে। আর সামনে দাঁড়ানো ছেলেটার মুগ্ধ দৃষ্টিটার মতোই মনের

ইচ্ছেটাও খানিকটা জানা হয়ে গেছে উপাসনার। কফিশপে বসে খানিকক্ষণ সময় কাটাতে চায়। সিনেমার গল্প শুনতে চায়। মুখ টিপে হেসে উপাসনা বলল, ক্যাপাচিনো?

বিট্টু চোখটা ছোট করে বলল, আর একটু বেশি। আজ একসঙ্গে লাঞ্চ করলে কেমন হয়?

উপাসনা জানে এখন ছুটি পাওয়া কোনও ঝক্কির ব্যাপারই নয়। কাজের চাপ না থাকলে দোকানের মালিক ছুটকো-ছাটকা এক-আধ ঘন্টার ছুটি দিতে ঘ্যানঘ্যান করে না। তা ছাড়া ছেলেটা বেশ ইন্টারেস্টিং। সিনেমা দিয়ে কথা শুরু হলেও নানা বিষয়ে কথা ঘুরে যায়। দিব্যি লাগে সেসব শুনতে।

উপাসনা ঘড়ি দেখে বলল, মনে হয় ম্যানেজ করতে পারব। দাঁড়ান আমি বলে আসি।

ভিডিয়ো লাইব্রেরির বাইরে বেরিয়ে এসে উপাসনা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, যাক, আজ মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে না। লাইব্রেরির থেকে বেরোতে পারলে, উফ... কী যে ভাল লাগে। ভেতরটা কীরকম বদ্ধ। দমবন্ধ করা একটা গন্ধ। ভিডিও টেপের।

ওটা সিনেমার গন্ধ।

ইউ আর কারেক্ট মিস্টার প্রীতম।

বিট্টু হাঁটা বন্ধ করে উপাসনার দিকে চেয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এত ফর্মাল কেন বলো তো?

ফর্মাল? ফর্মাল কোথায়? তা হলে আপনি ডাকলেই কি বেরিয়ে আসতাম? এককথায় আমি চলে এসেছি।

তুমি আমাকে বন্ধু মনে করো?

অফকোর্স মনে করি। তাই তো...

জাস্ট কল বিট্টু। বিট্টু আমার ডাকনাম। আর আপনি নয় তুমি।

উপাসনা নাকটা একটু কুঁচকে বলল, ঠিক আছে। কিন্তু বিট্টুর চেয়ে প্রীতম নামটাই আমার বেশি পছন্দ।

কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁতে এসে ঢুকল ওরা। অল্পবিস্তর এশীয় খাবার পাওয়া যায় রেস্তোরাঁটাতে। বিরিয়ানির অর্ডার দিয়ে নিশ্চিত হয়ে বসে বিট্টু বলল, তোমার কাছে একটা গোটা হিন্দি সিনেমার গল্প শুনব। কিন্তু তার আগে তোমাকে দেওয়ার জন্য একটা জিনিস আছে।

পকেট থেকে রঙিন গিফ্‌ট পেপারের মোড়ক বার করে উপাসনার হাতে দিল বিট্টু।

কী এটা? মোড়কটা হাতে নিয়ে উপাসনা জিজ্ঞেস করল।

মুখে একচিলতে হাসি নিয়ে বিট্টু বলল, খুলেই দেখো।

মোড়কটা খুলে একরাশ বিস্ময় নিয়ে উপাসনা দেখল একজোড়া শাঁখা আর পলা।

ওয়াও। দারুণ সুন্দর। কোথা থেকে কিনলে?

কলকাতা।

তুমি কবে কলকাতায় গিয়েছিলে?

গিয়েছিলাম। মাস দু'য়েক হয়ে গেল। তোমাকে দেব দেব করে আর দিতে আসাই হচ্ছিল না।

উপাসনা শাঁখা-পলাটা হাতে গলিয়ে নিয়ে তারিফের চোখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকল।

একবারে ঠিক সাইজের। সাইজটা কীভাবে আন্দাজ করলে?

বিট্টু ভুরু নাচিয়ে বলল, একজন সাহায্য করেছে।

নিশ্চয়ই মেয়ে সে।

বিট্টু ঠোঁট উলটে রহস্যের হাসি হাসল।

তোমার গার্ল ফ্রেন্ড?

তুমি যে অর্থে গার্ল ফ্রেন্ড ভাবছ, সে অর্থে গার্ল ফ্রেন্ড নয়। বাট সর্ট অফ ফ্রেন্ড বলতে পারো, অ্যান্ড হু ইজ ইনসিডেন্টালি আ গার্ল অলসো।

উপাসনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, একটা সত্যি কথা বলবে? তোমার কেন আমার কথা মনে হল?

আরও সত্যি কথা শুনবে? কলকাতায় যখন একা ছিলাম, তোমার কথা ভীষণ মনে হত। একদিন রাতে তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম...

চিঠি? তোমার কোনও চিঠি তো আমি পাইনি।

পাওনি। কারণ সেই চিঠিটা শেষ হয়নি। কিছুতেই শেষ করতে পারিনি।

উপাসনা আরও গম্ভীর হয়ে বলল, প্রীতম তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি বিবাহিত।

নিশ্চয়ই জানি। জানি বলেই তো বিবাহিতা বাঙালি মেয়েরা যেরকম সাদা-লাল চুড়ি পরে, সেরকম তোমার জন্য নিয়ে এলাম।

ভিডিয়ো লাইব্রেরির মেম্বারশিপ ফর্মে তোমার যা ডেট অফ বার্থ লিখেছ, সেই হিসেবমতো তুমি আমার চেয়ে বয়সে চার বছরের ছোট। তোমাকে বোধহয় আগেও বলেছিলাম এটা।

তুমি কী প্রমাণ করতে চাইছ উপাসনা?

আমি তোমাকে এটুকুই বোঝাতে চাইছি, তুমি একজন তোমার চেয়ে বয়সে বড় বিবাহিত মহিলার সঙ্গে কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা কোরো না।

বিট্টু অবাক হয়ে উপাসনার দিকে তাকাল। এ যেন সেই ছটফটে অনর্গল হিন্দি সিনেমার গল্প বলে যাওয়া মেয়েটা নয়। অন্য কেউ। ডক্টর ব্রাউনের মতো। মাথাটা ঝুলিয়ে নিচু গলায় বিট্টু বলল, আমি কখনও কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে চাইনি। তবু হঠাৎ হঠাৎ কীরকম যেন সম্পর্কে জড়িয়ে গেছি। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম আমার মনে হয়েছিল একটা হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ককে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিলাম, যাকে আমি একটা সময় মনেপ্রাণে ঘেন্না করতাম আবার তাকে ভুলতেও পারিনি। কিন্তু কেন তোমাকে আমার এত আপন মনে হয় জানি না। কোনও এক্সপ্লেনেশন নেই আমার কাছে। বেসিক্যালি আমি কিন্তু খুব লোনার। ছোটবেলার থেকে সম্পর্কহীন হয়ে একা একা বড় হয়েছি।

উপাসনা বিট্টুর হাতের ওপর হাত রেখে বলল, ইউ ওয়ান্ট কম্পানি?

ইয়েস, আই ব্যাডলি ওয়ান্ট আ কম্পানি। একটা সম্পর্কহীন সঙ্গ।

উপাসনার সেদিন আর ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে কাজে ফেরত যাওয়া হয়নি। বিট্টু একটা ঘোরের মতো বলে গিয়েছিল নিজের জীবননামা।

৯১

একদিন রাতে বাড়ি ফিরে আসার পর ডেভি একটা বড়সড় খাম নিয়ে এসে বিট্টুর হাতে দিল। বিট্টু খামটা হাতে নিয়ে প্রেরকের ঠিকানা দেখে বুঝতে পারল খামটা পাঠিয়েছে কলকাতা থেকে অনুপম ঘোষের ফার্ম। খামটা খুলে একগোছা টাইপ করা স্ট্যাম্প পেপার আর অনুপম ঘোষের হাতে লেখা একটা চিঠি পেল। চিঠিটাতে অনুপম ঘোষ সংক্ষেপে লিখেছেন হরিতলা কটন মিলের লিজ চুক্তি পনেরো বছরের জন্য আগরওয়াল ভাইদের সঙ্গে করার প্রয়োজনীয় কাগজপত্তর তৈরি করে পাঠালেন। ওতে দরকার শুধু দয়াল সান্যালের সই। বিট্টুর কথামতো লিজের টাকা বিট্টুর লন্ডনের ব্যাঙ্কে পাউন্ডে পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিট্টু যেন কাগজপত্তর খুঁটিয়ে পড়ে বুঝে দয়াল সান্যালকে দিয়ে সই করিয়ে কলকাতায় অনুপম ঘোষের অফিসে পাঠিয়ে দেয়।

বিট্টু বেশ কয়েকবার খুঁটিয়ে পড়ল লিজ ডিডটা। সমস্ত কিছু প্রাঞ্জল করে বুঝে অনুপম ঘোষের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল বিট্টুর। ভদ্রলোক সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে লিজ ডিডটা তৈরি করেছেন।

দয়াল সান্যাল বসার ঘরে সোফায় বসে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখছিলেন। বিট্টু স্ট্যাম্প পেপারগুলো হাতে করে পাকিয়ে নিয়ে এসে দয়াল সান্যালের পাশে বসে বলল, বাবা তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

টিভিতে লিভারপুল আর চেলসির ম্যাচ চলছিল। বিট্টুর কথায় টিভির থেকে মুখ ঘুরিয়ে দয়াল সান্যাল বললেন, কোন দলটা মোহনপুর জানিস?

বিট্টু রিমোটের বোতামটা টিপে টিভিটা বন্ধ করে বলল, বাবা আমাকে একটা ডিসিশন নিতে হয়েছে।

দয়াল সান্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন, টিভি বন্ধ করে দিলি কেন? ডুমুরঝরায় একবার শ্মশানকালীর মাঠে বল খেলা হয়েছিল। তারপর জানিস কী হয়েছিল... সেই কাপালিকটা...

দয়াল সান্যালের মুখটা ভয়ে নীল হয়ে গেল। বিট্টু দয়াল সান্যালের পিঠে হাত রেখে বলল, জানি, তুমি কিছুই বুঝবে না। তবু তোমাকে না বলে এই কাজটা আমি কিছুতেই করতে পারব না। আমি বাধ্য হচ্ছি বাবা। হরিতলা কটন মিলটা আর আমাদের হাতে ধরে রাখতে পারলাম না বাবা। কিছুদিনের জন্য এটা অন্য লোকের হাতে দিতে হচ্ছে।

দয়াল সান্যাল হাঁ করে বিট্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আর মাঝে মাঝে সেন্টার

টেবিলে রাখা স্ট্যাম্প পেপারটা দেখছিলেন। হঠাৎ করে ছোঁ মেরে স্ট্যাম্প পেপারগুলো তুলে নিয়ে বললেন, কে পাঠাল এটা?

অনুপম ঘোষ।

দয়াল সান্যালের মুখে এক চিলতে হাসি খেলে গেল। তারপর আঙুলটা ঠোঁটের ওপর ঠেকিয়ে বললেন, চুপ। চুপ। তোর মাকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। তুই চুপচাপ সরোজকে এটা দিয়ে দে। একটা মেয়েছেলের ঠিকানা ওতে দেওয়া আছে। তোর মায়ের সইটা নকল কবে নিয়ে আসবে। কেউ ধরতে পারবে না। বুড়ো আঙুলটা দোলাতে থাকলেন দয়াল সান্যাল।

তুমি এটা সই করে দাও বাবা।

বুড়ো আঙুলটা দোলানো থামিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দয়াল সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, কী লেখা আছে এতে?

হরিতলা কটন মিল পনেরো বছরের জন্য আগরওয়ালদের লিজ দিচ্ছি আমরা। বিট্টু মাথা নিচু করল।

আঠারো বেলের পেমেন্ট বাকি আছে আগরওয়ালদের। দিয়েছে ওরা?

হ্যাঁ দিয়েছে বাবা।

কাউকে বিশ্বাস করবি না। তোর মা বিরাট চক্রান্ত করছে। পৃথা জানে।

বিট্টু পেনটা খুলে দয়াল সান্যালের হাতে ধরিয়ে বলল, আই অ্যাম সরি বাবা। কিন্তু এটা আমাকে করতেই হচ্ছে।

একে একে সই এবং টিপসই অনুপম ঘোষের নির্দেশমতো সবই করাল বিট্টু। কিন্তু কাজটা করাতে গিয়ে নিজের মনটা একদম ভেঙে যাচ্ছিল। এই অন্যায়টা বাবার সঙ্গে করতে হবে কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। বারবার ভেতরে অপরাধবোধটা তাড়া করে ফিরছিল।

কাজটা হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে উপাসনাকে ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে ফোন করল বিট্টু।

উপাসনা, ব্যাডলি তোমাকে মিট করতে চাই।

কখন?

এখনই।

এখন? এখন তো অনেক রাত! আর আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আমার বর আসবে আমাকে নিতে।

আমি কিছু জানি না উপাসনা।

প্লিজ বোঝার চেষ্টা করো।

আমি কিছু বুঝতে চাই না উপাসনা।

একটু চুপ করে থেকে উপাসনা বলল, ঠিক আছে, এসো।

মিনিট পনেরোর মধ্যে পিকাডেলি সার্কাসে চলে এল বিট্টু। ভিডিয়ো লাইব্রেরির সামনে পর্যন্ত যাওয়ার দরকার হল না। তার আগেই এক জায়গায় অপেক্ষা করছিল উপাসনা। বিট্টু খেয়াল করেনি। উপাসনাই ডেকে নিল বিট্টুকে।

অ্যাই প্রীতম।

বিট্টু চমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর উপাসনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হল। কাছে এগিয়ে এসে উপাসনার হাতটা ধরে বলল, থ্যাঙ্কস উপাসনা। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমরা কতক্ষণ একসঙ্গে থাকতে পারব?

কতক্ষণ থাকতে চাও? মুচকি হেসে বলল উপাসনা।

ধরো যদি বলি সারারাত...

ঠিক আছে।

বিট্টুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সত্যি বলছ? তোমার হাজব্যান্ড?

ওকে মিথ্যে বলতে হয়েছে। বলেছি বন্ধুর বাড়ি থাকব। ফোনে তোমার গলা শুনেই বুঝেছি, তুমি সহজে ছাড়ার পাত্র নও আজকে। তোমার মধ্যে পাগলটা আজ জেগেছে। কিন্তু কোথায় থাকব? সারারাত তো রেস্তোরাঁ খোলা থাকবে না তোমার জন্য।

কফিশপ খোলা থাকবে। অথবা আমরা সারারাত পার্কের বেঞ্চে বসে কাটাতে পারি।

ওরে বাবা। তা হলে আমি নেই।

বিট্টু একটু চিন্তা করে বলল, তা হলে আমার ফ্ল্যাটে চলো।

দয়াল সান্যাল জেগেই ছিলেন। ডেভি বাড়ি চলে গিয়েছিল। দরজার ল্যাচ ঘুরিয়ে উপাসনাকে পিছনে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দয়াল সান্যাল তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ উপাসনার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, জুলি। তুমি কেন এসেছ আমার বাড়িতে? সরোজকে তো বলেছি তোমার টাকাটা দিয়ে দিতে...

বাবা ও জুলি নয়। উপাসনা। আমার বন্ধু।

তোর বন্ধু? মেয়েছেলে?

বিট্টু অস্বস্তিটা চেপে বলল, বাবা তুমি যে সিনেমা দেখো, ওই সিনেমাগুলো উপাসনাই আমাকে দেয়। আজ ও তোমাকে দেখতে এসেছে।

দয়াল সান্যাল আর কিছু বললেন না। বিরক্ত চোখে উপাসনাকে দেখতে থাকলেন। বিট্টু ব্যাপারটা খেয়াল করে দয়াল সান্যালকে যত্ন করে তুলে ধরে বলল, চলো বাবা শুতে চলো। অনেক রাত হয়েছে।

দয়াল সান্যালকে শুইয়ে ঘরের দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল বিট্টু। উপাসনার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, আমাদের সোফাটা কিন্তু পার্কের বেঞ্চ নয়। এনি ওয়ে কী খাবে বলো। ফ্রিজে বার্গার আছে। অন্য কিছু চাইলে আনিয়ে দিচ্ছি।

কিচ্ছু দরকার নেই। বসো তুমি। পরে খিদে পেলে খাব।

বিট্টু দুটো ওয়াইন এনে সেন্টার টেবিলে রেখে উপাসনাকে লক্ষ করে বলল, তোমাকে আজ এত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন?

এই দুম করে রাতে তোমার বাড়ি চলে এলাম। একটু বোধহয় বেশিই অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেল।

তুমি বিশ্বাস করো আজ ভীষণ ডিস্টার্বড হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকে সেদিন বলেছিলাম মনে আছে? কলকাতায় আমাদের ব্যাবসার কথা। বাবা তিলতিল করে যে

ব্যাবসাটা তৈরি করেছিল আজ তার লিজ ডিডটাতে বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে দিলাম। কিন্তু বাবা নিজেও জানে না বাবা কী সই করল। এটা একটা ভীষণ পাপবোধ। পিটারের সঙ্গে যেদিন পার্টনারশিপ ব্রেক আপের কাগজটা সই করেছিলাম, সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম নিজের তৈরি কোম্পানিটাকে শেষ করে দেওয়ার সইটা করতে কত কষ্ট হয়। খুব ডিপ্রেসড হয়ে গেলে আমার খুব ভয় করে। আই ব্যাডলি নিড কম্পানিয়ন।

কেন, ভয় করে কেন?

তোমাকে তো বলেছি। আমার মাম্মি সুইসাইড করেছিল। আমার মধ্যেও হয়তো সেই প্রবণতাটা আছে।

উপাসনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ডিপ্রেশন? তুমি আমার জীবনের ডিপ্রেশন জানো? প্রত্যেক দিন রাতে রাশি রাশি ডিপ্রেশন নিয়ে রাত জেগে সকালে আমাকে লোককে হিন্দি সিনেমার গল্প বলতে হয়।

তোমার কীসের এত ডিপ্রেশন?

আমাদের সাত বছর বিয়ে হয়ে গেছে। ঈশ্বর আমাদের কোনও সন্তান দেননি। তা ছাড়া সন্দীপ... সেদিন তুমি তোমার সব কথা আমাকে বলেছিলে। তুমি আমার জীবনটা শুনবে?

তোমাকে আমার জীবনের কথা বলে সেদিন খুব হালকা হয়েছিলাম। সেরকমই তুমি যদি তোমার জীবনের কথা বলে হালকা হতে চাও, বলো। তার আগে রিল্যাক্স করো উপাসনা। আমাদের দু'জনেরই রিল্যাক্সেশনের খুব দরকার।

উপাসনা দু'চোখ বন্ধ করে ফেলল। তারপর হতাশ গলায় বলতে থাকল, কাল সন্দীপ ঠিক ধরে ফেলবে।

কী ধরে ফেলবে?

ওকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি। আমি তোমার বাড়িতে রাত কাটিয়েছি।

ছাড়ো না এসব কথা। বিট্টু প্রসঙ্গ ঘোরানোর চেষ্টা করল। জীবনের গল্প ছেড়ে বরং রঙিন গল্প বলো। চলো একটা নতুন হিন্দি সিনেমার গল্প বলো।

উপাসনার ওয়াইনের গ্লাসটা এগিয়ে দিল। গ্লাসটা হাতে ধরে উপাসনা জিজ্ঞেস করল, জুলি কে? তোমার বাবা আমাকে জুলি ভেবেছিলেন।

বিট্টু চুপ করে গেল। নিজের জীবনের প্রায় গোটা গল্পটাই উপাসনাকে বলেছে বিট্টু। দিদিমার কথা, দিদিমার পেশার কথা, মায়ের কথা, হরির ঝিলের কথা, রবার্ট, ব্রাদার ম্যাকার্থি, পৃথা, লোকেন, এমনকী জুলির কথাও। কিন্তু এতগুলো চরিত্রের মধ্যে জুলির কথা বলার সময় কেন জানে না জুলির নামটাই শুধু উহ্য রেখে গিয়েছিল। কথা ঘোরানোর চেষ্টা করতে বিট্টু বলল, জুলি একটা সিনেমা আছে না?

উপাসনা ম্লান হাসল, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। ঠিক আছে আপত্তি থাকলে বোলো না।

বিট্টু আবার আগের মতোই চুপ করে গেল। উপাসনা ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, তোমার বাবা জুলিকে খুব ঘৃণা করতেন, তাই না?

কেন তোমার এরকম মনে হল?

ওঁর চোখে ঘৃণার ভাষাটা দেখেছি।

জুলি বাবার হয়ে কাজ করত। জুলিকে ইউজ করা হত। তবে বাবার মানসিক রোগের কথা তোমাকে বলেছি। তুমি ভুল বুঝে বোসো না যে বাবা তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। আসলে তোমাকে বাবা জুলি ভেবেছিলেন।

তোমার কষ্ট হয় না প্রীতম?

বাবার জন্য। সত্যি ভীষণ মুচড়ে যায় ভেতরটা।

আমি তোমার মায়ের কথা বলছি।

মাম্মি... জানি না। শুধু মনে হয় মাম্মি শেষ যে কাণ্ডটা করেছিল, তখনও কি একবারও ভেবেছিল আমার কথা!

কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছ কি, মানুষ হতাশার কোন প্রান্তে পৌঁছোলে আত্মহত্যা করে? উপাসনা উদাস হয়ে বলতে থাকল, আমি তিনবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিলাম, আমি জানি জীবনের কোন যন্ত্রণা মানুষকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়।

উপাসনার কথা শুনে বিট্টু চমকে উঠল। আজ যেন আর একবার মেয়েটাকে নতুন করে চিনছে। হিন্দি সিনেমার গল্প প্রগল্‌ভের মতো বলে যাওয়া মেয়েটার সঙ্গে এই মেয়েটার কোনও মিল নেই।

উপাসনা, আর ইউ কাওয়ার্ড? জীবন থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে?

দু'বার আমি হেভি ডোজের স্লিপিং পিল খেয়েছিলাম। আর একবার ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কাটতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেবার শেষপর্যন্ত আর সাহসে কুলোয়নি...

বিট্টু সোফাটা উপাসনার কাছে এগিয়ে এনে বসল।

ইউ আর চাইল্ডলেস। এটাই তোমার কাছে সবচেয়ে বড় দুঃখ? পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কি আর কোনও আকর্ষণই নেই?

কোনও কোনও সময় সত্যিই নেই। নাথিং টু লুক ফরওয়ার্ড। তার ওপর যে-মানুষটাকে বিশ্বাস করে তুমি নিজের জীবন সমর্পণ করেছ, তার ব্যবহার যদি দিনের পর দিন পালটাতে থাকে, তখন তোমার আর সত্যি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করবে না।

দু'জন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। একসময় উপাসনা নিচু গলায় বলল, তোমার কাছে একটা জিনিস দেখতে চাইব। দেখাবে?

কী?

তোমার মায়ের একটা ছবি।

বিট্টু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

আমাদের ফ্যামিলি অ্যালবাম পৃথা সব নষ্ট করে দিয়েছে। তবে মাম্মির একটা ছবি আছে আমার কাছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি।

শোওয়ার ঘরের আলমারি খুলে বিট্টু বার করে আনল শিপ্রার ডায়েরি দুটো। একটা ডায়েরির মলাটের ভেতরে সেলোটেপ দিয়ে আটকে রেখেছে ব্রাদার ডি'সুজার নিজের হাতে তোলা মার্থা আর শিপ্রার সাদাকালো একটা ছবি। সাদাকালো ছবিটা অনেকটাই বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ডায়েরিটা খুলে ছবিটা উপাসনার দিকে এগিয়ে দিল বিট্টু।

আমার দিদিমা আর মাম্মি।

শিপ্রার কিশোরী বয়সের ছবিটা দেখে উপাসনার মুখটা কোমল হয়ে গেল, ওমা। তোমার মা তো দারুণ সুন্দরী ছিলেন। কোথায় তোলা ছবিটা?

কার্শিয়াং-এ। পিছনে যে পাহাড়টা দেখছ, ওটা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

উপাসনা মন দিয়ে ছবিটা দেখতে থাকল। তারপর শিপ্রার ডায়েরিটার দিকে তাকিয়ে বলল, এই সেই ডায়েরিটা, যার কথা তুমি বলেছিলে। তোমার মা মারা যাওয়ার আগে ব্রাদার ডি'সুজার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ডক্টর ব্রাউন তোমাকে মন দিয়ে পড়তে বলেছিলেন।

ঠিক তাই।

একটু দেখতে পারি তোমার ডায়েরিটা।

দেখো না। আমি বরং একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। মাইক্রোওয়েভে বার্গার দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বিপ করলে বার করে নিয়ো।

বাথরুমে ঢুকে গরম জলে অনেকক্ষণ চান করল বিট্টু। বাবাকে লিজ ডিডে সই করানোর যে গ্লানি, পাপবোধটা ছিল সেটা অনেকক্ষণ আগেই উপাসনা মুছে ফেলেছিল। উপাসনা যে এক ডাকে সত্যিই রাতে বাড়িতে থাকতে চলে আসবে, এতটা কল্পনা করেনি। এখন ভেতর থেকে একটা ভাল লাগার আবেশ ছড়াচ্ছে শরীরে।

ফুরফুরে হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বিট্টু দেখল উপাসনা একমনে ডায়েরিটা পড়ে যাচ্ছে। সামনে সেন্টারটেবিলে পরিপাটি করে দুটো প্লেটে বার্গার সাজানো। বিট্টু একটু চিন্তা করে বলল, সরি, তোমাকে কী চেঞ্জ দেব বুঝতে পারছি না।

উপাসনা যেন কথাটা শুনতেই পেল না।

কী অপূর্ব তোমার মায়ের হাতের লেখা, সেরকম ভাল ভাষা, ডক্টর ব্রাউন তোমাকে মন দিয়ে পড়তে বলেছিলেন, তুমি পড়েছ?

বার্গারটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

মন দিয়ে পড়েছ?

বিট্টু একটু চুপ করে থেকে বলল. ডক্টর ব্রাউনের কথাটা মেলেনি। মাম্মির ডায়েরিটা পড়লে এখনও আমার ডিপ্রেসডই লাগে উপাসনা।

উপাসনা ডায়েরির পাতা উলটেই চলেছে।

বার্গারটা শেষ করো উপাসনা। তোমাকে আমি সারারাত না খাইয়ে জাগিয়ে রাখার জন্য এখানে আনিনি। চলো আমরা নিশ্চিন্তে কয়েক ঘণ্টা শান্তির ঘুম ঘুমোই।

বিট্টুর কথা শুনে উপাসনা খিলখিল করে হেসে উঠল, এই তুমি একটু আগে আমাকে বলছিলে খোলা আকাশের নীচে সারারাত পার্কের বেঞ্চে কাটিয়ে বসে দেবে।

সেটা যদি তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোথাও রাত কাটাতে রাজি না হতে তাই...

উপাসনা হাসি সামলে বলল, তোমার মা তোমার সম্পর্কে একটা কথা লিখেছেন চোখে পড়ল। তোমার নাকি অনেক বড় পর্যন্ত একটা অভ্যাস ছিল। তোমার মা একটা লালাবাই না গাইলে তোমার ঘুম আসত না। লিরিক্সটা লিখেছেন, আয় ঘুম, আয় ঘুম...।

বিট্টু মুখ টিপে হাসল। তারপর সুর করে গাইতে থাকল, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়... অদ্ভুত একটা টিউন, আয় ঘুম। তারপরে মাম্মি কী লিখেছে দেখো। আমার আরও অদ্ভুত একটা হ্যাবিট ছিল। আমি লালাবাইটা শুনতে শুনতে মুখের মধ্যে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে দিতাম...

বিট্টু দেখল উপাসনা ভুরুটা একটু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

টিউনটা আর একবার গাও তো... কোথায় যেন শুনেছি...

এটা কোনও সিনেমার গান নয়...

জানি সিনেমার গান নয়। এখানে লন্ডনেই কোথায় যেন শুনেছি। গাও আর একবার।

গাইতে পারি। কিন্তু আই নিড ওয়ান পারমিশন।

উপাসনার অনুমতির অপেক্ষা করল না বিট্টু। উপাসনার কোলে মাথা দিয়ে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে গাইতে থাকল, আয় ঘুম, আয ঘুম...

উপাসনার কোলে অদ্ভুত একটা গন্ধ। অদ্ভুত একটা উষ্ণতা। অদ্ভুত একটা শান্তি।

যত দূর মনে পড়ছে বার্বি গায় গানটা। বাচ্চাদের একটা কনসার্টে শুনেছিলাম...

আর কোনও কথা শুনতে ইচ্ছে করছে না বিট্টুর। শুধু উষ্ণতাটা উপভোগ করতে চায়। চোখ বন্ধ করে বলল, প্লিজ উপাসনা আর কোনও বার্বির গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে তোমার কোলেই মাথা ডুবিয়ে হিন্দি সিনেমার গল্প শুনতে।

উপাসনার আঙুলগুলো ততক্ষণে বিলি কাটতে আরম্ভ করে দিয়েছে বিট্টুর চুলের ভেতর।

তোমাকে অমিতাভ বচ্চন শ্রীদেবীর খুদা গাওয়ার গল্পটা বলা হয়নি। বাদশা খান মানে অমিতাভ বচ্চন বেনজিরের প্রেমে পড়ল...

ডক্টর ব্রাউন বিট্টুকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, জুলিকে যদি ভুলতে চাও, মহিলা জাতটার ওপর চরম বিতৃষ্ণার পাথরটা যদি ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলতে চাও, তা হলে এই মেয়েটার সঙ্গ ছেড়ো না। তবে মেয়েটা যেহেতু বিবাহিত সম্পর্কটাকে অহেতুক জটিল করে বিপজ্জনক জায়গায় নিয়ে যেয়ো না। কিন্তু প্রাজ্ঞর সাবধানবাণী উপেক্ষা করে কোনও শরীরের সম্পর্ক ছাড়াই একটা বিপজ্জনক সম্পর্কের সূচনা হয়েই গেল। দু'জনের ক্লান্ত মন যেন দু'জনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই সম্পর্কটা উপাসনার জীবনে যতটা না হতাশা কাটিয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জীবিত করেছিল বিট্টুকে। পিটারের সঙ্গে পার্টনারশিপ ছিন্ন হওয়ার হতাশা, হরিতলা কটন মিল আগরওয়াল ভাইদের হাতে চলে যাওয়ার হতাশা, সব কিছু ধুয়ে দিল এই সম্পর্কের স্রোত। উপাসনা বিট্টুর জীবনে মস্ত প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল।

নতুন করে ব্যবসায় আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারল বিট্টু। হরিতলা কটন মিলের নিজের টাকাটা নিজের নতুন স্বাধীন ব্যবসায় কাজে লাগাতে পেরেছিল বিট্টু। বিট্টুর সামনে একটা নতুন সুযোগও চলে এল। কম্পিউটার দুনিয়ায় তখন এক আতঙ্কের জন্ম হয়েছে।

ওয়াই-টু-কে। নতুন সহস্রাব্দের বছরকে দুটো সংখ্যায় চিনে নেওয়ার সমস্যা। বিট্টুর কোম্পানি সফলভাবে এর সমাধান করতে শুরু করল। বড় বড় ব্যাঙ্কগুলোর প্রিয় কোম্পানি হয়ে উঠতে থাকল বিট্টুর কোম্পানি।

বিট্টুর সঙ্গে উপাসনার সম্পর্কটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আর গোপন থাকল না। উপাসনার অসুখী দাম্পত্য জীবনে এমনিতেই সমস্যার অন্ত থাকত না। উপাসনার স্বামী ছিল সামান্য এক ট্যাক্সি ড্রাইভার। কখনও কখনও রাতে মত্ত হয়ে বাড়ি ফিরে অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে উপাসনার ওপর নির্যাতন চালাত, কখনও কখনও ঠান্ডা মাথায় উপাসনার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করত বিট্টুর কাছে মোটা পাউন্ড আদায়ের জন্য।

সবটুকু না জানলেও বিট্টু উপাসনার সমস্যার গভীরতা বুঝত। বিট্টু বারবার উপাসনাকে বুঝিয়েছে ঘৃণ্য দাম্পত্য সম্পর্কটা ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু উপাসনা কিছুতেই রাজি হত না। বিট্টু বলত, তোমার আমার জীবনের শূন্যতায় একটা মিল আছে।

তুমি তো ভগবানে বিশ্বাস করো না।

বিশ্বাস করার খুব স্ট্রং কারণ আছে কি! তুমি ওইসব না খেয়ে উপোস টুপোস করে ব্রত ট্রত করে কী পাও?

বিশ্বাসটা ছেড়ে দিলে জীবনে আর কীসের দিকে তাকিয়ে থাকব? তোমার মা একটা দারুণ কথা লিখেছেন। অন্তত একটা শান্তি খুঁজে পাবে।

বিট্টু বিরক্ত হত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলত, কোথায় সেই শান্তিটা আছে, হরির ঝিলে, শীতকালের পাখিদের মধ্যে? যাদের জন্য মাম্মি আমাকে ছ'বছর বয়সে গোলাগুলির মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, যার জন্য সাত বছর বয়সে মাম্মি আমাকে হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল? যার জন্য এগারো বছর বয়সে মাম্মি আমাকে পৃথার রাজত্বে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল?

বিট্টুর উত্তেজনা বাড়তে থাকত। উপাসনার সেই উত্তেজনার প্রকৃতি ততদিনে জানা হয়ে গেছে। এটা যতটা না উষ্মার তার চেয়েও বেশি অভিমানের। কথা ঘুরোনোর জন্য উপাসনা অন্য প্রসঙ্গর অবতারণা করত, নিউ ইয়র্কে তোমার অফিস খোলার কী হল?

তুমি জয়েন করবে?

সামান্য একজন ভিডিয়ো লাইব্রেরির সেলস গার্লকে উপহাস করছ?

হ্যাঁ করছি। কারণ তোমার মতো বোকা মহিলা পৃথিবীতে আর দুটো নেই। হোয়াট আই ক্যান অফার ইউ, পৃথিবীতে আর কেউ করবে না।

আমি তোমার জীবনে এলে, তুমি শেষ হয়ে যাবে... আমি অপয়া।

বিট্টু হাতের তালুতে ঘুসি মেরে বলে, ড্যাম ইট। আবার সেই বস্তাপচা কুসংস্কার।

কুসংস্কার নয়, দেখছ না আমি সন্দীপের জীবনে আসার পর ওর একফোঁটা উন্নতি হয়নি। তুমি কিছুই জানো না।

বিট্টু উপাসনার ঠোঁটে আঙুল ঠেকাত, প্লিজ, এই বস্তাপচা কথাগুলো আর বোলো না। সন্দীপকে ছেড়ে বেরিয়ে এসো।

উপাসনা উদাস হয়ে পড়ত, না, লোকটা যেমনই হোক, ওর ওপর আমার অনেক

ঋণ আছে। ওই আমাকে লন্ডনে নিয়ে এসেছে। না হলে হয়তো পচতাম মহারাষ্ট্রের কোনও গ্রামে।

বিপজ্জনক একটা সম্পর্কের সূচনা হয়ে থাকলেও শেষ বিন্দুতে পৌঁছোনোর আগে উপাসনা সম্পর্কটা থামিয়ে রেখেছিল। বছরগুলো এগোতে থাকল এভাবেই।

বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দয়াল সান্যালের মানসিক স্বাস্থ্যের আর কোনও অবনতি না হলেও, উন্নতি কিছু হল না। এও যেন এক বিন্দুতে এসে আটকে থাকা। ডক্টর ব্রাউন বলতেন এটা কোনও আশাপ্রদ লক্ষণ নয়। অ্যালঝাইমার্সের কামড় যে-কোনও সময় অন্য দিকে বাঁক নিতে পারে। মস্তিষ্ক এতটাই অকেজো হয়ে পড়তে পারে যখন মানুষ মুখে খাবারের গ্রাস নিয়ে ভুলে যাবে চিবোনের কথা। এক যন্ত্রণাদায়ক বেঁচে থাকা।

বিট্টু আতঙ্কিত হয়ে পড়ত।

প্লিজ ডক্টর। বলুন পৃথিবীর কোথায় এর বেস্ট ট্রিটমেন্ট আছে? আমি সেখানে নিয়ে যাব বাবাকে।

ডক্টর ব্রাউন লালমুখটা আরও থমথম করে জবাব দিতেন, আনফরচুনেটলি নো হোয়ার প্রীতম।

৯২

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরোজ বক্সী আর বীথির সঙ্গে বিট্টুর যোগাযোগটা কমে এসেছিল। দয়াল সান্যাল অবশ্য নিজের অসংলগ্ন কথায় সরোজ বক্সীর কথা যখন বলতেন বিট্টুর মাঝে মাঝে মনে হত যে ওদের খবর নেয়, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিসেব করে দেখত ভারতে ফোন করার এটা উপযুক্ত সময় নয়। তা ছাড়া আগে ব্যাবসার পুরো দায়িত্বে থাকার সময় সরোজ বক্সীর নিজের তরফ থেকে যোগাযোগ রাখার যতটা তাড়না ছিল, আগরওয়াল ভাইদের আওতায় ব্যাবসাটা চলে যাওয়ার পব সেই প্রয়োজনটাও ফুরিয়ে গিয়েছিল। একদিন বেশ সকালে আচমকাই সরোজ বক্সীর ফোন পেল বিট্টু। সাধারণ কুশল সংবাদ নেওয়ার পর ফোন করার আসল উদ্দেশ্যে এলেন সরোজ বক্সী।

তোমাকে একটা সুসংবাদ দেওয়ার ছিল বাবা।

বিট্টু খানিকটা অনুমান করতে পারলেও গলায় কৌতূহলী স্বরটা রাখল, কী গুড নিউজ কাকা?

বীথিমার বিয়েটা পাকা হয়েছে।

তাই! বিট্টু আন্তরিক খুশি হয়ে বলল, এ তো দারুণ খবর কাকা। কবে বিয়ে?

শ্রাবণের সাতে।

বিট্টু বাংলা মাসটা বুঝতে না পেরে বলল, তার মানে কবে কাকা?

সামনের মাসে, একুশে জুলাই। তুমি বড়সাহেবকে জানিয়ো বাবা। উনি যেন আশীর্বাদ করেন।

বিট্টু জানে বাবার কাছে এই খবরের কোনও মানে নেই। সরোজ বক্সীও হয়তো সেটা জানেন। কথাটা একরকম সান্যাল পরিবারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো। বিট্টু সম্মান জানিয়ে বলল, নিশ্চয়ই বলব সরোজকাকা। জানবেন বাবার আশীর্বাদ সবসময় থাকবে। কিছু টাকাকড়ি আপনাকে পাঠিয়ে দিই কাকা?

সরোজ বক্সী অপ্রতিভ হয়ে বলে উঠলেন, না, না, তুমি আমার জন্য যা করে দিয়েছ, যথেষ্ট। আমার নিজের ছেলে থাকলেও এতটা করত না। বীথিমার পাকা কথা যখন হয়ে গেল, আমার সবার আগে তোমার কথা মনে হয়েছে। মেমসাহেব বেঁচে থাকলে উনিও খুব খুশি হতেন...

কাকা, বীথি আছে আশেপাশে? দিন ওকে কনগ্র্যাচুলেট করি।

বীথি ফোনটা ধরার পর বিট্টু সুর কেটে বলল, কী বীথিরানি, তা হলে... ছেলে পছন্দ হল শেষ পর্যন্ত?

একটু লজ্জাধরা গলায় বীথি বলল, হতে হল বিট্টুদা। বাবা দিনে দিনে খুব অস্থির হয়ে উঠছিল।

গুড এক্সকিউজ। আমি তো ভাল মেয়ে তাই আমি বিয়ে করতে চাইনি, বাবা শুধু জোর করে... গুড, গুড। তা মে আই নো হু'জ দ্যাট লাকি ম্যান? কী করেন, কোথায় থাকেন?

বীথি গলাটা নামিয়ে বলল, ও একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে। এই বাড়িতেই একতলায় থাকে। ওর আমাকে ভাললেগে...

বিট্টুর চোখের সামনে সরোজ বক্সীর বাসস্থান পুরনো দিনের বিশাল রাজবাড়িটা ভেসে উঠল। একটা উঠোনকে মধ্যে রেখে তিন দিক ছড়ানো বিশাল বাড়ি। অসংখ্য পরিবার ভাগাভাগি করে থাকে। তারই কোনও একটা হবে বীথির শ্বশুরবাড়ি।

ওয়ান্ডারফুল! এত ভাল সলিউশন আর হয় না বীথি। তোমার সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল সরোজকাকাকে নিয়ে। সরোজকাকা তোমার চোখের সামনেও থাকলেন, আবার মেয়ের সংসার থেকে দূরেও থাকলেন।

আমিও এটা ভেবেই রাজি হয়েছি বিট্টুদা। তুমি আমার বিয়েতে আসবে বিট্টুদা?

আমার ভীষণ ইচ্ছে করছে বীথি তোমার বিয়েতে যেতে, কিন্তু আলটিমেটলি যেতে পারব কিনা জানি না। আমার এখন পার্টনার নেই বীথি। বিজনেসটা একাই চালাতে হয়। তা ছাড়া বাবাকে ছেড়ে এখন এক-দু' রাত্রির বেশি কোথাও গিয়ে থাকতে পারি না...

বীথি আর সরোজ বক্সীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিট্টুর যেটুকু চিন্তা ছিল বীথির বিয়ে সেই দুশ্চিন্তাটা দূর করেছিল। যদিও বীথির বিয়েতে শেষপর্যন্ত গিয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু উপাসনাকে সঙ্গে নিয়ে বীথির বিয়ের তত্ত্বের জন্য অনেক কিছু কিনে সরোজ বক্সীর বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল বিট্টু।

এক নিদারুণ শোকের দিনে গোটা ইংল্যান্ড মুষড়ে ছিল। রাস্তাঘাট সব থমথমে।

অধিকাংশ অফিস-কাছারি, দোকানপাট বন্ধ। ডেভি পর্যন্ত সেদিন কাজে আসেনি। বাড়ির ব্যালকনিতে এসে এই অদ্ভুত লন্ডনের শহরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ছিলেন দয়াল সান্যাল। মনের মধ্যে একটা চিন্তা পাক খাচ্ছে। নীচে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা লং ওভারকোট পরা লোক অদ্ভুত একটা চোখে ওপর দিকে তাকাল। কে লোকটা? বিট্টু আজ কলেজে যায়নি কেন? মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করতে থাকল। পরক্ষণেই লোকটার নাম মনে পড়তে ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভেতর এলেন দয়াল সান্যাল। বিট্টু সোফায় বসে টিভি দেখছে।

বাবা বিট্টু।

বিট্টু ঘুরে তাকাল।

এমারসন সাহেব কলেজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন তোকে এখনই কলেজে পাঠিয়ে দিতে।

বিট্টু আবার টিভির দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, আজ কলেজ ছুটি বাবা।

দয়াল সান্যাল বিচলিত হলেন। তবে যে এমারসন সাহেব হাঁটতে হাঁটতে কলেজের দিকে গেলেন। চোখের ইশারায় বলে গেলেন কলেজে বিট্টুকে পাঠিয়ে দিতে।

দয়াল সান্যাল বিট্টুর পাশে এসে বসলেন। নরম গলায় বললেন, না বাবা। আজ ছুটি নয়। এমারসন সাহেব ডেকে গেলেন। তুই বেরিয়ে পড়। মন দিয়ে লেখাপড়া করে আয়। হরিতলা কটন মিলটা তারপর আমরা দু'জনে মিলে অনেক বড় করব।

বিট্টু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

এমারসন সাহেব এখনই আমাকে ফোন করেছিলেন। বললেন প্রীতম আজ কলেজ ছুটি। তোমার বাবাকে বলতে ভুলে গেছি।

দয়াল সান্যাল আবার বিচলিত হলেন।

ছুটি? আজ কীসের পুজো?

বিট্টু দু'মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, প্রিন্সেস ডায়ানার আজ ফিউনারাল বাবা।

ফিউনারাল? ফিউনারাল মানে কী?

বিট্টু দয়াল সান্যালের কাঁধে হাত রাখল।

ডেভি আজকে আসতে পারবে না বাবা। তোমার খাবার আর ওষুধ আমি দিয়ে দিচ্ছি। তুমি লক্ষ্মীছেলের মতো খেয়ে নাও।

ঠিক আছে বাবা। তুই দিলে আমি খেয়ে নেব। ওই মেয়েছেলেটাকে আমাকে ওষুধ দিতে বারণ করে দিস। ও বিষ মিশিয়ে দেয়।

না বাবা। তোমাকে বলেছি না ডেভি খুব ভাল মেয়ে।

তা হলে ওর ওষুধগুলো অত তেতো কেন... দয়াল সান্যাল হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বিট্টুর কানের কাছে মুখটা এনে বললেন, পৃথার জলে ও লুকিয়ে বিষ মিশিয়ে দিত।

বিট্টু মুখটা ঘুরিয়ে ভুরু কুঁচকে দয়াল সান্যালের দিকে তাকাল। কলকাতায় অনুপম ঘোষের কাছে একটা কথা শুনেছিল। পৃথা-লোকেনের আর্সেনিক পয়জনিং-এর মতো

কিছু হয়েছিল। অনুপম ঘোষ এও বলেছিলেন, তোমাদের বাড়ির জলে যদি আর্সেনিক থেকে থাকে, তা হলে আর কারও বিষক্রিয়া হয়নি কেন। দয়াল সান্যাল অনেক সময় অনেক অসংলগ্ন কথা বলেন। সব কথা বিট্টু মন দিয়ে শোনে না। আজ হঠাৎ মনে হল যে-উত্তরটা মাঝে মাঝে খুঁজে বেড়ায়, বাবার অসংলগ্ন কথার মধ্যেই হয়তো উত্তরটা লুকিয়ে আছে।

কে বিষ মেশাত বাবা?

দয়াল সান্যাল একবার চারদিকে তাকালেন। তারপর আবার বিট্টুর কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বললেন, সরোজ।

তুমি বলেছিলে বুঝি?

না, সরোজ একদিন ধরা পড়ে গিয়েছিল। তুই দেখবি শিশিটা?

বিট্টু দু'হাত চুলের মধ্যে চালিয়ে মাথাটা হেলাল। এমন সময় দয়াল সান্যাল চিৎকার করে উঠলেন, ফিউনারাল। মনে পড়েছে ফিউনারাল। তোর দিদিমার হয়েছিল। শ্মশানকালীর মাঠে। সরোজ মাটি দিয়েছিল।

বিট্টু দয়াল সান্যালকে উঠিয়ে দাঁড় করাল। চামচে দিয়ে যত্ন করে দুধ কর্নফ্লেক্স খাওয়াল। তারপর দেওয়ালে সাঁটা প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ। ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর দয়াল সান্যাল বিট্টুকে বললেন, মাথাটা কেমন করছে। একটু শুয়ে নিই বাবা।

সেই ভাল।

তুই কলেজে চলে যা। এমারসন সাহেব বলে গেলেন।

বিট্টু দয়াল সান্যালকে ধরে খাটে এনে শুইয়ে দিল। বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বড় করে দরজার বাইরে চেয়ে রইলেন দয়াল সান্যাল। বিট্টু আবার সোফায় গিয়ে বসল। টিভিটা চালিয়ে দিল। ছেলেটা কখন কলেজে যাবে? দরজার বাইরে দৃশ্যটা আস্তে আস্তে ঝাপসা হতে থাকল। কিছুক্ষণ পর ভেতরে আবার সেই ছটফটানিটা আরম্ভ হল। বিট্টু কলেজে গেল তো? খাট থেকে নেমে নিঃশব্দ পায়ে বসার ঘরে এসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বিট্টু সোফায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। টিভির স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরালেন দয়াল সান্যাল। একটা ফুলে মোড়া কফিন এগিয়ে চলেছে। কফিনের মাথায় সাদা ফুলের মধ্যে একটা ছোট্ট প্ল্যাকার্ডে ছোট্ট একটা শব্দ, মাম্মি।

বিট্টু কাঁদছে। এ দৃশ্য কোনওদিন দেখেননি দয়াল সান্যাল। যেদিন শিপ্রা মারা গিয়েছিল সেদিন কি কেঁদেছিল বিট্টু? কোথায় যেন ছিল সেদিন ও? সরোজকে ফোন করতে হবে। টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন দয়াল সান্যাল। রিসিভারটা তুলে কিছুতেই মনে করতে পারলেন না সরোজ বক্সীর নম্বর। মনে হল, জুলিকে বললে হয় না! মেয়েটার কাছে দিব্যি হাসিখুশি থাকে বিট্টু। অসহায়ের মতো বিট্টুর কাছে এসে পিঠে হাত রেখে বললেন, জুলিকে ফোন কর বাবা। জুলি তোকে ভুলিয়ে দেবে।

ফোলা লাল চোখে দয়াল সান্যালের দিকে তাকিয়ে বিট্টু বলল, হ্যাঁ বাবা, জুলিকেই দরকার আমার।

বিট্টুর ফোনটা পেয়ে উপাসনা দু'মুহূর্ত চিন্তা করল। আজ সন্দীপ বাড়িতে আছে। বিট্টুর সঙ্গে সম্পর্কটা যদিও এখন খোলাখুলি ভাবেই জানা হয়ে গেছে সন্দীপের, তবু কখনও বিট্টুর ফোন পেয়ে সন্দীপের মুখের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়নি। আজ সেই দ্বিধাটাও কাটিয়ে ফেলল উপাসনা। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল বিট্টুর বাড়িতে। এবং আজ প্রথমবারের জন্য লক্ষ করল দয়াল সান্যালের চোখে ওর জন্য সেই ঘৃণাটা নেই।

যুবরানির অকালমৃত্যু আরও বহু জনের মতো উপাসনার নরম মনটাকেও ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। তবে বিট্টু কেন এতটা ভেঙে পড়ল বুঝতে পারল না উপাসনা। বিট্টুর পিঠে নরম করে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কী হয়েছে প্রীতম?

বিট্টু ধরা গলায় বলল, মাম্মিকে যখন শ্মশান নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আমার জন্য অপেক্ষা করেনি বাবা। সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

টিভির দিকে আঙুল তুলে দেখাল বিট্টু। ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের মধ্যে একটা পিয়ানোর সামনে বসে তখন এলটন জন। এলটন জন দু'চোখ ছলছল করে গাইছেন, 'গুডবাই ইংল্যান্ড রোজ... আ ক্যান্ডেল ইন দ্য উইন্ড।'

জানো উপাসনা, মাম্মি ঠিক যে-সময়টায় চলে গিয়ে গিয়েছিল, ব্রাদার ডি'সুজা পিয়ানো বাজিয়ে ঠিক এইভাবেই আমাকে ক্যারলস শোনাচ্ছিলেন। মাম্মির প্রিয় সব ক্যারলস।

বিট্টুর গলাটা ক্রমশ বুজে আসতে থাকল। রিমোটের সুইচটা টিপে টিভিটা বন্ধ করে বিট্টুর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিল উপাসনা। ধরা গলায় বলল, আমার মা যেদিন চলে গিয়েছিল, সেদিন আমাকেও কেউ শ্মশানে যেতে দেয়নি। আমি মেয়ে ছিলাম তো...

মাম্মি... মাম্মি... বিট্টু উপাসনার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে থাকল।

কাঁদো প্রীতম, কাঁদো। ভেতরে জমে থাকে সব কান্নাটাকে বার করে দাও। তোমার মায়ের জন্য সব অভিমানটা বার করে দাও। উনি পিয়োর ছিলেন। সবচেয়ে বেশি বোধহয় চেয়েছিলেন তোমাকে সুখী দেখতে। তোমার মায়ের ডায়েরিগুলো পড়ো।

বেশ রাত হল উপাসনার বাড়ি ফিরতে। সন্দীপ তখনও বাড়িতেই ছিল। সারাদিন বাড়িতে একা একা কাঁড়ি কাঁড়ি মদ খেয়েছে। উপাসনা বাড়িতে ঢুকতে না-ঢুকতেই উপাসনার সামনে হাত পাতল, দাও।

কী দেব?

পাউন্ড।

মানে?

সন্দীপ একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে বলল, তোমার নাগরের সঙ্গে যে শুয়ে এলে।

আমার ট্যাক্সটা দাও।

জানোয়ার কোথাকার। সরে যাও।

সন্দীপকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উপাসনা ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই সন্দীপ পিছন থেকে ওর চুলের মুঠিটা টেনে ধরল। তারপর সপাটে এক চড় কষাল।

সতী সাবিত্রী! আবার গলাবাজি...

হাতের কাছে একটা ছাতা খুঁজে নিয়ে এলোপাতাড়ি উপাসনাকে লক্ষ্য করে চালাতে থাকল সন্দীপ। তারপর লাথি।

বেশ রাত করে বিট্টু ফোনটা পেল। অন্য প্রান্তে গলাটা বেশ ঘাবড়ে থাকা গলা, স্যার... সন্দীপ ভাণ্ডারকার বলছি।

বিট্টুর ভুরুটা কুঁচকে গেল। লোকটার নামটা চেনা। উপাসনার স্বামী। কিন্তু কোনওদিন কথা হয়নি লোকটার সঙ্গে।

বলুন মিস্টার ভাণ্ডারকার। মাথা ঠান্ডা রেখে বিট্টু বলল।

স্যার... উপাসনা...

বিট্টুর মনে হল শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নামল। সন্দীপের গলা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা বিপদ হয়েছে উপাসনার। মেয়েটা তিনবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সেরকম আবার কিছু হয়নি তো। বিট্টুর মতো উপাসনাও সাংঘাতিক ডিপ্রেস্‌ড হয়ে পড়েছিল আজ।

কী হয়েছে উপাসনার?

সন্দীপ ঢোক গিলে বলল, ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।

বিট্টুর পায়ের তলাটা ফাঁকা মনে হল।

কী হয়েছে?

স্যার... আপনার বাড়ি থেকে ফেরার সময় গুন্ডারা ওকে ব্রুটালি মেরেছে।

বিট্টু চিৎকার করে উঠল, দেন, হোয়াই আর ইউ ওয়েটিং ফর। টেক হার টু হসপিটাল, কুইক।

স্যার... পুলিশ...

ড্যাম ইট পুলিশ। পুলিশ পরে দেখা যাবে। কুইক। সিটি হসপিটালে নিয়ে আসুন। আমি আসছি।

দরজায় ছোট্ট কাচের লুকিং উইন্ডোটা দিয়ে ভেতরের বেডে উপাসনাকে দেখতে পেল বিট্টু। খাটে অচৈতন্য হয়ে শুয়ে আছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এই মেয়েটাই বিট্টুর মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। গলায় নতুন করে একটা দলা টের পেল বিট্টু।

ডাক্তারের কাছে একটা ছোট্ট স্টেটমেন্ট দিয়েছে উপাসনা। গুন্ডাটা কে ছিল বিট্টু অল্প খোঁজ করেই জেনে গেল। একটু দূরে গোবেচারার মতো সন্দীপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গা জ্বলে গেল। হনহনিয়ে এগিয়ে এল সন্দীপের কাছে।

হাউ মাচ মানি ডু ইউ ওয়ান্ট টু গেট আউট অফ হার লাইফ?

স্যার... মানে...

বিট্টু কেটে কেটে বলল, পুলিশ তো আছেই... সত্যিকারের গুন্ডা কী তোমাকে সেটাও আমি দেখাতে পারি। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমি একটা চয়েস দিচ্ছি। কত পাউন্ড তুমি চাও, আজ রাতের মধ্যে ঠিক করে ফেলো।

পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে নিজের বিজনেস কার্ডটা সন্দীপের হাতে দিয়ে বলল, কাল সকাল এগারোটায় অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। উপাসনাকে বাড়ি ফিরতে দাও অ্যান্ড দেন সায়লেন্টলি জাস্ট গেট আউট অফ ইংল্যান্ড।

সন্দীপ ভাণ্ডারকারের সঙ্গে কুড়ি হাজার পাউন্ডে রফা হল বিট্টুর। সন্দীপ পাউন্ডটা পেয়ে শর্ত মতো বাধ্য হয়েছিল হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে যেতে। বিট্টু নিশ্চিন্ত হয়েছিল। ভেবেছিল উপাসনাকে পুরোপুরি পাওয়ার সব বাধা দূর হয়ে গেল। কিন্তু সন্দীপ একটা ছোবল রেখে গিয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ করে রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল উপাসনাও।

নিজের মতো কিছুদিন খোঁজাখুঁজি করে বিট্টু পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছিল। তার ফলস্বরূপ কয়েকদিন পরে দু'জন পুলিশ অফিসার বিট্টুর অফিসে দেখা করতে এলেন। জেরা করার ভঙ্গিতে প্রশ্ন করতে থাকলেন, মিসেস উপাসনা ভাণ্ডারকারকে আপনি কতদিন চেনেন মিস্টার সানিয়াল?

প্রায় চার বছর।

কী জানেন ওঁর সম্পর্কে?

ভারতীয়। ওর বর সন্দীপ ভাণ্ডারকার এখানে ট্যাক্সি চালাত। উপাসনা একটা ভিডিয়ো লাইব্রেরিতে কাজ করত। সব ঠিকানা তো আপনাদের আগেই দিয়েছি। সন্দীপ উপাসনার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করত। ওর নির্যাতনের ফলে কয়েকদিন আগে উপাসনাকে সিটি হসপিটালে...

বিট্টুর কথা শোনার ফাঁকে একজন অফিসার ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে বলতে থাকলেন, মিসেস উপাসনা ভাণ্ডারকার একজন ইলিগ্যাল ইমিগ্রান্ট ছিলেন। ইংল্যান্ডে অবৈধভাবে থাকতেন। খুঁজে পেলে ওঁকে আমরা ডিপোর্ট করব। আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

অসম্ভব! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বিট্টু। উত্তরে পুলিশ অফিসার এগিয়ে দিয়েছিলেন সন্দীপের নিজের হাতে লেখা অভিযোগপত্র। সেই সঙ্গে কিছু ফটোকপি করা প্রামাণ্য নথি।

এই ধাক্কাটা সামলে উঠতে বিট্টুর খুব অসুবিধে হয়েছিল। নতুন সহস্রাব্দ এগিয়ে আসছিল। সব শূন্যতা ভুলতে নিজেকে ওয়াই-টু-কে'র সমস্যা সমাধানে আরও ডুবিয়ে দিয়েছিল বিট্টু। কেটে যাচ্ছিল বছরগুলো।

গোটা অফিস অন্ধকার। শুধু বিট্টুর ঘরের কোনায় একটা ছোট্ট আলো জ্বলছে। সহস্রাব্দের আজ শেষ দিন। বিট্টুর অফিসের কর্মীরা আজ ছড়িয়ে আছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। গত পনেরো দিন দিনরাত এক করে তারা স্নায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বড় বড় কোম্পানি—যারা বিট্টুর ক্লায়েন্ট তারা আপদকালীন কন্ট্রোল রুম খুলেছে। আজ সহস্রাব্দটা মুড়োবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ব্যাঙ্কে জমানো পুঁজি শূন্য হয়ে যেতে পারে। আকাশে এরোপ্লেন দিক বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। হতে পারে আরও অনেক কিছু।

বিট্টু সেই গোত্রের লোকেদের মধ্যে পড়ে, যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, এসব কিছুই হবে না। মিডিয়া আর স্বার্থান্বেষী মানুষদের ফাঁপানো প্রচার এটা। যে আশ্বাসবাণী দিয়ে, একের পর এক সফটওয়্যার তৈরি করে গত তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে একের পর এক বড় বড় অর্ডার পেয়েছে, আজ তার অগ্নিপরীক্ষার রাত।

বিট্টুর টেবিলে একটা বড় গ্লোব। গ্লোবটার সাতটা জায়গায় সাতটা পিন ফোটানো আছে। পৃথিবীর সাতটা দেশ। এই ক'বছরে এই দেশগুলোতে বিট্টুর ব্যাবসা ছড়িয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে পিটারের সঙ্গে যখন পার্টনারশিপটা ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তখন মাত্র পনেরো জন কর্মচারী ছিল। এখন সেটা বাড়তে বাড়তে সাড়ে তিনশোতে ছাড়িয়ে গেছে। পিনবিদ্ধ জায়গাগুলোতে ওরা সব ছড়িয়ে আছে।

পিটারের কথা মনে পড়তেই আপনমনে হাসল বিট্টু। কয়েকদিন আগে পিটার বিট্টুর অফিসে দেখা করতে এসেছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর প্রথমবার। হাতে একটা দামি ওয়াইনের বোতল আর সুন্দর ভেলভেটের বাক্সে মোড়া তার চেয়েও দামি একটা ঘড়ি। ক্রিসমাস গিফ্‌ট। বিট্টু জানত গিফ্‌ট হল বাহানা। পিটার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। যথাসম্ভব উষ্ণতা ছড়িয়ে বিট্টুকে আলিঙ্গন করে পিটার বলেছিল, জানি, তোর অনেক অভিমান আছে, কিন্তু তা বলে বন্ধুর সঙ্গে একবারও কি দেখা করতে নেই?

একই প্রশ্ন হয়তো বিট্টুও করতে পারত। কিন্তু বিট্টু সে রাস্তায় না হেঁটে বলেছিল, তুইও ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত। একসঙ্গে একদিন ডিনার করার সময় কি আমাদের সত্যিই আছে পিটার?

পিটার আরও কিছুক্ষণ একথা-সেকথা বলেছিল। তারপরে চলে এসেছিল আসল প্রসঙ্গে, তোর কাছে একটা মিলেনিয়াম গিফ্‌ট চাইব...

বিট্টু একটু অবাক হয়ে পিটারের দিকে চেয়েছিল। গলাটা খাঁকরিয়ে দৃপ্ত গলায় পিটার বলেছিল, বিট্‌ল সফট আমার ফেরত চাই।

চমকে উঠেছিল বিট্টু। বহু বছর হয়ে গেল যথাসম্ভব তিক্ততা এড়িয়ে বিট্‌ল সফট ভাগ হয়ে গিয়েছিল। কোম্পানিটার নামের পিছনে শুধু ছোট্ট দুটো ল্যাজ ছিল বিট্‌ল সফট ইউনিভার্সাল আর বিট্‌ল সফট ইন্টারন্যাশনাল। প্রথমটার মালিক পিটার আর

দ্বিতীয়টার বিট্টু। সদ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুনামের জন্য কোম্পানির পরিচয়ের এই প্রথম অংশটুকু প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওইটুকুই। আর কোনওই যোগসূত্র ছিল না দুটো কোম্পানির মধ্যে।

বিট্টুর পালটে যাওয়া মুখটা দেখে পিটার বলেছিল, আমি তোর কোম্পানিটা কিনতে আসিনি। আমি শুধু নামটা চাই। বিট্‌ল সফটকে আমি একটা স্ট্রং ব্র্যান্ডে নিয়ে যাব। বিট্‌ল সফট ডট কম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অনলাইন শপিং ওয়েব সাইট।

বিট্টু মাথা ঝাঁকিয়েছিল, তুই বিয়ে করেছিস না?

হ্যাঁ। উইনির সঙ্গে তোর আলাপটা করিয়ে দেওয়া হয়নি। এবার দু'জনে একসঙ্গে ডিনারে একদিন ডাকবই।

তোর ছেলে আছে তো একটা...

ওরে বাবা তুই তো সব খবরই রাখিস দেখছি। মাইকেল। ভীষণ দুষ্টু...

মাইকেল নামটা তুই ছেড়ে দিতে পারবি?

পিটার থতমত খেয়ে চুপ করে গিয়েছিল। তারপর ছটফট করে বলে উঠেছিল, দুটো জিনিস এক নয় প্রীতম।

ঠান্ডা গলায় বিট্টু বলেছিল, নামটা আমার ছেলের নামের মতোই। হয়তো নামটা একদিন তুই-ই দিয়েছিলি, কিন্তু এভাবে ফেরত নিতে পারিস না।

আমি কিন্তু নামটা তোর কাছে খালি হাতে চাইতে আসিনি। নামেরও একটা দাম আছে। দামটা তোকেই ঠিক করতে বলছি।

বিট্টু মাথাটা ঠান্ডা রেখে বলেছিল, নামটা তোর কী দরকার? আমি তোর ব্যাবসার দিকে একটা আঙুলও কিন্তু বাড়াইনি।

পিটার হেসেছিল। তাচ্ছিল্যের হাসি, আমিও তুলিনি। ভদ্রলোকের চুক্তি ছিল আমাদের। কিন্তু তুই যেমন আমার খবর রেখেছিস, আমিও তেমনই তোর খবর রেখেছি। তুই বল তো, একত্রিশে ডিসেম্বর উনিশশো নিরানব্বইয়ের পর তোর ওয়াই-টু-কে সমস্যা সমাধানের কী ভবিষ্যৎ আছে!

তাচ্ছিল্যের হাসিটা বিট্টু ফেরত দিয়ে দিয়েছিল। কথাটা নিজেও ভেবেছে। সাড়ে তিনশো কর্মচারীর ভবিষ্যৎ হাতে নিয়ে চলা। পরের ব্যাবসাটাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। ইউরোপের অনেকগুলো দেশ মিলে সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে। ইউরো। বিভিন্ন দেশের চালু মুদ্রার 'ইউরো' ব্যবস্থায় আসার জন্য প্রচুর সফটওয়্যারের কাজ দরকার। কয়েকটা বড় বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রাথমিক বৈঠকও হয়ে গেছে। তবে সব কিছু নির্ভর করছে নতুন সহস্রাব্দটা ঠিকমতো চালু হওয়ার ওপর। ব্যাপারটা এখন একান্ত গোপনীয়।

দেখা যাক। তোর ডটকমের ব্যবসায় আশা করি থ্রেট নেই কোনও।

পিটারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, ডটকম। তুই জানিস ইংল্যান্ডের সব থেকে বড় ডটকম কোম্পানির প্রথম তিনটের মধ্যে আমি আছি। সাতচল্লিশটা সাব ডোমেন চলছে আমাদের। বি-টু-বি বিজনেস মডেলের নতুন মানে করে দিয়েছি

আমরা। এরপর আনব বি-টু-সি। সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা ডলার পাউন্ডের থলি নিয়ে বসে আছে আমার জন্য। পাউন্ড কোনও সমস্যা নয় আমার কাছে। আমার শুধু দরকার একটা ব্র্যান্ড। আমার কোনও কম্পিটিটর নেই। আমার কোম্পানির শেয়ারের প্রাইস নিশ্চয়ই তোর অজানা নেই।

পিটারের শেষ কথাগুলো ছিল ঔদ্ধত্যে ভরা। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিট্টুর তুখোড় ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছেড়ে পিটারের জন্য একটা মায়া হয়েছিল। যে-জায়গাটায় আজ পৌঁছেছে তার শুরুটায় পিটারের একটা অবদান ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে-জায়গায় পিটার আজকে এসে পৌঁছেছে সেই রাস্তায় বিট্টুরও অবদান কম নেই।

আমাকে ভাবতে দে। সেদিনের কথাটা ওখানেই শেষ করে দিয়েছিল বিট্টু।

গ্লোবটা ঘোরানোর ফাঁকে ঘড়ি দেখল বিট্টু। রাত্রি বারোটা বাজতে এখনও সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরি। তবে স্থানীয় সময় ধরে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত, দুবাই সব জায়গায় ব্রাহ্মমুহূর্তটা পেরিয়ে গেছে। কোথাও আকাশ থেকে প্লেন ভেঙে পড়েনি, কোনও কারখানায় বিস্ফোরণ হয়নি, কোনও ব্যাঙ্কের কাস্টমারের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ারও খবর নেই। এবার ইটালিতে ফোন করতে হবে। নতুন সহস্রাব্দ আর কিছুক্ষণ মাত্র দেরি। রোমে পাঁচজনের একটা টিম কাজ করছে। ওদের টিম লিডার বিকাশ। মোবাইল ফোনটা বার করে কলার লিস্টে সবে বিকাশের নামটা বার করতে যাবে, এমন সময় বেজে উঠল ফোনটা। অনেকগুলো নম্বর ফুটে উঠল স্ক্রিনে।

হ্যাপি মিলেনিয়াম প্রীতম।

চমকে উঠল বিট্টু। এই গলাটাকে পাগলের মতো খুঁজেছে কতদিন। গলাটা চিনতে একটুও ভুল হল না। কিন্তু অদ্ভুত একটা বিহ্বলতায় নিজের গলাটা আটকে গেল। ওপ্রান্ত থেকে খুশিঝরা গলাটা সুর করে বলে উঠল, তুমি আমাকে উইশ করবে না প্রীতম?

তুমি কোথায় উপাসনা? অস্ফুট স্বরে বলল বিট্টু।

আমি দারুণ একটা জায়গায়। খিলখিলে হাসির শব্দ উঠল, বিশ্বাস করো, ঠিক এই জায়গাটায় এখনও কোনও হিন্দি সিনেমার শুটিং হয়নি। তবে লোকেশনটা একেবারে...

কানের থেকে ফোনটা নামিয়ে এনে ইনকামিং কলের নম্বরটা দেখে একটা কাগজে চট করে টুকে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কোথায় উপাসনা?

সেটা কি খুব ইম্পর্ট্যান্ট প্রীতম?

কম্পিউটারে দ্রুত বিভিন্ন দেশের আইএসডি নম্বরগুলোর সঙ্গে উপাসনার কলিং নম্বরটা মেলাতে মেলাতে এক জায়গায় থেমে গেল।

কেমন আছ প্রীতম?

নিউজিল্যান্ডে তুমি কী করছ উপাসনা?

তুমি চিরকালই স্মার্ট প্রীতম। ঠিক ধরে ফেললে তো আমি নিউজিল্যান্ডে। তবে নিউজিল্যান্ডে আমি বেড়াতে এসেছি। আমার ছেলেমেয়েরা খুব ধরল নিউ মিলেনিয়ামের পৃথিবীর প্রথম সানরাইজটা দেখবে...

ছেলেমেয়ে... তুমি কী বলছ... আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে সিরিয়াসলি কথা বলছি।

আমিও সিরিয়াস। আমার ছেলেমেয়েরা কত বড় জানো? সবচেয়ে বড় মেয়ে। সে সিক্সথ স্ট্যান্ডার্ডে পড়ে।

তোমার বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। একটাই প্রশ্ন করার জন্য এত বছর ধরে আমি তোমাকে খুঁজেছি। তুমি আমাকে ঠকালে কেন?

উপাসনা অন্য প্রান্তে একটু গম্ভীর হল, আমি নিজেকে ঠকাতে চাইনি প্রীতম। সন্দীপ চলে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারছিলাম, তোমাকে ছেড়ে দূরে চলে না গেলে ছেড়ে থাকতে পারব না।

তুমি কি ভেবেছিলে ইমিগ্রেশনটাই একমাত্র প্রবলেম? ইংল্যান্ডে না হলে ভারতে গিয়ে আমরা থাকতে পারতাম না? আমাদের নিজেদের দেশে? অথবা অন্য কোনও দেশে? এমনকী ইংল্যান্ডেও কি চেষ্টা করতে পারতাম না! আমি সব ছেড়ে তোমার সঙ্গে যেতে রাজিই ছিলাম উপাসনা।

তুমি সব জেনে গেছ?

বিট্টু অসহায়ের মতো বলার চেষ্টা করল, আমি তো তোমার সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিলাম।

আমি চাইনি। কারণ আমি অপয়া। তোমার জীবনটাকে আর নষ্ট করতে চাইনি।

আর এখন? এখন কার জীবনটাকে নষ্ট করছ?

একটু চুপ করে থেকে উপাসনা একটা চাপা শ্বাস ফেলে বলল, আনোয়ারের প্রয়োজনটা অন্যরকম ছিল। আনোয়ারের সব ছিল, কিন্তু সংসারটা দেখার জন্য কারও একটা প্রয়োজন ছিল। ছেলেমেয়েদের বয়স যাই হোক না কেন, ওদের একটা মায়ের মতো কোনও বন্ধুর অভাব ছিল জীবনে...

আমি এইসব শুনতে চাই না... তুমি আমাকে ফোন করলে কেন?

তোমাকে কেন ফোন করে ফেললাম জানি না। অনেকবার মনে হয়েছে তোমাকে ফোন করি... জানো কয়েকদিন আগে আমার মেয়ে একটা সিনেমা দেখছিল। পাউলি। পাউলি একটা বুদ্ধিমান টিয়াপাখি, যে কথা বলতে পারে... একটা বাচ্চা মেয়ে যে ঠিকমতো কথা বলতে পারত না, পাউলিকে সে একটা উপহার হিসেবে পেয়েছিল। পাউলি বাচ্চা মেয়েটাকে কথা বলতে শেখাত কিন্তু মেয়েটার মুখে সেটা শুনে ওর বাবা ভাবল মেয়েটা রূপকথা আর বাস্তবকে তফাত করতে জানে না। পাউলিকে মেয়েটার কাছ থেকে...

বিট্টু অধৈর্য হয়ে পড়ল, হিন্দি সিনেমার গল্প তুমি আজও একই রকম বলো উপাসনা। কিন্তু তোমার গল্প শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না।

পাউলি হিন্দি সিনেমা নয় প্রীতম। জন রবার্টসের সিনেমা। নিশ্বাস ভারী হল উপাসনার, আমার ছেলেমেয়েরা হিন্দি সিনেমা দেখে না। আমি ওদের গল্প শোনাতে গেলে ওরা ভাবে আমি রূপকথা আর বাস্তবকে তফাত করতে পারি না। পাউলির বাচ্চা মেয়েটার মতো। কিন্তু আমি কোনও ভাল সিনেমা দেখলে আজও মনে মনে তোমাকে গল্পটা শোনাই। বা মনে হয় তোমাকে একটা ফোন করেই ফেলি... চাপা শ্বাস ফেলে

বলতে থাকল উপাসনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিই... আজ যে কী হল... তোমার কথা ভীষণ মনে হল...

বিট্টু ব্যঙ্গ করে বলল, মনে হল পাউলির গল্পটা শোনাই...

তাই কি?... হয়তো তাই। পাঁচ মিনিট আগেও আমি ভাবিনি আমি তোমাকে ফোন করব। আমি এখন একটা হিলটপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। সামনে যত দূর দেখা যায় সমুদ্র। সূর্যটা এখনও ওঠেনি। আকাশটা লাল হয়ে আছে। একটু আগে তার মধ্যে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। আমার কেন জানি না মনে হল এই পাখিরা সব তোমার সেই মায়ের ডায়েরিটাতে বন্দি ছিল। ওরা সব আজ মুক্ত হয়ে উড়ে গেল সেই হরির ঝিলের দিকে। রূপকথা না বাস্তব জানি না। কিন্তু আমার মনে হল ওই ঝাঁকটাতে পাউলিও ছিল। উড়ে যেতে যেতে পাউলি বলে গেল...

বিট্টু রাগত গলায় বলল, তোমার আর কিছু বলার আছে? রূপকথা, বাস্তব, ইংরেজি সিনেমার গল্প? এনি আদার ড্যাম ট্র্যাশ অ্যান্ড ননসেন্স?

তোমার মনে আছে প্রীতম, যখন তোমার কোম্পানিটা পিটারের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তুমি একদিন বলেছিলে 'বিটল্‌স সফট' নামটা আর তোমার ভাল লাগছে না। তোমার কোম্পানির একটা নতুন নাম চাও। আমি অনেক ভেবেও সেদিন বলতে পারিনি। আজ মনে হল উড়ে যেতে যেতে পাউলি আমাকে নামটা জানিয়ে দিয়ে গেল। উইং... ডানা... তোমার কোম্পানির নাম উইং সফট হতে পারে না প্রীতম?

পিটারের কথা মনে হল বিট্টুর। ফিসফিস করে বলে উঠল, 'বিটল্‌স সফট' নামটা আমার।

উপাসনা আবার উদাস গলায় বলতে থাকল, আমি জানি প্রীতম, আমার এটাও মনে আছে প্রীতম আজকের দিনটাও তোমার। তুমি এই দিনটার দিকে অনেক দিন ধরে তাকিয়ে ছিলে। ওয়াই-টু-কে। আমি জানি সাফল্য তোমাকে আজ ছুঁয়ে যাবে প্রীতম। আমার সামনের সমুদ্রর শেষটা অপেক্ষা করে আছে সহস্রাব্দের প্রথম সূর্যটা ওঠার জন্য। সূর্যটা যখন উঠবে, তখন আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব... নতুন সহস্রাব্দে এক ভীষণ সফল, ভীষণ সুখী মানুষ হও... নতুন সহস্রাব্দে আমাকে আর একবারও মনে কোরো না। এই সহস্রাব্দের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব দুঃখ, সব হতাশা ভুলে যাও...

ফোনের মধ্যে বিট্টু একটা উচ্ছ্বাস মেশানো কোলাহলের শব্দ শুনল। সেই সঙ্গে হাততালির আওয়াজ। নতুন সহস্রাব্দের সূর্যটা বোধহয় সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে উঠতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ক্রমশ হাততালি আর কোলাহলের আওয়াজটা তীব্র হতে থাকল। তার মধ্যে কেটে গেল ফোনটা।

একেবারে আনমনা হয়ে পড়ল বিট্টু। দিনের পর দিন যে-ব্রাহ্মমুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার আকর্ষণ উত্তেজনা সাফল্য অবগাহন সব যেন শূন্য হয়ে গেল। মোবাইল ফোনটা অফ করে ওভারকোটের পকেটে রেখে নিঃশব্দে অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর গাড়িটা চালিয়ে চলে এল লন্ডন ব্রিজের কাছে। আলোয় ঝলমল করছে রাত্রিটা। নতুন সহস্রাব্দকে ডাকতে উৎসবে মেতে আছে চারদিকে প্রাণচঞ্চল মানুষ। তার

মধ্যে টেমসের ধার দিয়ে আপন খেয়ালে হাঁটতে থাকল বিট্টু। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে রেলিং-এ ভর দিয়ে টেমসের জলের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলতে থাকল, জুলিকে ভুলতে কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিলাম। তোমার স্মৃতিটাও আজ টেমসের জলে দিয়ে দিলাম উপাসনা। গুড বাই মিলেনিয়াম। গুড বাই লন্ডন...।

কতক্ষণ টেমসের দিকে ঝুঁকে বিড়বিড় করে কথা বলে গিয়েছিল মনে নেই। একটা সময় আবার একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটতে থাকল বিট্টু। হাঁটতে হাঁটতে পা-গুলো মনে হল ভারী হয়ে এল। টেমসের ধারে একটা ফাঁকা বেঞ্চ পেল। দু' হাত-পা ছড়িয়ে বেঞ্চে বসে পড়ল। চারদিকের উৎসবের কোনও আওয়াজ যেন কানে ঢুকছে না। টেমসের চিকচিকে জলটা দেখে মনে পড়ে যাচ্ছে এক ছোটবেলার স্মৃতি। মহেশের ভাঙা বাড়িটার জানলা দিয়ে যেমন চিকচিক করত হরির ঝিলটা। একসময় বেজে উঠত হরিতলা কটন মিলের সাইরেন। ঝাপসা দৃষ্টিতে আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে বিট্টু বলতে থাকল, আমি আর পারছি না মাম্মি... কতদিন তুমি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সেই গানটা গাওনি... আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

কোথাও একটা সাইরেন বেজে উঠল, আকাশে আতসবাজি ঢেকে ফেলল তারাগুলোকে। অনেক দূর থেকে রাত্রি বারোটার গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ আসতে থাকল, ঢং... ঢং... ঢং...

৯৪

নতুন সহস্রাব্দের সূচনা মুহূর্তে উপাসনার ফোনটা বিট্টুকে এক অন্য মানুষে রূপান্তরিত করে দিল। কাজের হাজার চাপে, ব্যাবসা বাড়ানোর অদম্য নেশা আর বাবার পাশে অক্লান্তভাবে থাকার ফাঁকে যে-উপাসনার জন্য খোঁজ মাঝে মাঝে পাগল করে দিত, সেই রসায়নটাই শরীরের মধ্যে থেকে হারিয়ে গেল। লন্ডন শহরটাকেই ক্রমশ অসহ্য মনে হতে লাগল। এই শহরে আনাচে কানাচে যেন হতাশা লুকিয়ে আছে। ভেতরে ভেতরে লন্ডন ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা প্রস্তুতি শুরু করে দিল। চিন্তা ছিল একটাই, দয়াল সান্যালের চিকিৎসা।

ডক্টর ব্রাউনের সঙ্গে সম্পর্কটা দিনে দিনে আত্মিক হয়ে গিয়েছিল। শুরুটা হয়েছিল দয়াল সান্যালের চিকিৎসক হিসাবে। কবে যেন বিট্টুও ওঁর অলিখিত পেশেন্ট হয়ে উঠছিল। মনের অলিগলিগুলোর সব ঠিকানা ওঁর জানা। ডক্টর ব্রাউনই একদিন অনুমোদন করে দিলেন, অন্য শহরে গিয়ে এক নতুন মানুষ হয়ে সব কিছু শুরু করার ইচ্ছাটাকে। লিখতে আরম্ভ করলেন দয়াল সান্যালের দূর-চিকিৎসার প্রেসক্রিপশন।

একদিন ডক্টর ব্রাউনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে দয়াল সান্যাল বিট্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা আমাকে কেন এত প্রশ্ন করে বল তো? আমাকে আর এখানে নিয়ে আসবি না।

সিটবেল্টের ল্যাচ লাগাতে লাগাতে বিট্টু বলল, না, আর নিয়ে আসব না। আমরা এবার ফিরে যাব।

দয়াল সান্যাল চোখ কুঁচকে বললেন, কোথায় ফিরে যাব?

খুব সুন্দর একটা জায়গায় বাবা।

দয়াল সান্যাল চিন্তিত হলেন। বিট্টু একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে যে কালকে বললাম বাবা এমারসন সাহেব বলে দিয়েছেন, বিট্টু তুমি পাশ করে গেছ। এবার তুমি ফিরে যাও। তুমি ভুলে গেলে?

দয়াল সান্যালের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

ও তাই বল। তুই আমাকে বলেছিলি তাই না? এবার আমরা দু'জনে মিলে সেই মিলটা... সেই মিলটা... কী যেন নাম...

কী যেন নাম... কী যেন নাম... কী যেন নাম... তুমি মনে করার চেষ্টা করো বাবা। হরিতলা কটন মিলের নামটা বিট্টু বলল না।

বিট্টু বেজওয়াটার রোড ধরে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছিল। গাড়ি চালাতে চালাতেই ডানদিকে আঙুল তুলে বিস্তীর্ণ সবুজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই দিকের জায়গাটার কী যেন নাম...

দয়াল সান্যাল ঈষৎ রাগত গলায় বললেন, আঃ! মনে রাখতে পারিস না? হাইড পার্ক। তুই আমাকে কতবার দেখিয়েছিস।

বিট্টু মাথায় আঙুল চালিয়ে আক্ষেপ করার অভিনয় করল, ইস! দেখেছ... তোমার কেমন সব মনে থাকে আমিই সব ভুলে যাই। কিন্তু তুমি যে মিলটার কথা বলছিলে... কী যেন নাম।

তোকে মিলের কথা বলছিলাম? কোন মিলের নাম বলছিলাম।

হরিতলা কটন মিল।

দয়াল সান্যালের মুখটা এবার প্রসন্ন হল, হ্যাঁ, হরিতলা কটন মিল। খুব বড় করতে হবে মিলটাকে।

বিট্টুর গলার স্বরটা পালটে গেল। আপনমনে বলে যেতে থাকল, হরিতলা কটন মিল বন্ধ হয়ে গেছে বাবা।

কেন, আজ বন্ধ কেন? কীসের ছুটি আজ?

বিট্টু গাড়িটাকে রাস্তার একটা দিকে এনে পার্ক করল। বাবা কিছুই বুঝতে না পারলেও, পৃথিবীতে ঈশ্বর তো একটাই লোককে রেখে গেছেন যাঁর সামনে মনের কথাগুলো উচ্চারণ করে একটা শান্তি পাওয়া যায়। ডক্টর ব্রাউনের সঙ্গে কথা বলে আজ অল্প নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। বিট্টু স্বগতোক্তি করতে থাকল, আমরা দেশে ফিরে যাব বাবা। বেঙ্গালুরু। নতুন করে আবার সব আরম্ভ করব। আমার নতুন কোম্পানি, উইংসফট...

বিট্টু চেয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে নতুন করে শুরু করতে। ডটকম ব্যাবসা তখন দিনের পর দিন উল্কার গতিতে উর্ধ্বমুখী। পিটারের প্রস্তাব ছিলই। শুধু 'বিট্‌ল সফট' নামের ভগ্নাংশই নয়, গোটা 'বিট্‌ল সফট'কেই রেকর্ড পরিমাণ দামে পিটারকে বিক্রি করে

দিল। হয়তো ভাগ্যই। কারণ, এই বিক্রি করে দেওয়াটা বিট্টুর পক্ষে হয়েছিল একদম সময়োচিত।

কয়েক মাস পরে এক বসন্তের সকালে কাগজ পড়ে চমকে উঠল বিট্টু। ডটকম ন্যাসডাকে ক্র্যাশ করেছে। খবরের কাগজে পোশাকি নাম দিয়েছে বাবল বার্স্ট। গোটা বিশ্বব্যাপী শেয়ার বাজারে এক ধস নেমেছে। প্রথমেই পিটারের কথা মনে হল। কয়েকদিন পরে পিটারের অফিসে দেখা করতে গেল বিট্টু। পিটারকে দেখে ভেতরটা মুচড়ে উঠল বিট্টুর। মাত্র কয়েক মাস আগে যে-পিটারকে একটা টগবগে আত্মবিশ্বাসী যুবক দেখেছিল, একটা প্রচ্ছন্ন গর্বের সঙ্গে 'বিট্‌ল সফট' কিনে নেওয়ার চুক্তিটাতে সই করেছিল, সেই পিটার এখন যেন হঠাৎ করে এক অবসন্ন বৃদ্ধ হয়ে গেছে। পিটারের কাঁধে হাত রেখে বিট্টু বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে পিটার।

রুক্ষ চুলগুলোর ভেতর আঙুল চালিয়ে পিটার বলল, আমি শেষ হয়ে গেছি প্রীতম। ব্যাঙ্করাপসি ফাইল হয়ে গেছে। রাতারাতি সব শেষ। সামনের সপ্তাহ থেকে 'বিট্‌ল সফট'-এর অস্তিত্ব শেষ। তোকে ছাড়া 'বিট্‌ল সফট' বাঁচল না...

বিট্টু পিটারের হাত দুটো টেনে নিয়ে বলল, কে বলল পারবি না? ব্যবসায় ভাল-খারাপ সবরকম সময় যায়। আবার সব নতুন করে শুরু কর।

থ্যাঙ্কস প্রীতম। আমায় ক্ষমা করে দিস।

তোকে আরও একটা খবর দিতে এসেছিলাম। আমি লন্ডন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

পিটার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, চলে যাচ্ছিস মানে?

আমি ঠিক করেছি ইন্ডিয়ায় ফিরে যাব।

কলকাতায়?

না, বেঙ্গালুরু। কর্নাটক গভর্নমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওখানে আমার হেড কোয়ার্টার্স করব।

আর তোর বাবার ট্রিটমেন্ট?

ডক্টর ব্রাউনের সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবা মনে হচ্ছে এখন চিকিৎসার আওতার বাইরে চলে গেছে। বাবার এখন একটাই জিনিস দরকার। পুরনো দিনের চেনা পরিবেশ। সেই সঙ্গে সেবা যত্ন ভালবাসা। ইন্ডিয়াতে হয়তো সেটা পাব।

দয়াল সান্যালকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বেঙ্গালুরুতে চলে এল বিট্টু। আবার নতুন করে শুরু। বেঙ্গালুরু ততদিনে আমেরিকা ইউরোপের বড় বড় কম্পিউটার কোম্পানিগুলোর নতুন লক্ষ্যস্থল। এক ঝাঁক তরুণ ছেলেমেয়েকে নিয়ে নতুন উদ্যমে ব্যাবসাটা শুরু করল বিট্টু। নিরলস পরিশ্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নিজের একটা সুনাম আর পরিচিতি তৈরি করে ফেলতে পেরেছিল। নিজের পরিকল্পনামতো ইউরোপের বাজার ধরার জন্য নতুন মুদ্রা প্রচলনের ইউরো তো ছিলই, এর সঙ্গে সংযোজিত হল কম্পিউটার ব্যাবসার এক নতুন দিগন্ত, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও।

বেঙ্গালুরুতে এসে একটাই বিপত্তি হল। লন্ডন ছেড়ে বেঙ্গালুরুতে এসে নতুন পরিবেশে দয়াল সান্যাল আর কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। বিট্টুর চিন্তার আরও কারণ ছিল। ডেভির সেবা-শুশ্রূষায় অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন দয়াল সান্যাল। বিট্টু বহু চেষ্টা করেও ডেভিকে ভারতে আনতে পারেনি। অবস্থার অবনতিই হচ্ছিল। ডক্টর ব্রাউনকে একদিন ফোন করে সব বলাতে উনি পরামর্শ দিলেন, তোমাকে তো আমি বলেছিলাম প্রীতম, একমাত্র চেনা পরিবেশই ওঁকে ভাল রাখতে পারে। তোমাদের কলকাতার বাড়ির কথা তুমি কেন চিন্তা করছ না।

কলকাতা এখান থেকে অনেক দূর ডক্টর। তা ছাড়া আমি সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট এখানে করতে শুরু করে দিয়েছি। এখান থেকে যাওয়ার কোনও উপায় এখন নেই...

কিন্তু তোমাদের কলকাতার বাড়িটা তো আছে।

তা আছে।

একটা ব্যবস্থা করো না। কিছুদিন গিয়ে মিস্টার সানিয়াল ওখানে ভ্যাকেশন কাটানোর মতো থেকে আসুন।

সেটা হয়তো ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু পুরনো দিনের কেউ তো...

কথাটা শেষ করার আগেই বিট্টু থেমে গিয়েছিল।

অনেকগুলো রিং হয়ে যাওয়ার পর বীথি ফোনটা ধরল। বিট্টু কথাটা শুরুই করল মজা করে, ব্যবস্থাটা তুমি দারুণ করেছ বীথি। সরোজকাকার বাড়িতে ফোনটা বাজল, আর তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে তুমি ফোনটা ধরে ফেললে।

বীথি ঠান্ডা গলায় বলল, কেমন আছ বিট্টুদা?

ভাল! খুব ভাল বীথি। স্যরি, কাজের ঝামেলায় তোমাদের আর ফোন করাই হয় না। অবশ্য একই অভিযোগ আমিও করতে পারি। সরোজকাকা কেমন আছেন?

একইরকম নিস্পৃহ গলায় বীথি বলল, ভাল।

কাকা কোথায়?

হাঁটতে গেছে। গঙ্গার ধারে। দিনে এই একবারই সন্ধেবেলায় হাঁটতে বেরোয়।

ভেরি গুড। তোমাদের একটা খবর দেওয়ার আছে বীথি। কিছুদিন হল আমরা বেঙ্গালুরু চলে এসেছি। ভাবছিলাম বাবাকে ক'দিন কলকাতায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। আমাকেও একটা কাজের ব্যাপারে কয়েকদিন ফিলাডেলফিয়াতে যেতে হবে। সরোজকাকা যদি ওই সময়টায় ক'দিন বাবার কাছে থাকেন, খুব অসুবিধা হবে বীথি।

বীথি একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি বাবাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলে না?

কথাটার মানে ধরতে না পেরে বিট্টু বলল, কীসের ছুটির কথা তুমি বলছ বীথি?

তোমাদের সান্যালবাড়ির থেকে ছুটি!

বিট্টু অবাক হল। বীথির গলাটা খুব শুকনো। ওর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি তো মিটে গিয়েছিল। বিয়ের পর খুব খুশি ছিল।

কী বলছ বীথি? আমি চেয়েছিলাম হরিতলা কটন মিল যাতে আর কাকাকে ডিস্টার্ব

না করে। তার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। মিলটা তো এখন আগরওয়ালরা বন্ধই করে দিয়েছে। এসব আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি বলছি বাবার সঙ্গে কাকার যে সম্পর্ক আছে...

ব্যঙ্গাত্মক গলায় বীথি বলল, মালিকের সঙ্গে চাকরের সম্পর্ক?

বিট্টুর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। বীথির ব্যবহারটা এরকম পালটে গেছে কেন? অনেকদিন কোনও খোঁজখবর না রাখার অভিমান?

তোমার কী হয়েছে বীথি? তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?

বাবাকে আর ছুটি থেকে ডেকে পাঠিয়ো না বিট্টুদা। বাবা একটা নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। সেই জগৎটাতে বাবা খুব ভাল আছে। আমি ছাড়ি বিট্টুদা?

বীথির ব্যবহারটা মনে লাগল বিট্টুর। খানিকটা রাগও হল। হতে পারে সরোজ বক্সী নিজের ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে জীবনটাকে নিবেদিত করে দিয়েছিলেন সান্যাল পরিবারের জন্য, কিন্তু প্রতিদানে বিট্টু শুধু যথাযোগ্য গুরুজনের সম্মানই দেয়নি, যথাসাধ্য করার চেষ্টা করেছে, এমনকী বীথির জন্যও।

অকৃতজ্ঞতা! ভেতরে ভেতরে একটা জেদ চেপে গেল বিট্টুর। যদি বশংবদতা, প্রশ্নাতীত আনুগত্যটাই বাবার দরকার হয়, পয়সা দিয়ে তা হলে সেটাই কিনবে। শীতল ভট্টাচার্যর মুখটা ভেসে এল বিট্টুর মনে।

প্রীতম সান্যাল!

ফোনটা ধরে অপ্রত্যাশিত থমথমে গলাটা পেয়ে একটু থতমত খেয়ে গেলেন শীতল ভট্টাচার্য। আমতা আমতা করে বললেন, কেমন আছেন স্যার? অনেকদিন পরে।

আপনি এখন কী করছেন মিস্টার ভট্টাচার্য?

কিছু করছি না স্যার। বাড়িতেই বসে টিভিতে খবর দেখছিলাম...

আমি জানতে চাইছি, আপনি এখন কাজকর্ম কী করছেন মিস্টার ভট্টাচার্য?

শীতল ভট্টাচার্যর গলাটা করুণ হল, শুনেছেন তো স্যার, বিনয় আগরওয়াল হরিতলার মিলটা বন্ধ করে দিয়েছে। লেবার ট্রাবলটা সব নিজের তৈরি করা স্যার, আসলে অন্য ধান্দা...

বিট্টুর গলাটা আর এক পরত রুক্ষ হল, আপনি কি আর কোথাও চাকরি করছেন এখন?

দু'জায়গায় চেষ্টা করলাম স্যার। ভাল অফার দিয়েছিল। কিন্তু মন টেকাতে পারলাম না। হরিতলাটা নিজের হাতে...

আমার জন্য কাজ করবেন।

মুহূর্তে শীতল ভট্টাচার্যর গলাটা উৎসাহিত হয়ে উঠল, লন্ডনে স্যার? আমার পাসপোর্ট করানো আছে...

কাজটা কলকাতায়।

মুহূর্তের উৎসাহটা নিভতে আরম্ভ করল। এককালের ছোট মালিককে না বললেও

সত্যিটা ভেতরে বেজে উঠল। বিনয় আগরওয়াল অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু লিজটা হয়ে যাওয়ার পর তার একটা প্রতিশ্রুতিও রাখেনি। উলটে হরিতলা কটন মিলের জন্য অন্য ম্যানেজার ঠিক করল। মাইনেটা পেলেও সম্মানটা তলানিতে এসে ঠেকেছিল। তারপর তো একদিন হরিতলা কটন মিলটাই বন্ধ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করে দু'জায়গায় কাজ জোটানো গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সত্যিটা হল, দু'জায়গাতেই চাকরি চলে গিয়েছিল। এখন তুলোর দালালি করে দু'পয়সা উপার্জন হয়। কিন্তু ষাট পেরিয়ে ওই দু'পয়সা উপার্জনের জন্য অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, গুজরাত দৌড়ঝাঁপ এই বয়সে আর পোষাচ্ছে না। লন্ডন তো স্বপ্নের বেশি। কলকাতায় যদি সান্যালদের কাছে আবার স্থিতু হওয়া যায়, বর্তে যায়।

কী ভাবছেন মিস্টার ভট্টাচার্য?

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে শীতল ভট্টাচার্য বললেন, স্যার, এ তো আদেশ। নিশ্চয়ই করব? আপনি কি কলকাতায় ব্রাঞ্চ খুলছেন স্যার?

কাজটা হল, বাবার দেখাশোনা করতে হবে। আপনি রাজি হওয়ার আগে আমি কী চাই মন দিয়ে শুনুন। বাবা কলকাতার বাড়িতে থাকবেন। আগে বাড়িটা আগের মতো রেনোভেট করে নিন। যেমন দেওয়ালের রং ছিল, যেমন আলোর শেড ছিল, সব যতটা সম্ভব আগের মতো করতে হবে। খোঁজ করতে হবে পুরনো দিনের কাজের লোক ড্রাইভার কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বাবা হরিতলা কটন মিল নিয়ে আপনাকে যা যা প্রশ্ন করবেন, আপনাকে ভেবেচিন্তে উত্তর দিতে হবে। অ্যাজ ইফ, হরিতলা কটন মিলটা খুব ভাল চলছে। ফাইনালি চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার নার্সের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি রাজি থাকলে আপনার টার্মস বলুন।

এ সুযোগ ফোন বয়ে দু'বার আসবে না। মোদ্দা কথা কাজটা হল, পাগল সামলাতে হবে। কী কাজ করতে হবে পরে ভাবা যাবে। কোনও দ্বিধা না রেখে শীতল ভট্টাচার্য বললেন, আমি রাজি স্যার। আপনি কি বক্সীবাবুকেও বলেছেন স্যার?

বিট্টু মৃদু ধমকে উঠল, কেন? সরোজকাকাকে ছাড়া আপনি কাজটা করতে পারবেন না?

আলটপকা মন্তব্যটা শীতল ভট্টাচার্য তাড়াতাড়ি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন, না, না, স্যার আমি আসলে আপনাকে সাবধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। বক্সীবাবু তো এখন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী সেজে থাকে। ওর মেয়ের ব্যাপারটা জানেন তো স্যার...

আমার অন্য কিছু জানার সময় নেই। আপনার টার্মস আর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরটা আমাকে জানান।

বারো বছর পর কলকাতায় আবার ফিরে এলেন দয়াল সান্যাল। ডক্টর ব্রাউনের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক যেরকম পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল বিট্টু, তার অনেকটাই করে ফেলা গিয়েছিল। বিট্টু প্রথমে ঠিক করেছিল কলকাতা হবে বাবার বেঙ্গালুরু থেকে মাঝে মাঝে গিয়ে থাকার একটা বিকল্প ঠিকানা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আবার

কলকাতাই হয়ে উঠল দয়াল সান্যালের স্থায়ী ঠিকানা। এই ব্যবস্থা বিট্টুকেও কোথাও একটা নিশ্চিন্ত করেছিল। উইংসফটের প্রসারের জন্য ছুটে বেড়াতে থাকল পৃথিবীর এক কোণ থেকে অন্য কোণ। উইংসফটের কর্মীসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশচুম্বী হতে থাকল উইংসফটের হেডকোয়ার্টার। পৃথিবীর নানা শহরে জন্ম নিতে থাকল উইংসফটের শাখা অফিসের। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবসায় প্রীতম সান্যাল হয়ে উঠল একটা আলোচ্য ভারী নাম। এই প্রীতম সান্যাল চিরকালের জন্য বিট্টুকে পাঠিয়ে দিলেন বিস্মৃতির অতলে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রীতম সান্যালের চরিত্রও পালটে যেতে থাকল। বাইরে ও ভেতরে। বাইরে সকলে প্রীতম সান্যালকে ভাবত আত্মকেন্দ্রিক নির্বান্ধব খামখেয়ালি মানুষ। কর্মচারীরা ওঁকে অত্যন্ত সমীহ করত। আর ভেতরে ভেতরে প্রীতম সান্যাল প্রতিদিন আবিষ্কার করতেন নিজের পরিবর্তনকে। মায়ের জন্য যে তীব্র অভিমান আর ভালবাসায় বিদীর্ণ হয়েছিল শৈশব আর কৈশোর, সেই ক্ষত জুড়িয়ে মায়ের জন্য জন্ম নিল এক পবিত্র অনুভূতি।

এককালে যে মায়ের ডায়েরিটাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন, সেটাই হয়ে উঠল এক নিজস্ব পাঠ্য। ডায়েরিটা পড়ার সময় প্রত্যেকবার মনে হত, পাতাগুলো থেকে উঠে আসছে মায়ের নিজের কণ্ঠস্বর, যেটা এতদিন মলাটবন্দি হয়ে ছিল। সেই মাতৃভাষ্য প্রীতম সান্যালকে চিনিয়ে দিল মায়ের নিজের জগৎটাকে, জীবনদর্শনকে, পাখিদের জন্য ভালবাসাকে, দিদিমা মার্থার মতো রূপোপজীবিনী মেয়েদের যন্ত্রণাকে। চোখ বন্ধ করে অনুভব করতে পারতেন দিদিমা থেকে জুলির মতো হতভাগ্য মেয়েরা, যারা রাত বিক্রি করে, তাদের যন্ত্রণা। নিজে আর কখনও জীবনে নারীসঙ্গের আসক্তি অনুভব করেননি। তবে বাইরের লোকেরা জানত বাজারি নারীসঙ্গ ছাড়া চলে না প্রীতম সান্যালের। কিন্তু বন্ধ ঘরের মধ্যে কী করতেন সেই সব মেয়েদের সঙ্গে? কিনে নেওয়া রাতটাতে শান্তির ঘুম ঘুমোতে দিতেন। মেয়েরা নিজেদের আলোচনায় হাসাহাসি করত। বলত, পৌরুষ হারানো এক ধনী পাগল।

৯৫

কাকভোরে মহীশূরের কৃষ্ণচূড়া গাছে মোড়া রাস্তাটায় মুহূর্তের অসতর্কতায় অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গিয়েছিল প্রীতম সান্যালের। তারপরে দর্শনা রঙ্গনাথন জগিং করতে করতে যেন ধূমকেতুর মতোই উদয় হয়েছিল। তুবড়ে যাওয়া গাড়ির দরজাটা খুলে প্রীতম সান্যালকে উদ্ধার করেছিল। পায়ের চোটটা ভালই। যন্ত্রণাটা চেপে পা-টা টেনে টেনে চলতে কষ্ট হলেও, ভোরের কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি বিছানো রাস্তায় দর্শনার কাঁধে ভর দিয়ে সুন্দর রাস্তাটায় হাঁটতে ভাল লাগছিল। মেয়েটা নিঃসংকোচে এবং অক্লেশে একজন আহত মানুষের হাত নিয়ে নিয়েছে কাঁধে।

তোমার বাড়ি আর কত দূর দর্শনা?

খুব কষ্ট হচ্ছে আপনার? একটু দাঁড়াব?

না, কষ্ট আর আমার হচ্ছে কই, সব কষ্টটা তো তুমিই নিয়ে নিয়েছ।

প্রীতম সান্যাল নামটা শোনা আর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাওয়া বিশাল দামি গাড়িটা দেখা ইস্তক দর্শনার মাথায় নামটা ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রশস্তি শোনার অস্বস্তি দূর করতে আর হাঁটার কষ্টটা লাঘব করতে জিজ্ঞেস করে ফেলল, স্যার আপনি কি উইংসফটের...

প্রীতম সান্যাল ঘাড় ঘুরিয়ে দর্শনার মুখটা দেখার চেষ্টা করলেন।

তুমি জানো উইংসফটকে?

পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতেই আহত মানুষটার হাতের ভার কাঁধে ভারী মনে হল। উইংসফটের নাম কে না জানে? সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রীতম সান্যালের নামও, যার কোম্পানিটা উল্কার গতিতে বেড়ে চলেছে। মানুষটা অদ্ভুত। অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে হাতে মোবাইল ফোনটা ধরে গুনগুন করে গান করছিল। কথার তোড়ে এত বড় মাপের মানুষটাকে বলে ফেলেছে, আপনি বাচ্চা। আবার সেই মানুষটা বিনয় করে জিজ্ঞেস করছেন উইংসফটকে চেনে কিনা।

স্যার আপনি বলছিলেন আপনার অফিসে খবর দিলে এখনই লোকজন চলে আসবে। উইংসফটে আমার কয়েকজন বন্ধু আছে। আমি একটা খবর দেব ওদের?

প্রীতম সান্যাল হাসলেন। অ্যাক্সিডেন্টে গাড়িটা দুমড়ে গেলেও নিজের মোবাইল ফোন দুটো অক্ষতই আছে। একটা ফোন করলেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গাড়ির মেলা বসে যাবে। নরম গলায় বললেন, থাক দর্শনা। লোককে এত সকালে ঘুম থেকে তুলে অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা না হয় নাই দিলাম। চলো আগে তোমার হাতে কফিটা খেয়ে নিই। সময়মতো খবর দিয়ে দেব। তুমিও এই ভোরে ট্রাবলটা যে কেন নিলে!

কোনও ট্রাবল নয় স্যার। আমার মা একটা নার্সিংহোমের মেট্রন। হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এই তো স্যার, আমাদের বাড়ি চলে এসেছে।

দর্শনা আঙুল তুলে দূরে একটা বাড়ি দেখাল। অনেকটা ছড়ানো জায়গায় ছোট একটা একতলা অনাড়ম্বর বাড়ি। দূর থেকে বাড়িটা দেখে ভাল লেগে গেল প্রীতম সান্যালের। এই সাধারণ দৃশ্যটা পিকচার পোস্টকার্ডের মতো মনে হচ্ছে। ছোট্ট একটা কাঠের গেট পেরিয়ে বাড়িটার কাছাকাছি এসে ভেতর থেকে তানপুরার আওয়াজ পেলেন প্রীতম সান্যাল। সেই সঙ্গে এক না-জানা দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় ভজন। প্রীতম সান্যালের মুখের কৌতূহলটা দেখে দর্শনা বলল, আমার মা... বালাজির ভজন করছে।

কলিংবেলের সুইচে আঙুল ঠেকাল দর্শনা। ভেতরে তানপুরার আওয়াজ আর ভজন দুটোই বন্ধ হল। প্রীতম সান্যাল লজ্জিত গলায় বললেন, নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। প্রথমে তোমার জগিং নষ্ট করলাম আর এবার তোমার মায়ের প্রার্থনা।

দরজাটা খুলে বাইরে মেয়ের সঙ্গে এত সকালে এক অচেনা পুরুষকে দেখে মুখটা পালটে গেল শ্রীমতী রঙ্গনাথনের। দর্শনা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, মাম্মা, উনি মিস্টার সানিয়াল। রাস্তায় একটা আক্সিডেন্টে পড়েছিলেন।

শ্রীমতী রঙ্গনাথন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে আন্তরিকভাবে বললেন, আসুন, আসুন...

বাড়িটার ভেতরে পা রেখে প্রীতম সান্যাল বুঝতে পারলেন, বাড়িটা বাইরে থেকে যতটা সুন্দর, ভেতর থেকেও ততটাই সুন্দর। অল্প সাধারণ আসবাব পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের ভেতরে হালকা একটা ধূপের গন্ধ পরিবেশটাকে আরও পবিত্র করেছে। এত সকলেও শ্রীমতী রঙ্গনাথনের চান হয়ে গেছে। ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো। কপালে তিন লাইন চন্দনের টিপ। মুখের আদলে মা-মেয়ের সম্পর্কটা আর বলে দিতে হয় না।

প্রীতম সান্যালকে যত্ন করে সোফায় বসিয়ে দর্শনা বলল, মাম্মা, দেখবে একটু, ওনার পায়ে চোট লেগেছে।

প্রীতম সান্যাল হাত তুললেন, না, না, ব্যস্ত হতে হবে না। সেরকম কিছু নয়। তা হলে হেঁটে আসতেই পারতাম না। অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার সময় হাঁটুতে অল্প লেগেছে আর গোড়ালিটা মচকে গেছে। আসলে রাস্তায় থাকতাম। আপনার কাইন্ড হার্টেড মেয়ে, শুনল না। আপনাকে বিরক্ত করতে ধরে নিয়ে এল।

কোনও বিরক্ত নয় মিস্টার সানিয়াল। মচকানির ব্যথা পরে বাড়ে। দাঁড়ান একটা পট্টি দিচ্ছি।

ক্রমশ প্রীতম সান্যাল মা-মেয়ের অতিথিপরায়ণতা আর সেবাপরায়ণতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কয়েক ঘণ্টার পুরনো কাউকে অত্যন্ত আপনজন মনে হল। শ্রীমতী রঙ্গনাথন নিজে হাতে চুন-হলুদের পট্টি লাগিয়ে দিলেন। বরং শ্রীমতী রঙ্গনাথন যখন পায়ে পট্টিটা লাগাচ্ছিলেন তখন অস্বস্তি হচ্ছিল প্রীতম সান্যালেরই।

আপনাদের সেবা দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মিসেস রঙ্গনাথন। আপনার মেয়ে বুঝি রোজ এরকম লোক ধরে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে?

রোজ সকালে তো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না মিস্টার সানিয়াল। আর আমি একজন নার্স। এই কাজটা করাই আমার ধর্ম।

সবাই যদি আপনার মতো হত, আপনার মেয়ের মতো হত, তা হলে পৃথিবীটাই অন্যরকম হয়ে যেত মিসেস রঙ্গনাথন।

প্রীতম সান্যাল অন্যমনস্ক হলেন। গত রাতের কথা মনে পড়ে গেল। বনানীর কথা। বনানীর মতো নার্সরা দয়াল সান্যালের জন্য পয়সার বিনিময়ে কাজটা করে, কিন্তু সেবার সেই আন্তরিকতাটাই নেই। যেটা ছিল লন্ডনে ডেভির মধ্যে। বনানীর যদি উপস্থিত বুদ্ধি আর আন্তরিকতা আর একটু থাকত, তা হলে হয়তো কালকে রাতের ঘটনাটাই ঘটত না। সেই মেয়েটাকে নিয়ে এই ভোরে বেঙ্গালুরু গিয়ে কলকাতার ফ্লাইট ধরার তাড়ায় কৃষ্ণচূড়ার গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে অ্যাক্সিডেন্টটাও হত না। অবশ্য অ্যাক্সিডেন্টটা না হলে মা-মেয়ে রঙ্গনাথনের মমতা উষ্ণতায় ভরা বাড়িটাতেও আসা হত না।

দর্শনা স্টিলের ঘটিতে তিনটে কফি এনে সেন্টার টেবিলে রেখে বলল, মাম্মা, মিস্টার সানিয়াল কিন্তু মস্ত মানুষ। উইংসফট কোম্পানিটা ওঁর।

শ্রীমতী রঙ্গনাথনের মুখ দেখে কিন্তু মনে হল না উইংসফটের বিশালত্ব, বৈভব এবং অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে ওঁর কোনও সম্যক ধারণা আছে। ধোঁয়া ওঠা কফির ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি অফিসে কোনও খবর দিয়েছেন মিস্টার সানিয়াল?

দেব।

দর্শনা বলে উঠল, আপনি কফিটা খান, আমি খবর দিয়ে দিচ্ছি স্যার।

প্রীতম সান্যাল ম্লান হেসে বললেন, তোমার তো আবার বন্ধু আছে বললে উইংসফটে, তাই না?

হ্যাঁ, অনুপমা ভারমা, বিবেক গুপ্তা, কৌশল্যা...

প্রীতম সান্যাল হাসিটা চওড়া করলেন। দর্শনা অপ্রস্তুত হল। শুনেছে পৃথিবীব্যাপী সতেরো হাজার লোক কাজ করে উইংসফটে। তার কর্ণধারের পক্ষে দর্শনার বন্ধুদের মতো নিচু স্তরের কর্মীদের নিশ্চয়ই নাম মনে নেই। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাতে দর্শনা বলল, আমিও স্যার কিন্তু আপনার সঙ্গে করসপন্ডেন্স করেছি আগে।

প্রীতম সান্যাল কৃত্রিম বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, তাই, কবে?

আমি স্যার ইয়াডির সিইও মিস্টার বিরাজ মাথুরের সেক্রেটারি। ইয়াডির সঙ্গে যখন আপনার করসপন্ডেন্স হয়...

ওয়েট আ মিনিট! প্রীতম সান্যাল দর্শনার দিকে আঙুল তুলে বললেন, তুমি চাকরি করো? আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম তুমি কলেজে টলেজে পড়ো। ফার্স্ট ইয়ার।

তিন বছর আমি ইয়াডিতে আছি স্যার।

ইয়াডিতে মাথুরের কাছে আছ মানে বেঙ্গালুরুতে আছ?

ইয়েস স্যার বেঙ্গালুরুতেই। ক'দিন ছুটিতে মাম্মার কাছে এসেছি। আমি মিস্টার মাথুরের থ্রুতেও উইংসফটে খবর দিতে পারি।

প্রীতম সান্যাল পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করে বললেন, মাই সেল ইজ ওয়ার্কিং দর্শনা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে এতক্ষণ হয়তো আমি উইংসফটে খবর দিয়ে দিতাম। উইংসফটে খবর দেওয়ার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না। খবর যদি দিতেই চাও লোকাল থানায় একটা খবর দিয়ে দাও। গাড়িটা রাস্তায় ওভাবে পড়ে আছে। লোকাল থানার নম্বরটা আমার জানা নেই। বাকি যা খবর দেওয়ার ওরাই দিয়ে দেবে।

শ্রীমতী রঙ্গনাথন বললেন, আমার কিন্তু মনে হয় আপনার একটা এক্স-রে করিয়ে নেওয়াটা খুব জরুরি।

প্রীতম সান্যাল আনমনা হলেন। এরা কী চাইছে? প্রীতম সান্যাল চলে যান। আর সেটা চাওয়াই তো স্বাভাবিক। কয়েক ঘণ্টা আগেও তো এদের সঙ্গে কোনও আলাপ-পরিচয় ছিল না। এরা ভালমানুষ। সেবাকে ব্রত মনে করে। দুর্ঘটনা কবলিত একজন মানুষকে বাড়িতে নিয়ে এসে প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষা দিয়েছে। কফি খাইয়েছে। পরিশেষে যথাস্থানে খবর দিয়ে কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে চাইছে। ক'টা মানুষের মধ্যে আজ এই বিরল গুণ দেখা যায়? অথচ নিজের যে কিছুতেই আর উঠে যেতে ইচ্ছা করছে না। এটা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি রকম প্রত্যাশা হয়ে যাচ্ছে। মত পালটে উইংসফটের এক জেনারেল ম্যানেজারকে ফোন করে নিজের অ্যাক্সিডেন্টের খবরটা অতি সংক্ষেপে বলে দর্শনাকে ফোনটা দিয়ে বললেন, বিক্রম ওয়ালিয়া আছে লাইনে। তুমি অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা আর তোমাদের বাড়ির লোকেশনটা একটু বলে দাও প্লিজ।

দর্শনা ফোনটা নিয়ে বাড়ির ঠিকানা বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর প্রীতম সান্যাল শ্রীমতী রঙ্গনাথনকে বললেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার অফিসের লোকেরা চলে আসছে। আমি ততক্ষণ বসছি। কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আপনি বরং আপনার বালাজির ভজনটা শেষ করে নিন। বড় পবিত্র লাগছিল।

শ্রীমতী রঙ্গনাথন হাসলেন, আপনি ব্রেকফাস্টে ইডলি খাবেন না কর্নফ্লেকস খেতে পছন্দ করেন মিস্টার সানিয়াল?

আপনি কিন্তু আমার ঋণ বাড়িয়ে দিচ্ছেন মিসেস রঙ্গনাথন।

কীসের ঋণ মিস্টার সানিয়াল? আপনি অতিথি।

কী জানেন তো মিসেস রঙ্গনাথন, গতকালের তারিখটা আমার জীবনে এক অদ্ভুত তারিখ। আমার দিদিমা জন্মেছিলেন গতকালের তারিখে আবার আমার মা মারা গিয়েছিলেনও গতকালের তারিখে। তারপর...

প্রীতম সান্যাল মাথাটা হেলিয়ে আপন মনে বলে যেতে থাকলেন নিজের কথা। জীবনের অনেক কথা বললেন, আবার অনেক কথা বললেন না। যেমন বললেন কার্শিয়াং-এর বোর্ডিং স্কুলের কথা, ব্রাদার ডি'সুজার কথা, হ্যাম রেডিয়োর কথা, দয়াল সান্যালের মানসিক রোগের কথা, হরিতলা কটন মিলের কথা, হরির ঝিলে শিপ্রার পাখির স্বপ্নের কথা, দয়াল সান্যালের তুলো চাষের কথা; সেরকমই একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না দয়াল সান্যালের সঙ্গে শিপ্রার সম্পর্কের কথায়, শিপ্রার আত্মহত্যার কথা বা পৃথা, জুলি, উপাসনার কথা। শ্রোতারা কিন্তু নীরব থাকেনি। সময়ে সময়ে আন্তরিকভাবে সমব্যথী হয়েছে। যেমন শুনতে শুনতে শ্রীমতী রঙ্গনাথন কোনও সময় ভারাক্রান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এখন কেমন আছেন আপনার বাবা?

কেউ কি এভাবে বাবার কথা জিজ্ঞেস করে? আপনজনকে উত্তর দেওয়ার দায় থেকে প্রীতম সান্যাল বলতে থাকলেন, বাবা ভাল বা খারাপ থাকার ঊর্ধ্বে। যে স্টেজে বাবা সাফার করছেন, তাতে কখনই ভাল থাকাটা ডিফাইন করা যায় না। আমি একটু কনফিউজড। আপনাকে বললাম না, ওয়াই-টু-কে পর্যন্ত লন্ডনে ছিলাম। কোনও ট্রিটমেন্টেই বাবা রেসপন্স করলেন না। তারপর পাকাপাকিভাবে বেঙ্গালুরুতে থেকে অপারেট করতে শুরু করলাম। কিন্তু বেঙ্গালুরুটা বাবার একেবারেই স্যুট করল না। ডক্টররা অ্যাডভাইস করলেন বাবাকে কলকাতার বাড়িতে রাখতে। মানে সুস্থ অবস্থায় যে-বাড়িতে উনি থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। দেন... বাবাকে কলকাতার বাড়িতে রেখে, আই অলসো স্টার্টেড অ্যানাদার লং জার্নি। আফটার ওয়াই-টু-কে, রাইজ অ্যান্ড ফল অফ ডটকম, নেক্সট জেনারেশন অফ নেট ওয়ার্কিং... বিপিও... ব্লা... ব্লা... মাই কোম্পানি হ্যাজ রিচড টু আ হাইট... দর্শনা বোধহয় কিছুটা জানে। সতেরো হাজার লোক আজ দুনিয়াজুড়ে কাজ করে উইংসফটে। ইটস আ লং রান... বাট আয়াম টায়ার্ড...

শ্রীমতী রঙ্গনাথন আর দর্শনা আরও অবাক হয়ে শুনতে থাকল একজন অচেনা মানুষের জীবনের ছেঁড়া ছেঁড়া কথা। কখনও দর্শনার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে প্রশ্ন,

এখন তো হরিতলা কটন মিলটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন হরির ঝিলে পাখিরা আসে স্যার?

উদাস গলায় প্রীতম সান্যাল উত্তর দেন, জানি না দর্শনা।

আর আপনার? আপনার কোনও সেন্টিমেন্ট নেই?

প্রীতম সান্যাল আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে নিচু গলায় বললেন, বোধহয় না!

আপনার ইচ্ছে করে না হরির ঝিলে পাখিদের ফিরিয়ে আনতে? অনেক অনেক পাখি... দেশ-বিদেশ থেকে আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি...

প্রীতম সান্যাল অবাক হয়ে দর্শনার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, তুমি উইংসফটে জয়েন করবে দর্শনা?

এই আকস্মিক প্রস্তাবটার জন্য দর্শনা প্রস্তুত ছিল না। প্রথমেই মনে হল উইংসফটের মালিক আজ সকালের কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে চাইছেন।

জয়েন অ্যাজ মাই সেক্রেটারি। আই নিড সামবডি লাইক ইউ।

স্যার, ইয়াডি উইংসফটের তুলনায় অনেক ছোট কোম্পানি কিন্তু ইয়াডির বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

প্রীতম সান্যাল হাসলেন।

দ্যাটস গুড! ভেরি গুড! কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু তোমাকে আমার দরকার দর্শনা। তোমার রেমুনারেশন, কেরিয়ার সবই ইয়াডির চেয়ে ভাল হবে। জয়েন উইংসফট অ্যান্ড ট্রাই ইট। ভাল না লাগলে তুমি থেকো না।

ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স আর উইংসফটের উচ্চপদস্থদের নিয়ে বিশাল একটা গাড়ির কনভয় একসময় রঙ্গনাথনদের বাড়ির সামনে চলে এল। ছোট্ট বাড়িটার শান্ত পরিবেশটা আর শান্ত থাকল না। চলে যাওয়ার আগে প্রীতম সান্যাল শ্রীমতী রঙ্গনাথনের হাতটা ধরে বললেন, যে-কোনও প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন—এর মতো কোনও ক্লিশে কথা আপনাকে বলব না। আপনার কাছে শেষ একটা অনুরোধ রেখে যাব। দর্শনাকে আমার হাতে দিন...

অনুরোধটায় কাজ হয়েছিল নাকি দর্শনা পাক্কা পেশাদারের মতো উইংসফটে জয়েন করেছিল, সেটা আর প্রীতম সান্যাল খোঁজ করেননি। উইংসফটের এইচ.আর. ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ওঁর পছন্দের কথা। ওরা জানে পছন্দর লোককে কী পেশাদারি উপায়ে তুলে আনতে হয়। তবে প্রীতম সান্যালের সেক্রেটারিয়েটে পেশাদারি কাজের দক্ষতা দর্শনাও দেখাতে পারছিল।

মাস দুয়েক কাজ করার পর দু'দিনের ছুটি নিয়ে দর্শনা মায়ের কাছে গিয়েছিল। ফিরে এসে পরের দিন সকালে প্রীতম সান্যালের ঘরের দরজাটা খুলে ভেতরে আসার অনুমতি চেয়ে বলল, মে অ্যাই কাম ইন স্যার?

কাম, কাম... কবে ফিরলে দর্শনা?

কাল রাতে স্যার।

মিসেস রঙ্গনাথন কেমন আছেন?

ভাল স্যার। আপনাকে রিগার্ডস জানিয়েছেন।

প্রীতম সান্যাল একটু চিন্তা করে বললেন, ম্যাকাও কখনও গেছ দর্শনা?

দর্শনা মাথা নাড়ল।

নেক্সট উইকে একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমোনি আছে। উইংসফট একটা বেস্ট কর্পোরেট অ্যাওয়ার্ড পাবে। একটা টিম যাচ্ছে। তুমি যেতে চাও? ফেরার সময় হংকং ঘুরে আসবে।

আগের কোম্পানি ইয়াডিতে এসব সুযোগ ছিল না। বিশেষ করে সেক্রেটারিদের এসব সুযোগ তো হয়ই না। বিদেশ দেখতে কার না ইচ্ছে করে। তবে চোখ চকচক করে যাওয়ার ইচ্ছেটা আর প্রকাশ করল না দর্শনা। প্রীতম সান্যাল অবশ্য ইচ্ছেটা বুঝে নিলেন।

ওকে! ভিসার জন্য তোমার পাসপোর্টটা নীলেশকে দিয়ে দাও।

থ্যাঙ্কস স্যার!

দর্শনার হাতে একটা ডিভিডি ছিল। ডিভিডিটা প্রীতম সান্যালের দিকে এগিয়ে বলল, আমি এসেছিলাম এটা আপনাকে দিতে।

ডিভিডিটা হাতে নিয়ে প্রীতম সান্যাল বললেন, কী আছে এতে?

একটা ইন্টারভিউ। টিভি প্রোগ্রাম থেকে রেকর্ড করা। এবার ছুটিতে মায়ের কাছে গিয়ে হঠাৎ করেই দেখেছিলাম। পরের দিন রিপিট টেলিকাস্টের সময় রেকর্ড করে নিয়েছি। আপনার হয়তো খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে।

ঠিক আছে, দেখব।

টেবিলের ওপর ডিভিডিটা রেখে দিলেন প্রীতম সান্যাল। দর্শনা বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটার পর একটা মিটিং। নানা ধরনের রিপোর্টে চোখে বোলানো। অন্যান্য দিনের মতোই ব্যস্ত দিনটা শেষ হল বেশ রাত করে। তবে অফিস থেকে বেরোনোর সময় টেবিলের ওপর ডিভিডিটা চোখে পড়ায় নেহাত কৌতূহলবশত হাতে তুলে নিলেন।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে ডিভিডিটা দিলেন। ড্রাইভার মালিকের ইচ্ছে বুঝতে পারল। প্রায় দিনই প্রীতম সান্যাল বাড়ি ফেরার সময় গাড়িতে হালকা করে বাজনা শোনেন। ওসব ইংরেজি গানবাজনার কিছু ড্রাইভার না বুঝলেও, মালিকের পছন্দটা মুখস্থ করে নিয়েছে। মোৎসার্টের ফিফথ সিম্ফনি, বা কখনও কখনও ন্যাট কিং কোলের পিয়ানো। ক্যাডিটাতে নিঃশব্দে ডিভিডিটা ঢুকিয়ে দিল ড্রাইভার।

মনিটরটা অন করে দাও।

ড্রাইভার বুঝতে পারল এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেখারও জিনিস। রিমোট টিপে লুকিংগ্লাসের পাশে এলসিডি মনিটরটা অন করে গাড়িতে গিয়র ফেলল। প্রীতম সান্যাল মনিটরটার দিকে চাইলেন। সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেও দর্শনাকে দেখে মাঝে মাঝে উপাসনার কথা মনে পড়ে যায়। দু'জনের নামে কী ছন্দগত মিলটার সঙ্গে চরিত্রেরও একটা মিল আছে? এই মেয়েটাও কীভাবে বুঝল যে প্রীতম সান্যাল সিনেমা দেখতে ভালবাসে? পরক্ষণেই মনে পড়ল দর্শনা বলেছিল এটা একটা রেকর্ড করা ডিভিডি।

টিভিতে কী একটা প্রোগাম দেখে ভাল লেগেছিল। রিপিট টেলিকাস্টের সময় রেকর্ড করে ডিভিডিটা বানিয়েছে।

মনিটরে ততক্ষণে রেকর্ড করা প্রোগামটা শুরু হয়েছে। ডানদিকের কোনায় চ্যানেলের লোগোটা দেখে বুঝতে পারলেন না চ্যানেলটা কোথাকার। তবে সঞ্চালককে দেখে আর হিন্দি শুনে বুঝতে পারলেন এটা ভারতেরই শয়ে ``য়ে চ্যানেলের কোনও একটা। সঞ্চালক ততক্ষণে প্রোগ্রামটা শুরু করে ফেলেছে।

"ওয়েলকাম ওয়াল্স এগেন টু 'ড্রিম কোলা—আননোন ইন্ডিয়ান অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড'। বিশ্বের কোনায় কোনায় আমরা অচেনা কৃতী ভারতীয়দের খুঁজি। আজ স্টুডিয়োতে আমরা সেরকমই একজনকে নিয়ে এসেছি, যার নাম ভারতে আমরা সেভাবে জানি না। অথচ ইনি ভারতীয়। ওঁর জন্য কিন্তু জার্মান বাচ্চারা অজ্ঞান। ইনি এমন একজন গায়িকা যাঁর অ্যালবাম কেনার জন্য ক্রিসমাসের আগে ঠান্ডা উপেক্ষা করে সারারাত ধরে লাইন পড়ে। ইনি এমন একজন গায়িকা যিনি এক বর্ণও জার্মান ভাষা না জেনে হাজার হাজার জার্মান শিশুর হৃদয় ছুঁয়ে ফেলেছেন। প্লিজ ওয়েলকাম মিজ বার্বি।"

রহস্য উন্মোচন করে ক্যামেরায় এবার বার্বি নামের গায়িকাকে দেখা গেল। স্থূল এক মধ্যবয়সি মহিলা। গোলাপি রঙের একটা অত্যন্ত দামি ঝলমলে পোশাক পরে আছে। একমাথা অদ্ভুত ছাঁটের সোনালি চুল এবং সেটা যে পরচুলা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

ক্যামেরার প্রথম ফোকাসেই খিলখিল করে হাসতে থাকল মিজ বার্বি। সঞ্চালক প্রথম প্রশ্ন করল, বার্বি! প্রথমেই আপনাকে জিজ্ঞেস করব আপনার এই হাজার হাজার শিশুমন জয়ের পিছনের রহস্যটা কী?

রহস্য একটাই। আমিও যে একটা শিশু। হাসির গমকটা বেড়ে গেল বার্বির, শিশুদের নিজস্ব একটা কমিউনিকেশনের ভাষা আছে। সেটা সিক্রেট। আবার হি হি করে হাসতে থাকল বার্বি।

কিন্তু ভাষা? আপনি তো শুনেছি জার্মান ভাষাও জানেন না।

তাতে কী? আমি তো ইংরেজিও জানতাম না। একটু একটু শিখেছিলাম। এখন ওরা ইংরেজি অক্ষরে উচ্চারণগুলো লিখে দেয়, আমি শুধু গেয়ে যাই... সেই খিলখিলে হাসিটা চলতেই থাকল।

প্রীতম সান্যাল নিজের মনে মাথা ঝাঁকালেন। যেদিন মহীশূরে গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল, সেদিন ভোর থেকে আজ পর্যন্ত মনে হয়েছিল দর্শনা মেয়েটা সিরিয়াস। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ধারণাটার মধ্যে অল্প হলেও খাদ আছে। না হলে রিপিট টেলিকাস্ট দেখে কষ্ট করে রেকর্ড করে এরকম একটা ডিভিডি কেউ উপহার হিসাবে নিয়ে আসে?

মোবাইল ফোনটা বাজতে থাকল। সিএলআই-তে নামটা ফুটে উঠেছে, গুলশন। পিটসবার্গে বড় একটা অর্ডার ফাইনাল হওয়ার ছিল। তার খবরটাই...

ড্রাইভার নিয়ম জানে। মালিকের ফোন এসেছে। এখন যতক্ষণ মালিক ফোনে কথা বলবেন, গাড়ির ভেতরের স্পিকারের ভল্যুম শূন্যে রেখে দিতে হবে। তবে নির্বাক হয়ে চলতে থাকল মনিটরটা।

হাই গুলশন? হোয়াটস আপ?

ওপ্রান্তে গুলশান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, উই মেড ইট।

কনগ্রাচুলেশন গুলশন। ইউ হ্যাণ্ড ডান আ মার্ভেলাস জব।

ড্রাইভার কথাটা শুনে প্রমাদ গুনল। বেশ বোঝা যাচ্ছে কোম্পানির একটা খুব ভাল খবর এসেছে। আর সব ভাল খবর কি বাড়ি ফেরার সময়ই হয়? এখনই হয়তো মালিকের মতি ঘুরে যাবে। ভাল খবরটা সেলিব্রেট করতে ইন্দিরানগরে বাড়ি যাওয়া ভুলে বলবে পাঁচতারা হোটেলে যেতে। আর সেখানে একবার গিয়ে পড়লে কত রাতে ছুটি হবে ঠিক নেই।

নির্বাক এলসিডি স্ক্রিনটা-তে মাঝে মাঝে চোখ পড়ে যাচ্ছিল। ফোনে কথা বলতে বলতেই একবার টিভি স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে ভুরুটা অল্প কুঁচকে গেল প্রীতম সান্যালের। যে-মহিলা উৎকট সাজপোশাক পরে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে নিজের উত্তর শেষ করতে না পেরে হেসে গড়িয়ে পড়ে, তার মুখটা এখন ক্লোজ-আপে ধরা। চোখ দুটো জলে ভরা। সেই জল গড়িয়ে পড়ছে গালে। দর্শনার ওপর আর একবার বিরক্ত হলেন প্রীতম সান্যাল। এই হাসি, এই কান্নার প্রোগ্রামটা দেখে কী করে ধরে নিল এটা প্রীতম সান্যালের ভাল লাগবে? নাকি ওদের বাড়িতে জীবনের কিছু কথা শুনিয়ে আর যেচে অভূতপূর্ব মাইনের চাকরি দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন মেয়েটার? মনটা আবার ফিরিয়ে দিলেন গুলশনের ফোনে।

বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়ে যাওয়ার পর প্রীতম সান্যাল ফোনটা ছাড়লেন। ড্রাইভার বুঝল মালিকের মনটা বেশ খুশি হয়ে গেছে। লুকিংগ্লাস দিয়ে ড্রাইভার পিছনে দেখল। দু'দিকে মাথা নাড়ছেন আর গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছেন। ফোনে কথা বলা হয়ে গেছে। অভ্যাসমতো ড্রাইভার রিমোট টিপে আবার গাড়ির স্পিকারের ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিল।

'আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...'

চমকে উঠে প্রীতম সান্যাল গুনগুনানিটা বন্ধ করলেন। না, একটুও বুঝতে ভুল হচ্ছে না। যে-গানটা ওই অদ্ভুতদর্শন মধ্যবয়সি স্থূল মহিলা গেয়ে যাচ্ছে, সেই গানটা তো তার একান্ত নিজস্ব। বিহ্বল হয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, আলসুর লেক চলো।

রিমোটটা নিলেন প্রীতম সান্যাল। তারপর ডিভিডিটাকে আবার প্রথম থেকে চালালেন।

আলসুর লেকের এক প্রান্তটা বেশ ফাঁকাফাঁকা। ছড়ানো-ছিটানো দোকানপাটগুলোও এত রাতে সব বন্ধ হয়ে গেছে। তার মধ্যেও নির্জনতম জায়গাটায় এসে গাড়িটা দাঁড় করাল ড্রাইভার। প্রীতম সান্যাল ড্রাইভারের দিকে তাকালেন। ড্রাইভার চট করে মানেটা বুঝে নিল। এখন তাকে গাড়ির স্টার্টটা অন রেখে এসি চালিয়ে রেখে গাড়ি থেকে নেমে যেতে হবে। মালিক কিছুক্ষণ একা নিজের মতো থাকবেন গাড়ির ভেতর।

ডিভিডিটা এগিয়ে নিয়ে আবার সেই জায়গাটাতে প্লে করলেন প্রীতম সান্যাল যেখানে বার্বি শুরু করছে নিজের অতীত জীবনের কথা।

আমি আসলে পূর্ব পাকিস্তানের মেয়ে। পূর্ব পাকিস্তান বলছি এই কারণে, কারণ স্বাধীন বাংলাদেশে আমার কখনও যাওয়া হয়নি।

সঞ্চালক হাতের কাগজ দেখে বলল, তখন আপনার নাম ছিল বাবলি। এই বাবলি থেকে বার্বি কীভাবে হলেন?

বার্বির খিলখিলানো হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে মুখটা যেন একটু বিষণ্ণ হল।

তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমার বয়স মাত্র ষোলো। বাবা-মা'র সঙ্গে রিফিউজি হয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এলাম একদিন। আমার ঠাঁই হল ব্যারাকপুরে এক দয়ালু ভদ্রমহিলার বাড়িতে। ক্যাথিমাসি। ক্যাথিমাসির বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য থাকতে এসেছিলেন ভদ্রমহিলার এক বোনঝি। শিপ্রাদিদি। মাত্র কয়েকটা দিন। কিন্তু শিপ্রাদিদি আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। একটা আত্মবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল, সেটাই হয়তো ছিল বার্বি হয়ে ওঠার প্রথম দিন।

বার্বি একটা রুমাল বার করে চোখের কোলগুলো মুছল। অশ্রুশিক্ত চোখ দুটোকে ক্লোজ-আপে ধরবার জন্য ক্যামেরা আরও জুম করল। নেপথ্যে সঞ্চালকের গলা শোনা গেল, তারপর?

সেটা ছিল এক ডিসেম্বর মাস। ঠান্ডায় খোলা ছাদের তলায় শিপ্রাদিদি আমাকে ক্যারলস শেখাত—হি কেম টু টেল দ্য ফাদারস লাভ/ হিজ গুডনেস, ট্রুথ অ্যান্ড গ্রেস/ টু শো দ্য ব্রাইটনেস অফ হিজ স্মাইল, দ্য গ্লোরি অফ হিজ ফেস/ উইথ হিজ ওন লাইট, সো ফুল অ্যান্ড ব্রাইট/ দ্য সেড অফ ডেথ টু চেজ, গ্লোরি টু গড অ্যান্ড পিস অন আর্থ।

গানটা শেষ হতে হাততালি দিয়ে উঠল সঞ্চালক।

অসাধারণ... অসাধারণ, সেই সঙ্গে খুব ইন্টারেস্টিং। তারপর...

শিপ্রাদিদির একটা অসাধারণ সিনসিয়ারিটি ছিল। উনি শুধু আমাকে গানই শেখাতেন না। এক একটা করে ক্যারলসের উচ্চারণ শুদ্ধ করে দিতেন। আমি আসলে সেভাবে তো ইংরেজি জানতাম না। শুধু ইংরেজিই নয়, অদ্ভুত একটা লালাবাই শুনিয়ে শিপ্রাদিদি একদিন আমাকে ঘুম পাড়িয়েছিল। তখন ইন্ডিয়ান আর্মি ইস্ট পাকিস্তান অ্যাটাক করেছে। আমি ভয়ে মরে যেতাম। তার মধ্যেই একদিন এমন একটা গান শুনিয়েছিলেন যেটাকে আমি জীবনের সবচেয়ে পবিত্র গান মনে করি।

শোনান না আমাদের একটু।

আস্তে আস্তে চোখ দুটো বন্ধ করে বার্বি গাইতে থাকল। চোখ দুটো জলে ভরে উঠে গালে গড়িয়ে পড়ল। অল্প কেঁপে উঠল ঠোঁট, 'আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়।/ ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...

গান শেষ হতে সঞ্চালক পরের প্রশ্ন করলেন, তা হলে এই শিপ্রাদিদিই আপনার গানের শিক্ষিকা?

না, সেভাবে আমি গান শিখিনি কোথাও। শিপ্রাদিদিকে আমি মাত্র ওই ক'দিনই পেয়েছিলাম। কী অদ্ভুত দিনগুলো ছিল। বোধহয় আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের,

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলো। বেশ মনে আছে, শিপ্রাদিদির একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। বিট্টু। নামটা আজও মনে আছে। তবে তাকে আমি কখনও দেখিনি। শিপ্রাদিদি, ক্যাথিমাসি বিট্টুর জন্য লাল একটা সোয়েটার বুনত। সান্তাক্লজের পোশাক। লাল টুপি। তার মাথায় বরফের ফুলটা আমি তৈরি করেছিলাম। শিপ্রাদিদি খুব ভালবাসত ছেলেকে। রাতে শুয়ে ছেলেকে খুব মিস করত। যে-গানটা গাইলাম ওটা আসলে শিপ্রাদিদির ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর গান ছিল...

আমরা আসল জায়গাটাতে আবার ফিরে যাই। ব্যারাকপুর থেকে বার্বি।

আমি কিছুদিনের জন্য ব্যারাকপুর থেকে চলে গিয়েছিলাম। তারপর ব্যারাকপুরেই ফিরে এসেছিলাম এক কর্নেলের বাড়িতে, যিনি আমাকে মেয়ের মতো রেখেছিলেন। সেখান থেকে কলকাতায় বার সিঙ্গার। ক্যাথিমাসির ছেলে রবার্টদা খুব সাহায্য করেছিল, সেখান থেকেই একটা বাংলা সিনেমায় প্লে-ব্যাক করলাম। তারপর একদিন বোম্বে। বোম্বেতে আমার হিন্দি উচ্চারণের জন্য সেভাবে কাজ পাচ্ছিলাম না। ছুটকো-ছাটকা কাজ করতাম। একবার একটা মিউজিক্যাল ট্রুপের সঙ্গে ইউরোপ ট্যুরে কাজ পেয়েছিলাম। জার্মানিতে এক অ্যারেঞ্জারের আমার গলা খুব পছন্দ হয়ে গেল...

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল পুরনো বার্বি। ডিভিডিটা বন্ধ করে দর্শনাকে ফোন করলেন প্রীতম সান্যাল।

গুড ইভিনিং স্যার...

দর্শনা আমি কি তোমাকে কখনও বলেছি যে আমার মাম্মির নাম শিপ্রা সান্যাল?

না স্যার, আপনি বলেননি... কিন্তু হরিতলার যে ফাইলটা আপনি আমার কাছে দিয়েছেন তাতে মিসেস শিপ্রা সান্যালের...

তাই তুমি বার্বির ইন্টারভিউটা রেকর্ড করেছিলে?

দর্শনার গলাটা পালটে গেল। প্রীতম সান্যালের কাটা কাটা প্রশ্নে একটু যেন ঘাবড়ে গেছে। খানিকটা আবেগতাড়িত হয়ে করে ফেলেছে কাজটা। কিন্তু প্রীতম সান্যাল যে খেয়ালি মানুষ সেটা বিলক্ষণ জানত।

আসলে স্যার... আপনার যেদিন ভোরবেলায় কার অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল, আমি দেখেছিলাম আপনি আহত হয়ে গাড়িটার মধ্যে বসে আর ওই অদ্ভুত গানটা গাইছেন। কেন জানি না গানটার টিউনটা মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

ঘুমপাড়ানি গান। যে-গানটা আমি ঘুমোনোর আগে কোনও কোনও দিন অদৃশ্য কেউ একটা আমার কানে গেয়ে দেয়...

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই গানটার সিডি কোথায় পাওয়া যায়... আপনি বলেছিলেন কোথাও না, গানটা আছে আমার মনে। তাই একদিন হঠাৎ করে চ্যানেল সার্ফ করতে করতে গানটা শুনে রিপিট টেলিকাস্টের সময়টা খুঁজে বার করে আপনার জন্য রেকর্ড করেছিলাম স্যার। ভেবেছিলাম আপনার হয়তো ভাল লাগবে। আননোয়িংলি আমি যদি আপনাকে হার্ট করে থাকি, আপনার ফিলিংসকে হার্ট করে থাকি, আই আম অফুলি স্যরি স্যার।

প্রীতম সান্যাল একটু চুপ করে থেকে বললেন, না দর্শনা। গোটা ব্যাপারটাই হয়তো ঈশ্বরনির্দিষ্ট। থ্যাঙ্ক ইউ। তুমি জানো না তুমি কী ফিলিংস আমার কাছে পৌঁছে দিলে। পৃথিবীতে অন্তত একজন এখনও আছে যার মাম্মির জন্য ভালবাসা আছে, কৃতজ্ঞতা আছে। মাম্মি চিরকাল মানুষের ভালর জন্য ভেবেছে। পাখিদের ভালর জন্য ভেবেছে। ইন টার্ন পৃথিবীর কাছ থেকে এইটুকু অন্তত মাম্মির পাওনা ছিল। থ্যাঙ্ক ইউ।

দর্শনা এবার ভরসা পেয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি বার্বিকে চেনেন স্যার?

না। তবে বাবলিকে চিনি। মাম্মির ডায়েরিতে পড়েছি।

আমি স্যার চেষ্টা করব ইন্টারনেট থেকে ওঁর যোগাযোগ বার করে আপনাকে কনট্যাক্টস দিতে।

না দর্শনা। মাম্মির জন্য বার্বির ভালবাসাটা অনেক পিয়োর। আমি সেরকম কিছু আগে করি, তারপর আমি বার্বির কাছে গিয়ে বলব, আমিই. . আমি ঠিক করে ফেলেছি দর্শনা। নেক্সট উইকে কলকাতায় যাব। এবার উইংসফটের জন্য নয়, বাবার জন্যও নয়, আমার জন্য কলকাতায় যাব। তুমিও আমার সঙ্গে চলো দর্শনা।

নেক্সট উইক মানে ম্যাকাও-এ অ্যাওয়ার্ড সেরিমোনির সপ্তাহ। পেশাদারি দক্ষতায় দীর্ঘশ্বাসটা লুকিয়ে দর্শনা বলল, রাইট স্যার!

৯৬

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে প্রীতম সান্যাল দর্শনাকে নিয়ে কলকাতায় এলেন। কলকাতায় উইংসফটের যে-শাখা অফিসটা আছে, সেখানেই বসতে শুরু করলেন প্রীতম সান্যাল। কলকাতা অফিসের কর্মচারীরা তটস্থ থাকে। শোনা গেছে প্রীতম সান্যাল পুরো এক সপ্তাহ থাকবেন। দয়াল সান্যালের শরীর ভাল আছে আর পুরো এক সপ্তাহের জন্য প্রীতম সান্যালের মতো ব্যস্ত মানুষ কলকাতায় উইংসফটের কোনও কাজকর্ম না দেখে অন্য কাজে পড়ে আছেন, এটা তারা দেখতে অভ্যস্ত নয়। ডাইরেক্টরদের হাত ধরে উইংসফটের যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় বেঙ্গালুরু থেকেই। ক্রমে খবরটা উইংসফটের অফিসের বাইরে বেরোল। যাঁরা কর্পোরেট দুনিয়ার খবর ফেরি করেন, তাঁদের কপালে ভাঁজ পড়ল। জল্পনা চলতে থাকল প্রীতম সান্যালের কাজটা কী। কেউ ভাবেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। এবার রাজারহাটে উইংসফটের বৃহত্তম আকাশচুম্বী বহুতলটা হবে। জল্পনা চলতে লাগল আরও। প্রীতম সান্যাল এবার এক সেক্রেটারিকে নিয়ে এসেছেন। মেয়েটা হয়তো সব জানে। বাচ্চা মেয়ে। মুখোমুখি হলে মিষ্টি হেসে 'হাই' বলে। কিন্তু ওর কাছে একদানাও খবর জোগাড় করতে পারেনি কেউ। কেউ কেউ এটাও লক্ষ করল, দয়াল সান্যালের পুরনো ম্যানেজার শীতল ভট্টাচার্যর প্রীতম সান্যালের ঘরে যাতায়াতটা একটু বেশিই। এই অফিসে তার জন্য একটা ঘরও বরাদ্দ হয়ে গেছে। জল্পনা চলল, তা হলে কি বাবার পুরনো সুতোকলের ব্যাবসাটা... প্রতিপক্ষ এই জল্পনাটা

শেষ করতে দেয় না। দুর, দুর, সুতোর ব্যাবসা আর উইংসফট? উইংসফটের তুলনায় দশমিক শূন্য এক শতাংশও কি লাভ তুলতে পারবে হরিতলা কটন মিল? তা ছাড়া তালা ঝোলানো মিলটা তো কোনও এক মারোয়াড়িকে লিজ দেওয়া আছে। জল্পনা চলতেই থাকল...

প্রীতম সান্যাল নিজের চেম্বারে ঢুকতেই পিছন পিছন দর্শনা ঢুকে হাতের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরিটায় চোখ বুলিয়ে বলল, স্যার, আপনার বারোটার সময় লাঞ্চ আছে আগরওয়াল ব্রাদার্সদের সঙ্গে। অনুপম ঘোষের ফার্ম ব্রিফিং পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর হরিতলা থেকে দু'জন পলিটিকাল লিডার এসে বসে আছে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য। আনশিডিউলড।

কে?

সাম বিপুল মণ্ডল অ্যান্ড সুব্রত রক্ষিত।

সুব্রত রক্ষিতের নামটা শীতল বলেছিল। বিপুল মণ্ডলটা আবার কে? এনি ওয়ে, কী জন্য দেখা করতে চায়? শীতল জানে ওরা কেন আমাকে মিট করতে চায়?

আয়াম নট শিয়োর স্যার মিস্টার ভট্টাচার্য জানেন কিনা। তবে আমার ওদের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে ওরা জাস্ট কার্টিয়াস। সেরকম কোনও ফিক্সড অ্যাজেন্ডা নেই।

ভুল দর্শনা। রং ইউ· আর। উইদআউট এনি পারপাজ দু'জন লিডার এমনি এমনি দেখা করতে চলে আসে না। এনি ওয়ে, এখন কি সময় দেওয়া যাবে?

দর্শনার মনে ছিল, তবু একবার ডায়েরিটা দেখে নিয়ে বলল, মিনিট পনেরো দেখা করে নিতে পারেন। তবে আমি ওদের বলে দিচ্ছি, কোনও ইস্যু রিলেটেড ডিসকাশন হবে না। আমার মনে হয় আপনি মিস্টার ভট্টাচার্যকে সঙ্গে রেখে দিন।

রাইট! ওদের পাঠানোর আগে শীতলকে একবার পাঠিয়ে দাও। পাঁচ মিনিট পরে ওদের পাঠিয়ো।

প্রীতম সান্যালের টেবিলের উলটোদিক থেকেই দর্শনা শীতল ভট্টাচার্যকে ফোনে প্রীতম সান্যালের তলবটা জানিয়ে দিল। হাতের ফোল্ডারে কয়েকটা কাগজ ছিল। সেগুলো সই করানোর জন্য টেবিলের ওপর গুছিয়ে সাজিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘর থেকে বেরিয়েই দর্শনা দেখল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছেন শীতল ভট্টাচার্য। দর্শনা অল্প একটু হাসল। শীতল ভট্টাচার্যর মুখচোখ দেখেই মনে হচ্ছে টেনশনে আছে। দর্শনাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, বসের মুড কীরকম? ডাকছেন কেন?

দর্শনা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, গিয়ে দেখুন।

দ্রুত আরও কিছু জেনে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল শীতল ভট্টাচার্যের। বিশেষ করে এই এখন ওকে ডেকে পাঠানোর ব্যাপারে। কিন্তু ব্যাপারটাকে পাশ কাটিয়ে দিল দর্শনা। দর্শনা জানে সে প্রীতম সান্যালের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেক্রেটারি বলে অনেকেই তাকে সমীহ করে। অহরহ প্রত্যেকের যেন একটাই প্রত্যাশা থাকে দর্শনার কাছে। প্রীতম সান্যালের মনের অতলের খবর জানা। সেটাই যেন এই কোম্পানিতে ওপরে ওঠার সোপান, সুখেশান্তিতে থাকার একমাত্র চাবিকাঠি।

দরজাটা দুবার নক করে পাল্লাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন শীতল ভট্টাচার্য। প্রীতম সান্যাল একমনে একটা পেপার নাইফের ধারটা পরখ করে যাচ্ছেন। চোখ তুলে শীতল ভট্টাচার্যকে দেখলেনও না। তবে উপস্থিতিটা টের পেলেন। শীতল ভট্টাচার্য একটু উসখুস করে পুরনো একটা কাজের সূত্র ধরে বলার চেষ্টা করলেন, আমি স্যার অনুষ্টুপকে বলে দিয়েছি কোনও ট্রাশ অ্যান্ড ননসেন্স নিয়ে এলে দূর করে দেব।

প্রীতম সান্যাল ছুরিটা শীতল ভট্টাচার্যর দিকে তাক করে ওকে থামিয়ে দিলেন, মিস্টার ভট্টাচার্য আমি তো আপনাকে বলেছি আমার কী চাই। আপনাকে ফুল রেসপন্সিবিলিটি দিয়েছি টু গেট ইট ডান। অ্যান্ড ইউ মেসড ইট।

আসলে স্যার, আমি ভেবেছিলাম...

হাউ মাচ ডু আই পে ইউ মিস্টার ভট্টাচার্য?

শীতল ভট্টাচার্যর মুখটা ছোট হতে থাকল। প্রীতম সান্যাল একটা স্থির দৃষ্টিতে শীতল ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে বললেন, মিলিটারিতে একটা কথা খুব চলে জানেন তো। জুনিয়রকো সোচনা মানা হ্যায়। আই ডোন্ট পে ইউ টু থিঙ্ক ওভার মাই ডিসিশনস।

চুপ করে কিছুক্ষণ বিরক্তির সঙ্গে মাথা দুলোতে থাকলেন প্রীতম সান্যাল। তারপর আবার শীতল ভট্টাচার্যর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নাউ টেল মি, হরিতলা থেকে দু'জন পলিটিকাল লিডার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কেন? হ্যাভ ইউ লিকড সামথিং?

এই দমবন্ধ পরিবেশেও খুব অবাক হলেন শীতল ভট্টাচার্য। মুখে একটা বিস্ময় ফুটে উঠল, হরিতলা থেকে নেতা এসেছে? মানে সুব্রত রক্ষিতরা? কই আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি...

চুকচুক করে মুখে একটা আওয়াজ করে প্রীতম সান্যাল বললেন, আপনাকে আপনার চেয়ারটাতে বসিয়ে রাখার আর একটাও স্ট্রং পয়েন্ট খুঁজে পাচ্ছি না মিস্টার ভট্টাচার্য। আপনাকে আমি ইনভল্‌ভ করেছিলাম একটাই কারণে। আমার ধারণা ছিল এতদিন কাজ করে হরিতলাটাকে আপনি হাতের তালুর মতো চেনেন। লোকের সেন্টিমেন্ট বোঝেন।

আত্মপক্ষ সমর্থনে শীতল ভট্টাচার্য কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বন্ধ দরজায় আবার দুটো টোকা পড়ল। তারপরেই দরজাটা অল্প একটু ফাঁক হল। দর্শনা। পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। দর্শনার পিছনে পিছনে সুব্রত রক্ষিত আর বিপুল মণ্ডল।

সান্যালবাবু আসব? ভেতরে ঢোকার অনুমতি চাইল সুব্রত রক্ষিত।

আসুন! অমায়িক হয়ে বললেন প্রীতম সান্যাল।

বিপুল মণ্ডলকে পিছনে নিয়ে একটু কুণ্ঠিত হয়েই ঘরের ভেতরে এল সুব্রত রক্ষিত।

বসুন!

চোখের ইশারায় বসার চেয়ারগুলো দেখালেন প্রীতম সান্যাল। দু'জনে বসে পড়ার পর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা শীতল ভট্টাচার্যকেও ইশারায় বসতে বললেন। তারপর একটু আগে টেবিলের ওপর দর্শনার রেখে যাওয়া কাগজগুলো সই করতে করতে বললেন, আপনার অনেক নাম শুনেছি সুব্রতবাবু। কিন্তু মুখোমুখি আলাপ হওয়ার সৌভাগ্য...

সুব্রত রক্ষিত কুণ্ঠাটা ঝেড়ে ফেলতে পারল না। আমতা আমতা করে বলল, এদিকে পার্টি অফিসে একটা কাজে এসেছিলাম। শুনলাম আপনি এখন কলকাতার অফিসে আছেন, তাই ভাবলাম একটু দেখা করে যাই।

কাগজগুলো সই করা শেষ করে মুখ তুলে চেয়ে প্রীতম সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, কোনও সমস্যা টমস্যা হয়েছে নাকি?

নাহ্... না, এমনিতে সব ঠিক আছে। তবে শুনলাম আপনি হরিতলায় নতুন ইন্ডাস্ট্রি খুলবেন।

প্রীতম সান্যাল একটু চুপ করে থেকে বললেন, কে বলল?

সুব্রত রক্ষিত তীর্যক হাসল।

পার্টি লেভেলে খবর আছে। এলাকার উন্নয়নের জন্য আমি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। একটা মিল বন্ধ হয়ে গেছে, তার জায়গায় আধুনিক আর একটা ইন্ডাস্ট্রি হবে। এটাই তো উন্নয়নের মডেল। আমরা শুধু চাই উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষেরও উন্নয়ন হোক। আপনি কম্পিউটারের কাজের জন্য দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে আসবেন না। এলাকায় প্রচুর কম্পিউটারের স্কুল আছে। আপনাকে নামের লিস্ট দিয়ে দেব।

দ্যাটস ভেরি গুড! কিন্তু আপনার কাছে আমারও একটা অনুরোধ আছে সুব্রতবাবু। আপনি তো জানেন হরিতলায় এককালে কোনও ইন্ডাস্ট্রি ছিল না। হরিতলা কটন মিলই প্রথম ইন্ডাস্ট্রি। আপনার এলাকার উন্নয়ন হয়েছে হরিতলা কটন মিল দিয়েই। বাইরে থেকে বহু মানুষ এসে হরিতলায় বসতি করেছেন। মিলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের অনেকেই ভাল নেই। তাঁদের দিকটা আমাকে কিন্তু আগে দেখতে হবে।

সুব্রত রক্ষিত আর বিপুল মণ্ডল নিজেদের মধ্যে একবার চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর সুব্রত রক্ষিত বলল, আজ তা হলে উঠি সান্যালবাবু...।

সুব্রত রক্ষিতরা বেরিয়ে যেতেই প্রীতম সান্যাল শীতল ভট্টাচার্যকে বললেন, কী বুঝলেন মিস্টার ভাট্টাচার্য?

স্যার, ওরা কিছু একটা আন্দাজ করছে। এবার ওদের কথা না শুনলে ভয়ংকর একটা আন্দোলন শুরু হবে। আমাদের প্রজেক্টটা পণ্ড হয়ে যাবে।

আমাদের প্রজেক্টটা কী মিস্টার ভট্টাচার্য?

শীতল ভট্টাচার্য মাথা চুলকালেন। প্রজেক্টটা যে কী সেটাই যে ঠিক করে জানা নেই। প্রীতম সান্যাল মনের কথাটা ধরলেন, প্রজেক্টটা কী সেটাই যখন জানা নেই, তখন অহেতুক গুজব ছড়িয়ে হিরো হওয়ার চেষ্টা করবেন না। হরিতলা মিলের পুরনো লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার যে কাজটা দিয়েছি, সেটা কমপ্লিট করুন।

দর্শনা এসে নরম করে তাড়া দিল, স্যার, আগরওয়াল ব্রাদার্সদের সঙ্গে লাঞ্চের জন্য এবার আপনাকে বেরোতে হবে।

রাইট দর্শনা। আমি আজ আর নাও অফিসে ফিরতে পারি।

বিনয় আগরওয়াল একাই এসেছিলেন। ক্লাবে দুপুরে খাওয়ার ঠান্ডা জায়গায় বসে গরম স্যুপে চুমুক দিয়ে বিনয় আগরওয়াল বললেন, আমি সব খবর রাখি সানিয়ালসাব। আপনি আসমানকে টাচ করে ফেলেছেন।

আসমানটা যে আসলে ঠিক কতটা উঁচুতে সেটাই তো আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।

বিনয় আগরওয়াল দাঁত বার করে হাসলেন, এটা আপনি একশো কথার এক কথা বলেছেন সানিয়ালসাব। তা বলুন আমি আপনার কী সেবা করতে পারি?

প্রীতম সান্যাল গলাটা পরিষ্কার করে সোজাসুজি বললেন, হরিতলা কটন মিলটা আমার ফেরত চাই মিস্টার আগরওয়াল।

বিনয় আগরওয়াল গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর আবার দাঁতগুলো বার করে বললেন, এই তো লাস্ট ইয়ার আপনি লিজটা রিনিউ করিয়ে দিলেন। হঠাৎ কী কসুর হল?

আমি মাইন্ড চেঞ্জ করেছি মিস্টার আগরওয়াল। আই জাস্ট ওয়ান্ট দ্য মিল ব্যাক।

আপনি বিজনেসে অনেক রাইজ করেছেন। কিন্তু আমার বয়সটা আপনার চেয়ে বেশি। বিনয় আগরওয়াল নিজের মাথার সাদা চুলগুলো দেখিয়ে বললেন, আপনার ফাদারের জমানা থেকে কাজ করছি আপনাদের সঙ্গে। তাই আপনাকে নিজের লোক ভেবে একটা কথা বলছি। কিচ্ছু করতে পারবেন না হরিতলায়। পারলে এই বিনয় আগরওয়াল মিলটা বন্ধ করে দিত না।

আমি একটা চেষ্টা করে দেখতে চাই।

বিনয় আগরওয়াল একটু চিন্তা করে বললেন, সম্ভব নয় সানিয়ালসাব।

কেন সম্ভব নয়?

আগে আপনি একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো। যে-কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেছে তার লিজটা আমি রিনিউ করলাম কেন? আফটার অল বন্ধ কারখানার লিজটা রিনিউ করতে আমাকে টাকা দিতে হয়েছে।

অ্যামাউন্টটা খুব নমিন্যাল ছিল মিস্টার আগরওয়াল।

এটা আমার প্রশ্নের উত্তর নয় সানিয়ালসাব। আমার বহুত ইনভেস্টমেন্টে তালা পড়ে আছে হরিতলার মধ্যে। যতক্ষণ না আমি সেটা রিকভার করতে পারি, আমি এটা ছাড়তে পারব না সানিয়ালসাব।

প্রীতম সান্যালের হাসিটা ধীরে ধীরে চওড়া হল।

আপনার রিকভারিটা আমি দু'গুন করে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না। অনুপম ঘোষের ফার্ম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। তার চেয়ে আপনি বলুন আপনি মেন কোর্সে কী নিতে পছন্দ করবেন?

প্রীতম সান্যালের চোখ বাঁচিয়ে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে গণপতিবাবাকে প্রণাম জানালেন বিনয় আগরওয়াল। এই দিনটা কখনও আসতে পারে ভেবেই তো গণপতিবাবাকে স্মরণ করে নামমাত্র টাকায় লিজটা রিনিউ করিয়ে রেখেছিলেন। দিনটা

বড় তাড়াতাড়িই চলে এল। পাগল বাবার পর পাগল ছেলে। পাগল না হলে ভবিষ্যৎহীন একটা বন্ধ্যা সুতোর মিলকে আকাশচুম্বী দামে কেউ কিনতে চায়?

৯৭

হাওড়া স্টেশনে ব্যান্ডেল লোকাল থেকে নেমে জনস্রোতে মিশে গেলেন অনন্ত গুহ। স্টেশন চত্বর ছাড়ার আগে বড় ঘড়িতে দেখলেন তিনটে চল্লিশ। দুপুরবেলায় কোনও কালেই ঘুমোনোর অভ্যাস ছিল না। তবে ইদানীংকালে হরিতলা কটন মিলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনেক অভ্যাসই আস্তে আস্তে পালটাতে আরম্ভ করেছে। এই দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাসটাই যেমন। ক'দিন ধরেই ভাবছেন, দুপুরের দিকে কলকাতায় গিয়ে সরোজদার সঙ্গে দেখা করে আসবেন, কিন্তু দুপুরে ভাতঘুমে চোখ জড়িয়ে গিয়ে বেলা ফুরিয়ে যায়। শকুন্তলাই বরং তাড়া দেয়, কী হল যাও আজকে। খোঁজটা নিয়ে এসো।

অনন্ত গুহ হরিতলা কটন মিলে ছিলেন টেকনিক্যাল সুপারভাইজার। সরোজ বক্সীর সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কম ছিল। আর সেই দুঃসময়ের সময়? পলাশ যখন নকশাল হয়ে হারিয়ে গেল, শকুন্তলা থেকে থেকে হরিতলার মিলে আর দয়াল সান্যালের অফিসে ঝামেলা আরম্ভ করল, সেদিন সরোজ বক্সী না থাকলে কে বাঁচাত অনন্তকে পুলিশের আর দয়াল সান্যালের হাত থেকে। অনেকবার ভেবেছেন অনন্তকে বাঁচানোর জন্য শেষ বুদ্ধিটাও কি তা হলে সরোজ বক্সীরই ছিল?

শীতল ভট্টাচার্যর লোক বাড়ি এসে খবরটা দেওয়ার পর থেকে শকুন্তলা একটু বেশিই কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। অনন্ত গুহ ভাবেন, মানুষ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কত বদলে যায়। এই শকুন্তলাই এককালে একা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল দয়াল সান্যালের সঙ্গে। এই শকুন্তলাই একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল শিপ্রা সান্যালের চেক। সেই শকুন্তলাই এখন তাড়া দিচ্ছে আগে সরোজবাবুর সঙ্গে দেখা করে জেনে বুঝে এসো। আসল কারণটা বলতে পারলে উনিই বলতে পারবেন। প্রস্তুতি নিয়ে তারপরই যেয়ো। কিন্তু অনন্ত গুহর ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছে, কুণ্ঠা হচ্ছে। এতগুলো বছর সরোজ বক্সীর খোঁজখবরই রাখা হয়নি। আগরওয়ালরা মিলটা নিয়ে নেওয়ার পর সরোজ বক্সীর সঙ্গে দেখা করে একবারও জিজ্ঞেস করতে যাওয়া হয়নি, কেমন আছেন দাদা?

হাওড়া স্টেশনের বাইরে এসে একটু চিন্তা করে অনন্ত ঠিক করলেন, লঞ্চেই গঙ্গা পেরোবেন। কলকাতার বাসে ওঠার দস্তুর তাঁর ভদ্রেশ্বরের থেকে অন্যরকম। যদিও হাওড়ায় বাস টার্মিনাস, তবুও অনন্তর শঙ্কা হল, ঠিকঠাক স্টপেজ চিনে ভিড় ঠেলেঠুলে নামতে পারবেন কিনা। তারচেয়ে ফেরি অনেক নিশ্চিন্ত যাত্রা। সরোজ বক্সীও ওঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য এই জলপথটাই চিনিয়ে রেখেছেন।

লঞ্চে উঠে কাঠের লম্বা বেঞ্চে বসে পড়লেন অনন্ত। একটু পরেই লঞ্চটা ছেড়ে দিল। ভটভট আওয়াজ তুলে গঙ্গার বুকে দোল খেতে খেতে লঞ্চটা এগিয়ে চলল

বাগবাজারের দিকে। হাওড়ার ব্রিজটার তলা দিয়ে যাওয়ার সময় চিরকালের মতো একটা বিস্ময় আবার ছুঁয়ে গেল। এই ব্রিজটার বিশালত্ব লঞ্চে করে তলা দিয়ে না গেলে ঠিক বোঝা যায় না।

লঞ্চের মধ্যে থেকে গঙ্গায় কলকাতার তটরেখা দেখতে দেখতে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছিলেন অনন্ত। জায়গায় জায়গায় পাঁচিলের গায়ে আঁকা বিজ্ঞাপনের রকমফের ছাড়া গঙ্গার ধারের দৃশ্যটা খুব একটা বদলায়নি। নতুন বলতে চক্ররেলটা। সেটাও বোধহয় অনেক কাল হয়ে গেল। এঘাট-ওঘাট করে লঞ্চ এগোতে থাকল। নানা চিন্তায় আনমনা ভাবটা হঠাৎ কেটে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল নিমতলার ঘাটটা দেখে। চুল্লি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। সামনে ঘাটের সিঁড়িতে নতুন কাছা নিচ্ছে কিছু মানুষ। আর একটু উত্তরের দিকে দূরে চোখে পড়ল কাশী মিত্রর শ্মশানঘাট। অনন্তর মনে হতে লাগল অনেকদিন তো সরোজদার খোঁজ নেওয়া হয়নি, কারও কাছে খোঁজও পাননি। মানুষটা বেঁচে আছেন তো?

এই অপয়া চিন্তাটা তাড়া করে বেড়াতে থাকল। ভেতর ভেতর একটা অস্বস্তির খোঁচা। বাগবাজারের ঘাটে নেমে অস্বস্তিটা যেন আরও বেড়ে গেল। একটু দূরে বিচালি ঘাটের দিকে খড় বোঝাই দুটো নৌকো বাঁধা। কীরকম একটা নিঝুম বিকেল। নৌকা দুটোকে বারবার মৃত্যুর প্রতীক মনে হতে থাকল অনন্তর। খড় বোঝাই নৌকা দুটোর সঙ্গে কারও মৃত্যুচিন্তার পুরনো যোগসূত্র অবশ্য একটা আছে। অতসীবউদি যখন মারা গেলেন তখন সরোজদার বয়স বোধহয় সবে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কাশী মিত্রের ঘাটে মুখাগ্নি করে ইলেকট্রিক চুল্লিতে বউদিকে ঢুকিয়ে এক ফাঁকে গঙ্গার ধার বরাবর রাস্তাটায় আনমনে হাঁটতে হাঁটতে একটা একদম ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন সরোজদা। কেউ খেয়াল করেনি, কিন্তু অনন্তর নজরে এসেছিল। সরোজদা শূন্য একটা দৃষ্টি নিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে আছেন। সামনে একটা খড় বোঝাই নৌকা। ঢেউয়ের আছাড়ে অল্প অল্প দুলছে। শুধু এই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সরোজদা। খড় বোঝাই নৌকার সঙ্গে দাম্পত্য স্মৃতির কী সম্পর্ক ছিল, বুঝতে পারেননি অনন্ত। চারপাশের এরকম বহু সাধারণ দৃশ্যই হয়তো দাম্পত্যের সুখস্মৃতি। তবে সেই থেকে খড় বোঝাই নৌকা অনন্তর কাছে অবচেতন মনে মৃত্যুর প্রতীকই হয়ে গেছে।

ঘাট থেকে রাস্তায় উঠে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে চক্ররেলের লাইনটা পেরোনোর সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চিৎপুর রোডে ট্রাম লাইনের কাছে এলেন। রাস্তাটা মনে মনে ঠিক করলেন। এবার শোভাবাজারের দিকে একটু এগোতে হবে। তারপর একটা যাত্রা কোম্পানির অফিস আর একটা কাঁসা-পিতলের দোকানের মাঝখান দিয়ে একটা সরু গলি দিয়ে কয়েকটা বাড়ি এগোলেই সরোজ বক্সীর সেই পেল্লাই এককালের রাজার বাড়িটা।

এত বছর পর আসছেন, কিন্তু মনের ছবির সঙ্গে জায়গাটা হুবহু মিলে গেল। সাবেকি কলকাতার এই অংশটার বোধহয় আর কোনও পরিবর্তন হবে না। কাঁসা-পিতলের দোকানদারকে দেখে ওয়াজেদ আলির সেই বিখ্যাত কথাটা মনে পড়ে গেল অনন্তর।

সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বরং ভদ্রেশ্বরটাই বছর বছর পালটে যাচ্ছে। দশ বছর আগের ভদ্রেশ্বরের সঙ্গে আজকের ভদ্রেশ্বরটা মেলানো যায় না। গলিটা দিয়ে ঢুকে সরোজ বক্সীর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন অনন্ত।

একটা বয়সে এই বাড়িটায় কয়েকবার এসেছিলেন, শেষ বোধহয় এসেছিলেন অতসীবউদির শ্রাদ্ধের দিন। তবে শেষবার এসে যা দেখছিলেন, একটা পরিবর্তন তার থেকে চোখে পড়ল। একতলায় কয়েকটা অফিসঘর হয়েছে। উঠোনের ভেতরে পরিবর্তিত বিন্যাসটাতেই অনন্ত গুলিয়ে ফেললেন সরোজদার ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির মুখটা কোথায়। এ-বাড়িতে ওপরে ওঠার অনেকগুলো সিঁড়ি আছে। কিছুক্ষণ ইতিউতি উঠোনটায় ঘুরে শেষ পর্যন্ত একজনকে পাওয়া গেল যে আলগোছে অন্ধকার সিঁড়ির মুখটা দেখিয়ে দিল। সেকালের উঁচু উঁচু ধাপওয়ালা সিঁড়ি। একটা তলা উঠতেই হাঁফ ধরে গেল। সিঁড়ির মুখ থেকে দু'দিকে যাওয়ার লম্বা দরদালান। দরদালানের এক দিকে সারবদ্ধ ঘরের লাইন। সিঁড়িতে উঠে বাঁয়ে, মনে ছিল অনন্তর। একটা একটা করে ঘর পেরোতে পেরোতে একসময় একটা দরজার গায়ে কালো রং করা অক্ষরে পেয়ে গেলেন সরোজ বক্সীর নামটা।

দরজার চৌকাঠে একটা নড়বড়ে কলিংবেলের সুইচ। বোতামটায় অল্প চাপ দিতে ভেতরে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে একটা মহিলাকণ্ঠে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো প্রশ্ন ভেসে এল, কে?

সরোজদা আছেন? গলাটা অল্প চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন অনন্ত।

প্রশ্নটা শেষ হওয়ার গায়ে গায়েই বন্ধ দরজার ভেতর থেকে আবার গলা ভেসে এল, এখন ঘুমোচ্ছে, পরে আসুন।

প্রথমেই মনে একটা স্বস্তি পেলেন অনন্ত। একটু আগে লঞ্চ থেকে শ্মশান দেখে যে অশুভ চিন্তাটা ঝুপ করে নেমে এসেছিল সেটা অমূলক। সরোজদা বেঁচে আছেন। কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। দরজা খুলল না। এত দূর থেকে যখন এসেছেন, দেখা তো একবার করে যেতেই হবে। শকুন্তলার কৌতূহলের উত্তরটাও নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সরোজদা না ওঠা পর্যন্ত কোথায় অপেক্ষা করা যায়? সিঁড়ি ভাঙার ধকল এখনও যায়নি। হাঁটুটা একটু টলটল করছে, বুকেও অল্প ধড়ফড়ানি। দরদালানের আর এক দিকটা খোলা। দরজার উলটোদিকে রেলিং-এ ভর দিয়ে নীচে মানুষের আনাগোনা দেখতে থাকলেন অনন্ত।

কিছুক্ষণ পরে আবার সেই একই বেলের ঘড়ঘড়ে আওয়াজটা শুনতে পেলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে 'কে' জিজ্ঞাসাটা। অনন্ত ঘুরে দেখলেন বন্ধ দরজার সামনে এক যুবতী। অনন্তর দিকে পিছন ফিরে আছে বলে মুখটা দেখতে পেলেন না। তবে তার জিন্স, এক চিলতে কোমর বার করা খাটো একটা ঢলঢলে জামা, উঁচু হিলের জুতো আর মাথার পিছনে চুলের ছাঁট দেখে অনুমান করতে পারলেন মেয়েটি বেশ আধুনিকা। মেয়েটা একটু গলা ছেড়ে ইংরেজিতে বলল, আমি দর্শনা। বীথির সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?

অনন্ত বিলম্ব করলেন না। বন্ধ দরজার সামনে মেয়েটার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

খুট করে একটা আওয়াজ। রংচটা একটা ম্যাক্সি পরে বীথি দরজাটা খুলেই ভুরুটা কুঁচকোল। একটা অচেনা মেয়ে আর তার পিছনে অচেনা এক প্রৌঢ়। দু'জনে একসঙ্গে এসেছে কিনা বীথি বুঝে ওঠার আগেই অনন্ত আবার পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন, সরোজদা আছেন?

বীথি কিন্তু এবার আর বলল না, বাবা ঘুমোচ্ছে, পরে আসুন। আবার ভেতরেও আসতে বলল না। অনন্তর মনে হল মেয়েটিকে উনি চিনতে পেরেছেন, সরোজদার মেয়ে। অতসীবউদির কাজের দিন সদ্য মাতৃহারা একরত্তি মেয়েটাকে ফ্যালফ্যাল করে একটা পুতুল হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে নিজের নিশ্বাসটাকে খুব ভারী মনে হয়েছিল। তবে ওর নাম বীথি ছিল কিনা মনে করতে পারলেন না। বীথি দর্শনাকে ভেতরে আসতে বললেও অনন্তকে আলাদা করে ডাকল না।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখলেন অনন্ত। সরোজদা উত্তরাধিকারে দুটো ঘর পেয়েছিলেন। সেকালের রাজবাড়ির পেল্লায় ঘর। কাঠের পার্টিশন দিয়ে দিয়ে অনায়াসে দুটো ঘরকে তিনটে ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর করে নিয়েছিলেন। মুখস্থর মতো বাড়ির ভেতরটা মনে পড়ে যাচ্ছিল অনন্তর।

বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সরোজ বক্সী। আদুড় গায়ে আটপৌরে করে লুঙ্গি পরা। কিন্তু এ কোন সরোজ বক্সী? যে-মানুষটা কোনওদিন পরিপাটি করে দাড়ি না কামিয়ে বেরোতেন না, তাঁর গালে লম্বা সাদা দাড়ি। চুলটাও বড়। অনন্ত নতুন সংযোজিত দাড়িটা ছাড়াও দেখলেন বয়স অকৃপণ হয়ে থাবা বসিয়েছে সরোজদার শরীরে। চামড়া একেবারে শিথিল হয়েছে। মাথার চুল সাদা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাতলাও হয়েছে। চোখের দৃষ্টিও বোধহয় খানিকটা ক্ষীণ হয়েছে। না হলে দরজার অনেকটা কাছে এগিয়ে না আসা পর্যন্ত অনন্তকে চিনে উঠতে পারলেন না। অবশ্য এই বিকেলে এতদিন পরে অনন্তর আকস্মিক আসাটাও অপ্রত্যাশিত।

অনন্ত... এসো, এসো, ভেতরে এসো। অনন্ত গুহকে চিনতে পেরে শান্ত গলায় বললেন সরোজ বক্সী।

একটা কাঠের পার্টিশন পেরিয়ে অবিন্যস্ত স্প্রিং আর ছাল ওঠা একটা রেক্সিনের সোফায় অনন্তকে বসতে বললেন সরোজ বক্সী। অনন্ত দেখলেন সোফার অন্য প্রান্তে ততক্ষণে দর্শনা নামের মেয়েটা বসে আছে। উলটোদিকে বীথি। সরোজ বক্সীকে দেখে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে ইংরেজিতে বলল, আমি দর্শনা। বীথির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সরোজ বক্সী প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন, বসো মা বসো। তুমিও একটু বসো অনন্ত।

ভেতরে গেলেন সরোজ বক্সী। অনন্ত লক্ষ করল ওর দিকে একবার তাকিয়ে বীথিকে নিচু গলায় কিছু বলল দর্শনা নামের মেয়েটা। তারপর বীথি মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

বিকেল মুড়বার আগেই ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে। টিউব লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে। সেই আলোতে সবচেয়ে যেটা চোখে পড়ছে, দেওয়ালে এক প্রমাণ সাইজের গুরুদেবের ছবি। মোটা একটা চন্দনকাঠের মালা ঝুলছে ছবিতে।

সরোজ বক্সী ভেতরে গিয়ে লুঙ্গিটা পরিপাটি করে নিয়ে গায়ে একটা হাফ পাঞ্জাবি পরে এলেন। অনন্তর পাশে বসে হাতের ওপর আলতো করে একটা হাত রেখে বললেন, এদিকে, কি কোনও কাজে?

না দাদা, আপনার কাছেই এলাম। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আপনার খোঁজখবর পাইনি। ভাবলাম একবার দেখা করেই যাই আপনার সঙ্গে। কেমন আছেন দাদা?

সরোজ বক্সী দেওয়ালের ছবিটার দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, যামিনীদা যেমন কৃপা করেছেন। প্রেশারটা মাঝে মাঝে ভোগায়, হাঁটুর জোর কমছে। তবে রাজরোগ কিছু হয়নি। যাক, তোমার কী খবর বলো? বউমা কেমন আছে?

ভালই দাদা, শকুন্তলা তো কবে থেকে বলছে আপনার খোঁজ নিতে একদিন আসতে।

তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো আর নেই ঠিকই, তবে মাঝে মাঝেই তোমাদের সকলের কথা খুব মনে পড়ে। যামিনীদার কাছে তোমাদের মঙ্গল কামনা করি।

ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে বীথি একসময় অনন্তকে জিজ্ঞেস করল, আপনার চায়ে দুধ চিনি দেব?

দুধ দিলেও হবে, না দিলেও হবে। তবে চিনিটা দিয়ো মা।

বীথি ভেতরে চলে যাওয়ার পর সরোজ বক্সী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলে ভাই, টপ করে মরে যাওয়ার আগে একটা চিন্তাই শুধু রয়ে গেছে। মেয়েটাকে নিয়ে।

অনন্ত গুহর কথাটা কীরকম লাগল। অনন্তর মনে হল যেন শুনেছিলেন সরোজদা মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। সেই বিয়েতে হরিতলার কাউকেই নিমন্ত্রণ করেননি বলে অনেকের মনেও লেগেছিল। তা হলে কি মেয়েটার...। কয়েক ঝলকের জন্য দেখা বীথির সিঁথিটা মনে করার চেষ্টা করলেন।

বীথি দু'হাতে দুটো চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে ঢুকল। রংচটা ম্যাক্সিটার ওপর এবার একটা হাউস কোট চড়ানো। অনন্ত এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন বীথির সিঁথিটা সাদা। বীথির পিছন পিছন দর্শনা মেয়েটা। তার হাতে একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট। ঘরটায় আলাদা করে কোনও ছোট টেবিল নেই। হাত বাড়িয়ে বীথির হাত থেকে চায়ের প্লেটটা নিলেন অনন্ত। দর্শনা অনন্তর পাশে সোফাতেই বিস্কুটের প্লেটটা নামিয়ে রাখল। সরোজ বক্সী মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, অনন্তকাকাকে চিনতে পারছিস মা? আমরা আফিসে একসঙ্গে কাজ করতাম।

বীথি একটু হাসল। অনন্তকে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। অনন্ত বীথির চোখের ভাষাটা বুঝে নিয়ে বললেন, ওর আর কী করে মনে থাকবে? আমিই তো ওকে শেষ যখন দেখেছি, ও খুব ছোট্ট ছিল। তবে মা তোমাকে বলি, একবার দুপুরে বউদির হাতের রান্না খেয়েছিলাম। এখনও মুখে লেগে আছে। তুমি তখন সবে হামাগুড়ি ছেড়ে টলটল পায়ে হাঁটতে শিখেছ।

বীথির ওপর থেকে মুখটা ঘুরিয়ে সরোজ বক্সীর দিকে তাকালেন অনন্ত। টিউব লাইটের ঢিমে আলোতেও মনে হল সরোজ বক্সীর চোখ দুটো চিকচিক করছে। হয়তো হঠাৎ করে স্ত্রীর প্রসঙ্গটা চলে আসায়। মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন অনন্ত। এবার খেয়াল হল দর্শনা চুপ করে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনছে। এমন সময় ঘরের টিউব লাইটটা ঝুপ করে নিভে অন্ধকার নেমে এল। সরোজ বক্সী অন্ধকারে মেয়ের উদ্দেশে বললেন, বীথিমা একটা মোম জ্বালা। এখন তো লোডশেডিং হয় না, আজকে হঠাৎ আবার কী হল? কেব্‌ল ফল্ট নয় তো?

অন্ধকারের মধ্যেই বীথির গলা ভেসে এল, আনছি বাবা।

ফ্যানটা বন্ধ হয়ে গিয়ে ঘরটা গুমোট হয়ে যাচ্ছিল। মোমবাতির শিখার তাপে যেন গুমোটটা আরও বাড়ছিল। সরোজ বক্সী অনন্তকে বললেন, ছাদে যাবে অনন্ত? বাতাস পাবে।

অনন্তর মনে পড়ে গেল। সত্যিই অসাধারণ সরোজদার ছাদটা। উঁচু থেকে পশ্চিমে গঙ্গাটা দেখা যায়। বাড়িটা যে সত্যিই কত বড় ছাদটায় গেলে বোঝা যায়। একটা যেন পুরো ফুটবল মাঠ ছাদটায় ঢুকে যাবে। অনেকদিন আগে দেখা ছাদটার স্মৃতি মনে পড়তে আর একান্তে সরোজ বক্সীকে পাওয়ার সুযোগে অনন্ত খুব উৎসাহী হয়ে বলে উঠলেন, হ্যাঁ দাদা চলুন ছাদটায় যাই।

সরোজ বক্সী উঠে দাঁড়িয়ে বীথিকে বললেন, বীথিমা টর্চটা দে তো। সিঁড়ির ঘরটা এখন পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে।

বীথি ভেতরের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই অন্ধকার ঘরে জ্বলে উঠল পুরনো ব্যাটারির কমজোরি একটা হলদেটে আলো।

সাবধানে আস্তে আস্তে যেয়ো বাবা। আমি যাব সঙ্গে?

সরোজ বক্সী বলে উঠলেন, তোকে আসতে হবে না মা। তুই বরং অনন্তকাকার আর তোর বন্ধুর জন্য কিছু ব্যবস্থা কর। শুনলি না তোর মা অনন্তকাকাকে কেমন আপ্যায়ন করত।

ভীষণ লজ্জা পেলেন অনন্ত। শুধু পুরনো স্মৃতিটুকু উজাড় করেছিলেন। তার মানে এই ছিল না যে এখনও উনি একই আথিতেয়তা সরোজদার বাড়ি থেকে আশা করছেন। সলজ্জ হয়ে তাড়াতাড়ি উনি বলে উঠলেন, না না মা, তুমি একদম ব্যস্ত হয়ো না। আপনি না সরোজদা একদম একইরকম থেকে গেলেন। আগে বউদির ওপর যেরকম হুকুম চালাতেন এখন মেয়ের ওপর সেরকমই হুকুম চালাচ্ছেন। বীথির উদ্দেশে বললেন, তুমি একদম বাবার কথা শুনো না তো মা, আমরা বরং ছাদে যাই। যাবার আগে যদি আলো চলে আসে তোমার হাতে আর এক কাপ চা খেয়ে যাব।

অনন্ত উঠে পড়লেন। দর্শনা এবার চুপ করে অনন্তর ফাঁকা হয়ে জায়গাটায় বসে পড়ল।

এই পাড়ার বাড়িঘর যেমন পালটায়নি সরোজ বক্সীর ফুটবল মাঠের সাইজের ছাদটাও সেরকম পালটায়নি। প্রথম পা-টা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা টাটকা বাতাস

ঝাপটা মারল মুখে। এই পরশটা গঙ্গার বুকে নৌকাতেও যেন পাননি অনন্ত। অল্পবিস্তর ছড়ানো-ছিটানো লোক থাকলেও প্রমাণ সাইজের ছাদটা যেন ফাঁকা। ধীর পায়ে ছাদের এক প্রান্তে যেতে যেতে সরোজ বক্সী বললেন, একটু সুযোগ পেলেই এই ছাদে চলে আসি। মুক্তির শ্বাস খুঁজি।

ছাদের এক প্রান্তের প্রাচীরের ধারে চলে এলেন সরোজ বক্সী। সামনে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত গেছে। শেষ আলোর রেশটা আকাশ আর প্রবহমান গঙ্গার জলে ভাগাভাগি করে রেখে গেছে। কোথাও একটা শাঁখ বেজে উঠল। সরোজ বক্সী হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে চোখ বন্ধ করলেন।

গোধূলিকে গ্রাস করে অন্ধকারটা ঝুপঝুপ করে নেমে আসছিল। অন্ধকারটা নেমে আসতে দেখে অনন্তর ভেতরে ছটফটানি হচ্ছিল। আবার ভদ্রেশ্বর ফিরে যেতে হবে। কলকাতায় আসার একদম অভ্যাস নেই আজকাল। তার আগে সরোজ বক্সীকে বলতে হবে আসল কারণটা। নীচে কথাটা শুরু করা যায়নি বীথি আর ওই দর্শনা নামের মেয়েটার জন্য। লোডশেডিংটা এসে একান্তে একটা কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে। এবার বলতেই হবে। অনন্ত চারদিকটা একবার দেখে সাবধানী গলায় বললেন, দাদা, শীতলবাবু বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিল। বড়দিনের দিন হরিতলা কটন মিলে যাওয়ার জন্য বলে গেছে। দয়াল সান্যাল আর প্রীতম সান্যাল আসছে। শুনে অবধি শকুন্তলা খুব ঘাবড়ে গেছে। আমার মতো ছাপোষাকে কেন ডেকেছে দাদা?

প্রায় অন্ধকার হয়ে যাওয়া আলোয় অনন্ত সরোজ বক্সীর মুখের প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে পারলেন না। একইরকম মুখটা গঙ্গার দিকে ফেরানো। শুধু এবার বন্ধ চোখটা খোলা। কোনও উত্তর না পেয়ে অনন্ত এরপর কী বলবেন বুঝে উঠতে না পেরে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

শকুন্তলা আসলে ভেতরে ভেতরে খুব ভয় পেয়ে আছে...

সরমার আর কোনও খোঁজ রেখেছ অনন্ত?

অনন্ত গুহর গলাটা শুকনো লাগল। ঢোক গিললেন। পুরনো দিনের যোগসূত্রটা ফিরে আসছে। চার বছরের ওপর বিবাহিত জীবন কাটিয়েছেন সরমার সঙ্গে। তারপর যে কী হল। যে নিরুদ্দেশ পলাশকে খুঁজে পেতে শকুন্তলা পাগল হয়ে গিয়েছিল, সেই শকুন্তলাই চলে এল জীবনে। অনন্ত কী করেছিলেন? সামান্য অনুকম্পা দেখিয়ে শকুন্তলার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। সেই দাঁড়ানোটাই কাল হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে সব কিছু ওলটপালট কখন যে শুরু হয়ে গিয়েছিল টেরও পাননি। শকুন্তলা ক্রমশ আঁকড়ে ধরেছিল অনন্তকে আর সরমা একদিন নীরবে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সরোজ বক্সীই একদিন দয়াল সান্যালের টাকার বান্ডিল হাতে ধরিয়ে বলে গিয়েছিলেন সরমার খোঁজ আর কোনওদিন না করার জন্য। আজ সেই সরোজ বক্সীই জিজ্ঞেস করছেন, সরমার কোনও খোঁজ রেখেছ কিনা।

অনন্ত চুপ করেই থাকলেন। সরোজ বক্সী ভারী গলাতেই বললেন, সব পাপের ফলই মিটিয়ে যেতে হয় অনন্ত। অতসী আমার পাপ ধুয়ে চলে গেছে। যামিনীদা আমার পাপ

ধুয়ে চলে গেছে। আর বীথিমা এখন আমার পাপ ধুচ্ছে। সোমনাথকে ছেড়ে বীথিমাও একদিন চলে এল। এবাড়ির একতলায় ওর সংসার ছিল। চলতে ফিরতে আমাকে রোজ দেখতে হয় সোমনাথের পাশে অন্য একটা মেয়েকে...

সরোজ বক্সীর গলাটা ধরে এল। অনন্ত মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। ছাদের আর এক কোণে কখন যেন উঠে এসেছে বীথি। পাশে সেই মেয়েটা। সিল্যুটের মধ্যে দেখলেন ওরা কথা বলে যাচ্ছে। অনন্ত গুহ আরও নিচু গলায় বললেন, আপনিও বড়দিনের দিন যাবেন তো?

আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি অনন্ত। হতাশ গলায় বললেন সরোজ বক্সী।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে আলো ঝলমল করে উঠল দূরে গঙ্গার ওপর হাওড়া ব্রিজটা। নীল আর সোনালি এক মায়াবী আলোয় ভেসে যাচ্ছে ব্রিজটা। খবরের কাগজে অনন্ত পড়েছিলেন হাওড়া ব্রিজকে আলোর গয়না পরানো হয়েছে। কিন্তু দু'বর্ণের আলোয় সেটা যে এরকম মায়াবী হতে পারে চাক্ষুষ না করলে হয়তো কল্পনাতেও ধরতে পারতেন না। মুহূর্তে বিহ্বল হয়ে যখন দেখছেন ব্রিজটা, কানের কাছে সরোজ বক্সীর একটা ফিসফিসে কণ্ঠস্বর শুনলেন, আমি জানতাম, একদিন না-একদিন বিট্টুবাবা হরির ঝিল দেখতে ঠিক আসবে... ছেলেটার কাছেও পাপটা তো আমার। ফলটা আমাকেই ভুগে যেতে হবে। তুমি নিশ্চিন্তে দেখা করতে যেয়ো অনন্ত।

৯৮

নিতাই আর সুকুমার, প্রাইভেট সিকিউরিটির এই লোক দুটো আজ ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরেছে। হরিতলা কটন মিলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার চার মাস পর থেকে এই ডিউটিটা পেয়েছিল। ইউনিফর্ম আর পরতে হয় কোথায়? মাঝে মাঝে মিলটা খোলার জন্য কখনও সখনও গেট মিটিং, বিক্ষোভ টিক্ষোভ থাকলে লোক দেখাতে ইউনিফর্ম পরে। তবে এবার মনে হচ্ছে এতদিন বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলটায় কিছু একটা হতে চলেছে। কিন্তু কী হতে চলেছে সেটাই স্পষ্ট করে জানা নেই। তিন-চারদিন হল এককালের ম্যানেজারবাবু শীতল ভট্টাচার্য ব্যস্ত হয়ে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছেন। এঘর খোল, ওঘর খোল বলে অস্থির হয়ে যান। জংধরা তালাগুলো একদানে খোলা কি চারটিখানি কথা! এত বড় মিলটাতে তো দু'জন মাত্র দারোয়ান। রাত্রিবেলায় পাঁচিল টপকে চোরের আনাগোনা লেগেই আছে। আজকাল ওদের কাছে মেশিন থাকে। সব জেনেশুনে চোর এলে নিজেরাই লুকিয়ে পড়ে। কী চোরেরা নিয়ে যায়, তার কেউ হিসেব রাখে না। শীতল ভট্টাচার্যর আনাগোনায় তাই প্রাইভেট সিকিউরিটির লোক দুটো প্রমাদ গুনেছিল। লিস্টি মিলিয়ে সম্পত্তি দেখতে আসছেন না তো? হিসেব না মিললে তাদের চাকরি যে যাবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্তি।

আশঙ্কাটা অবশ্য প্রথম দূর হল গতকাল। প্রথমে একটা খবরের কাগজের লোক

খোঁজখবর করতে এসেছিল, তারপর ভরদুপুরে এক টেম্পো প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল নিয়ে এসে গেটের মুখে হর্ন বাজাতে থাকল পার্টির দাদা, বিপুল মণ্ডল। ঢুকেই তাড়া দিল, ক্যান্টিনের দরজাটা খুলে দে।

বিপুল মণ্ডলের সঙ্গে গেট মিটিং-এ, বাজারে-ঘাটে দেখা হয়। পার্টির দাদা। দেখা হলে সেলাম ঠোকে। কাল বিপুল মণ্ডল সোজা টেম্পোটাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল এককালের ক্যান্টিনটার সামনে। ক্যান্টিনের দরজাটা খুলে দেওয়ার পর বিপুল মণ্ডল বলল, চেয়ারগুলো পাতার জন্য টেম্পোর লোকগুলোর সঙ্গে হাত মেলাতে। সেসব মিটে যাওয়ার পর দুটো লোক যখন ক্যান্টিনটা ঝাড়াই-পোছাই আরম্ভ করল, সাহস করে সুকুমার জিজ্ঞেস করেই ফেলেছিল, কী হবে স্যার?

কাল এখানকার গণ্যমান্যরা আর এই কারখানায় যারা কাজ করে গেছে, সব আসবে।

সাহসটা আর এক ধাপ বাড়িয়ে নিতাই জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, কেন স্যার? কাল কী আছে?

সংবর্ধনা। এত প্রশ্ন করিস কেন? সকাল থেকে সেজেগুজে গেটে বসে থাকবি। সান্যালরা এলে আবার হেলেদুলে 'কী চাই', 'কাকে চাই', সাত প্রশ্ন জুড়িস না। স্যালুট মেরে হাট করে গেট খুলে দিবি।

নিতাই মনে মনে খিস্তি করল, এমন করে বলছে শালা, যেন মিলটা নিজের বাপের। সুকুমার ভয়ে ভয়ে বলল, শীতলবাবু থাকবেন তো?

বিপুল মণ্ডল খেঁকিয়ে বলে উঠেছিল, কেন রে শালা, শীতলবাবু না এলে সান্যালদের ঢুকতে দিবি না নাকি?

নিতাই আর সুকুমার ঢোক গিলে প্রায় সমস্বরে বলে উঠেছিল, না, আসলে সান্যালদের কখনও দেখিনি তো তাই...

খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠেছিল বিপুল মণ্ডল, সান্যালরা কী আর সাইকেলরিকশো চেপে আসবে না ভ্যানগাড়ি? তারপর হাতটা দু'দিকে ছড়িয়ে টেম্পোতে ওঠার আগে বলেছিল, পেল্লাই গাড়ি করে আসবে... পেল্লাই...

আজ নিতাই আর সুকুমার ধোপদুরস্ত ইউনিফর্মে গেটের মুখে অপেক্ষা করতে করতে সত্যিই একসময় একটা পেল্লায় গাড়ি এসে দাঁড়াল। পিছনে পিছনে আরও দুটো গাড়ি। হাতটা যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে সেলাম ঠুকে হরিতলা কটন মিলের গেটটার পাট খুলে দিল ওরা। আর কী আশ্চর্য! গেটটা পেরিয়েই দাঁড়িয়ে গেল পেল্লায় গাড়িটা। নেড়ামাথা একটা লোক বুড়োমতো একটা লোককে হাত ধরে নামিয়ে বলল, এসো বাবা।

নিতাই আর সুকুমার ভাবতে বসল, এরাই কি তা হলে সান্যাল বাপ-বেটা। কিন্তু সে আর জিজ্ঞেস করে কাকে? পিছনের গাড়িটা থেকে ততক্ষণে নেমে এল সিনেমার হিরোইনের মতো দেখতে একটা মেয়ে আর শীতল ভট্টাচার্য। শীতল ভট্টাচার্যকে দেখে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়ার আগেই একেবারে অবাক করে দিয়ে তার পরের গাড়িটা থেকে নামতে থাকল গলায় স্টেথো ঝোলানো ডাক্তার, মাথায় টুপি পরা নার্স...

দয়াল সান্যাল গুম মেরে কিছুক্ষণ সামনের মিলের শেডটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর এগোতে থাকলেন। শীতল ভট্টাচার্য পিছন থেকে দৌড়ে এসে পথের দিকে হাত পেতে বললেন, এই দিকে স্যার...

প্রীতম সান্যাল বিরক্ত মুখে হাত দিয়ে ঠেলে শীতল ভট্টাচার্যকে পিছনে সরিয়ে দিলেন। দয়াল সান্যাল এগিয়ে যেতে থাকলেন কার্ডিংরুমের দিকে। শীতল ভট্টাচার্য সিকিউরিটির লোকটাকে বললেন, কাউকে এখন আর ঢুকতে দিয়ো না বুঝলে... কাউকে না...

অদ্ভুত নিস্তব্ধ কার্ডিংরুমের ভেতরটা। ভেতরে ঢুকে দয়াল সান্যাল ওপরের দিকে তাকালেন। গোল গর্তর মধ্যে লাগানো এগজস্ট ফ্যানগুলো একটাও ঘুরছে না। উঁচু ছাদটার একপাশে সার দিয়ে থাকা ভেন্টিলেটর দিয়ে চুঁইয়ে রোদের রশ্মিগুলো পড়ছে মাকড়সার জালে মোড়া মেশিনপত্তরগুলোর ওপর। যেখানে তুলোর রোঁয়াতে ঘরটা ভরে থাকত, সেখানে এক কুচিও তুলো নেই কোথাও। দয়াল সান্যাল একপাশ ঘেঁষে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন। প্রীতম সান্যাল ইশারায় বাকিদের বেরিয়ে যেতে বললেন। এতগুলো মানুষের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভেন্টিলেটরে বাসা বাঁধা কয়েকটা পায়রা পাখা ঝটপটিয়ে উঠে অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল। চমকে উঠলেন দয়াল সান্যাল। মনে হল ঘুঘু ডেকে উঠল। কবে যেন এই ডাকটা শেষ শুনেছিলেন? কবে যেন... দয়াল সান্যালের ডুমুরঝরার একটা দুপুরের কথা ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ল। মাথার মধ্যে মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে একটা বাচ্চা ছেলের গলা হেঁকে চলেছে, 'সসানের কালী ঠাইকুর এয়েছে গো। পাপ ধুইবে চল...'

বিট্টু... বিট্টু..., কান চাপা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন দয়াল সান্যাল।

এই তো বাবা আমি...। বাবার পিঠে নরম করে হাত রেখে প্রীতম সান্যাল বললেন।

এ তুই কোথায় নিয়ে এলি?

কেন বাবা? হরিতলা কটন মিল। এমারসন সাহেব আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে হরিতলা কটন মিলটা অনেক বড় করতে হবে।

দয়াল সান্যাল মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন, ঠকিয়েছে, ম্যাকার্থি ঠকিয়েছে।

চলো আমরা স্পিনিংরুমটা দেখি।

নিতাই ছুটতে ছুটতে এসে স্পিনিংরুমের বাইরে দাঁড়ানো সুকুমারকে একটু ফাঁকা জায়গায় টেনে এনে চাপা গলায় খিস্তি করে বলল, এই শালা সুকুমার, তুই এবার গেটে যা তো। টিভি কোম্পানির ঢাউস ঢাউস গাড়ি এসে ইংরেজি কপচাচ্ছে... মাথা খারাপ করে দিচ্ছে...

মুহূর্তের জন্য চকচক করে উঠল সুকুমারের চোখ। একবার গেট মিটিং-এর সময় টিভি কোম্পানির লোক ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর সারা সন্ধ্যা রাত্রি তারকের দোকানে ধর্না দিয়ে পড়ে থেকে খুব হতাশ হয়েছিল। আটটার খবরে ওরা ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে সুব্রত রক্ষিতের বক্তৃতা আর আগরওয়ালদের অফিস ঘুরে ঘুরে দেখাল।

মায় পোস্টারগুলো, গেটের তালাটাও কতক্ষণ ধরে দেখাল। শুধু জমায়েত হওয়া লোকগুলোর ওপর ন্যাতা বোলানোর মতো ছবিটাকে চালিয়ে দিল। চোখ ফাটিয়েও ইউনিফর্ম পরা নিজেকে দেখতে পায়নি সুকুমার।

টিভির লোককে ছেড়ে দে। ওরা তো সব জায়গায় খবর করতে যায়। আমাদেরও ছবি উঠবে।

ই...ই, নিতাই মুখ ভেংচে বলল, ভূতের সম্পত্তি সুখে আগলাচ্ছিলি, এবার চাকরি থাকে কিনা ঠিক নেই, বাবুর চিত্তে শখ কত, টিভিতে মুখ দেখাবে, শীতলবাবু কী বলল মনে নেই?

স্পিনিংরুমের সেই ড্রামগুলো, যেগুলো অফুরন্ত দমে চরকির মতো ঘুরে চলত, জড়িয়ে ফেলত রাশি রাশি সুতো, সেগুলো থ মেরে দাঁড়িয়ে আছে। বনবন বনবন বনবন সেই আওয়াজটাই কোথাও নেই। দয়াল সান্যাল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন ড্রামগুলোর দিকে। একটা ড্রাম ছুঁয়ে দিশেহারা দৃষ্টি নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন।

এটা ঘুরবে না?

প্রীতম সান্যাল নরম গলায় বললেন, না বাবা, ওগুলো থেমে গেছে। ওগুলো আর কোনওদিন চলবে না।

ছেলের দিকে অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে আবার পরের ড্রামটার দিকে এগোলেন দয়াল সান্যাল।

সুকুমার ছুটতে ছুটতে কাছে আসতেই নিতাই আবার চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল, বারবার গেট ছেড়ে আসছিস কেন?

নিতাই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, টিভি কোম্পানির লোকগুলো গেঁড়ে বসে আছে। ভেতর থেকে তালা মেরে এসেছি। কিন্তু এক নতুন কিচাইন হয়েছে। কলকাতা থেকে একটা শালা ট্যাক্সি এসে ভেতরে ঢোকার জন্য খুব তড়পাচ্ছে। তুই একটু যা।

নিতাই মুখ বেঁকিয়ে বলল, আমি গিয়ে কী করব? কতবার বলব তোকে, শুনলি না, শীতলবাবু বলে দিল কারও ভেতরে ঢোকার পারমিশন নেই এখন।

বলছি শালা একটা মেয়েছেলে খুব তড়পাচ্ছে।

মেয়েছেলে?

হ্যাঁ, একটা বুড়োও আছে। মেয়েছেলেটা বলছে দর্শনাকে ডেকে দিতে। বলতে বলছে সরোজ বক্সী এসেছে। সান্যালরা নাকি আসতে বলেছে ওদের।

দর্শনা আবার কে? শালা বড়লোকদের কারবার! শালা যত ঝামেলা আমাদের...

নিতাই আর সুকুমার যুক্তি করে একসঙ্গে শীতল ভট্টাচার্যর কাছে গিয়ে বলল, স্যার, সরোজ বক্সী বলে একটা লোক আর একটা মেয়েছেলে ভেতরে আসতে চাইছে।

শীতল ভট্টাচার্যর ভুরুটা একটু কুঁচকে গেল। চারদিকটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে ওদের বললেন, বলে দাও প্রীতম সান্যাল সাহেবের পারমিশন নেই। ইনভিটেশন ছাড়া কেউ আজকে ঢুকতে পারবে না...

এমন সময় দর্শনা এগিয়ে এল। হাতে ফোল্ডিং মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাপটা খোলা।

শীতল ভট্টাচার্যকে বলল, মিস্টার ভট্টাচারিয়া... মিস্টার বক্সী অ্যান্ড বীথি ইজ ওয়েটিং আউটসাইড দ্য গেট। প্লিজ টেল দ্য সিকিউরিটি টু লেট দেম ইন...

শীতল ভট্টাচার্য নিতাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে চোখটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, ওদের ভেতরে আসতে বলো।

নিতাই গেটের দিকে দৌড়োতে লাগল। নিরাপদ দূরত্বে এসে আপন মনে বলে উঠল, শালা বড়লোকদের কারবারই আলাদা।

স্পিনিংরুম থেকে প্রবলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বেরোলেন দয়াল সান্যাল। তারপর জোড়হাত করে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। সন্দেহের চোখে আগাপাশতলা বেশ কয়েকবার তাকিয়ে চোখ দুটোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর ফিক হেসে বললেন, সরোজ। মাথার চুলগুলো সাদা রং করে, সাদা দাড়িগোঁফ লাগিয়ে সং সেজেছ কেন? লোকেন সাজিয়েছে বুঝি?

করজোড়ে নতমস্তক হলেন সরোজ বক্সী।

আমি শুধু আপনার জন্য প্রার্থনা আর বিট্টুবাবাকে আশীর্বাদ করতে এলাম স্যার...

শরীরটা জুতের লাগছে না সরোজ। চলো বাংলোতে যাই। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে...

প্রীতম সান্যাল বীথির দিকে চেয়ে হেসে অল্প মাথাটা ঝুঁকিয়ে নীরব স্বাগত জানালেন আর দর্শনাকে চাপা স্বরে বললেন, থ্যাঙ্কস দর্শনা। তারপর হাতছানি দিয়ে নার্সকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাকো বনানী। কিন্তু ওঁদের ডিস্টার্ব কোরো না। ওঁদের মতো কথা বলতে দাও। মিস্টার ভট্টাচার্য আপনি যান। অন্যান্য ব্যবস্থা দেখুন।

সরোজ বক্সীর সঙ্গে ধীর পায়ে দয়াল সান্যাল ম্যাকার্থির বাংলোর দিকে এগোতে থাকলেন। ওঁরা এগোতে দর্শনা বলল, স্যার, আমি কি এখানকার কিছু ছবি তুলতে পারি?

কীসের ছবি তুলবে দর্শনা?

দর্শনা অপ্রতিভ গলায় বলল, আসলে মা কালকে ফোনে বলছিল হরির ঝিলের ছবি তুলে আনতে। আপনার কাছে গল্প শুনেছিল তাই...

হরির ঝিল আমার পার্সোনাল প্রপার্টি নয় দর্শনা। ছবি তোলার জন্য আমার কোনও পারমিশন নেওয়ার দরকার নেই। তবে হরির ঝিল তো এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাবে না। তুমি এক কাজ করো। সরোজকাকার পিছন পিছন বাংলোতে চলে যাও। ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যাবে। তারপর সামনে একটা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে সামনেই হরির ঝিল। হরির ঝিল দেখার ওটাই বোধহয় বেস্ট ভিউ পয়েন্ট। মাম্মি ডায়েরিতে লিখে গেছে, দিদিমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল ওই বারান্দাটা।

দর্শনা চুপ করে গেল। আস্তে আস্তে সান্যালবাড়ির পারিবারিক ইতিহাসটা অনেকটাই জানা হয়ে গেছে। সেই ইতিহাসে ম্যাকার্থির বাংলোর একটা বড় ভূমিকা আছে। ছাড়পত্র পেয়ে সরোজ বক্সীদের রাস্তায় পা বাড়াল দর্শনা। দর্শনার এগিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে

বীথি বলে উঠল, মেয়েটা খুব ভাল বিটুদা। বাড়িতে এসে এমনভাবে বলে বুঝিয়ে গেল যে বাবাকে না এনে আর থাকতে পারলাম না।

তাই তো ওকে পাঠিয়েছিলাম বীথি। আমি ফোন করে তোমাকে বললে তো...

বীথি মুখটা নামিয়ে ফেলল, প্রত্যেকবার কেন যে তোমাকে ফোনে ওরকম বলে ফেলি... তোমাকে সরি বলতেও...

আমি আজ সব কিছু ভুলতে এসেছি বীথি। লেটস ফরগেট। তুমি তো সারা জীবন শুনে এসেছ হরিতলা কটন মিলের কথা। কিন্তু কোনওদিন চোখে দেখোনি। ঘুরে দেখো জায়গাটা...

বীথির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই প্রীতম সান্যাল পিছন ফিরে দেখলেন কখন যেন এসে চুপ করে একটা ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিপুল মণ্ডল আর শীতল ভট্টাচার্য।

কিছু বলবেন বিপুলবাবু?

না, বলছিলাম স্যার সাড়ে চারটেতে শুরু করে দেব প্রোগ্রাম। আজ বড়দিন হলেও বেলা তো ছোট স্যার। আমাদের লোকাল লোকেদের কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু আপনার পুরনো লোকরা তো কেউ কেউ দূর দূর থেকে আসবে।

এটার কি কোনও দরকার ছিল বিপুলবাবু?

কী বলছেন স্যার! হরিতলার জন্য আপনি বড় কিছু করতে যাচ্ছেন, লোকে সাসপেন্সে আছে, তার অ্যানাউন্সমেন্টটা আজ করতে যাচ্ছেন আর আমরা আপনাকে একটা সংবর্ধনা দেব না? এ ব্যাপারে সুব্রতদার সঙ্গে তো আপনার চুক্তি হয়েই গেছে। সুব্রতদা বড়দিনের ছুটিতে পুরী বেড়াতে গেছে। আমার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে গেছে।

শীতল ভট্টাচার্য উসখুস করছিলেন। সুযোগ পেয়ে বললেন, গেটে স্যার মিডিয়ার অনেক লোক জড়ো হয়েছে। গেটটা খুলে দিলে চিন্তা হচ্ছে ওদের কী করে আটকাব?

প্রীতম সান্যাল বিরক্তিতে কড়া গলায় বললেন, দ্যাটস ইয়োর প্রবলেম মিস্টার ভট্টাচার্য। মিডিয়ার লোক যেন না ঢোকে। ওদের বলুন যা বলার আমি কালকে প্রেস ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স করে বলব।

বিপুল মণ্ডল প্রীতম সান্যালের মেজাজ বুঝে গলা আরও মেলায়েম করে বলল, আপনার সঙ্গে আর একটা কথা ছিল স্যার...

বলুন।

শুনলাম, আজকে আপনার বাবাও এসেছেন। তা স্যার সংবর্ধনাটা কি আপনার বাবাকেও দেব? হাজার হোক উনি এই কারখানাটা করেছিলেন। উনি থাকতে... ওঁকে বাদ দিয়ে... শুধু আপনাকে...

এবার এতক্ষণ সঙ্গে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার পরিচয় দিয়ে বলল, স্যার ও অসীম। এই মিলেই একসময় চাকরি করত। মানপত্রটা ও পড়বে। তাই জিজ্ঞেস করছিল... কী রে অসীম তুই জিজ্ঞেস কর না...

অসীম হাতজোড় করে নমস্কার করল। প্রীতম সান্যাল আলগোছে নমস্কারটা ফিরিয়ে বিরক্তিটা ধরে রেখে বললেন, দেখুন বিপুলবাবু, আপনাকে একটা সত্যি কথা বলি। ইন

দ্য ফার্স্ট প্লেস আমি এই সংবর্ধনা নিতে রাজি ছিলাম না সেটা আপনি ভাল করেই জানেন। কিন্তু আমাকে রাজি হতে হয়েছে। খানিকটা বাধ্য হয়েই রাজি হতে হয়েছে। কারণ আমাকে এখানে কিছু করতে হলে আপনাদের নিয়েই চলতে হবে। এই সংবর্ধনা দিয়ে আপনার পার্টি একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ চাইছে। আপনারা চেয়েছিলেন সংবর্ধনাটা আরও পাবলিকলি, আরও ওপেন স্পেসে হোক। আমি চেয়েছিলাম আমার নিজের লোকেদের আর কিছু আশেপাশের স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে এইখানে ছোট্ট একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান। তাই সংবর্ধনা আর ঘরোয়া অনুষ্ঠান উইথ সাম অফ ইয়োর পিপল, সুব্রতবাবুর সঙ্গে এটাই চুক্তি হয়েছিল। একদম লো প্রোফাইল। এমনকী আমার উইংসফটের কাউকে ডাকিনি আমি। আপনারা কিন্তু কথা রাখেননি। মিডিয়াকে খবর দিয়েছেন। এরপর আপনি বলছেন বাবার কথা। বাবার এখানে আসার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। উনি অসুস্থ।

যথা সময়ে ক্যান্টিনটা ভরে উঠল। প্রীতম সান্যালের পক্ষ থেকে যাঁদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাঁরা অনেকেই উৎসাহী হয়ে এসেছেন। অনেকে এটাকে আবার মালিক পক্ষের কোনও নতুন চাল ভেবে আসেননি। সামান্য কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্টজনরা অবশ্য বিপুল মণ্ডলের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েও এসেছেন। বিপুল মণ্ডল সঞ্চালকের ভারটা নিয়েছিল। প্রীতম সান্যালকে পুষ্পস্তবক দিয়ে মধ্যমণি করে বসিয়ে যথাসম্ভব রাজনৈতিক রং লাগিয়ে প্রারম্ভিক বক্তৃতাটা দিয়ে অসীমকে মানপত্রটা পড়তে ডাকল বিপুল মণ্ডল। অসীমও এতক্ষণ এক অদ্ভুত আবেগে ভেসে ছিল। এই মিলে মাত্র ছ'বছর কাজ করেছে অসীম। প্রথম বছরটা কাটানোর পরই সান্যালদের হাত থেকে আগরওয়ালদের হাতে চলে গিয়েছিল মিলটা। অবশ্য মালিক বদলে গেলে কী হবে, একসঙ্গে কাজ করার মানুষগুলো তো বদলায়নি। মিলটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে কী টেনশনে কেটেছিল একটা মাস। তারপরে গেটে হাঙ্গামা, মিটিং, মিছিল... কত কী। অসীমের যেটা সবচেয়ে এতক্ষণ ভাল লাগছিল, সামনে বসা মানুষগুলোর মুখে আজ আর সেই টেনশনটা নেই। এই অনুষ্ঠানটা শুরুর আগে যখন একে অন্যর সঙ্গে দেখা হচ্ছিল, বুকে জড়িয়ে ধরছিল ওরা। হাবিবুলদা, শিশিরদা, অনন্তদা, উধম সিং, রফিকউল, তারক...

কই এসো অসীম। বিপুল মণ্ডল তাড়া দিল।

সকলকে সামনে রেখে অসীম দেওয়াল ঘেঁষে মধ্যিখানে দাঁড়াল। সামনে সকলে এখন ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে। হাতে গোল করে পাকানো মানপত্রটা এবার পড়তে হবে ভেবে চেয়ে থাকা মানুষগুলো আর থমথমে মুখের প্রীতম সান্যালকে দেখে যে-টেনশনহীনতার কথা ভাবছিল এতক্ষণ, সেই টেনশনটাই শরীরটাকে কীরকম অবশ করে দিল। এককালে স্কুলে ভাল আবৃত্তি করত বলে বিপুল মণ্ডল এই দায়িত্বটা দিয়েছে। এক বাংলার মাস্টারমশাইকে ধরে বিপুলই মানপত্রটা লিখিয়ে এনেছে। একবুক দম নিয়ে অসীম মানপত্রটা পড়তে আরম্ভ করল—

'হে সুধী, হে মহান, হে কর্মবীর, হে আলোর পথের দিশারী, তোমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে কণ্টকিত পথ আগামীর জন্য কুসুম কোমল করে গেলে, সে পথ হয়ে থাকুক কালের সাক্ষী।'

সবেমাত্র প্রথম বাক্যটা শেষ হয়েছে, এমন সময় প্রীতম সান্যাল হাত তুলে অসীমকে থামিয়ে সকলের উদ্দেশে বলে উঠলেন, আমার মনে হয় আমি আমার কথাটা আগে বলে নিই। তারপরে আপনারা ঠিক করবেন আমি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য কিনা।

মানপত্রটা গুটিয়ে নিয়ে অসীম একপাশে সরে গেল। প্রীতম সান্যাল অসীমের দাঁড়ানো জায়গাটায় এসে শুরু করলেন, আজ এখানে আসার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের এখানে ডাকার উদ্দেশ্য, আমি কয়েকটা খবর আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। প্রথম খবরটা হল হরিতলা কটন মিলের ম্যানেজমেন্ট এখন থেকে আগরওয়াল ব্রাদার্সের থেকে আবার ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের কাছে ফিরে এসেছে। খবরটা শুনে আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে একটা বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলের ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তনে কী লাভ হতে পারে? মিলটা কি আবার চালু করবে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজ? প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, উত্তরটা হচ্ছে—না। তার কারণ এই মিলটাকে চালু রাখতে হলে, তার প্রোডাক্ট নিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে মিলটার আধুনিকীকরণ করতে হবে। আপনারা জানেন হরিতলা এখন একটা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। এই এলাকায় আধুনিক মিল করার জন্য পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না। বিপুলবাবু একটু আগে বললেন আমি এখানে কম্পিউটার ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চলেছি। এই তথ্যটা উনি কোথায় থেকে পেয়েছেন আমার জানা নেই। কারণ বড় ধরনের কম্পিউটার রিসার্চ আর ডেভলপমেন্টের জন্য দরকার হয় একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ডেটা হাই ওয়ে। দুর্ভাগ্যবশত সেটাও এখানে নেই। এরকমভাবেই আমি ভেবেছি, একটার পর একটা প্ল্যান। প্ল্যান-এ, প্ল্যান-বি, প্ল্যান-সি। ভেবে ভেবে ঠিক করেছি, আমার কোম্পানি উইংসফটের সঙ্গে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজকে সংযুক্ত করে নেব। আশা করি উইংসফটের আগামী অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং-এ মার্জারের কাজটা শেষ করে ফেলতে পারব। এবারও নিশ্চয়ই আপনারা ভাবছেন, উইংসফটের সঙ্গে ডি এস ইন্ডাস্ট্রিজের মার্জারে কী লাভ হবে? হরিতলা কটন মিল কি খুলবে? একই কারণে উত্তরটা আবার হচ্ছে—না। কিন্তু এতে করে আপনারা যাঁরা বহু বহু বছর কাটিয়েছেন হরিতলা কটন মিলে, উইংসফটের তরফ থেকে আপনাদের জন্য কিছু করতে পারব। মিলটা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আপনারা যাঁরা কাজ হারিয়েছেন, উইংসফট তাঁদের কম্পেনসেশন দেবে, পেনশনের ব্যবস্থা করবে। যাঁরা রিটায়ার করে গেছেন, তাঁরাও পেনশন পাবেন। যাঁদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশুনো করছে, উইংসফট ফাউন্ডেশন তাদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করবে।

সমবেতদের মুখগুলো পালটে যাচ্ছিল। অবিশ্বাস্য লাগছিল কথাগুলো। কেউ একজন হাততালি দিল। মুহূর্তের মধ্যে সেই তালিতে মিশে গেল অসংখ্য হাত। বহু বছর পরে এরকম মুখরিত হয়ে উঠল হরিতলা কটন মিল।

প্রীতম সান্যাল হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বললেন। দু'চুমুক জল খেয়ে আবার শুরু করলেন, কিন্তু যাঁরা কোনওদিন হরিতলা কটন মিলে কাজ করেননি? হরিতলার অসংখ্য সাধারণ মানুষ! তাদের জন্য কি কোনও দায় নেই হরিতলা কটন মিলের? বিপুলবাবু একটু আগে বলছিলেন এলাকার সার্বিক উন্নয়নের কথা। আমি ভেবেছি।

আবার সেই প্ল্যান-এ, প্ল্যান-বি, প্ল্যান-সি। ভেবে ভেবে মনে হয়েছে আসুন না আমরা হরিতলাকে ফিরিয়ে দিই, সেই পুরনো হরিতলায়। সেই হরিতলাটা কেমন ছিল মনে আছে আপনাদের কারও?

এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মনে আছে। আমাদের কারখানার ঠিক পিছনে যে বড় হরির ঝিলটা আছে সেখানে তখন শীতকালে কতরকম পরিযায়ী পাখিরা আসত। এককালে হরির ঝিলের একধারে নিজের থেকেই সূর্যমুখী ফুল ফুটত, ফড়িঙের দল সেই ফুলগুলোয় উড়ে উড়ে বসত। সেসবও আজকাল আর দেখা যায় না। কত প্রজাপতি ছিল এককালে, সেসবও আর দেখা যায় না। শরৎকালে শিমুলবীজ ফেটে বাতাসে তুলো ভেসে বেড়াত। আমাদের পাঁচিলের ওপর এককালে প্রচুর পায়রা এসে বসত। মহেশ বলে একজন কাজ করত এই ক্যান্টিনে। ও মাঝে মাঝে গমের দানা ছড়িয়ে দিত। হুটোপুটি করে পায়রার দল নেমে আসত গমের দানা খেতে। এখনও কানে বাজে সেইসব ডানার আওয়াজ। শেডের ওপর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ার সংগীত। তাই তো মালদা থেকে চাকরি করতে এসে আর ফিরে যেতে পারিনি। তিন পুরুষের ভিটে ছেড়ে এখানেই একদিন বাড়ি করে ফেললাম। বড় মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা।

সেই দিনগুলোয় আপনার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন, ইচ্ছে তো করেই। কিন্তু সেসব দিন কি আর ফিরে আসবে?

চেষ্টা তো আমাদের করতে হবে। উইংসফট এই চেষ্টাটা করবে। হরিতলা কটন মিলের ইট কাঠ লোহা সব সরিয়ে এই জায়গায় একটা বিশ্বমানের পার্ক করবে। হরির ঝিলের ধারে এই জায়গায় হবে বিস্তীর্ণ সেই সবুজ পার্ক। হরিতলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াবে, ফড়িঙের মতো লাফাবে সেই পার্কে। সত্যিকারের এতদিনের লুকিয়ে থাকা প্রজাপতি আর ফড়িংরা বলবে, বাঃ ভারী মজা তো, চল আমারও গিয়ে ওদের সঙ্গে খেলে আসি। বয়স্করা গাছের ঠান্ডা ছাওয়ায় বসে আবার দেখতে পাবেন মাথার ওপর ছোট্ট একটা নাম-না-জানা বিদেশি পাখি।

আর একবার হাততালির ঝড় উঠল। বিপুল মণ্ডল ক্যান্টিনের বাইরে এসে ফোন করল সুব্রত রক্ষিতকে।

মাইরি দাদা, তুমি বসে বসে সমুদ্রে সূর্য ডোবা দেখো। আর এদিকে আমাদের সূর্যটা ডুবল। শালা প্রীতম সান্যাল একটা ঝান্টু মাল। কম্পিউটারের কারখানা না খুলে এখন বলছে সব মাঠ করে দেবে...

আত্মবিশ্বাসটা ফেরাতে অসীমকে আর বড় শ্বাস নিতে হল না। ভেতর থেকে একটা আবেগ উথলে উঠছে। হাতের পাকানো মানপত্রটা এবার গলা ছেড়ে পড়তে আরম্ভ করল—

'হে সুধী, হে মহান, হে কর্মবীর, হে আলোর পথের দিশারী, তোমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যে কণ্টকিত পথ আগামীর জন্য কুসুম কোমল করে গেলে, সে পথ হয়ে থাকুক কালের সাক্ষী। তোমার বাণী হোক আমাদের কর্মযজ্ঞের পাথেয়, সে বাণী অনুরণিত হোক

আগামীর হৃদয়ে। হে বিশ্বকর্মার বরপুত্র, যে শিল্প অনুচ্চারে এ কর্মমন্দিরে তুমি রচনা করে গেলে তা হোক আগামী দিনের বিগ্রহ। তোমার হৃদয়ের স্নিগ্ধতার স্পর্শ থাকুক...

এবারেও শেষ করতে পারল না অসীম। মনে হল লোকজন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপরেই একটা গলা পেল, বিট্টুবাবা, তুই আমাকে সব দেখালি মহেশের ক্যান্টিনটা দেখালি না... ওরা আসতে দিচ্ছিল না, তাই আমি নিজেই চলে এলাম।

দয়াল সান্যালের পিছনে সরোজ বক্সী, বীথি, দর্শনা, বনানী। সকলেই প্রায় একসঙ্গে প্রীতম সান্যালের দিকে অসহায়ের মতো তাকালেন। প্রীতম সান্যাল একটু অপ্রস্তুত হয়ে উঠে এলেন। বাবাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। দয়াল সান্যাল ভ্রূক্ষেপ না করে একজনের সামনে এসে থমকে গেলেন। স্থির দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অনুপম, তোমাকেও লোকেন সাদা দাড়িগোঁফ লাগিয়ে সঙ সাজিয়ে দিয়েছে?

তারপর একটু চিন্তা করে বললেন, ও বুঝেছি। কে যেন বলল আজ বড়দিন। তাই তোমরা সব লাল বুড়ো সেজেছ। হ্যাপি ক্রিসমাস... হ্যাপি ক্রিসমাস...

পুরনো কর্মচারীদের সঙ্গে হাত মেলাতে থাকলেন দয়াল সান্যাল। শীতল ভট্টাচার্য প্রীতম সান্যালের কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ভাগ্যিস মিডিয়াকে স্যার ম্যানেজ করে বাইরে রাখতে পেরেছি। না হলে এখানে থাকলে এতক্ষণ...

প্রীতম সান্যাল ক্যান্টিনের বাইরে বেরিয়ে এসে অসীমকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

তুমি এখানকার লোকাল ছেলে তাই না?

হ্যাঁ স্যার।

মহেশের বাড়িটা কোথায় ছিল জানো?

হ্যাঁ স্যার। এই মিলে কাজ করার সময় মহেশের বাড়ি নিয়ে অনেক জনশ্রুতি শুনেছে অসীম।

যাওয়া যায় এখন?

ওটা হরির ঝিলের ওদিকে। গাড়ি নিয়ে ঘুরে যেতে হবে। তবে স্যার ওদিকে কোনও ডেভলপমেন্ট হয়নি। আলোটালো কিছু নেই। বাড়িটাও পোড়ো। সাপখোপ বাদুড় থাকতে পারে। পড়ন্ত বিকেলের দিকে তাকিয়ে আসীম বলল।

গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। মেন গেটে মিডিয়া ছেঁকে ধরবে। পিছন পিছন ধাওয়া করবে। আর কোনওভাবে যাওয়া যায় কি?

একটা উপায় আছে স্যার... একটু চিন্তা করে অসীম বলল...

নিতাই হাঁপাতে হাঁপাতে সুকুমারকে এসে বলল, সাইকেলটা দে।

সুকুমার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, সাইকেল নিয়ে এখন কোথায় পালাবি? নিজেরটা কী হল?

দুটো সাইকেলই লাগবে।

কীসের সুখে?

এবার নিতাইয়ের দাঁতমুখ খিঁচানোর পালা।

বড় বলেছিল না বিপুল মণ্ডল... সান্যালরা কী রিসকোতে আসবে না ভ্যানরিসকোতে। শালা বড়লোকদের কারবারই আলাদা। শখ হয়েছে সাইকেল চাপবে। তাও আবার ওই হরির ঝিলের দিকে চোরছ্যাঁচোরদের পায়ে হাঁটা রাস্তায়। দে, দে... সাইকেলটা আর পিছনের ছোট গেটের চাবিটা দে...

৯৯

গোধূলির শান্ত প্রতিবিম্ব চিকচিক করছে হরির ঝিলের টলটলে জলে। হরির ঝিলের এই পাশে আজও সেভাবে জনবসতি গড়ে ওঠেনি। তিরিশ বছর আগেও জায়গাটা যেরকম ছিল, আজও সেরকমই আছে। মাটিতে পায়ে চলা একটা অপরিসর রাস্তা। এক দিকে হরির ঝিল আর এক দিকে অনুর্বর জমি। সেই জমিটার জায়গায় জায়গায় আগাছা আর কিছু ঝুপড়ি।

অসীম সাইকেলটা নিয়ে আগে আগে তটস্থ হয়ে যাচ্ছিল। মনটা পড়ে আছে ঈষৎ পিছনে, যেখানে প্রীতম সান্যাল সাইকেলটা চালাচ্ছেন। প্রথমে সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে যেভাবে টালমাটাল হয়ে গিয়েছিলেন প্রীতম সান্যাল, অসীমের ভেতরটা ছ্যাঁক করে উঠেছিল, মানুষটা আদৌ সাইকেল চালাতে পারবে কি! ওদের সঙ্গে আরও অনেকে আসতে চেয়েছিল। প্রীতম সান্যাল অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় বারণ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, একজনই যথেষ্ট যে শুধু মহেশের বাড়িটা চেনে। এবং বেছে নিয়েছিলেন অসীমকে। ব্যাপারটা গর্বের হলেও একটা টেনশনও ছিল।

স্যার আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?—কথাটা গলায় অনেকক্ষণ আটকে আছে, কিন্তু মুখে ফুটছে না। এখন অসীম খুব সাবধানে নিজের সাইকেলের স্পিড়ের খেয়াল রাখছে, যাতে পাল্লা দিয়ে বেশি স্পিডে মালিকের চালাতে অসুবিধা না হয় আবার কম স্পিডে ভারসাম্যটা টালমাটাল হয়ে না যায়। টেনশনটা ফুটে বেরোচ্ছিল অসীমের বুড়ো আঙুলে। শুনশান ফাঁকা রাস্তাতে মাঝে মাঝে গাড্ডা আর নুড়িপাথর দেখে ঘণ্টিটা বাজিয়ে ফেলছিল টিং টিং...। ঘণ্টির আওয়াজটা নিজের কানেই কেমন যেন বেমানান লাগছিল।

মহেশের বাড়িটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। অসীমের নিজেরই খেয়াল নেই কতদিন পরে এদিকে এল। এরকম একটা ভুতুড়ে জায়গায় মহেশ বাড়ি করতে গিয়েছিল কেন? যা জনশ্রুতি শোনা যায়, মহেশ ছিল প্রীতম সান্যালের মায়ের একদম খাস লোক। ওরা ছিল সেকালের নকশালদের দলের সক্রিয় কর্মী আর মহেশের বাড়িটা ছিল ওদের শক্ত গোপন ঘাঁটি। মহেশের শেষপর্যন্ত কী হয়েছিল কেউ জানে না। তবে মহেশের বাড়িটা নাকি আসলে প্রীতম সান্যালের মায়ের। সেই অর্থে বাড়িটার বর্তমান মালিক প্রীতম সান্যাল। বাড়িটার কী অবস্থা তাই জানা নেই। বহু বছর আগে শেষ যেবার এদিকটায় এসেছিল, স্পষ্ট মনে পড়ছে দেখেছিল বাড়িটায় কেউ থাকে না। একই সঙ্গে বাড়িটার

কাঠামোটাও খারাপ দেখেছিল। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ে ইটগুলো গা বার করেছে। এতদিনে নিশ্চয় বাড়িটা আরও পোড়ো হয়ে গেছে। সাপখোপ পোকামাকড়ের রাজ্য হবে। এই অবস্থায় প্রীতম সান্যাল যদি বাড়িটার ভেতরে যেতে চান... নতুন করে আরেকটা দুশ্চিন্তা আরম্ভ হল অসীমের।

দুশ্চিন্তার মোড় অবশ্য ঘুরে গেল। আর একটু কাছাকাছি আসতেই অসীম বুঝতে পারল বাড়িটায় এখন কেউ থাকে। বাড়িটার একপাশে দুটো বাঁশ পুঁতে দড়ি টাঙিয়ে গোটা দুয়েক কাপড় মেলা আছে। প্রীতম সান্যাল যদি বাড়িটার ভেতর দেখতে চান, ওদের সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে। আর তার চেয়েও বড় ঝামেলা হবে প্রীতম সান্যাল যদি বেদখল বাড়িটার দখল ফেরত চান। উচ্ছেদ করতে হলে অন্তত বিপুল মণ্ডল সঙ্গে এলে ভাল হত। আনমনা হতেই সাইকেলের স্পিডটা ঈষৎ বেড়ে গেল অসীমের। মাথার পিছনে যে -অদৃশ্য চোখ দুটো এতক্ষণ প্রীতম সান্যালের খেয়াল রাখছিল সে দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

বাড়িটার সামনে এসে জোরে জোরে সাইকেলের ঘণ্টিটা বাজাতে বাজাতে অসীম গলা ছাড়ল, কে আছ গো?

প্রীতম সান্যাল সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা স্ট্যান্ড করলেন। অসীমের কাছে এসে বললেন, ঠিক আছে, এত ব্যস্ত হয়ো না।

ভাঙা বাড়িটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক বছর পঁচিশের মহিলা। পোশাক থেকে চেহারা সব কিছুতেই দারিদ্র্যের মলিনতা প্রকট। সিঁথিতে লেপটানো সিঁদুরটা খেয়াল করে অসীম বলল, তোমার বর কোথায়?

মহিলা খানিকটা ঘাবড়ানো গলায় বলল, ও তো ফেরেনি এখনও...

অসীম অধৈর্য হয়ে বলল, আঃ! ওর কোনও মোবাইল নম্বর টম্বর আছে?

মেয়েটির গলা আরও মিইয়ে গেল। কোনওরকমে বলল, না...

তোমরা কবে থেকে আছ এখানে? কার পারমিশন নিয়ে এখানে আছ? তোমার বর কখন ফিরবে?

এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এক বছর পাঁচেকের রোগাপাতলা শ্যামলা মেয়ে। জীর্ণ একটা ফ্রকের ওপর ততোধিক জীর্ণ মাপে ছোট হয়ে যাওয়া সোয়েটার। অচেনা দুটো লোককে বাড়ির উঠোনে দেখে আর অসীমের ধমকানির কণ্ঠস্বর শুনে শুকনো মুখে মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল।

অসীমের কথায় ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হচ্ছিলেন প্রীতম সান্যাল। এবার স্পষ্ট বিরক্তিটা প্রকাশ করে বললেন, তুমি ওকে এত প্রশ্ন করছ কেন?

অসীম থতমত খেয়ে গেল। প্রীতম সান্যাল কীসের টানে এই পোড়ো বেদখল হয়ে যাওয়া বাড়িটায় এসেছেন, জানা নেই। শুধু নিজের একটা অনুমান, প্রীতম সান্যাল হয়তো নিজের বেদখল সম্পত্তিটা ফেরত চাইতে পারেন। একটু আগে হরিতলা কটন মিলের জায়গাটার যে-ভবিষ্যৎ ঠিক করেছেন, মহেশের বাড়িটাকেও হয়তো সেই কর্মকাণ্ডের অংশ করে নিতে চাইতে পারেন।

প্রীতম সান্যাল বিনীত গলায় মহিলাকে বললেন, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এলাম। অনেকদিন আগে এই বাড়িটায় ক'দিন কাটিয়ে গিয়েছিলাম। হরিতলায় এসে খুব ইচ্ছে হল একটু দেখে যাই বাড়িটা কেমন আছে।

অসীমের মতো মহিলাও বুঝতে পারল না ঝকঝকে পোশাকের ভদ্রলোকের এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাড়ি দেখতে আসার উদ্দেশ্য কী। বড় মাপের মানুষটাকে নিজের সম্মতি অসম্মতি কিছুই জানাতে পারল না সে। একটু আগে অসীমের প্রশ্নর সূত্র ধরে খানিকটা নিজের তাগিদেই বলল, ও ট্রেনে হকারি করে। দশটা-সাড়ে দশটা পর্যন্ত হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনে লোকাল ট্রেনেই থাকে। ওর মোবাইল নেই, তবে ইসটিশনে চায়ের দোকানির নম্বর আছে। কোনও খবর...

প্রীতম সান্যাল বললেন, না না, কোনও দরকার নেই। আমরা এই একটুখানি থেকেই চলে যাব।

মহিলা এবারও ধন্দে থাকল। তবে ভেতর থেকে দুটো মোড়া এনে বাড়িটার সামনে একচিলতে উঠোনটায় মোড়া দুটো পেতে বলল, বসুন।

প্রীতম সান্যাল মোড়াটায় বসলেও অসীম দাঁড়িয়েই রইল। প্রীতম সান্যালের শৈশবের স্মৃতিটা ফিরে আসতে থাকল। বাড়িটার পিছনে বড় গাছটা থেকে আরম্ভ করে সামনে হরির ঝিল পর্যন্ত সব একই রকম আছে। তবু কী যেন নেই। সেই ভয়ংকর রাতটার স্মৃতি ঝাপটা মারছে। অন্ধকার... কানফাটানো গুলির আওয়াজ... চিৎকার... ভারী বুটের শব্দ... প্রীতম সান্যাল চোখটা কুঁচকে বন্ধ করে দুঃস্বপ্নের স্মৃতিটা মুছে ফেলে ভাল স্মৃতিটা মনে করার চেষ্টা করলেন। এই বাড়িটায় সেই ক'দিন প্রায় বন্দি ছিলেন। সারাদিন মাম্মি জানলাগুলো সব বন্ধ করে রাখত। শুধু রাত্রি বাড়লে মাম্মি যখন ঘুম পাড়াতে আসত, মহেশকাকা এসে একটা জানলা খুলে দিত। ছোট্ট বিট্টু তখন সেই খোলা জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে দেখতে পেত বড় গাছটা। আর তারপরেই হরির ঝিল। হরির ঝিলের ওপর কালো কুচকুচে আকাশ, একফালি চকচকে চাঁদকে ঘিরে অসংখ্য ঝিকমিকে তারা। মাম্মি পিঠ ঘেঁষে আলতো আলতো করে চাপড় মারতে মারতে গুনগুন করে গাইত, আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়... আঃ কী আরাম। ছোট্ট বিট্টু বুড়ো আঙুলটা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ভারী চোখে হরির ঝিলের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত, যতক্ষণ না চোখটা বন্ধ হয়ে আসত।

মহিলা কী করবে বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে দু'কাপ চা করে এনেছিল। অসীম আত্মমগ্ন হয়ে হরির ঝিলের দিকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা প্রীতম সান্যালকে দেখে সস্তার চুল-ফাটল ধরা কাপ দুটো ফেরত নিয়ে যেতে ইশারা করছিল। মহিলা ভেবেছিল অসীম চা খেতে চায় না। তাই অসীমের চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অন্য কাপটা নিয়ে এসে চুপ করে প্রীতম সান্যালের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রীতম সান্যালের মগ্নতা ভাঙল পকেটে মোবাইল ফোনের রিংটোনে। পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বার করে কলার আইডিটা দেখে খুব বিরক্ত হলেন। শীতল ভট্টাচার্য। প্রীতম সান্যাল ফোনটা ধরতেই হুড়মুড় করে বলতে আরম্ভ করলেন, প্রেসের লোকগুলোকে সামলে নিয়েছি স্যার। কড়া গলায় স্পষ্ট বলে দিয়েছি, আপনার যা

বলার কাল আপনি প্রেস ক্লাবে বলবেন... উফ, শেষপর্যন্ত লোকগুলো বিদেয় হয়েছে। অবশ্য ওদের স্যার দোষ দেওয়া যায় না। আপনার মতো ভিভিআইপি...

আপনি কি এই ননসেন্স কথাগুলো বলার জন্যই ফোন করলেন?

না, মানে স্যার... মানে বলছিলাম এবার গাড়ি মহেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিই স্যার? আপনাকে আর কষ্ট করে সাইকেল নিয়ে আসতে হবে না। অবশ্য গাড়ি নিয়ে একটু ঘুরপথে ওখানে পৌঁছোতে হবে। তবে পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে...

হ্যাভ আই আস্কড ফর? কেটে কেটে বললেন প্রীতম সান্যাল।

শীতল ভট্টাচার্য আমতা আমতা করতে থাকলেন, না... মানে স্যার... এবার তো সন্ধে নামবে স্যার। ওদিকে সরোজবাবু আর অনুপম ঘোষকে নিয়ে বড়সাহেব এখনই একই গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছেন। আমি বলছিলাম...

আস্ক দর্শনা হোয়াট টু ডু। জাস্ট ডু হোয়াট শি সেজ অ্যান্ড ডোন্ট কল মি।

চায়ের কাপ হাতে প্রীতম সান্যালের ফোনে ইংরেজিতে ধমকানি শুনে মহিলার পেটের ভেতরটা খালি খালি লাগছিল। প্রীতম সান্যাল ফোনটা ছাড়ার পর মহিলা কোনওরকমে বলল, চা।

প্রীতম সান্যাল অল্প হেসে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নিলেন। চা-টা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। কয়েক চুমুকে চা'টা শেষ করে কাপটা একপাশে নামিয়ে রেখে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। খুব ভাল চা খেলাম। বাড়িটা দেখতে এসে এটা দেখে খুব ভাল লাগছে যে, বাড়িটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে আপনারা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

অসীম অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিল কথাটা বলবে। শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল, স্যার ঘরের ভেতরগুলো দেখবেন?

প্রীতম সান্যাল মৃদু ধমকে উঠলেন, হাউ ক্যান ইউ থিঙ্ক অফ বার্জিং ইন লাইক দ্যাট?

মোড়া ছেড়ে উঠে পড়লেন প্রীতম সান্যাল। পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করে এক খাবলা পাঁচশো টাকার নোট বের করে মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, এটা রাখুন। যা যা সারাই করার দরকার করিয়ে নিন। আরও যদি কিছু দরকার হয় আপনি ওকে বলবেন। প্রীতম সান্যাল অসীমের দিকে আঙুল দেখালেন। তারপর অসীমকে বললেন, গিভ হার ইয়োর কন্ট্যাক্ট সো দ্যাট দে সি ক্যান গেট ইন টাচ উইথ আস। জাস্ট টেল শীতল টু ডু অল দ্য নেসেসারি রিপায়ার্স উইদাউট ডিস্টার্বিং দেম।

মহিলা ফ্যালফ্যাল চোখে প্রীতম সান্যালের ইংরেজিতে বলা কথাগুলো শুনছিল আর হাতে ধরা অবিশ্বাস্য পরিমাণ টাকাগুলোর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। এত টাকা বাড়ি বয়ে এসে দিতে চাইছে? বাড়িটা সারাই করার কথা বলছে? প্রীতম সান্যালের ইংরেজিতে বলা কথাগুলোর সে নিজের মতো মানে করল এবং তাতে ক্রমশ কারণটা স্পষ্ট হতেই মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে প্রীতম সান্যালের পা দুটো জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, টাকা দিয়ে আমাদের তাড়িয়ে দেবেন না। আমাদের আর কোথাও গিয়ে থাকার জায়গা নেই। আপনি ভগবান। দয়া করুন। অন্তত ওর মুখ চেয়ে...

মায়ের দেখাদেখি বাচ্চা মেয়েটাও ততক্ষণে কচি হাতে প্রীতম সান্যালের পা দুটো

জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল। ওরা ভুল বুঝেছে। প্রীতম সান্যাল ছিটকে সরে যেতে চাইলেন তবে কচি হাত দুটো পা দুটো ছাড়ল না। প্রীতম সান্যাল নিচু হয়ে আলতো করে বাচ্চা মেয়েটার শীর্ণ হাত দুটো ছাড়ালেন। তারপর নিজের হাত দুটো সরিয়ে নেওয়ার আগে হঠাৎ করে মেয়েটার দু'বগলের তলায় হাত দুটো দিয়ে কোলে তুলে নিলেন। প্রীতম সান্যালের কোলে উঠে মেয়েটা আরও ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। 'মা'...'মা'... করে ছটফট করতে থাকল কোল থেকে নেমে যাওয়ার জন্য।

মেয়েটাকে কোলে দুবার ঝাঁকিয়ে খানিকটা ওর মাকে শুনিয়ে বলতে থাকলেন, এটা তো তোরই বাড়ি। তুই যাতে এই বাড়িটায় আরও ভালভাবে থাকতে পারিস, সেটাই তোর মাকে বলছিলাম। বোকা মেয়ে কাঁদছিস কেন...

প্রীতম সান্যালের চোখটায় কিছু একটা নীরব ভাষা ছিল। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা মেয়েটার কান্না থেমে গেল। নির্বাক হয়ে সেও চেয়ে থাকল প্রীতম সান্যালের চোখের দিকে। প্রীতম সান্যালের মুখে হঠাৎ কথা আটকে গেল। জীবনে প্রথম কোনও বাচ্চাকে কোলে তুললেন। তার কান্না ভোলালেন। অবর্ণনীয় এক অনুভূতি। পিতৃত্বের অনুভূতি কি এরকমই হয়? অথবা খুব প্রিয়জনের প্রাণের স্পন্দন কি এরকমই? জীবনের সুবাস অথবা আত্মজ উষ্ণতা কি এরকমই? অদ্ভুত একটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন বাচ্চা মেয়েটার চোখের দিকে। বিহ্বল হয়ে বলতে থাকলেন, আমি বারবার যেন তোর কাছে আসতে পারি আর তোকে কোলে নিয়ে দেখতে পারি ওই আকাশটা...

হরির ঝিলের ওপরে আকাশটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে প্রীতম সান্যালের গলায় কথাগুলো আটকে গেল। সন্ধেটা আরও ঘন হয়ে আসছে। অল্প একটা কমলার ছোপ রেখে আকাশটা এখন বিষণ্ণ নীল। সেই আকাশে একটা ধনুকের মতো সিলুট। দিনের শেষে অদ্ভুত একটা ছন্দে ডানা ঝাপটিয়ে দল বেঁধে আকাশে ধনুক এঁকে ওরা উড়ে আসছে হরির ঝিলের দিকে।

বিহ্বল হয়ে মেয়েটাকে কোলে আরও আঁকড়ে ধরে প্রীতম সান্যাল অস্ফুট স্বরে গাইতে থাকলেন, হোয়ার চিলড্রেন আর পিয়োর অ্যান্ড হ্যাপি...

১০০

ইন্টারকমটা ট্যাঁ-ট্যাঁ বাজছে। বাইরে এখনও ভাল করে আলো ফোটেনি, তবে দর্শনা পুরো রেডি হয়ে গেছে। অনেক ভোরে উঠে তার জগিং করার অভ্যাস। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো ব্যাপারটা কখনওই পছন্দ নয়। হাতে সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে কাজ করতেই ভাল লাগে। দর্শনার মনে হল, এই হোটেলের ম্যানেজমেন্টও বোধহয় ওর মতোই। এয়ারপোর্ট ড্রপিং-এর জন্য পৌনে পাঁচটায় গাড়ি আসার কথা। চারটে পঁচিশেই রিপোর্ট করছে। ফোনটা ধরল দর্শনা।

হ্যালো!

গুডমর্নিং ম্যাম। আপনার একটা বাইরের কল আছে।

এত ভোরে! অবাক দল দর্শনা। লাইনটা দিতে বলল। তারপরেই ওপ্রান্তে গলা পেল প্রীতম সান্যালের।

তোমার মোবাইলটা কী হল?

মোবাইলটা বন্ধ করে রেখেছিল দর্শনা। পুরনো অভ্যাস। রাতে শুতে যাওয়ার আগে সুইচ অফ করে রাখে। ভোরে উঠে এখনও অন করা হয়নি। দুঃখ প্রকাশ করল, স্যরি...

ইটস ওকে, কখন বেরোচ্ছ?

রেডি হয়েই গেছি প্রায়। পিক-আপ এলেই বেরিয়ে পড়ছি।

তোমাকে চেষ্টা করছিলাম। আমিই পিক-আপ করে নিতে পারতাম। এনি ওয়ে তুমি স্টার্ট করে আমাকে একবার ফোন কোরো। অন দ্য ওয়ে মিট করে নেব।

আপনি কম্ফর্টেবলি আসুন। আমি অন লাইন বোর্ডিং পাস করে নিয়েছি।

আই আম অলরেডি অন মাই ওয়ে। বাই দ্য ওয়ে তোমার টিকিটটা ইকনমি ক্লাসে আছে, তাই না?

হ্যাঁ স্যার।

ওটা ক্যানসেল করে বিজনেস ক্লাস করে নাও। আমরা একসঙ্গে যাব।

দর্শনা একটু অবাকই হল। টিকিট সব বেঙ্গালুরু অফিস থেকে ইস্যু হয়। পদমর্যাদা ধরে ক্লাস। আসবার সময় একসঙ্গে এলেও দর্শনার টিকিটটা ইকনমি ক্লাসেরই ছিল। প্রীতম সান্যালেরটা বিজনেস ক্লাস। ঘড়ির দিকে তাকাল আবার। আর একটা অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। এত আগে প্রীতম সান্যাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। দর্শনা জানে ভোরে ওঠার খুব একটা সুখ্যাতি নেই প্রীতম সান্যালের। চিরকাল ভোরের ফ্লাইট এড়িয়েই চলেন। নেহাত কাল রাতে হঠাৎ ঠিক করেছেন, আজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেঙ্গালুরুর ফ্লাইট ধরে ফিরে যাবেন, তাই টিকিট বদলে ভোরের ফাস্ট ফ্লাইটটা নিতে হয়েছে। গতকাল প্রেস কনফারেন্স গেছে। প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছেন। কখনও একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নে বিব্রত, বিচলিত। একটু ইতস্তত করে দর্শনা জিজ্ঞেস করল, আপনার রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো স্যার?

একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল দর্শনা।

কলকাতার এই বাড়িতে আমার কোনওদিনই ভাল ঘুম হয় না দর্শনা। ভীষণ ক্লসট্রোফোবিক লাগে। মনে হয় চারদিকের দেওয়ালগুলো যেন চেপে আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। এখন বরং অনেক ভাল লাগছে। এসি বন্ধ করে গাড়ির জানলাগুলো সব নামিয়ে দিয়েছি। ভোরের গন্ধ। একদম কার্শিয়াং-এর মতো।

প্রীতম সান্যাল চুপ করে গেলেন। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। কাজের বাইরে প্রীতম সান্যালের কিছু ব্যক্তিগত মুহূর্ত আছে যেগুলো মাঝে মাঝে দর্শনার সামনে চলে আসে। পেশাদারি দক্ষতায় দর্শনা এখনও বুঝতে পারে না, সেগুলো কীভাবে সামলাতে হবে। প্রসঙ্গটা ঘোরাতে বলল, গাড়িটা রিপোর্ট করলেই আমি বেরিয়ে পড়ছি স্যার।

প্রীতম সান্যাল তখনও আনমনা ছিলেন। আনমনা হয়েই বললেন, ইয়েস দর্শনা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো। আই অ্যাম মিসিং ইউ।

দর্শনা ফোনটা নামিয়ে রেখে চুপ করে খাটে বসে ভাবতে থাকল। প্রীতম সান্যালের

পেশাদারি জগৎ আর ব্যক্তিগত জীবন, এই দুটোর মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজনরেখা ছিল। এক দিককার প্রতিটি অণু-পরমাণু দর্শনার ক্রমশ নখদর্পণে হয়ে যাচ্ছে। আর এক দিককার জগৎটা এই সেদিন পর্যন্ত গাঢ় অন্ধকার ছিল। প্রীতম সান্যালই চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটু একটু করে আলো ফেলেছেন সেই অন্ধকারটায়। তাতে খাপছাড়াভাবে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়েছে অদ্ভুত একটা জীবন। সেই সঙ্গে স্পষ্ট বিভাজনরেখাটা যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রীতম সান্যাল যেন ক্রমশ আঁকড়ে ধরতে চাইছেন দর্শনাকে।

ইন্টারকমটা আবার বাজছে। একটু শিথিল হাতেই ফোনটা ধরল দর্শনা। মোবাইলটা এখনও অন করা হয়নি। ইচ্ছে করেই করেনি। প্রীতম সান্যালের অস্থিরতা জানে দর্শনা। মুহুর্মুহু ফোন করে যাবে। গলাটা গম্ভীর করে বলল, হ্যালো।

ম্যাম এয়ারপোর্ট ট্রান্সপোর্ট ইজ রেডি।

থ্যাঙ্কস। চেক আউটের হেল্প পাঠিয়ে দিন।

রাইট ম্যাম।

বাইরে আলো ফুটেছে। তবে শীতকালে কুয়াশায় ঢেকে আছে চারদিক। রাস্তাঘাট ফাঁকা হলেও ফুটপাতে অল্প অল্প মানুষ দেখা যাচ্ছে। গাড়িতে করে ভোরের কুয়াশামোড়া কলকাতা দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রীতম সান্যালকে ফোন করল দর্শনা।

স্যার আই হ্যাভ স্টার্টেড।

তুমি এখন এগজ্যাক্টলি কোথায় দর্শনা?

দর্শনা জায়গাটা চেনে না। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল জায়গাটা কোথায়। ড্রাইভারের কাছে জেনে ফোনে বলল, সামহোয়ার নিয়ার পার্ক সার্কাস। হেডিং টু বাইপাস।

তুমি একটা কাজ করো, ড্রাইভারকে বলো... না থাক গুলিয়ে ফেলবে... ড্রাইভারকে ফোনটা দাও একবার।

দর্শনা ফোনটা ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে কথা বলতে বলল। ড্রাইভার খানিকক্ষণ হুঁ-হাঁ করে কথা বলে দর্শনাকে ফোনটা ফেরত দিয়ে দিল। দর্শনা ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল প্রীতম সান্যাল ততক্ষণে লাইনটা ছেড়ে দিয়েছেন। ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, উনি কী বললেন?

ফুলবাগান হয়ে বাইপাসের দিকে যেতে বললেন। উনি ওখানে রাস্তায় অপেক্ষা করছেন।

দর্শনার মুখে চলে এসেছিল, ফুলবাগান? সেটা আবার কোথায়? কিন্তু প্রশ্নটা করতে গিয়েও করল না। কৌতূহলটা মনের ভেতরেই পুষে রাখল। ড্রাইভার জায়গাটা বললেও কিছুই মর্ম উদ্ধার করতে পারবে না। বাইপাস যাতায়াতের রাস্তাটা এতদিনে মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। তবে ড্রাইভার যেদিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল সেটা যে বাইপাসের দিকের রাস্তা নয়, সেটুকু বুঝল দর্শনা। একই সঙ্গে একটা এসএমএস পেয়ে নিশ্চিন্ত হল, কুয়াশার জন্য ফ্লাইট ডিলেড।

অচেনা রাস্তাটা দিয়ে এদিক-ওদিক ডাইনে-বাঁয়ে যেতে যেতে একসময় সামনে দূর

থেকেই দর্শনা দেখতে পেল প্রীতম সান্যালের হালকা নীল রঙের মার্সিডিজ গাড়িটা। রাস্তার এক দিকে দাঁড় করানো। বাঁদিকের পিছনের দরজাটা ঈষৎ খোলা। দর্শনা ড্রাইভারকে বলল গাড়িটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে।

গাড়ি থেকে নেমে দর্শনা এগিয়ে গেল খোলা দরজাটার দিকে। প্রীতম সান্যাল মন দিয়ে একটা ডায়েরি পড়ছিলেন। এই ডায়েরিটাও এতদিনে চিনে গেছে দর্শনা। প্রীতম সান্যালের মৃতা মায়ের ডায়েরি। চাক্ষুষ দর্শনে দর্শনা আবার অভিবাদন করল, গুডমর্নিং স্যার।

দর্শনা একটা অদ্ভুত পারফিউম ব্যবহার করে। এই গন্ধটা আর কোথাও কখনও পান না প্রীতম সান্যাল। সেই মহীশূরের রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টটা হওয়ার সময় প্রথম পেয়েছিলেন গন্ধটা। আজও গন্ধটা একইরকম আছে। চোখ বন্ধ করে আবিষ্ট হলেন গন্ধটায়। ভোরের মাটি ভেজা গন্ধর মতোই পবিত্র গন্ধটা। দর্শনার অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলেন না প্রীতম সান্যাল। শুধু ওর দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসলেন।

ড্রাইভার দর্শনার মালপত্তর মার্সিডিজের ডিকিতে তুলে দিল। দর্শনা ঘুরে গিয়ে অন্য দিকের দরজাটা দিয়ে প্রীতম সান্যালের পাশে এসে বসল। ড্রাইভারও নিজের সিটে এসে বসল। দু'জনেই আশা করছিল প্রীতম সান্যাল এবার নিজের দিকের খোলা দরজাটা বন্ধ করে ড্রাইভারকে এগোতে বলবেন। কিন্তু উনি একইরকমভাবে দরজাটা খোলা রেখে বসে রইলেন।

সেদিন তুমি হরিতলার প্রোগ্রামে তখন ছিলে না দর্শনা। একজন বলছিলেন হারিয়ে যাওয়া সূর্যমুখী ফুল, ফড়িং, পাখি, প্রজাপতির কথা। আমি যখন বললাম আমরা আবার সব ফিরিয়ে আনব, ভদ্রলোকের মুখের যে রি-অ্যাকশনটা হয়েছিল, সেটা আমি ভুলতে পারছি না দর্শনা। সেদিন মহেশকাকার বাড়ির উঠোনে বসে যখন হরির ঝিলটা দেখছিলাম তখন মনে হচ্ছিল, ওরা সত্যি ফিরে আসবে তো? আমি কি সেই ডাকটা ডাকতে পারব?

প্রীতম সান্যাল বাইরেটা দেখিয়ে বললেন, তোমাকে কেন এখানে ডাকলাম জানো তো? এই বাইরেটা দেখাতে। একবার এখানে দেখেছিলাম ভোরবেলায় এক ভদ্রলোক চান করে, খালি গায়ে রাস্তার ওপর গম ছড়াতে ছড়াতে অদ্ভুত একটা গলায় পাখিদের ডাকছেন, আ... আ... রাম কী চিড়িয়া, রাম কী খেত, খা লে চিড়িয়া ভর ভর পেট... আ... আ...। ভদ্রলোকের ডাক শুনে চারদিক থেকে পাখিরা উড়ে এসে খুঁটে খুঁটে সেই গম খেতে লাগল। আজ দেখো কেউ নেই। কে হারিয়ে গেছে দর্শনা? পায়রাগুলো না সেই মানুষটা?

হয়তো দু'জনেই স্যার।

অনেকে হারিয়ে যায় দর্শনা। যেমন জুলি গেছে, উপাসনা গেছে। হয়তো তুমিও একদিন হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাওয়াকে আমি খুব ভয় পাই দর্শনা।

জুলি আর উপাসনা কারা দর্শনা জানে না। তাই উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। প্রীতম সান্যাল শূন্য একটা দৃষ্টিতে বাইরে দেখছিলেন। একসময় গাড়ির দরজাটা বন্ধ করে ড্রাইভারকে বললেন, চলো।

গাড়িটা বাইপাস পেরিয়ে চিংড়িহাটা দিয়ে রাজারহাটের রাস্তা ধরল। প্রীতম সান্যাল কুয়াশার ঘেরাটোপে বাইরেটা দেখতে দেখতে বলতে থাকলেন, তোমাকে কেন

মিস করছিলাম জানো? মনে হচ্ছিল তুমিও হারিয়ে যাওয়ার আগে তোমাকে মাম্মির ডায়েরির কয়েকটা পাতা পড়ে শোনাই।

দর্শনা পেশাদারি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, আমার শুনতে খুব ভাল লাগবে স্যার।

প্রীতম সান্যাল ডায়েরিটা খুললেন না। কিন্তু মায়ের লেখাটা নিজের মতো করে বলতে থাকলেন।

মাম্মি স্বপ্ন দেখত আমার একটা খুব সুখের সংসার হবে। ফুটফুটে একটা মেয়ে হবে। সবসময় সে আমার চারপাশে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াবে। ফড়িঙের মতো লাফাবে। পাখির মতো গান করবে। সেদিনকার সেই ভদ্রলোকের কথার সঙ্গে কী মিল তাই না?

অবভিয়াসলি স্যার। ওঁরা দু'জনই তো হরির ঝিলকে ভালবেসেছিলেন। হরির ঝিলের চারদিকে এরকম দৃশ্যই দেখেছিলেন।

হয়তো তাই দর্শনা। বা হয়তো মাম্মির জীবনটায় ওরকম একটা স্বপ্ন ছিল। কাল রাত্রে আমার যখন ঘুম আসছিল না তখন অদ্ভুত একটা কথা মনে হল। মনে হল সত্যি যদি আমার একটা ফুটফুটে মেয়ে থাকত। যার কোনও দুঃখ থাকত না। যে আমার চারদিকে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াত, ফড়িঙের মতো লাফাত... কাল আমি সেই মেয়েটাকে দেখলাম দর্শনা...

পেশাদারিত্বটা মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলে দর্শনার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, কোথায় স্যার?

প্রীতম সান্যাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হরির ঝিলের ধারে মহেশকাকার বাড়িতে...

কিছু বলতে গিয়েও দর্শনা চুপ করে গেল। পুরনো পেশাদারিত্বটা ফিরিয়ে আনল। মানুষটার অনেক না বুঝতে পারা কথা মন দিয়ে শোনাটাই তার পেশার অঙ্গ।

তুমি ঠাকুর-দেবতায় খুব বিশ্বাস করো, তাই না দর্শনা?

করি স্যার। দর্শনা নিচু গলায় বলল।

পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?

দর্শনা আমতা আমতা করে বলল, মানে সেভাবে ঠিক বিশ্বাস... অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর মেনি আনএক্সপ্লেনড...

প্রীতম সান্যাল মাথা ঝাঁকালেন, না দর্শনা, এক্সপ্লেনেশন চাওয়ার দায়টা তো আমাদের। সবসময় দরকার আছে কি সব ঘটনার এক্সপ্লেনেশন চাওয়া? বিশ্বাসটার কি কোনও দাম নেই? আমি কি বিশ্বাস করি জানো? মাইসোরে সেই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে যখন আমি গাড়ির মধ্যে বসে মাম্মির সঙ্গে কথা বলছিলাম, কী বলছিলাম জানো... বলছিলাম মাম্মি হয় আমাকে শান্তির ঘুম পাড়িয়ে দাও, না হলে তোমার ডায়েরির পাতা থেকে সেই প্রজাপতির মতো মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও... আর তারপরেই মাম্মি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই বিশ্বাসটার পিছনে এক্সপ্লেনেশন চাওয়া কি খুব জরুরি?

দর্শনা বুঝতে পারল না এর উত্তরে কী বলবে। রাজারহাটের ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটা নিঃশব্দে জোরে ছুটে চলেছে। প্রীতম সান্যাল একইভাবে বলে চললেন, আমার ঘুম হত না দর্শনা। দিনের পর দিন। ডক্টররা আমাকে ওয়ার্ন করেছে। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আই

অ্যাম ইটিং মাই লাইফ। আমি যদি বিশ্বাস করি আমাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য একদিন মাম্মি তোমার হাত দিয়েই বার্বির ডিভিডিটা পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই বিশ্বাসটার পিছনে এক্সপ্লেনেশন চাওয়াটা কি খুব প্রয়োজনীয়?

দর্শনা আগের মতোই চুপ করে থাকল। প্রীতম সান্যাল পাশে রাখা মায়ের ডায়েরিটা তুলে নিয়ে একটা পাতা খুঁজতে খুঁজতে বলতে থাকলেন, আমি মাম্মির ওপর যত অভিমান করেছি মাম্মি ততই আমার কাছে ফিরে ফিরে এসেছে।

পাতাটা খুঁজে পেয়ে প্রীতম সান্যাল বলতে থাকলেন, মাম্মি বিশ্বাস করত হরির ঝিলের মধ্যে আমার দিদিমার আত্মা আছে। পাখিদের গান শুনতে শুনতে পরম শান্তিতে আছে... আর হরির ঝিলে আছে একটা অভিশাপ... হরির ঝিলের দিকে যে হাত বাড়িয়েছে, তার মাথায় অনিবার্য হয়ে নেমে এসেছে সেই অভিশাপ...

গাড়ির গতিটা হঠাৎ আস্তে হয়ে এল। দর্শনার চোখ ছিল ডায়েরিটার দিকে। সামনে তাকিয়ে দেখল রাজারহাটের শুনশান রাস্তায় সামনে একটা গাঢ় কুয়াশা। ড্রাইভারকে সাবধান করল দর্শনা, বি কেয়ারফুল...

ড্রাইভার ফগলাইটগুলো জ্বালিয়ে দিল। ফগলাইটের তীব্র আলো সেই কুয়াশায় গিয়ে ধাক্কা খেল। সাবধানেই গাড়িটা চালাতে লাগল ড্রাইভার। দর্শনা আড়চোখে দেখল কুয়াশাটা প্রীতম সান্যালকে বিচলিত করেনি। ডায়েরিটা বন্ধ করে সিটে মাথাটা এলিয়ে চোখটা বন্ধ করে বলে চলেছেন, আমার দিদিমাকে আমি কখনও দেখিনি... কিন্তু মনে হল, কাল প্রথম দেখলাম, সেই বাচ্চা মেয়েটাকে যখন কোলে তুললাম, বিশ্বাস করো ওর চোখে আমি দেখলাম দিদিমার চোখ... ভীষণ নিষ্পাপ পবিত্র দুটো চোখ। আমার একটুও ভুল হয়নি... আর দিদিমার চোখের কাছে আমি কী চাইলাম জানো... অভিশাপ... হরির ঝিলের অভিশাপ... যাতে বাবার মতো আমার মেমরিটাও এক জায়গায় ফ্রিজ করে যায়। যেখানে জুলি থাকবে না, উপাসনা থাকবে না, তোমরা কেউ থাকবে না দর্শনা। সেখানে থাকবে মাম্মি, পাখির গান, ক্যারলস... হোয়ার চিলড্রেন আর পিয়োর অ্যান্ড হ্যাপি... সেখানে বাবা আর মাম্মির মধ্যিখানে বসে অন্ধকার সিনেমা হলে আমি দেখব পথের পাঁচালি...

গাড়িটা থেমে গেল। কুয়াশাটা হঠাৎ করে খুব গাঢ় হয়েছে। এক হাত দূরের কিছুও দেখা যাচ্ছে না। এত গাঢ় কুয়াশায় গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। ড্রাইভার স্বগতোক্তি করল, কুয়াশাটা বাঁদিকে সরে যাচ্ছে ম্যাডাম। এখনই পরিষ্কার হয়ে যাবে...

ইটস ওকে! কোনও তাড়া নেই। ফ্লাইট ডিলেড আছে। ডোন্ট রাশ!

জানলাগুলো খুলে দিতে বলো দর্শনা। প্রীতম সান্যাল ক্লান্ত গলায় বললেন।

ড্রাইভারকে বলতে হল না। মালিকের কথা শুনে পাওয়ার উইন্ডোর বোতামটা টিপে নামিয়ে দিল সবকটা জানলা। ভিজে স্যাঁতস্যাঁতানি নয়, ভেতরটাও ভিজে ভিজে লাগছিল দর্শনার। মনে হল কুয়াশার মধ্যে কে যেন বলছে, ও অনেকদিন শান্তির ঘুম ঘুমোয়নি দর্শনা, ওকে ঘুম পাড়িয়ে দাও। গাও—আয় ঘুম, আয় ঘুম, আয় ঘুম আয়। ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম ঘুম আয়...